গোলাম মুরশিদ

আশার ছলনে ভুলি



এ রচনা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঐতিহাসিক জীবনী। সমগ্র বাংলা জীবনী-সাহিত্যেই একটি বিস্ময়কর অবদান।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

●

এই লেখা একটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবিস্মরণীয় করে রাখবে।

সাগরময় ঘোষ

●

মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে গত এক শতাব্দী ধরে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাস থেকে ফ্রান্স অবধি নানা জায়গার অসংখ্য তথ্য এবং সেসব তথ্যের অসামান্য বিশ্লেষণ দিয়ে গোলাম মুরশিদ প্রথম মধুসূদনের অন্তর্জীবন, সাহিত্যজীবন এবং প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে অভূতপূর্ব যোগাযোগ ঘটিয়েছেন। এই প্রথম মাইকেলের পূর্ণরূপ প্রকাশ পেলো।

আহমদ শরীফ

●

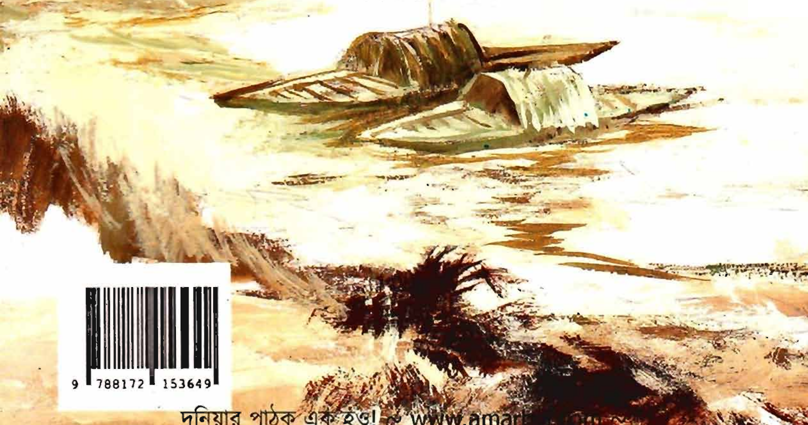
গবেষণালব্ধ অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য এবং অনুভবজাত নতুন ব্যাখ্যার সহযোগে মধুসূদনের জীবনী পুনর্গঠিত হয়েছে এই বইতে।

আনিসুজ্জামান

●

আমি আমার প্রিয় সুকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নতুনভাবে দেখলাম। (আমি বাঙালী নই—রাজস্থানের লোক।)

মদনলাল ব্যাস

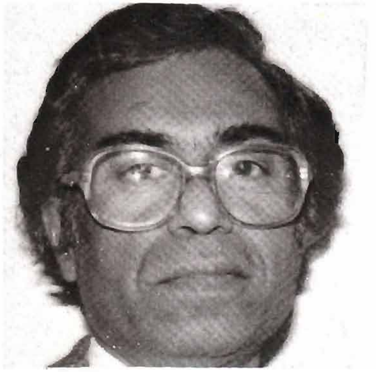


9 788172 153649

আশার ছলনে ভুলি

গোলাম মুরশিদ





জন্ম ১৯৪০, বরিশালে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে। পি এইচ ডি—ঐতিহাসিক ডেইভিড কফের তত্ত্বাবধানে। গবেষণার বিষয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দু দশক ধরে অধ্যাপনা। মাঝখানে দু বছর কেটেছে মেলবোর্নে, শিবনারায়ণ রায়ের তত্ত্বাবধানে, পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা কর্মে। ১৯৮৪ সাল থেকে লন্ডন-প্রবাসী।
বেতার-সাংবাদিকতা এবং শিক্ষকতার অবসরে প্রধানত আঠারো শতকের বাংলা গদ্য এবং মাইকেল-জীবন নিয়ে গবেষণা। প্রধান নেশা গবেষণার—অতীতকে আবিষ্কারের।
বারোটি গ্রন্থ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালার ওপর ভিত্তি করে রচিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ব্ববঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা (১৯৮১)। পিএইচডি. অভিসন্দর্ভের ওপর ভিত্তি করে লেখা সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক (১৯৮৫)। মহিলাদের নিয়ে লেখা Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization (১৯৮৩) (বাংলা অনুবাদ : সংকোচের বিহ্বলতা [১৯৮৫]) এবং রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারীপ্রগতির একশো বছর (১৯৯৩)।
অন্য উল্লেখযোগ্য রচনা, কালান্তরে বাংলা গদ্য (১৯৯২), যখন পলাতক (১৯৯৩) এবং বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদি-পর্ব (১৯৮৬)।
প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্য পেয়েছেন বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২)। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বক্তৃতা দান (১৯৯১-৯২)।
ছদ্মনাম : হাসান মুরশিদ। এই নামে একটি উপন্যাসও লিখেছেন।

প্রচ্ছদ □ সুনীল শীল ও সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

“হলপ করে বলতে পারি, আমি দেখা দেব একটা বিশাল ধূমকেতুর মতো—” বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর এই আত্মঘোষণায় খাদ ছিল না। এ-চিঠিটি যখন লেখা, তখনই তিনি খ্যাতি-অখ্যাতির তুঙ্গে।

বস্তুত, বাংলা সাহিত্যের আকাশে বিরল ও বিশাল এক ধূমকেতুর মতোই আবির্ভাব মাইকেল মধুসূদনের। চোখ-ধাঁধানো দীপ্তিতে ভাস্বর, ভিন্নতর গতিপ্রকৃতি, স্বতন্ত্র এক কক্ষপথ। নশ্বর দেহটি ধূমকেতুর মতোই দেখা দিয়ে অচিরে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু রেখে গেছে এক চিরস্থায়ী ঔজ্জ্বল্য—কীর্তিতে, জীবনে।

সৃষ্টির মতোই আশ্চর্য এক বর্ণময় জীবনও মাইকেল মধুসূদন দত্তের। প্রতিভা ও প্যাশনের, আকাঙ্ক্ষা ও আকিঞ্চনের, বৈপরীত্য ও নাটকীয়তার অন্তহীন দ্বন্দ্বে দীর্ণ, বিধ্বস্ত, বিপন্ন।

সজীব, স্বমহিম এবং সমকালকে ছাপিয়ে-ওঠা সেই জীবন নিয়ে কিন্তু আজও কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। যত-না তথ্য, তার ঢের বেশি জনশ্রুতি ও অনুমান-নির্ভর এতকাল-লিখিত প্রায় প্রতিটি মাইকেল-জীবনী।

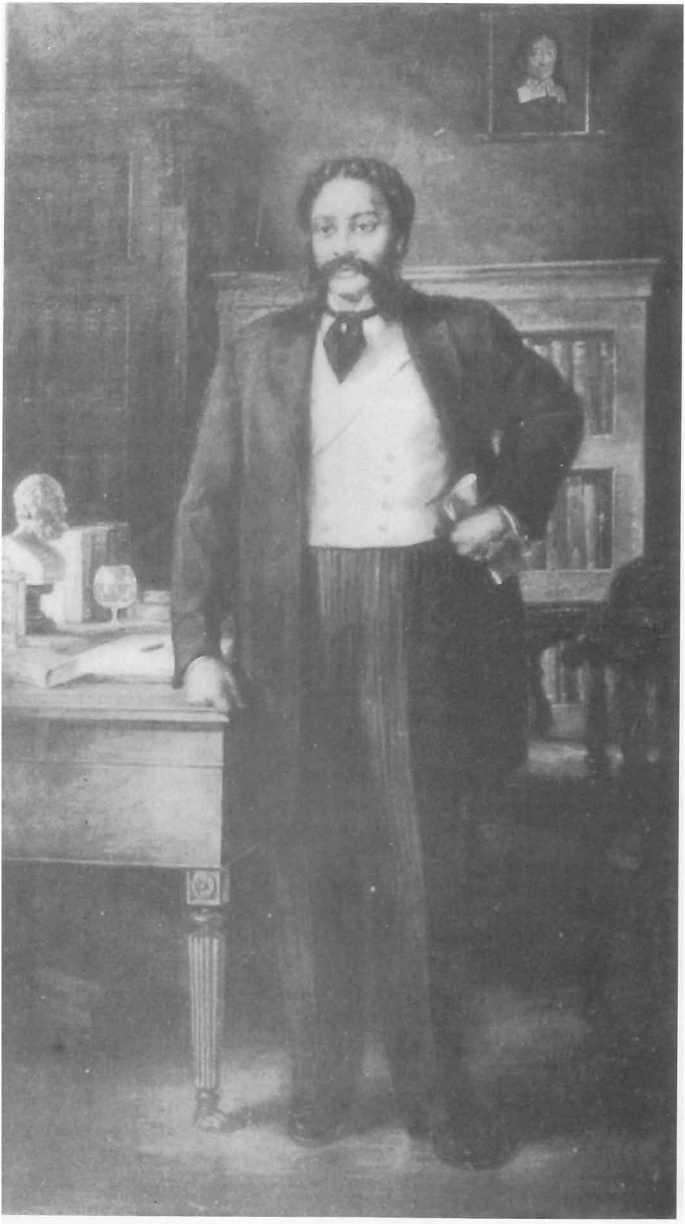
সেই আক্ষেপ ঘোচাতেই এই গ্রন্থ। এই বিপুল পরিশ্রমসাধ্য প্রামাণ্য মাইকেল-জীবনী, সেইসঙ্গে জীবন ও সৃষ্টির লুপ্ত যোগসূত্রগুলির উজ্জ্বল উদ্ধার।

বলা বাহুল্য, এ-কাজ সহজ ছিল না।

মাইকেল-জীবনীর উপাদান ছড়িয়ে আছে নানান জায়গায়। যশোর থেকে কলকাতা, মাদ্রাজ থেকে লন্ডন, ভার্সাই থেকে এডিনবরায়। এমন প্রতিটি জায়গায় এতকাল পরে হানা দিয়ে, দুষ্প্রাপ্য নথিপত্রের ধূলিধূসর পৃষ্ঠা এবং হারিয়ে-যাওয়া, ছড়িয়ে-থাকা সমুদয় নথিপত্র ঘেঁটে দীর্ঘদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় গোলাম মুরশিদ উপহার দিলেন এমন-এক গ্রন্থ, যা একাধারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনকথা এবং সেই জীবনের আলোয় মাইকেল মধুসূদনের রচনাবলিকেও নতুনতর দৃষ্টিতে মূল্যায়নের প্রয়াস।

‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালেই সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবী-পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছে গোলাম মুরশিদের এই রচনা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৭২তম জন্মদিনে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত।

ISBN 81-7215-364-3



এম.এস. ডাট, বার-অ্যাট-ল, অতুল বসুর আঁকা ছবি



আশার ছলনে ভুলি

মাইকেল-জীবনী

গোলাম মুরশিদ

আনন্দ

উৎসর্গ

আমার পুত্র
(অন্তু) পাণিনি মুরশিদ
এবং
কন্যা
(অমিতা) বিপাশা গার্গী মুরশিদ

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৯৮৬ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে আবিষ্কার করার যে-কাজ শুরু করেছিলাম কুড়ি বছর পরে বর্তমান সংস্করণের মাধ্যমে তা শেষ করতে পেরে স্বস্তি বোধ করছি। তবে এ সংস্করণে নতুন তথ্য সামান্যই যোগ করতে পেরেছি। কিন্তু যা বেশ ব্যাপকভাবে করতে পেরেছি, তা হলো: সংশোধন এবং পরিমার্জন। অনেক জায়গাই নতুন করে লিখেছি। তা ছাড়া, আগের সংস্করণে পাদটীকায় অনেক ভুল ছিলো। বর্তমান সংস্করণে পাদটীকা নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ করতে পেরেছি বলে ধারণা করি। বংশ-লতিকায় কিছু নতুন তথ্য আছে। তা ছাড়া, অনেক ছবির মানও আগের তুলনায় উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থশেষে একটি বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জীও জুড়ে দিতে পেরেছি। এর ফলে বইটি আগের তুলনায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

এর পরেও দুটি জায়গায় কিছু ফাঁক থেকে গেলো। রেবেকা টমসনের ধর্মপিতা ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশের সঠিক এবং পুরো পরিচয় এখনো পুরোপুরি উদ্ধার করা যায়নি। অবশ্য কবির জীবনের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। সুতরাং এ পরিচয় অনুদ্ঘাটিত থাকলেও কিছু যায়-আসে না। তা ছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ যা অজানা থেকে গেলো, তা হলো রেবেকার সঙ্গে কবির সম্পর্ক কখন এবং কিভাবে ছিন্ন হলো। আর, হেনরিয়েটার সঙ্গে কবির প্রণয়ের সম্পর্ক কিভাবে গড়ে উঠলো এবং তা শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে পরিণত না-হলেও পরিণতি লাভ করলো। রেবেকা এবং হেনরিয়েটা উভয়ই এতো সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন যে, তাঁদের সম্পর্কে লিখিত কোনো সূত্র থেকে এ ধরনের তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বিদ্যাসাগরকে লেখা মাইকেলের চিঠিগুলো দিয়ে এবং উইলিয়াম র‍্যাডিচি ও কিন্টন সীলি তাঁদের কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। ড র‍্যাডিচির সঙ্গে আলোচনা করেও উপকৃত হয়েছি।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণের পর আরও অনেক নতুন তথ্য পেয়েছি। বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লেখা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ৩৫ খানা মূল চিঠি পেয়েছি ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের কাছ থেকে। এসব চিঠির প্রায় সবগুলো আগেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অনেকগুলো চিঠির পুরো পাঠ প্রকাশিত হয়নি। পুরো চিঠি থেকে অনেক অজানা তথ্য জানা যায়। যেমন, মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে টাকাপয়সার হিশেব এসব চিঠি থেকে বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এ চিঠিগুলো ব্যবহার করতে দিয়ে ড দাশগুপ্ত

আমাকে চিরঋণী করেছেন। এসপিজি এবং জেমস লঙের কাগজপত্র থেকেও নতুন তথ্য পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ক্ষমা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ক্ষমা এই জন্যে যে, আগের সংস্করণে তাঁর নাম উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। আর কৃতজ্ঞতা এই জন্যে তিনি গল্পচ্ছলে একদিন বলেছিলেন যে, রোডস লাইব্রেরিতে মাইকেলের একখানা চিঠি দেখেছেন। রোডস লাইব্রেরিতে মাইকেলের লেখা কোনো চিঠি না-থাকলেও সেখানেই বিশপস কলেজের কাগজপত্র দেখার সুযোগ পাই। এই কাগজপত্রের মাধ্যমেই বিশপস কলেজের আমলে কবির এ যাবৎ অজ্ঞাত জীবনের এবং খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহের কথা জানা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম সংস্করণের সঙ্গে বর্তমান সংস্করণের একটা বড়ো পার্থক্য এই যে, প্রথম সংস্করণে ইচ্ছে করেই কোনো পাদটীকা অথবা উল্লেখপঞ্জী রাখিনি। কিন্তু বর্তমান সংস্করণে পাদটীকা দেওয়া হয়েছে। পাদটীকা রাখবো না — গোড়া থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায়, সব সময়ে দলিলপত্র অথবা বই থেকে তথ্যাদি টুকে আনার সময়ে পৃষ্ঠাসংখ্যা লিখে রাখিনি। এখন সেসব দলিলপত্র অথবা বই আবার খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ফলে অল্প সংখ্যক পাদটীকা পূর্ণাঙ্গ হলো না।

দেশ পত্রিকায় এই রচনাটির শেষ কিস্তি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এ বই-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ছাপার অসংখ্য ভুল, অনবধানতাজনিত ভাষার ত্রুটি, এবং কোনো কোনো জায়গায় পুনরাবৃত্তি থেকে গিয়েছিলো। এ জন্যে আন্তরিকভাবে লজ্জিত এবং দুঃখিত হয়েছি। প্রথম সংস্করণ যাঁরা কিনেছেন, তাঁদের কাছেও ক্ষমাপ্রার্থী। বর্তমান সংস্করণ প্রায় নির্ভুল হয়েছে। এই কাজে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর অধ্যাপক শফি আহমদ আর স্নেহভাজন ডক্টর স্বরোচিষ সরকার। দুজনকেই আন্তরিক ধন্যবাদ। এই লেখাটি *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি চিঠি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। তার মধ্যে বিশেষ করে স্বপন বসু এবং দীনেশচন্দ্র সিংহের চিঠি থেকে উপকৃত হয়েছি। তাঁদেরও ধন্যবাদ।

গোলাম মুরশিদ
নভেম্বর ১৯৯৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মারা যান এক শো কুড়ি বছরেরও আগে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদান সত্ত্বেও তাঁর কোনো প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশিত হয়নি। এ পর্যন্ত তাঁর যে-সব জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তাঁর জীবনের কোনো কোনো অধ্যায় সম্পর্কে যথেষ্ট অথবা অভ্রান্ত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কারণ, তাঁর সন্তান এবং বন্ধুরা তাঁর সম্পর্কে সামান্যই জানতেন। তা ছাড়া, তিনি জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাড়ে বারো বছর বঙ্গদেশ থেকে অনেক দূরে বাস করেছিলেন। সে সময়কার তথ্য খুব কমই জানা ছিলো। কিন্তু তাঁর জীবনীর অনেক উপকরণ লন্ডনে থাকতে পারে – আট বছর আগে এ কথা বলেছিলেন অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়। তিনি তখন লন্ডনে একটি সেমিনারে অংশ নিতে এসেছিলেন। এর সপ্তাহ খানেক পরে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রথম দিনই এমন কয়েকটি তথ্য খুঁজে পাই, যা কবির অন্য কোনো জীবনীতে লক্ষ্য করিনি। তারপর থেকে কতো যে উপকরণ পেয়েছি এই অসাধারণ গ্রন্থাগারে – মধু-রসিক পাঠক এ বই পড়লে তা টের পাবেন। তবে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভার্সাই-এর সরকারী এবং মিউনিসিপাল আর্কাইভস, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রেজ ইন লাইব্রেরি, ব্যর্মিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং এডিনবরার পাবলিক রেকর্ডস অফিসেও পেয়েছি। অধ্যাপক রায়ের কাছে আমার ঋণ অনেক।

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময়ে এ লেখাটি পড়ে আমার শিক্ষক অধ্যাপক আহমদ শরীফ এবং অধ্যাপক আনিসুজ্জামান অনেক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। মাইকেল মধুসূদনকে নিয়ে খুব মূল্যবান কাজ করেছেন ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র। তাঁরা *দেশ* পত্রিকায় আমার লেখা দেখে উৎসাহ এবং পরামর্শ দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরকে লেখা কবির কয়েকটি চিঠির পূর্ণতর পাঠ ড. দাশগুপ্তের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন ড. উইলিয়াম র‍্যাডিচি। এই চিঠিগুলো এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ডিফিল অভিসন্দর্ভ ব্যবহার করতে দিয়ে ড. র‍্যাডিচি আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেও উপকৃত হয়েছি। বায়রনের চিঠির সঙ্গে মাইকেলের চিঠির অত্যাশ্চর্য মিলটি তিনিই লক্ষ্য করেছিলেন।

অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা তিন দশক ধরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু আমরা কৃচিৎ একমত হই। অক্সফোর্ডে তিনি সম্প্রতি ন মাস ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তর্ক করে চিন্তার অনেক খোরাক পেয়েছি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার লেখা পড়ে তিনি আমাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। এ বই লেখার ব্যাপারে অন্য কারো কাছ থেকে এতোটা সাহায্য পাইনি। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এতোই আন্তরিক যে, ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে খাটো করতে চাইনে।

দেশ পত্রিকায় এ লেখাটি প্রকাশ করে শ্রীসাগরময় ঘোষ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ

করেছেন বললে কিছুই বলা হয় না। তিনি যেভাবে আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন, তা তুলনাহীন। একজন সম্পাদক একটা রচনার কতোটা সমাদর করতে পারেন এবং লেখকের কাছ থেকে কিভাবে একটা রচনা বের করে নিতে পারেন, তিনি তার অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। এ লেখাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যাপারেও তিনি উদ্‌যোগ নিয়েছেন। এ বই-এ প্রকাশিত কোনো কোনো চিত্রও তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

বিভিন্ন সময়ে আমার লেখা থেকে যাঁদের পড়ে শুনিয়েছি তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. কেতকী কুশারী ডাইসন এবং আবদুল গাফফার চৌধুরী। তা ছাড়া ছিলেন বিবিসিতে আমার সহকর্মীরা। তাঁরা যে ধৈর্য ধরে শুনেছেন এবং নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তার জন্যে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ। একবার *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর লেখাটি পড়ে অনেকে অযাচিতভাবে উৎসাহ এবং উপদেশ দিয়েছেন। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

লাইব্রেরি-কর্মীদের কাছ থেকে অসামান্য সহায়তা পেয়েছি। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির কর্মীরা, বিশেষ করে গ্র্যাহ্যাম শ এবং শ্রীমতী দীপালি ঘোষ, গ্রেজ ইনের লাইব্রেরিয়ান মিসেস টেরিজা টম, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রোডস লাইব্রেরির কর্মীরা, ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরির একজন কর্মী, ভার্সাই মিউনিসিপাল আর্কাইভসের কিউরেটর এবং ব্যর্মিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরল গ্রন্থ শাখার কর্মীরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সবার সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এ কাজ শেষ করা অসম্ভব হতো। রেবেকার সঙ্গে কবির বিয়ের দলিলের আলোকচিত্রটি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি বিনা মূল্যে সরবরাহ করায় লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এলগিন স্কুলের সংগ্রহ থেকে একটি ছবি জোগাড় করে দিয়েছেন ড. ক্লিন্ট সীলি। কবির সমাধির আলোকচিত্রগুলো জোগাড় করে দিয়েছেন শ্রীবাদল বসু।

যখনই এই লেখাটির কোনো অংশ পড়ে শুনিয়েছি, তার প্রায় প্রতিটি আসরে আমার স্ত্রী এলিজা হাজির থেকেছেন। তা ছাড়া, তিনি আমাকে প্রুফ দেখার ব্যাপারে এবং নির্ঘণ্ট তৈরি করতে সাহায্য করেছেন।

গোলাম মুরশিদ
কিংসবেরি
লন্ডন
বড়ো দিন, ১৯৯৪

তথ্যনির্দেশ

মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণ্য জীবনী লেখার জন্যে যেসব উপকরণ দরকার, তার অনেকটাই চিরকালের জন্যে লুপ্ত হয়েছে। যেসব উপকরণ লুপ্ত হয়নি অথচ এ পর্যন্ত যার সন্ধান পাওয়া যায়নি, এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

সবচেয়ে রহস্যাবৃত ছিলো তাঁর পরিবারের পরিচয় — তিনি যে-দুই মহিলার সঙ্গে জীবন কাটিয়েছিলেন এবং তাঁদের সন্তানাদির। রেবেকা টমসন ম্যাকট্যাভিশের সঙ্গে তাঁর বিয়ে এবং তাঁদের চার সন্তানের ব্যাপটিজম এবং সমাধিস্থ করার তথ্য ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত এক্লেসিয়াস্টিক্যাল পেপারের এন/২ সিরিজে আছে। তাঁর দুই কন্যা এবং পুত্রের প্রথম বিবাহের খবর আছে সিভিল ম্যারেজের নথিতে। এক কন্যা এবং পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ এবং সেই পুত্রের সন্তানদের তথ্য আছে এক্লেসিয়াস্টিক্যাল পেপারে। কিন্তু বিয়ের সময়ে রেবেকার বংশ-নাম বদল করা হয়েছিলো বলে তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত সরাসরি পাওয়া যায় না। তাঁর নাম খুঁজতে হয় ম্যাকট্যাভিশের বদলে টমসনের অধীনে।

কলকাতায় মাইকেল এবং হেনরিয়েটার যে-দুটি সন্তান হয়েছিলো, সে খবর আছে এন/১ সিরিজে। তাঁদের তিন সন্তানের মৃত্যু এবং দুজনের বিয়ের তথ্য এবং উত্তর-পুরুষের জন্ম, মৃত্যু এবং বিয়ের খবর এন/১ সিরিজে পাওয়া যায়। তবে ১৯৩৫ সালের পর থেকে দলিলপত্রে নামের সংখ্যা দ্রুত কমে এসেছে। সে জন্যে, এই সময়ের পর কবির বংশাবলীর হদিস করতে পারিনি (কবির জীবনী লেখার জন্যে তার কোনো দরকারও নেই)।

অসুবিধা দেখা দেয় হেনরিয়েটার পরিচয় নিয়ে। কবির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়নি। সুতরাং কলকাতা অথবা মাদ্রাস সিরিজের কাগজপত্র থেকে তাঁর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর পরিচয়-রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্যে ভার্সাই-এর মিউনিসিপ্যাল আর্কাইভসের সাহায্য দরকার। সেখানে তাঁর যে-দুটি সন্তান হয়েছিলো, তাদের একজনের কন্যার — মৃত্যুর এবং অ্যালবার্ট নেপোলিয়নের জন্মের তথ্য এই আর্কাইভসে আছে। এই কন্যা সমাধিস্থ করার এবং জন্মসংক্রান্ত দলিলে বংশ-নামসহ হেনরিয়েটার পুরো নাম দেওয়া আছে। একবার সে নাম জানার পর মাদ্রাসের এক্লেসিয়াস্টিকাল পেপার থেকে তাঁর বাকি পরিচয় আবিষ্কার করা শক্ত হয় না। ভার্সাইতে কবি যে-বাড়িতে বাস করতেন তার খবর এবং সেই বাড়িতে একটি স্মৃতিফলক লাগানোর তথ্যও এই আর্কাইভসে আছে। এই বাড়ির যে-বাসিন্দারা দাতব্য তহবিল থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন, তাঁদের খবর আছে ভার্সাই-এর সরকারী আর্কাইভসে।

রেবেকার পিতা বলে কথিত ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশের পরিচয় পাওয়া শক্ত। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত সৈন্য বিভাগের নথিতে খুব সম্ভব তাঁর ছোটো ভাই কলিন ম্যাকট্যাভিশের পরিচিতি এবং এডিনবরার পাবলিক রেকর্ডস অফিসের এক্লেসিয়াসটিক্যাল রেকর্ডসে তাঁর নিজের পরিচিতি আছে।

হিন্দু কলেজ এবং মাইকেলের বৃত্তি ও পদক লাভের অনেক তথ্য সরকারী রিপোর্টে আছে। এডুকেশন কাউন্সিল অথবা ডিপিআই-এর বার্ষিক রিপোর্টেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এডুকেশন কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত আলাদা করে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির *বেঙ্গল প্রসিডিংসে* পাওয়া যায়। তাঁর বিশপস কলেজে অধ্যয়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি এ পর্যন্ত একেবারে অজ্ঞাত ছিলো। এই কলেজ থেকে লন্ডনের সোসাইটি ফর দ্য প্রোপ্যাগেশন অব গসপেলস (এসপিজি)-এ যে-সব কাগজপত্র পাঠানো হতো তার একটি বড়ো

সংগ্রহ আছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রোডস লাইব্রেরিতে। এখানে মাইকেল সম্পর্কে তাঁর শিক্ষকদের কয়েকটি চিঠি, প্রতিবেদন এবং অন্য অনেক প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রও আছে।

কবির সঙ্গে পাদ্রি জেমস লঙের বেশ যোগাযোগ হয়েছিলো। *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর হাত দিয়ে। জেমস লঙের স্বাক্ষর করা এবং "With the complements of the author" বাণী সংবলিত এই কাব্যের কপিটি এখনো ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে আছে। তাঁর লেখা চিঠিপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র আছে চার্চ মিশনারি সোসাইটির কাগজপত্রে। এখন তা রক্ষিত হয়েছে ব্যর্মিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কবি মাদ্রাস স্কুল এবং মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামে কাজ করতেন। এই দুই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর একটি করে ছাপানো রিপোর্ট প্রকাশিত হতো। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ১৮৪৫ থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত অরফ্যান অ্যাইলামের এবং ১৮৪১ সাল থেকে মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয় ওরফে মাদ্রাস স্কুলের রিপোর্ট আছে। মাদ্রাসের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনরেলের বেতনের নথি থেকে মাদ্রাস স্কুলের শিক্ষকদের সম্পর্কে (১৮৫৭ সালের) বাড়তি খবর পাওয়া যায়। মাদ্রাসের *স্পেক্টেটর* এবং *অ্যাথেনিয়াম* পত্রিকার প্রায় পুরো নথিও এই লাইব্রেরিতে আছে। সেকালের মাদ্রাসের অন্য অনেক খবর পাওয়া যায় *ম্যাড্রাস অ্যালম্যানাক* আর *অ্যাসাইলাম অ্যালম্যানাক* থেকে। এতে তখনকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক তথ্য আছে।

কলকাতা থেকে যে-অ্যালম্যানাকগুলো প্রকাশিত হতো, তা থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। কলকাতার আদালতগুলোর এবং তাতে কারা কাজ করতেন,তাঁদের বেতন কতো ছিলো, এমন কি, কলকাতায় বসবাসকারী ইংরেজ, ফিরিঙ্গি এবং বিশেষ নাম-করা দেশীয়দের ঠিকানাও কোনো কোনো পঞ্জিকায় দেওয়া হয়েছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত অনেকগুলো পত্রিকার নথিও আছে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। এসবের মধ্যে আছে: *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ইংলিশম্যান, স্টেটসম্যান, বেঙ্গল হরকরা* আর *ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড*।

ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে দেওয়ানি আদালত এবং আইন বিভাগের সিদ্ধান্তের একটি আলাদা সিরিজ আছে। তবে তাতে রাজনারায়ণ দত্তের নাম অনেক খোঁজ করেও পাইনি। মাইকেলের নামও নয়। *ইংলিশম্যান* এবং সমসাময়িক পত্রিকায় মাইকেলের ব্যারিস্টারি-জীবনের খণ্ড খণ্ড পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য মামলার সংক্ষিপ্ত খবর আইনসংক্রান্ত সাময়িকপত্রিকায় (সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক) আছে। তবে তাতে এম এম ডাটের নাম খুব কমই উল্লিখিত হয়েছে। *বেঙ্গল ল রিপোর্টে* জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দুটি মামলার সূত্রে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

গোলাম মুরশিদ
কিংসবেরি
লন্ডন
বড়ো দিন, ১৯৯৪

সূচিপত্র

১

জননীর ক্রোড়-নীড়ে

'বন্ধু রাজ, তোমাকে আমি হলপ করে বলতে পারি, আমি দেখা দেবো একটা বিশাল ধূমকেতুর মতো — এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।''[১] — নিজের সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে মাইকেল যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে সন্দেহের সত্যি কোনো কারণ ছিলো না। তবে তাঁর এই উক্তিতে একটি ভ্রান্তি লক্ষ্য করি — তিনি যখন (জুলাই ১৮৬১) বলেছেন, তিনি ধূমকেতুর মতন দেখা দেবেন, তখন আসলে তিনি কেবল দেখা দেননি, রীতিমতো তুঙ্গে পৌঁছে গেছেন। *মেঘনাদবধ কাব্যের* দ্বিতীয় খণ্ড এবং *বীরাঙ্গনা* ছাড়া তাঁর সবগুলো গ্রন্থ ততোদিনে প্রকাশিত হয়েছে। ততোদিনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বাংলা সাহিত্যের বিতর্কাতীত সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার হিশেবে। এ প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও তিনি অবশ্য নিজেকে নিয়ে পুরোপুরি তৃপ্ত ছিলেন না। তখনো ভাবছেন, কাব্যকলা তাঁর ঠিক আয়ত্তে আসেনি। সে জন্যে বলেছেন, 'দেখা দেবো।' গত দেড় শো বছরে বাংলা সাহিত্যের আকাশে ছোটো-বড়ো অনেক তারকা দেখা দিয়েছেন। নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে তাঁরা সমুজ্জ্বল। কিন্তু ধূমকেতুর মতো হঠাৎ দেখা দিয়ে নাটকে, কাব্যে যুগান্তর ঘটিয়ে সবাইকে একেবার উচ্চকিত করেছিলেন একজন মাত্র — মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি যে কেবল ধূমকেতুর মতো অল্প সময়ের জন্যে দেখা দিয়েছিলেন, তাই নয়; তাঁর গতি-প্রকৃতি অন্যদের থেকে আলাদা, কক্ষপথও আলাদা। যতোক্ষণ ছিলেন, ততোক্ষণ তিনি অসাধারণ দীপ্তিতে ভাস্বর ছিলেন। চোখ-ধাঁধানো জ্যোতি দিয়ে সবাইকে চমক লাগিয়ে অচিরে তিনি হারিয়ে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব অথবা তাঁর বিস্ময়কর আবির্ভাবের কথা এতো কাল পরেও বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা ভুলতে পারেননি।

স্বসমাজের তুলনায় তিনি ছিলেন সবার থেকে আলাদা। আচার-আচরণে তাঁর ঔদ্ধত্য, সনাতন মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা, জীবন এবং সাহিত্যের প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি বিদ্রোহ — সবই তাঁকে চার দিকের জনতা থেকে একেবারে আসমান-জমিন ফারাক করেছে। ছাত্রজীবন থেকে নিষিদ্ধ খাবার খেয়েছেন তিনি। নিষিদ্ধ পানীয়তে আদৌ কোনো অরুচি ছিলো না। পোশাকে-আশাকে তিনি অনুকরণ করেছেন ফিরিঙ্গিদের। পরীর মতো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে — এ খবর শুনে বন্ধুদের মতো আহ্লাদে আটখানা হননি। বরং খৃস্টান হয়েছেন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে। সেই যুগে দু-দুটি শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে ঘর করেছেন। ডেপুটি হওয়া যে-কালে ছিলো জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা, সেকালে তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য ছিলো কবি হওয়া। যেকালে বাঙালিরা অহঙ্কারে ফেটে পড়তেন সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল হয়ে, সেই কালে কেবল ব্যারিস্টার হবার উদ্দেশ্য নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বিলেত গেছেন।[২] এবং সে সময়ের তুলনায় বিত্তও উপার্জন করেছেন যথেষ্ট। কিন্তু তা দিয়ে আর-

পাঁচ জনের মতো জমি কেনেননি। দু হাতে তা উড়িয়ে দেবার তাক-লাগানো নজির রেখে গেছেন। তিনি এমন অসাধারণ ছিলেন যে, সে সময়ের লোকেরা কেউ তাঁকে ঘৃণা করেছেন, কেউ ভালোবেসেছেন, কেউ-বা করুণা করেছেন; কিন্তু কেউ তাঁকে অস্বীকার করতে পারেননি।

মধ্য বাংলার একটি সাধারণ গ্রামের প্রথাবদ্ধ কিন্তু নব্যধনী পরিবারে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছেন কলকাতায়। লেখাপড়া শিখেছেন হিন্দু কলেজে। তাঁর চরিত্রে এসব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য তা হলে এলো কোত্থেকে? কতোটা তিনি পেয়েছেন পরিবার থেকে? কতোটা পরিবেশ থেকে? হিন্দু কলেজে প্রথম তিরিশ বছরে কয়েক হাজার ছেলেই পড়েছিলেন।[৩] কেউ তো এমন সৃষ্টি-ছাড়া হননি! তা হলে? পরে দেখতে পাবো, কোনো একটি সূত্রের কাছে তিনি এই আদর্শ পাননি; তিনি যা হয়েছিলেন, তাও একদিনে হননি!



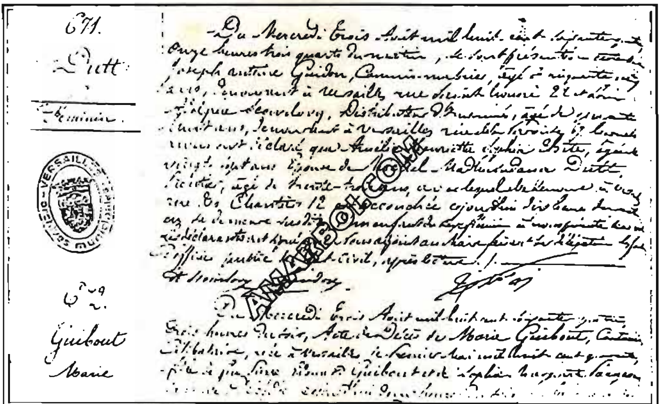
মাইকেলের সমাধিস্তম্ভে হেনরিয়েটার ভুল বংশনাম, সমাধিস্থ করার ভুল তারিখ এবং "interred" শব্দের ভুল বানান।

তাঁর বাবা ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। জেঠা রাধামোহন যশোরের সেরেস্তাদার, মেজ জেঠা মদনমোহন কুমারখালির মুন্সেফ আর সেজ জেঠা যশোরের উকিল। পরবর্তী সোপান হিশেবে মধুসূদনের পক্ষে ব্যারিস্টার হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। হয়েও ছিলেন একদিন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের আর-একটা দিক ছিলো — সেই দিকটা দীর্ঘদিন অবধি আদালতের ধারেও যায়নি। ঘুরে বেড়িয়েছে আইন এবং যুক্তির জগৎ থেকে অনেক দূরে — কবিতার জগতে। তাঁর একমাত্র বাসনা ছিলো তিনি উকিল নন, হাকিম নন, ডেপুটি নন — কবি হবেন। এই অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা কোথায় খুঁজে পেলেন তিনি?

ব্যক্তির চরিত্রগঠনে পরিবারের প্রভাব থাকে। পরিবেশের প্রভাবও অস্বীকার করার জো নেই। মাইকেল মধুসূদন দত্তও এ ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন না। সে জন্যে, তাঁর জীবনী পুনর্গঠনে তাঁর পরিবার কেমন ছিলো এবং সেই পরিবারের আওতায় তিনি কিভাবে মানুষ হয়েছিলেন, তা দেখা দরকার। কিন্তু দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, জীবনী-লেখকের জন্যে এ কাজটা মোটেই সহজ নয়। কারণ তিনি যে-পরিবারে জন্মেছিলেন, সে পরিবার এতোটা শিক্ষিত অথবা ঐতিহ্যবাহী ছিলো না যে, তার সব তথ্য লিখিত থাকবে। যেমনটা ছিলো, ধরা যাক, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। মধু যে জন্মেছিলেন বঙ্গদেশের একটি অজ গ্রামে, তার ফলে এ কাজটা আরও কঠিন হয়েছে। এ রকমের পরিবেশে জন্ম তারিখটা পর্যন্ত কেউ লিখে রাখে না। মধুর জন্ম তারিখও লেখা নেই। বস্তুত, পাড়াগাঁয়ে জন্মের সময়টা আনুমানিক মনে রাখা হতো কোনো ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে — "ঐ যে সেই বন্যার বছর"!

তারপর বয়স গোনা হতো কুড়ির হিশেবে। এমন কি, পৌনে দুশো বছর পরে এখনও জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এবং অন্যান্য পারিবারিক খবর লিখে রাখার রেওয়াজ, বিশেষ করে গ্রামে, চালু হয়নি। আর এসব তথ্যাদি রাখার সরকারী আইনও হয়নি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গবেষক নিতান্ত অসহায়। মাইকেল-জীবনের এ দিকটা নিখুঁত অথবা পূর্ণাঙ্গভাবে পুনর্গঠন করা, সে জন্যে, খুব শক্ত, প্রায় অসম্ভব।

মাইকেলের পারিবারিক পরিচয় উদ্ধার করার কাজটা বিশেষভাবে কঠিন হবার অন্য কারণও ছিলো। তাঁর কবরের ওপর যে-স্মৃতিফলক আছে, তার দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। তাঁর পৌত্ররা এই স্মৃতি-প্রস্তরের ওপর পিতামহী হেনরিয়েটার যে-পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যায় নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে তাঁরা কতোটা অজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা হেনরিয়েটার পুরো নাম লিখেছেন: Amelia Henrietta Sophia। তারপর বন্ধনীর মধ্যে তাঁর কুমারী বংশ-নাম লিখেছেন Dique। কিন্তু হেনরিয়েটার বংশ-নাম আদৌ ডিক ছিলো না। জন্মপত্র থেকে দেখা যাবে, তাঁর বংশনাম ছিলো



Wednesday, 3rd August, 1864, 11.45 A.M. Joseph A. Guidon, marblemaker, aged 55, living in Versailles at 22 rue St Honore, and Louis A. Sccwelovy, distributor of printed papers, aged 48, living in Versailles at 67 rue du la paroisse, declared that Amelia Henrietta Sophia White, aged 27, wife of Michel Madhusudana Dutt, barrister, aged 33, with who she lives at 12 rue Chantiers, gave birth to a female child today at 6 in the morning. the child was presented dead to the Alderman / Deputy Mayor, acting as the Registrar.

কন্যার জন্মপত্রে হেনরিয়েটার সত্যিকার নাম।
এ দলিলটি আছে ভার্সাই-এর মিউনিসিপ্যাল আর্কাইভসে

হোয়াইট। তা হলে তাঁর নিজের পৌত্রদের এ ভুল করার কারণ কী?

আসলে, মাইকেল এবং হেনরিয়েটা যখন মারা যান তখন তাঁদের কন্যা শর্মিষ্ঠার বয়স ১৪ বছরও পুরো হয়নি। তিনি আবার মারা যান মাত্র উনিশ বছর বয়সে। ওদিকে, কবির মৃত্যুকালে তাঁর দুই পুত্র ফ্রেডারিক এবং নেপোলিয়নের বয়স ছিলো যথাক্রমে এগারো বছর এগারো মাস এবং ছ বছর দু মাস। এদের মধ্যে ফ্রেডারিক মারা যায় এর দু বছর পরে। কেবল বেঁচেছিলেন নেপোলিয়ন। মাইকেলের নিজের তরফে ভাই-বোন থাকতে পারতেন, কিন্তু তাঁর অনেক জ্ঞাতি থাকলেও, কোনো

সহদোর ছিলেন না। যে-জ্ঞাতিরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কার্যকারণে তাঁর কোনো যোগাযোগও ছিলো না। হেনরিয়েটার তরফেও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগসূত্র লোপ পাওয়ার কারণ ছিলো। তিনি কবির জীবনসঙ্গিনী হয়েছিলেন পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে। মোট কথা, মাইকেল এবং হেনরিয়েটা মারা যাবার পরে তাঁদের সন্তানদের কাছে তাঁদের পরিচয় বিশদভাবে দেবার মতো কোনো লোক ছিলেন না। কবির বন্ধুরাও এ ব্যাপারে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেননি। কারণ বন্ধুদের সঙ্গে তিনি পারিবারিক পর্যায়ে কোনো যোগাযোগ রাখতেন না। তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখ অথবা কোনো গোপন তথ্য কারো সঙ্গে তিনি ভাগ করে নিতেন না। এ জন্যে, তাঁর বন্ধুরা যে-সামান্য তথ্য জানতেন, তাঁর পুত্র অথবা পৌত্ররা তার চেয়ে বড়ো একটা বেশি জানতেন না। নিজেকে জাহির করতে পছন্দ করলেও, তিনি নিজে তাঁর জীবন সংক্রান্ত তথ্যাদি কাউকে দেননি। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে তাঁর বন্ধু এবং পরিচিতদের মধ্যে অনেকে আত্মজীবনী লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি এদিকে মনোযোগ দেননি। একটি মাত্র ব্যতিক্রম যা লক্ষ্য করি, তা হলো: তিনি কেদারনাথ দত্ত নামে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে তাঁর জীবনের কিছু তথ্য লিখে পাঠিয়েছিলেন। এ ভদ্রলোক সম্ভবত জানিয়েছিলেন যে, তিনি দত্ত বংশীয়দের একটি ইতিহাস লিখছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যা তৈরি করেছিলেন, তা হলো বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায় বসবাসকারী দত্ত বংশীয়দের তালিকা।[৪] এতে তিনি দেখিয়েছিলেন, বঙ্গদেশে আগমনের পর থেকে দত্তদের কতোটি প্রজন্ম হয়েছে এবং তাঁরা কোথায় কোথায় বাস করছেন। নিতান্ত চটি বই। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতোটুকু সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। অপর পক্ষে, কেদারনাথ যদি দত্ত বংশের দিকে নজর না-দিয়ে কেবল কবির দিকে নজর দিতেন, তা হলে হয়তো মাইকেল-জীবনী রচনার মূল্যবান কিছু উপকরণ পাওয়া যেতো।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পিতামহীর পরিচয় দেবার জন্যে, কবির পৌত্ররা এতো নাম থাকতে *ডিক* নামটি বেছে নিলেন কেন? তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাবো, হেনরিয়েটার সত্যিকার পরিচয় কবির বন্ধু অথবা সন্তানরা কেউই জানতেন না। কিন্তু হেনরিয়েটা মাদ্রাস থেকে পালিয়ে এসেছিলেন — এমন একটা গল্প তাঁদের মধ্যে চালু ছিলো। এমন কি, রাজনারায়ণ বসু সন্দেহ করেছিলেন যে, তাঁদের বিয়ে হয়নি।[৫] তাঁরা অস্পষ্টভাবে আর-একটা খবর শুনেছিলেন, সে হলো: হেনরিয়েটা মাদ্রাস স্কুলে মাইকেলের এক সহকর্মীর কন্যা। হেনরিয়েটা সম্পর্কে তৃতীয় জনশ্রুতি — তিনি ফরাসি। (রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় হলপ করে এই ভুল তথ্য পরিবেশন করেছিলেন।)[৬] সুতরাং কবির পৌত্র এবং জীবনী-লেখকরা মাদ্রাস স্কুলের শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন ফরাসি নামধারী লোক খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের বিবেচনায়, এ রকমের নাম ছিলো দুটো — ডিক আর পেপিন।[৭] ডিক নামে ছিলেন দুজন শিক্ষক আর পেপিন নামে একজন। এঁরা তিনজনই কবির সঙ্গে একত্রে মাদ্রাস স্কুলে কাজ করেছিলেন। কিন্তু হেনরিয়েটা তাঁদের কারো কন্যা ছিলেন না। টমাস বেডফোর্ড পেপিন বিয়ে করেন ১৮৪৩ সালে এবং তাঁর প্রথম কন্যা মার্গারেটের জন্ম হয় ১৮৪৮ সালে — যে-বছর মাইকেল রেবেকাকে বিয়ে করেন।[৮] অপর পক্ষে, এ. ডিক এবং এল. ডিক মাদ্রাস স্কুল থেকে পাশ করে সেখানেই টিউটরের চাকরি পান।[৯] বয়সে তাঁরা দুজনই ছিলেন মাইকেলের চেয়ে ছোটো। তদুপরি, পেপিন অথবা ডিক — কেউই ফরাসি ছিলেন না। এঁদের মধ্যে একজনের — ডিকের — পরিচয় স্কুলের রেজিস্টারেই দেওয়া আছে — ঈস্ট ইন্ডিয়ান।[১০] আর টমাস বেডফোর্ড নামই প্রমাণ করে তিনি আদৌ ফরাসি নন। মাইকেলের জীবনী লেখক এবং পৌত্ররা আরও একটা কথা বিবেচনা করতে পারতেন: মাদ্রাস স্কুল ছিলো সরকারী স্কুল। সেকালে ইংরেজ এবং ফরাসিদের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সে স্কুলে কোনো ফরাসির চাকরি পাওয়ারও কথা নয়। সর্বোপরি, তাঁরা লক্ষ্য করতে পারতেন যে, হেনরিয়েটা ফরাসি হলে তাঁর দ্বিতীয় নামটি হেনরিয়েটা না-হয়ে আঁরিয়েৎ হতো। বানান হতো Henriette এবং

তৃতীয় নামটি সোফিয়া (অথবা সফাইয়া) না-হয়ে সোফি – Sophie – হতো।

পৌত্রবাই যদি তাঁদের পিতামহ এবং পিতামহীর পরিচয় সম্পর্কে এতো কম জানেন, তা হলে তেমন একজন কবির জীবনী লেখা কতো শক্ত কাজ, তা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। বস্তুত, যোগীন্দ্রনাথ বসু থেকে আরম্ভ করে সুরেশচন্দ্র মৈত্র পর্যন্ত যাঁরা এর আগে কবির জীবনী লিখেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন এবং, এক কথায়, অসাধ্য সাধন করেছেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ সোম, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং সুরেশচন্দ্র মৈত্র প্রায় এক শো বছরের ব্যবধানে মাইকেল-জীবনের বহু অজ্ঞাত তথ্য খুঁড়ে বের করেছেন। তাঁদের কারো কৃতিত্বই তাই কম নয়। এঁরা, বিশেষ করে, যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং নগেন্দ্রনাথ সোম মাইকেল-জীবনীর বহু তথ্য লোপ পাওয়ার আগে সেসব উদ্ধার করে লিখে না-রেখে গেলে আজ কারো পক্ষেই তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা সম্ভব হতো না।

কবির আত্মীয়রা বেঁচে থাকতে থাকতেই যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর পরিবারের কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন। তবে আত্মীয়দের কাছ থেকে তিনি যেসব খবর পেয়েছিলেন – যেমন মানকুমারী বসুর কাছ থেকে – তার কতোটা সত্য, কতোটা জনশ্রুতি, নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। নিজের পরিবারের কথা বলার সময়ে অতিরঞ্জন করা এবং তার ওপর গৌরবারোপ করা একটা খুব সাধারণ ব্যাপার। আবার পরিবারের কলঙ্কজনক কোনো দিক থাকলেও তা গোপন করাও স্বাভাবিক প্রবণতা। ভার্জিনিয়া উলফের জীবনী লিখতে গিয়ে কুইন্টিন বেল আট বছর বয়সে ভার্জিনিয়া অন্য এক নিকটাত্মীয়ের হাতে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন – এই তথ্যের উল্লেখ করেছেন। বেল দেখিয়েছেন, ভার্জিনিয়া বড়ো হয়েও সারা জীবনে কখনো স্বাভাবিক হতে পারেননি যৌনসম্পর্কিত মনোভাবে।[১১] এ রকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকলে, তার বিশ্লেষণ ছাড়া, যাঁর জীবনী লেখা হচ্ছে তাঁর অন্তর্জীবনের পরিচয় দেওয়া সহজ হয় না। অথচ পরিবার অথবা নিকটাত্মীয় ছাড়া এমন তথ্য দেবে কে? এ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে এ রকমের তথ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বঙ্গদেশে অথবা ভারতবর্ষে বেল কি এমন তথ্য খুঁজে পেতেন? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার ঘটনা সে সময়কার একটা বড়ো রহস্য। আর ঠাকুর পরিবারও ছিলো কলকাতার সবচেয়ে বিখ্যাত এবং বিদগ্ধ পরিবার। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ঘটনার নেপথ্য কাহিনী জনগণের কাছে আজও প্রায় অজ্ঞাত।[১২] মানকুমারী বসু অথবা অন্যান্য আত্মীয়ের কাছ থেকে যোগীন্দ্রনাথ যেসব তথ্য পেয়েছিলেন, নিরপেক্ষ কোনো সূত্র থেকে তিনি সেসব মিলিয়ে নেননি। সত্যি বলতে কি, তেমন কোনো সূত্র হয়তো ছিলোও না। বালক অথবা কিশোর মধুকে দেখেছিলেন, এমন কারো পক্ষে ১৮৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত বেঁচে থাকা খুব স্বাভাবিকও নয়।

যোগীন্দ্রনাথের সিকি-শতাব্দী পরে নগেন্দ্রনাথ সোম যখন তথ্য জোগাড় করতে চেষ্টা করেন, ততোদিনে তথ্যের সঙ্গে কিংবদন্তী আরও বেশি পরিমাণে মিশে গেছে। তবু এই দুজনের সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমানে মাইকেলের পারিবারিক ইতিহাস লিখতে হবে। সে জন্যে, এর গুরুত্ব সত্ত্বেও, এই ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ না হবারই সম্ভাবনা।

*

মধুসূদনের প্রপিতামহ রামকিশোর দত্ত বাসিন্দা ছিলেন সেকালের যশোর জেলার, একালের খুলনার। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর তিন ছেলে – রামনিধি, দয়ারাম এবং মানিকরাম এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন মাতামহের গ্রাম – যশোরের সাগরদাঁড়িতে। তাঁরা সেখানে কেন ঘর বাঁধলেন, আমাদের জানা নেই। পিতৃহীন বালকদের দারিদ্র্যই সম্ভবত এর কারণ। তবে সাগরদাঁড়িতে

এসেও রামনিধি তাঁর অবস্থা ভালো করতে পারেননি। তাঁর কুলগত বৃত্তি কী ছিলো, তাও অজ্ঞাত। কিন্তু কায়স্থদের ঐতিহ্য রক্ষা করে তিনি তাঁর সন্তানদের খানিকটা লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করেন। বড়ো ছেলে – রাধামোহনকে তিনি সেকালের আইন-আদালতের ভাষা – ফারসি শিখিয়েছিলেন। শিক্ষা লাভ করে রাধামোহন অবশ্য গ্রামের বাড়িতেই, আপাতদৃষ্টিতে আলসেমি করে, কালক্ষেপ করছিলেন। তারপর একদিন পিতার ভর্ৎসনায় রাগ করে জীবিকার অন্বেষণে চলে যান যশোরে। সেখানে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর ভাগ্য খুলে যায়। ফারসি ভাষায় তাঁর জ্ঞানের জন্যে তিনি আদালতে চাকরি পান এবং ধীরে ধীরে সেরেস্তাদার পদে উন্নীত হন।

রাধামোহনকে দিয়েই বস্তুত দত্ত পরিবার সৌভাগ্যের সূচনা। তাঁর ছোটো তিন ভাইকে তিনি যশোরে নিয়ে আসেন এবং সেখানে তাঁদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। এই তিন ভাইও তাঁর মতো ভালো করে ফারসি শেখেন এবং তার দৌলতেই টাকাপয়সার মুখ দেখেন। মেজভাই মদনমোহন প্রথমে যশোরের মীর-মুন্সী হন। পরে উন্নতি করে হয়েছিলেন কুমারখালির মুন্সেফ। সেজভাই দেবীপ্রসাদ লেখাপড়ায় আরও এগিয়ে গিয়ে যশোরে উকিল হন। আর চার ভাই-এর মধ্যে সবচেয়ে ছোটো – কবির পিতা – রাজনারায়ণ লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন। তিনি ফারসি খুব ভালো শিখেছিলেন। ফারসি ভাষায় তাঁর এই পারদর্শিতার জন্যে তাঁকে নাকি সবাই বলতো মুন্সী রাজনারায়ণ।[১৩] তাঁর এই মুন্সী পদবী কতোটা সুপরিচিত অথবা এর গুরুত্ব কতোটা ছিলো, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কারণ, এ পদবী যদি কেবল তাঁর বন্ধু অথবা পরিচিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে থাকে, তা হলে এ দিয়ে ফারসি-জানা লোক ছাড়া তেমন কিছু বোঝায় না। তদুপরি, কলকাতায় তখন মুন্সী রাজনারায়ণ নামে আর-একজন লোক ছিলেন। তিনি ১৮৩০ সালের শেষ দিকে *অবোধ বৈদ্যবোধোদয়* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং *সমাচার চন্দ্রিকায়* তার সমীক্ষা প্রকাশিত হয়।[১৪] মাইকেলের জীবনী-লেখকরা পরে এই মুন্সী রাজনারায়ণের সঙ্গে রাজনারায়ণ দত্তকে এক করে ফেলেছিলেন কিনা, জানার উপায় নেই। শোনা যায়, নিজের বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে তাঁর নিজেরও বেশ অহংকার ছিলো। ছোটো ভাই হিশেবে সবার আদর পেয়ে তিনি খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল হয়েছিলেন বলেও জানা যায়। পরে দেখা যাবে, তাঁর পুত্র তাঁর কাছ থেকে এই দুটো গুণই উত্তরাধিকার সূত্রে যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছিলেন।

উকিল হয়ে দেবীপ্রসাদের তুলনায় রাজনারায়ণ আরও এক ধাপ সামনে এগিয়ে যান। যশোরে কাজ না-করে তিনি যান কলকাতায়। সেকালে নিজের গ্রাম অথবা এলাকা ছেড়ে কেউ সাধারণত দূরে কোথাও যেতেন না। অন্য কোথাও গিয়ে ভাগ্য ফেরানোর জন্যে যে-উদ্যোগ এবং সাহস দরকার, তা কম লোকেরই ছিলো। গ্রাম ছেড়ে জিলা সদরে এসে রাধামোহন নিজের এবং পরিবারের উন্নতির পথ অবারিত করেছিলেন। অপর পক্ষে, রাজনারায়ণ যেহেতু যশোরেই তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন, সে কারণে তিনি আর-একটু সাহস এবং উদ্যোগ নিয়ে কলকাতার পথে পা বাড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন। কথিত আছে, তিনিও নাকি বড়ো ভাই-এর মতো পরিবারের ওপর রাগ করে অজানা এবং অনিশ্চিত কলকাতার দিকে যাত্রা করেছিলেন। তাঁর কলকাতায় আসার অব্যবহিত কারণ যাই হোক না কেন, তিনি উদ্যোগী, উদ্যমী এবং কৌতূহলী পুরুষ ছিলেন নিঃসন্দেহে। অপরিচিত জায়গায় গিয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার মতো দুঃসাহসও তাঁর ছিলো। মাইকেলের চরিত্রেও এই বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করবো।

দত্ত পরিবারের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এক কথায় বলতে পারি – এক পুরুষের মধ্যে এই পরিবার বিদ্যা এবং উদ্যোগকে মূলধন হিশেবে ব্যবহার করে সেকালের তুলনায় প্রচুর বিত্ত উপার্জন করেছিলো। এবং সেই বিত্ত দিয়ে জমিদারি কিনে দ্রুত আবার "বাবু"তে পরিণত হয়েছিলো। জমিদার না-হওয়া

পর্যন্ত সে যুগে সমাজের চোখে সত্যিকার মর্যাদা লাভ করা সহজ হতো না। তা ছাড়া, জমানো টাকা জমিতে খাটানো তখন সবচেয়ে বিচক্ষণ এবং নিরাপদ কাজ বলে গণ্য হতো। রাতারাতি ধনী হয়ে এ পরিবার একদিকে জাঁকজমকপূর্ণ বাড়িঘর, পূজা-মণ্ডপ ইত্যাদি তৈরি করেছিলো। অন্য দিকে চালু করেছিলো আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা-পার্বণ উদৎযাপন করার রীতি। মোট কথা, সাধারণ মানুষের চোখে বড়োলোক বলে পরিচিত হবার মতো চিরকেলে ক্রিয়াকলাপ এঁরা বেশ ঘটা করেই পালন করতেন। এই পরিবারের জাঁকজমক এবং অমিতব্যয়ের দৃষ্টান্ত হিশেবে যোগীন্দ্রনাথ যে-ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সত্য হলে, তাকে খুব জুতসই বলে বিবেচনা করতে হবে। রাধামোহন তাঁর পুত্রের কল্যাণের উদ্দেশ্যে একবার ১০৮টি কালী পুজো করেন এবং তাতে ১০৮টি মোষ, ১০৮টি ছাগল এবং ১০৮টি ভেড়া বলি দেওয়া হয়। আর অঞ্জলি দেওয়া হয় ১০৮টি সোনার তৈরি জবা ফুল।[১৫] এই পুজোয় অন্য আনুষঙ্গিক যেসব ব্যয় হয়েছিলো, তাও এই প্রসঙ্গে অনুমান করা যেতে পারে। রাজনারায়ণ দত্তের পিতা গরিব ছিলেন। নব্য ধনী এবং নব্য জমিদার হয়ে রাজনারায়ণ এবং তাঁর ভাই-এরা আর কী কী গুণের অধিকারী হয়েছিলেন, জানা নেই, কিন্তু রাজনারায়ণসহ সে পরিবারের সব সদস্যের চরিত্রে বেহিশেবি ব্যয়ের মধ্য দিয়ে অন্যদের চমক লাগানোর একটা মনোভাব অভ্রান্তভাবে তৈরি হয়েছিলো। মধুও তাঁর চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য পুরো মাত্রায় লাভ করেছিলেন। সে জন্যে এক মোহর দিয়ে চুল ছাঁটিয়ে তিনি নিজে যতো না খুশি হতেন, তার চেয়ে অন্যদের বিস্মিত করতেন বেশি।

প্রসঙ্গত, রাজনারায়ণের আয় কেমন ছিলো, সে বিষয়ে একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র মামলা করে যে-সম্পত্তি উদ্ধার করেন, তা থেকে তাঁর মোট বিষয়-আশয় এবং আয় সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব। মাইকেল পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করেছিলেন সাত হাজার টাকায়। ১৮৩০-এর দশকের একেবারে গোড়ার দিকে রাজনারায়ণ এ বাড়ি নিশ্চয় এর চেয়ে বেশি দামে কেনেননি। এ ছাড়া, সুন্দরবন অঞ্চলের জমিদারি কবি বিক্রি করেছিলেন ২০ হাজার টাকায়। মায়ের অলংকার তিনি পুরো উদ্ধার করতে পারেননি। তবে এই বাবদে মোট ১৩০০ টাকা ডিকরি পেয়েছিলেন। তার অর্থ সব মিলে কমবেশি ৩০/৩৫ হাজার টাকার সম্পত্তি রেখে রাজনারায়ণ মারা গিয়েছিলেন। শেষ দিকে তাঁর আয় ছিলো না। মনে হয়, সবচেয়ে ভালো সময়ে তাঁর সম্পত্তির দাম ছিলো মোটামুটি ৪০ হাজার। সেকালের কলকাতায় এর চেয়ে শতগুণে ধনী ছিলেন অনেকে। রাজনারায়ণ তাঁর বাড়ি কেনার মাত্র কয়েক বছর আগে কলকাতার এক বাবু নিকি নামে একটি বাইজি কিনেছিলেন এক লাখ টাকা দিয়ে। তা ছাড়া, তাকে মাসে তিনি বেতন দিতেন এক হাজার টাকা।[১৬] রামদুলাল দে মায়ের শ্রাদ্ধে ব্যয় করেছিলেন এক লাখ টাকা।[১৭] মোট কথা, কলকাতায় লাখপতির অভাব ছিলো না। রাজনারায়ণ দত্তের সমসাময়িক উকিল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আয় তাঁর চেয়ে কতো বেশি ছিলো এই প্রসঙ্গে তাও মনে করা যেতে পারে। তাঁর উইল থেকে দেখা যায় তাঁর বার্ষিক আয় ছিলো অন্তত আড়াই লাখ টাকা। এবং তিনি তাতে বলেছেন যে, তাঁর এই আয় আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিলা।[১৮]

রাজনারায়ণ কতো বড়ো উকিল ছিলেন, সে বিষয়ে যে-জনশ্রুতি চালু আছে, তাও বাস্তবের তুলনায় অনেকটা অতিরঞ্জিত। আসলে, তাঁর পুত্র যেহেতু অমন বিখ্যাত হয়েছিলেন, সে জন্যে তাঁর পরিচয়কেও বাড়িয়ে দেওয়ার একটা মানসিকতা জীবনী-লেখক এবং কবির ভক্তদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি তথ্য থেকে আমাদের বক্তব্য বোঝা যাবে। উনিশ শতকের ঐতিহাসিক গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, রাজনারায়ণ ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলদের সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় পঠিত ইংরেজিতে লেখা একটি প্রবন্ধও তিনি উদ্ধৃত করেছেন।[১৯] কিন্তু রাজনারায়ণ আদৌ ইংরেজি জানতেন না। গৌতম চট্টোপাধ্যায় যে-রাজনারায়ণ দত্তের প্রবন্ধ উদ্ধার করেছেন, তা হিন্দু কলেজে পড়া অন্য-একজন রাজরানায়ণের। ১৮৩৪ সালের ৭ মার্চ তারিখে কলকাতার টাউন হলে

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় যাঁরা আবৃত্তিতে অংশ নেন, তাঁদের মধ্যে এই রাজনারায়ণ দত্তও ছিলেন।[২০] বলা বাহুল্য তিনি মধুসূদন দত্তের পিতা রাজনারায়ণ নন। গৌতম চট্টোপাধ্যায় আসলে হিন্দু কলেজে পড়া এই রাজনারায়ণের নাম উল্লেখ করেছেন। ইনি জ্ঞানোপার্জিকা সভার সদস্য ছিলেন। যে-সভায় তিনি আবৃত্তিতে অংশ নিয়েছিলেন, সেখানে আর-একজন আবৃত্তিকার হাজির ছিলেন, তাঁর নাম মধুসূদন দত্ত। তিনিও মাইকেল মধুসূদন নন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে মাইকেল বলে বিবেচনা করেছিলেন।[২১] মাইকেলের কোনো কোনো জীবনীকার বলেছেন যে, রাজনারায়ণ উকিল হিশেবে প্রসন্নকুমার ঠাকুর অথবা রমাপ্রসাদ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।[২২] কিন্তু কলকাতার শিক্ষিত সমাজে উকিল হিশেবে প্রসন্নকুমার অথবা রমাপ্রসাদের যে-প্রতিষ্ঠা ছিলো, রাজনারায়ণের তার এক অংশও ছিলো বলে সমসাময়িক পত্রপত্রিকা অথবা অন্য কোনো সূত্র থেকে জানা যায় না। বরং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *সংবাদ প্রভাকর* থেকে যে-তথ্য উদ্ধার করেছেন, তা উল্টোটাই প্রমাণ করে। ১৮৪৮ সালের ১২ই এপ্রিলের সংখ্যায় বলা হয়েছে:

> পৌষ [১২৫৪]: – সদর আদালতের জজেরা খাস আপীলঘটিত মোকদ্দমায় উকিল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম সবদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন। পরন্তু রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি কএকজনকে অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত করিলেন।[২৩]

রাজনারায়ণ এই ঘটনার আগে আদালতের কোনো বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিনা, জানা যাচ্ছে না; তবে তাঁর সুনাম যে নষ্ট হয়েছিলো, এ খবর থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ঠাকুর পরিবার কলকাতার বিখ্যাত পরিবার। সেই পরিবারের সদস্য হিশেবে সমাজে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের, অথবা রামমোহন রায়ের সন্তান হিশেবে রমাপ্রসাদের বাড়তি প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম ছিলো – এটা জানা কথা। এ রকম অভিজাত ব্যক্তি কলকাতার সমাজে কম ছিলেন না। অপর পক্ষে, রাজনারায়ণ এসেছিলেন যশোরের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম থেকে এবং তিনি ছিলেন এক পুরুষের শিক্ষিত ও ধনী। তাঁর এই পটভূমি তাঁকে আরও বেকায়দায় ফেলেছিলো। তদুপরি, বৈদগ্ধ্য, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক প্রতিপত্তির দিক দিয়েও এঁদের সঙ্গে রাজনারায়ণের যোজন যোজন তফাত ছিলো। সেকালের বঙ্গদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা নিয়ে যখন আলোচনা হতো অথবা যখন সমাজ সংস্কারের আন্দোলন হতো, তাতে রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, সত্যচরণ ঘোষাল, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, তারাচরণ চক্রবর্তী এবং রামগোপাল ঘোষের মতো লোকের ডাক পড়তো, রাজনারায়ণ সে ক্ষেত্রে থাকতেন অনেক পিছিয়ে। কলকাতার সমাজে কারা পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, সে সম্পর্কে আর-একটা ধারণা করা যায় কলকাতার জুরিদের তালিকা থেকে। গ্র্যান্ড এবং পেটি জুরিদের সংখ্যা ছিলো দু হাজারেও বেশি। এই তালিকায় কলকাতার জানা-অজানা বহু লোকের নাম আছে। হিন্দু কলেজে মধুর যাঁরা শিক্ষক ছিলেন, আদালতের উকিল (প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইত্যাদি), জমিদার, গণ্যমান্য অন্যান্য লোক – অনেকের নামই সেখানে আছে, এমন কি, ১৮৪৭ সাল নাগাদ তাতে গৌরদাস বসাক-সহ মধুসূদনের কোনো কোনো সহপাঠীর নামও অন্তর্ভুক্ত হয়, তিনি রাজনারায়ণের নাম কখনো আসেনি।[২৪] আমরা এ দিয়ে রাজনারায়ণকে ছোটো করতে চাইছিনে, বরং এটাই বোঝাতে চাই যে, মধুসূদন যা হয়েছিলেন, নিজের প্রতিভা বলেই হয়েছিলেন এবং একজন বিখ্যাত লোকের পিতাকেও বিখ্যাত হতে হবে – এমন কোনো কথা নেই।

রাজনারায়ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন এবং কারও মধ্যে সংগীত অথবা অন্য কোনো শিল্পগুণ দেখতে পেলে তার স্বীকৃতি দিতেন। সুনির্দিষ্ট করে এও বলা হয়েছে যে, আগমনী এবং বিজয়ার গান অথবা সখীসংবাদ শুনে তিনি মুগ্ধ হতেন এবং গায়কদের দান করতেন

দরাজ হাতে। পিতার কাছ থেকে মধু এই গুণটি পুরোপুরি পেয়েছিলেন। মধুর মধ্যেও এই রকমের সৌন্দর্যপ্রিয়তা এবং বদান্যতা লক্ষ্য করি। রাজনারায়ণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং অসংযমী ছিলেন এমন কথাও জীবনী-লেখকরা উল্লেখ করেছেন।[২৫] কিন্তু কী অর্থে তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং অসংযমী ছিলেন, সে কথা বলা হয়নি। তবে ইঙ্গিতটা সম্ভবত যৌনতা এবং নৈতিকতার প্রতি। তখনকার বঙ্গদেশে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এই অসংযম কোনো অসাধারণ বিষয় নয়। বিশেষ করে কলকাতা, কৃষ্ণনগর, যশোর ইত্যাদি শহরের এ বিষয়ে নাম ছিলো।

> সে সময়ের যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে, আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে — "ইনি ইঁহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন," বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল।[২৬]

এই যশোরেই ওকালতি আরম্ভ করেন রাজনারায়ণ। সুতরাং তাঁর পেশাদার বন্ধুদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি যদি রক্ষিতা রেখে থাকেন, তা হলে অবাক হবার কারণ নেই। কিন্তু এই সুস্বীকৃত প্রথা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং অসংযমী বলে নিন্দা করা হয়, সেটাই বরং বিস্ময়ের কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে। তা হলে এ ব্যাপারে তিনি কি অন্য পাঁচজনকে টেক্কা মেরে অনেকটা দূরে এগিয়ে গিয়েছিলেন? কোনো রোগের কারণেই কি ১৮২৭/২৮ সালের পর নিতান্ত যুবা বয়সে তাঁর ঔরসে আর কোনো সন্তান জন্মেনি? আজ তথ্যের অভাবে এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যে রীতিমতো ভোগী ছিলেন, তাঁর জীবনযাত্রার যে-সামান্য আভাস পাওয়া যায়, তা থেকে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই দিকটা বেশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর পুত্রের চরিত্রেও। মধুসূদনের কবি হবার এবং যশ লাভের আকাঙ্ক্ষার কথা যেমন সবার জানা আছে, তেমনি জানা আছে তার বস্তুগত ভোগের বাসনার কথা।

রাজনারায়ণের কখন জন্ম হয় সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু অনুমান করি, ১৮০০ সালের আগে নয়। সেকালের রীতি অনুযায়ী তাঁর বয়স বছর বিশেক হবার আগেই তাঁকে নিশ্চয় বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছিলো। আর তাঁর প্রথম সন্তান মধুর জন্ম ১৮২৪ সালের ২৫ জানুআরি। (এই তারিখ অবশ্য আনুমানিক, যদিও বিয়ের সময়ে অথবা বিশপস কলেজে ভর্তির সময়ে কবি যে-বয়স লিখিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এর হুবহু মিল না-থাকলেও, সঙ্গতি আছে।[২৭]) এই হিশেবে রাজনারায়ণের স্ত্রী জাহ্নবী দেবীর জন্ম ১৮০৭/৮ সালের আগে হয়েছিলো বলে মনে হয় না। জাহ্নবী দেবীর পিতা ছিলেন যশোরের আর-একটি গ্রাম — কাটিপাড়ার জমিদার। মামা-বাড়ির সঙ্গে মধুর কোনো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো অথবা তাঁদের কোনো প্রভাব তাঁর চরিত্রে বিশেষভাবে পড়েছিলো — এমন কথা জীবনী-লেখকরা উল্লেখ করেননি। কিন্তু মধু তাঁর মায়ের চরিত্রের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবেই পেয়েছিলেন।

বাঙালি সব মা-ই স্নেহপ্রবণ; তবে জাহ্নবী দেবী বোধ হয় একটু বেশি মাত্রায় এই গুণটার অধিকারী ছিলেন। শুধু নিজের সন্তানদের নয়, অন্যদেরও তিনি সহজে আপন করে নিতে পারতেন। কলকাতায় তিনি পড়শি হিশেবে পেয়েছিলেন বর্ধমানের একটি পরিবারকে। এই পরিবারের কর্তার নাম রামকমল মুখোপাধ্যায়। এঁর কোনো পুত্র সন্তান ছিলো না। কিন্তু তিনটি ভাগ্নে তাঁর সেই অভাব ভালো মতো পূরণ করেছিলেন। এই তিন ভাগ্নের মধ্যে একজন ছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় — পরে যিনি কবি হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বড়ো ভাই গণেশচন্দ্রও একাধিক কাব্য প্রকাশ করেছিলেন। এই তিন ভাগ্নেই মধুর মাকে মা বলে ডাকতেন। সেকালে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের মধ্যে পার্থক্য ছিলো প্রায়

দুস্তর, এমন কি, ঘটি এবং বাঙালের মধ্যেও ব্যবধান কম ছিলো না। ভাষার পার্থক্যটা লক্ষ্য করা যেতো সবার আগে। তারপর পারিবারিক পর্যায়ে মিশতে গেলে আচার-আচরণ এবং রান্নাবান্নাতেও স্বাতন্ত্র্য দেখা দিতো। তা সত্ত্বেও, সেই যুগে তিনটি কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান একজন কায়স্থ রমণীকে মা ডাকতেন — এটা সেই মহিলার অন্যকে আপন করার অসাধারণ ক্ষমতা প্রমাণ করে। মধুও মায়ের কাছ থেকে প্রচুর আন্তরিকতা লাভ করেছিলেন। তিনি সবার সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন না। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে মিশতেন, তাঁদের জন্যে যে-কোনো রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে তৈরি থাকতেন।

জাহ্নবী দেবীর ছিলো আর-একটি অসাধারণ গুণ। সে যুগে স্ত্রীশিক্ষাকে বৈধব্যের প্রতীক বলে মনে করা হতো। এমন কি, মহিলারা নিজেরাও তাকে মনে করতেন মহা-অনিষ্টের আকর হিশেবে।[২৮] তা সত্ত্বেও, তিনি সেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মধুকে তিনি *রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী* এবং *অন্নদামঙ্গল* পড়ে শোনাতেন বলে কবির জীবনী-লেখকরা উল্লেখ করেছেন।[২৯] এর মধ্যে অবশ্য অতিরঞ্জন থাকা সম্ভব। কিন্তু, তা সত্ত্বেও বোঝা যায়, তিনি লেখাপড়া জানতেন এবং পুত্রকে ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় সাহায্য করেছেন; আর সেই সঙ্গে তাঁকে উৎসাহিত করেছেন *রামায়ণ, মহাভারত* ইত্যাদি পড়তে। তাঁর ভালো স্মরণশক্তি ছিলো এবং তিনি এসব কাব্য থেকে অনেকটা মুখস্থ বলতে পারতেন। মায়ের এই আবৃত্তি করার ক্ষমতা পুত্রের মনে কবিতার প্রথম স্বাদ দিয়েছিলো। মধু বালক বয়স থেকে কেবল কবিতা পড়তে ভালোবাসতেন না, তিনি কবিতা মুখস্থ করে ফেলতেন। পরিণত বয়সে তিনি যখন দাবি করতেন যে, তিনি বাংলা ভুলে গেছেন, তখনো স্বদেশ এবং বিদেশ থেকে চিঠি লেখার সময়ে পুরোনো বাংলা কবিতার পঙক্তি উদ্ধৃত করতেন। এ থেকে বোঝা যায়, ছোটোবেলায় শোনা কবিতা তাঁর মনের কতো গভীরে শিকড় গেড়েছিলো।

মধুর জন্মের চার বছরের মধ্যে জাহ্নবী দেবীর আরও দুটি ছেলে হয়েছিলো — প্রসন্নকুমার এবং মহেন্দ্রনারায়ণ। প্রসন্নকুমার মারা যায় দেড় বছর বয়সে। আর মহেন্দ্রনারায়ণ পাঁচ বছরের সময়ে। এ ছাড়া, জাহ্নবী দেবীর আর কোনো সন্তান হয়নি। একমাত্র জীবিত সন্তান হিশেবে মধু মানুষ হন আলালের ঘরের দুলালের মতো। তা ছাড়া, চার ভাই-এর মধ্যে সবচেয়ে ছোটো এবং সবচেয়ে শিক্ষিত ভাই-এর একমাত্র পুত্র হিশেবেও বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে তিনি একটু বেশি যত্ন এবং প্রশ্রয় পেয়েছিলেন। পরে কবির চরিত্রে বেহিশেবী ব্যয়, জেদ, নিজের খুশি মতো চলা, অন্যদের তুলনায় নিজেকে বড়ো মনে করা ইত্যাদি যেসব মনোভাব দেখতে পাই, তার অনেকটা তিনি পরিবারের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত আদর এবং আশকারা লাভের ফলে আয়ত্ত করেছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে।

মধু যেমন তাঁর বাবা-মার অন্তহীন ভালোবাসা পেয়েছিলেন, তেমনি তিনিও তাঁর বাবা-মাকে খুব ভালোবাসতেন বলে বোঝা যায়। ছেলেবেলায় বাবাকে নিয়ে মধুর গর্বের সীমা ছিলো না। তাঁর বিখ্যাত উক্তি — রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে টাকা গুণে খরচ করে না — কেবল তাঁর নিজের অহমিকা প্রকাশ করে না; এর মধ্য দিয়ে পিতাকে নিয়ে গর্ব করার মনোভাবও স্পষ্ট। অবশ্য বাবা-মা তাঁকে যে তাঁদের ডানার নিচে আটকে রাখতে চেয়েছিলেন, যৌবনে পৌঁছে মধু তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে রীতিমতো প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁর রুচি এবং লক্ষ্যের সঙ্গে বাবা-মার প্রত্যাশার মিলন হয়নি। সে কারণে তাঁকে সেই অল্প বয়সেই স্বশাসনের জন্যে বিদ্রোহ করতে হয়েছে। আমার ধারণা, এ ক্ষেত্রে মায়ের সঙ্গে নয়, বাবার সঙ্গেই তাঁর ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ বেশি করে দেখা দেয়। পিতা এটা বুঝতে চাইছিলেন না যে, মধু বড়ো হচ্ছেন এবং তাঁর মধ্যে একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটছে। আমরা পরে দেখতে পাবো, এ রকম একটা পর্যায়ে মধু খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে পরিবারের বাঁধন স্থায়ীভাবে কেটে ফেলেছিলেন। একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হঠাৎ তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন, ঠিকই; কিন্তু

বাবা-মার বিরুদ্ধে তাঁর অসন্তোষ এবং তাঁদের শাসন থেকে বেরিয়ে আসার বাসনা তাঁর মধ্যে দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছিলো অনেক আগে থেকেই।

রাজনারায়ণ ঠিক কখন কলকাতায় এসে ওকালতি শুরু করেন, জীবনীকারদের রচনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। সবচেয়ে পুরোনো জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথের মতে রাজনারায়ণ কলকাতায় আসেন মধু যখন সাত বছরের — অর্থাৎ ১৮৩১ সালে।[৩০] আর সবচেয়ে সাম্প্রতিক জীবনীকার সুরেশচন্দ্র মৈত্রের মতে মধুর বয়স যখন পাঁচ-ছ বছর — অর্থাৎ ১৮২৯-৩০ সালে[৩১] (এ মতের সপক্ষে তিনি অবশ্য কোনো তথ্য দিতে পারেননি)। কিন্তু কলকাতায় ওকালতি করলেও, সেকালের রীতি এবং লোকাচার অনুযায়ী[৩২] রাজনারায়ণ তাঁর স্ত্রী এবং দু সন্তানকে রেখে আসেন গ্রামের বাড়ি — সাগরদাঁড়িতে। উকিল হিশেবে তিনি প্রথম থেকে বেশ পসার লাভ করেছিলেন। কিছুকাল ওকালতি করার পরে তিনি খিদিরপুরে একটি বাড়ি কেনেন। খিদিরপুর তখন ছিলো নিতান্তই শহরতলী। খুব সম্ভব পাকা রাস্তা হয়নি। সেখানে বাড়ির দাম তুলনামূলকভাবে অনেক কমই হওয়ার কথা। তবু এ থেকে ওকালতিতে তাঁর মোটামুটি ভালো আয়ের আভাস পাওয়া যায়।

নিজে কলকাতায় আসার কতোদিন পরে তিনি তাঁর পরিবার কলকাতায় নিয়ে আসেন, তা সুনির্দিষ্ট করে জানা যায় না। তবে পরিবার কলকাতায় নিয়ে আসার ঘটনাটাকে জীবনী-লেখকরা যতোটা এগিয়ে এনেছেন, তা সঠিক না-ও হতে পারে। নিশ্চিতভাবে যা জানা যাচ্ছে তা হলো: মধু কলকাতায় আসেন তাঁর ছোটো ভাই মহেন্দ্রনারায়ণ মারা যাবার পরে। যোগীন্দ্রনাথের বর্ণনা অনুযায়ী মহেন্দ্রনারায়ণ মধুর চেয়ে চার বছরের ছোটো এবং তার মৃত্যু হয় তার বয়স যখন পাঁচ বছর।[৩৩] এ হিশেব ঠিক হলে, জাহ্নবী দেবী তাঁর পুত্রকে নিয়ে ১৮৩৩-৩৪ সালের আগে কলকাতায় আসেননি। এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দাকার যে, কলকাতায় আসার আগেই মধু সাগরদাঁড়িতে ফারসি শিখেছিলেন। একান্নবর্তিতা কাটিয়ে সেকালে নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে যাওয়া কারো পক্ষে সহজ ছিলো না। হয়তো রাজনারায়ণও আরও অনেক দিন তাঁর পরিবার কলকাতায় আনতে সমর্থ হতেন না। কিন্তু পর পর তাঁর দুটি সন্তান অকালে মারা যায় এবং কলকাতায় তিনি বড়ো বাড়ি কেনেন — এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখিয়ে একান্নবর্তী পরিবারের গণ্ডী থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। মধু বড়ো হচ্ছেন এবং তাঁকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, এ যুক্তিও সম্ভবত রাজনারায়ণকে এ ব্যাপারে ওকালতি করতে সহায়তা করে থাকবে।

কলকাতায় আসার আগে পর্যন্ত মধু লেখাপড়া শিখেছিলেন গ্রামের পাঠশালায়। তা ছাড়া, বাড়িতে মা এবং অন্যান্য আত্মীয়ের কাছ থেকেও তিনি সাহায্য এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি সে সময়ে লেখাপড়ায় খুব উৎসাহী এবং মনোযোগী ছিলেন — যোগীন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথ উভয়ই তা বলেছেন।[৩৪] তখন থেকে কবিতা পড়া এবং মুখস্থ করায় তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করা যেতো। আট-দশ বছর বয়স থেকে তিনি তাঁর মা এবং বাড়ির অন্য মহিলাদের এসব কাব্য থেকে পড়ে শোনাতেন। এভাবে বিশেষ করে *রামায়ণ* আর *মহাভারতে*র দিকে এবং সাধারণভাবে কাব্যের দিকে তাঁর যে-আন্তরিক আকর্ষণ তৈরি হয়, সারাজীবনের শত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও তা ম্লান হয়নি। বঙ্গদেশ থেকে অনেক দূরে মাদ্রাসে অথবা আরও দূরে ভার্সাইতে তিনি যখন নির্বাসিত, তখনো তাঁর মানসপট থেকে *রামায়ণ-মহাভারতে*র নস্টালজিক স্মৃতি মুছে যায়নি।

তাঁর পিতা এবং জেঠারা ফারসি ভাষা-জ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে ভালো করেই সচেতন হয়েছিলেন। সে জন্যেই, তাঁদের গ্রামে ফারসি শেখার ব্যবস্থা না-থাকলেও মধুকে ফারসি শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় তাঁর আট-ন বছর বয়সে। এর জন্যে আদরের সন্তানকে কষ্ট করে মাইলখানেক

হেঁটে অন্য গ্রামে যেতে হতো। ফারসি তিনি খুব বেশি শিখেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর ফারসির শিক্ষক তাঁকে ফারসি শ্লোক মুখস্থ করিয়েছিলেন। তাঁকে তিনি সেই বয়সে গজল গাইতেও শিখিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে বন্ধুদের তিনি নাকি মাঝেমধ্যে গজল গেয়ে শোনাতেন।৩৮ অবশ্য তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো দিন গান শিখেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু গানের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক ভালোবাসা ছিলো। এই প্রীতি তিনি অনেকাংশে পেয়েছিলেন পরিবার এবং বাল্য পরিবেশ থেকে। ছেলেবেলায় ফারসি পড়ার মধ্য দিয়ে তিনি যে-ফারসিপ্রীতি অর্জন করেন, সেই প্রীতি এবং সেই সঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা দীর্ঘ কাল বজায় ছিলো। পরে দেখতে পাবো, তাঁর রচনায় নগণ্য হলেও ফারসি অধ্যয়নের প্রভাব পড়েছিলো। তা ছাড়া, তিনি যে বারবার মুসলমানী বিষয় নিয়ে লেখার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন, এ-ও আংশিকভাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত ফারসি অধ্যয়নের ফল হতে পারে। এই প্রীতিবশত মাদ্রাস থেকে তিনি ফারসি কবি শেখ সাদীর বই চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করার পরেও, মধু নিশ্চয় অনেক বার সাগরদাঁড়িতে বেড়াতে গেছেন, বিশেষ করে পুজোর সময়ে। কিন্তু তবু সেই বয়স থেকেই সাগরদাঁড়ির সঙ্গে তাঁর বন্ধন আপাতদৃষ্টিতে আলগা হয়েছিলো। আর নিজের পরিবারের সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটেছিলো এক দশকের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মন থেকে তিনি তাঁর শিকড়ের টান সারা জীবন কাটাতে পারেননি। তাঁর সাহিত্য এবং তাঁর জীবনের নানা ঘটনা বিশ্লেষণ করলে নিজের উৎসের প্রতি তাঁর এই দরদ কতো আন্তরিক এবং জোরালো ছিলো, নির্ভুলভাবে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাবো, সাগরদাঁড়ি থেকে চলে যাবার তিরিশ বছরেরও পরে এবং ছ হাজার মাইল দূরে বসেও তিনি তাঁর শৈশবের গ্রামের প্রতি নাড়ীর টান অনুভব করেছেন।

বাল্য এবং কৈশোরে তাঁর মনে বিশেষ করে যা গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলো, তা হলো: গ্রাম বাংলার নিসর্গ। তাঁর এই নিসর্গপ্রীতি কতো অন্তরঙ্গ এবং দীর্ঘস্থায়ী সেটা বোঝা যায় তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে। মাদ্রাসে তিনি যখন *The Captive Ladie*-সহ তাঁর ইংরেজি রচনাগুলো প্রকাশ করেন, তখন জন্মস্থান এবং স্বজনদের কাছ থেকে তিনি ছিলেন অনেক দূরে। তা সত্ত্বেও, তাঁর শৈশবে দেখা নিসর্গ তাঁর রচনায় বার বার ছায়া ফেলেছে। ভার্সাইতে তিনি যখন তাঁর সনেটগুলো রচনা করেন, তখনও সেসব সনেটে তাঁর সাগরদাঁড়ির স্মৃতি একেবারে জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। কলকাতায় তিনি যখন বীররস পরিবেশনে ব্যস্ত এবং তাঁর কল্পনাকে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত করছিলেন, তখনো কোথাও কোথাও প্রায় ধান ভানতে শিবের গীতের মতো তাঁর রচনায় মধ্য-বাংলার সবুজ গাছপালা, নদীনালা, অবারিত প্রান্তর ফিরে ফিরে দেখা দিয়েছে। *তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্যে যেমন স্বর্গের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আসলে তাঁর শৈশবে দেখা নিসর্গের বর্ণনা দিয়েছেন:৩৯

> শাল্মলী, শাল, তাল, অভ্রভেদী
> চূড়াধর; নারিকেল যার স্তনচয়
> মাতৃদুগ্ধ-সম রসে তোষে তৃষাতুরে!
> গুবাক; চালিতা; জাম সুম্রমরূপী
> ফল যার; উর্দ্ধশির তেঁতুল; কাঁঠাল,
> যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
> ধনদের গৃহে যেন।

গুবাক, চালিতা, জাম, তেঁতুল, কাঁঠাল-ঘেরা নিসর্গ দেখে সহজেই চেনা যায় যে, এই স্বর্গ সাগরদাঁড়ি তথা মধ্য-বঙ্গ থেকে খুব বেশি দূরে অবস্থিত নয়। বস্তুত, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর মন নিয়ত সাঁতার

কেটেছে কপোতাক্ষের জলে। এই নদীর দুই তীরের সবুজ ছোটো গ্রামগুলো, তাদের কোথাও একটা ভাঙ্গা মন্দির, কোথাও একটা বিচ্ছিন্ন বট তাঁর মনে চিরস্থায়ী ছাপ এঁকে দিয়েছিলো।

১৮৪৩ সালের পরে তিনি গ্রামের সঙ্গে তাঁর এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলেন। তা ছাড়া, প্রথম বছর দশেক বাদ দিলে, তিনি গোটা জীবন বাসও করেছেন কোনো না কোনো নগরীতে — কলকাতা, মাদ্রাস, লন্ডন এবং ভার্সাইতে। অংশত সে কারণে, অংশত শৈশবে দেখা নিসর্গ তাঁর মনে স্থায়ীভাবে চিহ্ন এঁকে দেবার দরুন — তিনি যখন নিসর্গের কল্পনা করেছেন, তখন সাগরদাঁড়ি এসে তাঁর মনের পেছনে ভর করেছে, এমন কি, তাঁর অবচেতনায়। অবশ্য এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, বড়ো হবার পর নিসর্গের আরও দুটি উপাদানের প্রতি তাঁর অনুরাগ তৈরি হয়েছিলো। এ দুটি হলো: সাগর আর পর্বত। সাগরের প্রতি তাঁর প্রথম আকর্ষণ জন্মে — এই সাগরের ওপর দিয়ে তাঁকে তাঁর স্বপ্নের দেশ ইংল্যান্ডে যেতে হবে — এই কথা চিন্তা করে। তারপর অবশ্য মাদ্রাসে থাকার সময়েও তিনি একেবারে কাছ থেকে সাগরকে ভালোবাসার সুযোগ পেয়েছিলেন। স্পষ্ট বোঝা যায়, সাগর আর পর্বতকে তিনি ভালোবেসেছিলেন এদের বিশালত্বের জন্যে। সাগরতীরে বাস করলেও, তিনি অবশ্য কোনো বড়ো পর্বতের কাছে কখনো বাস করেননি। এমন কি, বড়ো কোনো পর্বত তিনি কোনো দিন দেখেছিলেন কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

কলকাতায়

মধুর যখন জন্ম হয় তার আগে থেকেই কলকাতার সমাজ এবং অর্থনৈতিক জীবনে দেখা দিয়েছিলো নানা ধরনের উত্থান-পতন। পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে রোজ সেখানে চলছিলো পুরাতনের বিদায়ের পালা আর তার জায়গায় নতুনের সংবর্ধনা। অর্থকরী ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে নতুন যুগের উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের প্রথম পাদেই হিন্দু কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিলো।[৩৬] বাংলা খবরের কাগজ আত্মপ্রকাশ করেছিলো ১৮১৮ সাল থেকে। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বই প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮২২ সালের গোড়ার দিকে।[৩৭] ধর্ম এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কেও নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন কেউ কেউ। রামমোহন রায় ফারসি ভাষায় একেশ্বরবাদ সম্পর্কে বই লিখেছিলেন এবং পরে আত্মীয় সভা স্থাপন করেছিলেন এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে। সতীদাহ প্রথা নিয়ে তুমুল বিতর্ক আরম্ভ হয়েছিলো সমাজের দু দিক থেকে। দিনের বেলায় ফিরিঙ্গি দপ্তরে কাজ করে বাড়ি ফেরার সময়ে গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হবার রীতিকে অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন বিবেককে সাফ রাখার প্রামাণ্য ব্যবস্থা হিশেবে।[৩৮] মোট কথা, পুরোনো আর নতুন মূল্যবোধের রীতিমতো বোঝাপড়া চলছিলো কলকাতার বাসিন্দাদের মধ্যে। কলকাতা কমলালয়ে ব্যবসা করে অনেকে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলা গাছ হচ্ছিলেন। সেই টাকা দিয়ে জমিদারি কিনে তাঁরা আবার সম্ভ্রান্ত বলেও নাম কিনছিলেন। কিন্তু মধু জন্মেছিলেন শহর থেকে অনেক দূরে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। সেখানকার জীবনযাত্রা ছিলো নগরের ব্যস্ততাবর্জিত — শান্ত এবং মন্থর। মূল্যবোধ মধ্যযুগীয়। সেখানে আধুনিকতার হাওয়া পুরোনো ব্যবস্থাকে বিচলিত করতে পারেনি। তখনো আগের যুগের ঘুমে সে বিভোর। সেই নিস্তরঙ্গ সাগরদাঁড়ির ছোটো ছেলে মধুর চারদিকে সবাই পরিচিত। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে বাস তাঁর। গ্রামের সবচেয়ে ধনী পরিবারের সন্তান হিশেবে পরিবারের বাইরেও বাড়তি খাতির সবার কাছে। তারপর সেই পরিচিত লোকজন এবং পরিবেশ থেকে তিনি একেবারে বালক বয়সে হঠাৎ ছিটকে পড়লেন সেকালের এবং সে বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দূরের এক মহানগরীতে।

ক্ষুদ্র গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বিশাল নগরীতে আসার দৃষ্টান্ত মধু অবশ্য পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর পিতা যে-কলকাতা আর সাগরদাঁড়ির মধ্যে বছরে কয়েক বার যাতায়াত করতেন, মহানগরী কলকাতার বার্তা বয়ে নিয়ে আসতেন একটি অজগ্রামে, তা থেকে অনেকেই হয়তো উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে বালক মধুই অনুপ্রাণিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। কলকাতায় যাবার স্বপ্ন তিনি শৈশব থেকেই দেখতে শুরু করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত যখন তিনি কলকাতায় গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকতে আরম্ভ করেন, তখন কলকাতাকে ঘিরে তাঁর যেসব কৌতূহল ছিলো, তা ঘুচে যেতে সময় লাগেনি। অতঃপর সাগরদাঁড়িই বালক মধুর মনকে মোচড় দিয়েছে। কপোতাক্ষ; বটবৃক্ষের নিবিড় ছায়া; ঠাকুরমা, পিসিমা এবং জেঠীমার রূপকথা; আর পাঠশালার বন্ধুদের স্মৃতি তখন মনকে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করেছে।

অতীতের স্মৃতিজনিত এই মর্মবেদনা ছাড়া, সংবেদনশীল এই বালকের কাছে বর্তমানও দেখা দেয় নানা সমস্যা নিয়ে। ঠিক কোন বছর, কোন মাসে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, সে তথ্যের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, কলকাতায় আগমনের ফলে তাঁর জীবনে কী ধরনের সংকট দেখা দিয়েছিলো এবং তিনি সেই সংকট কী করে ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় লেখাপড়ার জন্যে নতুন স্কুলে যাওয়া, সেখানে অন্য ধরনের বইপত্র এবং পাঠের আয়োজন, শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা, সহপাঠীদের কৌতূহল এবং শত্রুতার মোকাবেলা করে তাদের বন্ধুতে পরিণত করা, পড়শিদের মধ্য থেকে খেলার সাথী জোটানো - এসবও তাঁর মনকে নিশ্চয় উতলা করেছে। একান্ত আশ্রিত জীবন থেকে হঠাৎ তিনি যেন সহানুভূতি- এবং ভালোবাসাহীন একটা পরিবেশে এসে পড়েছিলেন। তিনি যেন ইঁটের পরে ইঁট দিয়ে ঘেরা একটা বিরাট কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এটা ছিলো তাঁর জীবনের একটা সংকট এবং সংক্রান্তির সময়।

প্রসঙ্গত, একটা কথা এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, যাকে পোশাকী ভাষায় বলে জীবনের "অধ্যায়", মধুসূদনের জীবনে সত্যি সত্যি সে রকমের সুস্পষ্ট আলাদা আলাদা অধ্যায় ছিলো। সাগরদাঁড়ি থেকে কলকাতায় আসার ফলে তাঁর জীবনে তেমনই একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিলো। তাঁর সেই আগেকার জীবন এবং নতুন জীবনের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন তিনি নিজে আর তাঁর বাবা-মা, নয়তো অন্য সব কিছু বদলে গিয়েছিলো। তেমনি তিনি যখন ধর্মান্তরিত হন, তখন তাঁর একেবারে নতুন জীবন আরম্ভ হয়েছিলো। মাদ্রাসে গিয়ে তিনি আর-একবার শুরু করেছিলেন একেবারে ভিন্ন একটি জীবন — আগেকার জীবনের সঙ্গে যাঁর সামান্যই যোগ ছিলো। মাদ্রাস থেকে তিনি যখন কলকাতায় আসেন, তখন আগেকার জীবনের সঙ্গে, বলতে গেলে, সকল বন্ধন কাটিয়ে এসেছিলেন। জাহাজ থেকে কলকাতায় নেমে তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর পঞ্চম জীবন। কলকাতা ছেড়ে তিনি যখন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে বিলেত যাত্রা করেন, তখন যে-জীবনের স্বাদ পেয়েছিলেন, সে জীবন ছিলো আগের জীবন থেকে অনেকটাই আলাদা। আর সবশেষে তিনি যখন তৃতীয় বারের জন্যে কলকাতায় জীবন শুরু করেন, তখনকার সেই কলকাতার জীবনের সঙ্গে আগেকার কলকাতার জীবনের সামান্যই মিল ছিলো। এমনি করে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনেই তিনি একে-একে সাতটি জীবন যাপন করেছিলেন।

গ্রামের পাঠশালায় তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন এবং লেখাপড়ায় তাঁর আত্যন্তিক মনোযোগ ছিলো — আগেই তা উল্লেখ করেছি। ভাষা শেখার ব্যাপারেও তাঁর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিলো। সুতরাং কলকাতায় স্কুলে যাবার পর ইংরেজি-জানা অন্য ছাত্রদের তিনি দ্রুত ধরে ফেলেছিলেন — এটা বোঝা যায়। বরং অন্যদের সঙ্গে নতুন করে মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সময় লাগাই স্বাভাবিক। ধারণা করা সঙ্গত যে, সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে প্রথম দিকে তাঁর মতো একজন স্পর্শকাতর এবং সূক্ষ্ম

অনুভূতিসম্পন্ন বালকের বেশ হাবু-ডুবু খেতে হয়েছে। তিনি যে গোড়াতে ইংরেজি ভাষা জানতেন না, এমন কি জানতেন না কলকাতার বাংলা, বরং কথা বলতেন যশুরে ভাষায় এবং আচার-আচরণে, পোশাকে-আশাকে অ-নাগরিক ছিলেন, এটা নিশ্চয় তাঁকে পীড়িত করেছে। সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি কতো বার সহপাঠীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপের মুখোমুখি হয়েছেন তাঁর পূর্ববঙ্গীয় ভাষার জন্যে। (রামমাণিক্যের উক্তি স্মরণীয়: *পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর্‍্যা মস্তক গুরাই দিচে – বাঙ্গাল কউস ক্যান?* [৩১])। এ সময়ে মধু যদি ইংরেজ কবি বালক শেলির মতো তাঁর পাঠশালায় গিয়ে সবার অজ্ঞাতে চোখ মুছে থাকেন, লেক্ষর খাতায় ফেলে-আসা গ্রামের ছবি এঁকে থাকেন, তা হলে অবাক হবার কারণ নেই।

স্কুলের নাম	স্থাপনের সময়	ঠিকানা	কি পড়ানো হতো/শিক্ষক
ক্যালকাটা হাই স্কুল	১৮৩০	১০২ জান বাজার	ইংরেজি, ল্যাটিন,গ্রীক, ফ্রেন্‌চ পড়ানো হতো। বিদেশী শিক্ষক
প্যারেন্টাল অ্যাকাডেমি	১৮২৩	১ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট	ইংরেজ শিক্ষক
লোয়ার অরফ্যান স্কুল		আলিপুর	৩জন ইংরেজ শিক্ষক
সেন্ট জেমস স্কুল	১৮২৩		ইংরেজ শিক্ষক
বেনোভলেন্ট ইনস্টিটিউশন	[illegible]	৩৬ বৌ বাজার	
জেনারেল এসেমব্লি			
অরিএন্টাল সেমিনারি		চিৎপুর রোড	কয়েকজন ইংরেজ শিক্ষক
ইউনিয়ন স্কুল		ভবানীপুর	
আপার অরফ্যান স্কুল		খিদিরপুর	৪জন ইংরেজ শিক্ষক

১৮৩০-এর দশকে কলকাতার কয়েকটি স্কুল।
এর যে-কোনোটিতে মধুর পক্ষে পড়া সম্ভব ছিলো।

আমার বিশ্বাস, এই পরিবেশে তিনি মাঝেমধ্যে তাঁর পিতা যে ধনী উকিল – এই উক্তি করে বন্ধুদের বিদ্রূপের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। এবং গোড়াতে যা ছিলো তাঁর আত্মরক্ষার হাতিয়ার, শেষ পর্যন্ত তাই একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এই হীনম্মন্যতাই কয়েক বছরের মধ্যে নিজেকে জাহির করার মানসিকতায় পরিণত হয়। তিনি যে পরবর্তী কালে সহপাঠীদের টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছেন, দামী উপহার দিয়েছেন, বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন, সেও অংশত তাঁর হীনম্মন্যতা/অহমিকার ক্ষতিপূরণ।

কলকাতায় তিনি কোন স্কুলে এসে ভর্তি হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোনো তথ্য জানা

যায়নি। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি খিদিরপুরে কোনো একটা ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়ার জন্যে ভর্তি হয়েছিলেন। সুরেশচন্দ্র মৈত্র এটা স্বীকার করেননি। সেকালে খিদিরপুরে কোনো ইংরেজি স্কুল ছিলো কিনা, ইংরেজি পঞ্জিকা এবং অন্যান্য সূত্র থেকে তিনি তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, মধু ভর্তি হয়েছিলেন খিদিরপুর থেকে অনেকটা দূরে লালবাজারের গ্র্যামার স্কুলে। পিতা তাঁকে সকালে আদালতে যাবার সময়ে স্কুলে নিয়ে যেতেন এবং বিকেলে ফেরার সময়ে সঙ্গে করে বাড়িতে আনতেন।[৪০] সুরেশচন্দ্রের এই অনুমান সত্য হওয়া সম্ভব। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। বিশেষ করে, রাজনারায়ণ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আদালতে যেতেন এবং সঙ্গে করে বাড়ি ফিরতেন — এই যুক্তিকে তেমন জুৎসই বলে ভাবতে পারছিনে। তখন কলকাতায় পালকি ভাড়া ছিলো সারা দিনে চার আনা। মধুকে বাড়ি থেকে স্কুলে এবং স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে দু আনার বেশি লাগার কথা নয়। সুতরাং মধুকে একজন ব্যস্ত উকিলের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে; অথবা বালক মধুকে পিতার আদালত বন্ধ হবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে বাড়ি ফেরার জন্যে, সুরেশচন্দ্রের এই যুক্তিকে খুব গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। তখন হিন্দু কলেজের জুনিয়র শাখায় ভর্তির জন্যে বয়সের সীমানা ছিলো আট থেকে বারো। মধুর বয়স তখন ছিলো এই সীমানার মধ্যে। তা হলে তিনি প্রথমেই হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন না কেন, তারও সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

মধু কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, তথ্য হিশেবে সেটা যতোটা গুরুত্বপূর্ণ, আসলে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই স্কুলে তিনি কী ধরনের শিক্ষা পেয়েছিলেন। আমরা যখনকার কথা আলোচনা করছি, ভালো ইংরেজি শেখার জন্যে কলকাতায় তখন বেশি স্কুল ছিলো না। প্রাইভেট পড়ার সুযোগও ছিলো সীমিত। ভালো শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ার জন্যে এ সময়ে, রামকমল সেনের মতে, মাসে চার থেকে ষোলো টাকা বেতন লাগতো।[৪১] অনেকে ইংরেজি শেখার নামে যা শিখতেন, তা হলো মুখে মুখে কতোগুলো জিনিশের নাম এবং কতোগুলো ক্রিয়াপদ। যাঁদের শিক্ষা আর-একটু এগুতো তাঁরা বর্ণমালাও শিখতেন সেই সঙ্গে। কিন্তু মধু শিখেছিলেন একেবারে চোস্ত ইংরেজি। তাঁর সহপাঠীদের তুলনায় ইংরেজিতে তাঁর দক্ষতা ছিলো অনেক বেশি। এর ভিত্তি সাগরদাঁড়িতে স্থাপিত হয়নি — কলকাতায়ই হয়েছিলো। সে কারণে মনে হয়, রাজনারায়ণ তাঁকে কোনো ভালো স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। সে স্কুলে ইংরেজ/ফিরিঙ্গি শিক্ষকও ছিলেন বলে ধারণা হয়।[৪২] এ ব্যাপারে রাজনারায়ণের বাস্তব এবং হিশেবী বুদ্ধির কথা মনে রাখা যেতে পারে। তিনি নিজে তাঁর পেশার জন্যে ইংরেজি শেখেননি। এমন কি, তিনি যে আদৌ ইংরেজি জানতেন, তেমন কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু স্বগঠিত এবং সফল একজন মানুষ হিশেবে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ফারসির যুগ শেষ হতে যাচ্ছে এবং নতুন যুগে তাঁর মতো সফলতা লাভ করতে হলে ইংরেজি ভাঙ্গিয়েই তা করতে হবে। মধু যখন কলকাতার স্কুলে ভর্তি হন, তার এক-আধ বছরের মধ্যে সরকারী কাজকর্মে ইংরেজি ভাষা চালু হয়েছিলো মেকলির সুপারিশে।[৪৩] সুতরাং সন্তানকে রাজনারায়ণ নিশ্চয় কলকাতার সেরা স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। মধু তাঁর নতুন স্কুলে কেবল ইংরেজি নয়, খানিকটা ল্যাটিন, গ্রীক এবং হিব্রু শিখেছিলেন — এমন কথাও বলা হয়।[৪৪] তা থেকেও কোনো ভালো স্কুলে লেখাপড়া শেখার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি আগে থেকে ভালো ছাত্র ছিলেন এবং লেখাপড়ায় তাঁর খুব আগ্রহ ছিলো। এখন এই স্কুলে এসে তিনি দ্রুত নতুন নতুন ভাষা শেখায় তাঁর দক্ষতা দেখাতে আরম্ভ করেন।

মধু হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ১৮৩৭ সালে।[৪৫] তখন হিন্দু কলেজে মোট ১৩টি শ্রেণী ছিলো। এর মধ্যে নিচের আটটি ছিলো জুনিয়র স্কুলের আওতায়, আর উপরের পাঁচটি শ্রেণী ছিলো সিনিয়র স্কুলের অধীনে। মধু ভর্তি হন নিচের দিক থেকে গুনলে পঞ্চম শ্রেণীতে, আর ওপরের দিক থেকে গুনলে

নবম শ্রেণীতে। তখন ওপরের দিক থেকে গোনারই রীতি ছিলো। কলকাতার অন্য স্কুলে মধুর ভাষা শিক্ষার যে-ভিত্তি তৈরি হয়, মনে হয় তা মজবুত ছিলো। তবু হিন্দু কলেজেই তিনি সত্যিকার শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। পরে তিনি যে কবি হয়েছিলেন, বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে-নিবিড় পরিচয় হয়েছিলো, তার জন্যে হিন্দু কলেজের কাছে তাঁর ঋণ অপরিসীম।

মধু হিন্দু কলেজে পড়তে আসেন, ডিরোজিও মারা যাবার ছ বছর পরে। সত্যি বলতে কি, তিনি মারা যান বালক মধু কলকাতায় আসারও আগে। হিউম, রীড, কান্ট, স্টিউয়ার্ট এবং টম পেইন পড়ার যে-রীতি তিনি উৎসাহিত করেছিলেন, তার গতি ততোদিনে অনেকটা স্তিমিত হয়েছিলো; কিন্তু হিন্দু কলেজে পঠন-পাঠন এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের যে-অসাধারণ ঐতিহ্য তিনি স্থাপন করেছিলেন, সে ঐতিহ্য তখনো ম্লান হয়নি। তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে তখন পর্যন্ত হিন্দু কলেজে ছিলেন।



১৮৩০-এর দশকের হিন্দু কলেজ

ডিরোজিও কেবল সাহিত্য পড়াতেন না; অথবা সাহিত্য পড়িয়েই তিনি হিন্দু কলেজে বিপ্লব আনেননি। তিনি ছাত্রদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন কলেজের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত নৈতিক দর্শন পড়িয়ে। অবশ্যই বলতে হবে, তিনি কখনো পাঠক্রমের বাঁধা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন না। বাইরের প্রশস্ত পৃথিবীর জানালাটাও তিনি খুলে দিতেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, তিনি তাঁর ছাত্রদের স্বাধীনভাবে ভাবতে শেখাতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের আসলে দুটো ভাগ ছিলো। একদিকে, তিনি রোম্যান্টিক কবি ছিলেন — কল্পনাই সেখানে তাঁর মূলধন। অন্যদিকে, তাঁর চরিত্রে বড়ো আর-একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো — চুলচেরা যুক্তিবাদের। তাঁর শিষ্যরা সেই যুক্তিবাদের প্রভাবে প্রচলিত মূল্যবোধ অনেকাংশে বিসর্জন দিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজ থেকে তিনি বিদায় নিতে বাধ্য হবার বারো বছর পরে যিনি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন এবং মধু যাঁকে দারুণ অপছন্দ করতেন, সেই জেমস ক্যর ডিরোজিওর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন:

> ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে সবকিছু যুক্তিবাদের আলোকে বিচার করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো। ঈশ্বর, ভবিষ্যৎ, পারিবারিক সম্পর্ক — যা আমরা যুক্তির বদলে দরদের সঙ্গে দেখি, তাঁর শিষ্যরা যুক্তিবাদে দীক্ষা নেওয়ায় সেসবকেও প্রশ্ন করেন।[৪৬]

শিষ্যদের এই আমূল সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কলেজের ছাত্রদের অভিভাবক এবং কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে যে-উদ্বেগের জন্ম দিয়েছিলো, তার ফলে ডিরোজিও অকালে কলেজ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর প্রভাব দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর শিষ্যদের ওপর বজায় ছিলো।

মধু যখন হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, তখনও ডিরোজিওর শিষ্যদের পরিচালিত একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিলা। এসব পত্রিকায় তাঁর শিষ্যরা অনেক সময়ে প্রচলিত মূল্যবোধ কাটিয়ে যুক্তিবাদের মাধ্যমে সত্যকে অঙ্গীকার করার আহ্বান জানাতেন। হিন্দু ধর্মকে তাঁরা আঘাত করতেন উঠতে-বসতে। তাঁরা যে-বিতর্ক সভা স্থাপন করেছিলেন, সেখানে স্বদেশ এবং স্বধর্মের পুরোনো রীতিনীতিকে অহরহ তাঁরা প্রশ্ন করতেন।[৪৭] ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে তাঁরা যে-সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা গঠন করেন, সেখানেও তাঁরা সমাজ সংস্কার নিয়ে আন্দোলন করতেন। এসবের সঙ্গে মধু যোগ দেননি। ১৮৪০ সালে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার যে-সভ্য তালিকা পাওয়া যায়, তাতে প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, গোবিন্দ দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ইত্যাদি তাঁর সহপাঠীদের নাম পাওয়া গেলেও, গৌরদাস বসাক অথবা মধুর নাম সেখানে অনুপস্থিত। একজন মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম আছে বটে, কিন্তু তিনি হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।[৪৮] তবে এসব সমাজ সংস্কারমূলক কাজকর্মে যোগ না-দিলেও মধু এসব না-শুনে পারেননি।



হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও
ছাত্রদের চুম্বকের মতো টানতেন

ডিরোজিওর সঙ্গে মধুর অন্য একটি যোগাযোগ ঘটেছিলো কবিতার মাধ্যমে। ডিরোজিওকে অনেকে বলতেন ইউরেশীয় বায়রন, যদিও অন্য প্রধান রোম্যান্টিক কবিদের – স্কট, মূর, বার্নস – দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া, যে-দেশাত্মবোধের জন্যে তিনি এখনো সুপরিচিত এবং প্রশংসিত, সেই দেশাত্মবোধের আদর্শ অনেকটা তিনি পেয়েছিলেন আর-একজন রোম্যান্টিক কবি – টমাস ক্যাম্বেলের কাছ থেকে। তাঁর কবিতায় যে-উচ্ছ্বাস এবং প্রাণ ছিলো, তরুণ মধু তা দিয়ে যতো সামান্যই হন না কেন, প্রথম দিকে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সর্বোপরি, দুজনই খাতক ছিলেন অভিন্ন মহাজনদের। সে দিক দিয়েও তাঁদের সাদৃশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। খিদিরপুরের যে-বাড়িতে মধু বাস করতেন, তিনি সেখানে আসার আগে সে বাড়ির ওপরও ডিরোজিওর প্রভাব পড়েছিলো – সে বাড়িতে বাল্যকালে বাস করতেন বাঙালিদের মধ্যে প্রথম যিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখেছিলেন – কাশীপ্রসাদ ঘোষ।[৪৯] তিনিও মধুসূদনের আগে ডিরোজিওর কবিতা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে তাঁর দেশাত্মবোধক ভাবনা দিয়ে। বস্তুত, ডিরোজিও মাত্র ২৩ বছর বয়সে মারা গেলেও, হিন্দু কলেজ এবং কলকাতার ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রভাব রেখে গিয়েছিলেন।

সাহিত্য ছাড়া, তরুণ মধু ডিরোজিওর আর-একটি প্রভাব স্বীকরণ করেছিলেন, তবে কোন পথে, তা জানা নেই। ডিরোজিওর অনেক শিষ্য সত্যের জন্যে দরকার হলে পিতামাতা এবং সমাজকে অস্বীকার করার আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন অসাধারণ সাহসের সঙ্গে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়[৫০], রসিককৃষ্ণ মল্লিক[৫১], দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়[৫২], মহেশচন্দ্র ঘোষ[৫৩], রামগোপাল ঘোষ[৫৪] প্রমুখ সেকালের অনেক নাম-করা ব্যক্তিত্ব তাঁদের নিজ নিজ বিশ্বাস এবং আদর্শের জন্যে তাঁদের জীবনে বহু বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা সাধারণ মানুষ নেয় না। ধর্মবিশ্বাস এবং সমাজসংস্কারে তাঁদের আগ্রহ ছিলো একান্ত আন্তরিক। মাইকেল এঁদের মতো কোনো সামাজিক বিষয়ে নিজের বিশ্বাসকে মর্যাদা দেবার জন্যে পরিবার এবং সমাজের বিরোধিতা করেননি। তাঁর সত্য ছিলো প্রধানত কবিতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। তার জন্যে তিনি আপনজন এবং আপাত সুখের জীবন বিসর্জন দিতে ভয় পাননি। পরে দেখতে পাবো, তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে এবং কবি হবার পথে তিনি নিজের পরিবারকে বাধা বলে বিবেচনা করেছেন, তখন কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা করেননি।



ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন: মাইকেলের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক

হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর বিদায় নেবার কয়েক বছরের মধ্যে — ১৮৩৫-৩৬ সালে — কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে আসেন একজন প্রাক্তন সৈন্য — ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন (১৮০১-৬৫)। ক্যাডেট হিশেবে তিনি বেঙ্গল আর্মিতে যোগদান করেছিলেন ১৮১৯ সালে। বেশ দ্রুত তিনি তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, মেজর পর্যন্ত তাঁর পদোন্নতি হয়েছিলো। কিন্তু বন্দুক নয়, তাঁর আসল অস্ত্র ছিলো কলম। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে কবি। অচিরেই তিনি বেসামরিক দায়িত্ব পান। প্রথমে তিনি কাজ করেন গভর্নর-জেনরেল বেন্টিঙ্কের অধীনে। তারপর শিক্ষা বিভাগে। ১৮২৭ সালে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যান এবং সেখানে *London Weekly Review* পত্রিকা প্রকাশ করেন। তবে বছর আড়াই পরে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। সেখানে তিনি প্রথমে *Bengal Annual* এবং তারপরে *Calcutta Literary Gazette* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তা ছাড়া, তিনি বেশ কয়েকটি কাব্য এবং প্রবন্ধের বইও প্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম কাব্য — *Miscellaneous Poems* — প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালে, কলকাতা থেকে। পরে লন্ডন থেকেও এ বইটি প্রকাশিত হয়েছিলো। তা ছাড়া, ১৮২৫ সালে লন্ডন থেকে তাঁর আর-একটি কাব্য প্রকাশিত হয় — *Sonnets and Other*

Poems। তাঁর *Literary Leaves* প্রকাশিত হয় ১৮৩৬ সালে। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি আরও কয়েকটি কাব্য এবং কাব্য-সমালোচনা প্রকাশ করেন।[৫৫] তবে বই-এর সংখ্যা দিয়ে নয়, তাঁর কবিতা এবং কাব্য-সমালোচনার উন্নত মানের জন্যেই তিনি সেকালের ইঙ্গ-ভারতীয় সকল সাহিত্যিকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতে পারেন। মেকলি ছিলেন তাঁর বিশেষ গুণমুগ্ধ। সেই মেকলির সুপারিশে তিনি হিন্দু কলেজে ডক্টর টাইটলার অবসর নেওয়ার পর সাহিত্যের অধ্যাপক হিশেবে যোগ দিয়েছিলেন।

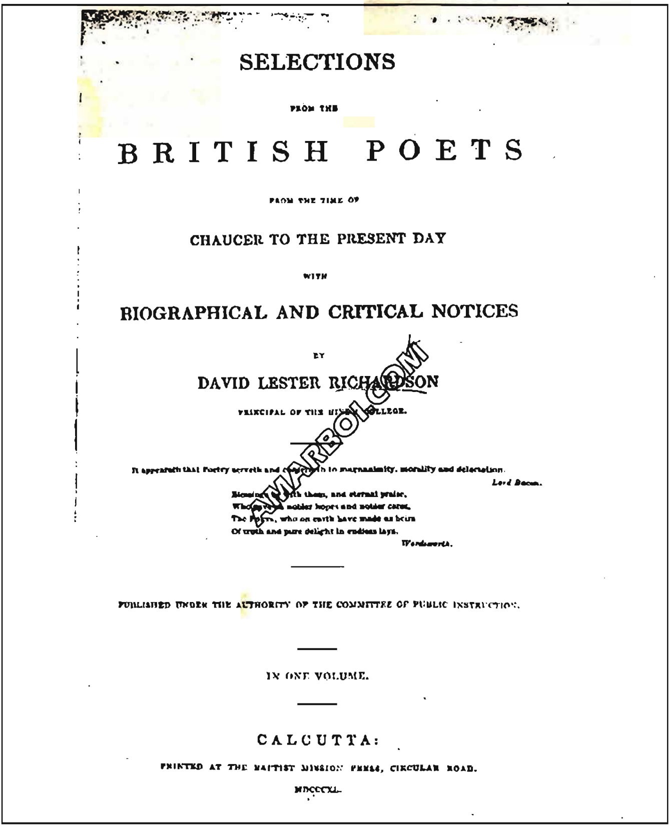
অল্পকালের মধ্যে তাঁর সাহিত্যিক গুণাবলীর সঙ্গে আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিলো শিক্ষকতার গুণাবলীর। ডিরোজিও এবং ডেভিড হেয়ার ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ এবং সহানুভূতি দিয়ে লেখাপড়া শেখানোর যে-প্রশংসনীয় রীতি প্রবর্তন করেছিলেন, রিচার্ডসন তা কেবল বহাল রাখেননি, তাকে বরং এগিয়ে দিয়েছিলেন। ছাত্ররা সচরাচর তাঁর ব্যক্তিগত যত্ন এবং উদার সহানুভূতি লাভ করতো। রিচার্ডসন শিক্ষক হিশেবে খুব ভালো ছিলেন — এ কথা তাঁর ছাত্রদের অনেকে তাঁদের স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে রাজনারায়ণ বসু তাঁর যে-রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, তা থেকে ছাত্রদের ওপর তাঁর প্রভাবের মাত্রা খানিকটা বোঝা যায়:

> কাপ্তেন সাহেব ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শেকসপিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। ... তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা বলিতে পারি না — তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না — কিন্তু তথাপি হয়।[৫৬]

কেবল ছাত্ররা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন না, মেকলি পর্যন্ত তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সবকিছু তিনি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু কলকাতায় রিচার্ডসন যেভাবে শেকসপীয়র আবৃত্তি করতেন, সেটা কখনো ভুলতে পারবেন না।[৫৭] উইলিয়াম র‍্যাডিচি মাইকেল সম্পর্কিত তাঁর অভিসন্দর্ভে লিখেছেন যে, রিচার্ডসনের সাহিত্যবোধ ছিলো অত্যন্ত উঁচু মানের। তাঁর মতে, রিচার্ডসন যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান ধারায় সুপরিচিত হননি, সে হয়তো তিনি ইংল্যান্ড থেকে অতো দূরে বসে সাহিত্যচর্চা করছিলেন বলে।[৫৮] নিজেও সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। সে জন্যে, সুদূর কলকাতা থেকে ইংল্যান্ডের রোম্যান্টিক কবিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। এই কবিদের একজন — লেই হান্টের কাছে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠি রক্ষা পেয়েছে।[৫৯]

বস্তুত, ডিরোজিও যেমন হিন্দু কলেজের একজন অতি অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন, রিচার্ডসনও ছিলেন তেমন অসাধারণ। তবে দু জনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারার মধ্যে সামান্যই মিল ছিলো। তা ছাড়া, তাঁদের অগ্রাধিকারও ছিলো একেবারে ভিন্ন রকমের। ডিরোজিও পড়াতেন নৈতিক দর্শন এবং সাহিত্য। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি দর্শন এবং সামাজিক বিষয়ে সচেতন হবার আদর্শে তিনি ষোলো আনা বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু রিচার্ডসন কেবল যে নৈতিক দর্শন পড়াতেন না, তাই নয়, তিনি দর্শনের প্রতি কোনো গুরুত্বই দিতেন না। তাঁর আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিলো সাহিত্যের মধ্যে। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ চমৎকারভাবে বলেছেন যে, ডিরোজিও জোর দিতেন লক, হিউম, পেইন ইত্যাদি দার্শনিকের রচনা পড়ার ওপর, কিন্তু ডিএলআরের আমলে এঁদের জায়গা দখল করলেন বায়রন, কীটস, শেলি ইত্যাদি রোম্যান্টিক কবিরা।[৬০] সামাজিক বির্তক এবং রাজনীতিতে ডিএলআরের রুচি ছিলো না। সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্যও ছিলো বিতর্কাতীত। ডিরোজিও সরকারের সমালোচনা করতে ভয় পেতেন না। তাঁর *East Indian* পত্রিকায় তিনি ইংরেজ কর্মকর্তাদেরও সমালোচনা করতেন। কিন্তু ডিএলআর এ রকম মনোভাবকে রাজদ্রোহিতা মনে করতেন। প্রসঙ্গত, একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৪৩ সালের ৮ ফেব্রুআরি সংস্কৃতি কলেজের হলে *সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার* একটি বৈঠক

অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশের আদালত এবং পুলিশের অবস্থা নিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পরিষ্কার হতেই তাকে রাজদ্রোহিতার সামিল মনে করে ডিএলআর এই প্রবন্ধ পাঠ বন্ধ করে দেন। কিন্তু পরের মাসের ২ ও ৩ তারিখের



SELECTIONS

FROM THE

BRITISH POETS

FROM THE TIME OF

CHAUCER TO THE PRESENT DAY

WITH

BIOGRAPHICAL AND CRITICAL NOTICES

BY

DAVID LESTER RICHARDSON

PRINCIPAL OF THE HINDU COLLEGE.

It appeareth that Poetry serveth and conferreth to magnanimity, morality and delectation.
Lord Bacon.

Blessings be with them, and eternal praise,
Who gave us nobler hopes and nobler cares,
The Poets, who on earth have made us heirs
Of truth and pure delight in endless lays.
Wordsworth.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE COMMITTEE OF PUBLIC INSTRUCTION.

IN ONE VOLUME.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, CIRCULAR ROAD.

MDCCCXL.

ডিএলআরের সম্পাদিত কাব্য সংকলন: মধুকে যা পথ দেখিয়েছিলো

Bengal Hurkaru পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৬১] এ থেকে ডিএলআর-এর মনোভাব বোঝা যায়। বস্তুত, সামাজিক বিষয়ে তিনি ছাত্রদের রক্ষণশীল শিক্ষাই দিতেন। এই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শের প্রভাব ছাত্রদের ওপর পড়েছিলো ভিন্নভাবে। ডিরোজিওর শিষ্যরা হয়েছিলেন প্রধানত সমাজ-সংস্কারক; আর রিচার্ডসনের শিষ্যরা সাহিত্যিক। রিচার্ডসনের মতো একজন অসামান্য সাহিত্যিকের

কাছে মধু যে গোড়া থেকে সাহিত্যের পাঠ নিতে পেরেছিলেন, সেটাকে তাঁর সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করতে হবে। সত্যি বলতে কি, সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ অতো আন্তরিক এবং তাঁর সাহিত্যবোধ অতো গভীর হবার পেছনে রিচার্ডসনের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিলো। মাইকেলের চিঠিপত্রে বিক্ষিপ্তভাবে ইতিহাসের উল্লেখ থাকলেও, কোথাও তিনি কোনো দার্শনিকদের অথবা দর্শনের উল্লেখ করেননি। ১৮৩০-এর দশকের ছাত্রদের, এমন কি, রাজনারায়ণ বসু এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে যে-সমাজসংস্কার সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়, তাঁর মধ্যে, বলতে গেলে, তা অনুপস্থিত। এ থেকেও তাঁর ওপর রিচার্ডসনের প্রভাব কতো গভীর ছিলো তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

১৮৪০ সালে রিচার্ডসন একটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করেন। এটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন মেকলির অনুরোধে। *Selections from the British Poets* নামে এই বিশাল গ্রন্থ এক দিকে তাঁর ছাত্রদের সাহিত্যিক রুচি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো; অন্যদিকে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো চসার থেকে আরম্ভ করে তরুণ টেনিসন (তখন তাঁর বয়স ৩১), ডিরোজিও থেকে আরম্ভ করে রিচার্ডসন, এমন কি, কাশীপ্রসাদ ঘোষ পর্যন্ত একেবারে সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে। এই সংকলনে পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিলো - ভূমিকা ১৯ পৃষ্ঠা, কবিদের জীবনী এবং রচনা সম্পর্কে টীকাটিপ্পনী ১২৮ পৃষ্ঠা এবং কবিতা ৯৭৪ পৃষ্ঠা — এই মোট ১১২১ পৃষ্ঠা। যে-অংশে কবিতা ছাপা হয়েছিলো, সে অংশের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুটি করে কলাম ছাপা হয়েছিলো, তার মানে সাধারণ হিশেবে সেখানে পৃষ্ঠা ছিলো ১৯৪৯ পৃষ্ঠা। এই সংকলনে ৩০৯ কলাম ব্যাপী শেকসপীয়রের পুরো নাটক ছিলো পাঁচটি, একটির অংশবিশেষ। মিল্টনের রচনারও একটা প্রধান অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। হয়তো এই সংকলনের মাধ্যমেই মিল্টনের সঙ্গে মধুর প্রথম ভালো করে পরিচয় হয়েছিলো। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ত্যাসো, শিলার এবং গ্যেটেসহ বহু য়োরোপীয় কবির (গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জর্মান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ এবং ডাচ ভাষা থেকে অনূদিত) রচনাও ছিলো এই বইতে। এই সংকলনের আর-একটি অত্যন্ত মূল্যবান অংশ হলো নির্বাচিত কবিদের পরিচয় এবং তাঁদের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এই অংশটা ছিলো অত্যন্ত সুলিখিত এবং তথ্যপূর্ণ। মধু এটি পড়ে বিশেষ মুগ্ধ হয়ে তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন: "আমি যদি এই ভূমিকাটা লিখতে পারতাম!"[৬২] এই ভূমিকা মধু এবং অন্য ছাত্রদের সাহিত্য বুঝতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছিলো।

রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হিশেবে কাজ আরম্ভ করেন ১৮৩৯ সালে — মধু এই কলেজে যোগদান করার দু বছর পরে। কিন্তু বালক কবি এবং ভালো ছাত্র হিশেবে তিনি অল্প দিনের মধ্যে রিচার্ডসনের নজরে পড়েছিলেন। আর মধু নিজেও অচিরেই প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর প্রিয় শিক্ষকের দ্বারা। ১৮৪১ সালে লেখা তাঁর সবচেয়ে পুরোনো যে-কবিতাগুলো রক্ষা পেয়েছে, তা পড়লে সন্দেহ থাকে না যে, তিনি এর অনেক আগে থেকে কবিতা লেখা মক্স করতে শুরু করেছিলেন। কবিতা লেখার অনুপ্রেরণাও তিনি সম্ভবত পেয়েছিলেন ডিএলআরের কাছ থেকে। পরে দেখতে পাবো, ১৮৪১ সালে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে মধু রিচার্ডসনের রীতিমতো নৈকট্য লাভ করেছিলেন। ডিএলআর মনে করতেন, সাহিত্য শেখার একটা খুব ভালো উপায় হলো নাটক দেখা। সে জন্যে তিনি তাঁর ছাত্রদের কলকাতার পেশাদার থিয়েটারে ইংরেজি নাটক দেখার উপদেশ দিতেন। আর মধু তাঁর এতো নৈকট্য লাভ করেছিলেন যে, নাটকের টিকিট লাগলেও তিনি ছুটতেন তাঁর শিক্ষকের কাছে।[৬৩]

এই বালক কবিকে রিচার্ডসন স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন, সেটা পরিষ্কার। মধু নিজেও অনুভব করতেন যে, ডিএলআর তাঁকে বিশেষ স্নেহ করছেন। তাঁর জন্যে এই অনুভূতি ছিলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই অনুভূতি তাঁকে ধ্রুবতারার মতো বিশেষ একটা দিকের নির্দেশ দিয়েছিলো। ডিএলআর

ছুটিতে গেলে ঝোঁকের মাথায় মধু ঠিক করলেন, তিনি কলেজে যাবেন না, যদিও শেষ পর্যন্ত না-গিয়ে পারেননি। এমন সিদ্ধান্ত নেবার কারণ, ডিএলআরের জায়গায় যিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন, সেই জেমস ক্যরকে তাঁর অপছন্দ। এর জন্যে ক্যর নিজে কতোটা দায়ী, বলা শক্ত। কারণ ডিএলআরের তুলনায় ক্যর যতোটা অনাকর্ষণীয় ছিলেন, মধু তাঁকে তার চেয়েও বেশি অনাকর্ষণীয় করে দেখেছেন। এ-ও রিচার্ডসনের প্রতি তাঁর ভালোবাসার মাত্রা প্রমাণ করে। মধু প্রথম দিকে খুব সনেট লিখতেন। একটি ভিন্ন ভাষাভাষী কিশোর কবির জন্যে সেটা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। তবে তারও একটা কারণ হতে পারে সনেটের প্রতি রিচার্ডসনের পক্ষপাত।

তখন হিন্দু কলেজে কী পড়ানো হতো, প্রসঙ্গত সে সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। জুনিয়র এবং সিনিয়র উভয় স্কুলে সাহিত্য এবং নৈতিক দর্শন পাঠ্য ছিলো। ডিএলআরের সংকলন প্রকাশিত হওয়ার পরে স্কুলের উভয় শাখায় এই সংকলনটি পাঠ্য করা হয়। এ ছাড়া, সিনিয়র স্কুলে টেকস্ট বুক সোসাইটির *English Reader*-ও পাঠ্য ছিলো। জুনিয়র স্কুলে গোল্ডস্মিথ এবং অ্যাডিসনের প্রবন্ধ পড়ানো হতো। নৈতিক দর্শনের মধ্যে জুনিয়র স্কুলে পাঠ্য ছিলো অ্যাবারক্রম্বাই-এর *Intellectual Powers*, ওয়েটলির *Easy Lessons in Reasoning*, রাসেলের *Modern Europe* আর টাইটলারের *Universal History*। গণিত এবং বাংলাও পড়তে হতো। সিনিয়র স্কুলে পড়ানো হতো মারের বিখ্যাত ব্যাকরণ, ক্রম্বির *Etymolgy and Syntax* এবং মার্শম্যানের *History of Bengal*। শেষ দুই শ্রেণীতে, যাকে বলা হতো কলেজ বিভাগ, সেখানে পড়ানো হতো মিল্টন, শেকসপীয়র, পোপ এবং গ্রে-র কবিতা আর বেইকনের প্রবন্ধ। ইতিহাসের মধ্যে পাঠ্য ছিলো হিউমের *History of England*, গিবনের *The Decline and Fall of the Roman Empire*, মিটফোর্ডের *History of Greece*, রাসেলের *Modern Europe*, মিলের *Indian History*, এলফিনস্টোনের *Indian History*, রবার্টসনের *Charles V* ইত্যাদি।

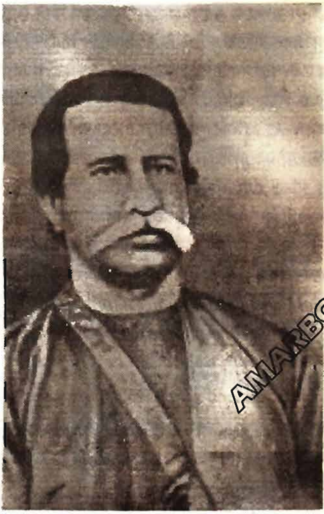
বাংলা পড়ানোর জন্যে হিন্দু কলেজে ছিলেন একাধিক শিক্ষক — জুনিয়র বিভাগে রামতনু লাহিড়ী এবং সিনিয়র বিভাগে রামচন্দ্র মিত্র। কিন্তু বাংলা পড়ার দিকে ছাত্রদের বিশেষ নজর ছিলো না। ১৮৪১ সালে কলেজের বাংলা পরীক্ষা নিয়েছিলেন রামকমল সেন। মধুও তখন ছাত্র ছিলেন। ছাত্রদের ফলাফল দেখে তিনি হতাশ হন। তিনি লিখিত মন্তব্য করেন:

> সিনিয়র ক্লাসের ছাত্ররা কেবল ইংরেজি পড়ার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। তারা বাংলা পড়া বন্ধ করেছে। ...মোট কথা, নিজেদের ভাষার চেয়ে ইংরেজি তারা ভালো বোঝে বলে মনে হয়। ইংরেজির তুলনায় নিজেদের ভাষা শেখার দিকে তারা সামান্যই গুরুত্ব দেয়, অথবা আদৌ কোনো গুরুত্ব দেয় না।[৬৪]

কুড়ি বছর পরে মাইকেল নিজেও বাংলার প্রতি গুরুত্ব না-দেবার সেকালের এই প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন। কবির রচনার প্রতিলিপি করার জন্যে দীননাথ ধর নামে এক তরুণকে (জন্ম ১৮৪০) নিয়োগ করা হয়েছিলো। কিন্তু এই তরুণের বানান দেখে সাহেব মাইকেলও আঁতকে ওঠেন। রাজনারায়ণকে তাই কপি পাঠানোর সময়ে বানান সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন: "বেশি দিন আগে নয়, তখন তুমি অথবা আমি যদি "শিব"-এর বদলে "ষীব" লেখা দেখতাম, অথবা দেখতাম বানানের এ ধরনের কোনো অস্থিরতা, তা হলে তাকে খুব অসাধারণ মনে করতাম না। সত্যি সত্যি আমাদের মাতৃভাষা কী দ্রুত অগ্রগতি এবং বিশুদ্ধতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বহু যুগের ঘুম ভেঙে কিভাবে সে জেগে উঠছে!"[৬৫]

হিন্দু কলেজের পাঠক্রম বিশ্লেষণ করলে বুঝতে কষ্ট হয় না, এই কলেজে পড়ার সময়েই ইংরেজি সাহিত্য এবং ইংরেজির মাধ্যমে য়োরোপীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে মধু খুব ভালোভাবে পরিচিত

হয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে রিচার্ডসনের মতো সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিককে শিক্ষক হিশেবে পাওয়ায় মধু সাহিত্যকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। ভাষার বুনিয়াদ হিন্দু কলেজে মজবুত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হতো। মধু তা দিয়েও খুব উপকৃত হয়েছিলেন। দর্শন এবং তর্কবিদ্যার দিকে তাঁর তেমন আকর্ষণ ছিলো না। কিন্তু ইতিহাস তিনি ভালো করে শিখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি যখন মাদ্রাসে পত্রিকা সম্পাদনা এবং শিক্ষকতার কাজ করেন তখন এই ইতিহাস শিক্ষা তাঁর কাজে লেগেছিলো। তাঁর তখনকার একাধিক লেখায় এই ইতিহাস-চেতনা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তিনি যে হিন্দু কলেজে থাকার সময়ে বাংলা ভালো করে পড়েননি, রামকমল সেনের প্রতিবেদন থেকে তা অনুমান করা সম্ভব। হিন্দু কলেজের পাঠক্রমে একটা বিষয় লক্ষযোগ্যভাবে অনুপস্থিত ছিলো, সে হলো বিজ্ঞান। বিলেতে অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞান পড়ানো হতো। এমন কি, হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখারও ব্যবস্থা ছিলো। আলোচ্য সময়ের তিন দশক আগে শেলি বিজ্ঞান পাঠ করে কী দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং রাসায়নিক পরীক্ষা করতে গিয়ে কতো বার আগুন লাগিয়েছেন, প্রসঙ্গত সেটা এখানে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু কলকাতায় বিজ্ঞান পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা কেন ইংরেজরা অনুভব করেননি, বোঝা মুশকিল। হয়তো কেবল কেরানি আর ডেপুটি তৈরি করাই ছিলো তাঁদের উদ্দেশ্য। এদের জন্যে তাঁরা বিজ্ঞান পড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করেননি। কিন্তু, কারণ যা-ই হোক, মাইকেল কোনো দিন বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারেননি। ভূগোলেও তাঁর জ্ঞান তেমন গভীর ছিলো বলে মনে হয় না। নয়তো, তিনি ইংল্যান্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বড়ো বড়ো পর্বত আর উপত্যকার কথা লিখতেন না।[৬৬] (পরে আমরা এ সম্পর্কে আরও দেখতে পাবো।) কিন্তু বিজ্ঞান যে উন্নতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এটা তিনি জানতেন। সে জন্যে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা একদিন স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করবে বলে তিনি যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে এ দিকটার দিকে জোর দিয়েছিলেন:[৬৭]



ভূদেব মুখোপাধ্যায়

some, perchance, here are,
Who, with a Newton's glance, shall nobly trace
The course mysterious of each wandering star;
And, like a God, unveil the hidden face
Of many a planet to man's wandering eye,
And give their names to immortality.

হিন্দু কলেজে মধু লেখাপড়া ছাড়া, আর-একটা জিনিশ পেয়েছিলেন, তা হলো: বন্ধুত্ব। তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন বলেছেন যে, তিনি সবার সঙ্গে সহজে মিশতে বা আলাপ করতে পারতেন না এবং তাঁর বন্ধুরা ছিলেন সবাই সুনির্বাচিত।[৬৮] পরে লক্ষ্য করবো, তাঁর যাঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁদের

সঙ্গে তিনি ছিলেন হরিহর আত্মা। তাঁদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে মিশতে, তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে, তাঁদের নিয়ে বেড়াতে যেতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু নিজের গোপন কথা, বিশেষ করে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তাঁদের কাছে তিনি মন খুলতে পারতেন না। তাঁকে সে জন্যে অন্তর্মুখী বলে মনে হয়। হিন্দু কলেজে পড়ার আগে তিনি যে-স্কুলে পড়েছিলেন, সেখানকার কোনো সহপাঠী তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর বন্ধু বলে পরিচিত হননি। কিন্তু হিন্দু কলেজে তিনি একে-একে বেশ কয়েকজন বন্ধু পেয়েছিলেন, যাঁদের সঙ্গে তাঁর স্থায়ী ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিলো। এই বন্ধুদের কেউ কেউ পরে বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত হয়েছিলেন। তবে এই কলেজে ভর্তি হবার পর বছর দুয়েক আপাতদৃষ্টিতে তিনি কোনো বন্ধু লাভ করেননি।

তাঁর সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু বলে যাঁর হদিস করা যাচ্ছে তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃত কলেজ এবং অন্য ছোটো ছোটো তিনটি স্কুলে কয়েক বছর পড়ার পর সংস্কৃত পণ্ডিতের ছেলে ভূদেব ১৮৩৯ সালে ইংরেজি পড়ার জন্যে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। তিনি এই স্কুলে যোগ দেবার পরেই যেচে গিয়ে মধু তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। দুজনই ভালো ছাত্র, দুজনই সুদর্শন, দুজনই তাঁদের পিতামাতার একমাত্র পুত্র। অল্পকালের মধ্যে দুজনের দীর্ঘস্থায়ী অন্তরঙ্গতা জন্মে। সামাজিক ভাবনার দিক দিয়ে ভূদেব খুব রক্ষণশীল ছিলেন, আর মধু ছিলেন কালাপাহাড়ী। তা সত্ত্বেও দু জনের মধ্যে কী করে বন্ধুত্ব হয়েছিলো, বোঝা যায় না। ভূদেবের সুন্দর চেহারা একটা কারণ ছিলো বলে মনে হয়। ১৮৪১ সালে টাকাপয়সার অভাবে ভূদেবের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিলো। তখন হিন্দু কলেজে ছাত্র-বেতন ছিলো মাসে পাঁচ টাকা। সেকালের বিচারে রীতিমতো বড়ো অঙ্কের টাকা। (বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর বছর পনেরো আগে মাসে দু টাকা বেতনের একটি চাকরি পাওয়ায়, তিনি এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনরা রীতিমতো খুশি হয়েছিলেন।[৬৯]) ভূদেবের পড়া বন্ধ হতে পারে, এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মধু তাঁর জলপানির টাকা থেকে এই খরচ দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[৭০] এ থেকে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা এবং মধুর বন্ধুপ্রীতির মাত্রা অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু মধুর মাইকেল হয়ে যাওয়াটা ভূদেব কোনো দিন ক্ষমা করতে পারেননি। তাঁর মতে, মধু খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পরে তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতাও অনেকটা নষ্ট হয়েছিলো।[৭১] এবং খৃষ্টান হবার জন্যেই পরবর্তী কালে মধুর কাছ থেকে তিনি খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু কবি তাঁর কৈশোরের এই বন্ধুকে কোনো কালে ভুলতে পারেননি। বিলেত থেকে পাক্কা সাহেব হয়ে ফিরে আসার পরেও তিনি ভূদেবের চুঁচুড়ার বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। কোট-প্যান্টালুন খুলে ধুতি পরে পিঁড়িতে বসে খেয়েছেন। তা ছাড়া, অক্ষম শরীর নিয়ে *হেক্টরবধ* রচনা করে তাঁর নামে তা উৎসর্গ করেছিলেন।[৭২]

ভূদেবের সঙ্গে প্রথমে পরিচয় হলেও মধুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো গৌরদাস বসাকের সঙ্গে। তাঁদের পরিচয় হয় ১৮৪০ সালে। এর আগে গৌরদাস কোথায় পড়তেন, তা জানা যায় না। তাঁর সঙ্গে একবার বন্ধুত্ব হবার পরে মধু আর তাঁকে কোনো দিন ভুলে যেতে পারেননি। সুখে-দুঃখে এই সম্পর্ক টিকে ছিলো তাঁর জীবনের একেবারে গোধূলি পর্যন্ত। কখনো খিদিরপুর থেকে বড়োবাজারে, কখনো মাদ্রাস থেকে কলকাতায়, কখনো কলকাতা থেকে বালেশ্বরে কি খুলনায়, কখনো ভার্সাই থেকে বাগেরহাটে এঁরই নামে কবি যে-অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন, তার অনেকগুলো হারিয়ে গেলেও, প্রায় সত্তরখানা রক্ষা পেয়েছে। চিঠিতে যে-ভাষায় তিনি বার বার গৌরদাসের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন অথবা গৌরদাসের ভালোবাসা কামনা করেছেন, তা সাধারণত প্রেমিকার জন্যে প্রেমিক জমা করে রাখে। প্রথম দিকে তাঁর লেখা গোটা পঞ্চাশেক কবিতার মধ্যে আটটি গৌরদাসের প্রতি উৎসর্গ করা অথবা তাঁকে নিয়ে লেখা। এর মধ্যে একটিতে

বন্ধুকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন:

> Tho' short, oh! too short is the Time we've, My Gour!
> To meet on this side of the tomb, killing thought!
> Yet Friendship and Love shall be e'er ours, My Gour!
> Where'er may Fate land me, thou shan't be forgot![৭৩]

এই ভালোবাসাকে সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে আরও গভীর বলে মনে হয়। বস্তুত, ভূদেবের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর গৌরদাসের প্রতি তাঁর ভালোবাসা - প্রকৃতি এবং মাত্রা উভয় দিক দিয়ে আলাদা। তাঁরা একে অন্যকে যেভাবে সাহায্য করেছেন, তা-ও দৃষ্টান্ত হবার যোগ্য। আমরা নানা জায়গাতে



মাইকেলের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু
গৌরদাস বসাক

এঁদের পারস্পরিক যোগাযোগ দেখতে পাবো। ১৮৪০ সালে মধুর আরো দুজন বন্ধু জোটে – বঙ্কুবিহারী দত্ত আর শ্যামাচরণ ল। ভূদেব, গৌরদাস, বঙ্কুবিহারী, শ্যামাচরণ আর কবি নিজে – এই পাঁচজনই ছাত্র হিশেবে খুব ভালো ছিলেন। সে জন্যে ১৮৪১ সালে সিনিয়র স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে এঁরা সবাই বৃত্তি পান। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ: এঁরা সবাই এক লাফে পঞ্চম শ্রেণী থেকে চতুর্থ অথবা তৃতীয় শ্রেণীতে নয়, একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন। গৌরদাস ছাড়া বঙ্কুবিহারী দত্তের সঙ্গে একটা পর্যায়ে মধুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিলো। এই ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করে বঙ্কুবিহারী বলেছেন যে, তিনি অনেক সময়ে মধুদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সেখানে দু-এক দিন কাটিয়ে আসতেন। মধুর মা এবং বাবাও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। বিশেষ করে মধুর মা তাঁকে

ভালো ভালো খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করতেন।[৭৪] মধুর মতো বঙ্কুবিহারীও পত্রপত্রিকায় লিখতেন। সে সূত্রেও দুজনের মধ্যে ভাব হয়েছিলো।

ও দিকে, রাজনারায়ণ বসুও এ সময়ে হিন্দু কলেজে পড়তেন। তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে এই কলেজে আসেন ১৮৪০ সালে। এখানে তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। মধু তখন তার দুই শ্রেণী নিচে – ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু তিনি নিচ থেকে লাফিয়ে উঠে ১৮৪২ সালে রাজনারায়ণের সহপাঠী হন। তবে তাঁর সঙ্গে তখন মধুর বন্ধুত্ব, এমন কি, বিশেষ আলাপও হয়নি। ক্লাসে নতুন ছাত্র এলে পুরোনোরা অনেক সময়ে তাদের সহজে গ্রহণ করতে রাজি হয় না। রাজনারায়ণের ক্লাসে মধু এবং তাঁর অন্য চার বন্ধু নতুন ছিলেন। (কারণ তাঁরা ক্লাস ডিঙিয়ে রাজনারায়ণদের সহপাঠী হয়েছিলেন।) তাঁরা যে নিচের ক্লাস থেকে এক বারে এই ক্লাসে উঠেছিলেন, তার জন্যে এই ক্লাসের অন্য ছাত্ররা তাঁদের অন্তত কিছু কাল সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি, এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। তদুপরি, রাজনারায়ণ বৃত্তি-পাওয়া ভালো ছাত্র ছিলেন। সাহিত্যেও তাঁর দখল ছিলো। সে জন্যে তিনি যদি মধুকে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে অথবা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, তা হলে অবাক হবো না। একদিন কলেজের জুনিয়র বিভাগের শিক্ষক রামতনু লাহিড়ীর পটলডাঙার বাড়িতে তাঁদের আলাপ হয়। সেখানে মিল্টন এবং শেকসপীয়র থেকে মধুর অনর্গল আবৃত্তি শুনে রাজনারায়ণ মুগ্ধ হন। ঈর্ষা বোধ করেন বটে, তবে একই সঙ্গে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও বোধ করেন।[৭৫] অবশ্য আলাপ একটু এগুলেও, কলেজ জীবনে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হয়নি।



মধুর আর-এক বন্ধু রাজনারায়ণ বসু

মধু তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে আরও কয়েক জনের কথা এখানে-ওখানে উল্লেখ করেছেন – শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরি আর বেণীমাধব বসু। বেণীমাধবের নামে তিনি একটি কবিতাও উৎসর্গ করেছিলেন।[৭৬] বেণীমাধব নিজেও কবিতা লিখতেন। মধুর আর-একজন বিশিষ্ট সহপাঠী ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দত্ত – কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সেক্রেটারি এবং ছোটো আদালতের জজ রসময় দত্তের পুত্র। (রসময় দত্ত একই সঙ্গে সংস্কৃত কলেজেরও সেক্রেটারি ছিলেন।) তিনিও স্কলারশিপ-পাওয়া ভালো ছাত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গে মধুর পরিচয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার পরে। রাজনারায়ণ বসু এবং গোবিন্দ দত্ত ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এঁদের বন্ধুত্বের একটা কারণ: দুজনেই সাহিত্য, বিশেষ করে ইংরেজি কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসতেন। রাজনারায়ণ এঁর কথা উল্লেখ করে তাঁর *আত্মচরিতে* লিখেছেন: "কলেজে থাকিতে ইংরাজী কবিতা পড়িতাম, না বলিয়া, তাহা গিলিতাম বলিলে হয়, তাহা এমনই আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। ইনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একহৃদয় ছিলেন বলিলে হয়। প্রাচীন এবং আধুনিক ক্ষুদ্রতম ইংরাজী কবির গ্রন্থ পর্যন্ত আমরা পড়িতাম।"[৭৭] কেবল সাহিত্য পড়াই নয়, গোবিন্দ দত্ত ইংরেজিতে কবিতাও লিখতেন। (তাঁর এই প্রতিভা পরে তাঁর দুই কন্যা তরু

এবং অরু দত্ত লাভ করেছিলেন।) ছাত্রজীবনে এঁর সঙ্গে মধুর কোনো ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো বলে জানা যায় না। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং ঈর্ষা হয়তো এর কারণ। ভোলানাথ চন্দ্রের সঙ্গেও মধুর বেশ বন্ধুত্ব ছিলো। তাঁর কথা কবি তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। অন্য আরও দুজন সহপাঠীর সঙ্গে মধুর ওঠা-বসা ছিলো বলে জানা যায় — এঁরা হলেন: দিগম্বর মিত্রের ভাই মাধব মিত্র আর গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মধু এবং তাঁর বন্ধুদের মধ্যে লেখাপড়ার ব্যাপারে বেশ স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ছিলো বলে আভাস পাওয়া যায়। গৌরদাসকে লেখা মধুর চিঠিপত্র থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, গৌরদাসও স্কুলপাঠ্য বইপত্রের বাইরে অনেক বই এবং পত্রপত্রিকা পড়তেন। মোট কথা, এই কলেজের ভালো ছাত্ররা কলেজে থাকতেই যথেষ্ট লেখাপড়া শিখতেন। এঁদের মধ্যে, মধুর আবার বিশেষ করে নাম ছিলো — "গ্রন্থকীট"। তা থেকে বোঝা যায়, তিনি সেই তরুণ বয়সেই কতোটা অধ্যয়ন করতেন। তবে তাঁর কোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে তাঁর লেখাপড়ার তফাত ছিলো। তাঁর অনেক বন্ধু পড়তেন পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্যে। কিন্তু মধু পড়তেন জানার জন্যে। পরীক্ষা তাঁর কাছে খুব জরুরী ছিলো না। যদিও ভালো ছাত্র হিশেবে পরীক্ষায়ও তিনি ভালো করতেন। গণিতে তাঁর আগ্রহ ছিলো না। কিন্তু ইচ্ছে করলে তিনি যে গণিতেও ভালো করতে পারতেন, ক্লাসে তার পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যরা যে-অঙ্ক করতে পারেননি, সেই অঙ্ক করে তিনি নাকি মন্তব্য করেছিলেন: "দেখলে তো, শেকসপীয়র ইচ্ছে করলে নিউটন হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন ইচ্ছে করলে শেকসপীয়র হতে পারতেন না।"[৭৮] মধু স্বভাব-কবি ছিলেন না। মিল্টনের মতো তিনি হয়েছিলেন পণ্ডিত-কবি। তাঁর সেই পাণ্ডিত্য এবং বৈদগ্ধ্যের প্রথম ধাপ নির্মিত হয়েছিলো হিন্দু কলেজে।[৭৯]

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মধু "আমার খিদিরপুরের ছেলেবেলার সাথী" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি অবশ্য হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন না, তদুপরি তিনি বাস করতেন কলকাতার বাইরে। পাঁচ বছর বয়স থেকে তিনি প্রথমে বাকুলিয়ার পাঠশালা এবং পরে মিশনারিদের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তার পরে তিনি ১৮৪৩ সাল অবধি লেখাপড়া শেখেন হুগলি কলেজে। আট বছরের সময়ে তাঁর বাবা মারা যান। আগাগোড়া তিনি তাঁর পুত্রহীন বড়ো মামা, মধুদের প্রতিবেশী, রামকমল মুখোপাধ্যায়ের স্নেহ এবং তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তিনি কলকাতায় বাস করতে আরম্ভ করেন, তাঁর মা মারা যাবার পরে, ১৮৪৩ সাল থেকে।[৮০] আবার তখন থেকে মধুও মাইকেলে পরিণত হন এবং খিদিরপুরে তাঁর বাসের পর্ব চুকে যায়। সুতরাং রঙ্গলাল কবির কতোটা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, অথবা তাঁদের মধ্যে কতোটা যোগাযোগ ঘটেছিলো, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ১৮৬০ সালের আগে পর্যন্ত মধুর কোনো চিঠিতে রঙ্গলালের কোনো উল্লেখও দেখতে পাইনে। হতে পারে, রঙ্গলালরা তাঁদের বাল্যবয়সে মাঝেমধ্যে কলকাতায় বড়ো মামার বাড়িতে বেড়াতে আসতেন এবং প্রতিবেশী হিশেবে তখন মধুর সঙ্গে রঙ্গলালের পরিচয় হয়। রঙ্গলাল এবং তাঁর বড়ো ভাই গণেশচন্দ্র আর ছোটো ভাই হরিমোহন মধুর মাকে যে মা ডাকতেন, সেটাও ১৮৪৩ সালের পরের ঘটনা হওয়াই সম্ভব। তার অল্প আগে তাঁদের মা মারা যান। অন্য দিকে জাহ্নবী দেবীও ১৮৪৩ সালের ফেব্রুআরি থেকে বস্তুত তাঁর একমাত্র পুত্রকে হারান। সুতরাং উভয় পক্ষের জন্যেই এই মা-পাতানো পারস্পরিক সান্ত্বনার কারণ হয়েছিলো।

যে-রোম্যান্টিক কবিদের মধু মনে মনে পুজো করতেন, তাঁদের সঙ্গে তুলনা করলে তিনি কবি হয়েছেলেন বেশ পরিণত বয়সে। বায়রন অথবা শেলির কবিতা বয়ঃসন্ধি কালেই প্রকাশিত হয়েছিলো।[৮১] মধু যে তাঁর জীবনের প্রথম ন-দশ বছর গ্রামে কাটিয়েছিলেন এবং তারপর সেই শিকড় কেটে নতুন করে কলকাতার শক্ত মাটিতে শিকড় গেড়েছিলেন, তার জন্যে তাঁর হয়তো কিছু বাড়তি

সময় নষ্ট হয়েছে। নয়তো মধুর মন কম বয়সেই পরিণতি লাভ করেছিলো। নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর কবিজীবনের গোড়া পত্তন হয়েছিলো হিন্দু কলেজে এবং, আগেই লক্ষ্য করেছি, তাতে সবচেয়ে বড়ো অবদান রেখেছিলেন রিচার্ডসন। তা ছাড়া, হিন্দু কলেজে যা পড়ানো হতো এবং যাঁরা এসব বিষয় পড়াতেন তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি এবং ঝোঁক — উভয়ই এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী।

কেবল সাহিত্যরুচি নয়, মাইকেলের গোটা মানস-গঠনে হিন্দু কলেজ পর্ব ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জীবনের, বলতে গেলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে চিরকেলে প্রথা এবং রীতির বিরোধিতা করেছেন। তাঁর কয়েক বছর আগেকার ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃস্টান হয়ে হিন্দু সমাজে আলোড়ন তুলেছিলেন।[৮২] রসিককৃষ্ণ মল্লিক শপথ নিতে গিয়ে বলেছিলেন, তিনি গঙ্গাজলের পবিত্রতা মানেন না।[৮৩] মাধবচন্দ্র মল্লিক *হরকরা* পত্রিকায় চিঠি লিখেছিলেন এই বলে যে, তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা যদি অন্তর থেকে কিছু ঘৃণা করেন, তা হলে সেটা হলো হিন্দু ধর্ম।[৮৪] খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত মধু তেমন গুরুতর অথবা চাঞ্চল্যকর কিছু না-করলেও নিজস্ব ভঙ্গিতে তিনিও কম বিদ্রোহী ছিলেন না। বস্তুত, তাঁর নানা আচরণে প্রচলিত রীতির বিরোধিতা দেখতে পাই। পরিবারের কাছ থেকে তিনি যে-অতিরিক্ত আদর এবং প্রশ্রয় পেয়েছিলেন, তা এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলো। কিন্তু তা-ই একমাত্র কারণ নয়।

একটি ঘটনার কথা শোনা যাক, গৌরদাসের স্মৃতিচারণ থেকে। গৌরদাসের সঙ্গে বেশ ভাব হবার পরে মধু অনেক সময়ে যেতেন বড়োবাজারে তাঁদের বাড়িতে (২ নম্বর বসাক লেন)।[৮৫] এ পর্যায়ে তিনি একদিন গৌরকে তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। সেই প্রথম। তাঁর সঙ্গে ভোলানাথ চন্দ্র। সেজেগুজে গৌরদাস সেখানে হাজির হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা আঘাত পেয়ে মুহূর্তের জন্যে পিছিয়ে যান। তিনি এবং ভোলানাথ সেখানে গিয়ে দেখেন, রাজনারায়ণ দত্ত আলবোলা টানছেন। তাঁর টানা শেষ হবার পরে তিনি নলটা এগিয়ে দিলেন মধুর দিকে। তারপর মধুও তৃপ্তির সঙ্গে তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।[৮৬] ১৮৪০-এর দশকে গুরুজনের সামনে ধূমপানের প্রতি মূল্যবোধ কতোটা কঠোর ছিলো, সঠিকভাবে বলা শক্ত। তবে গত শতাব্দীর শেষ দিকে ধূমপান না-করা ভালো চরিত্রের লক্ষণ এবং গুরুজনদের সামনে ধূমপান না-করা ভব্যতার অঙ্গ বলে বিবেচিত হতে আরম্ভ করে। (ব্রাহ্মদের প্রভাব হওয়া অসম্ভব নয়।) হতবাক গৌরদাস পরে মধুকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে মধু বলেন যে, তাঁর পিতা অন্য অভিভাবকদের মতো এসব তুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠানের ধার ধারেন না।[৮৭]

অনেকে বলেছেন, মধু সেই বয়স থেকে রাতে ঘুমানোর আগে এক পাত্র মদও খেতেন। তাঁর অন্যতম বন্ধু বঙ্কুবিহারীও এ রকমের সাক্ষী দিয়েছেন।[৮৮] কিন্তু এ কথা ঠিক নয় বলেই মনে হয়। অন্তত এ উক্তির মধ্যে অতিরঞ্জন আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মধু পরে মদ্যপায়ী হিশেবে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন, ধারণা করি, সে জন্যে তাঁর বন্ধু এবং জীবনীকারেরা পরে তাঁর মদ্যপান সম্পর্কে অনেক কথাই কল্পনা করে নিয়েছেন বা বাড়িয়ে বলেছেন। ১৮৪২ সালের অক্টোবর মাসে গৌরদাস বসাককে নৌকোয় ভ্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে মধু একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি লেখেন যে, গৌরদাস সঙ্গে করে উদার-মনা বন্ধুদের আনতে পারেন। [অন্যদের নয়।] কারণ তিনি এই প্রথমবারের মতো সুরা-দেবের পূজা করতে চান।[৮৯] মোট কথা, মধুসূদন হিন্দু কলেজে থাকতেই মদ্যপান করা শুরু করেছিলেন। কিন্তু রোজ রাতে ঘুমানোর আগে এক পাত্র মদ্যপান করতেন — এ কথা অভ্রান্ত বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, মদ্যপান করাকে এখন যতোটা অসাধারণ বলে বিবেচনা করা হয়, সে সময়ে তা তেমন মহাভারত-বিধ্বংসী বলে গণ্য হতো না। বরং, সেকালে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে মদ খাওয়া ব্যাপকভাবে চালু ছিলো। একে অপরাধ মনে না-করে অনেকে একে বিবেচনা করতেন চলতি

হাওয়ার পন্থা বলে। অনেকে আবার মনে করতেন যে, মদ খাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রাচীন সমাজের সঙ্গে তাঁদের বন্ধন, বিশেষ করে রক্ষণশীল মূল্যবোধের শিকল কাটিয়ে উঠতে পারবেন।[১০] বস্তুত, অনেকের কাছে মদ্যপান ছিলো পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মতোই উদারনৈতিকতার প্রতীক। পরে *মদ্যপান নিবারণী সভার* পৃষ্ঠপোষক হলেও, রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন। এর দরুন তিনি পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং কলেজের লেখাপড়া পুরোপুরি শেষ হবার আগেই বাধ্য হন কলেজ ছাড়তে। পরিমিত মদ্যপানের শিক্ষা দেবার জন্যে তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রোজ সন্ধ্যে বেলায় মদ এবং মাংস খেতেন। কিন্তু পিতার সঙ্গে দু গ্লাস শেরি খেয়ে রাজনারায়ণের তৃপ্তি হতো না। সে জন্যে তিনি পিতাকে না-জানিয়ে অন্যত্রও মদ খেতেন। ১৮৪৬ সালে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নেবার সময়ে পুরোনো মূল্যবোধ মুছে ফেলার প্রতীক হিশেবে তিনি বিস্কিট আর মদ খেয়েছিলেন।[১১] খৃষ্টান এবং মুসলমানদের তৈরি বলে বিস্কিট খাওয়াও সেকালে মদের মতো গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হতো।

ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং রামমোহন রায় রোজ পরিমিত পরিমাণে মদ খেতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪০-এর দশকে মহর্ষি বলে পরিচিত না-হলেও, তিনিই ধর্মীয় উৎসাহ এবং আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্রাহ্ম মূল্যবোধ প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনিও নিয়মিত মদ খেতেন। ১৮৫১ সালে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাবে তিনি মদ না-খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[১২] তখনকার বিখ্যাত লোকদের মধ্যে অনেকে মাত্রাতিরিক্ত মদ খেয়ে অকালে মারা যান। এঁদের মধ্যে হরিশ মুখার্জি, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।[১৩] ইংরেজি শিক্ষিত তরুণরা মদ্যপানকে কোন দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন, মাইকেলের *একেই কি বলে সভ্যতায়* তার চমৎকার ছবি দেখতে পাওয়া যায়।[১৪] রাজনারায়ণ বসুও এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

> তখন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক পুরুষ পূর্বে যুবকেরা মদ্যপান করিত না — কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল; গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এইসব রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।[১৫]

আগেই বলেছি, রাজনারায়ণ বসু মধুর সহপাঠী হলেও কলেজ-জীবনে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। উঠলে, যে-গোলদিঘিতে বসে রাজনারায়ণ মদ খেতেন, মধুকেও হয়তো সেখানে তিনি সঙ্গী হিশেবে পেতেন। কিন্তু মদ্যপানের প্রতি মধুর মনোভাব যেমনই হোক না কেন, রাজনারায়ণ বেশ্যাদের প্রতি কলেজের ছাত্রদের অনাসক্তির যে-মনোভাব প্রকাশ করেছেন,[১৬] তা মধুসূদন সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য।

রাজনারায়ণ দত্তের পরিবার শাক্ত ছিলেন কিনা, জানিনে, কিন্তু মাংসে তাঁদের বেশ রুচি ছিলো। মধু বাল্যকাল থেকে মাংস খেতে শিখেছিলেন। গৌরদাসকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে দেখতে পাই, তিনি পরের দিন তাঁকে নিয়ে নৌকা-ভ্রমণে যাবার সময়ে সঙ্গে করে বিস্কিট আর পাঁঠার মাংসের প্যাটিস নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছেন।[১৭] মনে হয়, বন্ধুকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি এই খাবারের নাম উল্লেখ করেছিলেন। গৌরদাস বসাক ছিলেন বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। বন্ধুদের মধ্যে মাংস খাবার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা তাঁকেও প্রভাবিত করেছিলো। মধুর বাড়িতে তিনি প্রথম পাঁঠার মাংস খান এবং, নিজেই লিখেছেন যে, তা তাঁর খুব ভালো লেগেছিলো।[১৮] ভোলানাথ চন্দ্রও জাহ্নবী দেবীর রান্না-করা পাঁঠার মাংসকে মাংসের রাজা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।[১৯] বঙ্কুবিহারীও মধুদের বাড়িতে মাংস

খেয়েছেন। তা ছাড়া, কলেজের কাছে এক রেস্তোরাঁয় মধু তাঁকে মোরগ আর পাঁঠার মাংস খাওয়াতেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[১০০] হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্রই — রাজনারায়ণ বসুও — গোমাংস খেতে আদৌ অপছন্দ করতেন না। *আত্মচরিতে* রাজনারায়ণ বসু বর্ণনা দিয়েছেন যে, তর সইতো না বলে তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা কলেজের গেট দিয়ে না-বেরিয়ে কলেজের দেয়াল টপকে কাবাব কিনতে যেতেন।[১০১] মধুও সে বয়সে নিষিদ্ধ মাংস খাওয়া আরম্ভ করেছিলেন কিনা, জীবনীকারেরা সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। তবে মনে হয়, কেবল পানীয় এবং বিস্কিটের প্রতিই নয়, অন্য খাদ্যের প্রতিও তাঁর মনোভাব বেশ উদার ছিলো।

মধু যে পিতার সঙ্গে একত্রে হুঁকো খেতেন, তা থেকে গুরুজনদের প্রতি তাঁর মনোভাব খানিকটা বোঝা যায়। তিনি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন, তা বলা না-গেলেও, তিনি যে গুরুজনদের সম্পর্কে প্রচলিত অনেক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে শেখেননি, তার বেশ আভাস পাওয়া যায়। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর বিয়ের আয়োজন করা হলে গুরুজনদের আদেশ এবং মাতার অশ্রু অগ্রাহ্য করে তিনি যে নিজের পথে পা বাড়িয়েছিলেন, সেই সম্ভাবনার বীজ আসলে তাঁর মধ্যে অনেক আগেই বপন করা হয়েছিলো। বস্তুত, আচার-আচরণে, পোশাকে-আশাকে তিনি বহু প্রথাই ভঙ্গ করেছিলেন। নতুন কায়দায় অথবা ফিরিঙ্গিদের মতো তাঁর চুল ছাঁটার কথা তাঁর বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণের দৌলতে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে।[১০২] বিশেষ করে এক মোহর দিয়ে চুল ছাঁটানোর কথা। পোশাকেও তিনি ছিলেন অনৈতিহ্যিক। প্রথমে ধুতি পরলেও ক্রমে তিনি আচকান এবং পরে কোট-প্যান্টালুন পরতে আরম্ভ করেন। তাঁর বন্ধুদের স্মৃতিচারণ থেকে মনে হয়, হিন্দু কলেজের কোনো ছাত্র তাঁর আগে পাশ্চাত্য পোশাক পরেননি।[১০৩]

প্রসঙ্গত বিয়ে এবং নারী সম্পর্কে সেকালের প্রথা-বিরুদ্ধ তাঁর রোম্যান্টিক মনোভাবের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যে-সময়ে নারীদের গণ্য করা হতো নিতান্ত ভোগের সামগ্রী এবং প্রায় জড় পদার্থ হিশেবে, মধু সে সময়েই তাদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর এই মনোভাবের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়, রচনা-প্রতিযোগিতা উপলক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তিনি যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা থেকে। ১৮৪২ সালে তিনি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন রামগোপাল ঘোষ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটি রচনার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই প্রতিযোগিতায় তাঁর এই প্রবন্ধটি সবচেয়ে ভালো বলে বিবেচিত হয় এবং তিনি এর জন্যে স্বর্ণপদক পান। তাঁর বন্ধু ভূদেব পেয়েছিলেন রৌপ্যপদক। মা শিক্ষিত না-হলে সন্তানকে শিক্ষিত করা কঠিন হয় — এ যুক্তি সবারই জানা এবং মধুও তা লিখতে ভুলে যাননি। কিন্তু বিশেষভাবে তিনি যা লিখেছিলেন, তা হলো:

> Extensive dissemination of knowledge amongst women is the surest way that leads a nation to civilization and refinement,... The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete... In India ... women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men.... The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed they cannot know, until civilization shows them the way to attain it.[১০৪]

মেয়েদের শিক্ষা দেওয়াকে তিনি গণ্য করতেন সভ্যতার প্রতীক এবং পারিবারিক জীবনকে আরও উপভোগ্য করে তোলার পূর্ব-শর্ত হিশেবে। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মহিলারা পুরুষদের যথার্থ জীবন-সঙ্গিনী এবং আত্মার দোসর হয়ে উঠবেন। রমণীরত্ন যে বোখারা আর সমরখন্দের সমস্ত রত্ন এবং অলঙ্কারের চেয়েও বেশি মূল্যবান, ফারসি কবির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।[১০৫] তাঁর বন্ধুরা, এমন কি, তাঁর মা বলেছেন, তিনি নাকি মনে

করতেন, বাঙালি মেয়েরা সৌন্দর্য অথবা গুণের দিক দিয়ে ইংরেজ মেয়েদের এক শো ভাগের এক ভাগও নয়। বাঙালি মহিলারা অশিক্ষিত বলে তাঁদের সঙ্গে স্বামীদের সম্পর্ক, তাঁর মতে, কখনোই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। আমরা পরে দেখতে পাবো, এ কেবল তাঁর রচনার কথা নয়, এই বক্তব্য তিনি বিশ্বাস করতেন মনেপ্রাণে।

গৌরদাস বলেছেন যে, মধু প্রথম দৃষ্টিতে প্রেমে পড়ার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।[১০৬] অন্যের পছন্দ করা কোনো মেয়েকে তিনি বিয়ে করবেন না এবং প্রেম করে বিয়ে করবেন — তাঁর এই আদর্শ অবশ্য স্বদেশের মাটিতে প্রোথিত ছিলো না। সেকালের লোকেরা অভিভাবকের পছন্দ করা বালিকাকে বিয়ে করেই সুখী হতেন। তা ছাড়া, কুলীনকন্যা অথবা অন্য কোনো সমস্যা-আক্রান্ত মেয়ে ছাড়া, সাধারণত সব মেয়েরই বিয়ে হয়ে যেতো দশ-বারো বছর বয়স হবার মধ্যে। সে জন্যে কোর্টশিপের ধারণা ছিলো একেবারে অবাস্তব। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মধু সেই কোর্টশিপের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তিনি যে-সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের জীবনী পড়েছিলেন, সেখানেই খুঁজে পেয়েছিলেন এই আদর্শ। পরে এ সম্পর্কে আমরা আরও বিস্তারিত দেখতে পাবো।

আগেই লক্ষ্য করেছি, মধু ছিলেন রিচার্ডসনের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। তবে কেবল ভালো ছাত্র বলে কলেজের অধ্যক্ষ তাঁকে স্নেহ করতেন না। ভালো ছাত্র কলেজে আরো ছিলেন। কিন্তু মধুর মধ্যে তিনি যে-কবিত্ব এবং প্রতিভার স্বাক্ষর দেখতে পেয়েছিলেন, তেমন অন্য কারো মধ্যে প্রত্যক্ষ করেননি। পরে আমরা দেখতে পাবো, মধুর প্রকাশিত একটি দেয়াল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রিচার্ডসন এই বিশেষ স্নেহের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি রিচার্ডসনের এই স্নেহের কথা তিনি ভালো করে জানতেন এবং সে কারণে শিক্ষকের প্রতি তাঁর যে-কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা ছিলো, তা সাহিত্যের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকেও জোরদার করেছিলো। তাঁর বন্ধুরা সাহিত্য পড়তেন, কিন্তু মধু সাহিত্যকে তাঁর নিজের জীবনে স্বীকরণ করতে চেষ্টা করতেন। তখন হিন্দু কলেজে যে-সাহিত্য পড়ানো হতো, তা-ও ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিচিত্র। সে কারণে, তরুণ মধু নানা স্বাদের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন।

কিন্তু তখন সাহিত্যের যে-শাখা তাঁর হৃদয় হরণ করেছিলো, তা হলো রোম্যান্টিক কবিদের রচনা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে আরম্ভ করে ক্যাম্পবেল পর্যন্ত নাম-করা সব রোম্যান্টিক কবির রচনা তিনি পড়েছিলেন। আগেই যেমনটা বলেছি, এঁদের মধ্যে বায়রনই ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। ধীরে ধীরে কীটস, মূর এবং স্পেনসরও তাঁকে আকৃষ্ট করেন। তাঁর সহপাঠীদের বেশির ভাগ রিচার্ডসনের সংকলন থেকে রোম্যান্টিক কবিদের কবিতা পড়ে সন্তুষ্ট হতেন; কিন্তু তিনি কেবল তাঁদের রচনা পাঠ করে খুশি হতেন না, জানতে চাইতেন তাঁদের জীবনের কথা। তা ছাড়া, নিজের জীবনে তাঁদের অনুকরণ করতেন সজ্ঞানে। যেমন রিচার্ডসনকে তিনি ভালোবাসতেন বলে তাঁর হাতের লেখাটিও তিনি অনুকরণ করতে চেষ্টা করতেন — যদিও রিচার্ডসনের হাতের লেখা আদৌ ভালো ছিলো না।[১০৭] তখনো পর্যন্ত বায়রন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি। সে জন্যে, কেবল তাঁর কবিতা পড়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বায়রনের জীবনের সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছিলেন। টমাস মূরের লেখা বায়রন-জীবনী (*Letters and Journals of Lord Byron, 1830*. ১৮৪০ সালের আগেই এ বই-এর চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো, ধারণা করি, মধু কিনেছিলেন ১৮৩৮ সালের সংস্করণ — খুব ছোটো হরফে ছাপা ৭৩৫ পৃষ্ঠার বই।) কিনে তিনি কী আগ্রহের সঙ্গে তা পড়েছিলেন, গৌরদাসকে লেখা একাধিক চিঠি থেকে তা বোঝা যায়।[১০৮] বায়রনের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ ধ্রুপদী সাহিত্যে তাঁর ভালোবাসা জন্মানোর পর অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছিলো; তবু রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে বায়রনের প্রতিই

তাঁর ভালোবাসা সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো। হিন্দু কলেজে ভর্তি হবার আগে তিনি একাধিক ধ্রুপদী ভাষার সঙ্গে সামান্য পরিচিত হলেও, ১৮৪১-৪২ সাল পর্যন্ত ধ্রুপদী সাহিত্যে আগ্রহ দেখাননি। শেকসপীয়রের রচনাও পাঠ্য ছিলো, কিন্তু তা তখন পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত, হৃদয়ের সঙ্গে নয়।

মধু ভালো ছাত্র হিশেবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং এ-ও একটা কারণ যার জন্যে তিনি বাবা-মার কাছে বাড়তি প্রশ্রয় লাভ করেছিলেন। ইতিপূর্বে দেখা গেছে, তিনি ১৮৪১ সালের শেষ দিকে পঞ্চম শ্রেণী থেকে পরীক্ষা দিয়ে কেবল বৃত্তি লাভ করেননি, সেই সঙ্গে দুটি ধাপ ডিঙিয়ে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরে রাজনারায়ণ দত্ত এবং জাহ্নবী দেবী উভয়ই নিশ্চয় অনেক স্বপ্নের জাল বুনেছিলেন। তাঁকে নিয়ে তাঁর বাবার কতো গর্ব ছিলো, পরের অধ্যায়ে তাঁর সোনার পদক প্রাপ্তি উপলক্ষে আমরা তা লক্ষ্য করবো। সেকালে পরিবারের আয়তন বহু ক্ষেত্রে এখনকার তুলনায় অনেক বড়ো হতো। তাঁদের যে আরও কয়েকটি সন্তান ছিলো না, সে জন্যে রাজনারায়ণ এবং জাহ্নবী দেবীর হয়তো মনে মনে দুঃখ ছিলো। কিন্তু তাঁরা নিজেদের মনকে নিশ্চয় এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে থাকবেন যে, মধু তাঁদের সোনার টুকরো ছেলে। এমন ছেলে একাই তাঁদের বংশই কেবল টিকিয়ে রাখতে পারবে না; বরং সে তাঁদের মুখও উজ্জ্বল করতে সমর্থ হবে। তাঁরা হয়তো কল্পনা করেছেন, লেখাপড়া শেষ করে মধু সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করবে। তার জন্যে একটি টুকটুকে লাল বৌ নিয়ে আসবেন তাঁরা। কিন্তু তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, তাঁদের একমাত্র সন্তান একদিন থেকেও থাকবে না — সরে যাবে তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে।

*

মধু কখন থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন, ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁর বয়স ১৭ হবার আগেই — এটা অনুমান করা সম্ভব। ১৮৪১ সালের তারিখ দেওয়া তাঁর সাতটি কবিতা পাওয়া গেছে। তাঁর যেসব কবিতায় কোনো তারিখ দেওয়া নেই, সেসবের মধ্যেও কতোগুলো এ বছরে লেখা। ১৮৪২ সালের তারিখ দেওয়া কবিতার সংখ্যাও সাত। এসব কবিতায় ভাষা, ছন্দ এবং আঙ্গিকের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে অবশ্যই মনে হয় যে, এর বেশ কিছু কাল আগে থেকে তিনি কবিতা লেখা আরম্ভ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৮৪১ সালে লেখা তাঁর বহু-উদ্ধৃত একটি কবিতার কথা এখানে বলা যায়:

I sigh for Albion's distant shore,
Its valleys green, its mountains high;
Tho' friends, relations, I have none
In that far clime, yet, oh! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory, or a nameless grave!

*

My father, mother, sister, all
Do love me and I love them too,
Yet oft the tear-drops rush and fall
From my sad eyes like winter's dew.
And, oh! I sigh for Albion's stand
As if she were my native land.

অ্যালবিয়নের যে-দেশের জন্যে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন অথবা অশ্রু বিসর্জন করেছেন, সে দেশে উঁচু কোনো পর্বত নেই, ভারতবর্ষ থেকে সে দেশে যেতে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ অ্যাটলান্টিক পাড়ি দেবারও

কোনো দরকার নেই, এমন কি ঘরে তাঁর কোনো ভগ্নীও তাঁর জন্যে চোখের জল ফেলছিলেন না, কিন্তু এসব সত্ত্বেও এ কবিতায় কবিত্বের অথবা আবেগের কোনো অভাব নেই। বোঝা যায়, এই পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্যে কিশোর কবিকে অনেক সাধনা করতে হয়েছে। অনুমান করি, তিনি এর অন্তত দু বছর আগে থেকে কবিতা লিখে হাত মক্স করছিলেন।

তাঁর কৈশোরক কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উচ্ছ্বাস এবং গীতলতার প্রাচুর্য। এ পর্যায়ে তিনি কোনো নীলনয়নাকে বাস্তবে ভালোবাসার সুযোগ পাননি — ভালোবাসা জানাতে পেরেছিলেন একমাত্র গৌরদাস বসাককে। তবু বার বার তাঁর 'aching heart' নিয়ে তিনি অজানা নীলনয়নার স্বপ্ন দেখেছেন এবং অবাস্তব সেই স্বপ্নকেই প্রেম নিবেদন করেছেন। শেলি ষোলো-সতেরো বছর বয়সে তাঁর সমবয়সী জ্ঞাতি বোন হ্যারিয়েটকে দেখে ভালোবেসেছিলেন। তবে তাঁর কাছ থেকে তেমন অনুকূল সাড়া না-পেয়ে তাঁর সেই ভালোবাসা তখন প্রণয়ে পরিণত হতে পারেনি। কিন্তু হ্যারিয়েট শেলিকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁকে লক্ষ্য করে কবিতা লিখলে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। বেচারা মধু দূর থেকেও তেমন কাউকে পাননি, যাকে লক্ষ্য করে তাঁর কবিতাগুলো লিখতে পারেন। অনেক কবিতাই তিনি উৎসর্গ করতেন গৌরদাসের নামে। তাই তিনি যখন লেখেন:

My thoughts, my dreams, are all of thee,
Though absent still thou seemest near;
Thine image everywhere I see -
Thy voice in every gale I hear.

তখন তাকে নিতান্ত অসার ভাবোচ্ছ্বাস বলে বিবেচনা করতে হয়। কেবল একটি জিনিশকে এর মধ্যে খাঁটি বলে মনে হয়, সে তাঁর উপচে-পড়া ভাবাবেগ। অন্য-একটি কবিতায় তিনি বলেছেন:

I loved a maid, a blue-eyed maid,
As fair a maid can e'er be, O

*

For her I sighed, and e'er shall sigh'
Tho' she shall ne'er be mine, O

তাঁর একেবারে গোড়ার দিকের কবিতায় কখনো নীলনয়না, কখনো পেনিলোপি, কখনো কাব্যলক্ষ্মীর কথা ভেবে তিনি মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। এই কবিতাগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটিতে তিনি অনির্দিষ্ট কোনো "কুমারী"র উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করেছেন। একটিতে তার সঙ্গে মিলনের কথাও বলেছেন:

When I gladly met her beneath yon almond tree ...
There I kissed and embraced her; - and oh! who can tell
What passions tumultuous did in my bosom swell!

কিন্তু তাঁর কৈশোরক কবিতায় বাল্যপ্রেমের উচ্ছ্বাস ছাড়া বাকি সব কিছু নীহারিকার মতো অবয়বহীন। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতায় অবশ্য পরিণতি দেখা দিয়েছে। ১৮৪৩ সাল নাগাদ তিনি King Porus-এর মতো কবিতাও রচনা করেছেন। ছটি অনুচ্ছেদ বিভক্ত ১৪০ পঙক্তির এই কবিতাটি তখন পর্যন্ত তাঁর লেখা সবচেয়ে লম্বা কবিতা। প্রথম এবং শেষ অনুচ্ছেদ দুটি একই ধরনে সাজানো এবং মাঝখানের চারটি অনুচ্ছেদ ভিন্ন ধরনের। কবিতাটি তিনি কি তাঁর ধর্মান্তরের আগে লেখেন, না পরে, তা সঠিক করে জানা যায় না। এ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিলো ঐ বছরের (১৮৪৩) *Literary Gleaner* পত্রিকায়।[১০৯] গোড়াতে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন ছোটো ছোটো লিরিক দিয়ে। রিচার্ডসন বিশেষ করে লিরিক পছন্দ করতেন। ন্যারেটিভ বা আখ্যানমূলক কবিতায় তাঁর তেমন রুচি

ছিলো না। রিচার্ডসনের প্রভাবে তিনি প্রথমে লিরিক কবিতা লিখতে শুরু করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর কবিতায় গল্পের বীজ দেখা দিতে আরম্ভ করে। এবং এ ধরনের কবিতায় কিশোর-কবি তুলনায় বেশি দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রথম দিকের কবিতায় বস্তুর অভাবে থাকতো প্রধানত দুঃখবিলাস, দীর্ঘনিশ্বাস, বিস্ময় এবং প্রেমের জন্যে বয়ঃসন্ধি কালের হা-হুতাশ। কাহিনীমূলক কবিতা লিখতে শুরু করার পরে, তাঁর কবিতায় দেখা দিলো যৎকিঞ্চিৎ বস্তু। রিচার্ডসনের প্রভাবও ততোদিনে তিনি খানিকটা কাটিয়ে উঠেছিলেন।

King Porus কবিতায় আমরা তাঁর আর-একটা বৈশিষ্ট্য নির্ভুলভাবে লক্ষ্য করি। সে হলো: তাঁর দেশপ্রেম। তিনি পাশ্চাত্যের দারুণ ভক্ত ছিলেন — ১৮৪১ সালে অ্যালবিয়নের দেশকে তাঁর স্বদেশ বলেই বিবেচনা করেছেন — As if she is my native land — কিন্তু দু বছরের মধ্যে King Porus-এ তাঁর বক্তব্য অনেকাংশে পাল্টে গেছে

But where, oh! Where is Porus now?
Where the noble hearts that bled
For Freedom - with the heroic glow
In patriot-bosoms nourish'd -...
And where art thou - fair Freedom! - Thou -
Once goddess of Ind's sunny clime!

মধুর স্বদেশ ভাবনা এবং দেশপ্রেম তাঁর রোম্যান্টিকতার মতো একেবারে আন্তরিক। তবে তিনি যে-কালে এ কবিতা লেখেন, তখনো ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়নি অথবা জাতীয়তাবাদ জনপ্রিয় হবার মতো সময় হয়নি। সে জন্যে, তাঁর বলার ভঙ্গি আলাদা। তা সত্ত্বেও স্বদেশকে নিয়ে তাঁর গর্ব এবং স্বদেশের প্রতি তাঁর প্রেমকে চিনে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয়। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর এই স্বদেশ- এবং স্বাধীনতা-প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিলো। তা ছাড়া, তিনি যখন স্বদেশের অথবা স্বদেশ-প্রেমের কথা লিখেছেন, তখন তাঁর কবিতায় সাবলীল ভঙ্গিতে তেজ এবং বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে। King Porus-এ তিনি যে-স্বতঃস্ফূর্ততা এবং আন্তরিকতা প্রকাশ করেছিলেন, তা কয়েক বছরের মধ্যে আরও পরিণতি লাভ করেছিলো তাঁর প্রথম কাব্য — *The Captive Ladie*-তে।

১৮৪১ সালের শেষ দিকে তাঁর আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো: একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ। আত্মপ্রকাশের বাসনা কমবেশি সবারই থাকে। তাঁরও ছিলো। তাঁর পরবর্তী জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, বারবার তিনি স্বীকৃতি এবং প্রশংসার জন্যে কাঙালপনা ব্যক্ত করেছেন। বায়রন-জীবনীর মতো শেলির কোনো জীবনীও তিনি সেই বয়সে পড়েছিলেন কিনা, তা জানা নেই। কিন্তু পত্রপত্রিকায় অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগেই শেলি তাঁর পিতামহের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতরণের জন্যে নিজের এবং তাঁর বোনের কবিতা ছাপিয়েছিলেন।[১১০] মধু যে-কালে তাঁর কবিতার কোনো প্রকাশক পাননি, সে সময় নিজেই একাধিক কবিতা ছাপিয়ে দেখতে কেমন লাগে, তা পরীক্ষা করে দেখেছেন।[১১১] ধারণা করি, বন্ধুদেরও দিয়েছেন দেখতে। হাতের লেখা পত্রিকা তাঁর সেই আত্মপ্রকাশের একটা বাহন হয়ে দাঁড়ায় এবং সেদিক দিয়ে তা তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই পত্রিকা টিকে ছিলো মাত্র তিন-চার মাস। তবু তার মধ্যে তিনি উপরের ক্লাসের ছাত্রদের ঈর্ষা এবং কলেজের অধ্যক্ষ — ডিএলআর-এর প্রশংসা আকর্ষণ করেছিলেন। এই পত্রিকাটি নামে এজমালি পত্রিকা হলেও, এর মধ্যে বারো আনাই থাকতো তাঁর রচনা। রিচার্ডসন এ পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা পড়ে দেখতেন এবং তাতে পত্রিকার প্রধান লেখক এবং সম্পাদক — তরুণ মধু বিশেষ করে উৎসাহ বোধ করতেন। রিচার্ডসন অনেক সময়ে মধুর কবিতা সংশোধনও করে দিতেন এবং

তাঁর ভাষা, ছন্দ ও কবিতার ভাব কী করে উন্নত করতে হবে সে সম্পর্কে উপদেশ দিতেন।

ভবিষ্যতে মধু বড়ো কবি হতে পারেন – এ কথা বলে এ সময়ে রিচার্ডসন তাঁকে উৎসাহ দিয়ে থাকবেন। এ অনুমানের কারণ এই যে, এর পর থেকে তাঁর কবি হবার বাসনা আগের চেয়েও প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি কবি হবেন, এ কথা তিনি এর আগে বন্ধুদের বলে থাকলেও, তার লিখিত কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু আলোচ্য সময়ে লেখা তাঁর চিঠিতে তিনি যে মহাকবি হবেন, সেই দৃঢ় বিশ্বাস গৌরদাসের কাছে প্রকাশ করেছেন।[১১২] কেবল তাই নয়, তিনি তাঁর জীবনী লেখার দায়িত্বও দিয়েছেন গৌরদাসকে: "আমি যদি বড়ো কবি হই, তা হলে তুমি আমার জীবনী লিখলে আমার কী ভালো লাগবে! আর আমি যদি ইংল্যান্ড যেতে পারি, তা হলে আমি যে বড়ো কবি হবো সে সম্পর্কে আমি প্রায় নিশ্চিত।"[১১৩] মূরের লেখা বায়রন-জীবনী থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন, কিভাবে বায়রন তাঁর বন্ধুকে তাঁর স্মৃতিকথা, ডাইরি এবং চিঠিপত্র দিয়ে গিয়েছিলেন। গৌরদাসকেও তিনি তাঁর জীবনী লেখার উপাদান দিয়ে যাবার কথা ভেবে থাকবেন। রিচার্ডসনের প্রশংসা পেয়ে বড়ো কবি হবার ব্যাপারে তাঁর আত্মবিশ্বাস যে জোরদার হয়েছিলো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেদিক দিয়ে তাঁর এই ক্ষণজীবী পত্রিকার অবদান খুব কম নয়।

১৮৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতার খবর পাওয়া গেলেও যা নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে না, তা হলো ১৮৪১ সালের আগে অন্য কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো কিনা। জীবনীকারেরা বলেছেন যে, তাঁর কবিতা *Calcutta Literary Gazette, Literary Gleaner, Bengal Herald, Oriental Magazine, Comet* ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।[১১৪] যেসব পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো তাদের নাম তিনি নিজের একটি কবিতায়ও উল্লেখ করেছেন। কাব্যদেবী বিদায় নিয়েছেন, এ কথা বলার পর, তিনি তাঁকে আবার শিগগির ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন:

Farewell! But oh! remeber me,
Return before our "Monthlies" all,
The "Gleaner" - "Blossom" - "Comet" tempt
Me, to scribble for them all.

সুরেশচন্দ্র মৈত্রের অনুমান, মধুর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৮৪২ সালের গোড়ার দিকে *Literary Gleaner* পত্রিকায়।[১১৫] এই পত্রিকা ছাড়া, আর কোন কোন পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো অথবা তাঁর মোট কটি কবিতা ১৮৪২-৪৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। কারণ এসব পত্রিকার বেশির ভাগের পুরোনো নথি কোথাও রক্ষিত হয়নি।[১১৬] কিন্তু ১৮৪২ সাল থেকে তাঁর কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। কলেজের দেয়াল টপকে তাঁর কবিতা যখন সদর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো দেয়াল পত্রিকাটিকে তিনি আর তখন আবশ্যিক বলে গণ্য করতে পারেননি। সে জন্যে ১৮৪২ সালের গোড়ার দিকে হাতে লেখা পত্রিকাটি লোপ পায়।

কলকাতার পত্রিকাগুলোতে বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পরে, কয়েক মাসের মধ্যে বড়ো কবি হওয়ার ব্যাপারে তিনি এতো আত্মবিশ্বাস লাভ করেন যে, অক্টোবর মাসের চার তারিখ – মঙ্গলবার, বিলেতের *Blackwood Magazine*-এ প্রকাশের জন্যে তিনি কয়েকটি কবিতা পাঠান। এর কয়েক বছর আগে এই পত্রিকায় মধুর মানসনায়ক রিচার্ডসনের কাব্যের প্রতিকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। কজেই বোঝা যায়, এ পত্রিকার মান সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। তা সত্ত্বেও

তিনি এই পত্রিকায় কবিতা পাঠানোর দুঃসাহস করেছিলেন। কবিতাগুলোর সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদককে তিনি কী লিখেছিলেন, জানা যায় না। কিন্তু এর কদিন পরে তিনি যখন আরও কয়েকটি কবিতা পাঠান বিলেতের *Bently's Miscellany*-তে, তখন যে-চিঠিটি লিখেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সেটি রক্ষা পেয়েছে। এতে তিনি লিখেছিলেন:

> সঙ্গের কবিতা কটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে পাঠাচ্ছি বেশ ভয়ে ভয়ে। কবিযশঃপ্রার্থীদের আপনি যে-রকম সব সময়ে মহানুভবতার সঙ্গে উৎসাহ দেন, তার জন্যেই আমি আপনার কাছে এ কবিতাগুলো পাঠাচ্ছি। মহাশয়, এই মুহূর্তে যশ আমার লক্ষ্য নয়, কারণ ভালো করে জানি আমি যশের উপযুক্ত নই। আমার যা প্রয়োজন তা হলো অনুপ্রেরণা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্রিটিশ জনসাধারণ, যাঁরা দৃশ্যত বদান্যতাপূর্ণ এবং মহান, তাঁরা এক বিদেশীর উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবেন না। আমি একজন হিন্দু, বঙ্গদেশের লোক, কলকাতার হিন্দু কলেজে ইংরেজি পড়ছি। আমার বয়স এখন আঠারো, — আপনার দেশের একজন কবি, কাউপির ভাষায় — "বয়সে না-হলেও, জ্ঞানের দিক দিয়ে একটি বালক মাত্র"।[১১৭]

এই পত্রিকায় তিনি যে-কবিতাগুলো পাঠান, সেগুলো প্রথমে উৎসর্গ করেছিলেন গৌরদাসের নামে। কিন্তু গৌরদাসের নাম কে জানে? সে জন্যে মধুর মনে হলো, কবিতাগুলো একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের নামে উৎসর্গ করলে এগুলোর প্রকাশযোগ্যতা বাড়বে। সুতরাং গৌরদাসের নাম বদল করে ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাম লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু হায়রে দুরাশা! সে কবিতা তবু *Bently* নিলো না। মধু নিশ্চয় ভাবলেন, *Bently* যথার্থ প্রতিভা চিনতে পারলো না।

তিনি যে আশা করেছিলেন, তাঁর ঐ বালসুলভ কবিতা বিলেতের এই বিখ্যাত দুই পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে গৃহীত হবে, এ থেকে বোঝা যায়, নিজের কবিতার মান সম্পর্কে তিনি একটু বেশি আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। অস্বীকার করা যাবে না, নিজের বিষয়ে তাঁর ধারণা সব সময়ে একটু ফাঁপানো ছিলো। বস্তুত, তাঁর চরিত্রের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য নিজেকে অন্যের তুলনায় বড়ো মনে করা। নিজের কবিতা সম্পর্কে এই উচ্চধারণা তাঁর অহংবাদী মনোভাবের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর পরবর্তী জীবনের নানা ঘটনা থেকেও সেটা আমরা বার বার লক্ষ্য করতে পারবো। কিন্তু বিলেতের পত্রিকায় কবিতা পাঠানোর ব্যাপারটাকে কেবল তাঁর অহমিকার প্রকাশ বলে মনে করা ঠিক হবে না। সৃষ্টির আনন্দে তিনি তখন উচ্চকিত। তাঁর সেই আনন্দ এবং তৃপ্তি কোনো মহাকবির চেয়ে কম ছিলো না। নিজের রচনাকে তিনি স্বভাবত দেখেছেন খানিকটা পাঠকের চোখ দিয়ে, কিন্তু বেশির ভাগটাই দেখেছেন, নিজের মনের মধ্যে ভাবের যে-বান ডেকেছিলো, তাতে ভাসতে ভাসতে। তাঁর কবিতা এই দুই পত্রিকায়, বলা বাহুল্য, প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু আত্মপ্রকাশের এবং স্বীকৃতি লাভের স্বপ্ন তিনি যে প্রথম যৌবন থেকে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন, তা এ ঘটনা থেকে একেবারে স্পষ্ট করে দেখা যায়।

বড়ো কবি হবার জন্যে তাঁর ইংল্যান্ডে যাওয়া দরকার — মধু এই ধারণা কোথায় এবং কখন পেয়েছিলেন, তা বলা সহজ নয়। অ্যালবিয়ন-তীরের জন্যে তিনি হা-পিত্তেশ করে কবিতা লিখেছিলেন ১৮৪১ সালে। তা থেকে মনে হয়, তার আগে থেকেই তিনি বিলেত যাবার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। ১৮৪২ সালেও একটি কবিতায় তিনি ইংল্যান্ড যাবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। এই কবিতায় তাঁর সে বাসনা এতো প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্বদেশকেও কারাগারের মতো অসহ্য বোধ করেছেন:

> Oft like a sad imprisoned bird I sigh
> To leave this land; though mine own land it be;

স্বদেশের সবুজ প্রান্তর, রংবেরঙের উজ্জ্বল ফুল, মেঘহীন আকাশ সুন্দর নিঃসন্দেহে; কিন্তু তাঁর কাছে

তার আবেদন সামান্যই। কারণ:

> For I have dreamed of climes more bright and free
> Where virtue dwells and heaven-born liberty
> Makes even the lowest happy; - where the eye
> Doth sicken not to see man bend the knee
> To sordid interest: - climes where science thrives,
> And genius doth receive her guerdon meet...
> There let me live and there let me die.

ইংল্যান্ডের রোম্যান্টিক কবিদের নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। নিজেদের রচনা সম্পর্কে তাঁরা আলাপ-আলোচনা করতেন এবং তার ফলে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও হতেন। বায়রন, শেলি, কীট্স, মূর, সাউদি এবং হান্টের যোগাযোগের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে রাখা যেতে পারে। যে-কলকাতায় বসে মধু সাহিত্য রচনা করছিলেন, সেখানে এ রকমের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সে যোগাযোগের ফলে লাভবান হবার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। তিনি কি সে কথা ভেবে বিলেত যাবার পরিকল্পনা করতে থাকেন? তিনি দেশে থাকলে কবি হিশেবে স্বীকৃতি পাবেন না – এই আশঙ্কা অন্তত এই কবিতায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রিচার্ডসন খুব উঁচু দরের কবিতা রচনা করেছিলেন, অথচ সে পরিমাণ স্বীকৃতি পাননি এবং স্বীকৃতি লাভের আশায় তিনি ইংল্যান্ডের রোম্যান্টিক কবিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন – আগেই তা উল্লিখিত হয়েছে। তিনি যে যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়েছেন, সে জন্যে রিচার্ডসন নিজেও কি ছাত্রদের সামনে আপসোস করেননি? করাই স্বাভাবিক। হতে পারে, ডিএলআরের এই হতাশার কথা শুনে মধুর মনে হয়েছিলো যে, ভালো কবিতা তিনি ভারতবর্ষে বসেও লিখতে পারবেন, কিন্তু সত্যিকার কবিযশ পেতে হলে তাঁকে ইংল্যান্ডে যেতে হবে। মনে হয়, এটাই ছিলো তাঁর ইংল্যান্ড যাবার উদগ্র কামনার প্রধান কারণ।

শিবনাথ শাস্ত্রী রিচার্ডসনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, রিচার্ডসন ভাববিহ্বল হয়ে সাহিত্য পড়াতেন। তাঁর পড়ানো শুনে তাঁর ছাত্ররা এতো প্রভাবিত হতেন যে, তাঁরা মনে করতেন, শেকসপীয়রের মতো বড়ো কবি আর নেই, ইংরেজি সাহিত্যের মতো সাহিত্যও আর নেই। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে, এভাবে তাঁর ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বদেশ থেকে অন্যত্র পরিচালিত হয়।[১১৮] রিচার্ডসনের প্রভাবেও মধুর মনে এ ধারণা হওয়া সম্ভব যে, ভালো কবি হতে হলে তাঁকে অবশ্যই বিলেতে যেতে হবে। তবে কারণটা যা-ই হোক, কবিযশ লাভের স্বপ্নের মতোই তাঁর বিলেত যাবার আগ্রহ ছিলো তাঁর সমগ্র হৃদয়-জোড়া।

তখন অবধি বাঙালিদের জন্যে বিলেত যাবার দৃষ্টান্ত বলতে গেলে ছিলোই না। আঠারো শতকেই বঙ্গদেশ থেকে আয়া এবং ভৃত্য হিশেবে কিছু কিছু লোক বিলেতে গেলেও, শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে কেউই এই দুঃসাহস করেননি। (একমাত্র ব্যতিক্রম মুরশিদাবাদের একজন শিক্ষিত মুসলমান – মীর্জা আবু তালিব খান। তিনি ১৭৯৯ সালে য়োরোপ ভ্রমণে যান। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স-সহ কয়েকটি দেশ তিনি সফর করেছিলেন এবং পরে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন।)[১১৯] ১৮৩০-এর দশকে রামমোহন রায় আর ১৮৪০-এর দশকে দ্বারকানাথ ঠাকুর এই দুঃসাহসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এর মধ্যে রামমোহন স্বধর্ম এবং স্বসমাজত্যাগী বলে বদনাম কিনেছিলেন। আর দ্বারকানাথ ধনী এবং প্রভাশালী ব্যক্তি হিশেবে সমাজের সমালোচনা খানিকটা অবজ্ঞা করতে পারলেও, ঐতিহ্যিক হিন্দু হিশেবে সুনাম অর্জন করতে পারেননি। এমন কি, তাঁর অনৈতিহ্যিক আচরণের জন্যে স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর দেয়ালের ব্যবধান গড়ে উঠেছিলো। মধু কি ভেবেছিলেন? বিলেত যাওয়া তখন খুব ব্যয়সাধ্য

ছিলো। যাঁদের সে রকমের টাকাপয়সা ছিলো, তাঁরাও আবার লোকাচার অমান্য করে কালাপানি পাড়ি দেবার কথা ভাবতে পারতেন না। (এ সম্পর্কে রক্ষণশীল হিন্দুদের মনে প্রবল আপত্তি শতাব্দীর শেষ দিকেও পুরো মাত্রায় বহাল ছিলো। ১৮৯৪ সালেও কালাপানি পাড়ি দিয়ে যাঁরা বিলেত গিয়েছিলেন, তাঁদের জাত রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি কমিটি গঠিত হয়েছিলো।)[১২০] সূর্য (গুডিভ) চক্রবর্তী থেকে আরম্ভ করে যাঁরা তখন বিলেত গিয়েছিলেন, সমাজে তাঁদের পাতক এবং একঘরে হতে হয়েছিলো।[১২১] দেশে ফিরে অনেককেই প্রায়শ্চিত্ত করে স্বসমাজে ফিরে যেতে হয়েছিলো। এক কথায় বলা যেতে পারে, বিলেত যাবার ব্যাপারে মধুর সামনে কোনো দৃষ্টান্ত ছিলো না। তা সত্ত্বেও, এই ধারণা কোথায় পেলেন তিনি? বস্তুত, আজীবন তিনি যে-ঔদ্ধত্য এবং দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর ইংল্যান্ড যাবার ইচ্ছের মধ্যেও সেই মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পাই।

তবে কবি হবার জন্যে সে পর্যায়ে — বোধ হয় সারা জীবনই — তিনি যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে তৈরি ছিলেন। তাঁকে তাঁর বন্ধুরা অনেক সময়ে পোপ বলে ডাকতেন। যে-কবির নাম অনুযায়ী বন্ধুরা তাঁকে এ নাম দিয়েছিলেন, সেই অ্যালেকজান্ডার পোপ এক জায়গাতে বলেছেন: কবিতার জন্যে দরকার হলে আপনজনদের, এমন কি বাবা-মাকেও ত্যাগ করতে হবে। মধু এই উক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন আপ্তবাক্যের মতো ধ্রুব সত্য বলে। বাবা-মা কি তাঁকে বিলেত যেতে দেবেন? এ প্রশ্ন তিনি নিশ্চয় অনেক বারই জিজ্ঞেস করেছেন নিজেকে। এমন কি, মায়ের কাছেও হয়তো পেড়েছেন কখনো কখনো। অবশ্য তিনি ভালো করে জানতেন, বাবা-মা তাঁর সব আবদার মেনে নিলেও তাঁকে সুদূর ইংল্যান্ডে যেতে দেবেন না। সে জন্যে, ইংল্যান্ডে যাবার কথা গোপনে তিনি বন্ধু গৌরদাসের সঙ্গে আলাপ করেন। তাঁর বাবা-মা যে তাঁকে যেতে দেবেন না, গৌরদাস নিশ্চয় তাঁকে সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তার উত্তরে তিনি ১৮৪২ সালের নভেম্বর মাসে পোপের উল্লেখ করে গৌরদাসকে লিখেছিলেন যে, কবিতার কারণে দরকার হলে তিনি বাবা-মাকেও ত্যাগ করতে প্রস্তুত।[১২২] তখনো তিনি জানতেন না, বিয়ে নিয়ে তাঁর জীবনে মস্তো সংকট নেমে আসছিলো। সুতরাং বিলেত যেতে চাওয়ার একমাত্র কারণ তখনো ছিলো কবি হওয়া। বস্তুত, ১৮৪২ সালে তিনি ইংল্যান্ডে যাবার ব্যাপারে মন স্থির করে ফেলেছিলেন। তমলুকে গিয়ে তিনি চিঠিতে গৌরদাসকে লিখেছিলেন: "কোন কুক্ষণেই যে এখানে আসতে রাজি হয়েছিলাম! ... কিন্তু, গৌর, আমার জন্যে একটা সান্ত্বনা আছে — আমি সাগরের আরও কাছাকাছি এসেছি — যে-সাগরের বুক চিরে, আশা করি শিগগিরই একদিন আমি ইংল্যান্ডের গৌরবোজ্জ্বল তীরের দিকে যাত্রা করবো।"[১২৩]

একটি প্রথাবদ্ধ পরিবারের আওতায় প্রায় সীমাহীন আদরের মধ্যে মানুষ হলেও, মূল্যবোধ এবং মনোভাবের দিক দিয়ে তিনি তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে অনেকটা দূরে সরে যাচ্ছিলন। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যানধারণা এবং কল্পনার জগৎ সেকালের সাধারণ লোকদের মাপে তৈরি ছিলো না। তাঁর এই "সৃষ্টিছাড়া" চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে রাজনারায়ণ অথবা জাহ্নবী দেবী খুব একটা সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, পুত্র যুবক হচ্ছেন, তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটছে — এ সম্পর্কেও তাঁরা খুব একটা সজাগ ছিলেন না। কিন্তু ১৮৪২ সালের অগস্ট মাসে — মধুর বয়স যখন সাড়ে আঠারো বছর — তখন কোনো একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে হঠাৎ পিতা-পুত্রের বিরোধ দাঁত মেলে দেখা দিলো। বিরক্ত পিতা পুত্রকে আদেশ দিলেন, অবিলম্বে গ্রামের বাড়ি সাগরদাঁড়িতে চলে যাবার জন্যে। এ আদেশ অংশত তাঁকে শাস্তি দেবার এবং ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে; অংশত এই প্রত্যাশায় যে, বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু দিন দূরে রাখলে এই "রোগ" সেরে যাবে। ৭ অগস্ট মধু গৌরদাসকে লেখেন সেদিন রাতের বেলায় তাঁকে যশোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে।

বন্ধুদের ছেড়ে যেতে, বিশেষ করে একজনকে (কল্পনা করে নাও সে জন কে) ছেড়ে যেতে আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। আমি কি কবির ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করে বলতে পারি "ওহ! কী অসহ্য! ওহ! কী দুর্ভর বেদনা!" আমি যদি একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম! কিন্তু আমাকে তা নিষেধ করা হয়েছে! প্রিয়, প্রিয় গৌর – প্রিয়তম বন্ধু! আমাকে ভুলে যেয়ো না! আমি জানিনে আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে কখন আমি ফিরে আসবো। ... "চির বিদায়"

ইতি

প্রিয়তম গৌর, আমি তোমার চিরদিনের অনুগত এবং অনুরক্ত, কিন্তু হতভাগা বন্ধু।

পুনঃ এই সঙ্গে তোমার জন্যে "ফরগেট মি নট"-এর একটা কপি পাঠালাম। বাঁধাই করার সময় পাইনি। দয়া করে আমার তরফ থেকে তুমি নিজেই বাঁধাই করে নিয়ো। এটা হলো তোমার প্রতি উপহারদাতার শ্রদ্ধা, প্রশংসা এবং ভালোবাসার প্রতীক।

যশোর যাবার সম্ভাবনা তাঁকে কতো কাতর করেছিলো, এ চিঠি থেকে সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। সেই সঙ্গে এ-ও দেখা যাচ্ছে যে, সে পর্যায়ে তিনি বাবার আদেশ অমান্য করার মতো মনোবল অর্জন করতে পারেননি। তাই দুঃখ যতোই মর্মভেদী হোক, বাবার আদেশকে মেনে নেওয়া ছাড়া তিনি আর-কোনো বিকল্পের কথা ভাবতে পারেননি।

এতো বড়ো ভাবী বিপদের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন। কী উপায়ে আমাদের জানা নেই। মায়ের আবেদন-নিবেদনে হোক অথবা পরীক্ষার কারণে হোক মধুর শেষ পর্যন্ত যশোরে যেতে হয়নি। ওদিকে, সেপ্টেম্বরের উনিশ থেকে কলেজে বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হবার কথা। প্রথম তিন দিন ছিলো সাহিত্যের পরীক্ষা, গণিত পরীক্ষা বাইশ থেকে চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত। আর ছাব্বিশ থেকে আটাশ তারিখ ছিলো বাংলা এবং অনুবাদের পরীক্ষা। সে বার পরীক্ষা নিতে হুগলি কলেজ থেকে এসেছিলেন মিস্টার ক্লিন্ট। এ ছাড়া, মিস্টার হ্যালিডে এবং ডক্টর গ্র্যান্টও পরীক্ষক ছিলেন। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে যাঁরা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোবিন্দ দত্ত, প্যারীচরণ সরকার আর ভূদেব মুখোপাধ্যায়।[১২৪] তখনকার মতো যশোরে যেতে না-হলেও, তাঁর যাবার আশঙ্কা কয়েক সপ্তাহ তাঁকে এবং গৌরদাসকে ভাবিত করেছে। অক্টোবরের সাত তারিখ তিনি গৌরদাসকে চূড়ান্তভাবে জানান, সাগরদাঁড়িতে যেতে হচ্ছে না, তার বদলে তাঁকে যেতে হচ্ছে তমলুকে।

রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন তমলুকের রাজপরিবারের উকিল। মামলার সূত্র ধরে সে বার পুজোর সময়ে তাঁকে সেখানে যেতে হয়। এই উপলক্ষে তিনি সঙ্গে নিতে চাইলেন মধুকে। ব্যস্ত উকিল তিনি। কলকাতায় পুত্রকে অনেক সময়ে কাছে ডেকে তিনি আদর করতেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর লেখাপড়া এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এমন কি, মাঝেমধ্যে পুত্রের হাতে আলবোলার নলও তুলে দিতেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র যে তাঁর কাছ থেকে, পরিবারের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন, এটা তাঁর তেমন নজরে পড়েনি। এটা দেখার মতো চোখ অথবা মনস্তত্ত্বও রাজনারায়ণের ছিলো কিনা, কে জানে! কিন্তু পুত্রের ব্যক্তিত্ব নিয়ে একটা সমস্যা যে দেখা দিচ্ছে সেটা তিনি ভুলে যেতে পারলেন না। অল্প দিন আগে পুত্রের আচরণে দারুণ বিরক্ত হয়ে তাঁকে যশোরে পাঠাতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত পাঠানো হয়নি। সে জন্যে এবারে তাঁকে তিনি তমলুকে নিয়ে যেতে চাইলেন। আশা করলেন, এর ফলে পুত্রের কিছু দিন কলকাতার বাইরে থাকা হবে। আর তিনিও সুযোগ পাবেন তাঁকে কাছ থেকে দেখার। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার।

রাজনারায়ণ নিজের চেষ্টায় কলকাতায় বড়ো উকিল হিশেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। গরিব অবস্থা থেকে রীতিমতো ধনী হয়েছেন তিনি। জীবনকে তিনি উপভোগ করেছেন নানাভাবে। কলকাতার শিক্ষিত এবং ধনীদেরও তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে। তাঁর জন্যে তিনি

কলকাতায় পাওয়া যায় এমন সবচেয়ে ভালো শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে ছাত্র হিশেবে তাঁর ছেলেও সুনাম অর্জন করেছে। ইংরেজিতে তুখোড়। স্কলারশিপ পেয়েছে। বড়ো হয়ে এ ছেলে যে উকিল হিশেবে তাঁকেও ছাড়িয়ে যাবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কী! ওকালতি ভালো না-লাগলে, ডেপুটি হতে পারে। একজন ডেপুটির আয় এবং সামাজিক প্রতিপত্তি অনেক। রাজনারায়ণ তাঁর চারদিকে প্রতিশ্রুতিশীল অনেক তরুণকে দেখেছেন অথবা তাদের কথা শুনেছেন। মধুকে তাদের মতো করেই তিনি কল্পনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সেই আদরের দুলাল আর-পাঁচজনের থেকে একেবারে আলাদা "অসাধারণ" কোনো আচরণ করবে - এটা তিনি প্রত্যাশা করেননি। রাজনারায়ণ ছেলের সমস্যাটা বুঝে উঠতে পারেন না। ভিড় এবং ব্যস্ততা থেকে দূরে - তমলুকে গিয়ে তিনি কাছ থেকে মধুকে দেখবেন বলে আশা করলেন।

পুত্রকে নিয়ে রাজনারায়ণ নৌকোয় করে তমলুকের পথে যাত্রা করেন ১০ অক্টোবর সোমবার আর সেখানে গিয়ে পৌঁছেন ১২ তারিখ সকাল বেলায়।[১২৫] পুজোর হৈচৈ, চারদিকে হট্টগোল। বিজয়ার শেষে পরিবেশটা একটু থিতিয়ে এলো কদিনের মধ্যে — ১৯ অক্টোবর বুধবারে আবার লক্ষ্মী পুজো। এর পরে রাজনারায়ণ সত্যি সত্যি তাঁর প্রত্যাশিত সুযোগ পান পুত্রকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার। এবং দেখতে পান, নিজের ছেলে হলেও মধু অন্য এক জগতের মানুষ। পুত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, আগ্রহ এবং কৌতূহলের সঙ্গে তাঁর নিজের অনেক তফাত। রাজনারায়ণ যেন তাঁকে চিনতে পারেন না। পূজাপার্বণ, প্রচলিত ধর্ম, এবং অন্যান্য সাংসারিক ব্যাপারে পুত্রের উৎসাহের অভাব তিনি লক্ষ্য না-করে পারলেন না। তিনি এতে কেবল বিস্মিত হননি, রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তিনি ভাবতে আরম্ভ করেন — কি করা যায়। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে পুত্রের জন্যে, তাঁর বিবেচনায়, এক ধন্বন্তরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

২

সাধিতে মনের সাদ

সতেরো/আঠারো দিন তমলুকে থাকার পর রাজনারায়ণ দত্ত কলকাতায় ফিরে আসেন, ৩০ অক্টোবর, রোববার — পরের দিন আদালত এবং হিন্দু কলেজ, দুই-ই খোলা। কলকাতায় ফিরে কাজ নিয়ে তিনি আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যেও পুত্রের যে-সমস্যা লক্ষ্য করেছিলেন, তার কথা ভুলতে পারলেন না। তাঁর দ্বিতীয় কোনো সন্তান ছিলো না। সুতরাং সব কাজের চেয়ে তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাঁর ছেলে। কিভাবে ছেলের মতি-গতি পরিবর্তন করা যায়, তা নিয়ে তিনি এ সময়ে জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে নিশ্চয় পরামর্শ করেন। তিনি শুধু চান, মধু আর-পাঁচজনের মতো আচরণ করুক! শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন ছেলের স্বভাব বদলের জন্যে স্থায়ী এবং অব্যর্থ একটি ব্যবস্থা নেবেন তিনি। সেকালে বাঙালি সমাজে উঠতি বয়সের তরুণদের কোনো সমস্যা দেখা দিলে, বিশেষ করে মানসিক অথবা আচরণের সমস্যা, তা হলে বিয়েকে একটা আচ্ছা দাওয়াই হিশেবেমনে করা হতো। সুতরাং ঘটক আসা-যাওয়া করতে আরম্ভ করলো। সমস্যাটাকে তিনি কতোটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন, তা বোঝা যায় কী রকম তড়িঘড়ি করে তিনি পুত্রের বিয়ের আয়োজন করেছিলেন, তা থেকে। তমলুক থেকে ফিরে আসার চার সপ্তাহের মাথায় ২৭ নভেম্বর মধু জানতে পারলেন, ঠিক তিন মাস পরে ফাল্গুন মাসে তাঁর বিয়ে। ইচ্ছে থাকলেও রাজনারায়ণ বিয়ের তারিখটা আরও এগিয়ে আনতে পারলেন না। কারণ পৌষ মাস বিয়ের জন্যে প্রশস্ত নয়। আর মাঘ মাস মধুর জন্ম মাস।

নাম-করা উকিল রাজনারায়ণ। বিত্তের অধিকারী। কলকাতায় বাড়ি আছে। তাঁর অন্য ভাইরাও সবাই শিক্ষিত এবং বিত্তশালী। আর পাত্র হিশেবে মধুও অসাধারণ। বাবা-মার একমাত্র সন্তান। শ্যামলা হলেও, সুদর্শন। মেধাবী ছাত্র হিশেবে এরই মধ্যে নাম কিনেছেন — হিন্দু কলেজের সোনার পদক- এবং বৃত্তি-পাওয়া ছাত্র। ভবিষ্যতে নিদেন পক্ষে ডেপুটি হতে পারবেন। এর চেয়ে যোগ্য পাত্র কমই আছে। তাদের সুন্দরী মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। সুতরাং প্রস্তাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রী-পক্ষ রাজি হয়ে গেলো। মধু গৌরদাসকে লেখা তাঁর চিঠিতে বলেছেন, মেয়েটি একটি জমিদার-কন্যা।[১] আর গৌরদাস বলেছেন, মেয়েটি ছিলো পরীর মতো সুন্দরী।[২] কিন্তু মেয়েটি কে, তা জানা যায়নি।

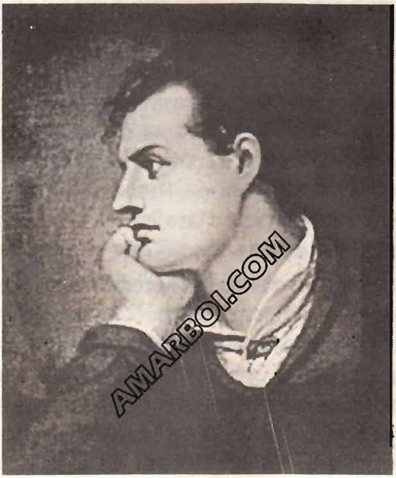
মধু কি মনে করতেন, তাঁর বিয়ে করার মতো বয়স অথবা সময় হয়নি? অসম্ভব নয়। তবে এ কথাটা জোরে-সোরে বলার মতো সাহস তাঁর ছিলো না। কারণ ততোদিনে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কারো কারো বিয়ে হয়ে গেছে, যদিও তাঁরা বিবাহিত জীবন শুরু করতে পারেননি নিতান্ত বালিকার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায়। সুতরাং বিয়ের আয়োজন করে রাজনারায়ণ দত্ত এমন কিছু অদ্ভুত আচরণ করেননি। বস্তুত,

তিনি যা করেছিলেন, তা-ই ছিলো সে কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক এবং সমাজ-স্বীকৃত রেওয়াজ। পুত্রের মুখ চেয়ে তিনি তদুপরি একটি 'পরীর মতো' কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক করেছেন। আর কী চাই! অবশ্য পরীর মতো সুন্দরী হলেই মধু যে সেই মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন না — এটা তাঁর অভিভাবকরা কল্পনা করেননি। বিয়ের ব্যাপারে সে যুগের বিচারে তাঁর ছিলো একেবারে ভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ।

বিয়ে এবং প্রেম সম্পর্কে মধু দারুণ রোম্যান্টিক ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গৌরদাসকে লেখা তাঁর গাদা গাদা চিঠিতে তিনি তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনাবিলাস অনেক কিছুর কথাই লিখলেও কোথাও কোনো মেয়ের কথা অথবা মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের কথা উল্লেখ করেননি। সে কথা তিনি বার বার লিখেছেন তাঁর কবিতায়। অবশ্য কবিতায়ও তাঁর স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন -- সে নীলনয়না। এবং এ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, নারীদের সম্পর্কে তিনি যে-রোম্যান্টিক ধারণা পোষণ করতেন, তা তিনি স্বদেশের মাটিতে পাননি, পেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের যে-সাহিত্য তিনি পাঠ করেছিলেন, সেখান থেকে। তাঁর প্রিয় যে-রোম্যান্টিক কবিদের কথা তিনি পড়েছেন, তাঁদের দৃষ্টান্তও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। এই কবিরা কেউ আয়োজিত বিবাহ করেননি। রীতিমতো প্রেম করে, বিয়ের আগে প্রেমিকা অথবা প্রেমিকাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তাঁরা মনের মতো মেয়েকে বিয়ে করেছেন। বিশেষ করে টম মূরের লেখা জীবনী পড়ার সময়ে তাঁর 'প্রিয়' বায়রনের দৃষ্টান্ত তিনি ভালোভাবে লক্ষ্য করেছিলেন।

বিয়ের আগেই বায়রন একাধিক নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন। মাত্র ন বছর বয়সে তাঁর প্রেম ভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন তাঁর নার্স। তাঁর দুই জ্ঞাতি বোন মেরী ডাফ আর মার্গারেট পার্কারকেও তিনি ভালোবেসেছিলেন ছেলেবেলায়। ১৩ বছর বয়সে তিনি যখন হ্যারো স্কুলে ভর্তি হন, সেখানেও তিনি অন্য বালকদের সঙ্গে প্রেমে পড়েন। তাঁর সমকামিতা এই স্কুলে এবং পরবর্তী কালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে অথবা গ্রীসে থাকার সময়ে আদৌ গোপন ছিলো না। ১৫ বছর বয়সে বায়রন প্রেমে পড়েন মেরী চ্যাওয়ার্থের। ২০ বছর বয়সে লন্ডনে তিনি যৌনাচারে এতো বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, তার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। তা ছাড়া, মনের মধ্যেও দেখা দিয়েছিলো একটা অপরাধবোধ। তা সত্ত্বেও, পরের বছর য়োরোপ ভ্রমণের সময়ে তিনি প্রেমে পড়েন এক বিবাহিতা মহিলার। কেবল তাই নয়, সেই মহিলার জন্যে একটা ডুয়েল লড়েন তিনি। একই বছর তিনি অ্যাথেন্সে জড়িয়ে পড়েন অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে। ২৪ বছর বয়সের সময়ে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে লেডি ক্যারোলিন ল্যাম্ব, লেডি অক্সফোর্ড, লেডি অক্সফোর্ডের সৎ বোন অগাস্টা লেই এবং লেডি ফ্র্যান্সিস ওয়েবস্টারের সঙ্গে। ১৮১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (সাড়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে) তিনি অ্যান ইসাবেলা মিলব্যাঙ্কের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেন। কয়েক মাস প্রেম করার পরে, তাঁকেই তিনি বিয়ে করেন পরের জানুআরিতে। কিন্তু এর অল্পদিন পরে অগাস্টা লেই লন্ডনে আসায় তাঁর সঙ্গে বায়রনের পুরোনো সম্পর্ক আবার গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। অংশত এরই জন্যে এক বছরের মধ্যে তাঁর বিয়ে ভেঙে যায়। অতঃপর বায়রন চলে যান য়োরোপে। সেখানে তাঁর কবি-বন্ধু শেলির শ্যালিকা ক্লেয়ারের সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয় এবং তাঁদের একটি অবৈধ সন্তান জন্মে (জানুআরি, ১৮১৭)। এখানেই শেষ নয়, ঐ বছর মারিয়ানা নামে আর-একজন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে তিনি প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু মারিয়ানার এক প্রতিযোগিনী দেখা দেন পরের বছর -- মার্গারিতা নামে রোমে এক রুটিওয়ালার স্ত্রী তাঁর প্রেমে পড়ে তাঁর সঙ্গে ভেনিসে চলে যান। এর পরের বছর তিনি প্রেমে পড়েন কাউন্টেস তেরেসার সঙ্গে। এই ঘটনার পর তিনি অল্প কাল বেঁচেছিলেন। তবে তখন এক বালকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মোট কথা, কবিতা এবং কামই ছিলো তাঁর জীবনের প্রধান প্যাশন।

উদার যৌনাচারের জন্যে মধু বায়রনকে ভালোবাসেননি। তবে তাঁর প্রিয় কবির জীবনী পড়ে তিনি যে-আদর্শ দেখতে পেয়েছিলেন, নিজের জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে তা দিয়ে কমবেশি প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। বায়রনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কতো গভীর ছিলো, টম মূরের লেখা বায়রন-জীবনীর পৌনঃপুনিক উল্লেখ থেকেও তার আভাস পাওয়া যায়। বায়রনের মৃত্যুর বর্ণনা পড়ে তিনি না-কেঁদে পারেননি। বায়রনকে তিনি কিভাবে অনুকরণ করতেন, তার একটি দৃষ্টান্ত দিলে তাঁর বায়রন-প্রীতি আরও পরিষ্কার হতে পারে। মিস্টার হার্নেসকে লেখা বরায়রনের একটি চিঠির সঙ্গে গৌরদাসকে লেখা



মাইকেলের নায়ক লর্ড বায়রন

মধুর একটি চিঠির তুলনা করে উইলিয়াম র‍্যাডিচি দেখিয়েছেন যে, মধু বায়রনের চিঠিরও অনুকরণ করতেন।[৩] বায়রনের চিঠির প্রথম অংশের পাঠ এই রকম:

> I am going abroad, if possible, in the spring, and before I depart, I am collecting the pictures of my most intimate school-fellows; I have already a few, and shall want yours, or my cabinet will be incomplete. I have employed one of the first miniature painters of the day to take them, of course, at my own expense, as I never allow my acquaintance to incur the least expenditure to gratify a whim of mine.[৪]

মধু এই চিঠির অনুকরণে বন্ধু গৌরদাসকে লেখেন:

> When I go to England, - which period, I hope, is not very far - (next cold season) - I intend to take a picture of yours -- let it cost me whatever it will. I will sell my very clothes for it - a miniature picture of course. This is what I have been thinking of today: I must do it. If circumstances allow, I intend

to take one, even before my departure for England. If you are acquainted with any artist, - native - English - let me know it.[৫]

কেবল কাব্য নয়, চিঠি লেখাও যদি অনুকরণ করে থাকেন, তা হলে বোঝা যায়, বায়রনের প্রেম-জীবনও তরুণ মধু লক্ষ্য না-করে পারেননি। অন্তত পক্ষে, একজন বিখ্যাত কবির জীবন যে এ রকমের হতে পারে এবং তার ফলে সাহিত্যের প্রশস্ত কক্ষ থেকে তাঁর কাব্য যে ছিটকে পড়ে না অথবা তার ফলে তাঁর কবিযশ যে কিছু মাত্র হ্রাস পায় না – এটা তিনি অনুধাবন করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে মধু অবশ্য বায়রনের প্রেমের আদর্শকে মেনে নিতে পারেননি। সত্যি বলতে কি, যৌন সম্পর্কিত কোনো রকমের যথেচ্ছাচার সেই বয়সে তিনি আদৌ অনুমোদন করেননি। সমকালে তিনি অনেক বদনামের ভাগী হয়েছিলেন, কিন্তু যৌনাচার নিয়ে কেউ তাঁকে দোষারোপ করেননি। বরং দেখতে পাই যৌনাচার সম্পর্কে তিনি বিশেষ শুদ্ধাচারী ছিলেন। রাতের বেলায় গৌরদাসের বাড়িতে গিয়ে যখন তাঁর দেখা পাননি, তখন অকারণে সন্দেহ করে তিনি গৌরদাসকে লিখেছেন: 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকরা যে-পাপের পথে ভেসে যায়, তুমিও সে পথে পা বাড়িয়েছো।'[৬] আগের অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সেকালের কলকাতায় বারাঙ্গনার সঙ্গ নিতে যাওয়া অথবা রক্ষিতা রাখা তেমন দোষের বলে বিবেচিত হতো না। বরং শিক্ষিত সমাজেও এ রীতি বেশ স্বীকৃত ছিলো। মধুসূদন সেটাকে কেবল যে ঘৃণা করতেন, তাই নয়; তিনি প্রেমহীন যে-কোনো যৌনাচারকে অপরাধ বলে গণ্য করতেন। তিনি যখন পিতার সঙ্গে তমলুকে বেড়াতে যান, তখন সেখানে নাকি একটা তাৎক্ষণিক 'প্রেমের' অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তমলুকে পৌঁছানোর ছ দিন পরে তিনি সেখান থেকে গৌরদাসকে যে-চিঠি লেখেন, তাতে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। নিশ্চয় তিনি আট/দশ বছরের কোনো কুমারীর প্রেমে পড়েননি! খুব সম্ভব কোনো বিধবা অথবা বিবাহিতার সঙ্গে এই ক্ষণিকের প্রণয় হয়ে থাকবে। আঠারো বছরের এক তরুণের জন্যে এটা একটা রোমাঞ্চকর সুখের অভিজ্ঞতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এর ফলে তিনি অপরাধবোধে জর্জরিত হন। গৌরদাসকে লিখেছেন: 'এখানে আমার একটা ছোটোখাটো প্রেমের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছো, বিরাগী এবং সন্ন্যাসী থেকে রাতারাতি আমি একটা লম্পটে পরিণত হয়েছি।'[৭] তাঁর এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে দুটো জিনিশ চোখে পড়ে। এক. নারীঘটিত ব্যাপারে তাঁকে সবাই বিরাগী এবং সন্ন্যাসী বলে ভাবতো। আর দুই. ক্ষণিকের জন্যে কোনো মহিলার সংস্পর্শে এসেও তিনি অপরাধবোধে কাতর হয়েছেন।

প্রেম তাঁর কাছে তখনো একটা আদর্শায়িত বস্তু। আয়োজিত বিয়ের কথা শুনে মধু তাই খুশি হতে পারলেন না, বরং খুব ঘাবড়ে গেলেন। কী করবেন প্রথমে বুঝতে পারলেন না। পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং মূল্যবোধের প্রভাবে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। তা ছাড়া, একদিন প্রথম দৃষ্টিতে এক 'নীলনয়না'র প্রেমে পড়বেন এবং পরিণতিতে তাকে বিয়ে করবেন বলে গোলাপি স্বপ্ন দেখেছিলেন। বস্তুত, ভালোবেসে বিয়ে করার আদর্শকে তিনি তাঁর মনের গভীরে একেবারে স্থায়ীভাবে জায়গা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সমূহ সমস্যার মুখোমুখি হলেন, পিতার পছন্দ করা একটি সাত/আট (কি বড়ো জোর দশ/বারো) বছরের বালিকাকে বিয়ে করার। এটাকে তিনি বিবেচনা করলেন গুরুতর একটা বিপদ হিশেবে। কী আশা করেছিলেন এবং কী হতে যাচ্ছে – এই দুই-এর মধ্যে তুলনা করে আঁৎকে উঠলেন তিনি। কিন্তু স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখলেও, মধুর ব্যক্তিত্ব তখনো এতোটা বিকাশ লাভ করেনি, অথবা তিনি নিজস্ব এমন আয়ের অধিকারীও হননি, যাতে পিতার মুখের ওপর বলতে পারেন, তিনি বিয়ে করবেন না। এই অবস্থায়, নিজের সমস্যা কাউকে বলে তিনি

মনের ভার খানিকটা লঘু করতে চেয়েছিলেন। তাই রাতের বেলায় বিচলিত মধু চিঠি লেখেন গৌরদাসকে:

> এখন সময়টা হলো প্রেমপত্র লেখার। কিন্তু আমার সমস্ত মন ভরে গেছে বিষাদের অন্ধকারে। আমি এখন কী করে প্রেমপত্র অথবা খুশির চিঠি লিখি? আমি যে-বিপদে পড়েছি, তা কতোটা গুরুতর, তুমি জানো না। এখন থেকে ঠিক তিন মাস পরে আমার বিয়ে করতে হবে – কী ভয়ানক ব্যাপার! এটা ভাবলেও আমার রক্ত শুকিয়ে যায় এবং আমার চুলগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা, সে হলো এক ধনী জমিদারের কন্যা। হতভাগিনী মেয়ে! অজ্ঞাত ভবিষ্যতের গর্ভে তার জন্যে কী দুঃখই যে জমা আছে! তুমি জানো আমার বিলেত যাবার ইচ্ছের শিকড়টা এতো গভীরে প্রোথিত যে, সেটাকে কোনোক্রমে উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। সূর্য উঠতে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আমি এই স্বপ্ন আমার হৃদয় থেকে কখনো মুছে ফেলতে পারবো না। আর এক-দু বছর অপেক্ষা করলে, নিশ্চয় দেখতে পাবে, আমি হয় বিলেতে থাকবো, নয়তো আমি আদৌ বেঁচেই থাকবো না – এর কোনো একটা হতেই হবে। গৌর, তুমি আমার বন্ধু, তোমাকে এই গোপন কথাগুলো জানালাম। এ কথাগুলো কোনোক্রমে প্রকাশ পাবে, আমি আদৌ এমনটা আশঙ্কা করছিনে। তুমি একজন ভদ্রলোক। এ যাবৎ আমি এসব গোপন কথা তোমাকেও বলিনি। কিন্তু আজ আর আমি এসব চেপে রাখতে পারছিনে। আমার সহানুভূতি দরকার – এবং আমি তা আর কার থেকে পেতে পারি?[৮]

এ চিঠির ভাষা থেকে বোঝা যায়, বিয়ের সংবাদে তিনি কতোটা উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত হয়েছিলেন। এর আগের চিঠিতে গৌরদাসকে তিনি লিখেছিলেন যে, ২৮ নভেম্বর তাঁর পিতা এক বড়োলোক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাবেন। সেই বড়ো লোকের বাড়ি থেকে ফিরে এসে পরের দিন রাতের বেলায় তিনি মধুকে বিয়ের এই খবর শোনান। আর মধু তাকে বিবেচনা করেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো।

পিতার মনোনীত বালিকাকে বিয়ে করার সংবাদ শুনে মধু যে-প্রতিক্রিয়া দেখান, সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা একান্তই অভিনব এবং একেবারে অভূতপূর্ব। এই ঘটনার ৪০ বছর পর কলকাতার আর-একটি অত্যন্ত বিদগ্ধ পরিবারের একজন বিলেত-ফেরত কবির বিয়ে ঠিক হয়েছিলো যশোরের একটি অশিক্ষিত এবং দেখতে সুশ্রী নয় - এমন একটি এগারো বছরের বালিকার সঙ্গে। তাতে মনে মনে কতোটা খুশি হয়েছিলেন, জানা না-গেলেও এই তরুণ কবি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – বাধ্যগত পুত্রের মতোই বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসেছিলেন। গোটা উনিশ শতকেই অসংখ্য বার এমনটা হয়েছে। ১৮৪০-এর দশকে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মধুসূদন আর ৭০-এর দশকে এ ধরনের একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গিয়েছিলো শিবনাথ শাস্ত্রীর ক্ষেত্রে। নিজের অমতে পিতার আদেশে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল সে স্ত্রীকে স্ত্রী হিশেবে গ্রহণ করতে পারেননি।[৯]

আমরা পরে দেখতে পাবো, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মধুর জীবন আমূল বদলে গিয়েছিলো। এতোদিন ছিলেন ধনী বাবা-মার একমাত্র আদরের সন্তান – জীবন ছিলো লঘু। কোনো সমস্যা নিয়ে তাঁর ভাবতে হয়নি। যখন যে-আবদার করেছেন, প্রায় সবই পূরণ করেছেন বাবা-মা। তাঁদের নিরাপদ ডানার নিচে সুখের নীড়ে জীবন কাটিয়েছেন। সেখানে কেবল স্নেহ, আবদার এবং প্রশ্রয়। জীবনের রূঢ়তার সঙ্গে এতোদিন তাঁর পরিচয় হয়নি। রুটিনমাফিক জীবনযাত্রার মাধ্যমে তিনি নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাচ্ছিলেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। কিন্তু প্রচণ্ড আঘাতে আকস্মিকভাবে তার ছিঁড়ে গেলো। তখন অঘ্রান মাস। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজেকে দেখতে পেলেন চৈত্র-দুপুরের খর রৌদ্রে। জীবনে এই প্রথম সত্যিকার একটা সমস্যার মুখোমুখি হলেন। এই সমস্যার একটা সমাধান তিনি করেছিলেন, কিন্তু তার ফলে তিনি জীবনের এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষপথে ছিটকে পড়েন। অতঃপর

তাঁর পরিচিত জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এক অর্থে চিরদিনের জন্যে ছিন্ন হয়েছিলো।

গৌরদাসের ওপর ভরসা করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতি পাবেন। কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং একই কলেজের একই পাঠক্রম-পড়া ছাত্র হলেও, তাঁদের দুজনের চিন্তাধারা এ ব্যাপারে অভিন্ন ছিলো না। মূল্যবোধেও ছিলো আকাশ-পাতাল ব্যবধান। বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে – এটাকে গৌরদাস মস্তো বড়ো সমস্যা হিশেবে দেখতে পেলেন না। এর আগেই তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। কই, তিনি তো সেটাকে আকাশ ভেঙে পড়ার মতো কোনো ঘটনা বলে গণ্য করেননি! মধুর বয়স উনিশ হতে আর বাকি আছে মাত্র দু মাস। এতো বিয়েরই বয়স! বেশির ভাগ লোকের তো এর আগেই বিয়ে হয়! এ ঘটনার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে না-পাওয়ায় গৌরদাস বন্ধুকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত সহানুভূতি অথবা সান্ত্বনা দিতে পারেননি। গৌরদাস যে মধুর সমস্যা দেখতে পাননি, তাঁর কারণ কেবল তাঁদের মূল্যবোধের পার্থক্য নয়, তাঁর আনুগত্যও ছিলো বিভক্ত। তিনি বন্ধুর প্রতি যেমন অনুগত ছিলেন, তেমনি অনুগত ছিলেন বন্ধুর পরিবারের প্রতি। রাজনারায়ণ দত্ত এবং জাহ্নবী দেবী এ সময়ে গৌরদাসের মারফত পুত্রকে বোঝাতে চেয়েছেন। পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে গৌরদাসকে লেখা মধুর যে-দুটি চিঠি পাওয়া যায়, তাতে বন্ধুত্ব এবং প্রণয়ের চিহ্ন অনুপস্থিত। এ থেকে অনুমান করি, গৌরদাসের ওপর মধু আর ভরসা করতে পারছিলেন না। কী করে বিয়ে এড়ানো যায়, এ পরামর্শের জন্যে ততোদিনে তিনি তাঁর অন্যত্র যাতায়াত আরম্ভ করেন।

বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এবং এ সিদ্ধান্ত আর বদল করা যাবে না – মধু এটা প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন। কিন্তু পিতাকে সরাসরি বলবেন, এ বিয়ে তিনি করবেন না – এক হুঁকোয় তামাক খেলেও, সে রকমের সাহস তাঁর ছিলো না। মাকে নিশ্চয় বলেছেন। হয়তো যুক্তিও দেখিয়েছেন যে, লেখাপড়া শেষ করে তিনি বিয়ে করবেন। কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা হয়নি। মধু তাঁর নয়নমণি হলেও, তিনি বুঝতে পারছিলেন না, অমন সুন্দরী একটি মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারে তার আপত্তিটা কোথায়। বাপ-ঠাকুরদা চোদ্দো পুরুষ তো ওভাবেই বিয়ে করেছেন! প্রতিবেশী রামকমল বাবুর ভাগ্নে রঙ্গলাল – সে তো আগের বছরই বিয়ে করেছে! তখন তার বয়স ছিলো মাত্র চোদ্দো। মধুর উনিশ! বিয়ের ব্যবস্থা হলে সবাই তো খুশি হয়। তাঁর ছেলে তা হলে এমন আজব আচরণ করছে কেন! গর্ভে ধারণ করলেও, জাহ্নবী দেবী এখন তাঁর ছেলের মন বুঝতে সত্যি সত্যি ব্যর্থ হন।

পুত্রের কাছে সমস্যাটা যে অতো গুরুতর, তা বুঝতে পারলে পিতামাতা বিষয়টা আর-একবার ভেবে দেখতেন বলে মনে করাই সঙ্গত। তাঁরা মধুর ভালোই করতে চেয়েছিলেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, তাঁরা তাঁকে হারাতে চাননি মোটেই। একমাত্র সন্তান হিশেবে মধু তাঁর মায়ের কতোটা প্রিয় ছিলেন, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। সর্বোপরি, মধুর প্রতি অগাধ স্নেহ ছাড়াও, পরকালে পিণ্ড লাভ আর ইহকালে উত্তরাধিকারীর প্রয়োজনীয়তা রাজনারায়ণ যে হাড়ে হাড়ে অনুভব করতেন, সে তাঁর পরবর্তী অর্ধ-উন্মাদ আচরণ থেকে বোঝা যায়। এই পর্যায়ে মধু কি মাকে পালিয়ে যাবার ভয় দেখিয়েছেন? আমার ধারণা, দেখাননি। দেখালে গৌরদাস পালিয়ে যাবার কথা ফাঁস করে দেবেন বলে তাঁকে হুমকি দিতেন না। আর মা-ও তা হলে আর-একটু গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টা বিবেচনা করতেন।

তাঁর বাবামা অথবা অন্যদের কাছে কোনো সমস্যা বলে মনে না-হলেও, মধুর নিজের কাছে এটা ছিলো প্রায় জীবন-মরণ সমস্যা। বিশেষ করে জীবনের ঐ পর্বেই সমস্যাটা অতো কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছিলো। যদি আরও দু বছর আগে রাজনারায়ণ এই বিয়ের আয়োজন করতেন, মধু এতো প্রবলভাবে আপত্তি করতেন না। তাঁর ব্যক্তিত্ব তখনো অতোটা পরিণতি লাভ করেনি। বিলেত যাবার ইচ্ছেটাও তখন এতো প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। রাজনারায়ণ যদি আরও দু বছর পরে বিয়ের আয়োজন

করতেন, তা হলেও সমস্যাটা মধুর কাছে অমন বিশাল বলে মনে হতো না। ততোদিনে হিন্দু কলেজে তাঁর লেখাপড়ার পাঠ প্রায় চুকে যেতো এবং তিনি স্বাধীন আয় করার এবং/ অথবা বাবার কর্তৃত্ব অস্বীকার করার কথা ভাবতে পারতেন। কিন্তু ১৮৪২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি না বালক ছিলেন, না পরিণত যুবক। এই অবস্থায় তিনি কী করার কথা ভেবেছিলেন? কী কী বিকল্প ছিলো তাঁর? পালানোর কথা তিনি নিশ্চয় ভেবে থাকবেন। কিন্তু কোথায়? পালিয়ে গিয়ে তিনি কী করবেন? – তাঁর তো কোনো আয় ছিলো না! কী খাবেন? কোথায় থাকবেন? চাকরি করার কথাও ভাবা সম্ভব – যদিও চাকরির বয়স তখনো তাঁর ঠিক হয়নি।

এই একেবারে নিরুপায় অবস্থায় তাঁর মাথায় একটা ভাবনা এলো। তাঁকে কেউ বুদ্ধি দিয়েছিলো, এমনও হতে পারে। তিনি ভাবলেন, মিশনারিদের কাছে গিয়ে তিনি যদি খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন, তা হলে এক ঢিলে দুই নয়, তার চেয়েও বেশি পাখি মারা সম্ভব হতে পারে। সমূহ যে-লাভের কথা ভাবলেন, তা হলো: খৃষ্টান হলে সঙ্গে সঙ্গে এ বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

দ্বিতীয় যে-লাভের কথা ভাবলেন, তা হলো: খৃষ্টান হলে তিনি খৃষ্টান সমাজ এবং ইংরেজ কর্মকর্তাদের সহায়তা পাবেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোনো প্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচিত পরিবারের কোনো সন্তান খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে মিশনারিরা তাকে একটা দৃষ্টান্ত এবং সম্মানের বিষয় বলে গণ্য করেন। এর কয়েক মাস আগে খিদিরপুরে তাঁদের পাড়ার একটি তরুণ (সুরেশচন্দ্র মৈত্র এঁর নাম লিখেছেন নবীনকৃষ্ণ মিত্র।[১০] চার্চের রেজিস্টারে এঁর নাম আমি খুঁজে পাইনি।) যখন খৃষ্টান হন, তখন একদিকে বাঙালি সমাজ এবং অন্যদিকে মিশনারি এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-হৈচৈ দেখা দিয়েছিলো, তা তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন। তাঁর সামনে অন্য দৃষ্টান্তও ছিলো। ডিরোজিওর অনেক ছাত্র হিন্দু ধর্মকে অস্বীকার করে অথবা তার সমালোচনা করে সমাজকে চটিয়ে দিয়েছিলেন। এই ছাত্রদের মধ্যে দুজন – কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধায় এবং মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃষ্টান হয়ে সমাজে দারুণ আলোড়ন তুলেছিলেন। (কৃষ্ণমোহন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৩২ সালের ১৭ অক্টোবর। মহেশচন্দ্র তার মাস দুয়েক আগে। তিনি মিশনারি হবেন বলে বিশপস কলেজে ভর্তি হন ২৯ অগস্ট।) এর কয়েক বছর পরে পড়তে এলেও মধু কলেজে সে কথা নিয়ে আলোচনা শুনেছেন। তা ছাড়া, তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে তিনি অনেক সময়েই খৃষ্ট ধর্মের গুণগান করতে শুনেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূদেব রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তিনিও খৃষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বেশ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে হিন্দু এবং খৃষ্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাঁর বিচলিত বিশ্বাসকে আবার হিন্দু ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন।[১১] রাজনারায়ণ বসুকে মধু শুনেছিলেন ইসলাম ধর্মের গুণগান করতে।[১২] পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে



কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়:
মধু যাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন।

যোগ দিলেও আনুষ্ঠানিক ধর্মে মধুর নিজের তেমন আগ্রহ ছিলো না। অপর পক্ষে, তিনি যখন য়োরোপীয় সভ্যতার কথা চিন্তা করতেন, চিন্তা করতেন হিন্দু সমাজের অসংখ্য কুসংস্কারের কথা – তখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সমাজ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি দিতো – তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়! অপর পক্ষে, তিনি যখন চিন্তা করতেন যে, তাঁর শ্রদ্ধেয় কবিরা এবং ডিএলআরের মতো তাঁর প্রিয় শিক্ষকরা – সবাই খৃষ্টান, তখন তিনি হয়তো হিন্দু ধর্মের তুলনায় খৃষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না-করে পারতেন না। অন্তত সভ্য জাতি হিশেবে অ্যাংলো-স্যাক্সনরা যে ভারতীয়দের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে, সে ইতিহাস তিনি ভালো করেই পড়েছিলেন। বছর এগারো পরে তিনি নিজেও সে কথা লিখেছিলেন।[১৩] খৃষ্ট য়োরোপের উদারতা এবং যুক্তিবাদ তাঁকে সত্যি সত্যি আকৃষ্ট করে।



টমাস ডিয়ালট্রি:
বিলেত যাবার ভরসা এবং খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

ধর্মান্তর খুব গুরুতর ব্যাপার, ধর্মান্তরের কয়েকটি ঘটনা দেখে তিনি তা খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অথবা তার জন্যেই এখন এই সংকট কালে খৃষ্টান হয়ে তিনি গোটা সমাজে একটা আলোড়ন তুলতে পারবেন, এমন ভাবও তাঁর মনে দেখা দিয়েছিলো কিনা, কে জানে? বিশেষ করে একটা কথা চিন্তা করে তিনি উদ্দীপ্ত বোধ করে থাকবেন। তিনি ভেবেছিলেন, খৃষ্টান হবার শর্ত হিশেবে মিশনারিদের কাছে দাবি করবেন, তাঁকে বিলেতে পাঠানো হোক। বিলেত চলে গেলে তিনি বিয়ে এড়াতে পারবেন, যে বাবা-মা তাঁকে জোর করে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁদের আচ্ছা জব্দ করতে পারবেন, আর সবচেয়ে বড়ো লাভ হবে তিনি এতোকাল বিলেতে গিয়ে কবি হবার যে-স্বপ্ন দেখেছেন, তাকে বাস্তবায়িত করার একটা সুবর্ণ সুযোগ পাবেন। তিনি বিবেচনা করলেন, তাঁর সমস্যার এর চেয়ে ভালো সমাধান আর হতে পারে না। কিন্তু তিনি জানতেন, এ কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পেলেও তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। সুতরাং তিনি খুব গোপনে এবং সুকৌশলে খৃষ্টান মিশনারিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করলেন। তিনি যদি কেবল খৃষ্টান হতে চাইতেন, তা হলে কাজটা অনেক সহজ হতো। একদিন গোপনে কোনো চার্চে গিয়ে দীক্ষা নিলেই চুকে যেতো। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে চাইলেন বিলেত যাবার নিশ্চিত আশ্বাস। সেটা অতো সহজ ব্যাপার ছিলো না।

পরবর্তী আড়াই মাস তিনি পরিবারের মধ্যে থেকেছেন, নিয়মিত কলেজে গেছেন, আর অত্যন্ত গোপনে তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে কথাবার্তা চালিয়েছেন। কিন্তু কাউকে বুঝতে দেননি, তিনি গোপনে পা বাড়িয়েছিলেন এক অনিশ্চিত অন্ধকার পথে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন – মধু তাঁকে খৃষ্টান হবার কোনো আভাস দেননি। আসলে, সমস্যায় পড়ে মধু তাঁর চারদিকের গোটা প্রথাবদ্ধ সমাজকে বিবেচনা করেছিলেন প্রতিকূল সাগরের মতো।

কারণ কোথাও কারো মধ্যে তাঁর সমস্যার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতির চিহ্ন তিনি দেখতে পাননি।

খৃস্টান হবার ফলে তাঁর জীবনে যে-প্রভাব পড়তে পারে, তিনি তা কি ভেবে দেখেছেন? ভাবাই স্বাভাবিক। তবে সেটা কতোটা গুরুতর হতে পারে, তা কল্পনা করতে পারেননি। খৃস্টান হলে তিনি যে আর কোনো দিন মায়ের কাছে, বাবার কাছে, খিদিরপুরের বাড়িতে থাকতে পারবেন না; স্বজনদের কাছ থেকে ছিটকে পড়বেন বহু দূরে; এমন কি, হিন্দু কলেজে বন্ধুদের সঙ্গে লেখাপড়ার পাটও চুকে যাবে – এতোটা তলিয়ে দেখেননি। খৃস্টান হলে এবং বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরলে, তিনি যে আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন – সে সমস্যা কি আদৌ তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিলো? আমার ধারণা, বাস্তব বুদ্ধির অভাবে অথবা বাবা-মার ওপর অভিমানবশত এসব কথা তিনি আদপে চিন্তা করেননি। করলে, তিনি কি বিয়ে এড়ানোর জন্যে এতো মূল্য দিতে রাজি হতেন? এ সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা যায় না।

খৃস্টান হবার উপায় কী? কার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন? সিদ্ধান্ত নিলেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। হিন্দু কলেজের ছাত্র হিশেবে তিনিও পরিবার এবং সমাজের তীব্র বিরোধিতার মুখে এবং বিবেকের তাড়নায় খৃস্টান হয়েছিলেন। মধু ভাবলেন, তাঁর সমস্যাটা তিনি সম্যকভাবে বুঝতে পারবেন। কৃষ্ণমোহন তখন ক্রাইস্ট চার্চের পাদ্রি হিশেবে কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে বাস করতেন। মধু একদিন সেখানে গিয়ে হাজির হন। তাঁকে কৃষ্ণমোহন আগে থেকে চিনতেন বলে মনে হয় না। তাঁর কাছে মধু নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন একজন খৃস্ট-ধর্মানুসন্ধী হিশেবে। তবে, কৃষ্ণমোহন দাবি করেছেন যে, দুতিন দফা আলোচনার পর তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন যে, খৃস্টান ধর্মের প্রতি মধু যতোটা আগ্রহী, বিলেত যাবার ব্যাপারে আগ্রহী তার চেয়েও বেশি।[১৪] তিনি খৃস্টান হতে চাইছিলেন ঠিকই, তবে তার শর্ত হিশেবে দাবি করছিলেন তাঁকে ইংল্যান্ডে পাঠাতে হবে। কৃষ্ণমোহন জানতেন, সেটা সহজ ব্যাপার নয়। সে জন্যে তিনি মধুকে উপদেশ দিলেন যাতে এ দুটো বিষয় তিনি গুলিয়ে না-ফেলেন। সে কথা শুনে বেশ হতাশ হলেন মধু। এবং তারপর থেকে তিনি কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে যাওয়া কমিয়ে দিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, খৃস্টান হয়ে এক ঢিলে একাধিক পাখি মারার যে-পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, তা অতো সহজ নয়।

কৃষ্ণমোহন অবশ্য মধুর ব্যাপারে আলোচনা করেন অ্যাংলিকান চার্চের একজন ওপরওয়ালার সঙ্গে। মধুর বিলেত যাবার বায়নার কথা শুনেও এই ওপরওয়ালা তাঁকে তাঁর কাছে পাঠানোর অনুরোধ জানান্। এই উপরওয়ালা খুব সম্ভব আর্চডীকন টমাস ডিয়ালট্রি (১৭৯৬-১৮৬১)। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে এলএলবি ডিগ্রি নিয়ে ১৮২৯ সালের গোড়ার দিকে তিনি ধর্মযাজকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখনই তিনি কলকাতায় আসেন। তারপর ২২ জুন থেকে তিনি ওল্ড চার্চের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৪৩ সালে তিনি ছিলেন পদের দিক দিয়ে কলকাতায় অ্যাংলিক্যান চার্চের দ্বিতীয় উচ্চতম ব্যক্তি। তাঁর ওপরে ছিলেন একজন - লর্ডবিশপ (রেভারেন্ড ডেনিয়েল উইলসন)। তিনি যদি মধুর বিলেত যাবার বাসনার কথা শোনা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর কাছে পাঠানোর কথা কৃষ্ণমোহনকে বলে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে তিনি বিলেত পাঠানোর ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে থাকবেন। কৃষ্ণমোহনের দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে মধু এঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং ইনি তাঁকে সব রকমের উৎসাহ দেন। এমন কি, তাঁকে তখনকার বঙ্গদেশের অস্থায়ী ছোটো লাট মিস্টার ব্যর্ডের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেন। এসব ব্যাপার থেকে মধুর নিশ্চিত ধারণা হয় যে, খৃস্টান হলে তাঁর বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা হবে। তরুণ মধু সরল মনেই এটাকে বিশ্বাস করেছিলেন। তা না-হলে, তাঁর গুরুতর সমস্যা সত্ত্বেও, তিনি সেই পর্যায়ে দারুণ খৃস্ট-প্রেমে পাগল হয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

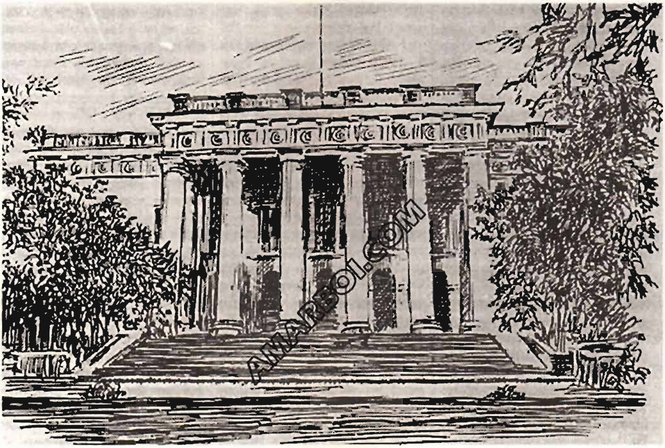
স্বয়ং কৃষ্ণমোহন যাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন খৃস্টান হবার ব্যাপারে সেই অ্যালেকজান্ডার ডাফের সঙ্গেও তিনি কথাবার্তা বলেছিলেন বলে মনে করার কারণ আছে। ডাফ ছিলেন চার্চ অব স্কটল্যান্ডের মিশনারি। তিনি তাঁর মিশনারি কার্যকলাপের জন্যে তখনকার কলকাতায় তাবৎ ধর্মযাজকের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ছিলেন। তাঁর একাধিক স্কুল ছিলো ইংরেজি শেখানোর। সেখানে তিনি ইংরেজি শেখাতেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষেও তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮৩০ সালে কলকাতায় আসার পরে তিনি নিজে ভালো বাংলা শিখেছিলেন। আর এ জন্য তিনি বাঙালিদের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে সমর্থ হতেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্যে নানাভাবে তিনি তাঁদের প্রলুব্ধও করতেন। তাঁর এমন একটা মননশীল আবেদন ছিলো যে, হিন্দু কলেজের ছাত্ররাও তাকে পছন্দ করতো। মধু যা চাইছিলেন অর্থাৎ বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা, ডাফ তা দিতে পারবেন না বলে তাঁকে সরাসরি জানিয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও চার্চ অব স্কটল্যান্ডের সঙ্গে পরেও মধুর একটা যোগাযোগ ছিলো বলে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।


আলেকজান্ডার ডাফ

যোগীন্দ্রনাথ সোম তাঁর মধু-স্মৃতিতে খৃস্টান হবার পেছনে মধুর আর-একটি অনুপ্রেরণা ছিলো বলে অনুমান করেছেন। তিনি ধারণা করেছেন যে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজ মেয়ে দেবকীর সৌন্দর্যে মধু আকৃষ্ট হন এবং সেটাও একটা কারণ যার ফলে তিনি খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন।[১৫] এই অনুমানের আদৌ কোনো ভিত্তি ছিলো না। দেবকী কেন, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির বড়ো মেয়ের সঙ্গেও ১৮৪৩ সালে মধুর পক্ষে প্রেম করার কোনো বাস্তব সম্ভাবনা ছিলো না। এই কন্যা, কমলের জন্ম হয় ১৮৩৭ সালের ১২ জানুআরি এবং তার ব্যাপটিজম হয় ৫ ফেব্রুআরি।[১৬] মাইকেল যখন খৃস্টান হন তখন এঁর বয়স মাত্র ছ বছর। ১৫ বছর বয়সে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে এই কন্যার বিয়ে হয় ১৮৫২ সালের ১৫ এপ্রিল।[১৭] আর দেবকী ব্যানার্জির সঙ্গে হেনরি সেলসের বিয়ে হয় ১৮৫৬ সালের ১৮ অক্টোবর তারিখে।[১৮] এই ভদ্রলোক প্রথমে ছিলেন বিশপস কলেজের কর্মচারী, পরে ধর্মযাজক। বিয়ের সময়ে দেবকী ব্যানার্জির বয়স ১৮ বছর। (দেবকীর জন্ম এবং ব্যাপটিজমের তারিখ চার্চের কাগজপত্রে খুঁজে পাইনি। কিন্তু বিয়ের সময়কার বয়স দিয়ে হিশেব করলে, তাঁর জন্ম কমলের এক বছর পরে। তার অর্থ মধু ধর্মান্তরিত হবার সময়ে এঁর বয়স ছিলো ৫ বছর।) একে সঙ্গে করে নিয়েই কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি মাদ্রাসে গিয়েছিলেন ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে।[১৯] দেবকীর বিয়ের সময়ে কবি মাদ্রাস থেকে ফিরে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন।

বিয়ের তারিখ এগিয়ে আসছে, ওদিকে ধর্মযাজকদের কাছ থেকেও কিছু আশ্বাস পাচ্ছে, এভাবে দেখতে দেখতে জানুআরি মাস এসে গেলো। ৫ জানুআরি টাউন হলে কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভা। সেখানে ভিড় করেন সরকারী বড়ো কর্মকর্তা, দ্বারকানাথ এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরসহ কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক এবং অভিভাবকরা। বহু ছাত্রও ছিলেন সেখানে। সভায় রসময় দত্ত কলেজের বার্ষিক রিপোর্ট

পড়ে শোনালেন। শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ভাষণ দিলেন। ভাষণ দিলেন মি ব্যর্ড এবং বাংলার ডেপুটি গর্ভনর। কৃতিবান ছাত্ররা একে একে পুরস্কার নিলেন সভাপতির কাছ থেকে। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত রচনার জন্যে সভাপতি তার পরে বিতরণ করেন দুটি পদক। মিস্টার ক্যামেরন নিজে এই রচনার বিচারক ছিলেন।[২০] প্রচুর হাততালির মধ্যে মধু পেলেন সোনার পদক, আর তাঁর বন্ধু ভূদেব রুপোর পদক। পুত্রের কৃতিত্বে রাজনারায়ণ দত্তের বুক ফুলে উঠলো। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পরীক্ষার ভিত্তিতে যখন বৃত্তি পাওয়া ছাত্রদের নাম ঘোষণা করা হলো তখন মধুর নাম শোনা গেলো না। পরীক্ষার আগে তাঁর যে কিছু সমস্যা হয়েছিলো, আমরা আগেই তা লক্ষ্য করেছি। সাহিত্যে তিনি অবশ্য মোটামুটি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ৫০ মার্কের মধ্যে তিনি ৩০ পেয়ে অষ্টম



টাউন হল: মাইকেল এখান থেকে সোনার পদক নিয়েছিলেন

হয়েছিলেন। (গোবিন্দ দত্ত পেয়েছিলেন ৪৯, প্যারীচরণ সরকার ৪৭, ভূদেব ৩২।) কিন্তু সিনিয়র স্কলারশিপ তিনি পাননি। তাঁর সেই ৮ টাকার বৃত্তিই থেকে গেলো। ভূদেব কিন্তু আট টাকার জায়গায় পেলেন ৩০ টাকার বৃত্তি। রাজনারায়ণ বসুর ৩০ টাকার বৃত্তিও অপরিবর্তিত থাকলো।[২১]

মধু সিনিয়র স্কলারশিপ না-পেলেও, রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর ফলাফল নিয়ে কী গর্বিত হয়েছিলেন, তা বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের কদিন পরে কলেজের সিনিয়র শাখার হেড মাস্টার, জেমস ক্যর মধুর পদক পাঠিয়ে দেন তাঁদের বাড়িতে। বন্ধুরা এই পদক দেখতে চান। তার জবাবে মধু গৌরদাসকে লেখেন: 'আমার মেডলটা রয়েছে বাবার কাছে।'[২২] ছেলে কৃতিত্ব দেখিয়ে যে-পুরস্কার পেয়েছেন, পিতার কাছে সেটা অত্যন্ত মূল্যবান মনে হয় এবং তিনি সেটি সযত্নে গচ্ছিত রাখেন নিজের কাছে। হয়তো সেটা সগর্বে দেখিয়েছেন বন্ধুদের।

এ সময়ে মধু গৌরদাসকে যে-চিঠিপত্র লেখেন, তার মধ্যে দুখানা মাত্র পাওয়া গেছে। দুখানা চিঠিই খুব সংক্ষিপ্ত এবং তার মধ্যে দু-একটি টুকরো খবর ছাড়া কোনো আবেগের কথা নেই। তিনি যে খৃস্টান হবার জন্যে মিশনারিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, সামনে বিয়ের খাঁড়া ঝুলছে অথবা তিনি খুব কাতর হয়ে আছেন — এই দু খানা চিঠি থেকে তার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। বরং

দেখা যাচ্ছে, তিনি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের বাড়িতে খাবার জন্যে এবং একটি লম্বা কবিতা লিখছেন – সম্ভবত King Porus। এ থেকে মনে হয়, নভেম্বর মাসে বিয়ের খবর শুনে তিনি যতোটা উতলা এবং উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন জানুআরি মাসের প্রথম দিকে তা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিলেন। তা ছাড়া, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিলেত যাবার ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারবেন না বলে তাঁকে জানিয়ে দেওয়ায়, খৃষ্টান হয়ে বিয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং বিলেত যাবার দ্বৈত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে বলে মেনে নিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ে ডিয়ালট্রির সঙ্গে কৃষ্ণমোহন তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। অতঃপর যে-স্বপ্নকে তিনি অবাস্তব বলে বিবেচনা করেছিলেন, তারই আবার সফল হবার সম্ভাবনা দেখতে আরম্ভ করেন।

এভাবেই দ্রুত জানুআরি মাস শেষ হয়ে গেলো। প্রিয় শিক্ষক ডিএলআর ছুটিতে, জেমস ক্যর, যাঁকে তিনি হাড়ে হাড়ে অপছন্দ করেন, তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্বে। কলেজে যেতে মোটে ভালো লাগছিলো না। কিন্তু না-গিয়ে উপায় নেই। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। তবে তাঁদের কাউকে তিনি নিজের পরিকল্পনার আভাস দিতে ভরসা পান না। বরং সযত্নে আপন পরিকল্পনা লুকিয়ে রাখেন। খৃষ্টান হলে তিনি যে এঁদের সঙ্গে আর লেখাপড়া করতে পারবেন না, এমন কি, কারো কারো সঙ্গে বন্ধুত্বেও ভাঁটা পড়বে, এ তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। সে জন্যে তাঁর আচরণে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখাননি তিনি।. ডিয়ালট্রি অনেক ভরসা দিয়েছেন এবং দীক্ষা নেবার তারিখ ঠিক হয়েছে ৯ই ফেব্রুআরি। পয়লা, কি দোসরা (ফেব্রুআরি) তিনি এক মোহর দিয়ে ফিরিঙ্গি ধরনে চুল ছাঁটিয়ে এলেন। কলেজে এসে প্রিয় বন্ধু ভূদেবকে বললেন: 'বলো, কেমন লাগছে দেখতে?' মধু যে নিজস্ব ভঙ্গির বদলে ফিরিঙ্গিদের অনুকরণে চুল ছাঁটালেন, ঐতিহ্যবাদী বন্ধুর সেটা ভালো লাগলো না।[২৩] কিন্তু মধু কোনো যুক্তি দেখালেন না। ঝগড়া করলেন না। তিনি জানেন, তাঁর ধর্মান্তরের দিন ঘনিয়ে আসছে। আর জানেন, তাঁর বিলেত যেতেও দেরি নেই। কাউকে কিছু বললেন না তিনি। পরের দিন উধাও হলেন বাড়ি থেকে। পরিচিতদের মধ্যে শেষবার তাঁকে দেখেছিলেন দিগম্বর মিত্রের ছোটো ভাই – মধুর সহপাঠী – মাধব মিত্র। তাঁরা দুজন মিলে মিত্রদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন।[২৪] তবে একই বাড়ি থেকে বের হলেও, দুজনের উদ্দেশ্য অভিন্ন ছিলো না।

তাঁর যখন হদিস মিললো তখন তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে। কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিলের সন্তান এবং হিন্দু কলেজের একজন নাম-করা ছাত্রকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হবে – এটা মিশনারিদের একটা কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত। তাঁরা কেবল গরিব আর নিম্নবর্ণের লোকদের ধর্মান্তর করাতে পারেন টাকাপয়সা আর খাবার-দাবারের লোভ দেখিয়ে – এ কথা বলে তাঁদের প্রয়াসকে ছোটো করে দেখানো হতো ভারতবর্ষে এবং ইংল্যান্ডে। সে জন্যে যখন তাঁরা কোনো ধনী এবং উচ্চবর্ণের লোককে দীক্ষা দিতে সমর্থ হয়েছেন, তখন সেটাকে ফলাও করে প্রচার করেছেন।[২৫] মধুসূদন তেমন একজন দীক্ষাপ্রার্থী। কিন্তু সমাজের ওপরতলার কাউকে দীক্ষা দেবার পেছনে ঝুঁকিও আছে বিস্তর। স্থানীয় লোকেরা তার বিরোধিতা করেন। তা ছাড়া, দীক্ষার পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দীক্ষিতকে স্বধর্মে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টাও চলে। ১৮৪২ সালের নভেম্বর মাসে মিশনারিরা শ্যামাচরণ বসু নামে একটি উঁচুঘরের যুবককে দীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর আত্মীয়রা তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নেন।[২৬] মধুর বেলাতেও সেই চেষ্টা হতে পারে। তার চেয়েও সমূহ আশঙ্কার কথা মনে করিয়ে দেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নাকি বলেছিলেন, দীক্ষা দেওয়ার আগেই রাজনারায়ণ লাঠিয়াল এবং সড়কিওয়ালাদের নিয়ে মধুকে ছিনিয়ে নিতে পারেন মিশনারিদের কাছ থেকে। সে কারণে মধুকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো একেবারে দুর্গের ভেতরে।

খবর পেয়ে রাজনারায়ণ পুত্রকে উদ্ধার করার জন্যে যতো পথ ছিলো সবগুলোর কথাই ভেবেছিলেন। তিনি তো মধুর মতো কল্পনার জগতে বাস করছিলেন না। খৃষ্টান হবার ফলাফল কী হতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। সুতরাং মধুকে ছাড়িয়ে আনার সব রকমের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। সরকারী মহলে ভূকৈলাসের জমিদার সত্যচরণ ঘোষালের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। তিনি বাস করতেন খিদিরপুরে, মধুদের বাড়ির কাছেই।[২৭] রাজনারায়ণ তাঁকে দিয়ে মধুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। মধুকে জানানো হয়েছিলো, তাঁকে বিলেত যেতে দেওয়া হবে, বিয়ে করতে না-চাইলে বিয়ে করতে হবে না, মর্মাহত জাহ্নবী দেবী শোকে পাগলের মতো হয়েছেন ইত্যাদি। কিন্তু দুর্গের কর্তৃপক্ষ সত্যচরণকে মধুর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিলেন না। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের মতে, দুর্গের কর্তৃপক্ষ দেখা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন মধুর জেঠতুতো ভাই প্যারীমোহন, হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র আর বন্ধু গৌরদাসকে। তাঁরা পারিবারিক, সামাজিক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটা মধুর কাছে তুলে ধরেছিলেন। মধুকে এ সময়ে বিলেতে যাবার জন্যে রাজনারায়ণ নাকি এক হাজার টাকার কম্পেনির কাগজও পাঠিয়েছিলেন।[২৮] কিন্তু পিতা তাঁকে বিলেত পাঠাবেন এবং, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর বিয়ে বন্ধ করতে রাজি হয়েছেন — এ কথা শোনা সত্ত্বেও মধু কেন নিজের সংকল্প থেকে বিচলিত হলেন না, তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। তবে মিশনারিদের পক্ষ থেকে এ পর্যায়ে তাঁর ওপর অনেক চাপ ছিলো — এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর ধর্মান্তর ততোক্ষণে কলকাতার খৃষ্টান ধর্মযাজকদের কাছে একটা সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

৯ ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় ওল্ড চার্চে মধুর দীক্ষার কাজ শেষ হলো। চার্চের সামনে মোতায়েন থাকলো সশস্ত্র প্রহরী। এই চার্চের প্রধান পুরোহিত এবং আর্চডীকন ডিয়ালট্রি জর্ডানের বারি দিয়ে মধুর সব অতীতের পাপ ধুইয়ে দিলেন। মধু মাইকেলে পরিণত হলেন। নিজের ধর্মান্তরের মুহূর্তে গাইবার জন্যে একটি হীম রচনা করেছিলেন তিনি। গাম্ভীর্যের সঙ্গে সেটি গাওয়া হলো।[২৯] মধু লিখেছিলেন:

Long sunk in superstition's night,
By sin and Satan driven, -
I saw not, - cared not for the light
That leads the blind to Heaven.
*
I sat in darkness, Reason's eye
Was shut, - was closed in me; -
I hastened to Eternity
O'er Error's dreadful sea
*
I've broken Affection's trenderest ties
For my blest Saviour's sake; -
All, all I love beneath the skies,
Lord! I for Thee forsake!

সবাই প্রার্থনা করলেন মধু যাতে পুণ্যধর্মের পথ চিরকাল আঁকড়ে থাকতে পারেন। এ গানে খৃষ্টধর্মের প্রতি মাইকেল বিশেষ আকর্ষণ দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে হিন্দু ধর্মের তুলনায় এ ধর্মকে বিবেচনা করেছেন অনেক উন্নত বলে। দেশীয়দের দীক্ষা দেবার ইতিহাসে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটি

বিশিষ্ট নাম। অন্য পাঁচজনের মাপে তাঁকে ধর্মযাজকরা বিচার করেননি। বরং একটু বাড়তি সৌজন্য দেখিয়েছেন। আর্চডীকন ডিয়ালট্রি তাঁকে ব্যক্তিগত অতিথি হিশেবে নিয়ে যান তাঁর নিজের বাড়িতে।[৩০] তিনি যে মধুর দীক্ষার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। তবে মাইকেল নিজে তাঁকে দায়ী করেননি। দীক্ষা হয়ে যাবার অল্পদিন পরে গৌরদাস ডিয়ালট্রিকে দোষারোপ করে মধুর কাছে চিঠি লিখেছিলেন। তার জবাবে মধু লিখেছিলেন:

> তুমি যে আমার প্রতি বন্ধুত্ব দেখিয়েছো, তার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ না-হয়ে পারছিনে। কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি যে-ভ্রান্তির জন্যে কষ্ট পাচ্ছে (আমি বলতে চাইছি দুর্ভাগ্যক্রমে কষ্ট পাচ্ছে) তার জন্যে তোমাকে অনুকম্পা না-করেও পারছিনে। মি ডিয়ালট্রির এখানে আসার সময়টাকে তুমি কেন কুক্ষণ বলে মনে করছো? তুমি কি ভেবেছো তিনি আমাকে খৃস্টান হতে রাজি করিয়েছেন? তুমি দারুণ দুঃখজনক ভুল করছো।[৩১]

কেবল গৌরদাস নয়, মাইকেলের আত্মীয় এবং বন্ধুরা তাঁর 'সর্বনাশের' অর্থাৎ খৃস্টান হবার ব্যাপারে মি ডিয়ালট্রিকেই দোষারোপ করেছিলেন। এ চিঠির মাধ্যমে তিনি ডিয়ালট্রির দোষ স্খালন করেছিলেন এই বলে যে, খৃস্টান হবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি নিজে নিয়েছিলেন। ডিয়ালট্রি তাঁকে লোভ দেখিয়েছিলেন কিনা, তিনি তা স্বীকার অথবা অস্বীকার করেননি। কিন্তু বিলেত যাবার বিষয়টা যে ডিয়ালট্রির সঙ্গে আলোচনা হয়েছিলো, এক্ষুণি আমরা তা দেখতে পাবো।

মধুর মাইকেল হবার অব্যবহিত কারণ ছিলো আয়োজিত বিয়ে থেকে রক্ষা পাওয়া এবং বিলেত



Baptisms solemnized at the Old Church Fort William in Bengal A.D. 1843

Modoosoodun ... son of ... Rajnarayan ... Dutt ... Calcutta ... Hindoo College

মাইকেলের ব্যাপটিজমের দলিল

যাওয়া – এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে কারণে তাঁর সব জীবনীকারই খৃস্টান হওয়াটা তাঁর জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে স্বীকার করেছেন; কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর অন্তরের কোনো যোগাযোগ ছিলো, এটা স্বীকার করেননি। বরং খৃস্টধর্ম তাঁর অন্তর্জীবনে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি জোর দিয়ে জীবনী-লেখক এবং সমালোচকরা এই কথাটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। দীক্ষা উপলক্ষে মাইকেল

তাঁর হীমে যা লিখেছিলেন, তাতে নিজের সমাজের কুসংস্কার এবং পাপের কথা আছে। বলেছেন, তিনি এ যাবৎ অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলেন, এবারে যুক্তির আলো দেখতে পেয়েছেন। এবং এই আলোতে আসার জন্যে আকাশের নিচে যা কিছু তাঁর প্রিয়, সব ত্যাগ করেছেন। তাঁর এই ধর্মীয় সংগীতের সবটাই লোক-দেখানো, সবটাই মেকি – এটা মনে করার কারণ নেই। ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখতে পাবো, এই ঘটনার তিরিশ বছর পরে তিনি ব্যাপটিজম উপলক্ষে আর-একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেখানেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নেবার ঘটনাকে 'পবিত্রতর' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩২] তবে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধার্মিক হয়ে পড়েছিলেন – বলা ঠিক হবে না। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে এই ধর্মের সঙ্গে তিনি নিজেকে শনাক্ত করেছিলেন। তা ছাড়া, বহু খৃষ্টীয় মূল্যবোধকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন এবং কোনো একটা সময়ে তিনি নিজে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করার জন্যে মিশনারিও হতে চেয়েছিলেন।



ওল্ড চার্চ: উনিশ শতকের গোড়ার দিকে

যে-মাইকেল আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি পরবর্তীকালে আনুগত্য অথবা অনুরাগ দেখাননি, সেই মাইকেলই আবার যেভাবে বারবার পাপবোধ এবং আত্মার সদ্‌গতির কথা বলেছেন, অথবা হিন্দু ধর্মের তুলনায় খৃষ্টীয় পাশ্চাত্যের জয়গান করেছেন, তাতে তাঁর ওপর এ ধর্মের সূক্ষ্ম প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। দীক্ষা নেবার ছ বছর পরে তিনি *Visions of the Past* নামে যে-দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন, প্রসঙ্গত তার কথাও উল্লেখ করা যায়। এই কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন, আদি-মানব এবং আদি-মানবী কিভাবে শান্তি এবং আশীর্বাদের কুঞ্জ থেকে শয়তানের আবির্ভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন এবং তারপর আবার স্বর্গীয় জ্যোতির আশীর্বাদে অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরে গেলেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন, এঁরা আলোতে ফিরে গেলেও, আগেকার স্বর্গে ফিরে যেতে পারলেন না। সেখানে যাবার জন্যে তাঁদের অনুশোচনা এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।[৩৩] এই যে স্বর্গের স্বপ্ন তিনি অঙ্কন করেছেন, এর সঙ্গে হিন্দু ধর্মীয় অনুষঙ্গের কোনো যোগ নেই। বলা বাহুল্য, এটা তিনি পেয়েছিলেন খৃষ্টীয় ঐতিহ্য থেকে। ১৮৫০ সালে তাঁর স্ত্রী রেবেকা যখন তাঁদের কন্যা ব্যর্থাকে নিয়ে উত্তরের দিকে

বেড়াতে যান, তখন তিনি যে-সনেট রচনা করেন, তা থেকেও খৃষ্ট ধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস কতোটা গভীর ছিলো, তার প্রমাণ মেলে। এ কবিতায় তিনি বলেন যে, আমরা আনন্দের দিনে তাঁকে স্মরণ করিনে, স্মরণ করি দুঃখের তিমিরে। কবি নিজে তাঁর বিরহ এবং নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে যেভাবে Heavenly Father-কে O Lord - our God of glorious majesty বলে স্মরণ করেছেন, যথাসময়ে আমরা তার পরিচয় পাবো।[৩৪]

পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে হিন্দু সমাজের বহু কুসংস্কার সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েছিলেন। সেই সমাজে তখনো যুক্তির বাণী অনেকাংশে অর্থহীন, এ-ও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এ রকমের অনেক ঘটনা তিনি যে তাঁর উনিশ বছরের জীবনে দূর থেকে দেখেছিলেন, তাই নয়; মর্মে মর্মে সেটা অনুভব করেছিলেন যখন বাবা-মা তাঁর বিয়ের আয়োজন করেন। তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কথা তাঁরা এক বারও ভেবে দেখেননি! একজন বিবেকবান এবং স্পর্শকাতর লোককে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে বাধ্য করলে সেটা যে তাঁর মনের ওপর কী দারুণ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে, বাঙালি সমাজে তার ভূরি ভূরি নজির নেই সত্যি, কিন্তু একেবারে নেই, তা নয়। দু দশক পরে, আর-একজন যুক্তিবাদী মানুষ — শিবনাথ শাস্ত্রী বাবার আয়োজিত বিয়ের অত্যাচারে কি রকম জর্জরিত হয়েছিলেন, তাঁর আত্মজীবনী থেকে তার খানিক আভাস পাওয়া যায়। একদিকে তিনি একটি নিরপরাধ মহিলাকে ত্যাগ করতে পারছেন না, অন্যদিকে তাঁর সঙ্গে বিবাহিত সম্পর্কও পালন করতে পারছেন না — এই অসাধারণ মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যেও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন।[৩৫] মাইকেলকে অতো দূর অবধি যেতে হয়নি, তার আগেই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সমাজ যে যুক্তির ধার ধারে না, হাড়ে হাড়ে সেটা তিনি টের পেয়েছিলেন। তাই মনে হয়, তিনি হীরেয় যে-কথা লিখেছিলেন, তার সবটা কৃত্রিম ছিলো না।

মধু বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন, কিন্তু পালিয়ে বেঁচেছিলেন কিনা — এক কথায় সেটা বলা যায় না। তিনি অনেকের তুলনায় বেশি আদর-যত্নের মধ্যে মানুষ হচ্ছিলেন। অবশ্য অভিভাবকরা তাঁকে মানুষ করাছিলেন — সমাজ যাকে উন্নতি বলে — সেই উন্নতির পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার জন্যে। তিনি যে সবার থেকে আলাদা, সৃষ্টি-ছাড়া একটা মানুষ হবেন, এটা তাঁর অভিভাবকরা আশা করেননি। দিনরাত্রি কবি হবার স্বপ্ন দেখলেও, তিনি নিজেও সে পর্বে কল্পনা করেননি যে, কবিতা লেখাকে তিনি পেশা হিশেবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু প্রচলিত অর্থে উন্নতির যে-সরল পথ ধরে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন খৃস্টান হবার ঘটনা তাঁকে সে পথ থেকে একেবারে দূরে ঠেলে দেয়। অতঃপর তাঁর কক্ষপথ অন্য পাঁচ জনের মতো সুগোল ছিলো না, সেটা হয়ে গিয়েছিলো ধূমকেতুর কক্ষপথের মতো — উৎকেন্দ্রিক। এর পরে তিনি নিয়মমাফিক কিছু করেননি, যা করেছেন আকস্মিক ঝোঁকের মাথায় এবং তাঁর সব ব্যবস্থা ছিলো সাময়িক। কিন্তু খৃস্টান হতে না-হলে, বাড়ি ত্যাগ করতে না-হলে, তিনি কী হতেন, এখন আর তা বলার জো নেই।

লেখাপড়ায় খুব ভালো এবং একমাত্র সন্তান হিশেবে মধুকে তাঁর বাবামা কতোটা ভালোবাসতেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই পুত্র যখন হঠাৎ খৃস্টান হলেন, তখন তাঁর পিতামাতা তাকে সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবার মতো বিবেচনা করেছিলেন, সন্দেহ নেই। মুহূর্তের মধ্যে রাজনারায়ণ দত্তের মাথায় যেসব চিন্তা খেলে যাওয়া স্বাভাবিক, সেগুলো হলো: 'আমি মরে গেলে আমাকে পিণ্ডি দেবে কে? আমার এতো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কে? মধুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো কি করে? ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে গোটা সমাজ আমাকে একঘরে করবে!' যে-সন্তান তাঁদের নয়নমণি, জীবিত থাকতেও সে যে এখন মৃতের অধিক — এই মর্মান্তিক দুঃখে রাজনারায়ণ দত্ত এবং জাহ্নবী দেবী অর্ধ-

মৃত হয়েছিলেন। কবির প্রতি সহানুভূতিবশত তাঁর জীবনী-লেখকরা তাঁর পিতামাতার এই দারুণ যন্ত্রণাকে খানিকটা লঘু করে দেখিয়েছেন বলে সন্দেহ হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, মর্মাহত হলেও, অচিরে খৃষ্টান পুত্রের কল্যাণের ব্যাপারে রাজনারায়ণ সচেতন হয়েছিলেন। এমন কি, কিছু কাল পরে অংশত সন্তানের মঙ্গল এবং অংশত হিন্দুত্বের টানে সেকালের বিবেচনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে পুত্রের লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন — যদিও প্রথাবদ্ধ হিন্দু সমাজের কট্টর গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার মধ্যে থেকে খৃষ্টান পুত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাও সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিলো না — বিশেষ করে একজন উকিলের পক্ষে — যাঁর ব্যবসা নির্ভরশীল সামাজিক শুভেচ্ছার ওপর।

পুত্র খৃষ্টান হবার ঠিক পরে পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-দারুণ সংকট দেখা দিয়েছিলো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা থিতিয়ে এসেছিলো। তারপর মধুর সঙ্গে পিতামাতার সম্পর্ক কী হবে, তার সংজ্ঞা মোটামুটি সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মাইকেল গৌরদাসকে যে-চিঠি লেখেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, ততোদিনে বাবা-মার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিলো।[৩৬] এই পর্যায়ে তিনি বোধ হয় বাড়িতে গিয়ে বাবা-মার সঙ্গে অথবা বাড়ির কাছাকাছি কোথাও বাস করার কথা ভেবেছিলেন। বাড়ি থেকে তিনি দরাজভাবে টাকাপয়সা পাচ্ছিলেন, একটি চিঠিতে তারও উল্লেখ আছে। 'ডিসেম্বরের আগে আমি ইংল্যান্ডে যাচ্ছিনে। শিগগিরই আমি গিয়ে বাবার সঙ্গে অথবা তাঁর কাছাকাছি কোথাও থাকবো। তবে মি ডিয়ালট্রির সঙ্গে ইংল্যান্ডে যাওয়া হচ্ছে না; বাবা তা হতে দেবেন না।'[৩৭] — তাঁর এই প্রশান্ত উক্তি থেকে বোঝা যায়, রাজনারায়ণ তাঁকে বিলেত পাঠানোর ব্যাপারে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে ডিয়ালট্রির ইংল্যান্ড যাবার কথা। মাইকেল তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণ মিশনারিদের সঙ্গে তাঁকে যেতে দিতে রাজি হলেন না। তিনি চেয়েছিলেন বিলেত যাবার লোভ দেখিয়ে অথবা সত্যি সত্যি সেখানে পাঠিয়ে পুত্রের আশা পূরণ করে মিশনারিদের কাছ থেকে তাঁকে সরিয়ে আনবেন। ডিয়ালট্রির সঙ্গে যেতে দিলে সেই উদ্দেশ্য কেবল যে ব্যর্থ হবে, তাই নয়, বরং মিশনারিদের সঙ্গে পুত্রের ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে যেতে পারে। সে জন্যে তিনি মধুকে বছরের শেষের দিকে — হয়তো ডিসেম্বরে — পাঠানোর প্রস্তাব দেন। কিন্তু কার্যকালে তিনি আর তাঁকে বিলেতে যাবার জন্যে সম্মতি অথবা টাকাপয়সা দেননি। কেন, তা জানা যাচ্ছে না। পিতা কি আশা করেছিলেন যে, পুত্রকে বিলেত যাবার আশা দিয়ে এবং কিছু দিন মিশনারিদের সংস্রব থেকে দূরে রাখতে পারলে, ঘরের ছেলে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার ঘরে ফিরে আসবে! অসম্ভব নয়। বরং এই প্রত্যাশাকেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

খৃষ্টান হবার কারণ যদি হয়ে থাকে আয়োজিত বিবাহের ফাঁস থেকে রক্ষা পাওয়া আর বিলেত যাওয়া, তা হলে সেটা এ পর্যায়ে পরিবারের মধ্যে ফিরে গিয়েও মাইকেল অর্জন করতে পারতেন বলে মনে হয়। তবু তিনি পরিবারে ফিরে এলেন না কেন? বস্তুত, পরিবারে ফিরে আসার পেছনে তাঁর জন্যে যথেষ্ট প্রলোভনও ছিলো। অপর পক্ষে, খৃষ্টান সমাজ অথবা ধর্মকে আঁকড়ে থাকার মধ্যে তাঁর এমন কী আকর্ষণ ছিলো? খৃষ্ট ধর্মে তাঁর বিশ্বাস কি এমন মজবুত ছিলো যে, তিনি আর সে ধর্ম ত্যাগ করে পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যেতে পারতেন না? খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে তখনকার মতো বিয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া ছাড়া তিনি আর কোনো লাভ করেছিলেন বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে, তা হলে খৃষ্ট ধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্য কী কারণে তিনি অতো প্রতিকূলতার মধ্যেও অতো দীর্ঘ দিন ধরে টিকিয়ে রাখলেন? এ প্রশ্নের জবাব এতো কাল জানা ছিলো না। কিন্তু বিশপস কলেজের তখনকার দুই অধ্যাপক — জর্জ উডনি উইদার্স এবং অ্যালফ্রেড স্ট্রীটের চিঠি এবং অন্য রচনা থেকে এর একটা মোটামুটি উত্তর পাওয়া যায়। তাঁদের মতে, খৃষ্ট ধর্মে তিনি কেবল বিশ্বাস স্থাপন করেননি, বরং তিনি এ ধর্মের প্রতি রীতিমতো আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[৩৮] তাঁর এই আকর্ষণ বছর দেড়েকের মধ্যে

কতো প্রবল হয়ে উঠেছিলো, তাঁর বিশপস কলেজে ভর্তির প্রসঙ্গে আমরা তা লক্ষ্য করবো। এখানে কেবল এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে পর্যায়ে, মধু 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' হিন্দু ধর্মের তুলনায় খৃষ্ট ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কোনো কিছুর বিনিময়ে বিসর্জন দিতে তৈরি ছিলেন না। খৃষ্ট ধর্মের কোন কোন বৈশিষ্ট্য তখনকার মতো এই ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণকে আন্তরিক এবং তীব্র করে তুলেছিলো, তা আমাদের জানা নেই। তিনি নিশ্চয় আশা করেছিলেন যে, এই ধর্মের ছায়ায় তিনি তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। এক দশক পরে তিনি এক বক্তৃতায় যেভাবে খৃষ্টধর্মকে হিন্দুধর্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠ করে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন, এ প্রসঙ্গে তা মনে রাখা যেতে পারে। তাঁর খৃষ্ট ধর্ম-প্রীতির গোড়াপত্তন হিন্দু কলেজে থাকতেই হয়েছিলো বলে মনে হয়।

মধুকে বাড়িতে রাখার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করার পরেও, বোধ হয় সমাজের কথা চিন্তা করে রাজনারায়ণ পুত্রকে আর বাড়িতে রাখতে পারেননি। মধু কিছুতেই একটা প্রতীকী প্রায়শ্চিত্ত করতেও রাজি ছিলেন না। এবং এ জন্যে সমাজের বিরুদ্ধতার কারণে নিজেদের বাড়িতে বাস করা দূরের কথা, বাবমা-র কাছাকাছি বাস করারও সুযোগ পাননি। কিন্তু মাঝেমধ্যেই তিনি এ সময়ে বাড়িতে আসতেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে। বিশেষ করে মায়ের সঙ্গে। ওদিকে, কলেজে ফিরে যেতে গিয়ে দেখলেন, সে কলেজের দ্বার তাঁর জন্যে রুদ্ধ। হিন্দু কলেজে তখনো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা ছিলো না। সে ব্যবস্থা হয়েছিলো আরও বছর দশেক পরে।[৩৯] তিনি ভাবলেন, ধীরে ধীরে উত্তেজনা চলে গেলে, পুরোনো ছাত্র তিনি — সেই সুবাদে তাঁকে হয়তো কলেজ বিশেষ বিবেচনায় ফিরে যেতে দেবে। কিন্তু রাজনারায়ণ দত্তের তদবির সত্ত্বেও মাইকেল কলেজে ফিরে যাবার অনুমতি পেলেন না। মাইকেল নিজেও এ সময়ে (মার্চ-এপ্রিল), তাঁর ভাষায়, বার পঞ্চাশেক ডিএলআরের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে ২৬ টাকা দিয়ে চারখানা বইও কিনেছিলেন।[৪০] কলেজে ফিরে যাবার ব্যাপারে তিনি কি তাঁর কাছেও তদবির করেছিলেন? অসম্ভব নয়। কিন্তু ১৫ এপ্রিল তারিখে ডিএলআর *হিন্দুস্তান* জাহাজে করে চলে যাবার আগে পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টার ফয়সালা হলো না।

এর পরে ১৯ এপ্রিল থেকে কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল হলেন জেমস ক্যর। ১৯ জুন থেকে স্থায়ী প্রিন্সিপাল।[৪১] তিনি যে কেবল মাইকেলকে কলেজে যাবার অনুমতি দিলেন না, তাই নয়, তিনি অন্য ছাত্রদেরও হুকুম দিলেন, তাঁরা কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। গৌরদাসকে লেখা অন্তত দুটি চিঠিতে ক্যরের অনুমতি নেবার কথা কবি উল্লেখ করেছেন।[৪২] হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সদ্য-ধর্মান্তরিত একটি যুবকের সঙ্গে মেলামেশা করছে — এ কথা রটে গেলে কলেজের অন্য ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে কী প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা ক্যর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতিতে বারো বছর আগে কলেজের পরিচালকদের চাপে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৪৩] এবারে ক্যর আগে থেকে সতর্ক হলেন। ওদিকে, রাজনারায়ণ আশা ছাড়তে পারলেন না — ফেব্রুআরি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ছেলের কলেজের বেতন দিয়ে দিলেন।[৪৪] কলেজ সেটা গ্রহণও করলো। কিন্তু তার পরেই কলেজের পরিচালকমণ্ডলী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো — কোনো ধর্মান্তরিত ছাত্রকে কলেজে পড়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না, কারণ তা হলে সেটা অন্য ছাত্রদের ধর্মান্তরে উৎসাহ দেবে।[৪৫] সুতরাং হিন্দু কলেজের দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হলো মধুর জন্যে।

ধর্মান্তরের ফল পেলেন তিনি হাতে-হাতে — বাড়িতে ঢুকতে পারলেও থাকতে পারলেন না; আর কলেজে ঢুকতেই পারলেন না। ওদিকে, ডিয়ালট্রি গোড়াতে সমাদর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেও,

সেখানে কয়েক দিনের বেশি থাকতে পারেননি। তাঁকে তখন থাকতে দেওয়া হলো মিশন রো-র ওল্ড চার্চে — যেখানে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন। এখানে থাকার সময়ে তিনি অনুভব করলেন, এটা তাঁর জীবনের একটা সংকট কাল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। তাঁদের সঙ্গ পছন্দ করতেন। কিন্তু খৃষ্টান হবার পরে হঠাৎ সবাই তাঁর কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেলেন। ভূদেব একবার এসেছিলেন তাঁর ধর্মান্তরের পরে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অন্য বন্ধুদের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাওয়ার উপায় নেই। কেবল যোগাযোগ রাখছিলেন প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাস। কবি তাঁকে ইংরেজি প্রবাদ মনে করিয়ে দেন — প্রয়োজনের সময়ের বন্ধুই সত্যিকার বন্ধু। মনে করিয়ে দেন, তাঁকে ভুলে না-যাবার কৈশোরক প্রেমের পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গৌরদাসও মাঝেমধ্যে অজুহাত দেখান। মাইকেল তাঁকে লেখেন: 'দরকার হলে পালকি ভাড়া করে এসো — টাকার জন্যে ভেবো না, আমার অনেক টাকা আছে।' তিনি যে এ সময়ে কী নিঃসঙ্গ ছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁর একটি চিঠি থেকে:

> কথায় বলে 'সে-ই সত্যিকার বন্ধু, যে তোমাকে প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য করে।' এখন আমি সংকটের মধ্যে আছি এবং তুমি যদি আমার সত্যিকার বন্ধু হও, তা হলে এখন সেটা দেখাও। তুমি কি ভাবছো, আমি তোমার কাছে টাকা ধার চাইবো? তুমি কি ভাবছো আমাকে কোনো জিনিশ জোগাড় করে দেবার জন্যে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের ওপর আমি আঘাত করবো? না, না, না! মোটেই সে রকমের কোনো বিষয় নয়। চমকে উঠো না। হায়! আমি একা! এবং আমার যা প্রয়োজন, তা হলো সঙ্গ। হ্যাঁ গৌর! তুমি কি এসে আমার সঙ্গে আজকের দিনটা কাটাবে? আমি প্রায় নিশ্চিত যে, তুমি এটা করবে না, কিন্তু যেহেতু তুমি দাবি করো যে, তুমি আমার বন্ধু সে জন্যে আমি যে সংকটে আছি, এটা তোমাকে জানানো আমার — বলতে গেলে — একটা দায়িত্ব।[৪৬]

এই একবারই নয়, তিনি বার বার গৌরদাসকে অনুরোধ জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে, তাঁর সঙ্গে গিয়ে সময় কাটানোর জন্যে। এবং তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়, গৌরদাস নানা রকমের বাধা সত্ত্বেও, তাঁর সঙ্গে এই যোগাযোগ বহাল রেখেছিলেন। গৌরদাসকে তিনি তাঁর ভালোবাসার নিশ্চয়তা দিয়েছেন এভাবে: 'কবি তাঁর প্রিয়াকে বলেছেন — Can I cease to love thee! No! — আমিও সে রকম করেই আমার প্রিয়, প্রিয় এবং সত্যিকার (যেটা খুব বিরল), সত্যিকার বন্ধুকে বলছি!'[৪৭] এই ভালোবাসার টান গৌরদাসও অনুভব করতেন, তাই কবি যতোটা চাইতেন, ততোটা না-হলেও, মাঝেমধ্যে তিনি যেতেন তাঁর কাছে। তা ছাড়া, অনেক সময়েই চিঠিপত্র লিখতেন। কয়েক বার তিনি অন্য বন্ধুদেরও সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, এঁদের নিয়ে কবি বাইরে কোনো অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে গেছেন।[৪৮] কিন্তু তাঁর নিঃসঙ্গ মনের তৃষ্ণা তাতে মিটতো না। তিনি কখনো ভূদেব, কখনো বেণী, কখনো বঙ্কু, কখনো ভোলানাথের কথা লিখতেন গৌরদাসের কাছে। বন্ধুদের কাছে তাঁর কথা মনে করিয়ে দিতে বলতেন।[৪৯]

ওল্ড চার্চে কয়েক মাস থাকলেও কবি দীর্ঘ দিন থাকতে পারেননি। আসলে থাকার জন্যে তিনি একটা জুৎসই জায়গাই পাচ্ছিলেন না। তখন কলকাতায় একজন দেশীয় খৃষ্টানের পক্ষে দেশীয় পাড়ায় একটা বাড়ি ভাড়া পাওয়া সহজ ছিলো না। ওদিকে, খৃষ্টান হলেও, ইংরেজদের মধ্যে থাকার অসুবিধে তিনি বেশ টের পাচ্ছিলেন। এ সময়েই একজন সজ্জন ধর্মযাজক তাঁকে আশ্রয় দিলেন — মি টমাস স্মিথ।[৫০] মধু হয়েছিলেন অ্যাংলিকান খৃষ্টান। তখন কলকাতার বিভিন্ন শাখার খৃষ্টানদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিলো তীব্র। কোন চার্চ কতোজন ধর্মান্তর করাতে পারে, সেটা ছিলো তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত একটা প্রশ্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, স্কটিশ চার্চের ধর্মযাজক মি স্মিথ মাইকেলকে নিজের বাড়িতে রাখেন। ধারণা করি টাকার বিনিময়ে। তিনি তখন বাস করতেন বরানগরে। আমার অনুমান, এ ব্যাপারে

কলকাতায় স্কটিশ চার্চের অন্যতম প্রধান ধর্মযাজক অ্যালেকজান্ডার ডাফের হাত ছিলো। তিনি নিজে কৃষ্ণমোহনের মতো মধুকেও খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা দিতে না-পারলেও আশ্রয় দানের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন।

ইতিমধ্যে গৌরদাস ছাড়া অন্য বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কমে এসেছে। হয়তো অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু গৌরদাসের সঙ্গেও তাঁর এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছিলো। মধু যে মাইকেলে পরিণত হয়েছিলেন, এটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। চিঠিতে তিনি একবার মধুকে নতুন নামে সম্বোধন করলেন। লিখলেন, 'প্রিয় খৃষ্টান বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্ত'। বন্ধু তাতে দারুণ বিরক্ত হলেন। গৌরদাসকে নিজের অভিমানের কথা জানিয়ে দিলেন।[৫১] একটি চিঠিতে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁকে কি বলে সম্বোধন করতে হবে।[৫২] ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী মাইকেল নিশ্চয় মনে মনে প্রশ্ন করেছেন, এঁরা ধর্ম দিয়ে সব বিচার করে কেন? তিনি নিজে খৃষ্টান হয়েও অন্যদের সঙ্গে মানবিক সম্পর্কগুলো ভুলতে পারেননি, অথবা সেগুলোর নতুন সংজ্ঞাও দিতে পারেননি। খৃষ্টান হয়েছেন, সে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, সে তাঁর নিজের সমস্যা। তাতে বন্ধুত্ব বিনষ্ট হবে কেন? প্রথাবদ্ধ সমাজের এই অদ্ভুত মনোভাবকে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো।

ওদিকে তাঁর লেখাপড়ায় কঠিন বাধার সৃষ্টি হয়েছিলো। যে মধু লেখাপড়া করতে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন, যাঁকে বন্ধুরা এই অভ্যেসের জন্যে নাম দিয়েছিলেন 'গ্রন্থকীট', সেই মধুর লেখাপড়া প্রায় বন্ধ। কেবল যে কলেজের আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া হচ্ছে না, তাই নয়, সমস্ত পরিবেশটাই এমন এলোমেলো এবং সমস্যায় ভরে গিয়েছিলো যে, তা লেখাপড়ার অনুকূল ছিলো না। নিজের পুরোনো বইগুলো জোগাড় করে লেখাপড়ায় মন দিতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর এক বন্ধু — শিবের কাছ থেকে ইংরেজি ব্যাকরণ এবং রোম্যানদের ইতিহাস ফেরত চেয়ে পাঠান।[৫৩] কিন্তু তাঁর পড়ার আগ্রহ দেখে যিনি তাঁকে সত্যিকার সাহায্য করতে পারলেন, তিনি মি টমাস স্মিথ। ধর্মযাজক হলেও, সাহিত্যে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো। মাইকেল তাঁর বাড়িতে থাকার সময়েই — ১৮৪৪ সালের মে মাসে — *Calcutta Review* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার চতুর্থ সম্পাদক হয়েছিলেন মি স্মিথ। (দ্বিতীয় সম্পাদক হয়েছিলেন মি ডাফ।) শেকসপীয়রের সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো। তিনি মাইকেলকে নিয়মিতভাবে শেকসপীয়র পড়াতে শুরু করলেন। এই পড়া মাইকেলের খুব কাজে লেগেছিলো। আসলে এ সময় থেকেই তাঁর সাহিত্যরুচির বিবর্তন আরম্ভ হয়। হিন্দু কলেজেও শেকসপীয়র পাঠ্য ছিলো। রিচার্ডসন শেকসপীয়র পড়াতেনও চমৎকার। কিন্তু মাইকেল তখন পর্যন্ত ভক্ত ছিলেন রোম্যান্টিক কবিদের। শেকসপীয় এবং মিল্টন পড়লেও সে পর্যায়ে তিনি ভালোবাসতে পারেননি। হয়তো সে সাহিত্যের গভীরে ডুব দেবার মতো সামর্থ্য তাঁর ছিলো না। মি স্মিথ তাঁকে নতুন একটা জগতের সন্ধান দিলেন এবং সেখানে বিচরণের পথ বাতলে দিলেন।

মনে হয়, স্মিথের বাড়িতে থাকার সময়ে ধর্মের প্রতিও তাঁর মনোভাব অনেকাংশে বদলে যায়। এক সময়ে ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। কিন্তু দীক্ষা নেবার পর ধীরে ধীরে, বিশেষ করে স্মিথের সাহচর্যে এসে, তিনি খৃষ্ট ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন। ধর্মান্তরের পর তিনি আপন পরিচিত পরিবেশ থেকে ছিটকে পড়েছিলেন অনেক দূরে। কেবল আত্মীয়-স্বজন নন, তাঁর প্রিয় বন্ধুরাও একে একে তাঁকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। অপর পক্ষে, কবি তাঁর বন্ধুদের কথা কতোটা মনে করতেন এবং তাঁদের সঙ্গ চাইতেন গৌরদাসকে লেখা চিঠিগুলো থেকে পরিষ্কার তা বোঝা যায়। বোঝা যায়, তিনি কী তীব্রভাবে স্বজন হারানোর বেদনা অনুভব করেছিলেন। এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি

একটা পরিচয়ের সঙ্কটে পড়েন এবং খৃষ্ট ধর্মকে সান্ত্বনা হিশেবে আঁকড়ে ধরেন। অল্পকালের মধ্যে কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে নয়, খৃষ্ট ধর্মের প্রতিই দারুণ উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এমন কি, এই উৎসাহের আতিশয্যবশত ১৮৪৪ সাল নাগাদ তিনি মিশনারি হবেন বলে ভাবতে আরম্ভ করেন।

লেখাপড়ার মতো আর-একটা জিনিশ এ সময়ে বাধা পেয়েছিলো — সে হলো তাঁর কবিতা রচনার ধারা। ১৮৪১-৪২ সালে তিনি বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন এবং সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিলো। ১৮৪২ সালের বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে যাবার পরে তিনি কয়েকটি কবিতা লন্ডনের দুটি নাম করা পত্রিকায় প্রকাশের জন্যেও পাঠিয়েছিলেন।[৫৪] তারপরই বিয়ে নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। সেই ঝামেলা থেকে একে একে লেখাপড়ার সমস্যা, থাকার সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা — নানা রকমের সমস্যা দেখা দেয়। এই অস্থিরতার মধ্যে কবিতা লেখার মতো অনুকূল পরিবেশ অথবা অনুপ্রেরণা পাননি। তবে খৃস্টান হবার মাস তিনেকের মধ্যে পরিবারের সঙ্গে যখন একটা আপোশ-রফা হয়, তখন কবিতা লেখার কথা ভেবেছিলেন বৈকি। গৌরদাসকে লিখেছিলেন: 'দীক্ষা নেবার পর থেকে কবিতা তেমন লেখা হয়নি। তবে তার চেষ্টা করছি। আর এবারে কোথা থেকে কবিতা প্রকাশিত হবে, জানো? একেবারে খোদ লন্ডন থেকে।'[৫৫] নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কল্পনাবিলাসটুকু ছাড়তে পারেননি। নিজেকে জাহির করার মনোভাবও নয়। এই একটি মাত্র চিঠি পড়লেও মাইকেল-চরিত্রের এই দিকটি চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয়। ১৮৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (সুরেশচন্দ্র মৈত্রের মতে মার্চ মাসে[৫৬]) *Literary Gleaner* পত্রিকায় তাঁর King Porus নামে যে-কবিতাটি প্রকাশিত হয়, সেটি জানুআরি মাসে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন এবং শেষ করেন দীক্ষা নেবার পরে।

মি স্মিথের বাড়িতে তিনি প্রায় বছরখানেক ছিলেন। আগেই দেখেছি, তাঁর জীবনের এই পর্বটি তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্যজীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলো। কিন্তু তাঁর বাড়িতে থেকে মাইকেলের আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার অথবা আবাসিক সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। বিলেত গিয়ে লেখাপড়া শিখবেন বলে তাঁর যে-আশা ছিলো, তা-ও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। ১৮৪৪ সালের গোড়ার দিকে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর বিলেতে যাওয়া হচ্ছে না। তা ছাড়া, তিনি যে হিন্দু ধর্মে ফিরে যাবেন না, অনেক ঝগড়াঝাটির পর সেটাও তাঁর পরিবারের কাছে ততোদিনে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি বরং বলতে শুরু করেন যে, তিনি বিশপস কলেজে গিয়ে লেখাপড়া শিখে মিশনারি হবেন। এর পেছনে কেবল ধর্মপ্রীতি ছিলো বলে মনে হয় না। তিনি পেশা হিশেবেও মিশনারি হবার কথা ভেবে থাকবেন। তাঁর আগে কৃষ্ণমোহন মিশনারি হয়েছিলেন।[৫৭] মহেশচন্দ্র ঘোষও মিশনারি হবার উদ্দেশে বিশপস কলেজে কিছু কাল লেখাপড়া শেখেন। কিন্তু অকালে মারা যাবার ফলে মিশনারি হতে পারেননি।[৫৮] গোপালচন্দ্র মিত্র ডীকন হন ১৮৪৩ সালে।[৫৯] তখন মিশনারিদের সবচেয়ে নিচের পদ — ক্যাটেকিস্টের বেতন ছিলো ৮০ টাকা, ডীকনের ১৫০ টাকা আর প্রীস্টের ২০০ টাকা।[৬০] চাকরি হিশেবে দেখলে শিক্ষিত বাঙালিদের জন্যে বেশ প্রলোভনের কাজ। তাই কবির কাছে এই লক্ষ্য হয়তো অদ্ভুত মনে হয়নি। তিনি গিয়ে বিশপস কলেজ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিশনারি হবার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এ কলেজে যাঁরা লেখাপড়া করতেন, তাঁরা সবাই ছাত্রবৃত্তি পেতেন। থাকার জন্যে অথবা লেখাপড়া শেখার জন্যে তাঁদের কোনো খরচ দিতে হতো না। মাইকেলও ছাত্রবৃত্তি নিয়ে সেখানে ভর্তি হতে চান। এতে তীব্র বাধা দেন রাজনারায়ণ। কারণ, খৃস্টান হয়েছেন বলে মধু একেবারে মিশনারি হবেন — এটা তিনি মোটেই মেনে নিতে পারলেন না। কলেজের অধ্যক্ষ জর্জ উডনি উইদার্সের চিঠি থেকে এ সম্পর্কে পরিষ্কার জানা যায়। মাইকেল এই কলেজে ভর্তি

হবার ঠিক পরে অধ্যক্ষ এক চিঠিতে লেখেন:

> চতুর্থ ছাত্রটি – মধুসূদন দত্ত – বেতন-দেওয়া ছাত্র। বেতন দেওয়া ছাত্র এই প্রথম আমরা ভর্তি করলাম। সে ভর্তি হতে চেয়েছিলো ধর্মতত্ত্বের ছাত্র হিশেবে। কিন্তু তার পিতা – যিনি এখনো একজন হীদেন – তিনি এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি খাওয়ার খরচ এবং কলেজের বেতন দিয়ে পড়ানোর বিকল্প বেছে নেন এবং (অবস্থাপন্ন লোক হিশেবে) সেটা তিনি অনায়াসে করতেও পারেন।[৬১]

বেতন দিয়ে পড়া আর বেতন না-দিয়ে ছাত্রবৃত্তি নিয়ে পড়ার মধ্যে পার্থক্য কি তা আরও পরিষ্কার হয় অধ্যাপক অ্যালফ্রেড স্ট্রীটের একটি চিঠি থেকে। তিনি লেখেন:



বিশপস কলেজ

> সে (ভাট) এখানে আসে মিশনারি হবার প্রকাশ্যে ঘোষিত সংকল্প নিয়ে। তাঁর পিতা, যিনি একজন মোটামুটি ধনী নেটিব, তিনি অন্তত এটা ঠেকানোর উদ্দেশ্যে একজন বেতন-দেওয়া ছাত্র হিশেবে তাকে কলেজে রাখার প্রস্তাব দেন। এবং (তখন থেকে) তা-ই করেছেন।[৬২]

বেতন দিয়ে পড়লে মিশনারি হবার ব্যাপারে অগ্রিম কোনো প্রতিশ্রুতি দেবার আবশ্যক নেই এই কারণেই রাজনারায়ণ পুত্রকে বেতন দিয়ে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আশা করেছিলেন, কিছু কালের মধ্যে পুত্রের মন বদলে যেতে পারে। সে ফিরে আসতে পারে তাঁর পিতৃপুরুষের ধর্মে।[৬৩] ঠিক এক বছর ন মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকার পর ৯ নভেম্বর (১৮৪৪) মাইকেল ভর্তি হলেন বিশপস কলেজে। কয়েক সপ্তাহের জন্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় বিভাগের ছাত্র। তবে তার পরই তাঁকে দ্বিতীয় বিভাগে তুলে দেওয়া হয়। (কলেজের মোট তিনটি বিভাগ ছিলো। প্রথমে ছাত্ররা ভর্তি হতো সাধারণত তৃতীয় বিভাগে।)[৬৪]

বিশপস কলেজে ভর্তি হওয়ায় দু দিক থেকেই তাঁর সমস্যার সমাধান হয়েছিলো – সেখানে লেখাপড়া শেখার খুব ভালো ব্যবস্থা ছিলো; আর ব্যবস্থা ছিলো বাসস্থানের। মধু কলেজে একার জন্যে একটা ঘর পেয়েছিলেন। কলেজের বেতন এবং থাকার খরচ মাসে ৬৪ টাকা[৬৫]; আর মধুর হাত খরচ ৩৬

টাকা – এই মোট এক শো টাকা দিতে হতো রাজনারায়ণকে। মায়ের কাছ থেকেও মধু টাকাপয়সা নিতেন – এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না।

হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে মধুর জীবন যেমন নির্ঝঞ্ঝাট ছিলো, বিশপস কলেজে তাঁর জীবন তেমন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ছিলো বলে মনে হয় না। কারণ, পিতার সঙ্গে কলহ ছাড়াও তিনি একাধিক বার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন – এক বার মদ্যপান নিয়ে, এক বার পোশাক নিয়ে[৬৬] এবং একবার তার চেয়েও গুরুতর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে – যার কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করবো। তবু বলা যায় যে, বিশপস কলেজে ভর্তি হবার পর প্রায় আড়াই বছর তাঁর জীবন ধরা-বাঁধা পথে এবং রুটিনমাফিক চলেছিলো।

বিশপস কলেজের আর হিন্দু কলেজের মধ্যে ছিলো আকাশ-পাতাল ব্যবধান। হিন্দু কলেজ নামে হিন্দু হলেও এখানকার পাঠ্য-তালিকায় নৈতিক শিক্ষা ছাড়া হিন্দু ধর্ম শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। তদুপরি, যতো দিন ডিরোজিও বেঁচেছিলেন, ততোদিন বরং হিন্দু ধর্মবিরোধী একটা মনোভাব কলেজের অনেক ছাত্রের মধ্যে দানা বেঁধেছিলো। একটা ইহলৌকিকতার মনোভাবও কারো কারো মধ্যে দেখা দিচ্ছিলো। মাইকেল এই কলেজে ডিরোজিও-বিপ্লবের কয়েক বছর পরে পড়তে এলেও, হিন্দু ধর্ম এবং প্রচলিত রীতিনীতি-বিরোধী মনোভাবের ধারা তখনো কলেজ থেকে লোপ পায়নি। এই পরিবেশে মধু হিন্দুধর্ম-বিরোধী কোনো কার্যকলাপে লিপ্ত না-হলেও হিন্দু সমাজে প্রচলিত বহু রীতিনীতির প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন। অপর পক্ষে, বিশপস কলেজ ছিলো সত্যিকারভাবে একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজ তৈরি হয়েছিলো ইংল্যান্ডের বাইরে খৃস্ট ধর্মীয় শিক্ষা ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। ধর্মান্তরের পর স্বরূপের সংকট থেকে হোক, ধর্মযাজকদের সাহচর্যে হোক, তাঁর মনে যে-ধর্মীয় ভাব জেগে উঠেছিলো, বিশপস কলেজের ধর্মীয় পরিবেশে তা শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলকাতার অদূরে এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন কলকাতার তখনকার বিশপ – মি মিডলটন। এই কলেজ স্থাপনের জন্যে গভর্নর জেনরেল মার্কুইস অব হেস্টিংস বিশপ মিডলটনের অনুরোধে বট্যানিক্যাল গার্ডেনের পাশে মোট ৬২ বিঘা জমি দান করেন। পরে চার্লস মেটকাফ দান করেছিলেন আরও এক খণ্ড জমি।[৬৭] মিডলটন নিজে দান করেন ৫০০ পাউন্ড আর লাইব্রেরির জন্যে ৫০০ বই। এ ছাড়া সাহায্য এসেছিলো নানা সূত্র থেকে। ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি দান করেছিলো পাঁচ হাজার পাউন্ড।[৬৮] চার্চ মিশনারি সোসাইটি দিয়েছিলো এক হাজার পাউন্ড। অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের প্রেসে ছাপা সব বই-এর এক খণ্ড করে দান করেছিলো। প্রথম থেকেই এই কলেজের লাইব্রেরি অত্যন্ত মূল্যবান বইপত্রে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই কলেজের কাজ আরম্ভ হয় ১৮২০ সালের ডিসেম্বর মাসে। বস্তুত, এই কলেজ গড়ে ওঠে খৃস্টান ধর্মযাজক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিশেবে। খুব কম ছাত্র এখানে পড়তে আসতো। খরচও ছিলো সেকালের তুলনায় খুব বেশি। যে-ছাত্ররা এখানে পড়তে আসতো, তারা আসতো ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। সুদূর শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ ভারত থেকেও এখানে ছাত্ররা পড়তে আসতো।[৬৯] মাত্র জনা কুড়ি ছাত্রের জন্যে[৭০] এ কলেজে তিন জন পুরো অধ্যাপক ছাড়াও, নানা ধরনের আরও চারজন দেশীয় শিক্ষক ছিলেন। এই কলেজে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খুব গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হতো ধ্রুপদী ভাষা এবং সাহিত্য। তার চেয়েও বড়ো কথা, এই কলেজের পরিবেশে একটা ধর্মীয় ভাব এবং গাম্ভীর্য বজায় রাখা হতো।

ধর্মের ব্যাপারে এখানে কী কড়া নিয়ম পালন করা হতো, তার একটা প্রমাণ পেয়েছি এই কলেজের

অধ্যাপক অ্যালফ্রেড স্ট্রীটের একটি চিঠি থেকে। চিঠির তারিখ পয়লা ফেব্রুআরি ১৮৪৭।[৭১] এতে দেখা যায়, মধুসূদন দত্ত তাঁর মাদ্রাসের সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু চার্লস এগব্যর্ট কেনেটের সঙ্গে কলকাতার রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের বিশপ ডক্টর ক্যারিউ-এর সঙ্গে দেখা করতে যান আগের বছরের শেষ দিকে। কেনেটের মা ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক। সেই সূত্রে কেনেটও ছেলেবেলায় রোম্যান ক্যাথলিক ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁর পিতার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং অ্যাংলিকান হন। কলকাতায় তাঁর পূর্ব পরিচিত রোম্যান ক্যাথলিক বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। সেই সূত্রে মাইকেল এবং চার্লস কেনেট ডক্টর পি জে ক্যারিউ-এর সঙ্গে দেখা করতে যান। বিশপের সঙ্গে পরিচিত হবার সময়ে মাইকেল তাঁর প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর আংটিতে চুমু খান। এই নিয়ে তাঁদের দু জনের কৈফিয়ত চাওয়া হয়, কারণ এই চুমু দেওয়ার মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ পেতে পারে। দু জনই লিখিত কৈফিয়ত পেশ করেন। ব্যাপারটা আর্চডীকন ডিয়ালট্রিকেও জানানো হয়। (ডিয়ালট্রি এঁদের দিকে নজর রাখার পরামর্শ দেন।) পরে দুজনকে সতর্ক করে বলা হয় যে, নিতান্ত প্রয়োজন না-হলে তাঁরা যেন আর কখনো রোম্যান ক্যাথলিক বিশপের সঙ্গে দেখা না-করেন।[৭২] কয়েক মাস ধরে ঝামেলা চলার পর ঘটনাটা চাপা পড়ে। অধ্যাপক স্ট্রীটের ভাষা থেকে বোঝা যায়, গোটা কলেজ, এমন কি, কলকাতার অ্যাংলিকান প্রতিষ্ঠান এই বিষয়টাকে কী রকমের গুরুতর বলে বিবেচনা করেছিলো।

মাইকেল হিন্দু কলেজে ভর্তি হবার আগে অন্য যে-স্কুলে পড়েছেন, সেখানে ল্যাটিন, গ্রীক এবং হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন বলে তাঁর জীবনীকারেরা দাবি করেছেন। কিন্তু তিনি এসব ভাষা কতোটা জানতেন, তা এ যাবৎ নির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারেননি। বিশপস কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড জর্জ উডনি উইদার্সের চিঠি থেকে এখন সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়, মাইকেল এই কলেজে ভর্তি হবার সময়ে বিভিন্ন ভাষা কতোটা জনাতেন। এ চিঠি তিনি লিখেছিলেন আর্নেস্ট হকিন্সের কাছে — মাইকেল ভর্তি হবার ঠিক এগারো দিন পরে।

> চতুর্থ ছাত্রটি (মধুসূদন দত্ত) তুলনামূলকভাবে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে অনেক বেশি পরিচিত। তদুপরি তার ল্যাটিন ভাষার কৃতিত্ব পাওয়ার মতো জ্ঞান আছে, গ্রীক ভাষার অআকখও সে জানে।[৭৩]

তিনি বিশপস কলেজে এসে দ্বিতীয় বার গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষা শেখার সুযোগ পান। উইদার্স নিজে হিব্রু ভাষার একটি ব্যাকরণ লিখেছিলেন। তবে এ কলেজে হিব্রু পড়ানো হতো কিনা, তার কোনো প্রমাণ পাইনি। মাইকেল এ কলেজে থাকার সময়ে ল্যাটিন এবং গ্রীক — দুই ভাষাতেই তাঁর দক্ষতার পরিচয় দেন। ২৩ জুলাই ১৮৪৭ তারিখে সোসাইটি ফর দ্য প্রোপ্যাগেশন অব দ্য গসপেল (এসপিজি)-এর সেক্রেটারি রেভারেন্ড জি এইচ ফ্যাগানকে লেখা এক চিঠিতে অধ্যাপক স্ট্রীট লিখেছিলেন গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষার মাইকেলের জ্ঞান কতোটা গভীর।[৭৪]

দীর্ঘ দিন লেখাপড়ার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ থাকার পর, কলেজে ফিরে যেতে পেরে মাইকেল খুশি হয়েছিলেন বলে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মাস দুয়েকের মধ্যে তিনি ডুবে গেলেন তাঁর লেখাপড়ায়। এ সময়ে তাঁর ব্যস্ততার মাত্রা বোঝা যায়, তাঁর একটি চিঠি থেকে (২৭. ১. ৪৫):

> এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, আমি এর আগে তোমার দুখানা সহৃদয় পত্রের জবাব দিতে পারিনি। কিন্তু তুমি যদি জানতে এখানে আমার সময় কী করে কাটছে, তা হলে তুমি নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করতে। অবশ্য তুমি যদি আসো এবং তোমার সঙ্গে অন্য কোনো বন্ধুদের নিয়ে আসো, তা হলে আমি তোমার এবং সেই বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুশি হবো। .. এতো ছোটো চিঠির জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে হবে; কিন্তু বিধাতার নামে বলছি, আমার পক্ষে আর একটা মিনিট সময়ও নষ্ট করা সম্ভব নয়।[৭৫]

হিন্দু কলেজে তিনি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, কিন্তু সাহিত্যকে তিনি সেখানে একটা ধর্মনিরপেক্ষ এবং মানবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছিলেন। তা ছাড়া, ধ্রুপদী সাহিত্যের পাশাপাশি সমকালীন সাহিত্যের পঠনপাঠনও হতো সেখানে। বিশেষ করে নিজে একজন রোম্যান্টিক কবি হিশেবে ডিএলআর সমকালীন কাব্য সাহিত্যের প্রতি ছাত্রদের কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। রোম্যান্টিক কবিদের প্রতি মাইকেলের মনে যে-গভীর ভালোবাসা লক্ষ্য করি, সেটা নিতান্ত হিন্দু কলেজের আমলে। এ সময়ে তিনি বায়রন, কীটস, স্কট, মূর, বার্নস, রিচার্ডসনের জগতে বিচরণ করতেন এবং এঁদের রচিত সাহিত্যকে বিবেচনা করতেন অনুকরণীয় একমাত্র সাহিত্য হিশেবে। পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, তিনি নিজে রোম্যান্টিক কবিতার অনুকরণ করলেও, কয়েক বছরের মধ্যে রোম্যান্টিক কবিদের প্রতি তাঁর অতিরিক্ত ঔৎসুক্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রসঙ্গত, ১৮৬০ সালে তিনি রঙ্গলাল সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন, তাও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি তখন বলেছিলেন: 'রঙ্গলালের দৌড় বড়ো জোর বায়রন, স্কট আর মূর পর্যন্ত। এই কবিরা ভালো কবি হলেও শ্রেষ্ঠ কাব্য এঁরা রচনা করেননি। বায়রনকে হয়তো ব্যতিক্রম বলে গণ্য করা যায়। আমি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে তার চেয়ে বেশি পছন্দ করি।'[৭৬] এই উক্তি থেকে দেখা যায় তাঁর প্রথম যৌবনের সাহিত্য-চিন্তা ততোদিনে কতোটা পাল্টে গিয়েছিলো। তরুণ বয়সে তিনি রোম্যান্টিক কবিদের প্রতি, বিশেষ করে বায়রনের প্রতি, কথায় কথায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও পরিণত বয়সে কোনো দিন তিনি আর রোম্যান্টিক কবিদের সম্পর্কে কোনো বেহিশেবী অথবা উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেননি। রোম্যান্টিক সাহিত্য থেকে তাঁর মন কতো দূরে সরে গিয়েছিলো, য়োরোপ-বাসের সময়কার আলোচনা থেকেও আমরা তার পরিচয় পাবো।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে দেখা দিয়েছিলো ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি অসামান্য প্রেম। এই রুচি গঠনে কোনো একটি সূত্র যদি সবচেয়ে প্রবলভাবে কাজ করে থাকে, তা হলে সেটা হলো বিশপস কলেজ। এই কলেজে উইদার্স, স্ট্রীট এবং, শেষ বছর, মি ওয়েঙ্গারম্যানের কাছে তিনি আর-এক ধরনের সাহিত্যে হাতেখড়ি নিয়েছিলেন, সাহিত্যকে দেখতে শিখেছিলেন আর-এক দৃষ্টিকোণ থেকে। এই কলেজের পাঠক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হতো। ইউরিপিদিসের মতো নাট্যকারের সঙ্গে এখানেই তাঁর পরিচয়। কিন্তু এখানে বিশেষ করে ঝোঁক ছিলো ধর্মীয় সাহিত্যের দিকে। গ্রীক ভাষায় বাইবেল এখানে খুব বিশদভাবে শেখানো হতো। সংস্কৃত এবং বাংলাও পড়ানো হতো। তবে মাইকেল পড়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না। লন্ডনে এসপিজির কাছে পাঠানো বিশপস কলেজের প্রতিবেদনে ইংরেজি সাহিত্যের কোনো উল্লেখ দেখতে পাইনি। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত, এখানে ইংরেজি পড়ানো হতো কিনা। এই কলেজে ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে এতো দিনের ভালো-লাগা রোম্যান্টিক সাহিত্যকে তিনি হয়তো অগভীর এবং হালকা সাহিত্য হিশেবে বিবেচনা করে থাকবেন। এ জন্যেই বলতে হয় যে, পরিণত বয়সে তিনি যে-সাহিত্য রচনা করেন, তার ভিত্তি অনেকাংশে তৈরি হয়েছিলো বিশপস কলেজে। এই কলেজে না-পড়লে, তিনি পরে যে-পণ্ডিতকবি হয়েছিলেন, তা হতে পারতেন কিনা, সন্দেহ আছে। আর তিনি খৃস্টান না-হলে হিন্দু পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে তার গতানুগতিক ব্যাখ্যা না-দিয়ে যে-মানবকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তা রচনা করতে পারতেন কিনা, সে সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। *Visions of the Past* সহ তাঁর একাধিক রচনাও এই কলেজে তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যয়নের প্রত্যক্ষ ফল।

বিশপস কলেজে ধ্রুপদী ভাষা এবং সাহিত্যের স্বাদ পাওয়ায় পরে তিনি আর অনুবাদের মাধ্যমে

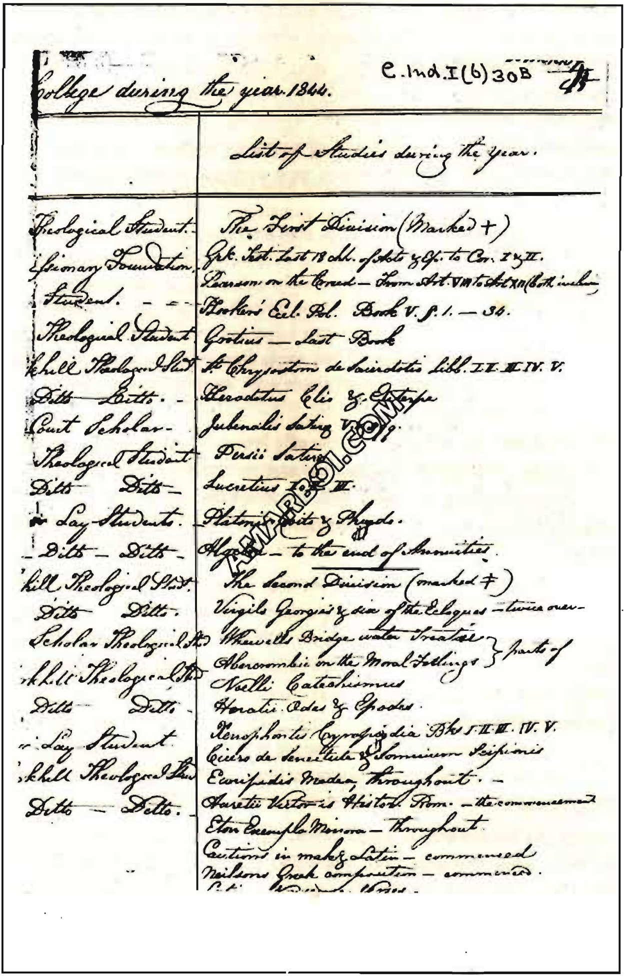
ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ে তৃপ্ত হতে পারেননি; বরং মূল ভাষায় মূল গ্রন্থ পড়ার চেষ্টা করেছেন। মাদ্রাসে গিয়ে তিনি যে তামিল-তেলেগু শিখেছিলেন এবং মূল দক্ষিণী রামায়ণ পড়তে চেষ্টা করেন, তাও এই ধ্রুপদী ভাষা এবং সাহিত্যপ্রীতির প্রত্যক্ষ ফল। ১৮৬১ সালেও তিনি কলকাতায় বসে মূল ইতালীয় ভাষায় ত্যাসো পড়তে আরম্ভ করেন[৭৭] — সেও বিশপস কলেজে অধ্যয়নের প্রভাব। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে, তাঁর খৃষ্টান হওয়া এবং বিশপস কলেজে পড়া — উভয়ই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশের জন্যে আশীবাদের কারণ হয়েছিলো। এই কলেজে তাঁর অধ্যয়নকাল শেষ হবার মুখে তাঁর অন্যতম অধ্যাপক রেভারেন্ড স্ট্রীট তাঁর সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন, তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

> সে খুব চালাক-চতুর। গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষার ভালো ছাত্র। এখানে আসার আগেই ইংরেজি-কবিতা লিখে সে খ্যাতি লাভ করেছিলো — এ কথা উল্লেখ করলেই বুঝতে পারবেন, ইংরেজি সে পুরোপুরি আয়ত্ত করেছে। সে হলো বালকসুলভ অহমিকা-পূর্ণ এবং সেই সঙ্গে আত্মশ্লাঘা-পূর্ণ একটি তরুণ। তবু সে বাধ্যগত, সম্মানযোগ্য, নীতিবাদী এবং, আমি বিশ্বাস করি, ধার্মিক। সে এখানে এসেছিলো উদারপন্থী ইয়ং বেঙ্গলের হাবভাব এবং বিশ্বাস নিয়ে — যদিও ইয়ং বেঙ্গলের খারাপ অভ্যাসগুলো তাঁর ছিলো না। কিন্তু মানুষের যথেচ্ছ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং বশ করার ব্যাপারে চার্চপদ্ধতির শিক্ষা অথবা, যাকে বলতে পারেন, ঈশ্বরভীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ক্ষমতা [তাঁর ওপর] লক্ষ্য করা গেছে।[৭৮]

স্ট্রীট মিশনারি ছিলেন। মনে করা সঙ্গত যে, তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষা খুব যে কার্যকর হয়েছে — এটা তিনি দেখতে চাইতেন। তবু তাঁর এবং উইদার্সের মন্তব্য ছাড়া সে সময়কার মাইকেল চরিত্র নির্মাণের কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নেই। স্ট্রীটের মন্তব্যে অতিরঞ্জন থাকতে পারে — এ কথা মনে রেখেও এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, বিশপস কলেজে পড়ার সময়ে তাঁর চরিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিলো।

হিন্দু কলেজে থাকলে মাইকেলের ছাত্রজীবন শেষ হতো ১৮৪৫-৪৬ সালে। তাঁর সহপাঠী এবং সমসাময়িক ছাত্রদের কেউ কেউ অবশ্য এর আগেই কলেজ ত্যাগ করেন। গোবিন্দ দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর আর প্যারীচরণ সরকার খুব ভালো ছাত্র ছিলেন, তবে তাঁরা সবাই ১৮৪২ সালের শেষে হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৪৩ সালে জ্ঞানেন্দ্রমোহন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন; প্যারীচরণ হুগলি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন; আর গোবিন্দ দত্ত কলেজ ছাড়ার পর চাকরি পান ট্রেজারিতে। কবির বেশির ভাগ সহপাঠীই কলেজ ছেড়ে যান ১৮৪৬ সালে। এ বছরের জুলাই মাসেও গৌরদাস পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, মাইকেলের চিঠি থেকে তা জানা যায়।[৭৯] গৌরদাসসহ ক্লাসের অন্য কয়েকজন ডেপুটি হয়েছিলেন।[৮১] জগদীশনাথ রায় তুখোড় ছাত্র ছিলেন। তিনি পুলিশ বিভাগে বড়ো চাকরি পেয়েছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় আর রাজনারায়ণ বসু পেশা বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতা।[৮০]

ধর্মান্তরের পর দেড় বছর মাইকেল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে পারেননি। ১৮৪৭ সালের শেষে তিনি যখন বিশপস কলেজ ত্যাগ করেন, তখন তিনি সিনিয়র বিভাগের ছাত্র, তবে সেখানকার চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি তখনো উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তার অর্থ এ নয় যে, তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন না। ১৮৪৬ সালের জানুআরি মাসে কলেজের প্রিন্সিপাল রেভারেন্ড উইদার্সের লেখা একটি চিঠি থেকে দেখা যায়, তার ঠিক আগে ডিসেম্বরে যে-পরীক্ষা হয়েছিলো, তাতে মাইকেল ধর্মতত্ত্ব এবং ধ্রুপদী সাহিত্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।[৮১] তা ছাড়া, স্ট্রীটের চিঠি থেকে আগেই আমরা দেখেছি, তিনি ভাষা শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন।[৮২] এ কলেজে থাকার সময়ে তিনি যে লেখাপড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতেন, তাও ভালো করে জানা যায়। ১৮৪৫ সাল থেকে ৪৭ সাল পর্যন্ত গৌরদাসকে



[illegible] College during the year 1844. E.Ind.I(b)30B

	List of Studies during the year.
Theological Student.	The First Division (Marked +)
[illegible]issionary Foundation	Grk. Test. Last 18 ch. of Acts & Ep. to Cor. I & II.
	Pearson on the Creed — from Art. VIII to Art. XII (both inclusive)
Student.	Hooker's Eccl. Pol. Book V. § 1. — 34.
Theological Student	Grotius — Last Book
[illegible]hill Theological Stud.	St. Chrysostom de Sacerdotio Libb. I. II. III. IV. V.
Ditto Ditto.	Herodotus Clio & Euterpe
Court Scholar.	Juvenalis Satirae V. [illegible]
Theological Student	Persii Satirae
Ditto Ditto	Lucretius I. & III.
Lay Students.	Platonis Crito & Phaedo.
Ditto — Ditto	Algebra — to the end of Annuities.
[illegible]hill Theological Stud.	The Second Division (marked ‡)
Ditto Ditto.	Virgils Georgics & six of the Eclogues — twice over
Scholar Theological Std.	Whewells Bridgewater Treatise } parts of
[illegible]hill Theological Std.	Abercrombie on the Moral Feelings }
	Nowelli Catechismus
Ditto Ditto.	Horatii Odes & Epodes
Lay Student.	Xenophontis Cyropaedia Bks I. II. III. IV. V.
	Cicero de Senectute & Somnium Scipionis
[illegible]hill Theological Stu.	Euripides Medea throughout. —
Ditto — Ditto.	Aurelii Victoris Histor. Rom. — the commencement
	Eton Exempla Minora — throughout
	Cautions in making Latin — commenced
	Neilsons Greek composition — commenced.
	[illegible]

বিশপস কলেজের পাঠক্রম, ১৮৪৪

লেখা তাঁর ছ খানা চিঠি পাওয়া গেছে। সবগুলো চিঠিই আকারে ছোটো এবং সবগুলো চিঠির মধ্যে একটি জিনিশ অভিন্ন দেখতে পাই – সে হলো তাঁর ব্যস্ততার উল্লেখ। বিশপস কলেজে লেখাপড়ার চাপ যে খুব বেশি ছিলো, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন: 'এখন টার্মের সময়, তোমার সঙ্গে দেখা করা অসম্ভব।'[৮৩] কিন্তু কলেজ যখন খোলা থাকতো না, তখনো তিনি কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন – তাঁর চিঠি থেকে তারও আভাস পাওয়া যায়। 'নানা কারণে গত ছুটিতে আমি তোমার সঙ্গে একদিনের জন্যেও দেখা করতে পারিনি, এ জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত।'[৮৪] তাঁর এ সময়কার চিঠিতে আর-একটা জিনিশ বেশ লক্ষ্য করা যায় – গৌরদাসের প্রতি আগে যে-কৈশোরক প্রেমের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেতো, তার অনেকটা ততোদিনে শুকিয়ে এসেছিলো। তবে তিনি যে তাঁর একান্ত আন্তরিক বন্ধু, গৌরদাসের অব্যাহত বন্ধুতা এবং অবিচল আনুগত্য থেকে এ উপলব্ধি তাঁর পাকা হয়েছিলো। 'যাঁরা আমাকে সত্যি ভালোবাসে তাদের যে আমি আরও বেশি করে মনে করিনে, এ জন্যে নিশ্চিতভাবে আমি নিজেকে একটা বদমাশ বলে গণ্য করি।'[৮৫] যাঁদের তিনি এ যাবৎ বন্ধু বলে বিবেচনা করতেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর যে একটা সত্যিকার দূরত্ব তৈরি হয়েছিলো, এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া তিনি কোনোদিনই চলতে পারেননি। বিশপস কলেজে তা হলে তিনি কাদের বন্ধু হিশেবে পেয়েছিলেন? তাঁর অধ্যাপকদের চিঠি থেকে জানা যায়, এখানে তাঁর অন্তত তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখতে পাবো, তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন কোন দিকে মোড় নেবে এঁদের একজন সে ব্যাপারেও বড়ো রকমের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

এই কলেজে তিনি প্রথমে যাঁকে বন্ধু হিশেবে পেয়েছিলেন, তাঁর নাম জর্জ ম্যান। তাঁর বয়স ছিলো মাইকেলের চেয়ে তিন বছরের ছোটো। কবি এই কলেজে ভর্তি হওয়ার এক মাস দুদিন পরে জর্জ ভর্তি হন। তিনি মরিশাস থেকে এসেছিলেন ধর্মযাজক হওয়ার শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। তিনি আশা করেছিলেন যে, ধর্মযাজক হয়ে মরিশাসে ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকেদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তাঁদের অন্তহীন অগ্নির হাত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার ঠিক ন মাস পরে – ১৮৪৫ সালের ১১ অগস্ট তারিখে তিনি হঠাৎ মাত্র চার দিনের জ্বরে মারা যান। মৃত্যুর মাত্র তিন ঘণ্টা আগে তিনি চার্চে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করান।[৮৬] মরিশাসবাসীদের নরকের যন্ত্রণা থেকে বাঁচানোর তাঁর মহৎ আকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু মাইকেলকে তিনি পেয়েছিলেন সত্যিকার বন্ধু হিশেবে। তাঁর মৃত্যুর পর তাই মাইকেল মরিশাসে গিয়ে বন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার সংকল্প করেন। কিন্তু একটা বড়ো রকমের বাস্তব বাধা এসে তাঁর পথ আটকালো। তিনি মরিশাসে যাবেন, কিন্তু তাঁর বেতন কে দেবে? সেখানে থাকার খরচ জোগাবে কে? তিনি তাই বিষয়টা নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে মাদ্রাসের বিশপের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন।

বিশপস কলেজে মাইকেলের দ্বিতীয় বন্ধু চার্লস এগবার্ট কেনেট। মাদ্রাস থেকে এই কলেজে আসেন মাদ্রাস চার্চমণ্ডলী মিডলটন বৃত্তি নিয়ে, সেখানকার লর্ড বিশপের নির্দেশে।[৮৭] তাঁর বয়স ছিলো মাইকেলের চেয়ে দু বছরের ছোটো। মাইকেলের ছ মাস পরে – ১৮৪৫ সালের এপ্রিল মাসে – তিনি এই কলেজে এসে ভর্তি হন এবং তাঁর আগেই – ১৮৪৭ সালের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে – তিনি এই কলেজের পাঠ শেষ করে মাদ্রাসে ফিরে যান।[৮৮] তিনি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েনগুডিতে ক্যাটেকিস্টের অর্থাৎ ধর্মযাজকদের মধ্যে সবচেয়ে নিচের পদে চাকরি পেয়েছিলেন। তবে অল্প কালের মধ্যেই – ১৮৫১ সালে তিনি ডীকন পদে উন্নীত হন। কবির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিলো। সত্যি বলতে কি, মাইকেলের জীবনের গতি কোন দিকে যাবে, তারও খানিকটা তিনি প্রভাবিত করেছিলেন বলে মনে হয়। কেনেটের স্ত্রী ফীবির নাম অনুসারে মাইকেল তাঁর দ্বিতীয় কন্যার নামও দিয়েছিলেন

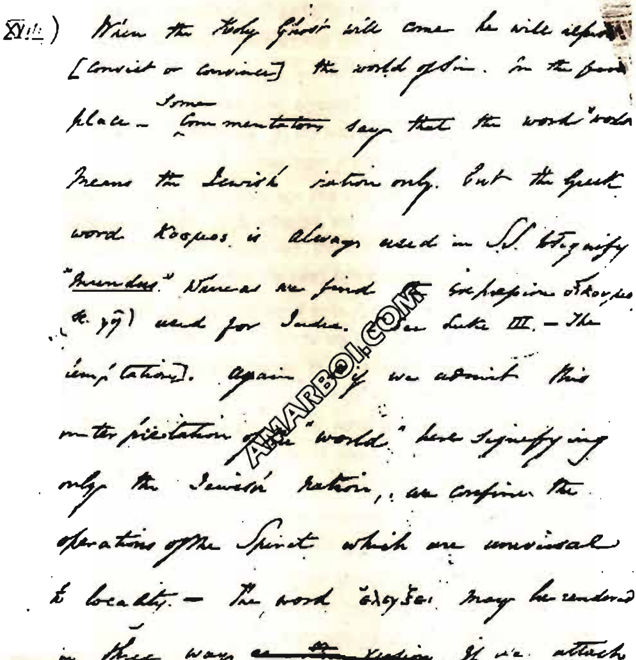
and thorough master of English, as you may suppose when I mention that before coming here he affected fame as an English poet. A piece of boyish vanity not without its correspondent conceits now, yet, he is obedient, honorable, moral, and I believe religious. He came here with the airs and notions of liberal young Bengal – though not its bad practices – but the power of education on Church system, or, if you will, of Instruction seasoned by the fear of God, has been shown in the constraint and taming of human freedom. I have thought it worth while to narrate all this partly as an instance hereof, but more in order to show the sad effects of the unsettled state of the Salary question. Some indeed may be disposed to say that it furnished in this case the very one test of character that was needed. Granted, provided no question is nevertheless raised as to the sincere Christianity of the party. He deceived himself as to the amount of his zeal, but he adds sincerity to zeal and to talents and so there remains a balance in the account which we can only carry to Profit and Loss with a sad heart . . .

(He is very intelligent, and a good Greek & Latin scholar and thorough master of English, as you may suppose when I mention that before coming here he affected fame as an English poet. A piece with boyish vanity not without its correspondent conceit now, yet, he is obedient, honourable, moral, and I believe religious. He came here with the airs and notions of liberal Young Bengal - though not its bad practices - but the power of education on Church system, or, if you will, of instruction seasoned by the fear of God, has been shown in the constrained and taming of human freedom. I have thought it worthwhile to narrate all this partly as an instance hereof, but more in order to show the sad effects of the unsettled state of salary question. Some indeed may be disposed to say that it furnishes in this case the very one test of character that was needed. Granted, provided that no question is nevertheless raised as to the sincere Christianity of the party. He deceived himself as to the amount of his zeal, but he adds sincerity to zeal and to talents. And so there remains a balance in the account what we can only carry to "Profit and Loss" with a sad heart.)

অধ্যাপক স্ট্রীটের রিপোর্টের এক পৃষ্ঠা।

ফীবি।[৮৯] তা ছাড়া, কবি তাঁর একটি কন্যার নামের সঙ্গে কেনেট নামও জুড়ে দিয়েছিলেন,[৯০] তবে, অনুমান করি, সেটা চার্লস এগবার্ট কেনেটের পিতা চার্লস কেনেটের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে, এগবার্টের প্রতি নয়। ১৮৮৪ সালে তিনি মারা যান।

এই কলেজে মাইকেলের তৃতীয় বন্ধু রবার্ট চার্লস ওয়কার। মাইকেলের চেয়ে দু বছরের ছোটো। বিশপস কলেজে পড়তে আসেন কবির ছ মাস পরে – পয়লা এপ্রিল ১৮৪৫ তারিখে।[৯১] খুব ভালো


XVII) When the Holy Ghost will come he will reprove [convict or convince] the world of sin. in the first place – Some commentators say that the word "world" means the Jewish nation only. But the Greek word κόσμος is always used in SS. to signify "mundus." ... used for Judea. See Luke III. – The temptation]. Again if we admit this interpretation of the "world" here signifying only the Jewish nation, we confine the operations of the Spirit which are universal to locality. – The word ἐλέγξει may be rendered in three ways. If we attach

নিউ টেস্টামেন্ট বিষয়ে মাইকেলের পরীক্ষার খাতা। এই পরীক্ষা হয়
৯ জুন, ১৮৪৭ তারিখে। নিচের দিকে একটি গ্রীক শব্দ দেখা যাচ্ছে।

ছাত্র ছিলেন তিনি। ১৮৪৯ সালের শেষ দিকে তিনি কলেজের চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর কলেজ ত্যাগ করে চলে যাবার ঠিক আগে হঠাৎ কদিনের জ্বরে তিনি মারা যান ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখে। তাঁর মৃত্যুতে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ওয়েন্ডারম্যান লন্ডনে এসপিজির কাছে খুব দুঃখ প্রকাশ করে একটি চিঠি লিখেছিলেন।[৯২] চার্লস এগবার্ট কেনেটের মতো ওয়কারও ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান।

বন্ধুত্ব ছাড়াও, পরিবারের কাছ থেকেও মধু অসামান্য আদর-যত্ন পেয়েছিলেন। প্রথমে সাগরদাঁড়িতে তিনি বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। তারপরে কলকাতায় এসেও বাবা-মার

ডানার নিচে পক্ষী-শাবকের মতো লালিত হয়েছেন। জীবনের রূঢ় দিকগুলো সম্পর্কে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা ছিলো না। সেই নিরাপদ সুখের আশ্রয় ত্যাগ করে তিনি প্রথম রূঢ়তার স্বাদ পেয়েছিলেন খৃষ্টান হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অবশ্য তখনো তাঁর মধ্যে স্বনির্ভরতা এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু প্রথমে ওল্ড চার্চে কয়েক মাস এবং টমাস স্মিথের বাড়িতে বছর খানেক বাস করার ফলে তাঁর মধ্যে একটা স্বনির্ভরতা দেখা দিতে আরম্ভ করে। তারপর মূল কলকাতার বাইরে — বিশপস কলেজে — বাস করার ফলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছিলো বলে মনে হয়। তা না-হলে তিনি সম্পূর্ণ অজানা উপকূলের দিকে তরী ভাসাতে ভরসা পেতেন কিনা, সন্দেহ আছে।

বিশপস কলেজে শেষ বছর তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে এ যাবৎ বলতে গেলে কিছুই জানা ছিলো না। যেটুকু জানা ছিলো, তার উৎস প্রধানত গৌরদাসকে লেখা কয়েকটি বিরল পত্র। ১৮৪৭ সালের মাঝামাঝি লেখা এ রকমের একটি পত্র থেকে জানা যায় যে, তাঁর সময়টা বিশেষ ভালো যাচ্ছিলো না। এ চিঠি তিনি লেখেন তাঁর পরীক্ষা শুরু হবার দু সপ্তাহ আগে।

> তোমার শেষ চিঠি পাওয়ার সময় থেকে আমি নানা ঝামেলায় প্রায় অর্ধ-মৃত। তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমি সুখী — খুব সুখী হবো। কাল এগারোটায় এসো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই একটি দিনের ব্যাপারেই আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি (যখন তোমাকে সময় দেওয়া সম্ভব)। তবে তোমার যদি জরুরী কাজ থাকে তা হলে অবশ্যই (যখন খুশি তখন) চলে এসো।[১৩]

এই চিঠিতে তিনি ঝামেলায় অর্ধ-মৃত হবার যে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, সেটা কী ধরনের ঝামেলা এবং তার কারণ কী — তিনি অথবা অন্য কেউ তা উল্লেখ করেননি। অবশ্য পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, এ ঝামেলা লেখাপড়া এবং পারিবারিক। এই বছরের শেষে তাঁর পিতা তাঁর খরচ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তার ফলে তিনি বিশপস কলেজের লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ঠিক কবে রাজনারায়ণ মধুর পড়ার খরচ দেওয়া বন্ধ করেন, তা জানা যায় না। তবে স্ট্রীটের চিঠি থেকে জানা যায়, এ সিদ্ধান্ত রাজনারায়ণ নিয়েছিলেন নভেম্বর মাসের আগে। ২২ নভেম্বর তারিখে অধ্যাপক স্ট্রীট এসপিজির কাছে যে-চিঠি লেখেন, তাতে বলেন:

> [আমাদের] ছাত্র ডাট আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে, কারণ তার বাবা এখন আর তার খরচ দেন না। আর নিজের খরচ দেবার মতো সামর্থ্য তার নেই।[১৪]

অধ্যাপক স্ট্রীট যেভাবে লিখেছেন, তাতে মনে হয়, নভেম্বরের আগেই রাজনারায়ণ পুত্রকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন। আর, এ নিয়ে পিতা এবং পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েন শুরু হয়েছিলো, তারও অনেক আগে — এ অনুমানই সঙ্গত। স্ট্রীটের লেখা থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, পিতা খরচ দেওয়া বন্ধ করার পরেও মাইকেল কয়েক সপ্তাহ কলেজে ছিলেন — যদিও ডিসেম্বরের মাঝামাঝি যে-বার্ষিক পরীক্ষা হয়েছিলো, তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। অথচ এটাই ছিলো তাঁর চূড়ান্ত পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় তিনি পাশ করলে পরে ধর্মযাজক হবার পথে কোনো বাধা থাকতো না। তিনি যে পরীক্ষা না-দিয়েই কলকাতা ত্যাগ করেন — তা থেকে তাঁর মানসিক এবং আর্থিক সংকটের তীব্রতা বোঝা যায়।

বিশপস কলেজে পড়ার জন্যে রাজনারায়ণ প্রায় তিন বছর খরচ দিয়েছিলেন — এ থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এই পুরো সময়টা তাঁদের সম্পর্ক ভালো অথবা স্থিতিশীল ছিলো। কিন্তু আসল ঘটনা সে রকমের ছিলো না। মাঝেমধ্যে তাঁর ধর্মান্তরের প্রসঙ্গ নিয়ে পারিবারিক কলহ এবং ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। পড়ার খরচ এবং উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়েও তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত, একে কেন্দ্র করে মাইকেল একাধিক বার লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে মিশনারি হবার জন্যে চেষ্টা

করেন। এ প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত জীবনী-লেখকরা জল্পনা-কল্পনা করলেও, কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা ছিলো না। কিন্তু বিশপস কলেজের নথি থেকে এখন এ বিষয়ে আসল খবরটা পাওয়া যায়।

মাইকেল লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে প্রথম বার মিশনারি হবার চেষ্টা করেন ১৮৪৫ সালের শেষ দিকে। ঘটনাটা বর্ণনা করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ উইদার্স। তিনি লিখেছেন যে, মধুসূদন ডাটের 'অতি-ঘনিষ্ঠ' বন্ধু জর্জ ম্যান মারা যাওয়ার পর মাইকেল লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে মিশনারির কাজ নিয়ে মরিশাসে যাবার জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। তাঁর হয়ে অধ্যক্ষ উইদার্স মাদ্রাসের বিশপ জর্জ জন ট্রেভর স্পেন্সারের কাছে চিঠি লেখেন ১৮৪৬ সালের ফেব্রুআরি মাসে।[১৫] বিশপ যখন জানান যে, মরিশাস তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না, তখন উইদার্স চিঠি লেখেন লন্ডনে এসপিজি অর্থাৎ গসপেল সোসাইটির কাছে। এতে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন একটি মিশন খোলার জন্যে।[১৬] কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সংস্থাকে তিনি রাজি করাতে পারেননি। মাইকেল তাই মিশনারি হয়ে মরিশাসে যেতে পারলেন না।

১৮৪৬ সালের প্রথম দিকে তিনি আর-এক দফা মিশনারি হবার কথা চিন্তা করেন — এ তথ্য জানা যায় স্ট্রীটের একটি চিঠি থেকে। ১৮৪৭ সালের ২৩ জুলাই তারিখে তিনি যে-চিঠি লেখেন, তা থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মিশনারি হবার আন্তরিক ইচ্ছ ১৮৪৬ সালের গোড়ার দিকে তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠেছিলো।

> বছর দেড়েক আগে, ছেলেটির যখন মনে হলো যে, তার মিশনারি হবার সংকল্প আগের তুলনায় অনেক জোরালো হয়েছে, তখন সে ভাবলো, তা হলে পিতার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নেওয়া ঠিক নয়, কারণ সে তার সংকল্প ত্যাগ করেছে মনে করে পিতা তাকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে।

কিন্তু এর পরে স্ট্রীট যা লেখেন, তা বিশ্লেষণ করলে মিশনারি হবার পেছনে ধর্মীয় আকর্ষণের চেয়েও অন্য আর-একটা কারণ চোখে পড়ে। মনে হয়, পিতার সঙ্গে তিক্ততা ছিলো এর অব্যবহিত কারণ।

> সে ... আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে, তার পিতা তাকে ত্যাগ করার এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে-হুমকি দিচ্ছে, তা কার্যকর করলে তাকে একটা ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হবে কিনা। এতে আমি তাকে বলি যে, সে যদি সোসাইটির (এসপিজি) কাজে আত্মনিয়োগ করে, তা হলে এটা পাওয়ার ব্যাপারে আমি কোনো সন্দেহ দেখিনে। তবু সে আরও জানতে চায় যে, তাকে কী রকমের বৃত্তি দেওয়া হবে। আমি বললাম, যেমনটা অন্য নেটিব ছাত্রদের দেওয়া হয় — থাকা খাওয়ার খরচ আর যোগ্যতা লাভের পর চাকরি, যদিও আমি বলতে পারছিনে তাতে বেতন কতো হবে। এর পরে তার আত্মপ্রবঞ্চনার ছবিটা বেরিয়ে পড়লো। সে অন্য নেটিব ছাত্ররা যেমন পোশাক-আশাক পরে তেমনটা পরতে রাজি নয়, অথবা অন্যরা যেমন বেতন পেয়েছে, তার চেয়ে কম বেতন নির্ধারিত হলে তা নিতেও রাজি নয়। এখানে আমার প্রসঙ্গত বলে নেওয়া উচিত ছিলো যে, সে যখন হিন্দু কলেজ থেকে এখানে আসে তখন পুরোপুরি য়োরোপীয় অভ্যাস নিয়ে এসেছিলো (অর্থাৎ পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া ও পানীয়ের ব্যাপারে)। আমি বুঝতে পারছিলাম, এটা অর্থহীন, তবু আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, সে যে-সংকল্প পোষণ করছে সেটা স্বীকার করা এবং তা থেকে পিতা অথবা সংসার অথবা টাকাপয়সা অথবা জমিজমার চেয়ে সে বেশি পাবে — এই বিশ্বাস রাখা তার কর্তব্য।

মাইকেলের ধর্ম প্রচারের আগ্রহ যে তাঁর সমস্ত অন্তরকে অধিকার করতে পারেনি, অন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করে স্ট্রীট চিঠিতে তারও প্রমাণ দিয়েছেন। মরিশাসে একটি মিশন খোলার ব্যাপারে সাহায্য করতে না-পারলেও, ১৮৪৬ সালের গোড়ার দিকে মাদ্রাসের লর্ড বিশপ তাঁকে চাকরি দেবার প্রস্তাব দেন। তিনি জানান যে, মাইকেল যদি দক্ষিণ ভারতে গিয়ে দেশীয়দের ধর্মান্তর করানোর কাজ নিতে রাজি থাকেন, তা হলে তাঁকে চাকরি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাবে আগ্রহ

দেখাননি। এর পরও

> মাদ্রাসের লর্ডবিশপ তাকে ডেকে পাঠান এবং তার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আমারই মতো এ সিদ্ধান্ত না-নিয়ে পারেননি যে, এটা হলো এমন একটা ব্যাপার যার একদিকের পাল্লায় আছে একটি কোট এবং ভাতা, আর অন্য দিকে আছে ধর্মপ্রচারের আহ্বান।[১৭]

এ চিঠি থেকে আরও একটা বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়, সে হলো: দূরে কোথাও গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবেন — এ বাসনা তাঁর তখন থেকেই মনের মধ্যে দানা বাঁধছিলো। কখনো তিনি বিলেতে যেতে চেয়েছেন, কখনো মরিশাসে, কখনো মাদ্রাসে, কখনো ভার্সাই, এমন কি, জীবনের একেবারে শেষ পর্বে অজ্ঞাত পঞ্চকোটে।

স্ট্রীটের চিঠি থেকে আরও কয়েকটি জিনিশ চোখে পড়ে। বিশেষ করে যা দেখা যায়, তা হলো: পিতাপুত্রের সম্পর্কে টানাপোড়েন আগাগোড়াই চলছিলো। শেষ পর্যন্ত মিশনারি হবার লক্ষ্যে অটল থাকলে পিতার কাছ থেকে টাকা নেওয়া ঠিক হবে কিনা — বিবেকের তেমন একটা দ্বন্দ্বও মধুর মধ্যে কাজ করেছে। কিছুদিন পর পর রাজনারায়ণ তাঁকে টাকাপয়সা বন্ধ করে দেবার এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দিতেন। তা সত্ত্বেও মাইকেল খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে রাজি হননি। উল্টো, খৃষ্ট ধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস এতোটা দৃঢ় হয়েছিলো যে, তিনি মিশনারি হবার কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন এবং পিতার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি না-করে মিশনারির কাজ নিয়ে দূরে সরে যাবার কথাও চিন্তা করতেন। তবে পার্থিব সুখ এবং ভোগের দিকে তাঁর যে-আন্তরিক আকর্ষণ ছিলো, তা তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার প্রাক্কালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিলেত যাওয়া এবং ধর্মান্তরের দ্বৈত বাসনার যে-তুলনা করেছিলেন — তিন বছর পরেও তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়নি। তা ছাড়া, তিনি যে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ এ চিন্তাও তাঁর মধ্যে বদ্ধমূল ছিলো। তাঁর অতো যোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি বেতন পাবেন দেশীয় মিশনারিদের সমান এবং বিদেশী মিশনারিদের চেয়ে কম — এর কোনোটাই তিনি মেনে নিতে পারেননি।

অনুকূল শর্তে মিশনারির কাজ পেলেন না, সরকারী কাজও নয়। তাই ১৮৪৬ সালে তাঁকে বিশপস কলেজেই থেকে যেতে হয়েছিলো। ওদিকে পিতার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও জোড়াতালি দিয়ে একটা সাময়িক রফা হয়েছিলা — তার পেছনে কতোটা জাহ্নবী দেবীর অশ্রুবিসর্জন ছিলো তা অবশ্য জানা যায় না। এরপর কিছু কাল তিনি আবার মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করেন। জুন মাসে পরীক্ষা। তিনি ভালো ছাত্র হিশেবে সেই পরীক্ষার আহ্বানও কম গুরুত্বের সঙ্গে নিতে পারলেন না। তবে লেখাপড়ায় তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। ১৮৪৭ সালের মে মাসে তিনি গৌরদাসকে যে-চিঠি লেখেন, তাতে তিনি নিজেই ঝামেলার কথা বলেছেন। এ ঝামেলা পারিবারিক। কলেজের খরচ নিয়ে পিতার সঙ্গে নতুন করে তিক্ততা দেখা দিয়েছিলো। এই তিক্ততার কারণ তিনি নিজে অথবা তাঁর পিতা লিখে রেখে যাননি। তবে এর কারণটা অনুমান করা কঠিন নয়। আমার ধারণা, বিরোধ বাধে উভয় পক্ষের প্রত্যাশা সমান অথবা একমুখী না-হওয়ায়। আড়াই বছর অপেক্ষা করেও রাজনারায়ণ যখন দেখলেন, মধু প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু সমাজে ফিরে এলেন না, বরং মাঝেমধ্যে মিশনারি হবেন বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেন, তখন তিনি আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর পর তিনি দুটি পদক্ষেপ নেন। প্রথম পদক্ষেপ ছিলো: পড়ালেখার খরচ দেওয়া বন্ধ করে খৃষ্টান সমাজ থেকে পুত্রকে ফিরিয়ে আসতে বাধ্য করা আর দ্বিতীয় পদক্ষেপ পুত্র লাভের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ।

আমার বিশ্বাস, পুত্রের পড়ালেখার খরচ বন্ধ করার যে-সিদ্ধান্ত রাজনারায়ণ গ্রহণ করেন, তাঁর জন্যে পুরোপুরি মধুই দায়ী ছিলেন না। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে আরও একটি বড়ো কারণ ছিলো।

সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল হিশেবে রাজনারায়ণের প্রতিষ্ঠা ছিলো এবং তিনি বেশ ভালো আয় করতেন, তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ১৮৪৭ সালের শেষ দিকে তিনি কোনো একটা পেশাদারি অযোগ্যতা এবং/অথবা অনিয়মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সে জন্যে, ডিসেম্বর মাসে আদালতের বিচারকরা তাঁকে আপীলঘটিত মামলা থেকে 'পদচ্যুত' করেন।[৯৭] স্থায়ীভাবে, না সাময়িকভাবে তা জানা যায়নি। রাজনারায়ণ কি কোনো বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন? সাধারণ একজন উকিলের 'পদচ্যুত' হবার কথা নয়! অবশ্য পেশাগত কোনো গুরুতর অনিয়মের দরুন উকিলদের ব্যবসা করার অধিকার আদালত কেড়ে নিতে পারে। রাজনারায়ণ তেমন কিছু করেছিলেন কিনা, আরও তথ্য আবিষ্কৃত না-হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে তা বলা সম্ভব নয়।[৯৮] কিন্তু এ ঘটনার পরে রাজনারায়ণের আয় কমে যাবার কথা। তিনি মধুর পড়ার খরচ বন্ধ করে দিলেন মোটামুটি এ সময়ে। তিনি ধরে নিলেন, পুত্র আর কখনো স্বধর্মে ফিরে আসবেন না। জোর করে বিয়ে দেবার সম্ভাবনা এ পর্যায়ে ছিলো না। সুতরাং জেদ করে মাইকেলের খৃষ্ট ধর্ম আঁকড়ে থাকার কারণ যে সে ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং হিন্দু ধর্মের তুলনায় সে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁর অটল বিশ্বাস — এটা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। অতঃপর তিনি আমৃত্যু খৃষ্ট ধর্মের মানবিক দিকগুলোকে, বিশেষ করে য়োরোপীয় মানবিক সভ্যতাকে, হিন্দু ধর্মের / ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করেছেন।

মোটামুটি এই পরিবেশে রাজনারায়ণ তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেন — তিনি পারলৌকিক মঙ্গল এবং ইহলৌকিক উত্তরাধিকারী লাভের কথা চিন্তা করে পুত্রার্থে আর-একটি ভার্যা আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ঠিক কখন বিয়ে করেন, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। এই স্ত্রী, শিবসুন্দরী, অল্প দিন পরেই মারা যান। খিদিরপুরের বাড়িতে ইনি আসেননি বলেই মনে হয়। প্রথম বার বিয়ে করে রাজনারায়ণ খানিকটা অপরাধবোধে কাতর হয়েছিলেন। কিন্তু এই স্ত্রী — রাজনারায়ণের ভাষায় — জাহ্নবী দেবীর 'সেবিকা'[৯৯] অকালে মারা যাবার পর্যন্ত দেরি না-করে রাজনারায়ণ একে-একে তৃতীয় এবং চতুর্থবার বিয়ে করেন। একজন জীবনীকার এমনভাবে এর বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে মনে হয়, মাইকেল মাদ্রাস যাবার আগেই তাঁর পিতা তৃতীয় বার বিয়ে করেন। এই জীবনীকার বলেছেন, কবি খিদিরপুরে বেড়াতে গেলে জাহ্নবী দেবী তাঁকে আপ্যায়ন করার দায়িত্ব দিতেন বিমাতা প্রসন্নময়ীকে।[১০০] মাইকেল ১৮৪৭ সালের মে মাসে গৌরদাসকে বিশপস কলেজ থেকে শেষ যে-চিঠিটি লিখেছিলেন, তাতে নানা ঝামেলার কথা লিখেছিলেন; কিন্তু তাঁর পিতার বিয়ে করার কোনো ইঙ্গিত নেই। এ থেকে জীবনীকারেরা ধরে নিয়েছেন যে, তখনো রাজনারায়ণ পুনর্বিবাহ করেননি। সে জন্যে সুরেশচন্দ্র মৈত্র এমনভাবে লিখেছেন, যা থেকে মনে হয় রাজনারায়ণ দ্বিতীয় বিয়ে করেন মোটামুটি এ সময়ে।[১০১] কিন্তু সুরেশচন্দ্রের এই অনুমান নগেন্দ্রনাথ সোমের বিবরণের সঙ্গে মেলে না। রাজনারায়ণ কখন দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বিবাহ করেন, তা সঠিক বলা যায় না।

সঠিক যা বলা যায়, তা হলো তিনি জাহ্নবী দেবীকে জানিয়ে অথবা তাঁর অনুমতি নিয়ে বিয়ে করেননি। সাগরদাঁড়িতে গিয়ে শিবসুন্দরীকে বিয়ে করার পর খবর পাঠান জাহ্নবী দেবীর কাছে। সেই সঙ্গে সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে খুব অসাধারণ — এক রাশ অপরাধ বোধ নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় বার বিয়ে করা সেকালে আদৌ অসাধারণ ব্যাপার ছিলো না। তদুপরি, এ ক্ষেত্রে এক মাত্র সন্তান খৃষ্টান হয়ে যাওয়ায় প্রথাবদ্ধ সমাজের দৃষ্টিতে রাজনারায়ণের দ্বিতীয় বার বিয়ে করার বেশ যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিলো। তিনি যদি সেকালের বাবুদের মতো দত্তক নেওয়ার প্রস্তাব দিতেন, তা হলেও সেটা অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হতো না। আগের আলোচনা থেকে দেখেছি, স্ত্রীর জ্ঞাতসারে উপপত্নী রাখাও তখন

রীতিমতো সমাজস্বীকৃত বিষয় ছিলো। তা সত্ত্বেও, তিনি যেভাবে জাহ্নবী দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, তা থেকে স্ত্রীর প্রতি রাজনারায়ণের এক ধরনের দায়বদ্ধতার আভাস পাওয়া যায়। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, স্বামী অন্য নারীর সংস্পর্শ লাভ করেছেন বলে জাহ্নবী দেবী আঘাত পাননি, বরং অন্য একটি নারীকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার জন্যেই তিনি অপমানিত বোধ করেছিলেন। তবে দারুণ দুঃখ পেলেও, এ ঘটনাকে তিনি নাকি শান্তভাবেই মেনে নিয়েছিলেন।

লেখাপড়ার খরচ বন্ধ হয়ে যেতে পারে — বিশপস কলেজে পড়ার সময়ে মাইকেল আগাগোড়াই এ আশঙ্কার মধ্যে সময় কাটিয়েছেন। সুতরাং পিতার চূড়ান্ত এবং রূঢ় সিদ্ধান্ত জানতে পেরে তিনি দুঃখিত হলেও বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। তবে এই বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি এর কোনো সহজ সমাধান দেখতে পাননি। বরং এতোকাল বিলাসের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন বলে তাঁর পক্ষে চোখে অন্ধকার দেখাই স্বাভাবিক। আগের বছরের (১৮৪৬) মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি সরকারী কাজও খুঁজছিলেন বলে স্ট্রীটের চিঠি থেকে জানা যায়।[১০২] তখন গরজ অবশ্য এতো প্রবল হয়নি। কিন্তু এখন টাকা বন্ধ হওয়ায় তিনি মরিয়া হয়ে একটি চাকরির চেষ্টা করলেন। এক সময়ে বঙ্গদেশের ডেপুটি গভর্নর, মি ব্যর্ড নাকি তাঁর ধর্মান্তরের সময়ে কেল্লায় রেখে তাঁকে মদত দিয়েছেন।[১০৩] ১৮৪৭ সালে ছোটো লাট ছিলেন টি এইচ ম্যাডক। মাইকেল নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ সময়ে একটা চাকরি দেবার অনুরোধ জানান।[১০৪] তা ছাড়া, তিনি চীফ সেক্রেটারি এফ জে হ্যালিডের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৫] কিন্তু কোনো সরকারী চাকরি তিনি পাননি। ওদিকে বিদেশী এবং দেশী মিশনারির বেতনের বৈষম্যের দরুন এক সময়ে তিনি মিশনারির কাজ নেবেন না বলে তাঁর অধ্যাপকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন নিরুপায় হয়ে মিশনারির কাজ নিতেও রাজি হন। অধ্যাপক স্ট্রীট চিঠিতে এ সম্পর্কে লেখেন:

> কলেজের প্রিন্সিপাল যিনি আমার চিঠির অনুলিপি দেখেছেন ... তিনি মনে করেন আমি একটা কথা উল্লেখ না-করে তার [মাইকেলের] প্রতি বলতে গেলে কোনো সুবিচার করিনি। সে নিজের থেকে মরিশাস অথবা অন্য যেকোনো জায়গায় যেকোনো বেতনে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলো। বেতনের কথাটা (সুনির্দিষ্টভাবে) ওঠেনি। আমি স্বীকার করছি, কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।[১০৬]

তাঁর মিশনারি হবার উৎসাহ সম্পর্কে তাঁর অধ্যাপকরা যা লিখেছেন, তার মধ্যে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু ঘটনার সত্যতা তাতে ঢাকা পড়ে না।

চিরকাল-সুখে-লালিত তরুণ কবি এ সময়ে তীব্র অর্থকষ্টের মধ্যে কী করেছেন, তা জানার উপায় নেই। শেলির মতো তিনি কি বাড়িতে গিয়ে পিতার সঙ্গে টাকাপয়সার জন্যে ঝগড়া করেছেন? তখন মাইকেলের বয়স প্রায় ২৪ বছর। আগের তুলনায় স্বাধীন ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ ঘটেছে — তিনি আর হিন্দু কলেজে-পড়া কিশোর ননীর পুতুল ছিলেন না। সুতরাং এই ঝগড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু তার চেয়েও যা বেশি সম্ভব মনে হয়, তা হলো তিনি তীব্র অভিমানে বাবা-মা কারো সঙ্গে দেখাই করেননি। এই তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত — যাঁকে তিনি ছোটোবেলা থেকে মনে মনে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আদর্শ পিতা বলে বিবেচনা করে এসেছেন! এই তিক্ততা ছাড়া পিতার পুনর্বিবাহেও তিনি নিশ্চয় দারুণ বিরক্ত হয়েছিলেন। এই পুনর্বিবাহের ফলে মায়ের ওপর যে-প্রতিক্রিয়া পড়েছিলো, তিনি তা-ও দেখেছিলেন। যে-স্নেহশীলা মাকে তিনি চিরদিন দেখেছেন প্রসন্ন, সুখের প্রতিমার মতো, তাঁর চোখে অশ্রু এবং মুখে রাশি রাশি না-বলা ব্যথার যন্ত্রণা দেখে বিচলিত বোধ করেন। পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ হন।

অতঃপর কলকাতা অসহ্য। এই অবস্থায়ই, তিনি অন্য কোথাও চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। বরং ভিক্ষা করে খাবেন, তবু আর বাড়ির দিকে পা বাড়াবেন না! এর আগে তাঁর শিকড় ধরে নাড়া দেবার

মতো অভিজ্ঞতা তিনি একবারই লাভ করেছিলেন — বিয়ের আয়োজন এবং তারপর খৃস্টান হবার ঘটনা থেকে। কিন্তু তারপর চার বছর ন মাসে পরিস্থিতি এসেছিলো স্থিতিশীল হয়ে। এবারে ঝড় এলো একেবারে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। সে ঝঞ্ঝাঘাতে তাঁর ঘর আবার ভাঙলো। পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় বার অনিকেত হলেন।

৩

পরদেশে

'যখন কলকাতা ত্যাগ করি তখন আমি বিরক্তি এবং উদ্বেগে অর্ধ-উন্মাদ হয়েছিলাম। এক মুহূর্তের জন্যেও ভেবো না যে, বিদায়ের আগে কেবল তোমার সঙ্গে আলাপ করিনি। আসলে, আসার আগে আমি দু-তিন জনের চেয়ে বেশি কাউকে আমার উদ্দেশ্যের কথা বলিনি।'[১] সত্যি সত্যি কলকাতা ত্যাগের সিদ্ধান্ত তিনি খুব গোপন রেখেছিলেন। খৃষ্টান হবার সময়েও নিজের উদ্দেশ্য কারো কাছে প্রকাশ করেননি। তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি নিজের অনেক কথাই কারো সঙ্গে ভাগ করে নিতেন না। কী ভেবে তিনি কলকাতা ছাড়লেন, অথবা তিনি কেন বেছে নিলেন মাদ্রাসকে, তার কোনো বিবরণ নিজে কোথাও দেননি; অথবা বন্ধুদেরও বলেননি। এমন কি, গৌরদাসকেও নয়। কিন্তু মনে মনে তিনি নিশ্চয় যোগ-বিয়োগ করে দেখেছিলেন, এর ফলে জীবনের ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে।

অসাধারণ অনেক গুণ ছিলো তাঁর, কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তাঁকে হিশেবী বলে প্রশংসা করেননি। জীবনে বারবার বেহিশেবী ঝুঁকি নিয়েছেন তিনি। তার ফলে আঙুলও পুড়িয়েছেন অনেক বার; কিন্তু তারপরও অজানা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করেননি। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিলেত যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন এই দুঃসাহস এবং হঠকারিতা থেকেই। আয়োজিত বিবাহ এড়ানোর জন্যে মরিয়া হয়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তার পেছনেও ছিলো এ রকমের বিদ্রোহী মনোভাব। এর ফলে বিয়ে তিনি এড়াতে পেরেছিলেন, কিন্তু লাভের অন্য অঙ্কগুলো যে হিশেবে মিলছে না, কয়েক মাসের মধ্যে তা টের পেয়েছিলেন। বস্তুত, বারবার ঝুঁকি নিয়ে সাহিত্য ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কাঙ্ক্ষিত ফল কৃচিৎ লাভ করেছেন। কলকাতা ছেড়ে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, তাঁর মাদ্রাস যাত্রাও এমনি এক অ্যাডভেঞ্চার। অজানা জায়গায় গিয়ে তাঁর ভাগ্য পরীক্ষা করার এই দুঃসাহস পরেও একাধিক বার লক্ষ্য করা যাবে।

এতো জায়গা থাকতে তিনি কেন মাদ্রাসে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তার কারণ এতো কাল একেবারে অজ্ঞাত ছিলো। তাঁর একাধিক জীবনীকার অনুমান করেছেন যে, ১৮৪৭ সালে বিশপস কলেজে যে-চারজন (আসলে পাঁচজন) দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ছাত্র লেখাপড়া করতেন, তাঁরা তাঁকে কোনো পরামর্শ দিয়ে থাকবেন। এই দক্ষিণী ছাত্রদের সঙ্গে তিনি এক জাহাজে করে মাদ্রাসে গিয়েছিলেন

— এমন অনুমান করেছেন সুরেশচন্দ্র মৈত্র।[২]

কিন্তু এ অনুমান আদৌ ঠিক নয়। সত্যিকার ঘটনা হলো: এই দক্ষিণী ছাত্রদের কেউ মাইকেলকে মাদ্রাস যাবার পরামর্শ দেননি। তিনি সে পরামর্শ এবং আশ্বাস পেয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিশপস কলেজের সাবেক ছাত্র — মাদ্রাসের চার্লস এগবার্ট কেনেটের কাছ থেকে। আমরা আগেই দেখেছি, কবি এই কলেজে ভর্তি হবার ঠিক পাঁচ মাস পরে — ১৮৪৫ সালের এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে — তিনি মিডলটন বৃত্তি নিয়ে এখানে ভর্তি হয়েছিলেন।[৩] বয়সে দু বছরের ছোটো হলেও, কবির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো।

পিতা যখন টাকাপয়সা দেওয়া বন্ধ করেন এবং বাড়ির পরিবেশ একেবারে অসহ্য বোধ হয়, মাইকেল তখন কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চান। কিন্তু যেখানেই যান না কেন, জীবিকার জন্যে একটা কাজ করার প্রয়োজন ছিলো। কিভাবে তাঁর সমস্যার সমাধান করা যায়, তা নিয়ে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু চার্লসের সঙ্গে আলোচনা করেন। চার্লস তাঁকে পরামর্শ দেন মাদ্রাসে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে। মাদ্রাসের বিশপের সঙ্গে মাইকেল আগের বছরই কথা বলেছিলেন এবং বিশপ তাঁর যোগ্যতা দেখে তাঁকে ধর্মান্তরে সহায়তা করার চাকরি দেবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তিনি সে কাজ তখন গ্রহণ করেননি। কিন্তু মাদ্রাস গেলে তিনি সে কাজ এখন হয়তো পেতে পারেন — এমনটা বিবেচনা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব। অন্তত কলকাতা ছাড়ার আগে নিতান্ত অসহায় পরিবেশে অধ্যাপক স্ট্রীটের কাছে তিনি ধর্মযাজক হবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন — এটা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি।

সেকালের বিচারে মাদ্রাস পরদেশ বলে বিবেচিত হলেও, কবির কাছে মাদ্রাস অজ্ঞাত জায়গা ছিলো না। তিনি সেখানে গিয়ে বিশপের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তা ছাড়া, চার্লসের মাধ্যমে মাদ্রাস সম্পর্কে তিনি অনেক খবরও পেয়েছিলেন। সুতরাং সেখানে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার প্রস্তাব অযৌক্তিক বলে বিবেচনা করেননি। তা ছাড়া, চার্লস তাঁকে ভরসা দিয়ে থাকবেন যে, বিশপের কাছ থেকে কোনো সাহায্য না-পেলেও তাঁর পিতা তাঁকে প্রথম দিকে কিছু সাহায্য করতে পারবেন। তাঁর পিতা — চার্লস কেনেট ছিলেন মাদ্রাসের ট্রেজারি ম্যানেজার। তার চেয়েও তাঁর বড়ো পরিচয়, তিনি ছিলেন সাতাশ বছর ধরে একটি সুপরিচিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি। বস্তুত, বন্ধুর আশ্বাসে ভরসা করেই কবি মাদ্রাসের দিকে যাত্রা করেছিলেন। মিশনারির কাজ না-দিলেও, তাঁর মাদ্রাস যাবার ব্যাপারে কলেজের অধ্যাপকরাও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বলে ধারণা করি।

কলকাতা থেকে হঠাৎ মাদ্রাসের অনিশ্চিত পথে পা বাড়ানোর কারণ ব্যাখ্যা না-করলেও, যাবার আগে তাঁর মানসিক অবস্থা কেমন ছিলো, গৌরদাস বসাককে লেখা উপরে উদ্ধৃত চিঠি থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। এ চিঠি তিনি লিখেছিলেন মাদ্রাস যাবার তেরো মাস পরে। যাবার আগে তিনি তাঁর অভিপ্রায়ের কথা না-বলায়, যোগাযোগ হবার পর গৌরদাস চিঠিতে অনুযোগ করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন: তাঁর কলকাতা ত্যাগের খবর তিনি বলতে গেলে কাউকে জানাননি। নয়তো তাঁর প্রতি তাঁর বন্ধুত্বে কোনো ভাঁটা পড়েনি।

মনে হয়, তাঁর পরিকল্পনার ব্যাপারে গৌরদাসকে তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। পাঁচ বছর আগে — ১৮৪২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি যখন বিলেত যাবার ব্যাপারে একেবারে দৃঢ়সংকল্প হয়েছিলেন, তখন তাঁর এই পরিকল্পনার কথা বন্ধুর কাছে প্রকাশ করায় গৌরদাস মা-বাবাকে বলে দেবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন। গৌরদাস গোপনীয়তা রক্ষা করলেও, এ ব্যাপারে কবি তাঁকে আর পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। খৃষ্টান হওয়ার পরিকল্পনা যেমন তিনি তাঁকে জানাননি, তেমনি জানাননি মাদ্রাসে যাবার পরিকল্পনা।

সেকালে জাহাজে করে সরাসরি কলকাতা থেকে মাদ্রাস যেতে সময় লাগতো চার-পাঁচ দিন। ক্যাবিনে ভাড়া ছিলো কম পক্ষে এক শো টাকা। বেশির ভাগ কম্পেনির জাহাজে একশো ষাট টাকা। একটি কম্পেনি নিতো ২২০ টাকা।[৪] যে-মধু চিরকাল লালিত হয়েছেন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে, অর্থকষ্ট কাকে বলে জানতেন না, হিশেব করে খরচ করতে পারতেন না – তিনি মাদ্রাস যাবার জন্যে এতোটা ব্যয় করতে সমর্থ হলেন না। ধারণা করি, যে-টুকু ব্যয় করতে পারলেন, তার জন্যেও তাঁকে অন্যের কাছে হাত পাততে হয়েছিলো। আর এই রূঢ় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রথম বারের মতো তিনি মিতব্যয়ী হবার চেষ্টা করেন। তবে পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখা যাবে, সে চেষ্টায় তিনি কোনো কালেই আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। মাদ্রাস যাবার আগে, যে-সামান্য টাকাপয়সা তিনি জোটাতে পেরেছিলেন (ধারণা করি, মা-র কাছ থেকে পাননি, কারণ মাদ্রাসে যাবার কথা মাকে বলতে



মাদ্রাসের জাহাজ ঘাট, ১৮৫৬ সালের আঁকা ছবি
মাইকেল এখানে গিয়ে নেমেছিলেন

পারেননি।) তা দিয়ে সরাসরি মাদ্রাসগামী জাহাজের টিকিট কেনা যায় না। সে জন্যে তিনি যান কম খরচের *লেডি সেইল* নামে ৩২৫ টনের ছোট্টো একটি উপকূলীয় জাহাজে করে।[৫] জাহাজের কাপ্টেন জে ক্যাস্টর। জাহাজটি গাঞ্জাম, কলিঙ্গপত্তম, বিশাখাপত্তম এবং করিঙ্গ হয়ে মাদ্রাসে যেতে সময় নিয়েছিলো মোট কুড়ি দিন। ২৯ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতা থেকে যাত্রা করে মাইকেল মাদ্রাসে পৌঁছেছিলেন ১৮৪৮ সালের ১৮ জানুআরি, মঙ্গলবার।[৬] পরের মঙ্গলবার তাঁর বয়স ২৪ বছর পূরো হবার কথা।

পাঁচ বছর আগে তিনি যখন তমলুকে গিয়েছিলেন, তখন সাগরের কাছাকাছি যেতে পারায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। কলকাতা ছেড়ে আসার দারুণ কষ্টের মধ্যে তখন তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ছিলো – তিনি সাগরের আরো কাছে এসেছেন, যে-সাগরের বুক চিরে অল্পদিন পরে একদিন তিনি পৌঁছে যাবেন তাঁর স্বপ্নে দেখা 'ইংল্যান্ডের গৌরবোজ্জ্বল উপকূলে'। কিন্তু তাঁর সেই সযত্নে লালিত স্বপ্ন বাস্তবতার রূঢ়

আঘাতে খানখান হয়ে ভেঙে পড়েছিলো কয়েক মাস পরে। অতঃপর খৃস্টান হয়ে আয়োজিত বিবাহের হাত থেকে রেহাই পেলেও বিলেত যাবার পথ তাতে প্রশস্ত হয়নি। 'সাগর থেকে গেলো দূর অস্ত'। মাদ্রাসের পথে *লেডি সেইলে* করে কলকাতা ছেড়ে শীতের শান্ত বঙ্গোপসাগরে পড়ে সাগরের অপরূপ রূপ দু চোখ দিয়ে তিনি নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু সাগরের বুকে চড়েও এতো কাল যে-উপকূলে যাবার বাসনা অন্তরের অন্তস্তলে পোষণ করে আসছিলেন, সেখানে যেতে পারলেন না। মহানগরী কলকাতা ছেড়ে বরং যেতে হলো তুলনামূলকভাবে অনেক ছোটো এবং সেকালের 'কলকাতাই' ইংরেজদের ভাষায় 'তমসাচ্ছন্ন' একটি শহরে। হতাশ হওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, যেভাবে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে কলকাতা ত্যাগ করতে হয়েছিলো, তাতে সমুদ্রযাত্রার সমস্ত আনন্দের ওপর আন্তরিক দুঃখ এবং ক্ষোভের গাঢ় কালো ছায়া পড়ে থাকবে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তাও মনকে হয়তো দমিয়ে দিয়েছে। তবে আগের কয়েক সপ্তাহ কেটেছে দারুণ মানসিক অশান্তি, উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে, এখন কোনো একটা সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে যাত্রা করে তিনি খানিকটা স্বস্তি লাভ করে থাকবেন।

জাহাজে মাইকেল নিজে এবং চারজন দেশীয় ভৃত্য আর কয়েকজন সেপাই ছাড়া, সহযাত্রীরা সবাই ছিলেন য়োরোপীয় অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান – ক্যাপ্টেন ডভটন, মি এবং মিসেস প্রেসগ্রেভ, মিসেস ল্যাংলি আর ম্যাকফারলেন। হংসদের মধ্যে বকের মতো, শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ তিনি; কিন্তু তাঁর আত্মসম্মান বোধ ছিলো নিতান্ত টনটনে। জাহাজের কম ভাড়ার যাত্রী হয়েও তাঁর অহমিকা তিনি ছাড়তে পারেননি। জাহাজের যাত্রীদের তালিকায় যে-নামগুলো পাচ্ছি, তাঁদের বিশেষ কোনো পরিচয় দেওয়া নেই। নামের সঙ্গে আছে শুধু পদবী – মিস্টার অথবা মিসেস। একটি নাম কেবল সবার থেকে আলাদা করে লেখা – মি এম এম ডাট অব বিশপস কলেজ।[৭] নেটিভ অথবা কোয়ার্টার-ডেকের যাত্রী হলেও তিনি যে যে-সে মানুষ নন, *অব বিশপস কলেজ* কথাটা জুড়ে দিয়ে সেটা জোর গলায় বলতে চেয়েছেন। পরবর্তী কালেও নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশে বারবার এটা তিনি প্রমাণ করতে তৎপর হয়েছেন। 'গৌরবারোপিত' অথবা ফাঁপানো পরিচয় দিয়ে বারবার তিনি তাঁর মাহাত্ম্যের কথা বলতে চেয়েছেন – কখনো মাদ্রাস, কখনো লন্ডন, কখনো বা ভার্সাইতে।

ইংল্যান্ডের বদলে তিনি যখন মাদ্রাসের 'অনুজ্জ্বল' উপকূলে নোঙর করলেন, তখন কি তাঁর মনে অনেক উচ্চাশা ছিলো? মনে হয় না। কারণ, তখনো তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন না, সেখানে তিনি কোনো কাজ জোটাতে পারবেন কিনা অথবা কী কাজ জোটাতে পারবেন। কলকাতার পরিচিত পরিজন থেকে দূরে মাদ্রাসে গিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে গোড়াতে তাঁকে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয়েছে। পরে গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে তিনি এই অভিজ্ঞতার কথা ব্যাখ্যা করেছেন: 'এখানে আসার পর একটা দাঁড়াবার মতো জায়গা পেতে আমার অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, সে কাজটা সোজা ছিলো না – বিশেষ করে একজন বন্ধুহীন আগন্তুকের জন্যে।'[৮] একটা অপরিচিত জায়গায় কোনো মতে মাথা গোঁজার জায়গা পাওয়াও সহজ নয়। তার ওপর তিনি সেখানে গিয়ে স্থির হয়ে বসতে না-বসতেই তাঁর বসন্ত হয়েছিলো।[৯] তখন যে অপরিচিত বিভূঁইয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি মারা যাননি, তা থেকেও পূর্ব-পরিচিতদের সাহায্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সেকালের মাদ্রাস ছিলো কলকাতার চেয়ে অনেক ছোটো, প্রায় একটি মফস্বল শহর। এর মোট জনসংখ্যা ছিলো সাড়ে তিন লাখ এবং এঁদের মধ্যে য়োরোপীয় আর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের সংখ্যা ছিলো – ১৮৬২ সালের লোকগণনা অনুযায়ী – ষোলো হাজার। তখনো মাদ্রাসে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটেনি – অন্তত কলকাতার সঙ্গে তার তুলনা চলতো না। মাদ্রাস হাই স্কুলের পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য, শিক্ষক এবং পরবর্তী কালে মাদ্রাসের অ্যাডভোকেট জেনরেল জন ব্রুস নর্টন মাদ্রাসের উন্নতির জন্যে

ওকালতি করে লন্ডনে বড়ো কর্তাদের কাছে চিঠির কাঠামোয় একটি বই ছেপে পাঠিয়েছিলেন ১৮৫৪ সালে।[১০] তাতে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে, যেখানে বঙ্গদেশে চল্লিশটির বেশি ইংরেজি স্কুল-কলেজ রয়েছে, সেখানে মাদ্রাসে আছে মাত্র একটি স্কুল। সত্যি বলতে কি, কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের সাড়ে তিন দশক পরে মাদ্রাসের প্রথম ইংরেজি শিক্ষার কলেজ স্থাপিত হয়। এই পরিবেশে চোস্ত ইংরেজি-জানা দেশীয় খৃষ্টান হিশেবে মাইকেলের পক্ষে মোটামুটি ভদ্রবেতনের ভালো চাকরি পাওয়া উচিত ছিলো। কোনো একটা স্কুলে অথবা কোনো সরকারী চাকরি। কিন্তু তিনি তা পাননি। পরেও চাকরির ব্যাপারে ভাগ্য তাঁকে সহায়তা করেনি।

তাঁর সম্পর্কে মাদ্রাসের বিশপের ধারণা খুব অনুকূল ছিলো না, তা তিনি জানতেন। তা সত্ত্বেও, মাদ্রাসে গিয়ে অসহায় অবস্থায় তাঁর সহায়তা চাওয়া সম্ভব। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে মি ডিয়ালট্রির পক্ষেও মাদ্রাসের বিশপকে লেখাও অসম্ভব নয়। আগেই লক্ষ্য করেছি, তাঁর মাদ্রাস যাবার কথা তিনি দু-তিনজনকে বলেছিলেন। এই দু-তিনজনের মধ্যে একজন প্রায় নিশ্চিতভাবে মি ডিয়ালট্রি।[১১] কিন্তু তা সত্ত্বেও মাদ্রাসের বিশপ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বলে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তিনি সাহায্য পেয়েছিলেন কেনেট পরিবার থেকে। তাঁকে কোনো চাকরি দেওয়া সম্ভব হবে কিনা, এ নিয়ে এগবার্ট এবং তাঁর পিতার মধ্যে আগেই আলাপ হয়েছিলো, এ প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। এগবার্ট কেনেটের পিতা চার্লস কেনেট ছিলেন অরফ্যান অ্যাসাইলামের সেক্রেটারি। তাঁরই কল্যাণে মাইকেল এই অ্যাসাইলামের বয়েজ স্কুলের আশার অর্থাৎ সহকারী শিক্ষকের চাকরি পেয়েছিলেন।

যে-য়োরোপীয়ান অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা যথেষ্ট সঞ্চয় না-রেখে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান রেখে মারা যেতেন, তাঁদের সন্তানদের জন্যে মাদ্রাসে দুটি অরফ্যান অ্যাসাইলাম স্থাপিত হয় — একটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আর একটি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এর মধ্যে একটা ছিলো সামরিক বিভাগে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের সন্তানদের জন্যে; অন্যটি বেসামরিক ব্যক্তিদের সন্তানদের জন্যে। এই দুটি অ্যাসাইলামের আবার দুটি করে শাখা ছিলো — একটি মেয়েদের জন্যে, একটি ছেলেদের জন্যে। স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে স্বজনহীন দেশে অসহায় সন্তানদের রেখে পিতা মারা গেলে, সেকালে সেসব সন্তান অকূলে ভাসতো। বিশেষ করে মেয়েরা অনেকে শেষ পর্যন্ত দেহ বিক্রি করেই দেহকে বাঁচিয়ে রাখতো। সে জন্যে অ্যাসাইলাম তৈরির প্রস্তাব উঠেছিলো। তবে প্রথমে তৈরি হয়েছিলো মিলিটারি ফিমেইল অ্যাসাইলাম — ১৭৮৭ সালে। এই তৈরি হয় এগমোরে। তার পরের বছর প্রতিষ্ঠিত হয় মিলিটারি মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম। বেসামরিক অ্যাসাইলামও একই ধারায় তৈরি হয় — আগে মেয়েদের, পরে ছেলেদের। বেসামরিক ফিমেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম স্থাপিত হয় ১৮১৬ সালে। আর মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম ১৮২৩ সালে। এ ছাড়া, ১৮০৭ সালে বেসামরিক অনাথদের জন্যে একটি ফ্রী স্কুলও স্থাপিত হয়েছিলো।[১২] যা পরে বেসামরিক মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অ্যাসাইলাম স্কুলে চাকরি পেয়েছিলেন মাইকেল। নিতান্ত সাধারণ চাকরি এবং তার বেতন অথবা সম্মান কোনোটাই ঈর্ষা করার মতো ছিলো না।

তিনি যে-স্কুলে চাকরি পেয়েছিলেন তার পুরো পোশাকী নাম হলো: মাদ্রাস মেইল অ্যান্ড ফিমেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম অ্যান্ড বয়েজ ফ্রী ডে স্কুল। আর যে-চাকরি পেয়েছিলেন, তার বেতন ছিলো সম্ভবত ৪৬ টাকা।[১৩] সহকারী শিক্ষক শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সে স্কুলে তখন অনেক শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি যোগ দিয়েছিলেন একজন সহকারী হিশেবে। কিন্তু পরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, সে স্কুলে ১৮৫০ সালের আগে পর্যন্ত বাইবেল, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি পড়ানোর জন্যে একজনের বেশি শিক্ষক ছিলেন না। তিনি কাজে যোগ দেবার সময়ে অথবা তার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত

এই স্কুলের প্রধান এবং একমাত্র শিক্ষক ছিলেন জেসি রে নেইলর। তিনি চলে যাওয়ায় বা চলে যাবার কথা ঠিক হওয়ায় মাইকেল নিযুক্ত হন — তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা না-থাকায় পুরোপুরি শিক্ষক পদে নয়, সহকারী শিক্ষক পদে। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত অ্যাসাইলামের প্রতিটি ছাপানো বার্ষিক রিপোর্ট আমি দেখেছি। তাতে তাঁর নিয়োগের তারিখ অথবা বেতনের কথা কোথাও উল্লিখিত হয়নি। তবে ১৮৪৮-৪৯ সালে তিনি ছাড়া এই বিদ্যালয়ে আর কোনো শিক্ষক ছিলেন না, তা এই রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার জানা যায়।

আর-একটি লক্ষ্য করার মতো তথ্য হলো: নামে বয়েজ স্কুল হলেও এই স্কুলে ফিমেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের মেয়েরাও পড়তো। ১৮৪৯ সালে পরিচালকরা মেয়েদের জন্যে একটি আলাদা স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ১৮৫১ সালের আগে মেয়েদের জন্যে পুরোপুরি আলাদা লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।[১৪] মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্যে একজন শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছিলো ১৮৫০ সালে।[১৫] পরের বছর আরও একজন। তা ছাড়া, ১৮৫১ সালে মাইকেলের সহকারী হিশেবে নিয়োগ করা হয় মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের দুজন পুরোনো ছাত্রকে।[১৬] অ্যাসাইলামের এই সম্প্রসারণের কারণ ১৮৪৮ সালে মাদ্রাসে পিটার উলি নামে এক ভদ্রলোক মারা যান এবং তিনি অ্যাসাইলামের জন্যে ১৫,০০০ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল রেখে যান।[১৭]

১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত সব সময়ে এই স্কুলে ছাত্র এবং ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো প্রায় ৫০। প্রথমে ছেলেদের চারটি শ্রেণী ছিলো, মেয়েদের তিনটি। স্কুলের সময় ছিলো সকাল আটটা থেকে একটা, আবার দুটো থেকে পাঁচটা। স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা একজন। সে জন্যে এক-একটা শ্রেণীকে এক-এক সময়ে পড়ানো হতো বলে মনে হয়। তবে লেখাপড়ার বাইরে ছেলেদের একটা ওয়ার্কশপে হাতে-কলমে কতোগুলো কাজ শেখানো হতো — টেবিল-চেয়ার থেকে শুরু করে জুতো তৈরি পর্যন্ত। স্কুলের পড়ার চেয়ে বেশির ভাগ সময়ে তারা এসব কাজ করতো বলে মনে হয়। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত এসব হাতের তৈরি কাজের বাবদে অ্যাসাইলাম বছরে পাঁচ শো অথবা তার চেয়ে বেশি করে টাকা পেতো — বার্ষিক রিপোর্টে তা দেখা যায়। মেয়েদের শেখানো হতো সেলাই-এর কাজ। এই দুটি ওয়ার্কশপে কাজ শেখানোর জন্যে কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন। স্কুল এবং ওয়ার্কশপ বাবদে অ্যাসাইলামের বার্ষিক ব্যয় ছিলো প্রায় ন হাজার টাকা। অরফ্যান অ্যাসাইলামের গড়পড়তা বাসিন্দা ছিলো মেয়েদের অ্যাসাইলামে ৭৫ থেকে ৮০ জন আর ছেলেদের অ্যাসাইলামে ৭০ থেকে ৭৫ জন। বছরে বছরে কিছু অনাথ অন্যের আশ্রয় পেয়ে চলে যেতো, এদের হিশেবও বার্ষিক রিপোর্টে দেওয়া আছে। আর মেয়েদের অ্যাসাইলামের কোনো কোনো সদস্যের আরও একটা গতি হতো — তাদের বিয়ে হয়ে যেতো — তার খবরও এই রিপোর্টগুলোতে আছে। ১৮৪৭-৪৮ সালে যেমন ফিমেইল অ্যাসাইলামের একজন বর্ডার-সহ মোট ছজন মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। ১৮৪৮-৪৯ সালে বিবাহিতার সংখ্যা ছিলো বর্ডার একজন আর অন্য দুজন সদস্য — এই মোট তিনজন। রেবেকা ছিলেন এই তিনজনের একজন।

রেবেকা থাকতেন ফিমেইল অ্যাসাইলামে এবং লেখাপড়া করতেন অরফ্যান অ্যাসাইলামের ছেলেদের স্কুলে। ১৮৪৭-৪৮ শিক্ষাবর্ষে এই স্কুলে মোট ছাত্র এবং ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো ৫১ জন। ছেলে এবং মেয়েদের হাতে-কলমের কাজে পার্থক্য থাকলেও, তাদের পাঠক্রমের তেমন কোনো পার্থক্য ছিলো না — সঙ্গের তালিকা থেকে তা দেখা যাবে। বাইবেল শিক্ষার প্রতি এই পাঠক্রমে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হতো। তা ছাড়া, প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজি সাহিত্য এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাস; দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি ব্যাকরণ, এশিয়া এবং য়োরোপের ইতিহাস এবং ভূগোল পড়ানো হতো। মাইকেল

এখানেই রেবেকাকে পান তাঁর ছাত্রী হিশেবে। জুতো সেলাই তাঁকে শেখাতে না-হলেও, চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবগুলো বিষয় তাকেঁ পড়াতে হতো। পরবর্তী কালে তিনি বারবার খৃস্টান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং আগ্রহের-অভাবের কথা উল্লেখ করলেও, তিনি এই স্কুলে চার বছর বাইবেল এবং বাইবেলের ইতিহাস পড়িয়েছিলেন। এই কাজে তাঁকে অবশ্য বছরখানেক সাহায্য করেছিলেন ব্ল্যাক টাউনের চ্যাপলেইন মি রবার্ট পসনেট। তিনি চলে যাবার পর জন রিচার্ডস যখন চ্যাপলেইন হন, তখন তিনিও সাহায্য করেন বছরখানেক। বিশপস কলেজে পড়ার সময়ে এবং অরফ্যান অ্যাসাইলামে পড়ানোর সময়ে তিনি খুব ভালো করে বাইবেলের শিক্ষা পেয়েছিলেন। এবং এই শিক্ষা একেবারে বাহ্যিক ছিলো না।

তিনি চাকরি নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে – ফেব্রুআরি মাসে – বয়েজ স্কুলে সে বছরের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সে পরীক্ষা নিতে আসেন তিনজন ধর্মযাজক – রেভারেন্ড টেইলর, ব্রাদারটন এবং রজার্স। এ ছাড়া আসেন মাদ্রাস স্কুলের শিক্ষক জর্জ জাইলস হোয়াইট।[১৮] এ সময়ে জর্জ হোয়াইটের সঙ্গে তরুণ মাইকেলের পরিচয় হয়। এই পরিচয় পরে ধীরে ধীরে পারিবারিক পর্যায়ে

ROUTINE OF STUDIES.

Male Orphan Asylum and Free Day School for Boys.

1st. Class—Scripture and Scripture History—Catechism with Scripture proofs—English Grammar—English History, Geography with especial reference to India—Use of the Globes—Writing and Arithmetic—Latin—Tamil and Teloogoo.

2d. Class—Scripture and Catechism with Scripture proofs—English Grammar—English History—Geography—Writing and Arithmetic—Tamil and Teloogoo.

3d. Class—Scripture—Geography and Grammar—Arithmetic—Reading and Spelling—Dictation—Writing.

4th. Class—Reading and Spelling—Church Catechism—Writing on the Board—Arithmetic (vivâ voce.)

5th. Class—Reading and Spelling—Catechism.

Female Orphan Asylum.

1st. Class—Scripture and portions committed to Memory—Catechism with Scripture proofs—Scripture History and "Young Churchman Armed"—Grammar—Indian Geography—English and Roman History—Arithmetic—Writing.

2d. Class—Scripture and Scripture Catechism and portions committed to Memory—"Young Churchman Armed"—Grammar—Geography—Writing—Arithmetic—Reading and Spelling.

3d. Class—Recitation of Scripture verses—Church Catechism with Scripture Proofs—"Young Churchman Armed"—Grammar—Geography—Writing—Arithmetic & Spelling.

অ্যাসাইলামের পাঠক্রম, ১৮৫০

ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিলো। এবং তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। পরীক্ষকরা সবাই তাঁদের রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, উপরের শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়ায় উঁচু মানের পরিচয় দিয়েছিলো। পরবর্তী বছরগুলোতে মাইকেলের শিক্ষকতায় তাঁর ছাত্রছাত্রীরা যে ভালো লেখাপড়া শিখেছিলো, তার প্রমাণও অ্যাসাইলামের বার্ষিক রিপোর্টে ছড়িয়ে রয়েছে। বিশেষ করে ১৮৫০ সালের

8.—There are 150 Orphans maintained in these Asylums, of which Number 75 are Girls and 75 are Boys; and the Directors have now the pleasure to report that an augmentation of 10 Orphans has since been made—5 to each Asylum. They are kept in separate and distinct Buildings erected for their accommodation, and both are contiguous to the Black-Town Church, and placed under the supervision of the Chaplain of the District, as is also the Day School for Boys, in which there are 50 poor Children. A larger number might be received as Day Scholars, as there are many applications for admission; but it was thought advisable to restrict it to the above number until the resources of the Schools were improved to enable them to maintain a larger educational Establishment.

The state of the Schools with reference to the number of children admitted, is as follows:

Free Day School for Boys, Established in 1807.

Received from the commencement to June 1848		1010
Do. During the past year		14.
		1024
Taken out and provided for by their friends from the commencement to 30th June 1848	959	
Do. During the past year	11	970
Remain at present		54

These Boys receive a gratuitous education except a few who pay from ½ to 1 Rupee per mensem, and they are supplied with Books and Stationery.

Male Orphan Asylum, Established in 1823.

	Boarders	Orphans.	Total.
Received from the commencement to 30th June 1848.	44	228	272
Admitted during the past year	0	13	13
	44	241	285
Apprenticed and provided for by their friends from the commencement to 30th June 1848	40	159	199
Do. during the past year	1	7	8
	41	166	207
Remaining	3	75	78

besides 10 Boys on Woolley's foundation, three above the complement.

The complement of Orphans has been since augmented to 80, on the foundation of the Charity.

Female Orphan Asylum, Established in 1815.

অরফ্যান অ্যাসাইলামের বার্ষিক রিপোর্টের এক পৃষ্ঠা

পরীক্ষার রিপোর্টে ছাত্রছাত্রীদের ভালো ফলাফলের জন্যে তাঁদের শিক্ষক মি ডাট যে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, সে কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর দুজন ছাত্রের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে

> ... under the judicious superintendence and instruction of the Master and Mistress, the progress made by pupils in various parts of their education has been satisfactory and they (*Directors*) confidently trust that the objects contemplated in the nurture and education of these orphans have been realized.

এখানে শিক্ষক এবং শিক্ষিকার নাম উল্লেখ করা না-হলেও, সরকারী গ্যারিসনের চ্যাপলেইন রেভারেন্ড ডাবলিউ বি পাওয়েল স্কুলের শিক্ষক – মি ডাটের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সবচেয়ে দুটি ভালো ছাত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন:

... the first as right to be expected, evinced powers of thought, and habits of thinking, which reflected very great credit on their master Mr Dutt.[১৯]

কবি নিজে ভালো ছাত্র ছিলেন এবং লেখাপড়া শিখেছিলেন ভালো শিক্ষকদের কাছে। সে জন্যে, শিক্ষকতা শুরু করার প্রথম দিকে তিনি যদি বা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগেও থাকেন, দ্রুত তিনি শিক্ষকতার কৌশল ভালো করে আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষকতা সম্পর্কে কোথাও ভালো-মন্দ কোনো মন্তব্য করেননি। তবু ওপরে পরীক্ষকদের যে-মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি, তা থেকে বোঝা যায়, শিক্ষক হিশেবে তিনি অল্প দিনের মধ্যে সাফল্য এবং সুনাম অর্জন করেছিলেন।

৪৬ টাকার চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব সমস্যার সমাধান হয়েছিলো অথবা অস্থির হৃদয় শান্ত হয়েছিলো, এমনটা মনে হয় না। একদিন ৮০ টাকা বেতনের ক্যাটেকিস্টের কাজ নেননি। এখন তার অর্ধেক বেতনের শিক্ষকতা নিয়ে তিনি কী করে তৃপ্তি পাবেন? তদুপরি, নিজের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন এবং পরিজন থেকে ছিটকে পড়ায় তাঁর মন বারবার মুষড়ে পড়াই স্বাভাবিক। মায়ের করুণ মুখ মনে পড়েছে। বন্ধুদের স্মৃতিও মনকে মোচড় দিয়েছে। তদুপরি, জীবন সংগ্রাম কাকে বলে, তা টের পেয়েছেন প্রথম বারের মতো। এই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাঁর নিশ্চয় সময় লেগেছে। তবে ধীরে ধীরে স্থায়ীভাবে থাকার ঘর এবং তার কয়েক মাস পরে ঘরনীও জুটেছিলো। পরের বছর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গৌরদাসকে লিখেছেন: 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার পরীক্ষার দিন অনেকটা বিগত। এখন নিজেকে দেখতে শুরু করেছি ভয়ানক ঝড়ে বিধ্বস্ত একটা জাহাজের কাপ্তান হিশেবে — যে-জাহাজ মোটামুটি একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে সবে মাত্র নোঙ্গর ফেলেছে। — তোমার জন্যে একটা উপমা দিলাম!'[২০] জন্ম-রোম্যান্টিক মাইকেল বিষয়ীর চোখে জগৎকে দেখেননি কোনোদিন। যখন ধনী হবার স্বপ্ন দেখেছেন, তখন যোগবিয়োগ করে কড়ায়-ক্রান্তিতে মিলছে কিনা, তা খতিয়ে দেখেননি। গৌরদাসকে যখন এ চিঠি লেখেন, তখন তাঁর নিজের আর্থিক এবং সাংসারিক সমস্যা কিছু কম ছিলো না। তখন স্ত্রী তিন মাসের গর্ভবতী এবং আয় যতো, ব্যয় তার চেয়েও বেশি, কারণ তিনি তো কৃচ্ছ্রসাধনা শেখেননি! ও বস্তু ধাতেই ছিলো না তাঁর। এই পরিবেশে তিনি বাস্তব সমস্যা নিয়ে হাহাকার না-করে কল্পনার জগতে বিচরণ করেছেন — সাধনা করেছেন কাব্যদেবীর। শিগগিরই সাহিত্যের অঙ্গনে তিনি স্থায়ী খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হবেন — এই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

মাদ্রাসে যাবার পর সেখানে চাকরি জোটানো এবং খানিকটা প্রতিষ্ঠা লাভ ছাড়া তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ভালোবেসে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করা। অরফ্যান অ্যাসাইলামের স্কুলে পড়াতে শুরু করার পরেই ভাবী স্ত্রী রেবেকার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিলো। প্রথম যৌবন থেকে তিনি কেবল নীলনয়নার স্বপ্ন আকাশে আকাশে বপন করেছিলেন। এবারে রক্তমাংসের অবয়বে সেই কল্পনার নায়িকাকে প্রত্যক্ষ করলেন। শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করার এই ব্যাপারটি ছিলো একেবারে অবাস্তব। অবাস্তব বলছি এ জন্যে যে, তখনো পর্যন্ত তাঁর শিক্ষক ডিএলআরের মতো কোনো কোনো ইংরেজ কর্মচারী অথবা ব্যবসায়ী দেশীয় নারী বিয়ে করলেও কিংবা তাঁদের রক্ষিতা রাখলেও, কোনো দেশীয় ব্যক্তি কোনো শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করেছিলো, এমন প্রমাণ নেই। (সূর্য গুডিভ চক্রবর্তী এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করেছিলেন আরও পরে — ১৮৫১ সালে।) এই বিবাহে সে জন্যে বাধা দেবার লোকের অভাব ছিলো না। গৌরদাসকে তিনি লিখেছেন: 'তাঁকে পেতে আমার দারুণ ঝামেলা হয়েছিলো। তাঁর বন্ধুরা, বুঝতেই পারছো, এই বিয়ের খুব বিরোধী ছিলো। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো।'[২১] অপরিচিত জায়গায় গিয়ে রোগ ভোগ করা, চাকরি জোটানো, একটি শ্বেতাঙ্গিনীর হৃদয় হরণ করা এবং সব বাধাকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিয়ে করতে পারা — এ সবই ঘটেছিলো মাত্র ছ মাস তেরো দিনের মধ্যে। বিয়ে হয় ৩১ জুলাই তারিখে (১৮৪৮)।

এই বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন জেসি রে (তাঁর পোশাকী নাম জেসি রে হলেও, তিনি পরিচিত ছিলেন রিচার্ড নামে) নেইলর (১৮২৩-১৮৭২) নামে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক – আগেই যাঁর নাম উল্লেখ করেছি, তাঁর স্ত্রী সুসানাহ্ এইচ নেইলর এবং এডওয়ার্ড প্রাইস।[২২] নেইলরের বয়স কবির চেয়ে এক বছর বেশি। ১৮৪৫ সালের ২৯ জুলাই তারিখে নেইলর যখন বিয়ে করেন তখন তিনি ছিলেন অরফ্যান আসাইলামের হেডমাস্টার।[২৩] আশার হিশেবে মাইকেল এই স্কুলের কাজ আরম্ভ করার সময়ে নেইলর বিদায় নেন। বছরখানেক পরে তিনি ব্ল্যাক টাউনের লাগোয়া পশ্চিমের পাড়া ভেপারির একটি স্কুলের শিক্ষক হন। (তিনি থাকতেনও ভেপারিতে।) কবি যতো দিন মাদ্রাসে ছিলেন ততোদিন এঁর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিলো। এই বন্ধুত্বের সূত্র ধরে কয়েক বছরের মধ্যে নেইলর মাদ্রাস স্কুলে তাঁর সহকর্মী হিশেবে যোগ দিয়েছিলেন।[২৪] তাঁর বিয়েতে পুরুত হিশেবে কাজ করেছিলেন ব্ল্যাক টাউনের চ্যাপলেইন রবার্ট পসনেট – অরফ্যান অ্যাসাইলামে বাইবেল পড়ানোর ব্যাপারে যিনি তাঁকে সাহায্য করতেন। তা ছাড়া, তিনি ছিলেন অরফ্যান অ্যাসাইলামের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম। অ্যাসাইলামকে তিনি বার্ষিক পনেরো টাকা করে চাঁদাও দিতেন।[২৫] এ বিয়েটা ছিলো অরফ্যান অ্যাসাইলামের প্রায় পারিবারিক ব্যাপার, কেবল বর অথবা কন্যার পরিবার সেখানে উপস্থিত ছিলো না, এই যা!

রেবেকার সঙ্গে তাঁর প্রণয় কিভাবে হয়েছিলো, এখন সাধ্যসাধনা করেও তার খবর জোগাড় করা সম্ভব নয়। মাইকেল কৃষ্ণাঙ্গ। মাদ্রাসে অজ্ঞাতকুলশীল। বিত্তহীন। তা সত্ত্বেও, রেবেকা যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, সে কৃতিত্ব কতোটা রেবেকার, কতোটা কবির, তা বলা সহজ নয়। এ ব্যাপারে প্রথম যৌবনে উপনীত অনাথ এবং আত্মীয় ও সহায়হীনা রেবেকার কাঙাল ও নিঃসঙ্গ মন যতোটা দায়ী; প্রতিভাদীপ্ত, উচ্ছ্বসিত, সপ্রতিভ, তরুণ মাইকেলের ব্যক্তিত্বও তার চেয়ে কম দায়ী ছিলো বলে মনে হয় না। বস্তুত, তাঁর বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব দেখেই রেবেকা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর কবিতা এবং রোম্যান্টিক মনের পরিচয়ও তিনি পেয়েছিলেন। মাদ্রাসের পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি যখন একজন উঠতি কবি হিশেবে নাম করেন, রেবেকা তাঁর প্রতি তখন আকৃষ্ট হননি – ততোদিনে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেছে। নিঃসঙ্গ রেবেকা মাইকেলের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা এবং আশ্রয়ের ভরসা পেয়েছিলেন, তাঁর কাছে যা অসামান্য বলে মনে হয়েছিলো। সে জন্যে, তিনি তাঁর গায়ের রং এবং আর্থিক দৈন্য দেখে ভয় পাননি। বিশেষ করে, কেনেট এবং মাইকেলের কাছে তিনি যখন জানতে পেরেছেন যে, আপাতত মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের দরিদ্র আশার হলেও তিনি 'কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট রাজনারায়ণ দত্তের' একমাত্র পুত্র।

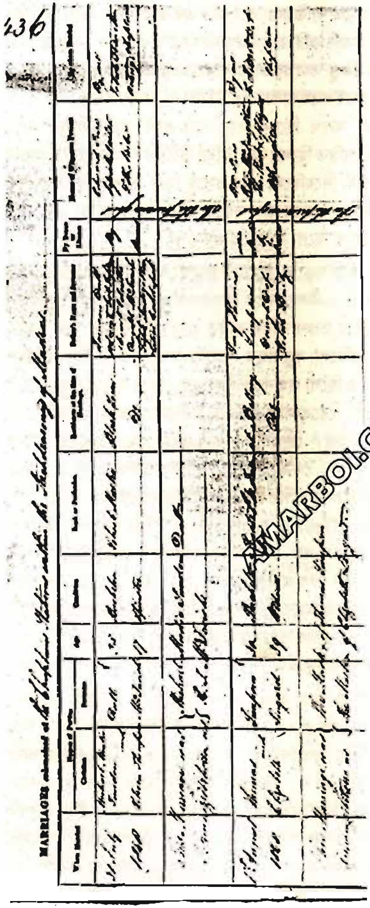
বিয়ের সময়ে চার্চের রেজিস্টারে লেখার জন্যে কবি যখন তাঁর পিতৃপরিচয় দেন, তখন একটু জাহির করেই বলেছিলেন: সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট।[২৬] তাঁর চরিত্রের সঙ্গে এটা আদৌ অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। রাজনারায়ণ দত্ত আদৌ অ্যাডভোকেট ছিলেন না। ১৮৪৮ সালে কলকাতায় অ্যাডভোকেটের সংখ্যা ছিলো মাত্র উনিশ। সবাই ইংরেজ। সবাই ব্যারিস্টার। এমন কি, ৫৩ জন অ্যাটর্নিরও সবাই ছিলেন ইংরেজ অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। দেশীয়রা ছিলেন প্লীডার – উকিল। কলকাতায় তখন প্লীডারের সংখ্যা ছিলো প্রায় চার শো। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ/অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানও ছিলেন। রাজনারায়ণ ছিলেন এই প্লীডারদেরই একজন। এবং তিনি যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় অথবা গোলাম সবদারের মতো প্রথম সারির উকিল ছিলেন না, আগেই তা উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া, মাইকেল সদর দেওয়ানি আদালতকে সুপ্রিম কোর্ট বলে উল্লেখ করেছিলেন, তাকেও অনেকে অতিরঞ্জন বলতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে যা বলার আছে, তা হলো: তখন সদর দেওয়ানি আদালত এবং সদর নিজামত আদালতকে ইংরেজিতে সুপ্রিম কোর্ট বলা হতো। হাই কোর্টের অভাবে এই দুই

আদালতই ছিলো সর্বোচ্চ আদালত। যে-মানসিকতা থেকে মাইকেল *লেডি সেইলে* করে মাদ্রাসে যাবার সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন 'এম এম ডাট *অব বিশপস কলেজ'* বলে, সেই একই মানসিকতা থেকে পিতৃপরিচয়কেও তিনি খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, পিতার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না-থাকা সত্ত্বেও।

পিতার পরিচয় দেবার ব্যাপারে রেবেকাও তাঁর স্বামীর পথ অনুসরণ করেছিলেন। সত্যি বলতে কি, তিনি পিতৃ-পরিচয় বিকৃত করেছিলেন আরও বেশি। তবে কারণটা ভিন্ন ধরনের। তিনি বিয়ের রেজিস্টারে তাঁর পিতার নাম লিখিয়েছিলেন ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশ, কিন্তু তাঁর পিতার নাম মোটেই ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশ নয়। চার্চের রেজিস্টারে বিয়ের সময়ে রেবেকা টমসন ম্যাকট্যাভিশের বয়স লেখা হয়েছিলো ১৭ বছর। ১৮৪৮ থেকে ১৭ বছর বাদ দিয়ে ১৮৩১ সালের চার্চের রেজিস্টার থেকে রেবেকার পিতামাতার সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ বছর ২১ ডিসেম্বর তারিখে তাঁর ব্যাপটিজমের সময়ে তাঁর পরিচয় লেখা হয় – পিতা রবার্ট টমসন, হর্স আর্টিলারি ব্রিগেডের গানার। আর মা ক্যাথরিন টমসন। মায়ের পরিচয় দিয়ে লেখা হয়েছে ইন্ডো-ব্রিটন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, মধুসূদন "of English parentage" বলে স্ত্রীকে নিয়ে গর্ব করলেও, আসলে তিনি পুরোপুরি য়োরোপীয়ান ছিলেন না। রেবেকার জন্ম নাগপুরে, ১৮৩১ সালে।[২৭]

স্ত্রীর পরিচয় দিতে গিয়ে মাইকেল গৌরদাসকে লিখেছিলেন, তাঁর শ্বশুর *ছিলেন* মাদ্রাসের একজন নীলকর। চার্চের রেজিস্টারে যে-পরিচয় আছে, তা সঙ্গে তাঁর এই উক্তির পুরো সঙ্গতি নেই। কারণ বিয়ের রেজিস্টারে 'ছিলেন' লেখা হয়নি, বরং রেবেকার পিতার নাম লেখা হয়েছে – ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশ, কডাপ্পার ইন্ডিগো সুপারিন্টেন্ডেন্ট – যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, এই ব্যক্তি জীবিত।[২৮] তা ছাড়া, নীলকর নন, তিনি নীলব্যবসায়ী আর্বাথনট কম্পেনির কর্মচারী মাত্র। তবে রেবেকার তরফ থেকে পিতৃ-পরিচয় পুরো অস্বীকার করার প্রয়াস ছিলো না। বিয়ের রেজিস্টারে নিজের নাম কেবল রেবেকা ম্যাকট্যাভিশ লিখলে, বলা যেতো তিনি পিতার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করেছেন। কিন্তু তাঁর বদলে তিনি আসল নাম – রেবেকা টমসনের - সঙ্গে ম্যাকট্যাভিশ বংশ-নামটি জুড়ে দিয়েছিলেন। তবে পিতার নাম রবার্ট টমসন না-লিখে, লিখেছিলেন ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশ। এই অসঙ্গতির কারণ কী?

রবার্ট টমসনের পরিচয় যতোটুকু জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনি ক্যাথরিন ডাইসনকে বিয়ে করেন বাঙ্গালোরে, ১৮২৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে। মাইকেল এবং রেবেকার মতো তাঁদেরও বিয়ে হয়েছিলো ব্যানস দিয়ে।[২৯] রেবেকাসহ তাঁদের আরো একাধিক সন্তান জন্মেছিলো। তাদের মধ্যে সারাহ টমসনের জন্ম ১৮৩৬ সালের জানুআরি মাসে।[৩০] আর রবার্ট টমসন মারা যান ১৮৪৪ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে।[৩১] ক্যাথরিন টমসন এবং ছোটো মেয়ে সারাহ্ অতঃপর কোথায় যান আমি তার হদিস করতে পারিনি। তবে খুব সম্ভব, রবার্ট টমসনের মৃত্যুর পরে তাঁরা ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশের আশ্রয় পান এবং পালক-পিতা ম্যাকট্যাভিশের নামকেই রেবেকা নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে দেন। (মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিআম ক্লিন্টন এর একটা দৃষ্টান্ত। উইলিআম তাঁর পিতার বংশনাম না-লিখে, নিজের নামের শেষে ব্যবহার করেন তাঁর মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর বংশনাম। পার্থক্য এই যে, রেবেকা নিজের মূল বংশনামও বহাল রেখেছিলেন।) পরে নিজের পরিবারেও রেবেকা ঘনিষ্ঠ এবং উপকারী বন্ধুদের নাম ব্যবহার করার এই ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। তিনি চারটি সন্তানের মধ্যে প্রথম সন্তানের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন অরফ্যান অ্যাসাইলামের সেক্রেটারি, মি চার্লস কেনেটের নাম, যাঁর কল্যাণে মাইকেল চাকরি এবং আশ্রয় পেয়েছিলেন। তা ছাড়া, কাজের জন্যে



মাইকেলের বিয়ের দলিল

তিনি সরাসরি দায়ীও থাকতেন মি কেনেটের কাছে। মি কেনেটের পুত্র চার্লস এগব্যর্ট তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু — সে যোগাযোগও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অরফ্যান অ্যাসাইলামের ছাত্রী হিশেবে স্বয়ং রেবেকাও সরাসরি মি কেনেটের অভিভাবকত্বে লালিত হয়েছিলেন। বোঝা যায়, তাঁদের বিয়েতে মি কেনেটের আশীর্বাদ ছিলো। দ্বিতীয় মেয়ের নামের সঙ্গে রেবেকা জুড়ে দিয়েছিলেন তাঁদের পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী জে ডাবলিউ সালফেন্টের নাম। আর তৃতীয় সন্তান — বড়ো পুত্রের নামের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন ম্যাকট্যাভিশ নাম।

ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশের সঙ্গে রেবেকার মায়ের বিয়ে হয়নি — অন্তত চার্চের রেজিস্টারে এমন বিয়ের কোনো প্রমাণ নেই। যদ্দুর জানতে পেরেছি, ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশের জন্ম স্কটল্যান্ডে, ১৭৮৩ সালে। তাঁর পিতার নামও ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশ।[৩২] তাঁর ছোটো ভাই কলিন সৈন্য বিভাগের সহকারী সার্জন হিশেবে ভারতবর্ষে আসেন এবং বেশির ভাগ সময়ই বোম্বাই অঞ্চলে কাজ করেন। তাঁরা দু ভাই-ই বিয়ে করেন স্কটল্যান্ডে এবং অবসর নেবার পর মারা যান স্বদেশে। এই পরিচয় কলিন বেলায় যতোটা অভ্রান্ত বলে দাবি করতে পারি, ডুগাল্ডের বেলাতে তেমন নয়। কারণ, ইউটার বংশ-পরিচয়ের তথ্যাবলী থেকে ১৭৮০-র দশকে জন্মেছিলেন এমন ২৯জন ডগাল্ড ম্যাকটেভিশের নাম জানতে পারছি, যাঁদের পিতাদের নামও ডুগাল্ড। অপর পক্ষে, এডিনবরার পাবলিক রেকর্ডস অফিসে কলিনের নামে তথ্য থাকলেও, ডুগাল্ডের নামে

নেই। তদুপরি, মাদ্রাস এবং বোম্বাই চার্চ-এলাকায় ম্যাকট্যাভিশ নাম দিয়ে সেকালে কোনো জন্ম, মৃত্যু অথবা বিয়ের তথ্য পাওয়া যায় না। এক মাত্র ব্যতিক্রম রেবেকা। এর কারণ তিনি পদবী হিশেবে ব্যবহার করেছিলেন ম্যাকট্যাভিশ নামটি। ধারণা করি, রবার্ট টমসন মারা যাবার পর, রেবেকা কিছু কাল ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশের আশ্রয়ে ছিলেন। কিন্তু তারপর তাঁকে থাকতে হয় অরফ্যান অ্যাসাইলামে। ম্যাকট্যাভিশের মেয়ে হলে তাঁর অরফ্যান অ্যাসাইলামে থাকার প্রশ্ন উঠতো না, কারণ এই অ্যাসাইলামে থাকতো কেবল যারা অনাথ। রেবেকা যে অনাথ ছিলেন, তার আর-একটা প্রমাণ বিয়ের সময়ে রেবেকার পিতা অথবা অন্য কোনো আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন না। কবির চিঠি থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। তাঁদের বিয়েতে কেউ কেউ প্রবল বাধা দিয়েছিলো — এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন বন্ধু এবং অন্যদের কথা, কিন্তু আত্মীয়দের কথা বলেননি।[৩৩] প্রবল বাধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের যে বিয়ে হলো, তার কারণ রেবেকার বক্তব্য এ ব্যাপারে ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

রেবেকার সঙ্গে পরিচয়ের পর, তাঁর সঙ্গে প্রেমে পড়তে রোম্যান্টিক মাইকেলের দেরি হয়নি। প্রথম যৌবন থেকে তিনি ভালোবাসার ধ্যান করেছেন — নীলনয়নাকে ভালোবাসার। তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে একজন রক্তমাংসের শ্বেতাঙ্গিনীকে পেয়ে তরুণ কবির কবিত্ব এবং প্রেম উভয়ই দ্রুত উথলে উঠেছিলো। তা ছাড়া, তিনি তখন বসবাস করছিলেন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিত পরিবেশ থেকে অনেক দূরে প্রায় অসহায় অবস্থায়। এ ছিলো সহানুভূতিশীল এক জোড়া মুগ্ধ চোখের মায়ায় দেউলে হয়ে যাবার একেবারে আদর্শ পটভূমি। রেবেকাকে তিনি যে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন, তাঁর কবিতা থেকে তার বেশ আভাস পাওয়া যায়। রোম্যান্টিক কবি প্রথম প্রেম এবং সেই প্রেমের পাত্রী নতুন বৌকে নিয়ে নেশায় যখন মেতে আছেন, তেমন সময়ে — অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে *Madras Circulator* পত্রিকায় পরপর তাঁর চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলো প্রেমের। এই চারটি কবিতা তিনি প্রকাশ করেন একটি ছদ্মনামে — Timothy Penpoem।[৩৪] এতো নাম থাকতে তিনি টিমথি নামটি কেন পছন্দ করে নিলেন, বোঝা যায় না। এই কবিতাগুলো প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবি হিশেবে *Madras Circulator*-এর কাছে তিনি বেশ প্রতিষ্ঠিত হন। তা ছাড়া, তাঁর আত্মবিশ্বাসও পোক্ত হয়। সদ্যবিবাহিত এবং প্রেমের পরিপূর্ণতার আবেগে তিনি এ সময়ে বিহ্বল। বিয়ের মোটামুটি সাড়ে তিন মাস পরে রেবেকা গর্ভবতী হন। সে খবরও তাঁকে উচ্ছ্বসিত করে থাকবে। এই পরিবেশে তিনি বাস্তব জীবনের সকল রূঢ়তা অগ্রাহ্য করে প্রাণের আনন্দে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন।

অবশ্য কবিতায় সাংসারিক অভাবকে গ্রাহ্য না-করা, আর গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করা এক নয়। বস্তুত, নিজেই লিখেছেন, সমস্যা কিছু কম ছিলো না। মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামে চাকরি করে বেতন পেতেন পঞ্চাশ টাকারও কম — তাই দিয়ে শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করা কি সহজ ব্যাপার? যদিও রেবেকার দাবি খুব বেশি ছিলো বলে মনে হয় না। তিনি নিজে ছিলেন গরিব একজন গোলন্দাজ সৈন্যের মেয়ে, কোনো দিন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হয়েছেন, তার কোনো প্রমাণ নেই। তদুপরি বিয়ের চার বছর আগে, মাত্র সাড়ে বারো বছর বয়সে পিতাকে হারানোর পর, জায়গা হয়েছিলো অনাথ আশ্রমে। এ থেকেই তাঁর পটভূমি সম্পর্কে ধরণা করা সম্ভব। এমতাবস্থায় রেবেকার প্রত্যাশা খুব উঁচু হবে কী করে? তা ছাড়া, মাইকেলের যে কোনো চাল-চুলো নেই, তা জেনেশুনেই তাঁকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। কবির দারিদ্র্যের সঙ্গে তিনি মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন বলেই মনে হয়। তবু বিয়ের পর সংসারের চাপে কবির অর্থকষ্ট বেড়েছিলো। এ সময়ে ব্ল্যাক টাউন ছেড়ে তিনি বাস করেছিলেন ব্ল্যাক টাউনের লাগোয়া উত্তর দিকে সাগরের ধারে রায়পুরমের একটি বাড়িতে।[৩৫] তার ভাড়াও বেশি। এ কারণে বাড়তি আয় করার জন্যে ১৮৪৮ সালের শেষ দিক থেকে তিনি পত্রপত্রিকায় লিখছিলেন অথবা অন্য কোনো কাজ করছিলেন বলে অনুমান করি।

এই পরিবেশে কাব্য চর্চা করা সহজ নয়। তবু এরই মধ্যে তিনি *Captive Ladie* নামে একটি কাব্য লিখে ফেলেন *Madras Circulator* পত্রিকার জন্যে। নভেম্বর মাসের গোড়ায় তিনি এটি লিখতে আরম্ভ করেন। আর শেষ করেন এ মাসেরই ২৫ তারিখ নাগাদ। এ কাব্যের পুরো নাম *The Captive Ladie* (An Indian Tale) in two Cantos। এ ছাড়া, এ কাব্যের শেষে তিনি জুড়ে দিয়েছেন *Visions of the Past* - A Fragment। *The Captive Ladie*-র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, এটা লেখা হয়েছে জীবনের নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে – অভাব আর অনটনের সঙ্গে লড়াই করে। মাদ্রাসে পা দেবার এক বছর এক মাস পরে – ১৮৪৯ সালের ১৪ ফেব্রুআরি গৌরদাসকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠিতেও এই প্রতিকূল অবস্থার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, শত অসুবিধে সত্ত্বেও ছাপানোর জন্যে একটি কাব্য রচনার কাজ শেষ করেছেন। গ্রন্থকার হবার জন্যে এ হলো তাঁর প্রথম রীতিমতো প্রয়াস। এ কাব্যের সূচনায় আছে রেবেকা-বন্দনা। আর এ কাব্য যখন *Madras Circulator*-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় তখন এর ললাটে ছিলো বন্ধু রিচার্ড নেইলরের নাম – অংশত যাঁর আনুকূল্যে রেবেকার গলায় তিনি মালা পরাতে পেরেছিলেন।

এই কাব্যের বন্দনা অংশে রেবেকার প্রতি তিনি যে-গভীর প্রেম এবং নির্ভরতা দেখিয়েছেন, তা থেকে তাঁর প্রতি কবির ভালোবাসার স্বরূপ এবং গভীরতা অনুভব করা যায়। *The Captive Ladie*-র সূচনায় তিনি লিখেছেন:

> রবিকরোজ্জ্বল স্বপ্ন বুনবো আমি, তোমার নয়ন জোগাবে আমার প্রেরণা;
> কেবল তোমায় পরাবো আমার মালা, প্রেমের মালা; সৌন্দর্যের সিংহাসনে আসীন আমার রানী।
> মধুর এমন ওই নয়নে নয়ন রাখা, যে-নয়নে ভিড় করেছে পরম প্রেমের আলোকমালা।

কবির সমস্ত নিঃসঙ্গতাকে ভুলিয়ে দিয়ে প্রিয়া তাঁর জীবনপাত্রকে কানায় কানায় ভরে দিয়েছেন তাঁর সঙ্গ দিয়ে। আজ আর কোনো দুঃখ নেই।

> The heart which once has sigh'd in solitude,
> And yearn'd t' unlock the fount where softly lie
> Its gentlest feelings, - well may shun the mood
> Of grief - so cold - when thou, dear one! art nigh,
> To sun it with thy smile, Love's lustrous radiancy?

কেবল সৌন্দর্য এবং প্রেম নয়, কবি তাঁর প্রেমিকার চোখে দেখতে পেয়েছেন অগাধ আশ্বাস আর পরিপূর্ণতার ইশারা।

> .... like that star which, on the wilderness
> Of vasty ocean, woos the anxious eye
> Of lonely mariner, and woos to bless,-
> For there be Hope writ on her brow on high,
> He recks not darkling waves, - fears the lightless sky!

কবির চোখে তাঁর প্রিয়া মূর্তিমতী প্রেরণা। এমন আঁখিতে আঁখি রেখে সকল অভাব আর সন্তাপকে অস্বীকার করা কঠিন নয় মোটেই:

> Tho' ours the home of want,— I ne'er repine,
> Art thou not there —

তারপর চূড়ান্ত ঘোষণায় বলেছেন: 'তুমি আমার মধুর স্বপন, তুমি আ-মা-র! পরিপূর্ণ সুখের বাস্তবতায়! ঝরে যাওয়া আমার বসন্তের স্মৃতি এখনো তিক্ত, তবু দুঃখ নেই কোনো!'

এক কথায় এ কাব্যের পরিচয় দিয়ে কবি গৌরদাসকে লিখেছেন, 'এতে আছে দুটি সর্গের একটি

কাহিনী — আধা-ঐতিহাসিক কাহিনী। ভালো-মন্দতে মেশানো মোট প্রায় বারো শো পঙ্‌ক্তি। এ ছাড়া আছে ছোটো একটা কি দুটো কবিতা।' দিব্যি দিয়ে বলেছেন, 'লিখতে সময় লেগেছে তিন সপ্তাহেরও কম।' অসম্ভব নয়, কারো সঙ্গে বাজি রেখে — কোনো কথার প্যাঁচে পড়ে এ কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন। অন্যের সঙ্গে বাজি ধরে অথবা জেদ করে ঝড়ের গতিতে লেখার তাঁর এই প্রবণতা পরেও দেখা যাবে। এ কাব্যের জন্যে তিনি যে-কাহিনী বেছে নিয়েছিলেন, তার কথা তিনি বন্ধুকে লেখেননি। কিন্তু লিখেছিলেন এ কাব্যের ভূমিকায়:

> এ কহিনীটি রচিত হয়েছে এমন একটি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে, যা ভারতবর্ষে বেশ জানা, এবং, আমার ভুল না-হয়ে থাকলে, কোনো কোনো য়োরোপীয় লেখকও এটা লক্ষ্য করেছেন। ... গজনির মাহমুদ ভারত আক্রমণ করার অল্প আগে কনৌজের রাজা রাজসূয় যজ্ঞ পালন করেন। আমি একে অনুবাদ করেছি 'বিজয় উৎসব' হিশেবে। সমকালীন প্রায় সব রাজাই কনৌজ-রাজের শক্তিকে অস্বীকার করতে না-পেরে এই যজ্ঞে যোগদান করেন। ব্যতিক্রম ছিলেন দিল্লির রাজা। তিনি নিজেকে বিবেচনা করতেন ব্যাসের মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডব রাজাদের বংশধর বলে। তিনি এই উৎসবে যোগদান করলে কনৌজের রাজাকেই সমগ্র দেশের সবচেয়ে বড়ো রাজা হিশেবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো। কিন্তু দিল্লিরাজ তাঁর বংশকে মনে করতেন রাজাধিরাজ হবার উপযুক্ত। সুতরাং তিনি কনৌজের রাজার রাজসূয় যজ্ঞে যাননি। কনৌজরাজ এতে দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে দিল্লিরাজের একটি সোনার মূর্তি তৈরি করে সেটি যজ্ঞস্থানে রাখেন। এই উৎসবের শেষ দিন দিল্লিরাজ তাঁর কিছু নির্বাচিত অনুসারী নিয়ে ছদ্মবেশে কনৌজরাজের প্রাসাদে ঢুকে এই সোনার প্রতিমা এবং সেই সঙ্গে রাজকুমারীকে হরণ করেন। এই রাজকুমারীকে তিনি আগেই বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কিন্তু কনৌজরাজ নিজের বংশকে রাজাধিরাজ হবার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করায় দিল্লিরাজের কাছে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করতে চাননি। পরে কনৌজরাজ অবশ্য তাঁর কন্যাকে উদ্ধার করে বন্দী করে রাখেন একটা নির্জন দুর্গে। ওদিকে, দিল্লিরাজ খবর পেয়ে রাজকুমারীকে এক ভাটের ছদ্মবেশে সেই দুর্গ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। কনৌজরাজ এই অপমানের কথা কখনো ভুলে যাননি। সে জন্যে গজনির মাহমুদ যখন দিল্লি আক্রমণ করেন, তখন কনৌজরাজ তাঁর জামাতাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। তবে মাহমুদ অল্পদিনের মধ্যে স্বয়ং কনৌজরাজকেও গুঁড়িয়ে ফেলেন। আমি অবশ্য রাজসূয় যজ্ঞের আগেই রাজকুমারীকে নির্জন দুর্গে বন্দী করে গল্পের খানিকটা পরিবর্তন করেছি।

যে-কাহিনী তিনি নির্বাচন করেছিলেন, তা পুরোপুরি ঐতিহাসিক ছিলো না। কনৌজের রাজকুমারীকে অপহরণ করে দিল্লির রাজা তাকে বিয়ে করেছিলেন এবং তারপর কনৌজের রাজা আবার তাঁর কন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে বন্দী করে রেখেছিলেন নিজের প্রাসাদে। সেই নারীই *The Captive Ladie*-র নায়িকা। কাহিনী লেখার সময়ে কবি তার ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্যে মোটেই ব্যাকুল হননি; এর মধ্যে যুদ্ধের ভেরীও তিনি বাজাননি। তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই কাহিনীর মানবিক প্রেমের দিকটিকে। এতো কাহিনী থাকতে তিনি বিশেষ করে এই কাহিনী নির্বাচন করলেন কেন, তার কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেননি। তবে কলকাতার ধনী এবং নাম-করা উকিল রাজনারায়ণ দত্তের নাম-করা পুত্র বিয়ে করতে চাইছে অরফ্যান অ্যাসাইলামের একটি অনাথ তরুণীকে, কিন্তু তাঁকে প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে তাঁর অনভিজাত ফিরিঙ্গি বন্ধুরা — এমন একটা ধারণা এর পেছনে কাজ করেছিলো কিনা, তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

যে-পরিবেশে তিনি কাব্যটি লিখেছিলেন, ভূমিকা থেকে দেখা যায়, কাব্য রচনার জন্যে তা তেমন অনুকূল ছিলো না। তা ছাড়া, কাব্যটি তিনি রচনাও করেছিলেন খুব কম সময়ের মধ্যে। এই তাড়াহুড়োর ছাপ তাঁর লেখায় পড়েছিলো এবং তিনি নিজেও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কৈফিয়ত দিয়ে তাই লিখেছেন:

> আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এ কাব্যে অনেক খুঁত দেখা দিয়েছে, এবং তার জন্যে পাঠকদের কাছে আমার মাফ চাইবার অনেক কারণ আছে। গোড়াতে এই কাব্য খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে রচিত হয় স্থানীয় একটি পত্রিকা — *Madras Circulator and General Chronicle*-এর জন্যে। জীবনের যে-নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে এই কাব্য লেখা

> হয়েছে, তা থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে কাব্য সাধনা করার জন্যে অসাধারণ প্রয়াস দরকার। অভাব এবং অনটন তাদের সঙ্গে দুঃখদুর্দশার যে-বাহিনী নিয়ে আসে, তা তাদের শিকারকে সামান্যই প্রেরণা দিতে পারে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, পত্রিকার সম্পাদক তাঁর রচনার মান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি নিজের উচ্ছ্বাস চাপা রাখতে পারেননি:

> এই পত্রিকার সম্পাদক গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে নাম-করা সম্পাদকদের অন্যতম। তিনি সারাক্ষণই আমার ঢাক পেটাচ্ছেন। চমৎকার লোক! এ কাব্যটা এখানে খুব মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। যাঁদের বিচারবুদ্ধি এবং যোগ্যতা খুব উন্নত মানের এমন অনেকে আমাকে এই কাব্যটিকে বই আকারে প্রকাশ করার জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন। সে জন্যে ছাপাখানার ভূত আমাকে ইতিমধ্যে পেয়ে বসেছে।

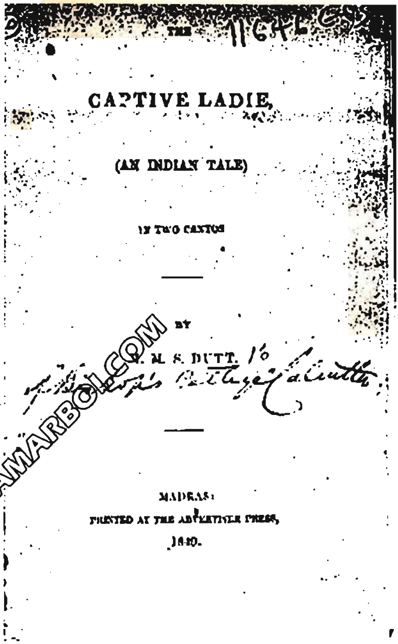
তাঁর লেখার ধরন থেকে অবশ্য মনে হয় না, এই ভূত তাঁর ওপর ভর করায় তিনি একটুও অখুশি। বরং মনে হয়, এ কাব্য প্রকাশ করছেন তিনি দারুণ উৎসাহ নিয়ে এবং এরই মধ্যে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে আশা করতে আরম্ভ করেছেন যে, এ কাব্য তাঁকে দেবে তাঁর আকৈশোর-কাঙ্ক্ষিত কবিযশ। তাঁর মতে, এ পথে দুস্তর কোনো বাধা নেই, আছে কেবল একটা ছোটোখাটো পার্থিব বাধা – ছাপার খরচ। আর, পরে নিজেই জানিয়েছেন, মাদ্রাসে ছাপার খরচ বড্ডো বেশি।[৩৬] (১৮৪৮-৪৯ সালের অরফ্যান অ্যাসাইলামের ২৪ পৃষ্ঠার বার্ষিক রিপোর্ট ছাপাতে খরচ হয়েছিলো ৩৫ টাকা ৪ আনা। *The Captive Ladie*-র পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিলো মোট ১১ + ৮০। সুতরাং ছাপাতে দেড় শো / দু শো টাকা খরচ হওয়া অসম্ভব নয়। এর মধ্যে প্রথম সর্গ শেষ হয়েছে ২৮ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় সর্গ ৫৪ পৃষ্ঠায়। তার পরে একটি সনেট এবং দীর্ঘ কবিতা (*Visions of the Past*)। আর-এক চিঠিতে লিখেছেন, তাঁর পক্ষে বড়ো কবি হওয়া শক্ত নয় মোটেই – কেবল কেউ যদি মাসে মাসে কয়েক শো করে টাকা ব্যয় করতে রাজি থাকতো।[৩৭]

গৌরদাসের কাছে তিনি জানতে চেয়েছেন, এই কাব্যের জন্যে তিনি কিছু গ্রাহক জুটিয়ে দিতে পারবেন কিনা। 'আমি জানি, তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে। প্রতি কপির দাম মাত্র দু টাকা। এমন কি আমাদের স্কুলের পুরোনো বন্ধুদের মধ্য থেকে তুমি নিশ্চয় কমপক্ষে ৪০ জন গ্রাহক জুটিয়ে দিতে পারবে। আমি এখানে খুব কম লোককে জানি। সে জন্যে আমি এ কাব্য বিক্রি থেকে ছাপার খরচ চুকিয়ে দিতে পারবো বলে মনে হয় না। ...তোমাকে আমি হলপ করে বলতে পারি, আমি কোনো আর্থিক লাভের আশায় এ বই ছাপাচ্ছিনে। কেবল লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পেলেই হলো।' তিনি আশা করেছেন, মার্চ মাসের গোড়াতে এ বই বেরিয়ে যাবে। এবং মার্চের মাঝামাঝি বিশপস কলেজের একজন ছাত্র (মাদ্রাস চার্চ এলাকার তিনজন ছাত্র পড়তেন বিশপস কলেজে) তাঁর পরিবারকে দেখে কলকাতায় ফিরে যাবেন। তাঁর হাত দিয়ে যতো খুশি কপি নিখরচায় পাঠানোর সুবর্ণ সুযোগও রয়েছে। সুতরাং গ্রাহক জুটিয়ে গৌরদাস কেবল যেন জানান, তাঁর কতো কপি দরকার। পুরোনো বন্ধুরা – বঙ্কু, ভূদেব, হরি, শ্যাম এবং স্বরূপও কি কিছু গ্রাহক জোটাতে পারবেন না?[৩৮] গ্রাহক সংগ্রহের অনুরোধ জানিয়ে তিনি হিন্দু কলেজের সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক মি মন্টেগু এবং বিশপস কলেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবার্ট ওয়াকারকেও চিঠি লেখেন।

কবি যদি কেবল এই বই-এর গ্রাহক জোগাড় করার অনুরোধ করে গৌরদাসের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সম্পর্ক ঝালাই করতেন, তা হলে তাঁকে স্বার্থপর বলা যেতো। কিন্তু তিনি সে ধরনের লোক ছিলেন না। আসলে, তিনি লেখার আগেই গৌরদাস তাঁর খবর এবং ঠিকানা জোগাড় করে বছরের গোড়ার দিকেই চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর বিয়ের কথাও জানতে পেরেছিলেন গৌরদাস। তিনি কোথায় তাঁর ঠিকানা এবং খবর পেয়েছিলেন, তার কথা জানা যায় না। রাজনারায়ণ দত্ত যতোই রাগ করুন না কেন, পুত্র কাউকে কিছু না-বলে উধাও হবার পরে এক সময়ে নিশ্চয় তাঁর খবর নিতে চেষ্টা করেছেন।

বিশপস কলেজ থেকে তাঁর খবর জোগাড় করাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, মাদ্রাসে যাবার কিছু কালের মধ্যে কবি নিজেই হয়তো তাঁর মাকে জানিয়ে থাকবেন যে, তিনি সেখানে আছেন। তবে তাঁর বিয়ে অথবা জীবন-সংগ্রামের কথা অভিমানবশত জানিয়েছিলেন কিনা, কে জানে? কিন্তু গৌরদাস তাঁর বিয়ের খবর পাওয়ার পরে তাঁর বাবামাও সে খবর তাঁর কাছ থেকে নিশ্চয় জেনেছিলেন।

সে যাই হোক, কবি যেমনটা আশা করেছিলেন, *Captive Ladie* তেমন সময়ে অর্থাৎ মার্চের গোড়ার দিকে বের হয়নি। তাঁর চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯ মার্চও বই ছাপাখানা থেকে মুক্তি পায়নি।[৩৯] বোধ হয় এপ্রিলের প্রথম দিকে এ বই সূর্যের আলো দেখেছিলো। ইতিমধ্যে বিশপস কলেজের ছাত্রটি কলকাতায় ফিরে গেছেন। সে জন্যে খরচ করে বই পাঠাতে হয়েছে *লেডি সেইল* জাহাজে করে — এক বছর চার মাস আগে যে-জাহাজে করে কাব্যের রচয়িতা নিজে কলকাতা থেকে মাদ্রাসে এসেছিলেন। এই জাহাজ মাদ্রাস ছেড়ে কলকাতা যাত্রা করে ২২ এপ্রিল। এক-এক জনের কাছে আলাদা করে বই পাঠালে খরচ বেশি পড়বে, তাই সব বই-ই পাঠান বিশপস কলেজে রবার্ট ওয়াকারের কাছে।[৪০]


CAPTIVE LADIE,

(AN INDIAN TALE)

IN TWO CANTOS

BY

M. M. S. DUTT.

MADRAS:

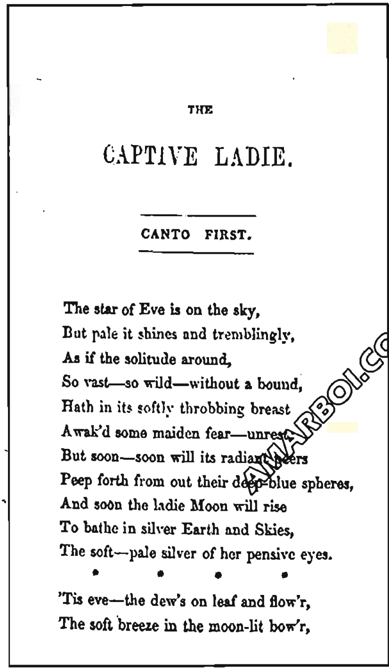
PRINTED AT THE ATHENÆUM PRESS,

1849.

ক্যাপটিভ লেডির নামপত্র, নিচে মাইকেলের হাতের লেখায় "অব বিশপস কলেজ, ক্যালকাটা"

কবির বন্ধুরা গ্রাহক সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে সত্যি সত্যি দ্রুত সাহায্য দিয়েছিলেন। গৌরদাস ফেব্রুআরি মাসের শেষ দিকে চিঠি পেয়ে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে ১৮জন গ্রাহক জোটান। আর বিশপস কলেজের বন্ধুরা জোটান ২৫জন।[৪১] ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কুবিহারী দত্ত এবং স্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ সময়ে তাঁর কাছে চিঠি লেখেন। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, তাঁরাও দু-চারজনগ্রাহক জুটিয়ে দিয়েছিলেন। গৌরদাস লিখেছিলেন যে, গ্রাহক সংগ্রহের কাজে সহায়তা হতো মধু যদি এ কাব্য সম্পর্কে একটা ছাপানো প্রোসপেক্টাস পাঠাতেন।[৪২] কিন্তু প্রোসপেক্টাস ছাড়াই তিনি ৫০ কপি বই নিয়েছিলেন। অবশ্য সব কপি বিক্রির জন্যে নয়। কবির নির্দেশে কয়েক কপি পাঠাতে হয়েছিলো পত্রিকায় সমালোচনার জন্যে এবং কয়েক কপি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহার দেবার জন্যে। উপহারপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষা পরিষদের সভাপতি জে ই ডি বেথুন, দিগম্বর মিত্র আর রামচন্দ্র মিত্র। পুরোনো শিক্ষক রামতনু লাহিড়ীকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার

চোখে দেখতেন। হিন্দু কলেজের বদলে তিনি তখন কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা করছিলেন। তাঁকেও কৃষ্ণনগরের ঠিকানায় তিনি এক কপি বই পাঠাতে অনুরোধ জানান। তবে কপি ফুরিয়ে যাবার দরুন প্রথম কিস্তির মধ্য থেকে তাঁকে বই দেওয়া সম্ভব হয়নি। বেথুনকে কী লিখে বই পাঠাতে হবে, তার বয়ানের সঙ্গে লিখেছেন: রামতনুর আপাতত অপেক্ষা করতে হবে।[৪৩] কলকাতায় আর-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি কেন বই পাঠাতে বলেননি, বোঝা যায় না – তাঁর প্রিয় শিক্ষক ডিএলআর। তিনি এর মাস ছয়েক আগে – ১৮৪৮ সালের অক্টোবর মাসে হুগলি কলেজ থেকে জেমস ক্যারের জায়গায় এক বছরের জন্যে প্রিন্সিপাল হয়ে হিন্দু কলেজে আসেন। অবশ্য হিন্দু কলেজের মি মন্টেগুর মাধ্যমে[৪৪] রিচার্ডসনকে পাঠানো সম্ভব। রিচার্ডসন আখ্যানমূলক কবিতার ভক্ত ছিলেন না। তিনি কোনো অনুকূল মন্তব্য করে থাকলে কবির চরিত্র যেটুকু আমরা বুঝতে পারি, তাতে মনে হয় – তিনি সেটা ফলাও করে বলতেন।


THE

CAPTIVE LADIE.

CANTO FIRST.

The star of Eve is on the sky,
But pale it shines and tremblingly,
As if the solitude around,
So vast—so wild—without a bound,
Hath in its softly throbbing breast
Awak'd some maiden fear—unrest,
But soon—soon will its radiant peers
Peep forth from out their deep-blue spheres,
And soon the ladie Moon will rise
To bathe in silver Earth and Skies,
The soft—pale silver of her pensive eyes.

* * * *

'Tis eve—the dew's on leaf and flow'r,
The soft breeze in the moon-lit bow'r,

ক্যাপটিভ লেডির প্রথম পৃষ্ঠা

ওদিকে, *The Captive Ladie* প্রকাশিত হবার পরই সে বই-এর মুদ্রক তাঁর টাকার জন্যে ব্যস্ত হয়ে কবিকে তাড়া দিতে আরম্ভ করেন। কিছু টাকা তাঁকে দেওয়াও হয়, কিন্তু তাতে তাগাদা বন্ধ হয়নি। তিনি তাই গৌরদাসকে অন্তত দুবার (৫ জুন আর ৬ জুলাই) বই বিক্রির টাকা যদ্দুর সম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠানোর অনুরোধ জানান। দু বারই তিনি মুদ্রকের অসহিষ্ণুতার কথা মনে করিয়ে দেন। অবশ্য রসিক মধুর ঠাট্টার স্বর তখনো চাপা পড়েনি। লিখেছেন: 'শ্যাম(চরণ ল)কে বোলো (কলকাতার) ব্যাগ্‌শ অ্যান্ড কম্পেনির তরফ থেকে একটা হুন্ডি এই শহরের বেইনব্রিজ অ্যান্ড কম্পেনির নামে পাঠাতে, যাতে বলা থাকবে সুউচ্চ এবং শক্তিমান মাইকেল ডাট স্কোয়ার অ্যান্ড কম্পেনি অথবা তাঁর বাহককে নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঐ পরিমাণ টাকা দিয়ে দেওয়া হয়।'[৪৫] বেইনব্রিজ কম্পেনির ছিলো বিরাট ব্যবসা, ব্ল্যাক টাউনে – একেবারে সাগরের ধারে। তাদের অফিস ছিলো ১৬ নম্বর বীচ ফার্স্ট লেইনে – কবির রায়পুরমের বাড়ির কাছে। টাকা পাঠানোর তাগিদ দিয়ে বিশপস কলেজ এবং হিন্দু কলেজেও কবি এ সময়ে অনুরূপ চিঠি লিখেছিলেন – সেটা অনুমান করা শক্ত নয়।

এ কাব্য তিনি ছাপিয়েছিলেন *Madras Advertiser* প্রেসে। তখন এই প্রেস ছিলো ১৪২ নম্বর মাউন্ট রোডে এবং পত্রিকার মালিক ছিলেন অ্যাবেল পেন সিমকিন্স।[৪৬] *The Captive Ladie*

ছাপানোর টাকা দেবার জন্যে তিনি কবিকে বেশ চাপ দিলেও, পরে দেখা যাবে কবির সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠ এবং সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। (প্রসঙ্গত আরও একটা কথা বলে রাখি, স্বামী মারা যাবার পর অ্যাবেল সিমকিন্সের মা দ্বিতীয় বিয়ে করেন পেট্রিক ক্রপলিকে। এই ঘরের প্রথম সন্তানের নাম অ্যামেলিয়া সোফিয়া। এঁকেই আমি প্রথমে অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া বলে ধারণা করেছিলাম।[৪৭] গোড়াতে এই প্রেসের মালিকও ছিলেন অ্যামেলিয়ার পিতা। সেই থেকেই আমার এ ভুল হয়েছিলো।)

The Captive Ladie প্রকাশের সময়ে প্রেসের পাওনা, গ্রাহক জোটানো ইত্যাদি বৈষয়িক কথাবার্তা মাঝেমধ্যে বলতে হয়েছে বৈকি! কিন্তু ধনী হবার সাধ থাকলেও মাইকেল বিষয়ী ছিলেন না। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিলো কবিযশ লাভ। এ ব্যাপারে মাদ্রাস নিয়ে তাঁর কোনো দুর্ভাবনা ছিলো না – পত্রিকায় বের হবার সময়ে তিনি এ রচনা সম্পর্কে সুধীমহলের অনুকূল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন। তদুপরি তিনি যাঁর নামে এ কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন, সেই অ্যাডভোকেট-জেনেরেল জর্জ নর্টন যখন কবিকে বললেন: এমন অসাধারণ ক্ষমতা এবং প্রতিশ্রুতি যে-কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, তেমন একটি কাব্য তাঁর নামে উৎসর্গ হতে দেখে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন, তখন এ কাব্যের উঁচু মান সম্পর্কে তাঁর মনে আর কোনো সংশয় থাকলো না। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, মাদ্রাস তিনি অনায়াসে জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মতে, তিনি প্রথম যখন মাদ্রাসে এসেছিলেন তখন তাঁর পক্ষে সেখানে কলকে পাওয়া শক্ত ছিলো। কিন্তু এ কাব্য প্রকাশের পর, 'এখন আমার জুতো পরে দাঁড়াতে পারলে বর্তে যাবে এখানকার অনেক বদমাশ।'[৪৮] বারবার তিনি উল্লেখ করেছেন, *The Captive Ladie* মাদ্রাসে খুব অনুকূল সাড়া জাগিয়েছে। নিজের এবং এই কাব্য সম্পর্কে তাঁর এই মূল্যায়ন খানিকটা রঙিন ছিলো, কিন্তু একেবারে কবিকল্পনা ছিলো না। বস্তুত, তেমন বিক্রি না-হলেও এবং তাঁকে সামান্য ঋণজালে জড়িয়ে ফেললেও, এই কাব্য মাদ্রাসের সুধীমহলে তাঁর আসন মজবুত করেছিলো। *Athenæum* পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠিতে Lælius ছদ্মনামে এক ভদ্রলোক এই কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।[৪৯] তিনি বিশেষ করে এই কাব্যের সূচনা অংশের খুব প্রশংসা করেন। এ চিঠির শুরুতে নতুন প্রকাশিত এই কাব্যের দিকে পত্রিকা সম্পাদকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে:

> Addressing you as a friend to Literature, and yourself a cultivator and reaper of its fruits, I am desirous of bespeaking your attention to a work of no ordinary Poetic talent just published at Madras, by Mr M. S. Dutt, entitled the 'Captive Ladie,'

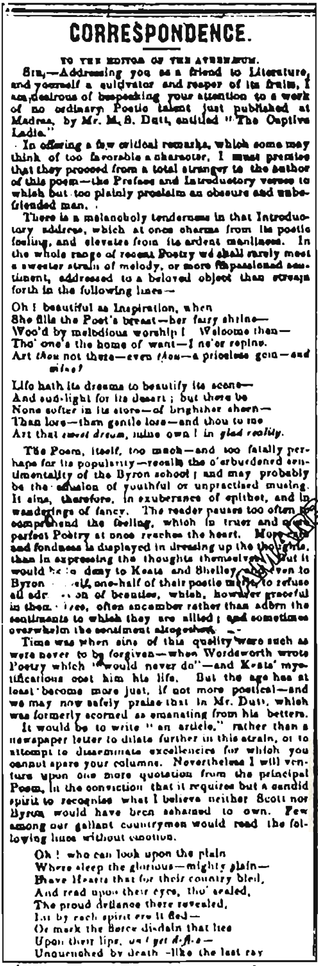
এর পর পত্রলেখক তাঁর চিঠিতে হলপ করে বলেছেন যে, একটু বেশি প্রশংসা করলেও কবির সঙ্গে তাঁর আদৌ কোনো পরিচয় নেই।

> In offering a few critical remarks, which some may think of too favourable a character, I must premise that they proceed from a total stranger to the author of this poem - the Preface and Introductory verses to which but too plainly proclaim an obscure and unbefriended man.

গোড়াতে তিনি উল্লেখ করেছেন কাব্যের সূচনা সম্পর্কে – যেখানে কবি তাঁর রচনাকে নিবেদন করেছেন তাঁর প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে:

> There is a melancholy tenderness in that Introductory address, which at once charms from its poetic feeling, and elevates from its ardent manliness. In the whole range of recent Poetry we shall rarely meet a sweeter strain of melody or more impassioned sentiment, addressed to beloved object than stream forth in the following lines -

পত্রলেখক কবির ত্রুটিও দেখিয়েছেন। কবি যে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, বক্তব্যের তুলনায়



CORRESPONDENCE.

TO THE EDITOR OF THE ATHENÆUM.

Sir,—Addressing you as a friend to Literature, and yourself a cultivator and reaper of its fruits, I am desirous of bespeaking your attention to a work of no ordinary Poetic talent just published at Madras, by Mr. M. S. Dutt, entitled "The Captive Ladie."

In offering a few critical remarks, which some may think of too favorable a character, I must premise that they proceed from a total stranger to the author of this poem—the Preface and Introductory verses to which but too plainly proclaim an obscure and unbefriended man.

There is a melancholy tenderness in that Introductory address, which at once charms from its poetic feeling, and elevates from its ardent manliness. In the whole range of recent Poetry we shall rarely meet a sweeter strain of melody, or more impassioned sentiment, addressed to a beloved object than streams forth in the following lines—

Oh! beautiful as Inspiration, when
She fills the Poet's breast—her *fairy* shrine—
Woo'd by melodious worship! Welcome then—
Tho' one's the home of want—I ne'er repine.
Art *thou* not there—even *thou*—a priceless gem—and *mine?*

Life hath its dreams to beautify its scene—
And sun-light for its desert; but there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than love—than gentle love—and thou to me
Art that *sweet dream*, mine own! in *glad reality*.

The Poem, itself, too much—and too fatally perhaps for its popularity—recalls the o'erburdened sentimentality of the Byron school; and may probably be the effusion of youthful or unpractised musing. It sins, therefore, in exuberance of epithet, and in wanderings of fancy. The reader pauses too often to comprehend the feeling, which in truer and more perfect Poetry at once reaches the heart. More care and fondness is displayed in dressing up the thoughts than in expressing the thoughts themselves. But it would be to deny to Keats and Shelley, and even to Byron himself, one-half of their poetic merit, to refuse all admiration of beauties, which, however graceful in themselves, often encumber rather than adorn the sentiments to which they are allied; and sometimes overwhelm the sentiment altogether.

Time was when sins of this quality were such as were never to be forgiven—when Wordsworth wrote Poetry which "would never do"—and Keats' mystifications cost him his life. But the age has at least become more just, if not more poetical—and we may now safely praise that in Mr. Dutt, which was formerly scorned as emanating from his betters.

It would be to write "an article," rather than a newspaper letter to dilate further in this strain, or to attempt to disseminate excellencies for which you cannot spare your columns. Nevertheless I will venture upon one more quotation from the principal Poem, in the conviction that it requires but a candid spirit to recognise what I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own. Few among our gallant countrymen would read the following lines without emotion.

Oh! who can look upon the plain
Where sleep the glorious—mighty slain—
Brave Hearts that for their country bled,
And read upon their eyes, tho' sealed,
The proud defiance there revealed,
Lit by each spirit ere it fled—
Or mark the fierce disdain that lies
Upon their lips, and yet defies—
Unquenched by death—like the last ray

অ্যাথেনিয়ামের পৃষ্ঠায় ক্যাপটিভ লেডির সমালোচনা

তিনি যে ভঙ্গিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, পত্রলেখক তার প্রশংসা করেননি। তবে এটাকে দোষ ধরলে বায়রন, কীটস এবং শেলিও যে বাদ যাবেন না, তাও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন:

The Poem, itself too much - and too fatally perhaps for its popularity - recalls the o'er burdened sentimentality of the Byron school; and may probably be the effusion of youthful or unpractised musing. It sins, therefore, in exuberance of epithet, and in wanderings of fancy. The reader pauses too often to comprehend the feeling, which in truer and more perfect poetry at once reaches the heart. More care and fondness is displayed in dressing up the thoughts than in expressing the thought themselves. But it would be to deny to Keats and Shelley, and even to Byron himself, one-half of their poetic merit, to refuse all admiration of beauties, which, however graceful in themselves, often encumber rather than adorn the sentiments to which they are allied; and sometimes overwhelm the sentiments altogether.

এরপর পত্রলেখক মনে করিয়ে দেন যে, এক সময়ে এ ধরনের 'অপরাধ' কাব্যকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলতো। কিন্তু এখন সে কাল বিগত এবং কাব্যের গুণাগুণ নির্ধারণের মানদণ্ড এখন অনেক সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর পর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রলেখক বলেন, তাঁর বিশ্বাস এমন রচনা 'বায়রন অথবা স্কট তাঁদের নিজের বলে মেনে নিতে লজ্জিত হতেন না। আমাদের মহৎ দেশবাসীদের মধ্যে খুব কমই আছেন যাঁরা নিচের পঙ্‌ক্তিগুলো বিনা আবেগে পড়তে পারবেন:

Oh! who can look upon the plain,
Where sleep the glorious - mighty slain, -
Brave Hearts that for their country bled,
And read upon their eyes, tho' seal'd,
The proud defiance there revealed,
Lit by each spirit ere it fled -
Or, mark the fierce disdain that lies,
Upon their lips and yet defies,-
Unquench'd by Death, like the last ray,
Of the set sun, still lingering there,
As if too loth to pass away,
But scorch and blast with lightning glare,-

Nor feel his blood within his vein,
Rage like the tempest-stirred main.
As if to burst - to gush - to flow -
And sweep away Fair Freedom's foe,
Nor madly long to wield the brand,
To save - defend - his Native Land.,,

লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই অংশে দেশাত্মবোধ কেবল স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়নি; সেই সঙ্গে এর মধ্যে এমন একটা আবেগ এবং তেজ প্রকাশ পেয়েছে, যা পাঠককে মুগ্ধ না-করে পারে না। পত্রলেখক কাব্যের সূচনা অংশেরও প্রশংসা করেছিলেন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন প্রেমের জোয়ার এবং আন্তরিকতা।

পত্রলেখক কবির যে-সমালোচনা করেছেন, তাকে মেকি বলে মনে হয় না। সমালোচকের মতে, কবির অনুভূতি সোজাসুজি পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করে না, বরং তা অনুধাবন করার জন্যে পাঠককে বারবার থামতে হয়। এটা তাঁর কবিতার একটা সত্যিকার বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া, ভাবনাগুলো প্রকাশের দিকে কবি যতোটা যত্ন এবং অনুরাগ দেখান, তার চেয়ে ভাবনাগুলোকে অলঙ্কৃত করার দিকে তাঁর যত্ন এবং অনুরাগ বেশি। এই দুটি সমালোচনাই ন্যায্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ধারণা করি, এ চিঠি কবির কোনো বন্ধু অথবা তাঁর নিজেরই লেখা। রিচার্ড নেইলরের হওয়া সম্ভব। নয়তো বই প্রকাশের দু সপ্তাহের মধ্যে একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে এ বই কিনে তা পড়ে সে সম্পর্কে একটি অনুকূল সমালোচনামূলক চিঠি লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারার কথা নয়। আর এ চিঠি খাঁটি হলে: যে-বায়রনের কথা মধু তাঁর কৈশোর থেকে অমন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তাঁর কবিতার সঙ্গে *The Captive Ladie*-র তুলনা দেখে তাঁর মনে ইংল্যান্ডে না-গিয়েই চূড়ান্ত কবিযশ পাবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

মাদ্রাসের অনুকূল সমালোচনা উপভোগ করলেও, কাব্য হিশেবে এর সত্যিকারের মূল্য কতোটা তা বোঝার জন্যে তিনি কলকাতার সমালোচকদের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকলেন। গৌরদাসকে কলকাতার প্রতিক্রিয়া, বিশেষ করে, বন্ধুরা কী বলেন এবং কোনো গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হয় কিনা, জানাতে একাধিক বার অনুরোধ করেছেন।[৫০] কাব্য ছাপা হবার সময়ে এবং তা প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরে তিনি এ কাব্য সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেছেন। যে-কাব্য মাদ্রাসে অমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কুড়িয়েছে, কলকাতায় তার সমাদর হবে না, এটা কি হতে পারে! এবং, ভাবলেন, একবার কলকাতার নিক্তিতে টিকে গেলে, তখন লন্ডনের বাজার যাচাই করে দেখবেন। এ কথা ভেবেও তিনি উত্তেজিত এবং উদ্দীপ্ত বোধ করে থাকবেন।

যখন *The Captive Ladie* ছাপার কাজ চলছিলো, সেই সময়ে — মার্চ মাসে — সৃষ্টির আনন্দে উচ্চকিত কবি তড়িঘড়ি করে লিখতে আরম্ভ করলেন আর একটি কাব্য — যার নাম জানা যায়নি। মাসখানেকের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় সর্গের মাঝামাঝি পৌঁছে যান। 'রক্তের স্বাদ পেলে' তিনি কিভাবে সাগরদাঁড়ির নয়, একেবারে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো ছুটতে পারেন, দশ বছর পরে আরও একবার তিনি তা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ যথাসময়ে আলোচনা করবো। উচ্ছ্বসিত কবি এপ্রিল মাসে গৌরদাসকে আর মে মাসে ভূদেবকে লেখেন, *The Captive Ladie*-র তুলনায় এ কাব্য অনেক ভালো হবে — বস্তুত, তুলনাই হয় না। সুতরাং পরিকল্পনা করলেন, আর মাদ্রাসে নয়, কয়েক মাসের মধ্যে এ কাব্য ছাপাতে হবে খোদ লন্ডনে।[৫১] লন্ডনের স্বীকৃতিই তো সত্যিকারের স্বীকৃতি! সেই সঙ্গে ভাবলেন, নতুন কাব্যটি যদি লন্ডনেই ছাপালেন, তা হলে *The Captive Ladie*-ও সেই সঙ্গে জুড়ে দিলে হয়! *The Captive Ladie*-র মধ্যে হিন্দুদের পুরাণ আর রীতিনীতির অনেক

কথা আছে, সেসব কথা ভালো করে বোঝার জন্যে টীকাগুলো যদি একজন হিন্দু-শাস্ত্রবিশারদকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া যায় আর সেই সঙ্গে সংস্কৃত উদ্ধৃতি এবং সূত্রসহ একটা বড়ো প্রবন্ধ – তা হলে ইংরেজ পাঠকদের পক্ষে এ কাব্যের প্রশংসা করা সহজ হবে। ভূদেবকে অনুরোধ করলেন, লিখে দেবার জন্যে। সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রকাশ্যে তার স্বীকৃতি থাকবে।[৫২]

The Captive Ladie সম্পর্কে গ্রন্থসমালোচনা দূরের কথা, প্রকাশের কয়েক সপ্তাহ পরেও বন্ধুদের কোনো মতামত জানতে পারলেন না কবি। উচ্ছ্বসিত হয়ে মতামত জানিয়েছিলেন এক মাত্র চিরদিনের বন্ধু গৌরদাস। তিনি লিখেছিলেন: 'এ কথা বলতে পেরে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে যে, তোমার এ কাব্য পড়ে আমি যখন উঠলাম, তখন তোমার প্রতিভা সম্পর্কে আমার ধারণা আরও উন্নত হলো। ব্রিটিশ-ভারতীয় সাহিত্যের দরবারে তুমি যে খুব লক্ষণীয় একটি ভূমিকা পালন করবেই এ সম্পর্কে আমার ধারণা আরও জোরদার হলো।'[৫৩] গৌরদাস সত্যিকারের সাহিত্যরসিক ছিলেন না। তাই তাঁর প্রশংসা পেয়ে কবি কতোটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, বলা যায় না। অন্য বন্ধুদের মতামত জানানোর জন্যেও অনুরোধ জানালেন। বইটা কলকাতার সুধীমহলের যাতে চোখে পড়ে, তার জন্যে *Hindu Intelligencer*-এ দু-তিনটে বিজ্ঞাপন দেবার কথাও ভেবেছিলেন।[৫৪] মোট কথা, কলকাতায় এ কাব্যের অনুকূল সমালোচনা হচ্ছে কিনা, তা জানার জন্যে *The Captive Ladie* প্রকাশিত হবার পরবর্তী দু মাস তিনি উদগ্রীব হয়ে থাকলেন। মনকে আশ্বাস দিতে থাকলেন, সুখ্যাতি না-পাবার তো কোনো কারণ নেই! কিন্তু তারপরই *Bengal Hurkaru*র একটি শেল অকস্মাৎ গিয়ে তাঁর একেবারে মর্মে বিঁধে গেলো।

এ পত্রিকায় *The Captive Ladie*-র সমালোচনা প্রকাশিত হয় ১৯ মে (১৮৪৯) তারিখে। ৫ জুনের চিঠিতে গৌরদাসকে তিনি যা লিখেছিলেন, তা থেকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি খুব ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। *Bengal Hurkaru* যে-সমালোচনা করেছিলো, তাকে সত্যিকার সাহিত্য সমালোচনা না-বলে ব্যক্তিগত আক্রমণ বলাই ভালো। গোড়া থেকে এ সমালোচনাকে নিতান্ত বিদ্বিষ্ট বলে চিনে নিতে ভুল হয় না। তা না-হলে কবির নাম নিয়ে অথবা দত্তদের নিয়ে বিদ্রূপ করার দরকার ছিলো না। হীদেনডমের প্রতিও সমালোচকের বর্ণবাদী মনোভাব চাপা থাকেনি:

> There is nothing poetical in the curt and dumpy name of Dutt. No more would there be in the equally brief and insignificant patronymic of Scott were it divested of its associations. But the Scotts and above all the *Scott*, have given to their name a classical euphony that makes it musical all over the world. Perhaps the Dutts may do as much for their own little pudgy appellation. Unpoetical as it sounds *now*, it designates a family whom the gods seem to have made poetical, or, at all events, endowed with the wish to be or the belief that they are so. In Calcutta we have at least three of the name who write English verse of faultless rhyme and musical rhythm, as our columns often show and as even the most inveterate contemner of Young Bengal must allow. And now we find they have another, if not more, at Madras - yes! at benighted Madras of all places in heathendom!

কবি ভূমিকায় লিখেছিলেন যে, তিনি এ কাব্য রচনা করেছিলেন দারুণ তাড়াহুড়ো এবং, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, অভাব আর জীবনের নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে – সেটাকেও সমালোচক কশাঘাত করতে ছাড়েননি।

> Possibly had our poet looked the ugly realities of life manfully in the face instead of trying to abstract his thoughts from them, he might not have been dependent on Want, Poverty, and Co. for his inspiration.

তারপর সমালোচক কবিকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, যখন কাজ (লেখাপড়া) করার সময় ছিলো, তখন তিনি যদি ঠিকমতো কাজ করতেন, তা হলে তাঁর অভাবে থাকতে হতো না:

> We are not of those that think a poet must necessarily be poor and miserable; but we believe that a youth
>
> Who pens a stanza when he should engross
>
> has only himself to blame if his pen neither brings him fame nor food.

সমালোচক খোদ কাব্যের দোষত্রুটি দেখাতে গিয়ে বেশি কিছু বলেননি। তাঁর প্রথম বক্তব্য: এ কাব্য হলো রীতিমতো অপেশাদারী। আর তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য এ কাব্য লেখা হয়েছে স্কট-মূর-বায়রনের ভঙ্গিতে। সমালোচক যে-দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমাদের বিবেচনায় মন্দ নয়।' তৃতীয় বক্তব্য: *Visions of the Past* মূল কাব্যের মতো অতোটা ভালো হয়নি। এখানে ঈভ আর অ্যাডম হলেন বায়রনের রচনায় মেরী চ্যাওয়ার্থ আর বায়রন নিজে যেমন।

> The style - which is Scott-Moore-Byronical - and quality of the poem may be judged from the following passage with which it commences and which we think is not bad:
>
> The star of Eve is on the sky,
> But pale it shines and tremblingly,
> As if the solitude around
> So vast - so wild - without a bound,
> Hath in its softly throbbing breast
> Awaken'd some maiden fear - unrest;
> But soon - soon will its radiant peers
> Peep forth from out their deep-blue spheres
> And soon the ladie Moon will rise
> To bathe in silver Earth and Skies
> The soft - pale silver of her pensive eyes.

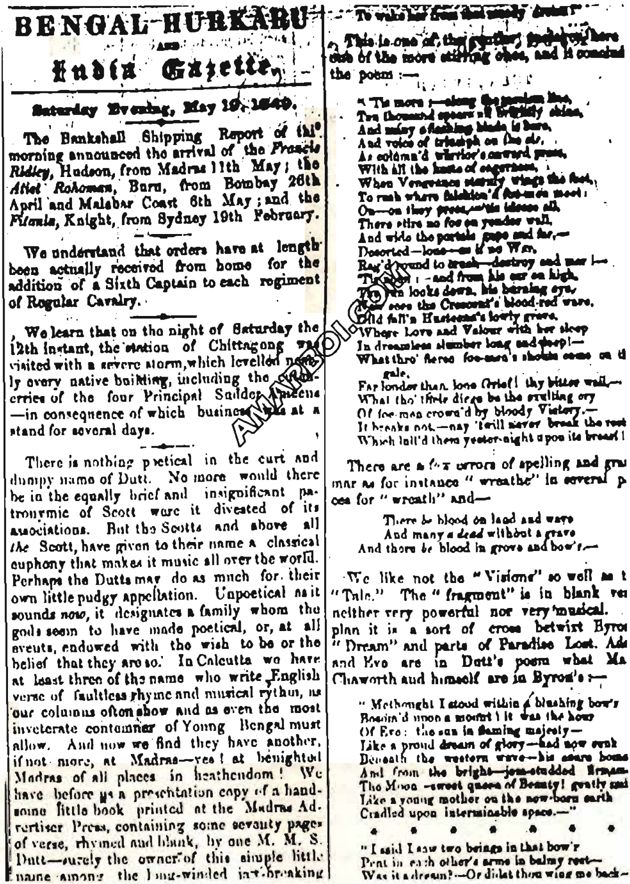
এর পর সমালোচক এই জায়গা থেকে আরও ২৬ পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আসলে যতো বিদ্বেষই মনের ভেতরে থাকুক না কেন, উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে সমালোচক থামতে পারেননি। সমালোচক আসলে এখানে নিজের সৌন্দর্যবোধের কাছে নিজেই পরাজিত হয়েছেন। এবং যেকোনো মাপকাঠিতে বিচার করা হোক না কেন, উদ্ধৃত অংশে যে খাঁটি কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, তা তিনি কী করে অস্বীকার করবেন? কবি এখানে সন্ধ্যার আকাশের যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি নিঃসন্দেহে খুব উচ্চ এবং সূক্ষ্ম কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। সেই কল্পনার সঙ্গে মিশেছে নরম আবেগের স্পর্শ।

> সন্ধ্যা তারা ডুবে যায়নি, কিন্তু সে কাঁপতে কাঁপতে দিচ্ছে ম্লান আলো, যেন তার চারদিকের বিশাল, বন্য এবং সীমাহীন নির্জনতা তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে এক অভূতপূর্ব ভীতি এবং চঞ্চলতা; কিন্তু অচিরেই তার উজ্জ্বল আলো নীলাকাশ থেকে মিলিয়ে যাবে; অচিরেই চাঁদকন্যা দেখা দেবে; রূপালি আলোতে সে ধুইয়ে দেবে ধরণী আর আকাশকে, তার নিস্প্রভ আর বিষণ্ণ রূপোলি আলো দিয়ে।

কাব্যের শেষ ২৫ পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করার সময়ে সমালোচক উপরে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলোর তুলনায় তাকে আরও জোরে নাড়া দেবার মতো বলে আখ্যায়িত করেছেন। *Visions of the Past*-কে তিনি তেমন ভালো বলতে পারেননি। তা সত্ত্বেও, সেখান থেকে তিনি ১৯ পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নিজের সংকীর্ণতার যদ্দুর সম্ভব পরিচয় দিয়ে তিনি স্পর্শকাতর এবং যশ-প্রার্থী কবিকে নানাভাবে জর্জরিত করেছেন। তাঁর বানান এবং ব্যাকরণের ভুলও দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে মর্মাঘাতী মন্তব্য করে বলেছেন, তিনি যদি কবি হিশেবে খ্যাতি লাভের স্বপ্ন দেখে থাকেন, তা হলে সেটা তিনি ভুলে

যেতে পারেন:

These verses of M.M.S. Dutt are very fair ameteur poetry; but if the power of making has deluded the author into a reliance on the exercise of his poetical abilities for fortune and reputation, or tempted him to turn up his nose at the more common-place uses of the pen, the delusion is greatly to be regretted. We believe that none of our Calcutta Dutts has fallen into this ruinous error, but that steadily following their more



BENGAL HURKARU
AND
India Gazette.

Saturday Evening, May 19, 1849.

The Bankshall Shipping Report of this morning announced the arrival of the *Francis Ridley*, Hudson, from Madras 11th May; the *Allet Rohoman*, Burn, from Bombay 26th April and Malabar Coast 6th May; and the *Flamla*, Knight, from Sydney 19th February.

We understand that orders have at length been actually received from home for the addition of a Sixth Captain to each regiment of Regular Cavalry.

We learn that on the night of Saturday the 12th instant, the station of Chittagong was visited with a severe storm, which levelled nearly every native building, including the cutcherries of the four Principal Sudder Ameens —in consequence of which business was at a stand for several days.

There is nothing poetical in the curt and dumpy name of Dutt. No more would there be in the equally brief and insignificant patronymic of Scott were it divested of its associations. But the Scotts and above all *the* Scott, have given to their name a classical euphony that makes it music all over the world. Perhaps the Dutts may do as much for their own little pudgy appellation. Unpoetical as it sounds *now*, it designates a family whom the gods seem to have made poetical, or, at all events, endowed with the wish to be or the belief that they are so. In Calcutta we have at least three of the name who write English verse of faultless rhyme and musical rythm, as our columns often show and as even the most inveterate contemner of Young Bengal must allow. And now we find they have another, if not more, at Madras—yes! at benighted Madras of all places in heathendom! We have before us a presentation copy of a handsome little book printed at the Madras Advertiser Press, containing some seventy pages of verse, rhymed and blank, by one M. M. S. Dutt—surely the owner of this simple little name among the long-winded ink-breaking

To wake her from that [illegible] dream?

This is one of the [illegible] here [illegible] of the more stirring ones, and [illegible] the poem :—

" The [illegible] along the [illegible] line,
Ten thousand spears all brightly shine,
And many a flashing blade is bare,
And voice of triumph on the air,
As column'd warrior's onward press,
With all the haste of eagerness,
When Vengeance sternly wings the feet,
To rush where falchion'd foe-men meet;
On—on they press,—the [illegible] all,
There stirs no foe on yonder wall,
And wide the portals gape and far,—
Deserted—lone—as if no War,
Rag'd round to crush—destroy and mar!—
The [illegible]—and from his car on high,
The sun looks down, his burning eye,
Now sees the Crescent's blood-red wave,
Old fall'n Husteena's lowly grave,
Where Love and Valour with her sleep
In dreamless slumber long and deep!—
What thro' fierce foe-men's shouts come on the gale,
Far louder than lone Grief! thy bitter wail,—
What tho' [illegible] dirge be the swelling cry
Of foe-men crown'd by bloody Victory.—
It breaks not,—nay 'twill never break the rest
Which lull'd them yester-night upon its breast!

There are a few errors of spelling and grammar as for instance "wreathe" in several places for "wreath" and—

There be blood on land and wave
And many a *dead* without a grave
And there *be* blood in grove and bow'r.—

We like not the "Visions" so well as the "Tale." The "fragment" is in blank verse neither very powerful nor very musical. In plan it is a sort of cross betwixt Byron's "Dream" and parts of Paradise Lost. Adam and Eve are in Dutt's poem what Mary Chaworth and himself are in Byron's :—

" Methought I stood within a blushing bow'r
Bosom'd upon a mount! it was the hour
Of Eve: the sun in flaming majesty—
Like a proud dream of glory—had now sunk
Beneath the western wave—his azure home
And from the bright—gem-studded firmament
The Moon—sweet queen of Beauty! gently and
Like a young mother on the new-born earth
Cradled upon interminable space.—"

* * * * * * *

" I said I saw two beings in that bow'r
Prest in each other's arms in balmy rest—
Was it a dream?—Or didst thou wing me back—

বেঙ্গল হরকরার পৃষ্ঠায় ক্যাপটিভের সমালোচনা

> homely and more profitable vocations, they prudently reserve their poetical powers to amuse their moments of leisure - it will be well if the recreations of Young Bengal were always so innocent.

সবশেষে অভদ্রতার সঙ্গে সমালোচক তাঁর সমীক্ষা শেষ করেছেন:

> With this we take our leave of M. M. S. Dutt and his poetry.

কবির নিতান্ত শত্রু ছাড়া, যেকোনো পাঠক এ রকম সমালোচনা পড়ে সমালোচকের রূঢ়তা এবং অন্যায় সমালোচনায় বিরক্ত না-হয়ে পারবেন না। আর যে-উচ্ছ্বসিত যুবক ধার করে কাব্য ছাপিয়েছেন কবি বলে খ্যাতি লাভ করার আশায়, তিনি এ সমালোচনা দেখে কী ভাববেন তা বলাই বাহুল্য। এই 'সমলোচনা' প্রকাশিত হবার ৩১ বছর আগে আর-এক তরুণ কবির তিনটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো *Blackwood's Edinburgh Magazine, Quarterly Review* আর *British Critic* পত্রিকায়। মাইকেলকে *Hurkaru*র সমালোচক আক্রমণ করেছিলেন তাঁর বায়রন-প্রীতির জন্যে, আর *Blackwood's* এই তরুণ কবিকে আক্রমণ করেছিলো তাঁর হান্ট-প্রীতির জন্যে। এই সমালোচনায় নবীন কবিকে আগাগোড়া এক অশিক্ষিত ডাক্তারের শিক্ষানবিশ বলে ব্যঙ্গ করা হয়। আর প্রবন্ধের শেষে এই কবি — জন কীটসকে এই বলে উপদেশ দেওয়া হয় যে, একজন অনাহারী কবি হবার চেয়ে একজন অনাহারী ডাক্তার হওয়া অনেক ভালো এবং বুদ্ধির কাজ। 'সুতরাং, মিস্টার জন, দোকানে ফেরত যান।' *Hurkaru*র সমালোচক *Blackwood's* এর এই সমালোচনা পড়েছিলেন কিনা, জানা যায় না। তবে প্রবন্ধের শেষ দুই সমালোচকই একই উপদেশ দিয়েছেন।

এই সমালোচনার জবাবে কীটস তাঁর ভাই জর্জকে লিখেছিলেন যে, তিনি মৃত্যুর পর ইংরেজ কবিদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। মাইকেলও প্রকাশ্যে এই সমালোচনাকে চূড়ান্ত আঘাত বলে মেনে নিলেন না। গৌরদাসকে লিখলেন: 'যাঁদের প্রশংসাকে সন্দেহ করা যায় না, তাঁদের কাছ থেকে এ যাবৎ এ কাব্যের যতো প্রশংসা শুনেছি, তাতে এটুকু সমালোচনা আমার সহ্য হবে।'[৫৫] তিনি তখনকার মতো মনকে প্রবোধ দিলেন, এই বলে যে, এটা *Hurkaru*-র সমালোচকের সংকীর্ণতা। তা ছাড়া, *Hurkaru*-ই তো শেষ কথা নয়। সমালোচনার জন্যে কাব্যটি অন্য পত্রিকায়ও পাঠানো হয়েছে। দেখা যাক, তারা কী বলে! বন্ধুরা কী বলেন, তাও শোনার জন্যে উৎকণ্ঠ হয়ে থাকলেন। *Hurkaru*-র সমালোচনায় প্রভাবিত হবেন — বন্ধুদের সম্পর্কে তিনি এমন কথা ভাবতে পারলেন না। বস্তুত, তাঁর কোনো কোনো বন্ধু যে এই সমালোচনা পড়ে অথবা এর কথা শুনে দুঃখিত হয়েছিলেন, তার একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন যোগীন্দ্রনাথ বসু। অজ্ঞাতনামা এক বন্ধু তাঁর চিঠিতে এই সমালোচনা সম্পর্কে লিখেছিলেন: 'আমার কোনো পত্রিকা পড়ারই অভ্যেস নেই। সে জন্যে, এই পত্রিকা পড়ে কলকাতার এই হৃদয়হীন বদমাশ সম্পাদকদের হাতে এক বন্ধুর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি।'[৫৬]

Hurkaru--য় সমালোচনা প্রকাশিত হবার ৯ দিন পরে *Hindu Intelligencer* পত্রিকায়ও একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এ সমালোচনাটি কবির বিশেষ প্রশংসা না-করলেও, একেবারে সহানুভূতি-বর্জিত ছিলো না। এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। আগেই বলেছি, খিদিরপুরে মধু যে-বাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন, সেই বাড়িতে এক কালে বাস করতেন। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর একটি কবিতা ডিএলআর তাঁর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বাঙালি কবি হয়েও তিনি একজন বাঙালি কবির বিশেষ প্রশংসা করতে পারেননি।

> আমরা মাদ্রাসে-ছাপা ৮০ পৃষ্ঠার মতো একটি পুস্তিকা পেয়েছি। এতে দুটি কবিতা আছে। এর একটির নাম *Captive Ladie*, অন্যটির নাম *Visions of the Past*। রচয়িতা এম এম এস ডাট। আমরা ধারণা করি ইনি এই দেশের লোক। এবং সে কারণে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টার জন্যে সব রকমের উৎসাহ

লাভ করতে পারেন।

কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনিযে-মন্তব্য করেন, তাকে প্রশংসা না-বলে, পৃষ্ঠপোষণা বলা যায়।

> দেখা যাচ্ছে, যে-গুণাবলী থাকলে সত্যিকার কবি বলা যায় আমাদের গ্রন্থকর্তা তা বর্জিত নন। প্রকৃতি তাঁকে যে-মানসিক শক্তি দিয়েছে, তিনি যদি তা কাজে লাগাতে থাকেন, তা হলে কাব্যজগতে আরও উঁচু আসন লাভ করতে পারবেন - এ সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই এবং তিনি যাতে তা পারেন – তার জন্যে আমাদের শুভেচ্ছা থাকলো।[৫৭]

এ সমালোচনা পড়ে কবি উচ্ছ্বসিত হতে পারেননি – বলা বাহুল্য। বছরের শেষ দিকে *Calcutta Review* পত্রিকায় *The Poetry of the Dutts* নামে একটি রচনায় *The Captive Ladie*-র আলোচনা হয়েছিলো (Vol. 12, No. 24)। তাতে মাইকেলের কবিতাকে গোবিন্দ দত্তের কবিতার চেয়ে নিম্নমানের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ মন্তব্য কবি দেখেছিলেন কিনা, জানা নেই। দেখে থাকলেও, গোবিন্দ দত্তের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করায় উল্লসিত হননি। তা ছাড়া, গ্রন্থ প্রকাশের অনেক দিন পরে প্রকাশিত হওয়ায় এক সময়ে সমালোচকদের মতামত জানার যে-গভীর আগ্রহ ছিলো, তা-ও ততোদিনে হারিয়ে ফেলার কথা। কিন্তু কলকাতার অন্যান্য নাম-করা পত্রিকা কোনো সমালোচনাই করলো না, সেটা তাঁর কাছে আরও দুঃখের বলে মনে হয়েছিলো। এরপরে কবি আর নিজের উৎসাহ ষোলো আনা বজায় রাখতে পারলেন না। কলকাতা পর্বেও দেখা যাবে, তিনি উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্য সাধনা করেছেন; অধ্যবসায়কে তিনি ডরাননি। কিন্তু নিজেই বলেছেন, অধ্যবসায় বহাল রাখার জন্যে চাই স্বীকৃতি আর প্রশংসার কিঞ্চিৎ বারিসেচন।[৫৮]

আমার ধারণা, সেই বারিসেচনের অভাবে তাঁর অজ্ঞাতনামা নতুন কাব্যটি সাহিত্যক্ষেত্রে পল্লবিত হতে পারলো না। তা ছাড়া, ছাপাখানার ভূত নয়, স্বয়ং মুদ্রকের পেয়াদাও তাঁকে ধাওয়া করেছিলো। তাই নিরুৎসাহের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় কাব্য – যাকে তিনি প্রথম কাব্যের তুলনায় অনেকটা উঁচুদরের বলে অভিহিত করেছিলেন – সেটি আর প্রকাশিত হলো না, লন্ডনে কেন, মাদ্রাসেও নয়।

অনামা যে-কাব্যটি কবি লিখছিলেন, সেটি প্রকাশিত না-হলেও তিনি যে *The Captive Ladie*র মতো এটিও লিখছিলেন একটি কাহিনীকাব্য হিশেবে এবং পৌরাণিক বিষয়কে অবলম্বন করে, তা জানা যাচ্ছে। এবং তা থেকে তাঁর প্রতিভা যে বিশেষ করে কাহিনীকে কেন্দ্র করে স্ফূর্তি লাভ করে, তার একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এর পরেও তিনি তাঁর সব কাব্য রচনা করেছিলেন কোনো না কোনো কাহিনী অবলম্বন করে।

The Captive Ladie তাঁকে মাদ্রাসের বাইরে তেমন কোনো কবিখ্যাতি দিতে পারেনি। তবে কবি নিজে এ কাব্যকে তুচ্ছ বলে মনে করতে পারেননি। কোনো অনুকূল সমালোচনা না-দেখে হতাশ গৌরদাস যখন তাঁকে বোঝাতে চেয়েছেন, এ কাব্য প্রকাশ করে কোনো লাভ হয়নি, তখনোও তিনি সেটা মেনে নিতে পারেননি। মাদ্রাস, কলকাতা, লন্ডন – সর্বত্র তাঁর জয়জয়াকার পড়ে গেছে, এ কথা লিখতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু এ কাব্য মাদ্রাসে তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্যে কতোটা অবদান রেখেছে, সেটা বন্ধুকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন।

> মনে হচ্ছে তুমি 'ক্যাপটিভ'কে ধরে নিয়েছো একটা ব্যর্থতা বলে, কিন্তু আমি তা মনে করিনে। কারণ, তাকিয়ে দেখো, আমার জন্যে অশেষ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে এ কাব্য। এর মাধ্যমে যাঁদের বন্ধুত্ব লাভ করেছি – তাঁদের চিনতে পারাও সৌভাগ্যের বিষয়। তুমি শুনে নিশ্চয় খুশি এবং বিস্মিত হবে যে, অল্প আগে আমাকে অ্যাডভোকেট-জেনরেল জর্জ নর্টন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এই বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে যতোটা সম্ভব সৌজন্যের সঙ্গে স্বাগত জানান। ... আমরা আলাপ-আলোচনা করি বন্ধুর মতো। তিনি আমাকে ধ্রুপদী সাহিত্যের কতোগুলো বই দিয়েছেন তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ।[৫৯]

আগেই বলেছি, পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে কাব্যটি মাইকেল উৎসর্গ করেছিলেন বন্ধু রিচার্ড নেইলরের নামে। কিন্তু কাব্যটি যখন এক সর্গেরও বেশি ছাপা হয়ে গেছে, তখন তাঁর মাথায় এলো এটি জর্জ নর্টনের নামে উৎসর্গ করলে হয়। নর্টন ছিলেন মাদ্রাসের বিশেষ নাম-করা ব্যক্তি। অ্যাডভোকেট-জেনরেল ছাড়াও তিনি ছিলেন অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক এবং উপদেষ্টা। মাদ্রাস স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৮৩৮ সালে যে-বোর্ড গঠন করা হয়, নর্টনকে তার সভাপতি নিয়োগ করা হয়েছিলো। তারপর ১৮৫২ সালের দোসরা জুলাই পর্যন্ত তিনি সেই পদে বহাল ছিলেন। কিন্তু সুপরিচিত লোক হওয়া সত্ত্বেও ১৮৪৯ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কবির আলাপ হয়নি। তবু সেই অপরিচিত নর্টনের নামে জীবনের প্রথম কাব্যটি উৎসর্গ করার এ খেয়াল হঠাৎ কেন তাঁর মনে এলো? আমার ধারণা, বিষয়ী না-হলেও, একটা ব্যাপারে কবি বারবার হিশেবী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন – পৃষ্ঠপোষকদের নামে তাঁর গ্রন্থগুলো উৎসর্গ করে। বন্ধুবৎসল কবি তাঁর গ্রন্থাবলী বন্ধুদের নামে, একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, উৎসর্গ করেননি। সে ব্যতিক্রম ভূদেব মুখোপাধ্যায়। নয়তো প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাসকে – যাঁকে তিনি নিজের জীবনী রচনার ভার দিয়েছিলেন, অথবা রাজনারায়ণ বসু – যাঁকে নিজের কবিখ্যাতি টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন – তাঁদের নামেও কোনো রচনা উৎসর্গ করেননি। একবার একজনকে একটি কাব্য উৎসর্গ করার পর সেই কাব্য আর-একজনের নামে উৎসর্গ করার এই ঘটনা কোনো সুরুচি অথবা ঔদার্যের পরিচয় বহন করে না। তা সত্ত্বেও, কবি তা করেছিলেন। এবং করে তাঁর কিঞ্চিৎ ইহলৌকিক লাভ হয়েছিলো বৈকি!


জর্জ নর্টন

কাব্যটি উৎসর্গ করার অনুমতি পাওয়ার জন্যে তিনি *The Captive Ladie*-র প্রথম সর্গটি পুরো এবং দ্বিতীয় সর্গের খানিকটা জর্জ নর্টনের কাছে পড়ে দেখার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। নর্টন যখন দেখলেন, কাব্যটির মধ্যে 'অনেক শক্তি আর প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রয়েছে', তখন আপত্তি করলেন না। কাব্যটি জর্জ নর্টনের নামে উৎসর্গ করার জন্যে তিনি কি পরিমাণ আগ্রহী ছিলেন এবং জর্জ নর্টনকে তুষ্ট করার জন্যে তিনি কি পরিমাণ বিনয় প্রকাশ করেছিলেন, তা বোঝা যায়, এ কাব্যের উৎসর্গপত্র থেকে। এতে তিনি লিখেছিলেন:

> To / George Norton, Esquare / The following tale / is / (by permission) / most respectfully dedicated, / by his most obedient / and / most humble servant / The author.

এই উৎসর্গপত্রে আর-একটা জিনিশ লক্ষযোগ্য, তা হলো: by permission কথাটি। এমনটা অবশ্য কোনো উৎসর্গপত্রে দেখা যায় না, তা নয়। কিন্তু বিরল নিশ্চয়। বোঝা যায়, এ ব্যাপারে জর্জ নর্টন খুব কড়া এবং পোশাকী ছিলেন।

কাব্যটি প্রকাশিত হবার তিন মাস পরে জর্জ নর্টন কবিকে ডেকে পাঠান। গৌরদাসকে লেখা চিঠি থেকে লক্ষ্য করেছি, তাঁকে নর্টন খুব সমাদর করেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, স্বয়ং কবি যা চেয়েছিলেন, নর্টন সেই আশ্বাস দিলেন। বললেন, মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের শিক্ষকতার চেয়ে অনেক উঁচু দরের একটি সরকারী চাকরি তিনি জুটিয়ে দেবেন। নর্টন বলেছিলেন ঢাকা, বেনারস অথবা হুগলিতে যেমন কলেজ আছে, তেমন একটি কলেজ মাদ্রাসে শিগগির খোলা হবে। সেই কলেজের প্রধান শিক্ষকের অথবা ইনস্পেক্টরের কাজ পাওয়া যাবে – এ আশ্বাসও তিনি দিয়েছিলেন। এ চাকরি পাওয়া যে কিছু কঠিন হবে না, নর্টনের কথা থেকে কবি সেটা অনুমান করেছিলেন। কারণ নর্টন বলেছিলেন যে, মাইকেল কলকাতায় থাকলে অনেক রাঘব বোয়াল চিরদিনের জন্যে না-হলেও সাময়িকভাবে তাঁর পথ আটকে রাখতে পারতো। কিন্তু মাদ্রাসে রাঘব বোয়াল কেন, সাধারণ রুই-কাৎলার তরফ থেকেও তেমন কোনো আশঙ্কার কারণ নেই।[৬০]

ঢাকা, বেনারস এবং হুগলির মতো মাদ্রাসে কবে কলেজ খোলা হবে, সেই আশায় বসে থাকলে কবির সংসার চলবে না। বিশেষ করে মাসখানেক পরেই যখন স্ত্রী সন্তান প্রসব করবেন। তাই দ্রুত একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সুতরাং নর্টন তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন মাদ্রাস স্কুলের হেডমাস্টার এয়ার বার্টন পাওয়েলের কাছে, মাদ্রাস স্কুলে একটি চাকরি দেবার জন্যে। পাওয়েল ছিলেন কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার। ১৮৪০ সালে তিনি পেমব্রুক কলেজ থেকে গণিতে ট্রাইপস করেন। স্বয়ং গভর্নর লর্ড এলফিনস্টোনের সুপারিশে তাঁকে মাদ্রাস স্কুল চালু হবার সময় থেকে অর্থাৎ ১৮৪১ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে প্রধান শিক্ষক করা হয়েছিলো সাত শো টাকা বেতনে, সেই সঙ্গে বাড়ি ভাড়া আরও ৮০ টাকা দিয়ে। (১৮৫৫ সালে তাঁর বেতন বেড়ে দাঁড়ায় এক হাজার টাকায়।) কবির চেয়ে মাত্র ছ বছরের বড়ো হলেও, তিনি ছিলেন মাদ্রাসের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তিনি মুগ্ধ হলেন। গৌরদাসকে লিখলেন: 'ভাবতে পারবে না, কী ভালো মানুষ তিনি।' স্কুলভবনটা দেখে তাঁর অবশ্য ভালো লাগেনি, তার অবস্থা কাহিল। (এই স্কুল বসানো হয়েছিলো এগমোরের পুরোনো পোস্ট অফিস ভবনে।) লাইব্রেরি বলতে গেলে নেই।[৬১] কিন্তু তাতে কী আসে যায়? মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের তুলনায় তো অনেক ভালো! তা ছাড়া বেতন তিন গুণেরও বেশি। সুতরাং মাইকেল তক্ষুণি মাদ্রাস স্কুলে চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। তবে মাদ্রাসে কলেজ খোলার প্রস্তাব তখন কার্যকর করা হয়নি। মাদ্রাস স্কুলেও সেই মুহূর্তে কোনো চাকরি খালি ছিলো না। ফলে *The Captive Ladie* অনেক বন্ধু দিলেও, পার্থিব কোনো সুফল সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারেনি।

বৈষয়িক উন্নতিতে তেমন কোনো সহায়তা না-হলেও, *The Captive Ladie* লিখে কবির কোনো লাভ হয়নি, তা নয়। এতোকাল তিনি কেবল খণ্ড কবিতা লিখেছিলেন – এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলো King Porus আর *Visions of the Past*। কিন্তু পরে তিনি আখ্যানকাব্য লিখেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সেই আখ্যান কাব্য লেখার গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এই কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে। কলকাতায় বসে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছিলেন, তার তুলনায় এ কাব্য অনেক পরিণত – কাহিনীর বুননিতে এবং ভাষা, ছন্দ ও উপমা-অলংকারের ব্যবহারে। এর চেয়েও কবির বড়ো লাভ হয়েছিলো পরোক্ষভাবে। ইংরেজিতে কাব্য রচনা করে সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন পাবেন বলে তাঁর উচ্চাশা ছিলো, কিন্তু *The Captive Ladie*-কে কলকাতার পাঠক সমাজ যেভাবে গ্রহণ করেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে সেই উচ্চাশাকে তিনি একবার বাস্তবতার আলোকে খতিয়ে দেখার সুযোগ পান। বিশেষ করে ডিঙ্কওয়াটার বেথুন যে-রূঢ় সত্য লিখেছিলেন, তা তাঁর উচ্ছ্বাসের ওপর তখনকার মতো ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেও, তাঁকে ভাববার খোরাকও কম দেয়নি। বেথুনকে বই

পাঠানোর সময়ে তিনি গৌরদাসকে তার ওপর লিখে দিতে বলেছিলেন:

> আপনি এ দেশের জন্যে যে লোকহিতকর কাজগুলো করেছেন, তার প্রতি লেখকের বিনীত কৃতজ্ঞতার প্রতীকস্বরূপ এই কাব্যটি সম্মানের সঙ্গে পাঠালাম।[৬২]

এ বই পড়ে বেথুন গৌরদাসকে যা লিখেছিলেন, তার মধ্য দিয়ে *The Captive Ladie*-র প্রতি খুব উচ্চ ধারণা প্রকাশ পায়নি।

> তাঁর কাব্য উপহার দেবার জন্যে আপনার বন্ধুকে আপনি দয়া করে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাবেন। আমার কাছে মনে হচ্ছে, তাঁর উপহারের আমি একটা রূঢ় জবাব দিচ্ছি। এই সুযোগে আপনার মাধ্যমে তাঁকে আমি সেই উপদেশটাই দিতে চাই, যা আমি ইতিমধ্যে তাঁর কয়েকজন দেশবাসীকে দিয়েছি। এই উপদেশ হলো: তিনি ইংরেজিতে কবিতা না-লিখে তাঁর সময়টা বরং অন্য কোনো কাজে ব্যয় করলে বেশি লাভবান হবেন। তবে মাঝেমধ্যে অনুশীলন হিশেবে এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা প্রমাণের জন্যে এ ধরনের প্রয়াস অনুমোদন করা যেতে পারে। অবশ্য কবিতা লেখাই তাঁর লক্ষ্য হলে তিনি তাঁর দেশের অনেক বেশি সেবা করতে পারবেন এবং তাঁর নিজের জন্যেও স্থায়ী খ্যাতি লাভের অনেক বেশি সুযোগ পাবেন, যদি কিনা ইংরেজি চর্চার মাধ্যমে তিনি যে-রুচি এবং মেধা অর্জন করেছেন, তা তাঁর নিজের ভাষার মানোন্নয়ন এবং কাব্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার কাজে ব্যয় করেন।
>
> আমি যদ্দুর জানি আপনাদের সাহিত্যের সবচেয়ে সেরা নমুনাগুলোও স্থূল এবং অশ্লীল। নিজেদের ভাষায় উচ্চতর এবং মহত্তর স্বাদের সাহিত্য গড়ে তোলার জন্যে একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ কবির পক্ষে দেশবাসী-দের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার চেয়ে উন্নত কোনো আশা থাকতে পারে না। তা ছাড়া, তিনি অনুবাদের মাধ্যমেও অনেক সেবা করতে পারেন। এভাবেই বেশির ভাগ য়োরোপীয় জাতির সাহিত্য গড়ে উঠেছে।[৬৩]

বেথুনের এই চিঠিতে সত্যের কোনো অভাব নেই। তবে তিনি মাইকেলের অন্য যে-দেশবাসীদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁদের তুলনায় মাইকেলের কবিপ্রতিভা এবং *The Captive Ladie*-র কাব্যগুণ নিঃসন্দেহে বেশি ছিলো। সে জন্যে কেবল কবির কাছে নয়, তাঁর সহানুভূতিশীল পাঠকদের কাছেও এ চিঠিকে খুব রূঢ় বলে মনে হয়। বেথুন তাঁকে যে-উপদেশ দেন, প্রায় একই সময়ে এবং প্রায় একই ভাষায় তিনি সে কথা বলেন কৃষ্ণনগর কলেজে প্রদত্ত তাঁর এক ভাষণে।[৬৪] আমার ধারণা, এ বক্তব্য ছিলো তাঁর একটি বহু-ব্যবহৃত উপদেশ। এবং সে জন্যে, তিনি যদি *The Captive Ladie* না-পড়েই অথবা তাতে সামান্য চোখ বুলিয়েই কবিকে এই উপদেশ দিয়ে থাকেন, তা হলে বিস্মিত হবো না।

বেথুন সাহিত্যের মস্তো বড়ো সমজদার অথবা সমালোচক ছিলেন, এমন কথা কেউ বলেননি। সুতরাং তাঁর মুখে *The Captive Ladie* এবং তার রচয়িতার মৃত্যুদণ্ড এই কাব্য অথবা তার কবি সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য মনে করার কারণ নেই। কিন্তু স্পর্শকাতর তরুণ কবির মনে এ আঘাতটা *Bengal Hurkaru*র শক্তিশেলের চেয়েও রূঢ় মনে হয়েছিলো। কলকাতার রূঢ় সমালোচনার ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাসে দারুণ চোট লেগেছিলো। এর পরোক্ষ একটা প্রমাণ পাই এ যাবৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞানা এবং একেবারে ভিন্ন একটা সূত্র থেকে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে *The Captive Ladie*-র একটি কপি আছে। এই কপিটি কবি নিজে মাদ্রাস থেকে পাঠিয়েছিলেন। এক সময়ে তিনি ভাবতেন, *The Captive Ladie* নিজের কাব্যগুণেই তাঁকে খ্যাতি দেবে। এর জন্যে কারো কাছে দরবার করার দরকার নেই। কিন্তু তিনি যখন এই বই ব্রিটিশ মিউজিয়মে পাঠান, তখন নিজের ছাপানো নামের নিচে নিজেই লিখে দিয়েছেন 'of Bishop's College, Calcutta'।[৬৫] কারণ, তাঁর তখন মনে হয়েছে, কাব্য হিশেবে এ বই ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে স্থান পাবে কিনা, সে সম্পর্কে মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষের মনে যদি কোনো সন্দেহ দেখা দেয়, তা হলে অন্তত 'of Bishop's College' কথাটা দিয়ে তিনি গ্রন্থাগারিকদের দ্বিধা দূর করতে সমর্থ হবেন। (কবির এই পরিচিতি ছাড়া, *The Captive Ladie*-র দ্বিতীয় সর্গের

চারটি জায়গায় কেটে ছাপার ভুল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। তেরো বছর পরে তিনি যখন তাঁর দুটি অনূদিত নাটকসহ তাঁর সবগুলো বই মিউজিয়মকে দান করেন, তখন সেগুলোর ওপর কোনো পরিচিতি লেখেননি। তা থেকে বোঝা যায়, প্রথম কাব্য প্রকাশের পরে প্রতিকূল সমালোচনার দরুন তাঁর আত্মবিশ্বাস টোল খেলেও, পরবর্তীকালে মিল্টন এবং কালিদাসের সঙ্গে তাঁর তুলনা শুনে তাঁর আত্মবিশ্বাস এতোটা বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, তখন আর নামের শেষে 'অব বিশপস কলেজ, ক্যালকাটা' কথাটা জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে তাঁর মনে হয়নি। এই বইগুলোর বেশির ভাগই তিনি নিজে ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বইগুলো এক সঙ্গে ৬৬ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে লাইব্রেরির তালিকাভুক্ত করা হয়।

কবি তাঁর কলকাতার সমালোচকদের কাছ থেকে যে নির্দয় সমালোচনা শুনেছিলেন, তা তাঁর প্রাপ্য ছিলো বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর এ আঘাতের দরকার ছিলো। ইংরেজিতে কাব্য লিখে মহাকবি হবার তাঁর বাসনা যে নিতান্ত আকাশকুসুম কল্পনা এবং নিজের মাতৃভাষা ভুলে যাবার মধ্যে যে কোনো বাহাদুরি নেই – এ দুই অনুভবই এ চিঠি পাওয়ার পর ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে দানা বেঁধেছিলো। বেথুনের মন্তব্য পাওয়ার কয়েক মাস আগেই গৌরদাসকে মাদ্রাস থেকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠিতে তিনি প্রায় বড়াই করে লিখেছিলেন: 'আমি বাংলা ভুলে যাচ্ছি, কতোটা দ্রুত, তোমাকে বোঝাতে পারবো না।' অতঃপর বাংলায় তাঁর দক্ষতা নেই বলে বিনয় প্রকাশ করলেও, কোনো চিঠিতে তিনি বাংলা ভুলে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেননি।


জে ই ডি বেথুন

মাইকেলের জীবনী-লেখকরা যেভাবে তাঁর বাংলায় কাব্যচর্চা এবং বেথুনের চিঠির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখিয়েছেন, তা সঠিক নয়। বেথুনের চিঠি পড়ে কবি অমনি ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা ছেড়ে দিলেন এবং বাংলায় কাব্য রচনা করার জন্যে বাংলা ভাষা চর্চার কাজে উঠে-পড়ে লাগলেন, ইতিহাস এমনটা সাক্ষ্য দেয় না। এই মাত্র তাঁর যে-চিঠির উল্লেখ করলাম, ১৪ ফেব্রুআরির (১৮৪৯) সেই চিঠিতে তিনি গৌরদাসকে কাশীদাসী *মহাভারত* এবং শ্রীরামপুর সংস্করণ কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* পাঠানোর অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে পাঠাতে বলেন, বিশপস কলেজে যে-বইগুলো ফেলে এসেছিলেন, সেগুলো। শৈশবে *রামায়ণ* এবং *মহাভারতে*র সঙ্গে তাঁর যে-নাড়ির যোগ ঘটেছিলো, খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ, ভিনদেশী সংস্কৃতিকে স্বীকরণ অথবা খৃষ্টান স্ত্রী বরণ করায় তা মোটেই ছিন্ন অথবা দুর্বল হয়নি। তা ছাড়া, কোনো শ্রেষ্ঠ রচনা লিখতে হলে তাঁকে যে ভারতীয় বিষয়ই নির্বাচন করতে হবে – এ কাণ্ডজ্ঞান তাঁর ছিলো। তাই, বেথুনের মন্তব্য পাওয়ার অনেক আগেই, শুধু *The Captive Ladie* নয়, তাঁর অনামা অসমাপ্ত কাব্য এবং *Upsori*-র বিষয়বস্তুও তিনি নিয়েছিলেন ভারতীয় কিংবদন্তী এবং পুরাণ থেকে। বোঝা যায়, ইংরেজি ভাষায় লিখলেও, দেশীয় উপকরণ তাঁকে সারাক্ষণ উদ্দীপ্ত করছিলো। তা ছাড়া, বেথুনের উপদেশ পাওয়ার আগে থেকে তিনি মাতৃভাষায় লেখায় কথাও ভাবছিলেন বলে মনে হয়। সর্বোপরি, বেথুনের উপদেশ পাওয়ার পরও কবি

ইংরেজিতে কাব্য রচনার চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করেননি। তারপরেও ইংরেজিতে কবিতা লিখেছেন। তবে তাঁর উপদেশ বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করে থাকবে।

The Captive Ladie থেকে কাঙ্ক্ষিত খ্যাতি অথবা স্বীকৃতি না-পেয়ে তিনি হতাশ হলেন, কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন না। বরং নিজেকে আরো ভালো করে তৈরি করার সংকল্প নিলেন। অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন অনেকগুলো ধ্রুপদী ভাষা। ফেব্রুআরি মাসে গৌরদাসকে যে বইগুলো পাঠাতে বলেছিলেন, সেগুলো নিরাপদে তাঁর হাতে এসে পৌঁছলো অগস্ট মাসের মাঝামাঝি। সেই সঙ্গে এসেছিলো বেথুনের প্রশংসাবর্জিত কঠোর উপদেশ। তার ওপর ঠিক সেই সময়ে — বিয়ের ঠিক এক বছর আঠারো দিন পরে — ১৮ অগস্ট শনিবার শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার দিন জন্ম নিলো তাঁদের প্রথম সন্তান — ব্যর্থা।[৬৭] আনন্দ করবেন, না মাথার চুল ছিঁড়বেন, ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। কারণ, তাঁর হাত একেবারে খালি। সাধারণ খুচরোও নেই পকেটে ঝুনঝুন করে যা বাজতে পারে। 'এই মুহূর্তে আমার অভাব এমন প্রকট যে, কোনো দর্শন দিয়েও একে সহনীয় করে তোলা সম্ভব নয়। বেথুনের মন্তব্য সম্পর্কে আমার অনেক কিছুই বলার মতো আছে, কিন্তু সময়টা এখন বড্ডো খারাপ যাচ্ছে।'[৬৮]

উদ্‌বেগ আর দুশ্চিন্তার সেই অসহ্য পরিবেশে নিজের সৃষ্টিকে আরও মহৎ করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি কষে লেখাপড়া আরম্ভ করেছিলেন। ছাত্র ছিলেন না তিনি। কিন্তু অধ্যয়নকেই তপস্যা বলে গণ্য করেছিলেন। সকালে দু ঘণ্টা পড়েন হিব্রু, দুপুরের পর দু ঘণ্টা গ্রীক, বিকেলে তিন ঘণ্টা তেলেগু এবং সংস্কৃত, সন্ধ্যে বেলায় দু ঘণ্টা ল্যাটিন আর রাতের বেলায় তিন ঘণ্টা ইংরেজি — মোট বারো ঘণ্টা। (এ ছাড়া, পেট চালানোর জন্যে মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের ছেলেদের স্কুলে পড়ানো আছে চার ঘণ্টা। অ্যাসাইলামের রিপোর্টে ক্লাসের সময় দেখানো হয়েছে মোট সাত ঘণ্টা।) 'কী বলো, পূর্বপুরুষদের ভাষাকে অলঙ্কৃত করার জন্যে তৈরি হচ্ছি না যথেষ্ট মাত্রায়?'[৬৯] লেখাপড়া করার এই সময়সূচী তৈরি করেছিলেন বেথুনের মন্তব্য পাওয়ার আগেই। ভবিষ্যতে মহৎ কাব্য রচনার জন্যে আরো অধ্যয়নের উদ্‌যোগের কথা বন্ধুকে লিখলেন সরবে — এর মধ্যে গর্ব করার মনোভাব যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস। গৌরদাস বেথুনের উপদেশ পেয়ে তাকে ধ্রুব সত্য বলে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি নিজে এই সমালোচনায় দুঃখিত হয়েছিলেন। মধু কতোটা মর্মাহত হবেন, তাও তিনি অনুমান করতে পারছিলেন। শোকার্ত আপনজনকে মানুষ যেমন সান্ত্বনা দেয়, গৌরদাস তেমনি মধুসূদনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছিলেন যে, মধু বাংলায় কাব্য লিখলে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন।[৭০] গৌরদাসের এই হতাশার সুর মধু নিশ্চয় শুনতে পেয়েছিলেন, তাঁকে চাঙ্গা করার জন্যে তাই অধ্যয়ন এবং পূর্বপুরুষের ভাষাকে সমৃদ্ধ করার সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন অমন দুঃসময়ে। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন — 'পূর্বপুরুষের ভাষাকে অলংকৃত করার জন্যে আমি কি তৈরি হচ্ছি না?' — থেকে বোঝা যায়, বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করবেন বলে তিনি এর আগে থেকেই মনে মনে সংকল্প নিয়েছিলেন।

এই চিঠি লেখার পর গৌরদাসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নাটকীয়ভাবে কমে যায়। যেমন হঠাৎ চিঠিপত্রের আদানপ্রদান শুরু হয়েছিলো, তেমনি হঠাৎ আবার তা বন্ধ হয়ে যায়। তা না হলে আমরা জানতে পারতাম, ধ্রুপদী ভাষা চর্চা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতোটা সাহিত্য পাঠ করছিলেন। কী কী পাঠ করছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না-থাকলেও, অনুমান করা সম্ভব, পরে কলকাতায় ফিরে তিনি যে-সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তা তিনি শূন্য থেকে পাননি; বরং তার ভিত্তি খানিকটা তিনি তৈরি করেছিলেন এ সময়ে। যদিও ১৮৪৯ সালের শেষ দিক থেকে শুরু করে ১৮৫২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা এবং একই সঙ্গে একাধিক পত্রিকা সম্পাদনার কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায়, কতোটা

লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। অবশ্য স্কুলে যোগ দেবার পরবর্তী বছর তিনেক তিনি সে সুযোগ পেয়েছিলেন।

The Captive Ladie বই আকারে প্রকাশের সময়ে রিচার্ড নেইলরের নাম বাদ দিয়ে তিনি সে বই নর্টনের নামে উৎসর্গ করলেও নেইলরের প্রতি তাঁর বন্ধুত্বে ভাঁটা পড়েনি। প্রথম বিবাহ বার্ষিকী যখন ঘনিয়ে এলো, বার্ষিকীর তিন চার দিন আগে, তিনি আবার তাঁর নামে উৎসর্গ করলেন দুটি সনেট — কেবল নিজের বিয়েতে সহায়তা দেবার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নয়, বরং নেইলরের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষেও এ ছিলো তা একান্ত নিজস্ব উপহার। নেইলরের চতুর্থ বিবাহবার্ষিকী ছিলো ২৯ জুলাই। এই সনেট দুটির মধ্য দিয়ে কবির নিজের মনের প্রগাঢ় বেদনা প্রকট হয়ে দেখা দিলো।

> Richard! there is a grief which few can feel;
> It cuts into the bosom's deepest core,
> And with unwearied fingers aye doth steal
> Its summer gladness, and its faery store
> Of hopes and aspirations.

এ এমন মর্মঘাতী বেদনা যা সব ছারখার করে দেয়। পবিত্রতম দৈববাণীও তারপর কোনো সান্ত্বনার মলম লাগাতে পারে না। এই কবিতা দুটিতে পারিবারিক কোনা দুঃখের ইঙ্গিত নেই। সে পর্যায়ে বিবাহ নিয়ে কোনো সংকট দেখা দেয়নি, স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়েও ভাঁটা পড়েনি। যদিও সংসারে নিদারুণ অভাব আছে, সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে প্রথম সন্তান হতে যাচ্ছে। কিন্তু সে রকমের সমস্যা সম্পর্কেও এ কবিতায় কোনো আভাস নেই। এ হলো কবির মর্মস্থলে জমাট বাঁধা দুঃখের গাঢ় কুয়াসা — when morrow smiles it dies away. অলৌকিক আনন্দের উল্টো পিঠে যে-অপার বেদনা থাকে এ সেই ব্যাখ্যার অতীত অকারণ দুঃখ, অন্য কিছু নয়। জনারণ্যে থেকেও নিঃসঙ্গতার যে-দুর্বিষহ বিষাদ কবিকে বিপন্ন করতে পারে, এ সেই ব্যথা। পরেও দেখা যাবে, এ রকমের ব্যাখ্যাতীত ব্যথার কথা তিনি অনেক বার বলেছেন। আপাতসুখের মধ্যেও বুক ভাঙ্গা হাহাকার করেছেন।

মাইকেল এবং রেবেকা তাঁদের প্রথম আদরের সন্তানের নাম রাখেন বেশ জমকালো দেখে — ব্যর্থা ব্লানশ। এর সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন একটি বংশনাম — কেনেট। তাঁদের দুঃখের দিনে মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের সেক্রেটারি চার্লস কেনেট তাঁদের যে-সমর্থন এবং সহানুভূতি দিয়েছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে মেয়ের নামের সঙ্গে তাঁর নাম জুড়ে দিয়েছিলেন। চার্লস কেনেটও তাতে খুশি হয়েছিলেন। তিন মাস পরে, ১৫ নভেম্বর যখন ব্যর্থার ব্যাপটিজম হয়, তখন অন্যদের মধ্যে চার্লস কেনেটও চার্চে হাজির হয়েছিলেন। আর এসেছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু জে আর নেইলর[৭১] — বিয়ের সময়ে যিনি কেবল সাক্ষীই ছিলেন না, বরং বিরোধিতার মুখে তাঁদের দিয়েছিলেন নৈতিক সমর্থন। তিনি ছিলেন কবির কাছে অনেকটা মাদ্রাসের গৌরদাসের মতো।

গৌরদাসকে লেখা চিঠি থেকে বোঝা যায়, সন্তানের জন্মে কবি উচ্ছ্বসিত হয়েছেন।[৭২] আগের মাসে গৌরদাসের চিঠি থেকে খবর পেয়েছিলেন যে, তাঁর কাছে মধুর খবর পেয়ে বাবামা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, বিশেষ করে মা। আদরের একমাত্র সন্তানের জন্যে কয়েকটা জিনিশ দিয়ে মা একটা পোটলা বেঁধে দিয়েছিলেন গৌরদাসের হাতে। অনুরোধ করেছিলেন সেটা মধুর কাছে পাঠিয়ে দিতে। (কী ছিলো সেই পোটলাতে? সেকালে একজন সাধারণ বাঙালি মা কী পাঠাতে পারতেন যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন, পর-হয়ে যাওয়া তাঁর খৃষ্টান সন্তানকে?) গৌরদাস সম্ভবত লিখেছিলেন মায়ের অনুযোগের কথা। গৌরদাসের নিজের অভিযোগের কথা — মধু মায়ের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। কবি তার উত্তরে বন্ধুকে লিখলেন, মায়ের আঁচলের তলায় মানুষ কি চিরদিন লুকিয়ে থাকতে পারে? বাস্তব

পৃথিবীতে সবার নিজের নিজের পথ করে নিতে হয়।[৭৩] সাত বছর আগে — ১৮৪২ সালের নভেম্বর মাসেও একবার বন্ধুকে অ্যালেকজান্ডার পোপের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন, কবিতার জন্যে দরকার হলে বাবামাকেও ছাড়তে হয়। তবে কলকাতায় যেতে না-পারলেও, সন্তান জন্মের পর আনন্দে উদ্‌বেল কবির মনে হলো: বাবামাকে খবরটা এই মুহূর্তে জানানো দরকার। তাই বন্ধুকে লিখলেন: 'চিঠিটা পেয়েই বাবাকে জানিয়ো আমার একটি মেয়ে হয়েছে। আমার এমন বাংলা জানা নেই যাতে করে খবরটা তাঁকে লিখতে পারি।'[৭৪]

প্রথম যৌবন থেকে মাইকেল ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলেন, সেই সঙ্গে সজ্ঞানে বাংলা ভোলারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর মাতৃভাষা এবং পাঠ্য বিষয় হিশেবে বাংলা তাঁকে পড়তে হয়েছে দীর্ঘ দিন। যে-রামচন্দ্র মিত্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গে *The Captive Ladie*-র একটি কপি পাঠিয়েছিলেন, হিন্দু কলেজে কবি তাঁর কাছে নিশ্চয় বাংলা পড়েছিলেন, নয়তো হঠাৎ আকাশ থেকে তাঁর মনে এই শিক্ষক সম্পর্কে শ্রদ্ধা আসেনি। হিন্দু কলেজের জুনিয়র শাখায় রামতনু লাহিড়ীর কাছেও তিনি বাংলা পড়েছিলেন। (রামতনু লাহিড়ী হিন্দু কলেজে যোগদান করেন মধু সে কলেজে ভর্তি হবার চার বছর আগে — ১৮৩৩ সালের পয়লা জুলাই।) বিশপস কলেজেও বাঙালি ছাত্রদের বাংলা এবং সংস্কৃত শিখতে হতো। মাইকেল ব্যতিক্রম ছিলেন কিনা জানা যায় না। সে জন্যে বলতে হয়, বাংলা ব্যবহার না-করে, নিজের আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই বলে বাবাকে সন্তান হবার খবর লিখে জানানোর মতো বাংলাও তিনি ১৮৪৯ সাল নাগাদ ভুলে গিয়েছিলেন, এমনটা মনে করা শক্ত। তাঁর বহু ভানের মধ্যে বাংলা ভুলে যাবার প্রসঙ্গও একটা। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চাইতেন, তিনি কতোটা খাঁটি ইংরেজ বনে গিয়েছেন।

সন্তান জন্মের পর আর্থিক অনটনে তিনি যখন অস্থির হয়ে পড়েন তখন তিনি আর অরফ্যান অ্যাসাইলামের আশার অর্থাৎ সহকারী শিক্ষক ছিলেন না। ইতিমধ্যে তাঁর পদোন্নতি ঘটেছিলো। অ্যাসাইলামের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে মনে হয়, তিনি ছিলেন এ সময়ে (১৮৪৯ সালে) স্কুলের প্রধান এবং একমাত্র শিক্ষক। পরের বছর এপ্রিল মাসে *Eurasian* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি রচনা থেকেও বোঝা যায়, তিনি তখন অরফ্যান অ্যাসাইলামের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। আমাদের হাতে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু মনে হয় অরফ্যান অ্যাসাইলামের চাকরি ছাড়াও, তিনি বাড়তি আয়ের জন্যে পত্রপত্রিকায় লিখতেন। এটা মনে করার কারণ এই যে, ১৮৪৯ সালে তাঁকে সম্পাদক নিয়োগ করে *Madras Advertiser* পত্রিকার মালিক অ্যাবেল পেন সিমকিন্স *Eurasian* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রপত্রিকার সঙ্গে আগে থেকে কোনো রকমের যোগাযোগ না-থাকলে, একেবারে অভিজ্ঞতাহীন একজন লোককে সম্পাদক করে একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা সিমকিন্স ভাবতেন না। আমাদের অনুমানের দ্বিতীয় কারণ, তিনি এই পত্রিকা বেশ যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। এই যোগ্যতা তিনি কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়া অর্জন করেছিলেন, এমনটা মনে করা সঙ্গত নয়।

অ্যাবেল পেন সিমকিন্সের প্রেস থেকে কবি তাঁর প্রথম কাব্য ছাপিয়েছিলেন, ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করেছি। সিমকিন্স ছিলেন দক্ষ মুদ্রক এবং প্রকাশক। তিনি তাঁর ছাপাখানা থেকে একই সঙ্গে একাধিক পত্রিকা বের করেন এবং পত্রিকাগুলো বেশ কিছু দিন টিকে থাকে, তা থেকে তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মাদ্রাসে সেকালে একটি বড়ো ইউরেশিয়ান সম্প্রদায় বাস করতো। (১৮৭৫ সালে এঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় বারো হাজারে।) তিনি অনুমান করেছিলেন যে, বিশেষ করে ইউরেশিয়ানদের স্বার্থের কথা মনে রেখে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে পারলে তা জনপ্রিয় হবে। ওদিকে মাইকেল

দেশীয় হলেও, আধা-ইংরেজ ছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর একটি পূর্ণকালীন চাকরিও ছিলো। পত্রপত্রিকায় লিখে ইতিমধ্যে ইংরেজি ভাষা এবং সাংবাদিকতায় তাঁর যোগ্যতারও পরিচয় দিয়েছিলেন। অ্যাবেলের মনে হলো: অল্প বেতনে এঁর চেয়ে ভালো সম্পাদক আর হয় না। এ জন্যে তাঁকে সম্পাদক করে ৩ নভেম্বর (১৮৪৯) থেকে তিনি এ পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকা প্রকাশিত হতো প্রতি শনিবার।

Eurasian পত্রিকা নানাভাবে কবিকে সাহায্য করেছিলো। বিশেষ করে, সামান্য হলেও, নিয়মিত বাড়তি আয়ের রাস্তা খুলে দিয়েছিলো এ পত্রিকা – আসলে এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এর হাল ধরতে রাজি হয়েছিলেন। কন্যার জন্মের পরে দারুণ অভাবের মধ্যে এই বাড়তি আয় বিশেষ কাজে এসেছিলো। তা ছাড়া, এ পত্রিকা তাঁর রচনা প্রকাশের একটা প্রশস্ত মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো। প্রথম যৌবন থেকে তিনি লিখেছেন এবং নিজের লেখার মান সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণাও পোষণ করেছেন। তাঁর 'সেই উঁচু মানের' কবিতা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কতো না সম্পাদকের তোয়াজ করেছেন। *Bentley's Miscellany*-সহ কতো পত্রিকায় তিনি কবিতা পাঠিয়েছিলেন প্রকাশের জন্যে। খুব অনুনয় করে চিঠিও লিখেছেন কোনো কোনো সম্পাদকের কাছে। কলকাতার *Literary Gleaner* ইত্যাদি পত্রিকায় মাঝেমধ্যে কবিতা প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু প্রতিবারেই কবিতা পাঠিয়ে ছাপা হয় কিনা, তা দেখার জন্যে তীর্থের কাকের মতো তাঁকে তাকিয়ে থাকতে হতো। মাদ্রাসের দুটি প্রধান পত্রিকা *Athenæum* এবং *Spectator*-এও তাঁর মাদ্রাসে আগমনের পরে প্রথম প্রায় দু বছর কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়নি। এক মাত্র অবলম্বন সেই *Madras Circulator*। কবি হয়তো অনেকবার ভেবেছেন, তাঁর যদি একটা পত্রিকা থাকতো! সে জন্যে *Eurasian*-এর দায়িত্ব পেয়ে তিনি খুশি হয়েছিলেন। হোক না অপ্রতিষ্ঠিত, অজ্ঞাতপরিচয়, সদ্যপ্রকাশিত পত্রিকা, তবু *Eurasian*-এর তিনি সম্পাদক। এখন থেকে তাঁর রচনা প্রকাশে আর কোনো বাধা থাকলো না। তা ছাড়া, তিনি বোধ হয় এ-ও ভেবেছিলেন যে, কী করে পত্রিকা চালাতে হয়, তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ সম্পাদকদের তা দেখিয়ে দেবেন। তিনি যা ধরতেন, কষেই ধরতেন। *Eurasian*-ও তিনি চালাতে আরম্ভ করলেন আন্তরিকতা আর উৎসাহের সঙ্গে।

Eurasian-এ বিজ্ঞাপন থাকতো, স্থানীয় এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকতো, চিঠিপত্রের কলাম থাকতো। আর থাকতো সেকালের পত্রিকার জন্যে অত্যাবশ্যক বিষয়, যেমন জাহাজ চলাচলের খবর, সেনাবাহিনীর খবর, আদালতের খবর ইত্যাদি। অন্যান্য পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতিও থাকতো সেকালের পত্রিকায় – বিশেষ করে লন্ডনের এবং কলকাতার পত্রপত্রিকা থেকে। *Spectator* পত্রিকা মাঝেমধ্যে, বিশেষ করে শুক্রবারের সংখ্যায় একটি ক্রোড়পত্রিকা বের করতো সাহিত্য সম্পর্কে। তাতে লন্ডনের বাসি মালমশলাই থাকতো প্রধানত। কবি তাঁর পত্রিকা ভরে দিতে আরম্ভ করেন তাঁর নিজের রচনা দিয়ে। দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ ১০ নভেম্বরের সংখ্যা থেকে তিনি *Rizia: Empress of Inde* কাব্যনাট্য প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। তারপর ১২ জানুআরি পর্যন্ত এ নাটকের মোট নটি দৃশ্য প্রকাশিত হয়।[৭৫]

Rizia-র বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক উভয় সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিনব। সেকালের বাঙালি সাহিত্যিকরা মুসলিম বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্য রচনার কথা ভাবতে পারতেন না। এ রকম বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁদের যেমন কোনো আগ্রহ ছিলো না, তেমনি পাঠকরাও এতে উৎসাহী হবেন বলে তাঁরা মনে করতেন না। কিন্তু মাইকেল চিরাচরিত পথে হাঁটার পাত্র ছিলেন না। আদর্শের খাতিরে যিনি নিজের ধর্ম বিসর্জন দিয়েছিলেন, স্বজন এবং স্বসমাজকে ত্যাগ করতে ভয় পাননি, তাঁর মূল্যবোধ যে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা হবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী! তিনি সে জন্যে গতানুগতিক পথে না-

চলে আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর রচনায় বারবার পরীক্ষানিরীক্ষা করতে দ্বিধা বোধ করেননি। বরং সেটাই ছিলো তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। *Rizia*-ও এর ব্যতিক্রম ছিলো না।

প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি, বাল্যকালে মধু ফারসি পড়েছিলেন। ফারসি অবশ্য সেকালের অন্য লেখকরাও কমবেশি পড়েছিলেন। সুতরাং কেবল ফারসি পড়ার ঘটনাটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ফারসি ভাষা তাঁর মনে কোনো দাগ না-কাটলেও, ফারসি সাহিত্য এবং মুসলমানি বিষয়বস্তু তাঁর মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিলো। বিশেষ করে সাদির রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর একাধিক রচনায় দেখা যায়। তা ছাড়া, তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলমানি বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন একটা তেজ এবং প্রবল আবেগ অথবা প্যাশন আছে, শক্তিশালী সাহিত্যিক যাকে খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারবেন।[৭৬] পরেও দেখা যাবে, তিনি একাধিক বার এ রকম বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্য রচনা করার সংকল্প প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক বার তাঁর পৃষ্ঠপোষক অথবা বন্ধুরা তাঁকে সে পথ থেকে সরিয়ে রেখেছেন। সমকালের তুলনায় তাঁর মনে এই অসাধারণ চেতনা বিকাশের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি তাঁর বন্ধুদের তুলনায় শুধু নয়, তাবৎ বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় একটা জায়গাতে আলাদা – তিনি নিজের ধর্মের বন্ধন কেটে অন্য একটি ধর্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে সে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার প্রতিও আনুগত্য হারিয়ে ফেলেন। মোট কথা, কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি একাত্ম বোধ করতে পারেননি – না তাঁর আদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে, না তিনি যে-সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চেয়েছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে। বরং তিনি নিজের সম্প্রদায় থেকে দূরে সরে যাবার দরুন এবং য়োরোপীয় মুক্তবুদ্ধির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার কারণে একটা অসাধারণ অসাম্প্রদায়িক চেতনা স্বীকরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্তত বঙ্গদেশের নাগরিক সমাজে সে কালে যে-প্রবল হিন্দু-মুসলমান ভেদবুদ্ধি সক্রিয় ছিলো, তিনি তার উর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন। তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে তাই একক না-বলে পারা যায় না।

Rizia নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার প্রশস্তি গাননি, মুসলমান সমাজেরও নয়। তিনি যে-কাহিনী বেছে নিয়েছেন, তা কতোটা ঐতিহাসিক সে সম্পর্কেও সন্দেহ আছে – যদিও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এ নাটকের বিষয়বস্তু তিনি নিয়েছেন, অ্যালেকজান্ডার ডাও-এর অনূদিত মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতার ফারসি ভাষায় লেখা *হিন্দুস্তানের ইতিহাস* থেকে। কিন্তু রচনার ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্যে তিনি বড়ো একটা ব্যস্ত ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি ইতিহাসের মধ্য থেকে একটি মানবিক আগ্রহের কাহিনী বেছে নিতে চেয়েছিলেন। *The Captive Ladie*-তেও তাঁর একই মানসিকতা দেখতে পাই। তার মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ আছে, অস্ত্রের ঝনঝনানি আছে, কূটনীতি আছে, কিন্তু সেসব বহিরঙ্গের বিষয়। কবি আঁকতে চেয়েছেন একটি প্রণয়কাহিনী। *Rizia* নাটকেও তাঁর লক্ষ্য অভিন্ন। বরং এ নাটকে তিনি এঁকেছেন একটি অসামাজিক প্রেমের কাহিনী এবং, সে কারণে, সে কাহিনী আরো প্রবল আবেগ এবং আকর্ষণের। এই কাব্যনাট্যে একটা অসাধারণ জিনিশ লক্ষ্য করি সে হলো: এতে হিন্দু, মুসলিম এবং গ্রীক – এই তিন পুরাণ থেকে তিনি অবলীলায় মালমশলা ব্যবহার করেছেন। সেকালের ভারতবর্ষে এটা করতে পারতেন মুষ্টিমেয় যে-কজন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁদের অন্যতম। অন্য যাঁরা শিক্ষিত ছিলেন, তাঁদের অনেকে হিন্দু এবং গ্রীক পুরাণ জানলেও, মুসলিম 'পুরাণ' জানতেন না; অথবা জানলেও তাকে নিজেদের রচনায় ব্যবহার করার মতো ঔদার্য অথবা অনুরাগ তাঁদের ছিলো না।

মাইকেলের এই নাট্যকণা অনুযায়ী রিজিয়ার সঙ্গে প্রণয় ছিলো তাঁরই এক ক্রীতদাস – জামালের। কিন্তু তাঁর এই প্রণয়কে, স্বাভাবিকভাবেই, হিংসার চোখে দেখতেন তাঁর সাবেক স্বামী সিন্ধুর সুলতান

আলতুনিয়া। ষড়যন্ত্র করে আলতুনিয়া তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং জামালের ছিন্নমস্তক উপহার দেন। তা ছাড়া, রিজিয়ার বন্দী ভ্রাতা বাইরমকে মুক্তি দেন আলতুনিয়া। অতঃপর বাইরম হন ভারতের সম্রাট। আর রিজিয়া প্রথমে বন্দিনী এবং পরে নিহত হন। এই কাহিনীর মধ্যে যে-আবেগ, নাটকীয় উত্থান-পতন এবং সহিংসতা আছে তা মাইকেলের কল্পনাকে উস্কে দিয়েছিলো।

রিজিয়া যখন বিদ্রোহের একেবারে মুখোমুখি হন, তাঁকে বন্দী করার জন্যে এগিয়ে আসছে তাঁর শত্রুরা, সেই নাটকীয় মুহূর্তটি মাইকেল অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন:

Riz. *(Rising)* Stand off - and dost thou dare -
Several We dare ...
Kab. *(From behind)* That's right ... be bold and seize her, friends
Riz. Summon my guards!
1st T.C. All gone t' imperial Delhi,
To ravel in the coronation feast
O' thy brother Byram ...
Riz. Miscreant! thou lyest ... call Jammal ...

ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বিতীয় তুর্কি আমীর জামালের ছিন্ন মস্তক এগিয়ে দিলো রিজিয়ার দিকে:

2nd T.C. Here he is
(Throwing down the head of Jammal)
Riz. O God!

বিস্ময় এবং আঘাত কাটিয়ে উঠে অতঃপর সম্রাজ্ঞীর মতোই রিজিয়া তেজ, বীরত্ব এবং দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। বস্তুত, মাইকেল পরবর্তী সময়ে প্রমীলা এবং *বীরাঙ্গনার* যে-তেজোদ্দীপ্ত ও বীর নারীদের চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন, তাদের আভাস এখানেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো: *Rizia*-তে তিনি কেবল নায়িকার বীরত্ব দেখাতে চাননি। তাঁর কোমল নারী হৃদয়ের ছবি পাঠকের কাছে তুলে ধরাই ছিলো কবির আসল উদ্দেশ্য। রিজিয়া নির্বাসিত হবার আগের অবসর মুহূর্তে স্বগতোক্তি করছেন:

And is this all? It is a dream ...
A hideous - hideous dream! Wake Rizia! Wake ...
And let no idle dreams now daunt my heart,
Wake, empress of proud Inde!

(She rises)

Why shouldn't thou fear?
Earth hath no glory brighter than thine own! -
They talked of Byram ... of my brother Byram ...
Poor Byram! I did love him ... where is he?
The tenant of an iron-mused dungeon!
Fy! 'twas a baseless dream!

(She turns round and sees the head of Jammal)

O God! O God!
And art thou there, mute witness of dead truth!
Then 'twas no dream? Can'st thou not speak? An empress
Ev'n when a mighty empress questions thee?
O that this heart will break! But sleep in peace!

এই দৃশ্যে যে উত্তম কাব্য এবং নাটকীয়তা আছে, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি কলকাতায়

এসে বছর আটেক পরে নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন। যথাসময়ে দেখতে পাবো, প্রথম নাটকেই তিনি অসামান্য সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। নাটক রচনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া এটা প্রায় অসম্ভব হতো। বস্তুত, *Rizia* রচনার মাধ্যমে তাঁর নাটক রচনার হাতেখড়ি হয়েছিলো। এ নাটক নিয়ে তিনি কতো ভেবেছিলেন এবং কতো বার এক-একটা অংশের খসড়া করেছিলেন, কে জানে! কিন্তু নাটকটি তিনি শেষ করতে পারেননি। আমার ধারণা, শিক্ষকতা এবং পত্রিকা সম্পাদনার কাজের ওপর প্রতি সপ্তাহে আবার একটি করে দৃশ্য লেখার প্রতিযোগিতার সঙ্গে তিনি শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কাহিনীর প্রতি তাঁর প্রেম কোনো কালেও লোপ পায়নি। পরে কলকাতায় যখন তিনি একটির পর একটি সফল নাটক লিখেছেন, তখনো রিজিয়ার কাহিনী নিয়ে একবার একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার সংকল্প প্রকাশ করেছেন। লিখেও ফেলেছেন অর্ধ-শত পঙ্‌ক্তি। তারপর ইংল্যান্ড থেকে ফিরে সাহিত্যের আসর থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যখন বিচারপতির দরবারে হাজির হয়েছেন, তখনোও আর-একবার এই কাহিনীর নাট্যরূপ দেবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সাধ থাকলেও, সে নাটক লেখার শারীরিক অথবা মানসিক সাধ্য, এমন কি, অবকাশ তাঁর তখন আর ছিলো না।

Rizia শেষ করতে না-পারলেও, এই নাট্যকণার প্রতি তাঁর কেবল দরদ নয়, গর্বও ছিলো। সে জন্যে *Rizia* প্রকাশিত হবার পরে তিনি মাদ্রাসে যেসব কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, তার অনেকগুলোতে নিজের নাম না-লিখে লিখেছেন '*Rizia*-র রচয়িতা'। মনের মধ্যে এ নাটিকা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ না-করলে তিনি এভাবে তাঁর পরিচয় দিতেন না। বরং হয়তো লিখতেন '*The Captive Ladie*-র রচয়িতা'। তাঁর *Rizia* নাট্যকণা সম্পর্কে তিনি কী ভাবতেন, তাঁর সে সময়কার কোনো চিঠিপত্র থাকলে জানা যেতো। *The Captive Ladie* ছাপা হবার সময়ে যখন তিনি তার অনামা কাব্যটি লিখছিলেন, তখনই এই দুই কাব্য সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা তিনি অকপট উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে *Rizia*-র দু কিস্তি ছাপা হবার পরেই আগের নভেম্বর মাস (১৮৪৯) থেকে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে গৌরদাসসহ বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র লেখায় ছেদ পড়ে। দোষটা মাইকেলের নয়। তিনি গৌরদাসকে শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন: 'তোমরা কি সবাই মরে গেছো? নাকি না-জেনে আমি কোনো অপরাধ করে ফেলেছি? ভূদেব অথবা তোমার কাছ থেকে তিন মাসেও একটি লাইন পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। ভূদেব, স্বরূপ তোমরা সবাই এক-একটা হামবাগ।' নিজের সম্পর্কে আর তাঁর কীর্তি সম্পর্কে অনেক কথা যে বলার আছে, তা জানতে পাই এই চিঠিরই একটি কথা থেকে। লিখেছেন: 'নিজের কথা কিছু বলার লোভ সম্বরণ করছি। কারণ ইতিমধ্যে তুমি যদি পঞ্চত্ব পেয়ে থাকো, তা হলে আমি চাইনে আমার এ চিঠি অন্য কারো হাতে পড়ুক। দোহাই তোমার চিঠি লিখো। ইতি তোমার দারুণ ক্রুদ্ধ ইত্যাদি।'[৭৭] এ চিঠি গৌরদাস পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, তাঁর সঙ্গে কবির চিঠিপত্রের যোগাযোগ কেন ছিন্ন হলো বোঝা যায় না। কেবল গৌরদাস নন, এরপর ছ বছর এক মাসের মধ্যে অন্য বন্ধুদের কাছে লেখা কোনো চিঠিও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এলেও, গৌরদাসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো, এমনটা মনে করার কারণ নেই। ১৮৫১ সালের জুলাই এবং ১৮৫২ সালের এপ্রিল মাসে লেখা গৌরদাসের অন্তত দুটি চিঠি পাওয়া গেছে এবং তা থেকে মনে হয় তাঁদের মধ্যে সামান্য যোগাযোগ তখনো রয়েছে। গৌরদাস তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে (১৮৫২ সালের) আরো উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি মাইকেলের পাঠানো *Hindu Chronicle* পত্রিকা পাচ্ছেন (নিশ্চয় সৌজন্য সংখ্যা)।[৭৮] এ-ও যোগাযোগ বহাল থাকার ইঙ্গিত।

Eurasian প্রকাশিত হবার পর কবি ভেবেছিলেন, তিনি হাতে একটি পত্রিকা পেয়েছেন, অতঃপর

প্রাণের আনন্দে একের পর এক রচনা প্রকাশ করতে থাকবেন। *Rizia* প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর এ সংকল্পের খানিকটা আভাসও পাই। কিন্তু ১৮৫০ সালের প্রথম দিকে থেকে হঠাৎ তাঁর রচনার ধারা যেন শুকিয়ে গেলো। এর কোনো কারণ আমাদের জানা নেই। তবে *Rizia* শেষ করতে না-পারার যে-কারণ উল্লেখ করেছি, সৃজনশীলতা রুদ্ধ হবার কারণও হয়তো তাই। অর্থাৎ পূর্ণকালীন শিক্ষকতা, শিশুকন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা, অধ্যয়ন এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা — এর পর আর কাব্য অথবা নাটক রচনার অবসর তাঁর হাতে ছিলো না। আমার ধারণা, তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, সংস্কৃত, ইংরেজি অধ্যয়নের যে-সময় তালিকা পাঠিয়েছিলেন বন্ধুকে, সে তালিকা অনুযায়ী লেখাপড়া করার কর্মসূচীও বেশি দিন বজায় রাখতে পারেননি। উৎসাহের অভাব ছিলো না, সময়ের অভাব এবং পরিবেশের প্রতিকূলতাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫০ সালের ১২ জানুআরির পর কেবল *Rizia*-ই বন্ধ হলো না, প্রকৃত পক্ষে, নতুন রচনা প্রকাশই প্রায় বন্ধ হলো। কিন্তু তিনি যে শুধু একজন পত্রিকা লেখক নন, তিনি যে একজন কবি, তার প্রমাণ তিনি দিতে থাকেন কলকাতায় প্রকাশিত পুরোনো কোনো কোনো কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে। এসব রচনার মধ্যে একটি ছিলো King Porus। তা ছাড়া, তিনি ডিএলআর এবং শশিচন্দ্র দত্তের কবিতাও পুনঃপ্রকাশ করেছিলেন।[৭৯]

ওদিকে, সন্তান জন্ম দেবার পর, রেবেকার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিলো। অতঃপর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় এবং স্বজনদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করার জন্যে রেবেকা বেড়াতে যান উত্তরে (জন্মস্থান নাগপুরে?), সম্ভবত ফেব্রুআরি মাসের শেষ দিকে। এক বছর সাত মাসের মধ্যে রেবেকার সঙ্গে এই প্রথম বিচ্ছেদ। আদরের শিশুকন্যার সঙ্গেও। কবির এই বিচ্ছেদের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে On the Departure of My Wife and Child to the Upper Provinces নামে একটি কবিতায়। কবিতাটি বের হয় ৯ মার্চের (১৮৫০) *Eurasian*-এ। সেই বেদনাই প্রতিফলিত হয়েছে এই একান্ত ব্যক্তিগত কবিতায়। কবি বলেছেন:

> My home is lonely - for I seek in vain
> For them who made its star-light: there's a cry
> Of anguish fiercely wrung by untold pain
> E'en from heart of heart's! Hear it on high!

কেবল যে স্ত্রী এবং সন্তানের জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তা-ই নয়, তিনি বিধাতার কাছেও প্রার্থনা জানিয়েছেন তাঁদের জন্যে। তিনি বলেছেন, 'হে স্বর্গীয় পিতা, তোমার কাছেই আমরা ফিরে যাই, তবে আমাদের আনন্দের মুহূর্তে নয়, বরং আমাদের প্রগাঢ়তম দুঃখের দিনে। তুমি আমাদের দুঃখের কথা শোনো এবং আমাদের যন্ত্রণাকে মোচন করো।'

> O Mercy throned thou, whose eyes of light
> Aye beam with sleepless love - to thee I kneel
> For them - the lov'd - the loving! yes to thee,
> O Lord - our God of glorious majesty.

রেবেকার সঙ্গে কবির এই প্রথম বিচ্ছেদ দেখা দিলেও, এই বিচ্ছেদের সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা পরে চিরবিচ্ছেদের সূচনা করেছিলো। কিন্তু সে সম্পর্কে রেবেকা অথবা মাইকেল কেউই তখন অবগত ছিলেন না। রেবেকা উত্তর দিকে যাত্রা করার কয়েক সপ্তাহ পরে — ১১ এপ্রিল তাঁর ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী কিশোরী হেনরিয়েটার মা মারা যান মাত্র ৪০ বছর ১১ মাস বয়সে।[৮০] আমরা পরে দেখতে পাবো, এই মৃত্যুর ঘটনা দু-তিন বছর পরে হেনরিয়েটার সঙ্গে কবির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করেছিলো — যদিও এই মৃত্যুর সময়ে তাঁরা পরস্পরকে চিনলেও ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন কিনা, তা বলা যাচ্ছে না। অন্তত তাঁদের মধ্যে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা তখনো দেখা দেয়নি। সে যাই হোক, ঠিক

কতো দিন পরে রেবেকা ফিরে আসেন, আমাদের জানা নেই – জুন মাসের আগেই। কারণ এই মাসে তিনি দ্বিতীয় বার গর্ভবতী হন।

পত্রিকা চালাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু কবির প্রধান আয়ের উৎস ছিলো অরফ্যান অ্যাসাইলামের শিক্ষকতা। ১৮৫০ সালের এপ্রিলে তিনি ছিলেন অ্যাসাইলাম স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তখন স্কুলের কোনো স্থায়ী প্রধান শিক্ষক ছিলেন না। স্কুলের পরিচালকরা এ কারণে বিলেত থেকে একজন শিক্ষক নিয়ে আসার কথা চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। *Madras Circulator*-এ এই রকম একটা সংবাদও প্রকাশিত হয়েছিলো। মাইকেল এটাকে তাঁর পদোন্নতির এবং উচ্চতর বেতনের প্রতি একটা হুমকি বলে বিবেচনা করেন। তিনি একে নীরবে মেনে নিতে চাইলেন না। সে জন্যে, *Eurasian*-এর ২৯ এপ্রিলের সংখ্যায় এই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করলেন। তিনি লিখলেন:

> একজন ইরেশিয়ান শিক্ষকের জায়গায় একজন য়োরোপীয়ান শিক্ষক নিয়োগের ঔচিত্য সম্পর্কে আমি শুধু প্রশ্নই করছিনে, আমি আপোশহীনভাবে এর বিরোধিতা করছি। এ স্কুলটি হলো বিশেষ করে একটি পূর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। তা হলে এই স্কুলের শিক্ষককে একজন য়োরোপীয়ান হতে হবে কেন? যাঁরা চামড়ার রঙের পার্থক্যের কাছে নতি স্বীকারের শোচনীয় ক্রোধের আগুন জ্বালানো অব্যাহত রাখেন, সেই অবলুণ্ঠিত মোশাহেবি এবং মানসিক দাসত্বের নিন্দা করার মতো কঠোর ভাষা আমাদের জানা নেই।[৮১]

এই বক্তব্যে যে-তিক্ততা প্রকাশ পেয়েছে, তা থেকে মনে হয়, মাইকেল চোস্ত্ ইংরেজি-জানা লোক হলেও, তাঁর প্রতি বর্ণবাদী আচরণ কম লক্ষ্য করেননি। কলকাতা এবং মাদ্রাস, বস্তুত, উভয় জায়গায় কালো চামড়ার লোকদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা এবং অবিচারের বহু দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছিলেন। কখনো কখনো নিজেও তার ভুক্তভোগী হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে বেশ কয়েকজন ইংরেজ শিক্ষক ছিলেন; কিন্তু, অনুমান করি, তাঁদের কারো মনের গভীরে বর্ণবিদ্বেষ থাকলেও প্রকাশ্যে তাঁরা তা দেখাতেন না। কিন্তু বিশপস কলেজে চামড়ার রঙ ভেদে পোশাক এবং পানীয়ের পার্থক্য করা হতো বলে তাঁর জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন। পোশাক নিয়ে মাইকেলের সঙ্গে যে-তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিলো, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তার বর্ণনা দিয়েছেন।[৮২] (এই গল্পের কোনো ভিত্তি আছে কিনা বলা মুশকিল। বিশপস কলেজের কাগজপত্রের মধ্যে এর কোনো উল্লেখ দেখতে পাইনি – যদিও এ ধরনের অন্য একটি বর্ণবাদী ঘটনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। তা ঘটেছিলো তরুণ মাইকেল সে কলেজে ভর্তি হবার আগে।) এই কলেজের ছাত্রদের তালিকায় সব সময়ে সম্প্রদায়ের উল্লেখ থাকতো। ছাত্রদের বর্ণ অনুযায়ী তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হতো – ইংরেজ, ইউরেশিয়ান আর নেটিভ। কলেজের অধ্যক্ষ উইদার্স এবং অধ্যাপক রেভারেন্ড স্ট্রীট যতো জায়গায় কবির নাম উল্লেখ করেছেন, তার কোথাও মাইকেল বলেননি। ছাত্রদের তালিকায়ও কোথাও তাঁর নাম মাইকেল নয়। সর্বত্র তিনি মধুসূদন ডাট। এ থেকে সে কলেজে এক ধরনের সূক্ষ্ম বর্ণবিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বর্ণবৈষম্যের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে এই প্রথম নয়। তদুপরি, তাঁর নিজের জীবিকার প্রতি হুমকি লক্ষ্য করে তিনি একটু বেশি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। নিজের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন:

> এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব যাঁর ওপর অর্পিত রয়েছে মননশীলতা, প্রতিভা এবং কর্মশক্তির দিক দিয়ে তিনি কোনো য়োরোপীয়ানের তুলনায় ছোটো নন। তা ছাড়া, ব্ল্যাকটাউনের মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামের তুলনায় যেসব স্কুলের লক্ষ্য অনেক উঁচু তিনি সেখানে কাজ করার উপযুক্ত।[৮৩]

অনুমান করি, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে অ্যাসাইলামের পরিচালকমণ্ডলীরও তিক্ততা হয়ে থাকবে। তবে অনেক উঁচু দরের স্কুলে কাজ করার উপযুক্ত হলেও, পরবর্তী দু বছর তিনি অ্যাসাইলাম স্কুলে পড়ে থাকতেই বাধ্য হন। তিনি যে-ধরনের স্কুলের কথা বলেছিলেন, মাদ্রাসে তেমন স্কুল একটাই ছিলো এবং জর্জ নর্টনের সুপারিশ এবং ভালো মানুষ হেডমাস্টার থাকা সত্ত্বেও সেখানে তখনকার মতো কোনো

চাকরি তিনি পাননি।

অরফ্যান অ্যাসাইলামে দু-চারটি ভালো ছাত্র ছিলো; কিন্তু অযত্নে লালিত অনাথ সন্তানদের বেশির ভাগের লেখাপড়ার মান ছিলো নগণ্য। সে জন্যে, এ স্কুলে পড়িয়ে তিনি যে-দারুণ আত্মতৃপ্তি পেতেন, এমনটা মনে করার কারণ নেই। আমার ধারণা, জীবিকার খাতিরেই এ কাজ করছেন বলে তিনি মনে করতেন। *Eurasian*-এ লিখে তিনি কতোটা আনন্দ পেতেন, তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে কবি। সাংবাদিকতার জন্যে আবশ্যিক পারিপার্শ্বিক জীবনের চলতি ঘটনাবলীর প্রতি তাঁর সত্যিকার আগ্রহ কতোটা ছিলো, আর কতোটা বাধ্য হয়ে সে সবের খোঁজখবর নিতেন, তা জানার উপায় নেই। তবু পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যে-পরিচিতি এবং সম্মানের যোগ রয়েছে, তিনি তা থেকে যদি কোনো সান্ত্বনা এবং সন্তোষ পেয়ে থাকেন, তা হলে অবাক হবো না। পত্রিকা পরিচালনার কাজ তিনি খুব যোগ্যতার সঙ্গে করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর এই যোগ্যতার কারণে *Eurasian* পত্রিকা টিকে যায়। এ সময়ে — পত্রিকার মালিক ভাবলেন *Eurasian* পত্রিকাকে তিনি কেবল ইউরেশিয়ানদের জন্যে না-রেখে আর একটু বৃহত্তর ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবেন। তাতে পাঠক এবং ক্রেতাসমাজের পরিধি সম্প্রসারিত হবে। পত্রিকাটির নাম সে জন্যে তিনি পরিবর্তন করলেন। ১২ জুন (১৮৫০) থেকে এ পত্রিকার নাম হলো *Eastern Guardian*। এ ছাড়া, তিনি দেশীয়দের জন্যে চালু করলেন একটি নতুন পত্রিকা। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে *Madras Hindu Chronicle* নামে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকারও সম্পাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মাদ্রাসে তখন দেশীয়দের উদ্যোগে একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো বটে, কিন্তু সেসব পত্রিকাকে কোনো প্রামাণ্য পত্রিকা বলে গণ্য করা যেতো না। অথচ নব্যশিক্ষিত দেশীয়দের মধ্যে ভালো একটি ইংরেজি পত্রিকার চাহিদা ছিলো। এটা বিবেচনা করে সিমকিন্স *Madras Hindu Chronicle* প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। মাইকেল একই সঙ্গে ইউরেশিয়ান এবং দেশীয়দের সমস্যা সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলে সিমকিন্স আরও ভরসা পান। তা ছাড়া, *Madras Circulator* এবং *Spectator* প্রকাশিত হতো প্রতি সোম, বুধ আর শুক্রবার। *Athenæum* প্রকাশিত হতো মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবার। অ্যাবেল সিমকিন্সের *Madras Advertiser* প্রকাশিত হতো সোম আর বৃহস্পতিবার। তবে এ পত্রিকা ছিলো প্রধানত বিজ্ঞাপনেরই পত্রিকা। *Eurasian* বের হতো প্রতি শনিবার। দেখা যাচ্ছে, সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে একমাত্র বৃহস্পতিবারই একটি মাত্র পত্রিকা প্রকাশিত হতো। অনেকটা সেই অভাব পূরণ করার উদ্দেশ্য এই দিনটিতে *Madras Hindu Chronicle* প্রকাশের ব্যবস্থা হয়।

দোসরা অক্টোবর (১৮৫০) এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যা থেকেই সম্পাদক উঁচু মানের পরিচয় দেন। পত্রিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে *Athenæum* পত্রিকা তার খুব প্রশংসা করে একটি খবর ছাপে। এতে বলা হয়:

> এ সপ্তাহে *Madras Hindu Chronicle* নামে একটি নতুন সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে যে-মৌলিক নিবন্ধগুলো এবং উদ্ধৃতিসমূহ রয়েছে, তা থেকে এই নতুন পত্রিকার মতামত এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা অনুকূল ধারণা তৈরি হবে।[৮৪]

মাইকেল দেড় বছর এই পত্রিকা যোগ্যতার সঙ্গে চালিয়েছিলেন এবং সম্পাদক হিশেবে মাদ্রাসের সাংবাদিক মহলে যথেষ্ট সুনাম এবং স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন মাদ্রাস স্কুলে চাকরি নেবার কারণে এই পত্রিকার কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছিলো, তখন *Athenæum* যে-মন্তব্য করেছিলো, তা থেকে সম্পাদক হিশেবে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। *Athenæum*-এ *Daily News*.

Crescent এবং *Examiner*-এর সমালোচনা করে লেখা হয়েছিলো:

> ...there is but one paper, the *Hindu Chronicle*, which has any pretensions to merit; and the public will regret to learn that it is likely to be discontinued.
>
> Mr Dutt became a writer from the sheer force of ability; and has lapsed into a school master from the force of circumstances. His mental power partakes so much of the nerve and energy of the Saxon spirit, that the distant contemporaries have expressed doubts as to the paternity of the articles in the *Hindu Chronicle*.[৮৫]

Madras Hindu Chronicle পত্রিকায় তিনি যেসব লেখা লিখতেন, তাদের মান এতো উঁচু ছিলো যে, সেগুলো তাঁর লেখা কিনা, তাই নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতো। — এই মন্তব্য থেকেই পত্রিকার মান সম্পর্কে অভ্রান্ত ধারণা জন্মে। বস্তুত, তিনি এই পত্রিকা যে দক্ষতার সঙ্গে চালাতে পেরেছিলেন, *Athenæum* পত্রিকার মন্তব্য থেকে বারবার তার প্রমাণ পাওয়া যায়। *Athenæum* যে সব সময়ে তাঁর সঙ্গে একমত হতো, তা নয়। যেমন, চার্লস নেপিয়ারের সমালোচনা প্রসঙ্গে এ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর বচসা হয়।[৮৬] এর কদিন পরে তিনি তাঁর অ্যাংলো-স্যাক্সন-প্রীতির নমুনা রেখে এক নিবন্ধে লেখেন যে, কোনো কোনো য়োরোপীয় ভারতবর্ষের অবিমিশ্র প্রশংসা করেন; কিন্তু তা আদৌ বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁরা তা করেন নিতান্ত আদর্শবাদী এবং মোহের দৃষ্টি দিয়ে।

Athenæum পত্রিকা সঙ্গে সঙ্গে এর সমুচিত সমালোচনা করে। প্রসঙ্গত এ পত্রিকা উল্লেখ করে ভারতবর্ষের মেয়েদের আনুগত্য এবং আন্তরিক ভালোবাসার কথা।[৮৭] মাইকেল লিখেছিলেন, ইংরেজরা সিপাহিকে সিপয় বলে — এই বিকৃতি অর্থহীন। *Athenæum* এই সমালোচনা মেনে নিতে পারেনি।[৮৮] মোট কথা, তাঁর সঙ্গে এ রকমের মতভেদের অনেক প্রমাণ *Athenæum*-এ পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, *Athenæum* যখন *Hindu Chronicle* পত্রিকার কথা উল্লেখ করেছে, তখনই বিশেষ সমীহ করে উল্লেখ করেছে। মাইকেল যে অন্য সম্পাদকদের তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী এবং যথেষ্ট সামর্থ্যের অধিকারী, এই পত্রিকার বহু মন্তব্য থেকে তার আভাস পাওয়া যায়।

তিনি ভালো সম্পাদক ছিলেন — তার আর-একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় পত্রিকা প্রকাশিত হবার পরের বছর। অ্যাবেল সিমকিন্স এ সময়ে মিলিটারি বোর্ডে ভালো চাকরি পেয়ে তাঁর ব্যবসা এবং পত্রিকা ছেড়ে দেন। তখন তাঁর কাছ থেকে *Madras Hindu Chronicle* কিনে নেন সি. এম. পেরেরা আর *Madras Advertiser* এবং *Eastern Guardian* কিনে নেয় লরেন্স অ্যান্ড কম্পেনি। *Madras Hindu Chronicle*-এর নতুন মালিকও কবির হাতে পত্রিকার দায়িত্ব বহাল রাখেন। তবে *Eastern Guardian*-র সঙ্গে এর পর তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিলো বলে মনে হয় না। কারণ *Athenæum* পত্রিকায় একই বিষয় নিয়ে একই সংখ্যায় *Madras Hindu Chronicle*-এর সম্পাদকের প্রশংসা এবং *Eastern Guardian*-এর সম্পাদকের সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়।

তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পত্রিকা পরিচালনা করতে পেরেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু পত্রিকায় তিনি কী লিখতেন? *Madras Hindu Chronicle* থেকে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখা উদ্ধার করেছেন সুরেশচন্দ্র মৈত্র এবং বীরেশ চট্টোপাধ্যায়। তা থেকে চলতি ঘটনা সম্পর্কে কবির সচেতনতা, সমালোচনা করার ব্যাপারে তাঁর সাহস এবং তাঁর স্পষ্টবাদিতার নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়। 'Native Education' নামে একটি নিবন্ধে তিনি গভর্নরের দুজন উপদেষ্টার ধারালো এবং ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা করে লেখেন:

> পরম শ্রদ্ধেয় গভর্নরের মাননীয় সহকর্মীরা উভয়ই দেশীয়দের শিক্ষিত করে তোলার বিরোধিতা করেন — তবে আলাদা আলাদা কারণে। একজন, যাকে বলা হয় সরকারী শিক্ষা পদ্ধতি, সে সম্পর্কে আপত্তি করেন, কারণ

> তার মধ্যে বাইবেল শেখানোর কোনো সংস্থান নেই। অন্য জনের আপত্তির কারণ, তাঁর প্রভুদের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার খাতিরে তাঁদের দাসদের জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল খাওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

এরপর তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার কতোটা ব্যবস্থা থাকা উচিত, বাইবেল শিক্ষার কোনো দরকার আছে কিনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে যিনি শিক্ষা দেবার ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন, তাঁর বক্তব্য তিনি এক কথায় উড়িয়ে দেন: all that we can say is that we wish him - a pleasant morning!। তিনি আরও বলেন: The people of this country must be educated.[৮৯]

বিধবাদের অথবা স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীদের বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রমতে হতে পারে কিনা, তা নিয়ে ১৮৫১ সালে তিনি যে-মতামত *Madras Hindu Chronicle*-এ প্রকাশ করেন, তার মধ্যে কোনো প্রগতিশীলতা নেই। বরং পুনরায় স্বামী গ্রহণ করার সপক্ষে যে-শ্লোক আছে, কলিযুগে তা অচল — এ কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছেন।[৯০] কিন্তু ১৮৫৫ সালে যখন বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্যে রক্ষণশীল আর প্রগতিবাদীদের মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলছিলো, তখন তিনি আইন পাশ করার পক্ষ সমর্থন করেছেন। *Spectator* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে তিনি রক্ষণশীলদের বিরোধিতার উল্লেখ করে বলেছেন যে, সরকার এ বাধা নিশ্চয় অগ্রাহ্য করবে। তিনি আশা করেছেন: যে-সরকার সতীদাহ নিষিদ্ধ করেছে, আইন পাশ করে ধর্মান্তরিতদের উত্তরাধিকার রক্ষা করেছে, মিশনারিদের স্কুলে অর্থ সাহায্য দিয়েছে এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে — সে সরকার রক্ষণশীলদের বিরোধিতায় বিচলিত হবে না। প্রসঙ্গত বঙ্গদেশ এবং মহারাষ্ট্রে এ আইন প্রণয়ন করার পক্ষে এবং বিপক্ষে আন্দোলন কতোটা এগিয়েছে, তিনি সে কথাও লিখেছিলেন।[৯১]

১৮৫২ সালের জানুআরি মাসে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি *Hindu Chronicle* একটি নিবন্ধে যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে মুসলমান রাজত্বের সমালোচনা থাকলেও, সত্যের অথবা সাহসের অভাব ছিলো না। মুসলমান রাজত্বের সমালোচনা করে অন্য একটি পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। এই লেখার সমালোচনা করে তিনি লেখেন, ইংল্যান্ডের ইতিহাস আলোচনা করলে যে-অষ্টম হেনরি অথবা তাঁর কন্যাকে দেখতে পাই, সে কি কোনো যুগের চেয়ে কম অগৌরবের? তারপর তিনি বলেন:

> লীডেনহলের শাসনে ভারতের অবস্থা যেমনটা দাঁড়িয়েছে, তার চেয়ে মুসলমান আমলে ভারতের সমৃদ্ধি বেশি ছিলো। স্যার চার্লস এই সত্যকে লুকিয়ে রাখতে চাইতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস তাঁর বিপক্ষে।[৯২]

এই রচনায় সমকালীন ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় মুসলিম আমলকে ভালো বলার মাধ্যমে তিনি ইংরেজ এবং শিক্ষিত হিন্দু উভয় মতকেই চটিয়ে দিয়েছিলেন। *Athenæum* পত্রিকা, যা সব সময়ে তাঁর উদারতা এবং প্রগতিশীলতার প্রশংসা করতো, সে পত্রিকাও এই নিবন্ধের সমালোচনা করেছিলো।[৯২] কিন্তু এই রচনায় তাঁর অসাম্প্রদায়িকতা এবং সৎসাহস অনায়াসে চোখে পড়ে।

১৮৫১ সাল তাঁর জীবনে কম ঘটনাবহুল ছিলো না। এ বছরের প্রথম দিকে তাঁর মা মারা যান। তিনি মায়ের প্রথম সন্তান হলে, তাঁর বয়স ৪২/৪৩ বছরের বেশি হয়েছিলো বলে মনে হয় না। খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে মধু তাঁর বাবামার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন; কাব্যদেবীর সাধনা করতে হলে বাবামাকে ত্যাগ করতে হবে, এ বিশ্বাসও তাঁর প্রবল ছিলো; তার ওপর, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি সেকালের বিবেচনায় 'সুদূর' মাদ্রাসে ছিলেন; তদুপরি নিজের সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে নতুন জীবন পরিচালনা করছিলেন। তা সত্ত্বেও, মায়ের মৃত্যুর খবর তাঁকে কম বিচলিত করেনি। এ খবর গৌরদাস তাঁকে দেননি। দিয়েছিলেন তাঁর পিতা — দায়িত্ববোধের দরুন, না জাহ্নবী দেবীর শেষ

অনুরোধ পালন করতে গিয়ে, এখন আর জানার উপায় নেই। খবর পেয়ে নিজের আর্থিক সচ্ছলতা না-থাকা সত্ত্বেও মধু একবার কলকাতায় না-গিয়ে পারলেন না। মাদ্রাস থেকে ফিরতি টিকিটের দাম ক্যাবিনে ভ্রমণ করলে দু শো টাকার চেয়েও বেশি — তাঁর তখনকার প্রায় তিন মাসের বেতন। এমতাবস্থায় তিনি কী ভেবেছিলেন অথবা কিভাবে সমস্যার সমাধান করেছিলেন, জানার উপায় নেই। তবে চার বছর পরে পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে বন্ধুকে যা লিখেছিলেন, তা আমাদের জানা আছে। তা থেকে মনে হয়, এই টাকা ব্যয় করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অংশত মায়ের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে, অংশত নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্যে, তিনি শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাবার সিদ্ধান্ত নেন। আসলে শৈশব থেকে মধু মায়ের যে-অসাধারণ স্নেহের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, বাঁধন আলগা হলেও, সেটা তিনি ভুলতে পারেননি। তিনি ঠিক কখন কলকাতায় যান, জাহাজের যাত্রীদের নাম থেকে তা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ১৮৫১ সালের যাত্রীদের তালিকায় তাঁর নাম কোথাও খুঁজে পাইনি। আমার ধারণা, ক্যাবিনে যাবার মতো টাকা তাঁর হাতে ছিলো না। তাই তিনি হয়তো ডেকের যাত্রী হিশেবে কলকাতায় গিয়েছিলেন। ডেকের যাত্রীদের নাম তালিকায় লেখা হতো না। বরং লেখা হতো: 'এতো জন নেটিভ', 'এতো জন সেপাই'। নতুন কোনো কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া না-গেলে, আজ আর জানার উপায় নেই, তিনি ঠিক কখন কলকাতায় গিয়েছিলেন। তবে ধারণা করি, মে-জুন মাসে।

অনুমান করা সম্ভব, কলকাতায় এসে তিনি অপরাধীর মতো তাঁর পিতার মুখোমুখী দাঁড়িয়েছিলেন। মাতার অকাল মৃত্যু এবং দুর্দশার জন্যে তিনি নিজেকে কতোটা দোষারোপ করতেন, বলা শক্ত। কিন্তু রাজনারায়ণ দত্ত তাঁদের জীবনে অনেক দুঃখের জন্যে মধুকেই দায়ী মনে করতেন। কলকাতার সেই অস্বস্তিকর পারিবারিক পরিবেশে তিনি সপ্তাহখানেকের বেশি থাকেননি। তাই যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিলেন, তেমনি ঝড়ের গতিতে মাদ্রাসে ফিরে যান। পিতার প্রতি কতোটা শ্রদ্ধা তাঁর অবশিষ্ট ছিলো, বলা শক্ত। এক সময়ে তিনি তাঁর লেখাপড়ার খরচ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেই তিক্ততার কথা তো মনে ছিলোই; তদুপরি পরপর তিনটি বিয়ে করে পিতা যে মায়ের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিলেন, সে অভিযোগ তাঁকে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেনি। তবে ১৮৫১ সালে তিনি যখন কলকাতা থেকে বিদায় নেন, তখন তিনি জানতেন না, পিতার সঙ্গে এটাই হবে তাঁর শেষ দেখা — যদিও সদ্য স্ত্রী মারা যাবার পরে শ্মশান বৈরাগ্যবশত তাঁর পিতার পক্ষে সেটা ভাবা অসম্ভব নয়। পিতার ঘরে তখন অবশ্য একাধিক স্ত্রী ছিলো। তখনো তিনি স্বর্গ আর উত্তরাধিকারী লাভের আশা ত্যাগ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। পুত্র লাভের জন্যে তাঁর এই প্রয়াসে তিনি কতো বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন, তা বোঝা যায় মাত্র তিন-চার বছরের মধ্যে একে-একে তিন-তিনটি বিয়ে করার ঘটনা থেকে। সন্তান না-হবার জন্যে রাজনারায়ণ তাঁর স্ত্রীদের দায়ী করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরা দায়ী ছিলেন, মনে করা শক্ত। কারণ, জাহ্নবী দেবী যখন মারা যান, তখনো তাঁর গর্ভ ধারণের বয়স চলে যায়নি। রাজনারায়ণ অকারণেই অতোগুলো বিয়ে করেছিলেন। অনুমান করি, একবার দ্বিতীয় বিয়ে করার পর তাঁর কোনো চক্ষুলজ্জা অথবা সঙ্কোচ ছিলো না।

এ যাত্রায় পরিচিতদের মধ্যে কবি কেবল রেভারেন্ড যদুনাথ ঘোষের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁরই কাছ থেকে গৌরদাস মাইকেলের এই সফরের খবর পান। তাঁদের বন্ধু স্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ কথা তাঁকে বলেছিলেন। এ খবর শুনে খুশি না-হয়ে তিনি আহত হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর অমন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা না-করে চলে যেতে পারেন, এটা তিনি ভাবতে পারেননি। সে জন্যে তাঁর অভিমান এবং অনুযোগ জানিয়ে তিনি ২৯ জুলাই তারিখে কবিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। 'তোমার কাজ

সেরে তুমি তোমার প্রিয় শহরে চলে গেছো। এটা শুনে আমি খুব দুঃখিত হয়েছি। কারণ আমার অবশ্যই পুরোপুরি প্রত্যাশা ছিলো, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেবে। ... বোঝা যায়, আমার প্রতি তোমার আদৌ কোনো ভালোবাসা নেই।'[১৩] এ চিঠি পেয়ে কবি তাঁর সম্পাদিত *Madras Hindu Chronicle* পত্রিকা বন্ধুর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন; কিন্তু তাঁর চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন কিনা, জানা যায় না।

১৮৫১ সালে কবির পারিবারিক জীবনে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো: দ্বিতীয় কন্যা ফীবির জন্ম। এই কন্যার জন্ম ৯ মার্চ তারিখে। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মে তিনি খুশি হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু আর-একটি সন্তানের জন্মের ফলে সংসারের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিলো — সেটা যে তাঁর কাছে সুখবর ছিলো না, তা বলা বাহুল্য। এই সন্তানের নামকরণের সময়েও রেবেকা আর মাইকেল তাঁদের বন্ধু এবং হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথা মনে রেখেছেন। অরফ্যান অ্যাসাইলামের সেক্রেটারি হিশেবে চার্লস কেনেট ছিলেন তাঁদের সবচেয়ে বড়ো মুরব্বি। প্রথম মেয়ের নামের সঙ্গে তাঁরা তাই কেনেট নাম জুড়ে দিয়েছিলেন। এবারে দ্বিতীয় মেয়ের নাম রাখতে গিয়ে ফীবি নামটা নিলেন চার্লস এগবার্ট কেনেটের সদ্য-বিবাহিত স্ত্রী ফীবির নাম থেকে। আর সালফেল্ট নামটি নিলেন পরিবারের আর-এক বন্ধু জে ডাবলিউ সালফেল্টের নাম থেকে। ফীবি কেনেট এবং জে ডাবলিউ সালফেল্ট দুজনই হাজির ছিলেন ফিবির ব্যাপটিজমের সময়ে।[১৪] তবে মায়ের মৃত্যু উপলক্ষে কলকাতায় যাওয়া-আসার অপ্রত্যাশিত খরচ ইত্যাদি কারণে ব্যাপটিজম করাতে অনেকটা সময় লেগে গেলো। জন্মের প্রায় পাঁচ মাস পরে — তেসরা অগস্ট ফিবির ব্যাপটিজম হয়েছিলো। ব্যাপটিজমের জন্যে তখন সামাজিকতা ছাড়াও, রেজিস্ট্রি করাতে ১৭ টাকা এবং কেরানিকে আলাদা ৫ টাকা দিতে হতো।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তাঁর এই পারিবারিক উৎসবের ২০ দিন পরে — ২৩ অগস্ট শনিবার — চার্লস কেনেট মারা যান। তিন দিন পরের *Athenaeum* পত্রিকায় দেখতে পাই, তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যতো লোক হয়েছিলো, মাদ্রাসে তা অতি বিরল ঘটনা। তিনি যে গরিবদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং অ্যাসাইলামের সেক্রেটারি হিশেবে ৩০ বছর জনহিতকর কাজে প্রভূত অবদান রেখেছিলেন, তা-ও এ পত্রিকায় বলা হয়েছে।[১৫] ২৯ অগস্ট সন্ধ্যেয় অ্যাসাইলামের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবার তারিখ কেনেটই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি মারা যাওয়ায় সেই সভায় তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর নামে একটি তহবিল গঠন করা হয় অনাথ শিক্ষানবিশদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে।[১৬]

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে রেবেকা তৃতীয় বারের মতো গর্ভবতী হন। তৃতীয় একটি সন্তানের সম্ভাবনা মাইকেলের অভাববোধকে তীব্রতর করে থাকবে। বস্তুত, অভাবের তাড়নায় তাঁর এ সময়টা ছিলো একেবারে নিষ্ফলা। ১৮৫০ সালেও তাঁকে মাঝেমধ্যে দু-একটা কবিতা লিখতে অথবা তা পত্রিকায় প্রকাশ করতে দেখি। কিন্তু ১৮৫১ সালে তিনি কিছু লিখেছিলেন, তার কোনো প্রমাণ নেই। সৃজনশীলতার বদলে এ সময়ে মাদ্রাস স্কুলে অথবা অন্য কোথাও একটা ভালো চাকরি পাওয়ার জন্যে তিনি তাঁর প্রধান মুরুব্বি জর্জ নর্টনকে অনুরোধ করেছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। নর্টন এ সময়ে তাঁকে একটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি কেন জুটিয়ে দিলেন না, বলা শক্ত। তা ছাড়া, কলকাতায় ফিরে তিনি আদালতে যে-ধরনের চাকরি করেছিলেন তেমন চাকরি অথবা তার চেয়ে ভালো চাকরি জর্জ নর্টনের অধীনে পাওয়া কঠিন হতো বলে মনে হয় না।

অর্থস্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন মাইকেলের কোনোদিন পূরণ হয়নি। অবশ্য তার জন্যে কেবল সীমিত সুযোগ এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম আয়ই দায়ী নয়, তাঁর অমিতব্যয়িতা এবং বেহিশেবি মনোভাবও কম

দায়ী ছিলো না। তবে মাঝেমধ্যে অর্থস্বাচ্ছন্দ্যের আশা ঝিলিক দিয়েছে বৈকি! ১৮৫২ সালের শুরুতে এমনি একটি সুসময়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। মাদ্রাস হাই স্কুল — যার তখনকার নাম ছিলো মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি[৯৭] — তার ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক, দ্বিতীয় টিউটর, মি এইচ বাওয়ার্স মাত্র ৩৪ বছর বয়সে, অবসর গ্রহণ করেন ৩১শে জানুআরি। তার পর তিনি চলে যান য়োরোপে। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং অ্যাডভোকেট-জেনরেল জর্জ নর্টন কবিকে স্কুলের হেডমাস্টার মি পাওয়েলের কাছে পাঠিয়েছিলেন আড়াই বছর আগে। এখন স্কুলের একটা শূন্য পদ দেখা দেওয়ায় তাঁকে সেখানে একটা চাকরি দেবার সুযোগ এলো। মার্চ মাসের ২৬ তারিখে পরিচালকমণ্ডলী গভর্নরকে যে-চিঠি লেখেন, তা থেকে জানা যাচ্ছে, তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে সেই শূন্য পদে একজন নেটিভ — মি ডাটকে মনোনীত করেছেন। তাঁর পরিচয় দিয়ে এঁরা বলেন, ইনি প্রথমে কলকাতার হিন্দু কলেজে এবং তারপর বিশপস কলেজে লেখাপড়া শেখেন। ধ্রুপদী এবং ইংরেজি সাহিত্যে এঁর পাণ্ডিত্য খুব উঁচু মানের, এবং বয়সে তরুণ হলেও শিক্ষকতায় তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।[৯৮]

আগেই দেখেছি, এয়ার বার্টন পাওয়েলকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক করে নিয়ে আসা হয়েছিলো ইংল্যান্ড থেকে। তাঁর সঙ্গে আরো তিনজন শিক্ষক প্রথম থেকেই কাজে যোগদান করেন — জর্জ জাইলস হোয়াইট, জে. ম্যাকলিশ আর অ্যাডাম এ. গর্ডন। ম্যাকলিশ ছিলেন ফিরিঙ্গি। কিন্তু গর্ডন আসেন ইংল্যান্ড থেকে — ১৮৪৬-৪৭ সালে। তিনি সেখানে এমএ পাশ করেন এবং সেই সঙ্গে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন লন্ডনের অদূরে একটি কলেজে। মাইকেলের চেয়ে বছর চারেকের বড়ো। আর জর্জ হোয়াইটের জন্ম লন্ডনের ফুলহ্যামে হলেও তিনি কতোটা লেখাপড়া শিখেছিলেন তা জানা যায় না। তবে তিনি ১৮২০ সালে মাদ্রাসে এসে মিলিটারি অ্যাসাইলাম স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক হয়েছিলেন।[৯৯] ১৮২৫ সালে তিনি মাদ্রাসেই বিয়ে করেছিলেন।[১০০] মাইকেল যখন মাদ্রাস স্কুলে কাজ করতে আসেন তখনো এই তিনজন শিক্ষক সেখানে কাজ করছিলেন। এঁদের মধ্যে অ্যাডাম গর্ডন ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক, বেতন ৩৫০ টাকা, আর জর্জ জাইলস হোয়াইট এবং ম্যাকলিশ ছিলেন যথাক্রমে প্রথম এবং তৃতীয় টিউটর, বেতন ২০০ টাকা। দ্বিতীয় টিউটর বাওয়ার্স য়োরোপ চলে যাওয়ায় পরিচালকমণ্ডলী সেই শূন্যপদে জানুআরি মাসের শেষে মাইকেলকে দ্বিতীয় টিউটর হিশেবে নিয়োগ করার সুপারিশ করেন। অন্য শিক্ষকরা সবাই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। তাঁর বেতন কর্তৃপক্ষ শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকদের মতো দরাজ হাতে নির্ধারণ করেনি। তাঁর বেতন ঠিক হয় মাত্র দেড় শো টাকা। ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে স্কুলে যে-শিক্ষকরা ছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা এবং বেতন দেখলেই বোঝা যায়, তাঁদের মধ্যে কারা য়োরোপীয়ান, আর কারা ইউরেশিয়ান অথবা মাইকেলের মতো কৃষ্ণাঙ্গ নেটিভ।

ওদিকে, মাইকেল মাদ্রাস স্কুলে চলে যাচ্ছেন দেখে, অ্যাসাইলামের পরিচালকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অরফ্যান অ্যাসাইলামের বয়েজ স্কুল ৮ মার্চ থেকে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হোক। বার্ষিক রিপোর্টে অবশ্য তাঁরা মিস্টার ডাট চলে যাচ্ছেন, এ কারণ দেখানননি। তাঁরা বরং বলেছেন যে, ১৮৫২ সালের ৮ মার্চ তারিখে অ্যাসাইলামের ফ্রী বয়েজ স্কুলের পরিচালকরা সিদ্ধান্ত নেন যে, বছরের গোড়ার দিকে বেকারিতে পাদ্রী টেইলার এবং তার আগের বছর অ্যাসাইলামের কাছে — পার্চারিতে একটি ফ্রী প্যারিস স্কুল খোলায় অ্যাসাইলামের বয়েজ স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অ্যাসাইলামে তখন যে জনা পঞ্চাশেক ছাত্রছাত্রী পড়ছিলো, তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় রেভারেন্ড টেইলরের ওপর।[১০১]

কবি মাদ্রাস স্কুলে ঠিক কোন তারিখে যোগ দিয়েছিলেন, তা জানা যায় না, তবে মার্চ মাসে। বয়েজ্ স্কুল বন্ধ হবার তারিখ (৮ মার্চ) এবং *Athenæum* পত্রিকার ৯ মার্চের সম্পাদকীয় থেকে মনে হয়, তিনি

মোটামুটি এর দু-চার দিনের মধ্যেই মাদ্রাস স্কুলে কাজ আরম্ভ করেন।

স্কুলে পড়িয়ে তিনি কতোটা আনন্দ পেতেন সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে মাদ্রাস স্কুলে তিনি কী পড়াতেন তা আমরা সংক্ষেপে দেখে নিতে পারি। প্রথম শ্রেণীতে (ওপরের দিক থেকে গুনলে) তিনি পড়াতেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াতেন ইতিহাস আর কবিতা। পাঠ্যবই-এর মধ্যে কলকাতার হিন্দু কলেজের ডিএলআর সম্পাদিত কাব্য সংকলন পড়ানো হতো। তৃতীয় আর পঞ্চম শ্রেণীতে তিনি পড়াতেন কাব্য আর ভূগোল। একটা সময়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াতেন কাব্য আর ইতিহাস। তিনি কেবল যে প্রচুর সাহিত্য পড়েছিলেন, তাই নয়; একটি কাব্য এবং নাটক প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং তিনি নিজেকে হয়তো সাহিত্য পড়ানোর যোগ্য শিক্ষক বলে বিবেচনা করতেন। অপর পক্ষে, তাঁর ইংরেজ সহকর্মীদের পক্ষে তাঁর যোগ্যতাকে খানিকটা ছোটো করে দেখা অসম্ভব নয়। এ নিয়ে মাঝেমধ্যে টানাপোড়েন হওয়াও স্বাভাবিক।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মাদ্রাস স্কুলে চাকরি পেয়ে তিনি নিশ্চয় খুশি হয়েছিলেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, তিনি নিশ্চয় নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন। *The Captive Ladie* ছাপা হওয়ার সময় থেকে তিনি এ চাকরির দিকে নজর রেখেছিলেন। অ্যাসাইলামের চাকরির তুলনায় এ চাকরি ছিলো অনেক সম্মানের এবং সেই সঙ্গে অনেক বেশি বেতনের। তদুপরি, তিনি আশা করেছিলেন, *Madras Hindu Chronicle*-এর কাজ থেকেও তাঁর নিয়মিত বাড়তি আয় বজায় রাখতে পারবেন। কিন্তু মানুষের আশা এবং বাস্তব ঘটনাবলী সব সময়ে একই পথে যায় না। তিনি একটা রূঢ় আঘাত পেলেন। যে-জর্জ নর্টনকে তিনি তাঁর প্রথম কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং যে-এয়ার বার্টন পাওয়েলকে তিনি খুব ভালো মানুষ বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, এখন তাঁর বাড়তি আয়ের পথে তাঁরা বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। স্কুল কমিটি তাঁকে জানিয়ে দিলো, স্কুলের কাজে যোগ দিলে তাঁকে পত্রিকার কাজ ছেড়ে দিতে হবে। তাঁরা কারণ দেখালেন যে, এই কাজ তাঁর স্কুলের কাজে বাধা দেবে। তাঁদের যুক্তি আদৌ খোঁড়া ছিলো না। কিন্তু তাঁর কাছে এটা বাড়া ভাতে ছাই-এর মতো মনে হলো।

স্কুল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত বদল করানোর ব্যাপারে তিনি যে তদবির করেছিলেন তার পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে। তাঁর বন্ধু কম ছিলো না। তাঁর হয়ে *Athenæum* পত্রিকা ৯ মার্চ তারিখে জোরালো সুপারিশ জানায় স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে। তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়। *Athenæum* যা লিখেছিলো তার খানিকটা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি।

> দেশীয় পত্রিকাগুলো মধ্যে *Madras Hindu Chronicle*-ই একমাত্র উঁচু মানের পত্রিকা। কিন্তু পত্রিকাটি এখন বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কারণ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মাইকেল ডাট পরিবেশের চাপে পড়ে মাদ্রাস স্কুলে চাকরি নিতে বাধ্য হচ্ছেন। স্কুল বোর্ড বলছে শিক্ষকতার সঙ্গে পত্রিকার কাজ করলে শিক্ষকতার কাজে ক্ষতি হবে। এটা ঠিক নয়। আসলে ক্ষতি হবে একটি দেশীয় পত্রিকার।

Athenæum-এ বাড়তি মন্তব্য করা হয় তাঁর মননশীলতা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে। এতে বলা হয়: পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে দেশীয় একজন মানুষও কতো বড়ো এবং সুশিক্ষিত হতে পারেন, মি ডাট তার একটা দৃষ্টান্ত। *Athenæum*-এর এই সুপারিশ সত্ত্বেও কবি *Madras Hindu Chronicle*-এ কাজ করার অনুমতি পাননি স্কুলের কাছ থেকে। আমার ধারণা, পত্রিকার সম্পাদক হিশেবে জনমতের ওপর প্রভাব বিস্তারের যে-হাতিয়ার তাঁর হাতে ছিলো, স্কুল কর্তৃপক্ষ সেটাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেনি। ১৮৫০ সালে অ্যাসাইলামে য়োরোপীয় শিক্ষক নিয়োগের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে তিনি *Eurasian* পত্রিকাকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন, অসম্ভব নয় যে, কর্তৃপক্ষ সেটাও মনে রেখেছিলো। স্কুলের কাজ নেওয়া ছাড়া তাঁর অবশ্য কোনো বিকল্প ছিলো না। মাদ্রাস স্কুলে তাঁর বেতন আগের স্কুলের তুলনায় এতো বেশি ছিলো যে, তিনি এই চাকরি না-নিয়ে পারেননি। তা ছাড়া, চাকরির স্থায়িত্বের কথাও তিনি

বিবেচনা করে থাকবেন। (১৮৫৩ সালের জানুআরি থেকে এই চাকরি সরকারী বলে বিবেচিত হয়।) সুতরাং অ্যাসাইলাম এবং *Hindu Chronicle*-এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি মাদ্রাস স্কুলে যোগ দিলেন।

মাদ্রাস স্কুলে কাজ আরম্ভ করে কবি দারুণ অর্থকষ্ট থেকে খানিকটা স্বস্তি লাভ করেছিলেন বলে অনুমান করাই সঙ্গত। তবে আয় যতোই বাড়ুক না কেন, অর্থের চাহিদা শেষ হবার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না। তা ছাড়া, পরিবারের আয়তন এবং সেই সঙ্গে ব্যয়ও বাড়ছিলো। স্কুলে চাকরি শুরু করার চার মাস পরে এবং বিয়ের চতুর্থ বার্ষিকী আসার পাঁচ দিন আগে তৃতীয় সন্তান উপহার দেন রেবেকা। প্রথম পুত্রের জন্ম হলো ২৬ জুলাই তারিখে। পুত্রের জন্মে মাইকেল এবং রেবেকা খুশি হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। দু মাস পুরো হবার আগেই তাঁরা পুত্রের ব্যাপটিজমের আয়োজন করেন। এই ব্যাপটিজম হয় ১৭ সেপ্টেম্বর। পুত্রের নাম দেওয়া হলো জর্জ জন ম্যাকট্যাভিশ ডাট।[১০২] তৃতীয় নামটি – ম্যাকট্যাভিশ – ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশের নাম থেকে নেওয়া। রেবেকার সত্যিকার বংশ নাম যদি ম্যাকট্যাভিশ হতো তা হলে পুত্রের নামের সঙ্গে ম্যাকট্যাভিশ নাম দেওয়ার দরকার হতো না। আর যদি পিতা এবং মাতা – উভয়ের বংশনাম ব্যবহার করার উদ্দেশ্য থেকে পুত্রের নামের সঙ্গে ম্যাকট্যাভিশ নাম দিতেন, তা হলে অন্য পুত্র এবং কন্যাদের নামের সঙ্গেও ম্যাকট্যাভিশ নাম লাগানো থাকেতো। কিন্তু আগেই দেখেছি, দু মেয়ের নামের সঙ্গে তাঁরা দিয়েছিলেন পারিবারিক বন্ধুদের বংশনাম। আর এর দু বছর পরে দ্বিতীয় পুত্র জন্ম নিলে তার নামের সঙ্গে ডাট ছাড়া অন্য কোনো বংশনামই দেওয়া হয়নি। কবি যে তাঁর নিজের পদ এবং সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সব সময়ে খুব সচেতন ছিলেন, জর্জের ব্যাপটিজমের দলিল থেকে তার খানিকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি চার্চের রেজিস্টারে তাঁর পরিচয় লেখান: মাদ্রাস স্কুলের শিক্ষক। কিন্তু আগের বছর যখন দ্বিতীয় কন্যার ব্যাপটিজম হয় তখন পেশা লিখিয়েছিলেন শুধু শিক্ষক। অ্যাসাইলামের কথা আর উল্লেখ করেননি। (অবশ্য সব ধর্মযাজক রেজিস্টারে এক রকম করে নাম-ধাম লিখতেন না। তাই এ থেকে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।)

স্কুলে যোগ দেওয়ার পর তুলনামূলকভাবে সচ্ছল অবস্থায় তিনি তাঁর রায়পুরমের বাড়ি ছেড়ে বাস করতে আরম্ভ করেন ভেপারি ক্যাসেলেটে। এই নিশ্চিন্ত এবং ব্যস্ততাবর্জিত পরিবেশে তিনি আবার কেন কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন না, সেটা বোঝা শক্ত। তিনি কি তখনো গোপনে পত্রপত্রিকার জন্যে বাড়তি লেখা তৈরি করতে ব্যস্ত, নাকি তিন-তিনটি সন্তান এবং সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তা এখন জানার উপায় নেই। এমনও হতে পারে যে, বেথুনের কঠোর মন্তব্য পাওয়ার পর থেকে তিনি ইংরেজিতে কবিতা লেখার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আবার বাংলায় কবিতা লেখার কথাও তখনো পর্যন্ত ভাবেননি। এ সময়ে মাদ্রাস স্কুলকে কেন্দ্র করে তাঁর নতুন বন্ধু পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিলো। সহকর্মীদের সঙ্গেও তাঁর ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিলো। তিনি প্রভাব বিস্তার করে এ সময়ে বন্ধু রিচার্ড নেইলরকে ভেপারি স্কুল থেকে মাদ্রাস স্কুলে নিয়ে আসেন।

সহকর্মীদের মধ্যে জর্জ হোয়াইটের সঙ্গে কবির আগে থেকেই বন্ধুত্ব হয়েছিলো। মনে হয় পারিবারিক পর্যায়েও তাঁদের মধ্যে যাওয়া-আসা আরম্ভ হয়েছিলো। এক সময়ে তাঁরা থাকতেনও একই পাড়ায় – রায়পুরমে।[১০৩] এঁদের পরিচয় হয়েছিলো কবি মাদ্রাস যাবার পরের মাসে – অরফ্যান অ্যাসাইলামের পরীক্ষা উপলক্ষে – ইতিপূর্বে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। জর্জ হোয়াইট অরফ্যান অ্যাসাইলামের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রতিটি বার্ষিক সভায় যোগ দিতেন এবং তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। যেমন, ১৮৪৮ সালের ৩০ অগস্ট যখন অ্যাসাইলামের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়, তখন জর্জ হোয়াইট তাতে কেবল যোগ দেননি, তিনি সভায় একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং সে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিলো।[১০৪] তা ছাড়া, মাসে মাসে তিনি

অ্যাসাইলামে এক টাকা করে চাঁদা দিতেন। (জর্জ হোয়াইট আরও একটি অনাথ তহবিলের পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই তহবিলের নাম ছিলো Madras Widows and Orphan's Fund।) কবি মাদ্রাস স্কুলে তাঁর সহকর্মী হবার পরে, তাঁদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক। তদুপরি, এর দু বছর আগে জর্জ হোয়াইটের স্ত্রী অ্যালাইজা মারা যাবার পর নিঃসঙ্গ জর্জ হোয়াইটের সঙ্গে তাঁর সঙ্গ ঘনিষ্ঠতা বাড়া অসম্ভব নয়। *Athenæum*-এর মন্তব্য থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, পারিবারিক কারণে বাধ্য হয়ে কবি মাদ্রাস স্কুলে চাকরি নেন। এই কারণটা প্রধানত আর্থিক। কিন্তু ভাগ্যের কী পরিহাস, অংশত মাদ্রাস স্কুলের চাকরি নেবার পরে স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে তাঁর যে সুখের সংসার ছিলো, তা চিরদিনের জন্যে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

জর্জ জাইলস হোয়াইটের অন্তত তিনটি সন্তান ছিলো – বড়োটি মেয়ে – অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সফাইয়া আর ছোটো দুটি ছেলে। ছেলেদের নাম উইলিয়াম জন টমাস হোয়াইট আর এডুইন আর্থার হোয়াইট। হেনরিয়েটার জন্ম ১৮৩৬ সালের ১৯ মার্চ,[১০৫] উইলিয়ামের জন্ম ১৮৩৭ সালের ৩১ জুলাই[১০৬] (বিয়ে ১৮৬৪ সাল) আর এডুইনের জন্ম ১৮৩৯ সালের ১০ এপ্রিল।[১০৭] মাইকেলের সঙ্গে এই তিন কিশোর-কিশোরীর পরিচয় হয়। ঠিক কখন তা সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের মা মারা যাবার পরে কবি তাদের বাড়তি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন বলে মনে হয়। উইলিয়াম, এডুইন এবং অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং তাঁদের প্রতি তাঁর এই সহানুভূতি আরো বৃদ্ধি পায় তিনি মাদ্রাস স্কুলে চাকরি নেবার পর। ওদিকে, স্ত্রী মারা যাবার পর তিন বছর পূর্ণ হবার আগেই ১৮৫৩ সালের ৭ ফেব্রুআরি জর্জ হোয়াইট দ্বিতীয় বার বিয়ে করে ফেললেন। স্ত্রী মরে গেলে আবার বিয়ে করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু যা প্রায় অসম্ভব ছিলো, তা হলো ৪৭ বছর বয়স্ক জর্জ হোয়াইট বিয়ে করলেন ১৬ বছর বয়স্ক এমিলি জেইন শর্ট নামে একটি কিশোরীকে। কন্যা হেনরিয়েটার ১৭ বছর বয়স হতে তখন বাকি ছিলো মাত্র ৪০ দিন। মধুসূদনের পিতাও মোটামুটি ঐ একই বয়সে পর পর তিনটি কিশোরী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। পার্থক্যটা এই যে, বাঙালি সমাজে ওর থেকে বেশি বয়সী মেয়েকে বিয়ে করা কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু জর্জ হোয়াইট নিজের অবিবাহিত কন্যার চেয়েও কম বয়সী একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন বেশি বয়সী মেয়ে অথবা মহিলা পাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। জর্জ হোয়াইট মনে মনে কতোটা অপরাধ বোধ করেছিলেন, আমার জানা নেই। তবে তিনি লাইসেন্স দিয়ে বিয়ে করার সময়ে নিজের বয়সের উল্লেখ না-করে বিয়ের দলিলে লিখেছিলেন 'of full age'.[১০৮]

এই বিয়ের পর হেনরিয়েটা এবং তাঁর ছোটো ভাই উইলিয়াম ও এডুইন অসুখী হন। বিশেষ করে, সমবয়সী বিমাতার সঙ্গে হেনরিয়েটার সম্পর্ক অল্পদিনের মধ্যে তিক্ত হয়ে ওঠে। কবিও তাঁর পিতাকে এমনি দ্বিতীয় (এবং তারপর তৃতীয় এবং চতুর্থ বার) বিয়ে করতে দেখেছিলেন এবং/অথবা শুনেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বিমাতা তাঁকে গঞ্জনা দিতে পারেননি; কিন্তু এসব অবস্থায় সংসারে যে-অশান্তি হয়, তার স্বরূপ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। এখন হেনরিয়েটা, উইলিয়াম ও এডুইনকে সেই দারুণ অশান্তির ভুক্তভোগী হতে দেখে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে দরদ উথলে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে তিনি যদি কান্নার জন্যে হেনরিয়েটাকে তাঁর কাঁধ এগিয়ে দিয়ে থাকেন, তা হলে অবাক হবার কিছু নেই। দুঃখকাতর হেনরিয়েটাও এই সহানুভূতি গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। বস্তুত, এই সহানুভূতি থেকে ক্রমে দু জনের মধ্যে প্রণয়সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওদিকে, জর্জ হোয়াইটের বিয়েকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসের ছোট্টো য়োরোপীয় সমাজে যে-কেলেঙ্কারী দেখা দিয়েছিলো, তা তাঁর কর্মস্থানেও প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এই বছর তিনি মাদ্রাস স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পেনশন নিতে বাধ্য হন। মনে হয়,

তিনি বেশি বয়সের জন্যে অবসর নেননি। কারণ, মাদ্রাস স্কুলে তাঁর চাকরি চলে যাবার পরে তিনি ঘরে বসে থাকেননি। ১৮৫৪ সালে তাঁকে প্রধান শিক্ষকের কাজ করতে দেখা যায় ভেপারি স্কুলে। আর মাদ্রাস স্কুলে তাঁর জায়গাতে প্রথম টিউটর হন জে এস জেনকিনস। এর পর কবির সঙ্গে জর্জ হোয়াইট এবং হেনরিয়েটার সম্পর্ক কী দাঁড়ায়, আমরা তা কেবল অনুমান করতে পারি।

ওদিকে, মাদ্রাস স্কুলের সম্প্রসারণের প্রশ্ন এবং অন্যান্য উপদলীয় কোন্দল উপলক্ষে জর্জ নর্টন এবং পরিচালকমণ্ডলীর অন্য পাঁচ জন সদস্য ১৮৫২ সালের ১২ জুলাই পরিচালকমণ্ডলীর সভা অনুষ্ঠানের পর ১৩ তারিখে পদত্যাগ করেন। এই স্কুলে যাতে সাধারণ পরিবারের ছেলেরা ভর্তি হতে না-পারে, তার জন্যে, যেমনটা আগেই লক্ষ্য করেছি, ছাত্রদের মাসিক বেতন ঠিক হয়েছিলো ৪ টাকা। কিন্তু

ROUTINE OF STUDIES IN THE HIGH SCHOOL.

No. of Teachers, including a Pupil teacher...... 7

Mr. G. G. White.............1st Tutor.
" M. Dutt.....................2d do.
" T. B. Peppin...............3d do.
" J. Nailer.....................4th do.
C. Teroovengadum Naidoo 5th do.
A. Narrain Row..............6th do.
" T. F. Johnson..............Writing Master.

No. of Scholars at the commencement of 1853...175
At the end of 1853,....141

Teachers	Subjects	Books	Remarks
	5th Class—20—16 Boys.		
Mr. G. G. White,	Reading History. Poetry. Geography. Arithmetic.	Murray's English Reader Pinnock's Goldsmith's History of England. Calcutta Poetical Reader, No. III. Symonds' Geography of India.	
C. Teroovengadum Naidoo,	Elements of Composition. Euclid. Algebra.	Williams' Symbolical Euclid. Pinnock's Algebra, Part II.	
Mr. T. F. Johnson,	Copy Writing.		
	4th Class—26—21 Boys.		
Mr. G. G. White,	Geography. Arithmetic.	Symonds' Geography of India.	
Mr. M. Dutt,	Reading. History. Poetry. Elements of Composition.	Murray's English Reader. Pinnock's Goldsmith's History of England. Calcutta Poetical Reader, No. III.	
C. Teroovengadum Naidoo,	Euclid. Algebra.	Williams' Symbolical Euclid. Pinnock's Algebra, Part I.	
Mr. T. F. Johnson,	Copy Writing.		
	3d Class—22—21 Boys.		
Mr. M. Dutt,	Poetry. Geography.	Gay's Fables. Goldsmith's Grammar of Geography.	
Mr. T. B. Peppin,	Reading and Spelling. History. Grammar. Arithmetic. Writing from Dictation.	Pinnock's Roman History. do. Murray's Abridged Grammar. Bonnycastle's Arithmetic.	
Mr. T. F. Johnson,	Copy Writing.		
	2d Class, Division B—32—22 Boys.		
Mr. J. Nailer,	Reading and Spelling. Writing from Dictation. Poetry. Geography. History. Grammar. Arithmetic.	Pinnock's Roman History. Gay's Fables. Goldsmith's Grammar of Geography. Pinnock's Roman History. Murray's Abridged Grammar. Bonnycastle's Arithmetic.	
Mr. T. F. Johnson,	Copy Writing.		
	2d Class, Division A—30—22 Boys.		
Mr. M. Dutt,	Poetry. Geography.	Gay's Fables. Goldsmith's Grammar of Geography.	
Mr. T. B. Peppin,	Writing from Dictation. Reading and Spelling.	Pinnock's Roman History.	

মাদ্রাস স্কুলের রুটিন

জর্জ নর্টনের মত অগ্রাহ্য করে ১৮৫৩ সালের পয়লা জানুআরি থেকে কলেজ শাখাতে দু টাকা আর প্রাইমারি শাখাতে এক টাকা বেতন নির্ধারিত হয়। ছাত্র সংখ্যার ওপর সঙ্গে সঙ্গে এর প্রভাবও পড়েছিলো। হাই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২২১-এ, আর প্রাইমারির ছাত্র সংখ্যা হলো ২৭৮।[১০৯] এই সংখ্যা আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। ১৮৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে, বস্তুত, স্কুলের কাঠামো রীতিমতো ঢেলে সাজানো হয়। এ সময়ে উচ্চতর শাখার জন্যে প্রিন্সিপাল করা

হয় এয়ার বার্টন পাওয়েলকে। আর স্কুলের প্রাইমারি শাখার প্রধান নিযুক্ত হন জে ম্যাকলিশ। ইতিহাসের অধ্যাপক হন অ্যাডাম গর্ডন। তখন তাঁর বেতন ৩৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়। মাসখানেক পরে বাওয়ার্সও দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিশেবে যোগদান করেন।[১১০] কবি এই পদটি পাবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু কার্যকালে তা পেলেন না। তাঁর বেতনও থেকে গেলো আগের মতো — দেড় শো টাকা। এর ফলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। নতুন কাঠামোয় স্কুলের কাজ শুরু হয় ১৮৫৩ সালের ১৫ জানুআরি।

এ সময়ে কবির বন্ধু রিচার্ড নেইলরকে স্কুলের চতুর্থ টিউটর হিশেবে নিয়োগ করা হয়। ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, এই নিয়োগের পেছনে তাঁর সুপারিশ কাজ করেছিলো। এবং করে থাকলে, এ থেকে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কয়েক মাসের মধ্যে তিনি তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে স্কুলে তাঁর আসন পাকা করে নিয়েছিলেন। তবে আসন যতোই পাকা হোক, তাঁর নিজের কোনো পদোন্নতি না-হওয়ায় অথবা বেতন না-বাড়ায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন। পরে তাঁর অসন্তোষ ধীরে ধীরে তীব্রতর হয়েছিলো। পাওয়েল বিএ এবং গর্ডন এমএ পাশ হলেও, জেনকিন্স অথবা বাওয়ার্সের কোনো ডিগ্রি ছিলো না। তবু তাঁরা কবির চেয়ে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বেতনও পেতেন বেশি। তাঁর এই অসন্তোষ শেষ পর্যন্ত বছর দেড়েকের মধ্যে তাঁকে মাদ্রাস স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। অথবা এমনও হতে পারে, যে এই অসন্তোষ থেকে সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং পরিণতিতে তিনি তাঁর চাকরি খোয়ান।

মাদ্রাস স্কুলে চাকরি শুরু করে জীবিকা অর্জনের দিক থেকে খানিকটা সুস্থির হয়ে কবি আবার কাব্যের জগতে ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু যাননি। তবে এই স্কুলে চাকরি করার সময়ে — ১৮৫৪ সালের গোড়ার দিকে তিনি একটি বক্তৃতা করেছিলেন, যা পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিলো ঐ বছর এপ্রিল মাসে। তিনি এই বক্তৃতাটি রচনা করার আগে এক গুরুতর দুর্ঘটনায় প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। এর ফলে বেশ কিছু দিন তাঁকে বাড়ির মধ্যে আটকা থাকতে হয়েছিলো। বক্তৃতাটি তিনি লেখেন সেই সময়ে।[১১১] এই পুস্তিকার নাম দেন *The Anglo-Saxon and the Hindu*, Lecture I। অসম্ভব নয় যে, তিনি এ বিষয়ে একাধিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ভাষণের বক্তব্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। তাঁকে যাঁরা হিন্দু হিশেবে দেখতে পছন্দ করেন, তাঁরা এই লেখাটিকে তাঁর ব্যতিক্রমী রচনা বলে বিবেচনা করেন। কারণ এঁর মধ্যে তিনি হিন্দু পুরাণ নিয়ে গর্ব করার মতো কোনো কথা বলেননি। বরং এর মধ্য দিয়ে তাঁর খৃষ্টানি মনোভাব এবং ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে তাঁর কবিতা এবং কাব্যের সঙ্গে এই মনোভাবের সাদৃশ্য নেই। সে জন্যে, শ্রীমধুসূদন এমন কথা বলতে পারেন দেখে তাঁর ভক্ত সমালোচকরা তাঁর এই রচনাটি অস্বীকার করতে পারলেই খুশি হন।

কিন্তু *The Anglo-Saxon and the Hindu* আদৌ অস্বীকার করার মতো রচনা নয়। কবিকে পুরো দেখতে চাইলে বরং এই রচনাটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়। তিনি যে একাধিক সংস্কৃতির মূল্যবোধ স্বীকরণ করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁর মধ্যে যে পরস্পর-বিরোধী মূল্যবোধ দেখা দিয়েছিলো, এ প্রবন্ধ থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এবং এটা এ বক্তৃতার উৎসর্গপত্রেও লক্ষ্য করা যায়। এই পুস্তিকাটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন জন হেনরি কেনরিক (১৮১৫-?)[১১২] নামে এক ভদ্রলোককে। মাদ্রাস পলিটেকনিকের সেক্রেটারি হলেও, জর্জ নর্টনের মতো কেনরিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন না। কবিও কোনো লাভের আশায় তাঁকে এই পুস্তিকা উৎসর্গ করেনি। এঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে

উঠেছিলো। সম্বোধন (My dear Kenrick) থেকে শুরু করে উৎসর্গপত্রের সর্বত্র এই বন্ধুত্বের ভাবটি লক্ষযোগ্য। বিগত দিনগুলোতে তাঁর কাছ থেকে যে-সহৃদয়তা এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছেন উৎসর্গপত্রের শেষ দিকে তিনি তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

> এই বক্তৃতাটি আপনার নামে উৎসর্গ করার অনুমতি দিন। আমার দুঃখ: এটা আপনার সম্মানের জন্যে যদি আরও মূল্যবান হতো! তবে আমি যখন চিন্তা করি যে, এটা লেখার সময়ে দারুণ শারীরিক কষ্টের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের জন্যে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি, তখন আমি এই লেখাটার প্রতি একটা সকৃতজ্ঞ পক্ষপাতের অনুভূতি লাভ না-করে পারিনে। আমি যখন একটা দুর্ঘটনায় প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিলাম এবং অনেক দিন গৃহবন্দী ছিলাম, তেমন একটা সময়ে এটি পরিকল্পনা এবং রচনা করি। এই রচনাটি নিখুঁত না-হলেও এটির নাম এমন একজনের নামের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরে ভালো লাগছে, যিনি যে-সম্প্রদায়ের সদস্য সেই সম্প্রদায়ের অলঙ্কারস্বরূপ, যে-দেশের অধিবাসী সে দেশের সম্মানস্বরূপ এবং যাঁর বন্ধুত্বে আমি গর্ব বোধ করি।

MADRAS UNIVERSITY. lxi

No. VI.

ESTABLISHMENT OF THE MADRAS UNIVERSITY AS ON THE 30th APRIL 1855.

Names.	Designation.	Amount of Salary.		
	COLLEGIATE DEPARTMENT.			
E. B. Powell Esq.	Principal	700	0	0
Do.	House-rent	80	0	0
A. A. Gordon, Esq	Professor	500	0	0
C. Teroovengadam Naidoo	Acting do.	100	0	0
	HIGH SCHOOL DEPARTMENT.			
J. S. Jenkins, Esq	1st Tutor	250	0	0
Mr. M. Datt	2d do.	150	0	0
„ W. Williams	3d do.	150	0	0
„ T. B. Peppin	4th do.	100	0	0
„ J. R. Naikor	5th do.	70	0	0
„ A. Dique	6th do.	50	0	0
„ L. Dique	7th do.	50	0	0
„ P. Vurdacharry	8th do.	40	0	0
	PRIMARY SCHOOL DEPARTMENT.			
Mr. J. McLeish	Head Master	200	0	0
„ C. D'Sena	1st Teacher	50	0	0
„ T. Gilles	2d do.	35	0	0
„ T. D'Vaz	3d do.	35	0	0
T. Bhagavantaram	4th do.	85	0	0
M. Abdool Rahaman	5th do.	25	0	0
Mr. T. F. Johoson	English Writing Master	50	0	0
do.	Librarian	15	0	0
„ E. Barnett	Assistant Writing Master	20	0	0
	VERNACULAR DEPARTMENT.			
Mr. W. Joyes	Tamil Superintendent	200	0	0
T. Vizagapermal Iyer	do. Head Master	70	0	0

মাদ্রাস স্কুলের শিক্ষকদের নাম এবং বেতন, জানুআরি ১৮৫৫

কেনরিক ছিলেন বিজ্ঞানে খুব উৎসাহী। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে মাদ্রাসে একাধিক বক্তৃতা করে-ছিলেন, যা নিয়ে দিনের পর দিন সেখানকার পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে। মাদ্রাসে টেলিগ্রাফ লাইন বসানো এবং বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মাদ্রাস পলিটেকনিকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও তাঁর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-প্রীতির পরিচয় দেয়। কিন্তু কবি বিশেষভাবে প্রশংসা করতেন তাঁর দেশপ্রীতির। কেনরিক ফিরিঙ্গি হলেও, বোঝা যায়, বিলেতকে নয়, নিজের দেশ বলে গণ্য করতেন ভারতবর্ষকে (স্বভাবতই ডিরোজিওর কথা মনে করিয়ে দেয়।) এবং কবি তাঁর এই মনোভাবকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। উৎসর্গপত্রে সে দিকে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে। প্রসঙ্গত বলা যায়,

তিনি নিজে এ ধরনের লোকদের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট বোধ করতেন। হিন্দু কলেজ-উত্তর তাঁর সব ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ফিরিঙ্গি। চার্লস এগবার্ট কেনেট, রবার্ট ওয়কার এবং রিচার্ড নেইলর — তিন জনই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। জর্জ ম্যানও ছিলেন মরিশাসের 'নেটিভ'। যে-বহুসাংস্কৃতিক শিক্ষা পেয়েছিলেন তাতে নিজেকে তিনি অনেক সময়ে ত্রিশঙ্কুর মতো বিবেচনা করতেন। তিনি না-পারতেন দেশীয়দের ভিড়ে মিশে যেতে, না-পারতেন য়োরোপীয়দের সঙ্গে একাত্ম হতে। (এমন কি, য়োরোপীয়রা তাঁকে দু হাত বাড়িয়ে নিতেনও না!) কেনরিকের মতো যে-স্বল্প সংখ্যক লোককে তিনি চিনতেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি ভাবনার মিতালি লক্ষ্য করতেন।

আগেই দেখেছি, খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর মানসিকতায় রীতিমতো পরিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ করেছিলো। এমন কি, তিনি মিশনারি হবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। তবে বিশপস কলেজ ছাড়ার পর খৃস্টধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকের প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস দুর্বল হতে আরম্ভ করে। কিন্তু হিন্দু সভ্যতার অবক্ষয় এবং ঐতিহ্যসর্বস্বতার তুলনায় খৃস্টধর্মের ঔদার্য এবং খৃস্টীয়-য়োরোপের আধুনিকতা তাঁর মন এবং মননশীলতাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলো। জীবনের বেশির ভাগ সময় খৃস্টান সমাজ এবং খৃস্টান জীবনসঙ্গিনীদের সঙ্গে বাস করার ফলেও তিনি চিন্তার দিক দিয়ে জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে হিন্দু সমাজ থেকে সরে গিয়েছিলেন অনেকটা দূরে। এ সমাজের বহু মূল্যবোধকে তিনি পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছিলেন বললেও যথেষ্ট হয় না। বস্তুত, ভারতবর্ষীয় অনেক কিছুকেই ঘৃণা করতে শিখেছিলেন। তাঁর সেই মনের অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায় এই বক্তৃতায়।

এতে তিনি বলেছেন, পশ্চিম থেকে ভারতবর্ষে যে-বিজয়ীরা এসেছে, তারা ভারতবর্ষের অবক্ষয়ী সভ্যতাকে উদারতা দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করবে। গৌরব এবং ক্ষমতায় তাঁরা বিজয়ী মোগলদের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ। সত্যি বলতে কি, সামরিক শক্তি এবং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে তারা আগেকার যে-কোনো সভ্যতার তুলনায় অনেক অগ্রসর। ইংরেজি সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। কিন্তু গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ভারতের কথা ক্ষণিকের জন্যে মনে করলেও, তাঁর সমকালীন হিন্দু সভ্যতার প্রতি তাঁর আন্তরিক বিতৃষ্ণা এবং অনুকম্পা চাপা থাকেনি।

> The Hindu! — Alas! Centuries of servitude and oppression; the predominance of a superstition, dismal and blasting; a fatal adherence to institutions whose cruel tendency ever it is to curb and to restrain the onward march of a man as a social, as an intellectual pilgrim, tracing round him a wizard ring, solemnly believed to be impassable — and violently repressing every inborn longing to be free; these alas! have rendered that name a name of reproach — an astonishment, a proverb and a byword among the nations!

তিনি হিন্দু এবং অ্যাংলো-স্যাক্সনের মধ্যে তুলনা করে বলেছেন, হিন্দু জাতি এখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত এবং তার দেবার কিছু নেই। এখন বিধাতা অ্যাংলো-স্যাক্সনকে পাঠিয়েছেন, এই অর্ধমৃত হিন্দুকে কবর থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে।

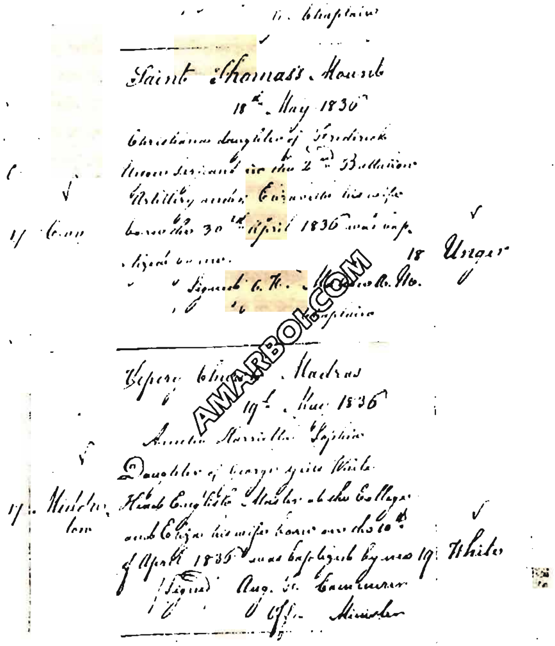
> ...it is the Solemn Mission of the Anglo-Saxon to renovate, to regenerate, to civilize, or in one word, to Christianize the Hindu!

অ্যাংলো-স্যাক্সনকে তিনি কেবল রেনেসান্স-উত্তর একটি আধুনিক শক্তি হিশেবে প্রশংসা করেন না, তার খৃস্টধর্মীয় পরিচয়কেও তিনি ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন।

> The Anglo-Saxon is the soldier of the Cross — the Crusader, who has come to the sunny East to carry on a bloodless, though a far more glorious war, than did the lion-hearted Richard, than did the puissant Edward — the first of that name.
>
> After quelling the obstinate antagonism, after crushing the stout resistance of

> European Paynimrie, the victorious gonfalon of the Cross is now unfurled before the mighty and vast citadel of Brahminism, and it is the hand of the Anglo-Saxon which must plant it on the embattled towers of that citadel.

বস্তুত, তাঁর এই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা এবং সে ধর্মকে হিন্দু ধর্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর মনে করার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়। অ্যাংলো-স্যাক্সন (কয়েক দশক পরে



Saint Thomas's Mount
18th May 1836
Christiana daughter of Frederick ... 2nd Battalion Artillery ... born the 30th April 1836 was baptized by me.
Signed C. H. ...
Chaplain
18 Unger

Vepery Church Madras
19th May 1836
Amelia Henrietta Sophia
Daughter of George Price White Head English Master at the College and Eliza his wife born on the 10th of April 1836 was baptized by me
Signed Aug. H. Caemmerer
Offg. Minister
19 White

হেনরিয়েটার ব্যাপটিজমে দলিল

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'বড়ো ইংরেজ') — তার প্রতি মাইকেলের এই মুগ্ধ দৃষ্টি পরবর্তীকালে অক্ষুণ্ন ছিলো কিনা, বা তাতে ঘা লেগেছিলো কিনা, সে আমরা যথাসময়ে দেখতে পাবো। কিন্তু খৃষ্টধর্মীয় উদারতা এবং কোনো কোনো মূল্যবোধের প্রতি তাঁর আস্থা ধীরে ধীরে আরো জোরদার হওয়া ছাড়া দুর্বল হয়নি।

মাদ্রাস স্কুলের শিক্ষকদের যে-তালিকা আগেই উদ্ধৃত হয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, ১৮৫৫ সালের ৩০ এপ্রিলও তিনি সে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু কাগজপত্রের অভাবে বলা যাচ্ছে না ঠিক করে

তিনি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেন অথবা ছাড়তে বাধ্য হন। ১৮৫৫ সালের পরবর্তী শিক্ষা পরিষদের যে-কটি বার্ষিক প্রতিবেদন দেখেছি, তার কোথাও তাঁর নাম খুঁজে পাইনি। নেইলরের নামও নয়। তার অর্থ ঐ বছরের ৩০ এপ্রিলের পরে কোনো এক সময়ে তাঁদের চাকরি চলে যায়। ঠিক এই সময়ে অসুস্থতার কারণে মি পাওয়েলও লম্বা ছুটিতে য়োরোপে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আপাতদৃষ্টিতে মাইকেলের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অনুপস্থিতে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন, অথবা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ওদিকে, ১৮৫৫ সালের ৬ মার্চ তারিখে *Spectator* পত্রিকা সপ্তাহে তিনবার প্রকাশের পরিবর্তে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। পত্রিকার নাম সামান্য বদলে রাখা হয় *Madras Spectator*। এই পত্রিকায় তিনি সহকারী সম্পাদকের কাজ পেয়েছিলেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন যে, নামে সহকারী সম্পাদক হলেও, আসলে সম্পাদকের কাজই করতেন তিনি। সেটা অসম্ভব নয়। কলকাতার তখনকার একটি পত্রিকায় তাঁকে *Spectator*-এর *নেটিভ এডিটর* বলে উল্লেখ করা হয়েছিলো।[১১৩] *Spectator*-এর চাকরি তাঁর খুব কাজে লেগেছিলো। মাদ্রাস স্কুলের চাকরি ছেড়ে এ কাজ না-পেলে তিনি নিঃসন্দেহে বিপদে পড়তেন। ওদিকে, *Spectator*-এর জন্যেও এটাকে একটা মওকা বলে বিবেচনা করা যায়। তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং যোগ্য সাংবাদিক মাদ্রাসে পাওয়া আদৌ সহজ ছিলো না, আবার দৈনিকে পরিণত হওয়ায় এমন একজন সাংবাদিক *Spectator*-এর জন্যে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিলো।

Spectator দৈনিক হিশেবে আত্মপ্রকাশের তিন দিন পরে কবি এবং রেবেকার চতুর্থ সন্তান – দ্বিতীয় পুত্র – মাইকেল জেমসের জন্ম হয়। বেচারা জুনিয়র মাইকেলের ব্যাপটিজম এক বছরের মধ্যেও হতে পারেনি।[১১৪] এই পুত্রের জন্মের অল্প দিন পরে কবি বেকার হয়েছিলেন কিনা, ঠিক বলা যাচ্ছে না। এমনও হতে পারে যে, চাকরি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং ঝামেলার দরুন পুত্রের জন্মের দু-চার মাসের মধ্যে ব্যাপটিজমের আনুষ্ঠানিকতা পালনের ব্যবস্থা করতে পারেননি। অথবা হতে পারে, সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন আর নতুন সন্তানের আবির্ভাবকে তেমন করে স্বাগত জানানোর মতো উৎসাহ পিতামাতার ছিলো না। কিন্তু কারণ যাই হোক, জুনিয়র মাইকেলের ব্যাপটিজম দেখা তার পিতার ভাগ্যে আর কোনোদিন ঘটে ওঠেনি।

Spectator-এর চাকরি আর সেই সঙ্গে 'চমৎকার স্ত্রী এবং চারটি সন্তানের' সংসার সাজিয়ে তিনি যখন বেশ গুছিয়ে বসেছেন, তেমন সময়ে – ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখ বুধবার তিনি হঠাৎ গৌরদাসের চিঠি পেলেন – চিঠিটি লেখা তাঁর সহস্র স্মৃতি-বিজড়িত খিদিরপুরের বাড়ি থেকে। গৌরদাস লিখেছেন

> কয়েক বছর পর তোমাকে লিখছি। তোমার এবং আমার যোগাযোগবিহীন নীরবতার মধ্য দিয়ে যে-দীর্ঘ সময় চলে গেছে, সেটাকে তোমার এবং আমার উভয়ের জন্যে একটা গুরুতর এবং নিন্দনীয় কর্তব্যচ্যুতি বলে বিবেচনা করি। এক মাত্র ভগবান জানেন, আমি কতোবার তোমার কথা মনে করেছি। আমার চিন্তা যদি কোনো ভাষা না-পেয়ে থাকে, তা হলে তার একমাত্র কারণ আমি জানতাম না তুমি কোথায় আছো। তুমি কেমন আছো, সে সম্পর্কেও কোনো কথা শুনতে পাইনি। সর্বত্র খুঁজেও হদিস পাইনি তুমি কোথায় আছো। ... আমি এখন তোমাকে লিখছি এমন একটা জায়গা থেকে যেখানে তুমি তোমার শৈশব এবং বাল্যকাল – না আমার বরং বলা উচিত – তোমার যৌবনের সবচেয়ে ভালো সময়টা কাটিয়েছো। আমি কেন এবং কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, সেটা আমি এক্ষুণি তোমাকে বলছিনে, তোমার উত্তর না-পাওয়া পর্যন্তই বলছিনে। ... আমি তোমার প্রতি একটা ভালোবাসা চিরদিন অনুভব করেছি, সে জন্যে তোমাকে ভুলে যেতে পারিনে। তোমার প্রতি ভালোবাসার প্রভা ম্লান হলেও ভালোবাসা চলে যায়নি। আবার হাওয়া দিলে দ্বিগুণ বেগে জ্বলে উঠবে, যদিও দীর্ঘকাল

> চলে গেছে এবং তোমার বাড়ি, তোমার পরিবার, বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন এবং আমার সঙ্গে তোমার দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তোমাকে না-লেখার একটা কৈফিয়ত যতো ছোটোই হোক, আমার তরফ থেকে আছে; কিন্তু তুমি যেমন তোমার নিজেকে চেনো, তেমনি আমাকে চেনো, আমার বাবাকে চেনো, আমাদের বাড়ি চেনো; তুমি চাইলে যেকোনো সময়ে আমাকে লিখতে পারতে। তা সত্ত্বেও, তুমি তেমন কিছু করা থেকে বিরত থেকেছো। এমন কি, তুমি একবার খোঁজও নাওনি, আমি বেঁচে আছি, নাকি মরে গেছি। ... এদিকে আমার স্ত্রী এখন স্বর্গে।

অনুমান করি, এ পর্যন্ত পড়ে মাইকেল পুরোনো বন্ধুর অভিমান দেখে বিব্রত হয়েছেন। কিন্তু খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন, তাঁর সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ হওয়ায় — যদিও বন্ধুর স্ত্রী মরে যাওয়ার খবরে দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু অমনটা এদেশে মোটেই বিরল নয়। তারপর চিঠিতে যা পড়লেন, তাতে অবশ্য তিনি চমকে উঠলেন:

> আমি দুঃখিত, তোমার পরিবার সম্পর্কে, বরং বলি তোমার বাবার পরিবার সম্পর্কে, ভালো কোনো খবর দিতে পারছিনে। তুমি বোধহয় অনেক আগেই শুনেছো যে, তোমার বাবামা উভয়ই এখন মৃত। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তোমার জ্ঞাতি ভাইয়েরা কাড়াকাড়ি করছে। তোমার দুই বিধবা বিমাতা বেঁচে আছেন। কিন্তু তোমার লোভী এবং স্বার্থপর আত্মীয়দের কাড়াকাড়ির জন্যে তাঁরা তাঁদের মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়েছেন।[১১৫]

যোগাযোগ যতোই বিচ্ছিন্ন হোক, পিতা নেই — এ খবর শুনে কবি একটা আকস্মিক রূঢ় আঘাতে বিচলিত হলেন। সেই তমলুক থেকে ফেরার পর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিলো। তারপর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ, বাড়ি ছেড়ে হস্টেলে থাকা, বাবার পুনর্বিবাহ, লেখাপড়ার খরচ বন্ধ করে দেওয়া — পরপর অনেক তিক্ত ঘটনাই মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মনে পড়ে থাকবে। কিন্তু সব ছাপিয়ে হয়তো মনে পড়েছিলো, শৈশব, বাল্য আর কৈশোরের কথা। চলচ্চিত্রের মতো এক ঝাঁক সুখস্মৃতি দ্রুত মনের পর্দার ওপর একের পর এক ভেসে ওঠাই স্বাভাবিক — বাবা যে কী ভালোবাসতেন! আর বাবার কথা বলতে গিয়েও মধুর বুক ফুলে উঠতো গর্বে, অহংকারে! নিজের অজ্ঞাতে অনেক বিষয়ে তাঁকেই নায়ক হিশেবে গণ্য করতেন তরুণ মধু। সেই বাবা আর নেই! মধু ভাবেন, 'সত্যি সত্যি আমি আজ অনাথ হলাম!' একটু পরেই বন্ধুকে তিনি তাঁর সেই বিষণ্ণতার কথাই লিখেছেন।

আর্থিক অবস্থা ভালো হবার সঙ্গে সঙ্গে কবি একাধিক বার বাড়ি বদল করেছিলেন। সম্ভবত এ জন্যে গৌরদাস তাঁর ঠিকানা পাননি। পরেও দেখা যাবে, আয় বাড়লে তিনি ভালো বাড়িতে না-থেকে পারতেন না। আয় কমে গেলে পুনরায় মূষিক হতেও দেরি হতো না। সে যাই হোক, ঠিকানা জোটাতে না-পারার জন্যে গৌরদাস তাঁর চিঠিটি পাঠান রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে। কৃষ্ণমোহন তাঁর কন্যা দেবকীকে নিয়ে কলকাতা থেকে যাত্রা করেন ৭ ডিসেম্বর (১৮৫৫)। মাইকেল যে-ধরনের ছোট্টো উপকূলীয় জাহাজ *লেডি সেইলে* করে মাদ্রাস এসেছিলেন, কৃষ্ণমোহনও তেমন একটি ছোটো জাহাজ — *নাইলে* করে মাদ্রাস আসেন। নানা বন্দর হয়ে মাদ্রাসে আসতে এই জাহাজের সময় লেগেছিলো ১০ দিন।[১১৬] ১৯ তারিখ তিনি গৌরদাসের চিঠি তাঁকে পৌঁছে দেন। চিঠি পড়ে তিনি সব জানতে পেলেন। তখনো তিনি নির্দিষ্ট তারিখ না-জানলেও, রাজনারায়ণ মারা যান এগারো মাস আগে — ১৬ জানুআরি।

গৌরদাস তাঁকে সম্পত্তির কথা বলেছিলেন — তাঁর প্রাপ্য সম্পত্তি নিয়ে অন্যরা কাড়াকাড়ি করছে। কিন্তু তিনি কী করবেন?

> প্রিয়তম গৌর, তুমি তো জানো কলকাতায় যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়! দারুণ খরচসাপেক্ষ, বিশেষ করে আমার মতো হতভাগার জন্যে! তবে তুমি যদি আশ্বাস দাও যে, বাবার সম্পত্তি থেকে আমার

> যাবার খরচ উশুল হবে, তা হলে কলকাতা, আমার পুরোনো কলকাতার উদ্দেশে পাল তুলতে রাজি আছি।

বাবা মারা যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর আত্মীয়রা যে তাঁকে কোনো খবর দেননি, সে কথা ভেবে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন।

> তুমি খবর না-দিলে আমার বাবার মৃত্যুর খবর আমি হয়তো বছরের পর বছর জানতেই পারতাম না! গৌর, কখন এবং কেমন করে বাবা মারা গেলেন? আমার মনটা উদাস হয়ে যাচ্ছে। তুমি যা যা জানতে পারো, আমাকে জানিয়ো। এই চিঠি পাওয়া মাত্র ফিরতি ডাকে আমাকে লিখো। বাবার যশোরে জমিজমা আছে, সে আমি জানি। আর আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি অর্থগৃধ্নু শকুনগুলোর হাত থেকে সে জমি উদ্ধার করতে পারবো।

চিঠির বয়ান থেকে মনে হয়, যখন চিঠি লিখতে আরম্ভ করেন তখনো কলকাতায় যাবেন কিনা, সে সম্পর্কে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না; ভেবেছিলেন, সম্পত্তির পরিমাণ কতোটা তা জানার পর সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু চিঠি লিখতে লিখতে মন স্থির করে ফেলেছেন। – 'পারলে ২৭ তারিখে আগামী জাহাজে করেই চলে যাবো।' গৌরদাসের স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে নিজের পরিবারের কথা মনে পড়লো। লিখলেন: স্ত্রী এবং চারটি সন্তান নিয়ে তিনি সুখে আছেন।[১১৭]

কার্যকালে ২৭ তারিখে (ডিসেম্বর) তাঁর যাওয়া হলো না। হয়তো যাওয়ার আগে পরিবারের জন্যে যেসব ব্যবস্থা করে যাওয়া দরকার, তা করতে পারেননি। হয়তো যাওয়ার জন্যে ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ বাবদে যে-টাকাকড়ি দরকার, তা জোগাড় করতে পারেননি। হয়তো গৌরদাসের চিঠির জন্যেও অপেক্ষা করে থাকলেন। ওদিকে, কবির চিঠি পেয়ে গৌরদাস উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। তিনি এই চিঠির উত্তর দেন ৫ জানুআরি (১৮৫৬)।

> তোমার উষ্ণতা এবং ভালোবাসায় ভরা চিঠি পেয়ে কী যে খুশি এবং আনন্দিত হয়েছি, তা বোঝানোর মতো ভাষা আমার নেই। চিঠির কালো বর্ডার দেখে আমি খানিকটা চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু চিঠির বক্তব্য আমাকে দিয়েছে নির্ভেজাল সন্তোষ। তার চেয়েও বড়ো কথা, তোমার খিদিরপুরের আত্মীয় এবং বন্ধুরা তুমি নেই বলে যে ভুয়ো খবর দিয়েছিলো এবং যা শুনে আমি মর্মান্তিক বেদনায় কাতর হয়েছিলাম, তা মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেছে। ...
>
> তোমার বাবা মারা যাবার আগে মানসিক দিক দিয়ে ঠিক সুস্থ ছিলেন বলে মনে হয় না। ... তিনি কতোটা সম্পত্তি রেখে গেছেন, তার সঠিক ধারণা আমি দিতে পারবো না। যশোরে যে-সম্পত্তি আছে, তার দাম কতো তুমিই তা ভালো বলতে পারবে। তাঁর অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির দাম খুব বেশি হবে না। তবে খিদিরপুরের বাড়িটির দাম চার হাজার বলে শোনা যাচ্ছে। কলকাতায় আসার এবং ফিরে যাবার জন্যে তোমার যে-ব্যয় হবে, তার জন্যে যথেষ্ট সম্পত্তি রয়েছে। আমি তোমাকে দেখার জন্যে উদ্বিগ্ন বোধ করছি। কারণ তুমি এলে এই সম্পত্তি নিয়ে যে মামলা-মকদ্দমা চলছে, তারই অবসান হবে না, এই অরক্ষিত সম্পত্তি দিয়ে যারা কেবল নিজেরা লাভবান হবার স্বপ্ন দেখছে সেই বেআইনী দাবিদারগণও ভয় পেয়ে যাবে। তোমার বিমাতারাও লাভবান হবেন – তাঁরা তা হলে একজন রক্ষক পাবেন এবং টাকাপয়সার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবেন।
>
> আমি খিদিরপুরে চাকরি করতে আসার পর, আমার হাতে প্রথম যে-তদন্তটি এলো, তা হলো চার আইন (১৮৪৯) অনুযায়ী একটি বাড়ির মালিকানা বিষয়ে তদন্ত করা – যে-বাড়িতে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজনের সঙ্গে আমার সুখের দিন কেটেছে।[১১৮]

মধু যাতে কলকাতায় সপরিবারে ফিরে আসেন, তার জন্যে এ চিঠিতেও গৌরদাস অনুরোধ জানিয়েছেন। এমন কি, *Spectator* পত্রিকার সহ-সম্পাদকের কাজ থেকে তাঁর নিশ্চয় বেশি আয়

হয় না, বরং কলকাতায় এলে বড়ো কোনো কাজ পাওয়া যাবে — এ রকম যুক্তি দিয়েও তাঁকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি লেখেন যে, নতুন শিক্ষা পদ্ধতি (উড্‌স ডেসপ্যাচের ওপর ভিত্তি করে) প্রবর্তিত হওয়ায় অধ্যাপক অথবা ইনস্পেক্টরের পদ পাওয়া শক্ত হবে না এবং পেলে তাঁর ভালো আয় হবে।

গৌরদাসের চিঠি থেকে সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে ভরসা পেয়ে কবি কলকাতা যাবার পরিকল্পনা পাকা করে ফেললেন। তবে কলকাতায় যাওয়া, বিশেষ করে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করতে যাওয়া, দু-চার দিনের ব্যাপার নয়। পত্রিকা থেকে ছুটি নেওয়া এবং সংসারের সব ব্যবস্থা করার জন্যে সময় লাগলো যতোটা ভেবেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি। শেষ পর্যন্ত সবকিছু সামাল দিয়ে কলকাতার জাহাজে চড়ে বসলেন জানুআরির শেষে।

মোটামুটি এ সময়ে চমৎকার স্ত্রী আর চার সন্তানের আপাতদৃষ্টিতে একেবারে পরম সুখের নীড়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিলো। প্রমাণের অভাবে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় — কবি মাদ্রাস ত্যাগ করার আগে, নাকি তার অব্যবাহিত পরে। কিন্তু সে এমনই প্রচণ্ড ঝড় এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস যে, সমস্ত সংসার যে-ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিলো, সে ভিত্তি পর্যন্ত ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। এর পর কবি আর সে সংসারে কোনো দিন ফিরে যেতে পারেননি। চমৎকার বৌ-এর মুখের দিকে তাকানো তো দূরের কথা, সাড়ে ছ বছরের বড়ো-মেয়ে ব্যর্থা, চার বছর দশ মাসের ছোটো-মেয়ে ফিবি, সাড়ে তিন বছরের বড়ো-ছেলে জর্জ আর দশ মাসের ছোটো-ছেলে মাইকেল — কারো সামনে জীবনে আর দাঁড়াতে পারেননি। এই সর্বনাশী বাত্যার কারণ কী? এর কারণ ব্যাখ্যা করার মতো যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী থেকে একটা সম্ভাব্য কারণ আমরা অনুমান করতে পারি।

কবির সহকর্মী জর্জ হোয়াইট তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ের চেয়েও কম বয়সী একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনেন এবং তার ফলে যে সংসারের শান্তি বিনষ্ট হয় — এ আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। তখন সহকর্মীর কন্যা হেনরিয়েটাকে কবি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। সেই সহানুভূতিই ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হয়। কিন্তু, অনুমান করি, এই গোপন প্রেমের কোনো প্রভাব তাঁর সংসারে গভীর ছাপ ফেলতে পারেনি। হেনরিয়েটার সঙ্গে প্রেম এবং রেবেকার সঙ্গে দাম্পত্যজীবন সমান্তরালভাবেই চলছিলো — দ্বৈত জীবন যাকে বলে। সংসারে যদি অশান্তি হতো, রেবেকাকে ত্যাগ করার আদৌ কোনো পরিকল্পনা যদি তাঁর মনে থাকতো, তা হলে গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে একেবারে অযাচিতভাবে লিখতে পারতেন না: I have a fine English wife and four children।[১১১] তিনি হয়তো ভেবেছিলেন: এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না! হেনরিয়েটার পিতা ছিলেন সাহিত্যের শিক্ষক। পরবর্তী জীবনের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, হেনরিয়েটা বাংলা শিখে কবির সাহিত্যসঙ্গিনী হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। অপর পক্ষে, আমার ধারণা, অনাথ রেবেকার শিক্ষা সামান্যই হয়েছিলো। হেনরিয়েটা ছিলেন সে তুলনায় বেশি শিক্ষিত। কবি যে তাঁর সঙ্গ পছন্দ করতেন, তাঁকে ভালোবাসতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে প্রেমের জন্যে নিজের স্ত্রী অথবা সন্তানদের ত্যাগ করতে তিনি তৈরি ছিলেন না। রেবেকা তাঁকে বিয়ে করতে গিয়ে যে-সাহস দেখিয়েছিলেন এবং যে-ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, কবি সেটাও ভুলতে পারেননি। তা ছাড়া, রেবেকাকে তিনি আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন। সে জন্যে নির্ঝঞ্ঝাটে আপন গতিতে এগিয়ে চলছিলো এই প্রণয়ের ধারা।

কিন্তু মাইকেল দীর্ঘদিনের জন্যে কলকাতায় চলে যাচ্ছিলেন — এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এতো দিনের লুকানো এই প্রণয়লীলা হঠাৎ প্রকাশ পেয়েছিলো। কিভাবে প্রকাশ পেলো, কতোটা প্রকাশ পেলো, সে আমাদের জানা নেই। কিন্তু ব্যাপারটা আর রেবেকার কাছে চাপা থাকেনি, এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে-রেবেকা স্বজন এবং বন্ধুদের তীব্র বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে তখনকার সমাজের দৃষ্টিতে

একেবারে অগ্রহণযোগ্য একটি কৃষ্ণাঙ্গকে বিয়ে করেছিলেন এবং সব অভাব স্বীকার করে ভালোবাসা আর সন্তান দিয়ে স্বামীর সংসারকে ভরে দিয়েছিলেন, তিনি এই বিশ্বাসঘাতকতাকে মেনে নিতে পারেননি। অতঃপর রেবেকা আর মাইকেলের সঙ্গে ঘর করতে রাজি হননি। কিভাবে সংসার চলবে, কৃষ্ণাঙ্গ শিশুগুলোর কী হবে – এসব গুরুতর সমস্যা ছিলো রেবেকার সামনে, তা সত্ত্বেও অভিমানিনী নারী ভেবে থাকবেন যে, তিনি ভিক্ষা করে খাবেন, তবু এঁর সঙ্গে আর নয়! মাইকেল যেন আর ফিরে না-আসেন – মুখ রক্ষার জন্যে তিনি সম্ভবত তাঁকে তা বলে দিয়েছিলেন। অবশ্য আর-একটা সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনে। সে হলো: এই প্রেমের খবর কবির মাদ্রাস ত্যাগের আগে পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। প্রকাশ পেয়েছিলো তিনি কলকাতা যাবার পরে। এই সম্ভাবনার কারণ পরে ব্যাখ্যা করবো। কিন্তু মাইকেলের প্রণয় এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা যখনই প্রকাশ পেয়ে থাকুক না কেন, তিনি সত্যি সত্যি আর কোনো দিন মাদ্রাসে ফিরে যাননি।

তাঁর মাদ্রাস ত্যাগের সময়ে কনিষ্ঠ পুত্র মাইকেল জেমসের বয়স ছিলো দশ মাস। তখনো তার ব্যাপটিজম হয়নি। তার ব্যাপটিজম হয় কবি মাদ্রাস ছাড়ার কিঞ্চিদধিক দু মাস এবং ঈস্টারের কদিন পরে – দোসরা এপ্রিল।[১২০] এবং এই পুত্রের মৃত্যু হয় আরো উনিশ দিন পরে – ২১ এপ্রিল।[১২১] তা সত্ত্বেও কবি আর মাদ্রাসে যাননি। বস্তুত, স্নেহের বন্ধন অথবা পারিবারিক দায়িত্ব কোনো কিছুই তাঁকে তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। তেরো বছর আগে তিনি যখন ধর্মান্তরের জন্যে বাড়ি ছাড়েন অথবা ন বছর আগে কলকাতা ছেড়ে তিনি যখন মাদ্রাসের পথে পা বাড়ান, তখনো কোনো স্নেহের টান তাঁর মনকে টলাতে পারেনি। এ তাঁর চরিত্রেরই একটা বৈশিষ্ট্য।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহারে কোনটা বিবেচনা এবং কোনটা অবিবেচনা, বলা শক্ত। কারণ আন্তরিক প্রণয় থেকেও মানুষ মানুষকে নিষ্ঠুরতম আঘাত দিতে পারে। সুতরাং কেবল রেবেকাকে ত্যাগ করলে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু চার-চারটি অপোগণ্ড অসহায় সন্তানকে তিনি কোন বিবেচনায় চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করেছিলেন, তা বোঝা মুশকিল। তিনি এঁদের জন্যে এক গাদা টাকাকড়িও রেখে আসেননি। কারণ ২০ ডিসেম্বরের (১৮৫৫) চিঠিতে তিনি নিজেকে একটা "poor devil" বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে, কলকাতায় যেতে পারবেন যদি পিতার সম্পত্তি থেকে সেই খরচটা উঠে আসে। সুতরাং বলা যায়, স্ত্রী এবং সন্তানদের মাদ্রাসে ফেলে এসে তিনি 'বীররসের' বড়ো কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেননি। মাকে ত্যাগ করে এসে পোপের দোহাই দিয়ে বলেছিলেন, কাব্যদেবীর সাধনা করার জন্যে দরকার হলে পিতামাতা সবাইকে ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু সন্তানদের তিনি কি জন্যে ত্যাগ করেন কোনো কালে তার ব্যাখ্যা দেননি। গৌরদাসের মতো অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও কোনোদিন কিছু খুলে বলেননি। তবে তিনি পাষণ্ড ছিলেন না, পরে দেখতে পাবো, এই অপরাধ বোধ তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে এবং সে জন্যে কবিতার ভাষায় আত্মগোপন করে তিনি গলা ফাটিয়ে আন্তরিক আর্তনাদ করেছেন।

রেবেকাও তাঁর স্বামীকে ভুলতে পারেননি। সেটা প্রেমের কারণে নাকি কৃষ্ণাঙ্গ তিনটি সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, তা বলা শক্ত। মাইকেল মাদ্রাস ত্যাগের সাড়ে ৩৬ বছর পরে, ১৮৯২ সালের ২২ জুলাই, তিনি যখন ক্ষয় রোগে মারা যান, তখনো চার্চের খাতায় তাঁর নাম লেখা হয়েছে রেবেকা টমসন ডাট।[১২২] বিবাহবন্ধন তিনি ত্যাগ করেননি। তার একটা কারণ হতে পারে: যে-হেনরিয়েটার জন্যে তিনি তাঁর সুখের সংসার ভাঙতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই হেনরিয়েটা যাতে মাইকেলকে কোনো দিন বিয়ে করতে না-পারেন, তিনি সে জন্যে বিবাহবিচ্ছেদে রাজি হননি। প্রসঙ্গত, আরো একটা কথা উল্লেখ করতে হয়, যে-সন্তানদের রেবেকা পক্ষীমাতার মতো দুই পাখার

নিরাপত্তা দিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর অতো ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও তাঁদের জীবনের গতি স্বচ্ছন্দ হতে পারেনি। পরে আমরা তা বিস্তারিতভাবে লক্ষ্য করবো।

মাদ্রাস থেকে মাইকেল কেন ছদ্মনাম (মিস্টার হোল্ট) নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন — এ নিয়ে তাঁর জীবনী-লেখকরা গবেষণা না-করলেও, জল্পনা-কল্পনা কম করেননি। রেবেকা এবং তাঁর বান্ধবদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি ছদ্মনামে কলকাতায় আসার টিকিট কিনেছিলেন; মি হোল্টের নামে যে-আসন সংরক্ষিত ছিলো, হঠাৎ করে আসতে হয় বলে সেই আসনে তিনি এসেছিলেন; দেশীয়রা ক্যাবিনে যেতে পারেন না, সে জন্যে ইংরেজি নাম নিতে হয় ইত্যাদি অনেক কিছুই ছিলো এই জল্পনা-কল্পনার মধ্যে।[১২৩] কিন্তু আসল ঘটনা হলো: মাইকেল তাঁর নিজের নামেই টিকিট কিনেছিলেন। *Athenæum* পত্রিকায় দেখতে পাই দু হাজার টনের এবং ৫২০ অশ্বশক্তির সেকালের বিরাট জাহাজ *বেন্টিঙ্ক* মাদ্রাস ত্যাগ করে ২৮ জানুআরি সোমবার। এই জাহাজটি সাউথ্যাম্পটন থেকে কলকাতায় যাচ্ছিলো মাদ্রাস হয়ে। শূন্য আসনে মাদ্রাস থেকে ছ জন 'ভদ্রলোক' যাত্রী, একজন নেটিভ যাত্রী, দুজন দেশীয় ভৃত্য আর দুজন সহিস ওঠেন। ভদ্রলোক যাত্রীদের মধ্যে একজনের নাম মি. এম এম ডাট।[১২৪] সুতরাং আর যাই হোক, তিনি মাদ্রাস থেকে ছদ্মনাম নিয়ে পালিয়ে যাননি।

তা হলে কবি যে মি হোল্ট নামের কথা লিখেছেন, সেটির উৎস কী? জাহাজটি ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় যাচ্ছিলো। যাত্রীরা সবাই ছিলেন য়োরোপীয়। জাহাজে তিনি ছিলেন মাত্র চারদিন। কিন্তু তারই মধ্যে বিদগ্ধ এবং চোস্ত্ ইংরেজি-জানা যাত্রী হিশেবে তিনি অন্য যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে এই পরিচয়/ঘনিষ্ঠতা থেকে হোল্ট নাম দিয়েছিলেন। তবে বিশেষ করে হোল্ট কেন — অন্য কোনো তথ্য না-পেলে তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। সরকারী কাগজপত্র অনুযায়ী জাহাজটি কলকাতায় পৌঁছে পয়লা ফেব্রুআরি, শুক্রবার রাতের বেলায়। কলকাতায় যে-যাত্রীরা পৌঁছেছিলেন, সেই যাত্রীদের তালিকায় মাদ্রাস থেকে আগত যাত্রীদের মধ্যে পাচ্ছি মি হোল্টসহ ছ জনের নাম,[১২৫] আর মি এম এম ডাটের নাম সেখানে অনুপস্থিত। বোঝা যায়, কলকাতায় নামের তালিকা দেবার সময়ে জাহাজ-কর্তৃপক্ষ তাঁর সত্যিকার নাম না-লিখে, তাঁর ঠাট্টা-করে-দেওয়া নামই লিখে দিয়েছিলো।

মাদ্রাস থেকে তিনি যাত্রা করেছিলেন এক নামে, কিন্তু চারদিন জাহাজে থাকার পর কলকাতায় নামার সময়ে তাঁর নাম হয়ে গেলো আর-এক। বাস্তবেও তিনি মাদ্রাসে তাঁর জীবনের এক অধ্যায় শেষ করে কলকাতায় শুরু করেন জীবনের সম্পূর্ণ নতুন আর-এক অধ্যায়।

৪

মধুচক্র — গৌড়জনে যাহে ...

'এসে গেছি। ভেবে দেখো ব্যাপারখানা, ওরা আমার নাম দিয়েছিলো মি হোল্ট। ঢাকঢোল না-পিটিয়ে যদি আসতে পারো, তা হলে চলে এসো। আমি এসে গেছি, এখনো সেটা লোকেদের জানতে দিতে চাইনে।' ১৮৫৬ সালের দোসরা ফেব্রুআরি, শনিবার সকাল বেলায় বিশপস কলেজে পৌঁছে মাইকেল এই চিঠিটি লিখেছিলেন গৌরদাসের কাছে।

এই চিঠি পড়ে দুটো ব্যাপারে খটকা লাগে। তিনি তাঁর আগমনের কথা গোপন রাখতে চান কেন — বোঝা যায় না। তা ছাড়া, এ চিঠি লেখা খুব হাল্কা চালে। যে-মানুষটি মাত্র পাঁচ দিন আগে তাঁর সুখের সংসার তছনছ করে চলে এসেছেন, বিশেষ করে ফেলে এসেছেন এক গণ্ডা কচি বাচ্চাকে, তার অমন হালকা হবার কথা নয়। অবশ্য হতে পারে তখনো হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের কথা প্রকাশ পায়নি অথবা রেবেকার সঙ্গে বিচ্ছেদ দেখা দেয়নি। কিন্তু কবি মাদ্রাস ত্যাগ করার অনতিকাল পরেই রেবেকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়।[১০] এমন আভাস পাওয়া যায়। এবং তারপর রেবেকার সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়ার উদ্যোগও শুরু হয়। কবি মাদ্রাস ত্যাগের সাড়ে তিন মাস পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু চার্লস এগবার্ট কেনেট তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় আসেন।[১] তাঁর এই আগমনের কারণ জানা নেই। কিন্তু অসম্ভব নয় যে, তাঁর কলকাতা সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো রেবেকা এবং মাইকেলের মধ্যে দৌত্য করা। এ ব্যাপারে তাঁর খানিকটা নৈতিক দায়িত্বও ছিলো। মাইকেল কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পুত্র — বিয়ের আগে তিনি কি সে সাক্ষ্য দেননি? এখন কার্যত বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় তিনি আপোশের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন। তবে তথ্যের অভাবে চূড়ান্ত কোনো রায় দেওয়া শক্ত। কবি যে কলকাতায় আসার মাস খানেকের মধ্যে গৌরদাসের মধ্যস্থায় চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেন — তা থেকেও মনে হয়, ততোদিনে সম্পত্তির জন্যে নয়, পারিবারিক কারণেই তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকার পরিকল্পনা করেন। কারণ গোড়াতে তিনি সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। তিনি এসেছিলেন নিতান্ত গৌরদাসের প্রেরণায়। তিনি মনে করেছিলেন, তাঁকে দেখে সম্পত্তি ভোগ দখলকারী আত্মীয়রা পালিয়ে যাবেন। মামলা করতে হবে অথবা তার জন্যে এতো সময় লাগবে, এটা ভাবতে পারেননি।

কলকাতায় থাকার খরচ চালানোর জন্যে তিনি তেমন টাকাপয়সা আনতে পারেননি। গৌরদাস তাঁর স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন যে, মধু যখন কলকাতায় ফেরেন, তখন তাঁর কাছে একটি পয়সাও ছিলো না।[২] এই উক্তির মধ্যে অতিরঞ্জন ছিলো। যেমন অতিরঞ্জন ছিলো, তিনি কলকাতায় এসেই গৌরদাসের কাছে ছুটে যান — এই উক্তিতে। কারণ আগের চিঠিতেই দেখতে পাচ্ছি, তিনি কলকাতায়

এসে বিশপস কলেজে উঠেছিলেন এবং সেখান থেকে গৌরদাসকে চিঠি লিখেছিলেন। সে যাই হোক, ক দিনের মধ্যেই তাঁর পকেট গড়ের মাঠ। ধার চাইলেন বন্ধুর কাছে। গৌরদাসের কাছ থেকে টাকা পেয়ে তিনি যে-চিঠি লেখেন, তার তারিখ ১৭ ফেব্রুআরি — অর্থাৎ কলকাতায় আসার ঠিক পনেরো দিন পরে। গৌরদাস ধার দিয়েছিলেন মাত্র ৫০ টাকা, কিন্তু তিনি ধন্যবাদ দিলেন 'এক হাজার'।[৩] এ থেকে তাঁর অভাবের মাত্রা খানিকটা আঁচ করা যায়। কিন্তু এই টাকা ফুরোনোর আগেই তিনি সম্ভবত একটা চাকরির চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তাঁর একটা গতি করার জন্যে গৌরদাস এ সময়ে তাঁর বাড়িতে কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং দিগম্বর মিত্রকে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানান। সেখানে তিনি মধুকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবার জন্যে এঁদের অনুরোধ করেন। কবি তখন গৌরদাসের বাড়িতে বাস করছিলেন। বন্ধুরা ভাবেন, সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে অনেক দিন কলকাতায় থাকতে হবে বলে তাঁর চাকরির প্রয়োজন। কিন্তু কবি জানতেন, সম্পত্তি নয়, সংসারের কারণেই তাঁকে অতঃপর স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকতে হবে। যা ঘটেছিলো, তারপর তাঁর আর মাদ্রাসে যাবার মুখ ছিলো না।

কলকাতায় প্রতিযোগিতা মাদ্রাসের তুলনায় অনেক বেশি — জর্জ নর্টন তাঁকে সে কথা এক সময়ে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। যে-দুটি কাজে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো — শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতা — তার কোনোটাই তিনি পাননি। কোনো পত্রিকায় চাকরি জোটাতে চেষ্টা করেছিলেন কিনা, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু হুগলি নর্মাল স্কুলের হেডমাস্টারের পদের জন্যে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। আর এর জন্যে তাঁকে লিখিত পরীক্ষাও দিতে হয়েছিলো। পরীক্ষায় তিনি হেরে যান। চাকরিটি পান তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়।[৪] ভূদেব খুব ভালো ছাত্র ছিলেন, মাইকেল তাঁর নানা গুণের সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন। তা ছাড়া, বাল্যবন্ধু হিশেবে কবি তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালোওবাসতেন। কিন্তু তিনি কি তাঁকে তাঁর নিজের মতো প্রতিভাবান মনে করতেন? কাজেই ভূদেব চাকরি পাওয়ায়, তিনি হতাশ হয়ে থাকবেন। তারপরে আর কোথাও শিক্ষকতা জোটানোর চেষ্টা করেছেন বলে জানা যায় না। চাকরি পেয়ে ভূদেব কাজে যোগদান করেন ২২ জুন।[৫] সুতরাং এপ্রিল-মে মাসে এই পরীক্ষা হয়ে থাকবে। অরফ্যান অ্যাসাইলাম এবং মাদ্রাস স্কুলে তিনি যেভাবে চাকরি করেছিলেন, তাতে মনে হয় মাইকেল ভালো শিক্ষক ছিলেন। তদুপরি মাদ্রাস স্কুলে তিনি অন্তত সাড়ে তিন বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। হিন্দু কলেজ এবং বিশপস কলেজে তাঁর উচ্চশিক্ষা লাভ এবং মাদ্রাসে সাত-আট বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা দিয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজেও তাঁর পক্ষে চাকরি পাওয়া অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু অজ্ঞাত কোনো কারণে তিনি কোথাও একটা ভদ্র-গোছের মাস্টারি জোটাতে পারেননি। পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁর যে-দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিলো, কলকাতায় তা-ও কোনো কাজে লাগেনি।

শেষ পর্যন্ত, চাকরি পেলেন একবারে অপ্রত্যাশিত একটা জায়গায় — পুলিশ কোর্টে। পরে দেখা যাবে, সম্ভবত এই কাজের সূত্র ধরেই তিনি নিজের অধঃপতন ডেকে এনেছিলেন। এ সময়ে একটা ডেপুটিগিরি জোটাতে চেষ্টা করেছিলেন কিনা, জানা নেই। তবে যখনকার কথা বলছি, গৌরদাস তখন চাকরি করলেও ডেপুটির কাজ পাননি। তা পেয়েছিলেন আরও দু বছর পরে। সে যাই হোক, পুলিশ কোর্টে চাকরি পেতে সাহায্য করেছিলেন এই কোর্টেরই জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট, এক কালে হিন্দু কলেজের সহপাঠী, কিশোরীচাঁদ মিত্র। কিশোরীচাঁদ হিন্দু কলেজে মাইকেলের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ো ছিলেন। কিন্তু ভালো ছাত্র হিশেবে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ছিলো বলে মনে হয়। কিশোরীচাঁদ এখন চীফ ম্যাজিস্ট্রেট জি এফ ককবার্নের কাছে সুপারিশ করে মাইকেলের বিপদের দিনে বন্ধুকৃত্য করলেন। জুলাই মাসে কবি কেবল কিশোরীচাঁদের কোর্টে সহায়ক কর্মচারীর কাজ নিলেন না, থাকতে আরম্ভ করলেন দমদমে, কিশোরীচাঁদের বাড়িতে। তাঁর স্ত্রী কৈলাসবাসিনী তাঁর বাল্যবয়সে খিদিরপুরে তাঁকে

কাছ থেকে দেখেছিলেন।

মাইকেল প্রথম যে-চাকরিটি পেলেন, তাতে বেতন ছিলো খুব কম। এটি ছিলো সম্ভবত দোভাষীর কাজ। তবে অচিরে পুরোনো একজন কর্মচারী, মি. টাকার অন্যত্র বদলি হওয়ায়, তিনি জুডিশিয়াল ক্ল্যার্কের চাকরি পান। বেতন এক শো পঁচিশ টাকা।[৬] মাদ্রাসে তিনি যে-আয় করছিলেন, তার তুলনায় এ বেতন খুব খারাপ ছিলো না। বছর দুয়েক পরে নিজেই বলেছেন: 'ডালভাতের জন্যে যথেষ্ট।'[৭] কিন্তু তখন পুলিশ কোর্ট এবং অন্য কোর্টগুলোতে যেসব বাঙালি চাকরি করতেন, তাঁদের কারো কারো তুলনায় এ আয় ছিলো নিতান্তই কম। স্বয়ং কিশোরীচাঁদের বেতন ছিলো ৮০০ টাকা। স্মল কোর্টের বিচারক হরচন্দ্র রায়ের বেতন ১০০০ টাকা। কোর্টের দোভাষী শ্যামাচরণ সরকারের ৬০০ টাকা। সুপ্রিম কোর্টের কেরানি কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জির ২৬০ টাকা। স্মল কোর্টের গিরিশচন্দ্র দত্তের বেতন ২০০ টাকা আর রামকানাই সেনের ১৫০ টাকা। এমন কি, মাইকেল যে-কোর্টে চাকরি পেলেন, সেই কোর্টে একই সঙ্গে কাজ করতেন প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, তাঁরও বেতন ১২৫ টাকা।[৮] কবি হয়তো ভাবেন: মুড়ি-মুড়কির একই দর! ধারণা করি, নিজের সঙ্গে যখনই তুলনা করেছেন, তিনি কেবল নিজের আয় কম বলে যন্ত্রণা পাননি, বরং 'অযোগ্য, অর্ধশিক্ষিত' সহকর্মীদের তুলনায় তিনি অনেক কম পাচ্ছেন, এ চিন্তা করে আরো বেশি করে কষ্ট পেয়েছেন। এই চিন্তা থেকে তিনি এক সময়ে আইন অধ্যয়ন করে নিজের আয় বাড়ানোর সংকল্প নিয়েছেন। কিন্তু সে আলোচনায় আমরা পরে আসবো।



কিশোরীচাঁদ মিত্র

কিছুকাল ১ নম্বর দমদম রোডে কিশোরীচাঁদের বাড়িতে অতিথি হিশেবে থাকার পর, তিনি অন্যত্র চলে যান। ঠিক কবে থেকে তাঁর নিজের সংসার সাজিয়ে বসেন, বলা যাচ্ছে না। তবে, আমার বিশ্বাস, অগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে। কারণ কিশোরীচাঁদের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবীর আত্মকথা থেকে জানতে পাই যে, শ্রাবণ মাসে কিশোরীচাঁদ লিভারের অসুখে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্যে কৈলাসবাসিনী তাঁর স্বামীর বোতল-সঙ্গীদের স্বাভাবিকভাবেই দোষারোপ করতেন।[৯] এঁদের মধ্যে মাইকেল ছিলেন অন্যতম। আর তিনি যেহেতু একই বাড়িতে বাস করতেন, সে জন্যে, তাঁকে যদি কৈলাসবাসিনী একটু বেশি করে দোষারোপ করে থাকেন, তা হলে অবাক হবার কারণ নেই। তাই মোটামুটি এ সময়েই তিনি নিজের বাড়িতে চলে যান বলে মনে করা সঙ্গত। তবে কোথায় বলা যাচ্ছে না। তাঁর জীবনীকারদের মতে, তিনি এ সময়ে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন ৬ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোডে।[১০] এটা ঠিক নয়। কারণ ১৮৫৬ সালের শেষ অবধি এই বাড়িতে ভাড়াটে হিশেবে অন্য লোকের নাম দেখতে পাই *বেঙ্গল ডায়রেক্টরিতে*।[১১] পরের বছর তিনি এ বাড়িতে গিয়ে থাকবেন।

কিশোরীচাঁদের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেও, যাকে সত্যিকার গুছিয়ে বসা বলে, তা তিনি করতে পারেননি। লেখাপড়ায় তাঁর আগ্রহ ছিলো আগাগোড়া। ছাত্রজীবনের শেষে মাদ্রাসে যখন আপাত-দৃষ্টিতে লেখাপড়ার কোনো দরকার ছিলো না, তখনো তাঁকে আমরা কখনো কখনো দিনের মধ্যে বারো ঘণ্টা ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়ন করতে দেখেছি। কলকাতায় ফিরে এ সময়ে তিনি তাঁর সেই অভ্যাস কতোটা বজায় রেখেছিলেন, এখন আর তা জানার উপায় নেই। কিন্তু মাদ্রাসে এক সময়ে পরিতৃপ্ত প্রেমের আনন্দে তাঁর মধ্যে সৃষ্টিশীলতার যে-বান ডেকেছিলো, সে ধারা এ সময়ে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলো। গোটা ১৮৫৬ সালে তিনি কিছু লেখেননি। ১৮৫০ সাল থেকে তাঁর যে-বন্ধ্যা সময় শুরু হয়েছিলো, তখনো জের চলছিলো তারই। কিশোরীচাঁদের বাড়িতে থাকার সময়ে এক দিন — ১৮৫৬ সালের ২০ জুলাই — খেলার ছলে একটি ছড়া লিখেছিলেন কল্পিত ম্যাথনিয়াকে নিয়ে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

মাদ্রাসে তিনি নিজের পরিবারকে লণ্ডভণ্ড করে এসেছিলেন। সে জন্যে, কলকাতায় ফেরার পরও দীর্ঘদিন নিজের মনটাকে শান্ত করে কাব্যচর্চার মতো অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারেননি। রেবেকার বিরুদ্ধে মনটাকে বিষিয়ে তুলে একটা সান্ত্বনা পেতে হয়তো চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আদরের সন্তানগুলোকে ভোলা অতো সহজ ছিলো না। তদুপরি, নতুন প্রণয়িনীর বিরহ এবং দুশ্চিন্তাও তাঁকে বিষণ্ন করে থাকবে। জ্ঞাতিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়েও এ সময়ে মামলা মকদ্দমা আরম্ভ হয়। গৌরদাস লিখেছেন যে, মধু কলকাতা ফেরার পরেই খিদিরপুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো আত্মীয়দের জানিয়ে দেওয়া যে, তিনি ফিরে এসেছেন। খিদিরপুরের বাড়িতে গিয়ে তিনি তাঁর অসহায় তরুণী বিমাতাকে দেখে নাকি খুব বিচলিত বোধ করেছিলেন।[১২] সম্পত্তির লোভে তাঁর আত্মীয়রা রাজনারায়ণ দত্ত মারা যাবার পরে, মৃত্যুর খবরটা পর্যন্ত তাঁকে জানাননি। তাঁরা বরং সবাইকে বলতেন যে, মধু মারা গেছেন। এই বাড়ি নিয়ে আত্মীয়রা মামলা এবং পাল্টা-মামলা করায়, কাকতালীয় যোগাযোগবশত সেটা তদন্ত করার দায়িত্ব পড়েছিলো গৌরদাসের ওপর। বিষয়টা তদন্ত করার সময়ে গৌরদাস সেখানে গিয়ে শুনতে পান, মধু মারা গেছেন। এমন কি, খিদিরপুরে মধুর প্রতিবেশী রঙ্গলাল এবং গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এটাই বিশ্বাস করতেন। এই পরিবেশে গৌরদাস মরিয়া হয়ে মধুর কাছ চিঠি লিখেছিলেন।[১৩] আশা করেছিলেন, যদি বন্ধু বেঁচে থাকেন, তা হলে তিনি এ চিঠি পাবেন। কলকাতায় এসে কবি যখন খিদিরপুরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি আশা করেছিলেন যে, তাঁকে দেখে তাঁর আত্মীয়রা অর্থহীন মনে করে মামলা-মকদ্দমা প্রত্যাহার করবেন। কিন্তু তাঁরা উৎসাহ হারাননি। বরং শেষ পর্যন্ত লড়েছিলেন। মিথ্যে উইল দেখিয়ে তাঁরা মামলায় জয়ী হবেন বলে আশা করেছিলেন। ১৮৪৯ সালে ধর্মান্তর এবং পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত যে-আইন (৪ আইন নামে পরিচিত) প্রণীত হয়েছিলো, এই মামলা তা প্রয়োগের একটা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। এই মামলা নিয়ে তিনি কম বিব্রত হননি। প্রাত্যহিক জীবনের নানা সমস্যা নিয়েও তিনি এ সময়ে সুস্থির ছিলেন না।

ওদিকে, তিনি কলকাতায় বাসা বাঁধার পর দেশে দু-তিনটি খুব আলোড়নকারী ঘটনা ঘটেছিলো। ২৫ জুলাই (১৮৫৬) প্রণীত হয়েছিলো বিধবাবিবাহ আইন — যে-আইনের সপক্ষে আগের ডিসেম্বর মাসে তিনি *Madras Spectator* পত্রিকায় ওকালতি করেছিলেন। (এ আইন প্রণয়নে হিন্দু কলেজে তাঁর অন্যতম পরীক্ষক মি গ্র্যান্ট বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।) আইন গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিধবার বিয়ে হয়নি। প্রতিটি বিয়ের জন্যে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন — এ কথা ঘোষণা করেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।[১৪] তবু সহজে কাউকে এ বিয়েতে রাজি করানো সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও রক্ষণশীল সমাজ এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেছিলো। আইন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে দেখে বিদ্যাসাগর এবং তাঁর বন্ধুরা বিধবাবিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করার একটা বড়ো রকমের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার

ফলে সে বছর ডিসেম্বর মাসে রক্ষণশীলদের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো প্রথম বিধবাবিবাহ। এই ঘটনা সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে, রাজনারায়ণ বসু এ দিনের স্মৃতিচারণ করে লিখেছিলেন: 'সেদিন কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে, যুগ উল্টানোর ন্যায় কি একটি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে।'[১৫] উদারপন্থী শিক্ষিত ভদ্রলোকরা যে উল্লসিত হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। যখন আইন পাশ হয়, তখন মাইকেল থাকতেন কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে। সেদিন কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর ডাইরিতে যা লিখেছিলেন, তা থেকে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, কবির সঙ্গে তিনি কী ধরনের আলোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: 'আজকের দিন আমার দেশের ইতিহাসে নতুন যুগের প্রারম্ভ বলে গণ্য হবে।'[১৬]

আইন প্রণীত হবার পর, যিনি প্রথম বিধবাবিবাহ করেন, সেই শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ছিলেন সংস্কৃত কলেজের এক সময়কার ছাত্র এবং শিক্ষক। তাঁকে কলেজের অধ্যক্ষ এবং এ আন্দোলনের সবচেয়ে প্রধান নেতা বিদ্যাসাগর প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ বিয়ে করার এক বছর পরে শ্রীশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, এ বিয়েতে রাজি হবার পেছনে তাঁর আর্থিক লোভ থাকা সম্ভব।[১৭] কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেই রক্ষণশীল সমাজে এ বিয়ে ছিলো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। কবির বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর দুই জেঠতুতো ভাই — দুর্গানারায়ণ এবং মদনমোহন বসু তৃতীয় এবং চতুর্থ বিধবাবিবাহের নজির স্থাপন করেন (ফেব্রুআরি ১৮৫৭) এবং এ ব্যাপারে রাজনারায়ণ তাঁদের উৎসাহিত এবং সাহায্য করেন। সত্যি বলতে কি, মাইকেলের বন্ধু অথবা বন্ধুস্থানীয় যাঁরা, তাঁরা প্রায় সবাই বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। একজন প্রগতিশীল মানুষ হিশেবে তিনিও এই আন্দোলন দিয়ে প্রভাবিত না-হয়ে পারেননি।

বিধবাবিবাহের হৈচৈ বন্ধ হতে না-হতেই ১৮৫৭ সালের মে মাসে আরম্ভ হয় সিপাহী বিপ্লব। বঙ্গদেশে এই বিপ্লব বিশেষ সমর্থন পায়নি, বিশেষ করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা অনেকে একে বিবেচনা করেছিলেন একটা উপদ্রব হিশেবে।[১৮] রাজনারায়ণ বসু সিপাহী বিপ্লবের মাত্র ৮ বছরের মধ্যে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে মেদিনীপুরে *জাতীয় গৌরব সম্পাদনী* সভা স্থাপন করেছিলেন।[১৯] নবগোপাল মিত্রের *National Paper*-এ শিক্ষিতদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তা ছাড়া, কয়েক বছরের মধ্যে তিনি হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি কট্টর জাতীয়তাবাদী বক্তৃতাও দিয়েছিলেন।[২০] কিন্তু সেই রাজনারায়ণ বসুই ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, *আত্মচরিতে* তিনি তাঁর সকৌতুক কিন্তু আন্তরিক পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের ফলে বাঙালি বর্ণহিন্দুরা জমিদারি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে যে-স্থিতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, রাজনারায়ণ থেকে আরম্ভ করে স্বয়ং মাইকেল পর্যন্ত সবাই ছিলেন তার ফসল। সুতরাং বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সেই কায়েমি ব্যবস্থার মধ্যে অব্যবস্থা নিয়ে আসার জন্যে সিপাহী বিপ্লবকে স্বাগত জানাতে তৈরি ছিলেন না।

যে-মাইকেল মাত্র তিন বছর আগে *The Anglo-Saxon and the Hindu* লিখেছিলেন এবং যিনি ইংরেজদের মনে করতেন ক্ষয়িষ্ণু ভারতবর্ষের ত্রাতা হিশেবে — তিনি এই বিপ্লবকে কী চোখে দেখেছিলেন, তা জানার জন্যে কৌতূহল না-হয়ে পারে না। ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে ভারতবর্ষে আবার মোগলদের অথবা দেশীয় কোনো রাজার শাসন চালু করার ধারণাকে তিনি যে মনে মনে সমর্থন করতে পারেননি, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। তবে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালিরা সিপাহী বিপ্লব-বিরোধী যে-মনোভাব পোষণ করতেন, তাঁর ধারণা অতো সরল ছিলো বলে মনে হয় না। ইংরেজি সভ্যতা এবং ইংরেজ কর্তাদের তিনি একই দৃষ্টিতে দেখতেন না। উদার এবং যুক্তিবাদী

চিন্তাধারার প্রবর্তক এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্রষ্টা এবং উত্তরাধিকারী হিশেবে তিনি ইংরেজি সভ্যতার একান্ত ভক্ত ছিলেন। তা না-হলে তিনি *The Anglo-Saxon and the Hindu* লিখতে পারতেন না। বস্তুত, এই বক্তৃতায় তাঁর ইংরেজি সভ্যতা-প্রীতি প্রায় অন্ধতার পর্যায়ে পড়ে। যে-জাতি শেকসপীয়রের মতো কবি-নাট্যকার, মিল্টনের মতো ধ্রুপদী কবি এবং বায়রন আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো রোম্যান্টিক কবির জন্ম দিয়েছে, তিনি কি সে জাতির অবিমিশ্র প্রশংসা না-করে পারেন?

অপর পক্ষে, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সব সময়ে যে মধুর হয়েছে, তা নয়। জেমস ক্যারের মতো শিক্ষক তিনি ছাত্রজীবনে পেয়েছিলেন। বিশপস কলেজে দেশীয়, ফিরিঙ্গি এবং ইংরেজদের মধ্যে ভেদাভেদ ছিলো — কলেজের কাগজপত্র থেকে তার প্রমাণ পেয়েছি। তাঁর কোনো কোনো জীবনীকার কৃষ্ণমোহনের স্মৃতিচারণের ওপর নির্ভর করে বলেছেন যে, এই কলেজে তাঁর কিছু বর্ণবাদী অভিজ্ঞতা হয়েছিলো।[২১] এ সময়ে মিশনারি হিশেবে কাজ করতে চাইলে তাঁকে একাধিকবার বলা হয়েছিলো যে, তিনি পাবেন বিদেশীদের চেয়ে কম বেতন। কিন্তু তাঁর সত্যিকার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিলো মাদ্রাসে — এ প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ধরনের প্রথম অভিজ্ঞতা হয় রেবেকাকে তিনি যখন বিয়ে করতে চান। রেবেকার ষোলো আনা সম্মতি সত্ত্বেও, রেবেকার পরিচিত এবং বন্ধুরা অনেকে এ বিয়েতে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। তিনি যখন একাধিক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হিশেবে মাদ্রাসে বেশ প্রতিপত্তির সঙ্গে লেখালেখি করছিলেন, তখনো তিনি বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সহযোগী এক পত্রিকা-সম্পাদক তাঁর এ সময়ে নাম দিয়েছিলো Mr Dirt।[২২] একবার তিনি ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করার সময়ে শ্রীলঙ্কাকে ভারতবর্ষের অংশ বলে বর্ণনা করেন। এই ভ্রান্ত বর্ণনাকে *Spectator* তীব্র ব্যঙ্গ করে।[২৩] মাইকেলের পক্ষে তখন এগিয়ে আসেন *Athenaeum* পত্রিকার সম্পাদক।[২৪] এ রকমের ঘটনা কতো ঘটেছিলো, তখনকার কাগজপত্রের নথি না-থাকায় সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। অথবা Mr Dirt নাম দেবার পেছনে কতোটা তিক্ততা কাজ করেছিলো, তার ব্যাপ্তি অথবা গভীরতার কথাও এখন কেবল অনুমান করতে পারি। মাদ্রাস স্কুলে চাকরি করতে যাবার সময়ে তিনি পত্রিকার কাজ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কর্তাব্যক্তিরা তাতে অনুমতি দেননি। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, মাদ্রাস স্কুলে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ পাননি। এ ঘটনাকেও তাকে তাঁর পক্ষে বর্ণবাদের ঘটনা বলে চিহ্নিত করা অসম্ভব নয়। এমন কি, সেখানে তিনি খাঁটি ইংরেজ শিক্ষকদের সমান বেতনও পাননি।

সর্বোপরি, ইংরেজ রাজত্বের ঔপনিবেশিক চরিত্রও তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিলো না। মাদ্রাসে থাকার সময়ে তিনি মুসলিম এবং ইংরেজ শাসনামলের মধ্যে তুলনা করে মুসলিম আমলের চেয়ে ইংরেজ আমলের শোষণের বেশি নিন্দা করেছিলেন। তা ছাড়া, পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখা যাবে, ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্যেও তাঁর মনে কম ক্ষোভ ছিলো না। মোট কথা, ইংরেজদের অবিমিশ্র প্রীতির চোখে, প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখার মতো মনোভাব তাঁর ছিলো না। সে জন্যে, সিপাহী বিপ্লবের প্রতি তাঁর মনোভাব কেমন ছিলো, তা এক কথায় বলা যায় না।

সিপাহী বিপ্লব উপলক্ষে দেশে যে-সংঘাত শুরু হয়েছিলো, তা পুরোপুরি শান্ত হবার আগেই আবার আরম্ভ হয় নীলকরদের অত্যাচার উপলক্ষে নতুন আন্দোলন। তখনকার বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ অনেকাংশে গড়ে উঠেছিলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল হিশেবে এবং ভদ্রলোকদের অস্তিত্ব অনেকটা নির্ভরশীল ছিলো কৃষকদের শোষণের ওপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভদ্রলোকদের মধ্যে কৃষকদের অথবা গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা একেবারে ছিলো না, তা নয়। তা না হলে হরিশচন্দ্র মুখার্জি অমন প্রবলভাবে *হিন্দু পেট্রিয়টের* পাতায় নীলকরদের অত্যাচারের কথা লিখতে পারতেন না। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* মতো জমিদার-পরিচালিত একটি ধর্মীয় পত্রিকায় নীলকর এবং জমিদারদের অত্যাচারের

জীবন্ত বর্ণনা প্রকাশিত হতে পারতো না। অথবা দীনবন্ধু মিত্রও *নীলদর্পণ* লিখতে পারতেন না। 'সাহেব' মাইকেলও *বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ*-র মতো প্রহসন লিখতে পেরেছিলেন এই সচেতনতা ছিলো বলেই। চা-বাগানের শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে সমাজের নিচের তলার অনেক লোককে নিয়ে পরবর্তী দু দশকে অনেকগুলো প্রহসন রচিত হয়েছিলো – সেও এই সচেতনতারই পরিচায়ক। বস্তুত, এ ছিলো সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মাদ্রাসে যিনি প্রতিটি চলতি ঘটনার খবর রাখতেন এবং সে সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করতেন পত্রিকার পাতায়, তিনি কলকাতায় এসে এসব ঘটনার প্রতি সামগ্রিকভাবে কী ধরনের সাড়া দিতেন, স্বভাবতই তা জানতে ইচ্ছে করে। এবং এসব ক্ষেত্রে তথ্যের অপ্রতুলতা আমাদের পীড়া দেয়। বাড়তি আয়ের জন্যে কলকাতার পত্রপত্রিকায় তিনি এ সময়ে লিখতেন কিনা, সে সম্পর্কেও কিছু বলার জো নেই। কলকাতার পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ভালো ছিলো না। এক সময়ে তিনি মাদ্রাসের মতো জায়গায় পত্রিকার জগতে ডুবে থাকলেও, কলকাতায় ফেরার কিছুকাল পরে কলকাতার পত্রিকাগুলো সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন, তা থেকে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, কলকাতায় পত্রিকায় থাকে বস্তা-পচা আবর্জনা।[২৫]

কলকাতায় ফিরে আসার পর তাঁর অন্তরে প্রবল বাত্যা দেখা দিয়েছিলো এবং বাইরের সমাজেও সংবর্ত সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু তাই বলে সময় দাঁড়িয়ে থাকেনি। দেখতে দেখতে দু বছর কেটে যায়। এবং এই বহমান সময় একটা শক্তিশালী ভেষজের মতো কাজ করে তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁর সব দুঃখবেদনা অনেকাংশে ভুলিয়ে দিয়েছিলো। ধীরে ধীরে তার প্রভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবনের শোচনীয় ট্র্যাজিডি কাটিয়ে উঠছিলেন। লেখার জন্যে মনও তৈরি হচ্ছিলো। সে রকম সময়ে – কলকাতায় আসার আড়াই বছর পরে – হঠাৎ তাঁর সুপ্ত সাহিত্যপ্রতিভা আবার জেগে উঠলো একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। নাটক রচনার অথবা তার অভিনয়ের কোনো ঐতিহ্য তখনো বাঙালি সমাজে তৈরি হয়নি। ১৮৫২-৫৩ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত যে-কটি নাটক প্রকাশিত হয়, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে অভিনীত হয়নি। তারপর ১৮৫৮ সালে কৌলীন্য এবং বিধবাবিবাহের মতো জীবন্ত এবং বিতর্কিত সমস্যা নিয়ে লেখা দুটি নাটকের অভিনয় তখনকার কলকাতার সমাজে হঠাৎ একটা উৎসাহের জন্ম দেয়। সেই সঙ্গে পৌরাণিক নাটকও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। এ বছরের মার্চ মাসে প্রথমে জয়রাম বসাকের বাড়িতে *কুলীনকুলসর্বস্ব* এবং তারপর আশুতোষ দেবের বাড়িতে *শকুন্তলা*র অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য এবং মঞ্চের নতুন ইতিহাস তৈরি হয়।[২৬] কয়েক জন ধনী নাট্যামোদী এতে যে-ভূমিকা পালন করেন, তা অভিনয় এবং নাটক রচনায় খুবই প্রেরণা দিয়েছিলো। এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ, পাইকপাড়ার দুই জমিদার-ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরোক্ষভাবে এঁরা মাইকেলের অবরুদ্ধ প্রতিভারও স্ফূরণ ঘটিয়েছিলেন।

প্রতাপচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থাপন করে *রত্নাবলী* নাটকের অভিনয় করান ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে। তাঁরা ঠিক করেছিলেন এই নাটকের তৃতীয় অভিনয়ের জন্যে বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডেসহ ইংরেজ কর্মকর্তা এবং অবাঙালি দর্শকদের নিমন্ত্রণ করবেন। কিন্তু এই দর্শকরা যেহেতু বাংলা নাটকের সংলাপ বুঝতে পারবেন না, সে জন্যে তাঁরা এই নাটকটি পুরো ইংরেজিতে অনুবাদ করানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা যখন এই অনুবাদ করার জন্যে একজন সত্যিকার যোগ্য লোক খুঁজছিলেন, তখন গৌরদাস বসাক মাইকেলের নাম প্রস্তাব করেন। গৌরদাসের সঙ্গে রাজাদের এমনি পরিচয় ছাড়াও, যোগাযোগের একটা কারণ এই যে, তিনি ছিলেন রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্য সমাজের সদস্য। কবির ইংরেজি জ্ঞান সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহ ছিলো না। তদুপরি,

The Captive Ladie প্রকাশ এবং মাদ্রাসে একাধিক পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্যে পারদর্শিতার নির্ভুল প্রমাণ দিয়েছিলেন। রাজারা বরং সন্দেহ করেছিলেন তাঁর বাংলা জ্ঞান সম্পর্কে। কিন্তু গৌরদাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর তাঁরা এ কাজ তাঁকে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। অনুবাদ করার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয় সম্ভবত জুন মাসে।

জেদ মাইকেলের চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি *রত্নাবলীর* অনুবাদ করতে সমর্থ কিনা, এ নিয়ে রাজারা এবং তাঁদের পারিষদবর্গ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সেটাই তাঁর জেদ বাড়িয়ে দিয়েছিলো। এ কারণে তিনি *রত্নাবলীর* অনুবাদ শুরু করেন খুব গুরুত্বের সঙ্গে। গৌরদাসকে এ সময়ে যে-দুটি চিঠি লেখেন, তা থেকে মনে হয়, তাঁর নিজের আত্মবিশ্বাস তখন তেমন জোরালো ছিলো না।[২৭] প্রথম দুই অঙ্কের অনুবাদ পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তাই গৌরদাসকে তা খুব যত্নের সঙ্গে পড়ে দেখতে বলেন। আর সেই সঙ্গে অনুরোধ জানান পরামর্শ দেবার জন্যে। গৌরদাসের সাহিত্য-জ্ঞান যে খুব গভীর নয়, তা তিনি জানতেন; সে জন্যেই বলেছেন: 'তোমার ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় কতোটা ঘনিষ্ঠ, তা আমার জানা নেই। কিন্তু অনুবাদ করতে গিয়ে আমি খাঁটি স্যাক্সন ইংরেজিতে লিখতে চেষ্টা করেছি, কারণ এটা হলো সর্বোত্তম নাটকগুলোর ভাষা।'[২৮]

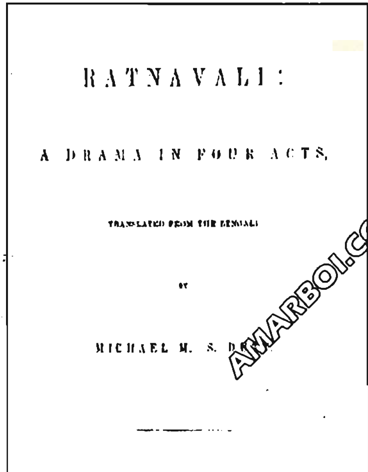
সর্বোত্তম ভাষায় তিনি যে-নাটকের অনুবাদ করছিলেন, সে নাটক যে সত্যিকার উঁচু মানের নাটক নয়, এটা অবশ্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। সে জন্যে, রামনারায়ণের রচনার মানের কথা মনে রেখে লিখেছেন: 'মূলই নিম্নমানের, আমি করবো কী!।' তিনি বেশ ভালো করে বুঝেছিলেন, তিনি যেমনটা অনুবাদ করেছেন ঐ নাটকের ওর চেয়ে ভালো অনুবাদ আশা করা ঠিক নয়। তবে তিনি তাঁর নিজের অনুবাদ সম্পর্কে যাই মনে করেন না কেন, দেশী-বিদেশী যাঁরা *রত্নাবলীর* অনুবাদ দেখেছিলেন, সবাই এর ভাষার খুব প্রশংসা করেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন যে, *Bengal Hurkaru*-র সম্পাদক এই নাটকের অভিনয় দেখে লিখেছিলেন, ইংরেজি ভাষায় কোনো বাঙালির এমন দখল আছে, তা তাঁর জানা ছিলো না। এমন কি, কলকাতায় যে-ইংরেজরা আছেন, তাঁদেরও অনেকে এমন ভাষায় লিখতে পারলে শ্লাঘা বোধ করবেন।'[২৯] এই অনুবাদ অক্টোবর মাসের আগেই কোনো এক সময়ে প্রকাশিত হয়েছিলো।

রত্নাবলী অনুবাদ করতে গিয়ে কবির একাধিক লাভ হয়েছিলো। প্রথম লাভ: অনুবাদের জন্যে পাঁচ শো টাকা পারিশ্রমিক। তিনি তাঁর চাকরিজীবনে এর আগে এতো টাকা কখনো একত্রে হাতে পাননি। ভারী খুশি হলেন। তা ছাড়া, নতুন সংসার পাততে যে-ব্যয় হয়েছিলো, তার ধকলও সামলে উঠলেন। কিন্তু এই অব্যবহিত লাভের চেয়ে অনেক বেশি লাভ হলো অন্যত্র। *রত্নাবলীর* মহড়া দেখে তিনি খুব হতাশ হয়েছিলেন। 'অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়!'[৩০] কিন্তু এই হতাশা সত্ত্বেও, তিনি মহড়ায় নিয়মিত যেতেন। গৌরদাস বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিও যেতেন সেখানে। তাঁকে জুলাই মাসের গোড়ার দিকে একদিন মধু বললেন: 'রাজারা এতো বাজে একটা নাটকের জন্যে এতো টাকা খরচ করছেন! আহা, আমি যদি আগে জানতাম! তা হলে, আমি তোমাদের থিয়েটারের জন্যে যোগ্য একটা নাটক দিতে পারতাম।' মধুর এ কথা শুনে গৌরদাস হেসে ফেলেন। তাঁকে খানিকটা ঠাট্টাও করেন। 'তুমি কি চাও, আমরা *বিদ্যাসুন্দরের* মতো আর-একটা নাটকের অভিনয় করি?'[৩১] গৌরদাস নিশ্চয় জানতেন মাইকেলের রুচি আর *বিদ্যাসুন্দরের* রুচি এক রকমের নয়। তিনি আসলে যা বলতে চেয়েছিলেন, তা হলো: তাঁর বন্ধু বাংলায় কিছু লিখতে পারবেন, এটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। বা লিখলেও তা কিছু হবে না।

রত্নাবলীর অনুবাদ করতে পারবেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে রাজারা যেমন মাইকেলের

জেদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, বাংলা নাটক লিখতে পারবেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহপ্রকাশ করে গৌরদাস একই কাজ করেছিলেন। বস্তুত, মাইকেলকে উস্কে দেবার জন্যে এই খোঁচাটুকুই যথেষ্ট ছিলো। পরের দিন সকালে তিনি যান এশিয়াটিক সোসাইটিতে। সেখানে কাজ করতেন গৌরদাসের এক জ্ঞাতি ভাই। তাঁর কাছ থেকে তিনি কয়েকখানি বাংলা আর সংস্কৃত বই, বিশেষ করে নাট্যরচনা, নিয়ে এলেন। তারপর সপ্তাহখানেকের মধ্যে একদিন গৌরদাসকে তিনি একটি নাটকের প্রথম কয়েকটি দৃশ্য পড়ে শোনালেন।[৩২]

পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ দেখেই গৌরদাস স্বীকার করলেন: হ্যাঁ, খাঁটি নাটকই বটে! তিনি বন্ধুর কীর্তি দেখে বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়েছিলেন। তক্ষুণি সেই দৃশ্য কটি নিয়ে তিনি বেলগাছিয়ায় যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কবি তাঁকে থামিয়ে দিলেন। তাঁকে লিখে জানালেন: 'আগে শেষ করি প্রথম অঙ্ক। তারপর যেয়ো।' গৌরদাস পাণ্ডুলিপি দেখাতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে নিজের উচ্ছ্বাসও চেপে রাখতে পারলেন না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে বললেন, মধুর কীর্তির কথা। যতীন্দ্রমোহন মধুকে চিনতেন না; কিন্তু *The Captive Ladie* পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সে জন্যে ১৬ জুলাই (১৮৫৮) গৌরদাসকে লিখলেন: 'আপনার বন্ধুর পাণ্ডুলিপি পড়ার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। যিনি একটি বিদেশী ভাষায় অমন চমৎকার লিখতে পারেন, তিনি যে নিজের ভাষায় অবদান রাখতে পারবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আপনার বন্ধু যদি যে-কোনো দিন আমার বাগানবাড়িতে আসেন, তা হলে আমি সম্মানিত বোধ করবো।'[৩৩]


RATNAVALI:

A DRAMA IN FOUR ACTS.

TRANSLATED FROM THE BENGALI

BY

MICHAEL M. S. D

অনূদিত *রত্নাবলীর* নামপত্র

বন্ধুদের এই পাণ্ডুলিপি দেখানোর জন্যে গৌরদাস কবিকে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু কবির মনে তখনো নিজের বাংলা লেখার মান সম্পর্কে খানিকটা সংশয় থেকে গিয়েছিলো। সে কারণে তিনি তাঁর সংলাপে কোনো ব্যাকরণের ভুল থাকলে, তা সংশোধন করার জন্যে রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়েছিলেন। *রত্নাবলীর* মহড়া দেখতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কবির পরিচয় হয়েছিলো। কিন্তু রামনারায়ণের সংশোধন দেখে তিনি খুব হতাশ হলেন। তক্ষুণি ঠিক করে ফেললেন, তাঁর সাহায্য নেবেন না। 'নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবো, নয়তো ডুবে যাবো। ... সাহিত্যের দরবারে আমি অন্যের ধার করা পোশাক পরে দাঁড়াতে চাইনে। আমি একটা টাই হয়তো নিতে পারি, একটা ওয়েস্ট কোটও নেওয়া সম্ভব; কিন্তু গোটা স্যুট নয়। ... দুয়েক জায়গায় একটা-আধটা পরিবর্তন করতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমার বাক্যগুলোকে আমি ঢেলে সাজাবো? ছ্যা, তার চেয়ে আমি বরং ওটা পুড়িয়ে ফেলবো।'

আসলে, সংস্কৃত-পণ্ডিত রামনারায়ণ অনেক জায়গায় কবির বাক্যগুলো নিজের মতো করে লিখেছিলেন। সেটা স্বাধীন চিন্তা এবং নিজের স্টাইলে বিশ্বাসী মাইকেলের পছন্দ হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন, ব্যাকরণের ভুল থাকেলে রামনারায়ণ কেবল সেগুলো শোধরাবেন, অন্য কিছু নয়। বিশেষ করে রামনারায়ণ তাঁর নায়িকা শর্মিষ্ঠার সংলাপ যেভাবে বদল করেছিলেন, সেটা তাঁর খুব খারাপ লাগলো: 'আমার বেচারী শর্মিষ্ঠাকে দিয়ে রামনারায়ণ জঘন্য গদ্যে কথা বলিয়েছেন।' তা ছাড়া, 'একজনের স্টাইলের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে চোখে পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বন্ধু আর আমার মধ্যে সামান্যই মিল রয়েছে।' অবশ্য বিরক্ত হলেও রামনারায়ণের কিছু পরামর্শ তিনি মেনে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। আর তাঁর সম্পর্কে নিজের এই মন্তব্যকেও তিনি গোপন রাখতে চান। গৌরদাসকে তাই লিখেছেন: 'তোমার বন্ধুদের সঙ্গে এ নাটক সম্পর্কে কোনো কথা হলে দয়া করে রামনারায়ণের বিষয়ে কিছু বোলো না।'[৩৪] কবি হয়তো তাঁর প্রতি প্রকাশ্যে অশ্রদ্ধা দেখাতে চাননি অথবা ভেবেছেন, তাঁর ভাষার সমালোচনা করলে লোকের কাছে নিজেরই হাস্যকর হতে হবে। মোট কথা, বাংলায় এ তাঁর প্রথম রচনা, সুতরাং একটু মাজাঘষা না-করে তিনি এ নাটক কাউকে দেখাতে চান না। 'এমন অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাণ্ডুলিপি দেখানোর কথাটা আমার ভালো লাগছে না। কিন্তু এ সপ্তাহের শেষেই তোমাকে প্রথম তিন অঙ্ক দিতে পারবো।'[৩৫]


রামনারায়ণ তর্করত্ন

কবি জানতেন, নাটক জিনিশটা দেশী মাল নয়। বিশেষ করে তিনি লেখার সময়ে বিদেশী নাটকের আঙ্গিক এবং ভাবের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। অলীক কুনাট্য দিয়ে যাঁদের রুচি গড়ে উঠেছে, তাঁদের সেটা ভালো নাও লাগতে পারে। নিজেকে তাই সান্ত্বনা দিলেন:

> ভাবনাগুলো যদি যথাযথ এবং উজ্জ্বল হয়, প্লট যদি কৌতূহলোদ্দীপক হয়, আর চরিত্রগুলো যদি ঠিকমতো অঙ্কিত হয়, তা হলে বিদেশী আবহাওয়া আছে কি নেই, কে তার ধার ধারে? মূরের কবিতায় প্রাচ্যের উপাদান, বায়রনের কবিতায় এশিয়ার ভাবধারা, কার্লাইলের রচনায় জার্মানবাদ দেখে কেউ কি তার নিন্দা করে! তা ছাড়া, আমি তো লিখছি আমার দেশের সেই লোকেদের জন্যে, পাশ্চাত্য ভাবধারায় যাঁদের মন লালিত হয়েছে। ... ঘাবড়ে যেয়ো না, গৌর, যাঁরা মোটে ইংরেজি জানেন না, এমন কয়েক জনকেও আমি দ্বিতীয় অঙ্কটা দেখিয়েছি এবং তাঁরা যে-ভাষায় এ নাটকের প্রশংসা করেছেন, তাতে মাঝেমধ্যে আমার মনে হয়েছে, এঁরা বোধ হয় আমাকে তোশামোদ করছেন। ...দুশ্চিন্তা কোরো না দোস্ত, আমি এমন একটা নাটক লিখবো, যা দেখে ঐ বুড়ো হতচ্ছাড়া পণ্ডিতগুলো থ হয়ে যাবে।

এই রচনা সম্পর্কে তাঁর আত্মবিশ্বাস ততোক্ষণে অনেকটা বেড়ে গেছে। তাই লিখলেন: 'যতীন্দ্র বাবু

আর রাজাদের দেখলে তুড়ি দিয়ে তুমি তাঁদের উড়িয়ে দিয়ো – ওভাবেই বাজারে একটা জিনিশের দাম বাড়াতে হয়।'[৩৬]

The Captive Ladie লিখেছিলেন তিন সপ্তাহের মধ্যে। *শর্মিষ্ঠা* লিখতেও তার চেয়ে খুব বেশি সময় লাগলো না। সৃষ্টির নেশা যখন তাঁর ওপর ভর করতো, তখন তিনি ধীরে-সুস্থে লিখতে পারতেন না। যা কিছু লেখার ঝড়ের গতিতেই লিখতেন। বছর দেড়েক পরে নিজেই কেশব গাঙ্গুলিকে জানিয়েছিলেন: 'ধীমা তাল আমার তাল নয়, যা লিখবো ঝটপট লিখে ফেলবো।'[৩৭] তোয়াক্কা না-করার ভাব দেখিয়ে *শর্মিষ্ঠার* দাম বাড়াতে হয়নি, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মাইকেল মেজে-ঘষে যখন তাঁর পাণ্ডুলিপি রাজাদের কাছে পাঠালেন, রাজারা তখন তা পড়ে মুগ্ধ না-হয়ে পারলেন না। এই নাটকের আঙ্গিক এবং ভাবধারায় যে-পাশ্চাত্য প্রভাব ছিলো, তা দেখে প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতরা এর সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হননি।[৩৮] বস্তুত, এটা নাটক হয়নি – তাঁদের কেউ কেউ এমন কথাও বলেছিলেন। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা এই নাটকের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। তাঁরা স্বীকার করলেন যে, এমন একটি নাটকও বাংলা ভাষায় লেখা হয়নি। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে জোরদার হলো রাজা-ভ্রাতাদের এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্বীকৃতি। কারণ নাটক মঞ্চস্থ করা এবং প্রকাশ করার ব্যাপারে সরাসরি পৃষ্ঠপোষণা এলো তাঁদের কাছ থেকে। সত্যি বলতে কি, পরে দেখতে পাবো, তহবিল দিয়ে তাঁরা কবির রচনাবলীর ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

মাইকেল *শর্মিষ্ঠার* কাহিনী নিয়েছিলেন *মহাভারতের* আদিপর্ব থেকে। বিশেষ করে এ কাহিনী তিনি কেন বেছে নিলেন, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে তার উত্তর খোঁজার জন্যে খুব দূরে যাবার দরকার নেই। নাট্যকারের নিজের জীবনে এই নাটকের ঘটনাগুলো আগেই অভিনীত হয়ে গিয়েছিলো। কবির নিজের জীবনের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার অসাধারণ মিল চোখে না-পড়ে পারে না। যযাতি মানুষ হলেও, তিনি যে-দুই নারীর প্রেমে পড়ে তাঁদের বিয়ে করেন, তাঁদের একজন দৈত্যরাজের কন্যা, অন্যজন দৈত্যগুরুর কন্যা। মাইকেল নেটিভ হলেও, তিনি যে-নারীদের প্রেমে পড়েছিলেন, তাঁরা কেউই নেটিভ নন। যযাতির সঙ্গে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার যেমন 'নৃতাত্ত্বিক' পার্থক্য রয়েছে, তেমনি মাইকেলের সঙ্গে রয়েছে রেবেকা ও হেনরিয়েটার নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য। নাটকে শর্মিষ্ঠার কাহিনী এ রকম:

> রাজা যযাতি যখন শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন, তখন পূর্ব শর্ত অনুযায়ী অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীর পরিচারিকা হয়ে যযাতির ঘরে আসেন। সেখানে যযাতি শর্মিষ্ঠার রূপলাবণ্য দেখে অচিরে তাঁর প্রেমে পড়ে তাঁকে গোপনে গান্ধর্বমতে বিয়ে করেন। তাঁর ঘরে যযাতির তিন পুত্র জন্মে। তারপর একদিন রাজা যখন দেবযানীর হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে শর্মিষ্ঠার বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শর্মিষ্ঠার সন্তানরা এসে রাজাকে সংবর্ধনা জানায় এবং প্রশ্ন করে রাজা কেন, তাদের মা নন, এমন এক মহিলার হাত ধরে যাচ্ছেন।

নাটকে রাজার প্রেম এবং দ্বিতীয় বিবাহের খবর এভাবে প্রকাশ পায় দেবযানীর কাছে:

> রাজা। কি আর বলবো ভাই! এবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত; এত দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন।
>
> বিদূ। বলেন কি মহারাজ? তা এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই; ভাল, রাজমহিষী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে পারলেন?
>
> রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হলে, লোকের আর দুঃখের সীমা থাকে না। মহিষী অদ্য সায়ংকালে অনেক যত্নপূর্ব্বক তাঁর পরিচারিকাদের উদ্যানে ভ্রমণ করতে আমাকে আহ্বান করেছিলেন; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পারলেম না। সুতরাং আমরা উভয়ে তথায় ভ্রমণ করতে করতে প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্ত্তী হলেম। ভাই হে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ কি যে প্রকারে উদ্বিগ্ন হলো, তা বলা দুষ্কর।
>
> বিদূ। বয়স্য! তার পরে?

রাজা। আমাকে দেখে প্রিয়তমা প্রেয়সী শর্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করে প্রফুল্লবদনে উর্দ্ধশ্বাসে আমার নিকটে এলো এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান রইলো।

বিদূ। কি দুর্ব্বিপাক! তার পরে?

রাজা। রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃদুস্বরে বললেন, বৎসগণ, তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করো না। এই কথা শুনে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, সক্রোধে স্বীয় কোমল বাহু আস্ফালন করে বল্লে, আমরা কাকেও শঙ্কা করি না, তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও, তিনি হলে আমাদের কত আদর কত্যেন।

*

রাজমহিষী তৎকালে আমাকে আর প্রিয়তমা শর্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভর্ৎসনা করলেন, তার আর সীমা নাই।

কবি মাদ্রাস থেকে গৌরদাসকে যখন লিখেছিলেন, চমৎকার স্ত্রী এবং চার সন্তান নিয়ে তিনি বেশ সুখে আছেন, তার ৩৯ দিন পরে তিনি সেই চমৎকার স্ত্রী এবং সন্তানদের ফেলে চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য হন। খুব সম্ভব হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের খবর আবিষ্কার হবার ফলেই তাঁর সংসার নাটকীয়ভাবে ভেঙ্গে গিয়েছিলো। দেবযানীর মতো রেবেকাও যদি এমনি আকস্মিকভাবেই হেনরিয়েটার সঙ্গে কবির গোপন প্রেমের কথা জেনে থাকেন, তা হলে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। এমন কি, এই গোপন কথা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর কোনো সন্তানের ভূমিকা থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়।

নাটকে দেখতে পাই, রাজার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার গোপন সম্পর্কের কথা জানাজানি হবার পরে, দেবযানী রাজাকে ত্যাগ করে পিতার কাছে চলে যান। নাটকের শেষে এসে শুক্রাচার্যের মধ্যস্থতায় রাজা দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার মধ্যে আপোশ করে দুই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করার একটা জোড়াতালি দেওয়া সমাধান বের করছেন।

রাজ্ঞী। (শর্মিষ্ঠাকে) সে যা হৌক, সখি, অদ্যাবধি আমাদের পূর্ব্বপ্রণয় সঞ্জীবিত হলো। এখন এসো, দুই জনেই পতিসেবায় কিছুদিন সুখে যাপন করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশাল তরুবর, মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো।

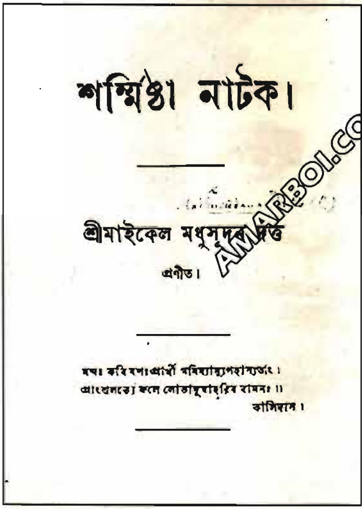
রাজা। (প্রফুল্লমুখে উভয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া) অদ্য এক বৃন্তে যুগল পারিজাত প্রস্ফুটিত।

নাটকে যেমন সমাধানই দেখান না কেন, বাস্তব জীবনে মাইকেল কোনো সমাধান খুঁজে পাননি। তবে ১৮৫৮ সালের মাঝামাঝিও তাঁর তেমন চেষ্টা অব্যাহত ছিলো কিনা কে জানে? তিনি যখন *শর্মিষ্ঠা* রচনা করেন, হেনরিয়েটা তখনও কলকাতায় আসেননি। সে জন্যে তিনি কি তখনও রেবেকা আর হেনরিয়েটার মধ্যে আপোশ করে রেবেকার সঙ্গে সংসার করার কথা ভেবেছেন কিনা, তা বোঝা যায় না। তবে নাটকে দুই সতীনের মধ্যে আপোশ করানো এবং তাদের নিয়ে ঘর করানো সম্ভব হলেও বাস্তব জীবনে সেটা অনেক শক্ত। তাই দেখতে পাই, তিনি আর মাদ্রাসে ফিরে যেতে পারেননি। বরং মাদ্রাস থেকে এর অল্প পরেই হেনরিয়েটা এসে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়েছেন।

১৮৪৮ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৮৪৯ সালের শেষ দিক পর্যন্ত বছর খানেকের জন্যে তাঁর মধ্যে যে সৃজনশীলতার জোয়ার এসেছিলো, ঠিক দশ বছর পরে তার পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হয় এ সময়ে। মাদ্রাসে তখন নতুন বিয়ে করা বৌ-এর সঙ্গে প্রেমে, তৃপ্তিতে তিনি উচ্ছ্বসিত। ১৮৫৮ সালের শেষ দিকেও সে রকমের একটা সময় এলো। এবারে রেবেকা নন, তাঁর ঘরে হেনরিয়েটা। এ বছরের একেবারে শেষ দিকে হেনরিয়েটা কলকাতায় আসেন। জাহাজের যাত্রীদের তালিকা থেকে তাঁর নাম অবশ্য আমি বের করতে পারিনি। অবিবাহিত অবস্থায় তিনি মাইকেলের আহ্বানে কলকাতায় আসছিলেন পিতার বিনা অনুমতিতে।[৩৯] রেবেকার বন্ধুদেরও তিনি নিশ্চয় জানাতে চাননি। সুতরাং তাঁর পক্ষে ছদ্মনামে

আসা সম্ভব। তা ছাড়া, পুরুষপ্রধান সমাজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তখন যাত্রীদের তালিকায় অনেক সময়ে মেয়েদের নাম লেখা হতো না। কেবল লেখা থাকতো 'এতোজন মহিলা এবং এতো জন শিশু।' সুতরাং হেনরিয়েটার কলকাতা আগমনের নির্দিষ্ট তারিখ বলা সম্ভব নয়। তবে কবি তাঁর চিঠিতে হেনরিয়েটার কথা প্রথম বারের মতো উল্লেখ করেন পরের বছর – ১৮৫৯ সালের ৯ জানুআরি। এই চিঠির ভাষা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, 'মিসেস ডাট' সদ্য এসেছেন। 'তোমার চিঠি এবং আমাদের ব্যাপারে তুমি যে-আগ্রহ দেখিয়েছো, তার জন্যে মিসেস ডাট তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তোমার চিঠিটা এসেছে গতকাল। তুমি আমাদের উভয়ের শ্রদ্ধা জেনো।'[৪০] হেনরিয়েটা অনেক দিন আগে এলে এ পর্যায়ে আর 'আমাদের ব্যাপারে তুমি যে-আগ্রহ দেখিয়েছো' – এই আগ্রহ দেখানোর প্রশ্ন উঠতো না।

তাঁর প্রথম সন্তান হবার তারিখ থেকেও হেনরিয়েটা কখন কলকাতায় আসেন, তার খানিকটা আঁচ করা যায়। এই সন্তান – শর্মিষ্ঠার জন্ম হয় ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কলকাতায় আসার আট বছরের মধ্যে হেনরিয়েটার নিয়মিত বিরতিতে মোট চারটি সন্তান হয়েছিলো। সেভাবে বিবেচনা করলে, তিনি কলকাতায় আসার এক বছরের মধ্যেই প্রথম সন্তান হওয়া স্বাভাবিক। সে হিশেবে তিনি কলকাতায় আসেন ১৮৫৮ সালের সেপ্টেম্বরের পরে।


শর্ম্মিষ্ঠা নাটক।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥
কালিদাস।

শর্মিষ্ঠার নামপত্র

একবার কল্পনার পালে হাওয়া লাগার পর এক সময়ে তিনি যেমন *The Captive Ladie-Visions of the past-Upsori-Rizia* এবং তাঁর অনামী কাব্যটি (১৮৪৯) লিখেছিলেন নেশাগ্রস্তের মতো, তেমনি মত্ত হলেন সৃষ্টির আনন্দে। *শর্মিষ্ঠা* রচনা শেষ হবার পর একটার পর একটা বড়ো কল্পনা তাঁর মাথায় এলো। তিনি, তাঁর ভাষায়, এই পর্বে রক্তের স্বাদ পেয়েছিলেন।[৪১] এর পর তিনি আর পেছনে ফিরে তাকাননি। আত্মবিশ্বাসের কোনো সংকটও তাঁর মনকে বিহ্বল করেনি। যদিও মাঝেমধ্যে বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষকদের উৎসাহ এবং কখনো কখনো উৎসাহের অভাব তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে বৈকি!

মাদ্রাস থেকে এক চিঠিতে তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন: তাঁর বড়ো কবি হবার পথে তেমন কোনো বাধা তো নেই, কেউ যদি শুধু মাসে মাসে কয়েক শো টাকা ব্যয় করতে রাজি থাকতেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ঠিক তেমন কল্পতরু ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মনে হলো,

এঁরা সাহিত্যের বেশ পৃষ্ঠপোষণা করতে চান। তাঁরা টাকা ব্যয় করতে রাজি ছিলেন; আবার আধুনিক সাহিত্য বোঝার মতো বিদ্যেও মোটামুটি এঁদের ছিলো। মধুসূদন সহজে বন্ধু হতে পারতেন। রাজাদের সঙ্গেও তাঁর দ্রুত বন্ধুত্ব হলো। *রত্নাবলীর* অনুবাদ করে রাজাদের কাছ থেকে যে-মোটা টাকা পেয়েছিলেন, তার জন্যেও তিনি রাজাদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন। তাই ১৮৫৯ সালের জানুআরি মাসের মাঝামাঝি *শর্মিষ্ঠা* প্রকাশিত হলে তা উৎসর্গ করলেন রাজ-ভ্রাতাদের নামে।



হেনরিয়েটা: কবি-জীবনের শেষ পনেরো বছরের সুখদুঃখের ভাগিনী

শর্মিষ্ঠা প্রকাশ করে *রত্নাবলীর* মতো এক থোক টাকা পেলে তিনি নিশ্চয় খুশি হতেন। বিশেষ করে হেনরিয়েটা কলকাতায় আসায় তাঁর খরচ বেড়ে গিয়েছিলো, এমনটা মনে করা সঙ্গত। কিন্তু টাকা তিনি পাননি। বরং মুদ্রণের জন্যে রাজাদের কাছ থেকে যে-ঋণ নিয়েছিলেন, তা শোধ করতে সময় লেগেছে। অবশ্য যা তিনি পেয়েছিলেন, তা টাকার তুলনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ – স্বীকৃতি এবং আত্মবিশ্বাস। বই প্রকাশের ক দিন আগেই গৌরদাসকে লিখেছেন: '*শর্মিষ্ঠা* ভারী সুন্দরী মেয়ে হয়েছে

— তাকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কথা যদি আমার বিশ্বাস করতে হয়। যতীন্দ্র ঠাকুর বলেছেন: এ হলো আমাদের ভাষার সবচেয়ে সেরা নাটক। আর ছোটো রাজা তিন সত্যি দিয়ে বলেছেন: এ নাটকটি ষোলো আনা সার্থক হয়েছে।'[৪২] সবার কাছ থেকে এ ধরনের উচ্চ প্রশংসা শুনে শুনে তিনি এক সময়ে সত্যি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন যে, এই নাটকের মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকে পরিণত হয়েছেন। 'এই নাটক আমাকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী একটা আসন দেবে, তোমাকে এটা না-বললেও চলে। সবাই এর কাব্যগুণ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন।'[৪৩] ব্যাপারটা অবশ্য তাঁর কাছে অবিশ্বাস্যই ঠেকে। কারণ কিছু দিন আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে তিনি শেখার মতো ভাষা বলেই গণ্য করেননি। বরং এ ভাষা ভুলে যাবার জন্যে চেষ্টা করেছেন প্রাণপণ। যে-ভাষাকে তিনি চরম অযত্ন করেছিলেন, সেই ভাষা যে তাঁকে এতো সৃষ্টির উপকরণ এবং এতো খ্যাতি এনে দিয়েছে — পরবর্তী দু বছর সে কথা তিনি বারবার বলেছেন। কেবল তাই নয়, যথাসময়ে দেখতে পাবো, এ চিন্তা তাঁকে এতোটা আবেগে উদ্দীপ্ত করেছিলো যে, তিনি এ নিয়ে একটি অসাধারণ কবিতাও লিখে ফেলেন। *শর্মিষ্ঠা* তাঁকে যে-অবিশ্বাস্য খ্যাতি এবং স্বীকৃতি দিয়েছিলো, তা দেখে গৌরদাসের কাছে তিনি অকপটে স্বীকার করেন: 'তোমাকে যদি মনের কথাটা খুলে বলি, তা হলে বলতে হবে, আমি সত্যি সত্যি কল্পনা করিনি যে, এই একটি নাটকের মধ্য দিয়ে আমি এতোসব করতে পারবো।'[৪৪] স্বীকৃতি এবং খ্যাতি লাভের মধ্যে কী আনন্দ *The Captive Ladie* লিখে তিনি তা যেমনটা চেয়েছিলেন, সেভাবে অনুভব করতে পারেননি। এখন *শর্মিষ্ঠা* তাঁকে সেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হবার সুযোগ দিলো।



প্রতাপচন্দ্র সিংহ

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলায় লেখার কোনো অভিজ্ঞতা না-থাকা সত্ত্বেও প্রথম রচনায়ই তিনি এতো সফলতা দেখালেন কী করে? কাহিনীর পরিকল্পনা, চরিত্র চিত্রণ এবং সংলাপ রচনায় কোনো রকমের অনুশীলন ছাড়া, সাফল্যের এই চাবিকাঠি তিনি পেলেন কোথায়? এর একটা সহজ উত্তর আছে। আসলে মাদ্রাসে *Rizia* নাটক লেখার মাধ্যমেই নাটক রচনায় তিনি হাত মক্স করেছিলেন। এ ছাড়া, কাহিনী নির্মাণে তাঁর একটা স্বাভাবিক পটুত্বও ছিলো। হিন্দু কলেজের আমল থেকেই তিনি কবিতার মধ্যেও কাহিনী নিয়ে আসতে আরম্ভ করেছিলেন। এবং আগেই উল্লেখ করেছি, আখ্যানমূলক কবিতায় তাঁর হাত খুলতোও ভালো। *The Captive Ladie*-তে তিনি আখ্যানকাব্য লেখার ব্যাপারে বড়ো রকমের অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছিলেন। যদিও স্বীকার না-করে উপায় নেই যে, *Rizia*-য় যে-নাটকীয়তা ছিলো, *শর্মিষ্ঠায়* তা অনেকাংশে অনুপস্থিত। তিনি এ কাহিনীর নাটকীয়তা পুরোপুরি কাজে লাগাতেও পারেননি। মনে হয়, এ ব্যাপারে ভাষা একটা বড়ো অন্তরায় হিশেবে কাজ করেছিলো। কোথাও কোথাও প্রতিদিনের মুখের ভাষার আভাস এবং সাবলীলতার বীজ দেখতে পেলেও, এক কথায় বলা যেতে পারে, এ নাটকের সংলাপের ভাষা খুব আড়ষ্ট। যে-সাবলীলতার বীজ এ নাটকে দেখা যায়,

সেই বীজই পরে অন্যান্য নাটকে কমবেশি পল্লবিত হয়ে দেখা দিয়েছিলো। তদুপরি, রামনারায়ণের হস্তক্ষেপের ফলে সংলাপের ভাষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা তিনি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। সমকালীন বাংলা নাটকের আদর্শও তাঁকে প্রভাবিত করেছিলো। সে জন্যে কেবল *শর্মিষ্ঠায়* নয়, তাঁর অন্যান্য নাটকেও তিনি ভদ্রলোকদের মুখে কৃত্রিম এবং গুরুচণ্ডালী মেশানো আড়ষ্ট ভাষা, এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষ আর মহিলাদের মুখে কথ্য ভাষা ব্যবহারের রীতি অনুসরণ করেছেন। অবশ্য রামনারায়ণ-সহ যে-বাঙালি নাট্যকারগণ সংলাপে এ ধরনের আদর্শ তাঁর আগেই অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা সে আদর্শ পেয়েছিলেন সংস্কৃত নাটক থেকে। সমকালীন বাংলা নাটক এবং সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের প্রতি এই আনুগত্য না-দেখালে মাইকেলের নাটকের ভাষা গোড়া থেকেই অনেকটা স্বচ্ছন্দ হতে পারতো বলে অনুমান করি।

সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, *শর্মিষ্ঠা* সম্পর্কে তিনি সমালোচনার বদলে প্রশংসা লাভ করেছিলেন অনেক বেশি। এই প্রশংসা থেকে তাঁর নিজের মনেও এ নাটকের মান সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা হয়েছিলো। এ নাটক নিয়ে তিনি কতোটা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন, তার আর-একটা প্রমাণ: তিনি হেনরিয়েটার প্রথম কন্যার নাম রেখেছিলেন শর্মিষ্ঠা। কন্যা জন্মানোর মাত্র ক দিন আগেই *শর্মিষ্ঠার* খুব সার্থক অভিনয় হয়েছিলো। তা-ও তাঁকে এই নাম দিতে উৎসাহিত করে থাকবে।

শর্মিষ্ঠা নাটকের আগে পর্যন্ত বাংলায় বলতে গেলে কোনো নাটকই লেখা হয়নি। সে কারণে এই নাটক সবার দৃষ্টি কেড়েছিলো। তা না-হলে এ নাটক সাহিত্যের বিচারে উঁচু দরের কোনো নাটক বলে গণ্য হতে পারে না। চরিত্র অঙ্কন, দৃশ্য পরিকল্পনা, এবং, সর্বোপরি, সংলাপ রচনায় এ নাটকের দুর্বলতা সহজেই চোখে পড়ে। নাটকের আঙ্গিক সম্পর্কেও তিনি ঠিক মনঃস্থির করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সে জন্যে প্রাচীনপন্থীরা এ নাটকে বিজাতীয় অর্থাৎ পশ্চিমা প্রভাব দেখতে পেলেও, আসলে এ নাটকে তিনি দেশীয় রীতির প্রতি যথেষ্ট আনুগত্য দেখিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য নাট্যকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের অভাব নয়, আত্মবিশ্বাসের অভাবই এর জন্যে দায়ী। তিনি আশঙ্কা করেছেন, দেশীয় রীতি মেনে না-চললে তাঁর নাটক লোকেরা গ্রহণ করবেন না। তবে এই নাটক ব্যাপক স্বীকৃতি লাভের পর তিনি যে-আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন, তা দিয়ে পরবর্তী নাটক এবং কাব্যে তিনি আপন চিন্তাধারার ছাপ আরো কর্তৃত্বের সঙ্গে এঁকে দিতে পেরেছিলেন। এমন কি, এ নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময়েও তাঁর এই বর্ধিত আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অনুবাদের ভূমিকায় তিনি যেভাবে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমন্বয় করার সাধনায় তাঁর যৌবনের সবচেয়ে ভালো সময়টা উৎসর্গ করার কথা বড়াই করে বলেছেন,[৫৫] তা থেকে এই মনোভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে *শর্মিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ* কোনো নাটক না-হওয়া সত্ত্বেও এর ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যাবে না। আর নাট্যকারের নিজের জীবনেও এই নাটক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

শর্মিষ্ঠা যখন প্রকাশিত হয়, মোটামুটি তখনই হেনরিয়েটা গর্ভবতী হন। প্রায় ছ বছর প্রণয়লীলা চলার পর তাঁর সঙ্গে মাইকেলের মিলন হয়। অনুমান করি, তাঁদের এই মিলন ছিলো প্রচণ্ড আবেগ এবং উচ্ছ্বাসে ভরা। গোড়ার দিকে, স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষের মতো কবি পুলিশ কোর্টের নথিতে ভুল করেছিলেন কিনা, জানা নেই। তবে চীফ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে কোর্ট থেকে নির্বাসন দেননি। বরং ম্যাজিস্ট্রিটদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিলো। হেনরিয়েটার সঙ্গে মিলনের পর প্রথম দিকে তাঁকে অনেকটা সময় দিতে হতো বলে মনে হয়। তা ছাড়া, নতুন করে সংসার শুরু করতে গিয়ে মাদ্রাসের মতোই আর-একবার বেশ অর্থকষ্ট অনুভব করেন। নিজের আয় নিয়ে তিনি কখনো সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং অন্যদের যোগ্যতার সঙ্গে নিজের যোগ্যতা এবং আয়ের তুলনা করে তিনি চিরকাল অসুখী বোধ

করেছেন। এখন হেনরিয়েটার আগমনে সেই অসন্তোষ আর-একবার দাঁত মেলে দেখা দিলো। নানা জনের কাছে এ সময়ে তাঁর দেনা জমে ওঠে। পরেও দেখা যাবে, অভাবের সময়ে তিনি পাড়ার দোকানদার এবং বাড়িওয়ালা থেকে আরম্ভ করে অনেকের কাছ থেকে ধার করতেন।

আর্থিক অনটনের মুখে নাটক অথবা কাব্য রচনার কাজ বাদ দিয়ে তিনি আপাতত কিছু দিন নিজের আর্থিক অবস্থা ভালো করার জন্যে অন্য একটি পথে পা বাড়ালেন। আইনজীবী হিশেবে তিনি তাঁর পিতাকে প্রচুর অর্থ আয় করতে দেখেছেন। এখন দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর চার দিকে তাঁর চেনা অনেক বাঙালিকে যাঁদের আয় ছিলো তাঁর তুলনায় অনেক বেশি। তিনি ভাবলেন, উকিল হবার জন্যে তাঁর তো বেশি কিছু করার নেই। পুলিশ কোর্টে আড়াই বছর কাজ করার পর মামলা-মকদ্দমা তো তিনি ভালোই বোঝেন। এখন তিনি যদি আসন্ন আইন পরীক্ষায় অংশ নেন, তা হলে সমস্যার সমাধান হতে পারে! তাঁর চারদিকের 'অর্ধশিক্ষিত' এবং 'মেধাবর্জিত' লোকেরা যদি এ পরীক্ষায় পাশ করতে পারে, তা হলে তাঁর না-পারার কোনো কারণ নেই। সুতরাং কষে আইন পড়তে আরম্ভ করলেন। এ সময়ে আইন পরীক্ষা নেবার জন্যে সরকারের একটি কমিটি ছিলো আটজন সদস্যবিশিষ্ট। লিখিত পরীক্ষা নেবার পর, কারা উকিল হবার যোগ্য এই কমিটি তা নির্ধারণ করে একটা সার্টিফিকেট দিতো। গৌরদাসকে ১৮৫৯ সালের ৯ জানুআরি কবি লিখেছেন: 'আমি ভীষণ ব্যস্ত, আগামী আইন পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি। এ পরীক্ষায় ফেল করতে পারি—এমন চিন্তা আমার আদপে ভালো লাগছে না। কিন্তু আমার ভাগ্যে কী আছে কে জানে!' সত্যি, ভাগ্য তাঁর এ ব্যাপারে প্রসন্ন ছিলো না। অনেকে তাঁকে এ সময়ে বুদ্ধি দিলেন যে, আগে *শর্মিষ্ঠা* (এবং অন্য রচনা) থেকে যথেষ্ট খ্যাতি হোক, তার পরে আইন পরীক্ষা দিলেই চলবে।[৪৬] ততোদিন তাঁর উচিত হবে, এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকা। তদুপরি, জানুআরি মাসের শুরু থেকে তিনি রাজা-ভাইদের কথায় উৎসাহিত হয়ে *শর্মিষ্ঠার* অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। তাও তাঁকে যথেষ্ট ব্যস্ত রাখছিলো বলে মনে হয়।



ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ

এই পরিবেশে ২৩ জানুআরি রাতের বেলা ঈশ্বর গুপ্ত মারা যান হঠাৎ করে। তাঁর বয়স হয়েছিলো মাত্র ৪৭ বছর। কবি অথবা সাহিত্যরসিক হিশেবে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে মাইকেলের কোনো সাদৃশ্য ছিলো না। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বিষয়বস্তু অথবা কাব্যরুচিকেও তিনি শ্রদ্ধা করার মতো কারণ দেখেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তুতে সমসাময়িকতা আমদানি করা এবং সাহিত্যকে সমকালীন জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসার ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্তের অবদান তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এক শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিশেবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁর গুরুত্বের কথাও তিনি ভালো করে জানতেন। সে কারণে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। এতে তিনি উত্তরসূরী হিশেবে

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

আছিলে রাখালরাজ কাব্যব্রজধামে
জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলে হরষে;

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর, তাঁর স্মরণে কোনো কিছু করার ব্যাপারে তাঁর বন্ধুরা অথবা বাঙালি সমাজ কোনো উদ্যোগ দেখাননি, কবি তাতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন।[৪৭]

ও দিকে কোনো কোনো বন্ধু তাঁকে নিরুৎসাহিত করলেও, তিনি আইন পরীক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরীক্ষার জন্যে সেবারে দরখাস্ত করেছিলেন প্রায় ছ শো প্রার্থী। ২৪ জানুআরি পরীক্ষা দেবার জন্যে পাঁচ শোরও বেশি প্রার্থী গিয়ে হাজির হন টাউন হলে। কিন্তু যথেষ্ট প্রস্তুতি নিতে পারেননি বলে তিনি শেষ পর্যন্ত এই পরীক্ষা দিতে যাননি। কার্যকারণে এদিন পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়নি।[৪৮] টাউন হল তৈরি হয়েছিলো এ ঘটনার প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগে — ১৮১৪ সালে। সেই পুরোনো টাউন হলে তখন মেরামত করার কাজ চলছিলো। যে অংশে মেরামত চলছিলো না, সে অংশে বসার মতো জায়গা ছিলো মাত্র দেড় শো লোকের। তদুপরি এই পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যরা খবর পেয়েছিলেন, ঐদিন সকালে নাকি এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখা গেছে ভবানীপুর অঞ্চলে। সুতরাং তখনকার মতো পরীক্ষা স্থগিত রাখা হলো। সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হলো, অতঃপর কী করণীয়। সেই সঙ্গে এ-ও সুপারিশ করা হলো যে, যাঁরা প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের ক্লাস করেছেন, কেবল তাঁদেরই পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হোক।[৪৯] এর কদিন পরে কবি জানতে পারেন যে, সে বছর আর আইন পরীক্ষা হবে না। সুতরাং আর-এক বার তিনি নিশ্চয় তাঁর ভাগ্যকে দোষারোপ করেন।

এ অবস্থাতেই, গৌরদাসের কাছে এ সম্পর্কে আবার চিঠি লেখেন। তবে পরীক্ষার চেয়েও, তাঁর সমূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তাঁর পাওনাদারেরা। লোয়ার চিৎপুর রোডে সংসার করতে গিয়ে, বিশেষ করে হেনরিয়েটা আসার পর তাঁর ঋণ বেড়ে গিয়েছিলো। গৌরদাসের সাধ্য ছিলো না অতো টাকা ধার দিয়ে বন্ধুকে সাহায্য করেন। সেই পরিস্থিতিতে তাঁর আর-এক বন্ধু — শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই আর্থিক অনটনের কথা খুলে বলেন পাইকপাড়ার রাজাদের কাছে। শ্রীরাম ছিলেন রাজাদের দেওয়ান। অমনি ছোটো রাজা, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁর বেশির ভাগ ঋণ শোধ করে দিলেন। ছোটো ছোটো পাওনাদারদের বদলে তিনি একজনের কাছে ঋণী হলেন, নাকি উদার এবং বন্ধুবৎসল একজন মানুষ বিপদগ্রস্ত এক কবিকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন, স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে কবি যেভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তাতে মনে হয়, এ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ফেরত পাওয়ার জন্যে দেননি। কবি টাকার তাগাদা থেকে বেঁচে গেলেন। খুব খুশি হয়ে গৌরদাসকে লিখলেন: 'পরের বার যখন ছোটো রাজাকে লিখবে, তখন আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ো। রাজাকে কিন্তু বোলো না, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছি।'[৫০]

আর্থিক অনটন, আইন পরীক্ষার চাপ, প্রণয়িনীর আগমন ইত্যাদি নানা কারণে *শর্মিষ্ঠা* প্রকাশের অব্যবহিত পরে তিনি নতুন কোনো রচনায় হাত দিতে পারেননি। তবে অনুবাদের কাজ অনেক সময়ে যান্ত্রিকভাবেও করা যায়। বোধ হয় সে জন্যেই, *শর্মিষ্ঠা* প্রকাশিত হবার কদিন আগে — ৯ জানুআরি, তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন যে, *শর্মিষ্ঠার* অনুবাদ করা হবে। সৃজনশীল রচনার অভাবে পরবর্তী দু মাস তিনি *শর্মিষ্ঠার* অনুবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মার্চের মাঝামাঝি গৌরদাসকে জানান, অনুবাদের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে।[৫১] নিজের রচনা সম্পর্কে তাঁর ধারণা সব সময়ে একটু ফাঁপানো ছিলো। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতরা ছাড়া অন্য সবার প্রশংসা শুনে তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে, তাঁর এ

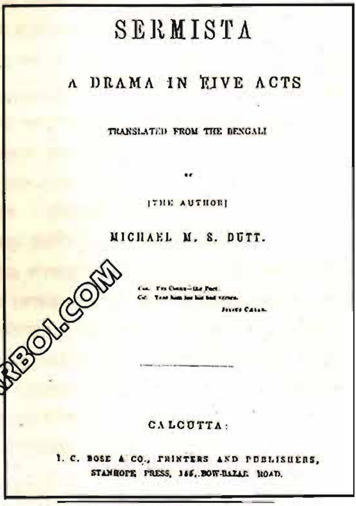
নাটকের এমন অনেক সাহিত্যিক মূল্য আছে, যা তাঁর নিজেরও চোখে পড়ছে না। অসম্ভব নয় যে, অনেকটা এ কারণে তিনি *শর্মিষ্ঠার* ইংরেজি অনুবাদ করার কথা চিন্তা করেন। তা ছাড়া, *শর্মিষ্ঠা* অভিনয় করার সময়ে রাজারা ইংরেজ দর্শকদের নিমন্ত্রণ করবেন বলে এই নাটকের অনুবাদ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কবি তাঁর উদ্দেশ্যের কথা খুলে বলেননি। কিন্তু ইংরেজি *শর্মিষ্ঠাও* খুব সুন্দর হয়েছে, এ কথা তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন।[৫২] তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা — রাজারা এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর — *শর্মিষ্ঠার* অনুবাদ দেখে খুব প্রশংসা করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ১৮৫৯ সালের ফেব্রুআরি মাসে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন, মাইকেল প্রথম দিকটা যেমন অনুবাদ করেছেন, তেমনভাবে শেষ পর্যন্ত অনুবাদ করতে পারলে *Ratnavali*-কেও তা হারিয়ে দেবে।[৫৩] অনুবাদ শেষ হলে রাজারা এ বই ছাপার জন্যে টাকাও ধার দিয়েছিলেন। ফলে মে মাসের গোড়াতে ইংরেজি *শর্মিষ্ঠা* প্রকাশিত হয়।

ইংরেজি *শর্মিষ্ঠা* প্রকাশিত হবার পরের মাসে *Indian Field* পত্রিকায় এ নাটকের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়, 'মিস্টার মাইকেল মধুসূদন ডাট দেশীয় ভাষায় একটি ধ্রুপদী নাটক লেখার প্রশংসনীয় চেষ্টায়, আমাদের বিবেচনায়, সাফল্য লাভ করায় কৃতিত্বের দাবিদার। বাংলা ভাষা এখনো উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য নিয়ে গর্ব করতে না-পারলেও, এবং এই ভাষা এখনো ত্রুটিমুক্ত না-হলেও নাটক লেখার জন্যে এ ভাষা যথেষ্ট উপযোগী।' সমালোচক আরও খবর দিয়েছেন যে, এ নাটক ম্যানেজারের বাক্সে বন্দী থাকবে না, শিগগিরই রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের ব্যক্তিগত বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হবে।[৫৪] এ সমালোচনা ছিলো নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। কবির প্রতি প্রশংসায়ও কোনো উচ্ছ্বাস ছিলো না। বারবার লক্ষ্য করা গেছে যে, তাঁর রচনায় কেউ প্রশংসা করলে কবি বিশেষ খুশি হতেন এবং তা ফলাও করে বলতেন। কিন্তু এ প্রশংসার কথা তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি। পত্রিকার সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র কবিকে এককালে চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন, বাড়িতে আশ্রয়ও দিয়েছিলেন; কিন্তু *শর্মিষ্ঠার* প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে পারেননি। হতে পারে, সাহিত্যিক হিশেবে মাইকেল কতো বড়ো তিনি তা তখনো উপলব্ধি করতে পারেননি। পরে অবশ্য *তিলোত্তমাসম্ভব* এবং *মেঘনাদ* সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

সংসারকে ঘিরে যে-মন আগের কয়েক মাস ধরে ঘুরপাক খাচ্ছিলো, *শর্মিষ্ঠা* অনুবাদ শেষ হবার ঠিক পরে তা আবার দূরের আহ্বানে উদাস হয়। প্রাত্যহিকতার সীমানা পেরিয়ে তিনি দূরের সাগর এবং পর্বতের আহ্বান শুনতে পান। গৌরদাস তখন বালেশ্বরে। তাঁকে পূর্বোক্ত চিঠিতে লিখেছেন: 'আমি যদি সাগর আর পর্বতের কাছে থাকতে পারতাম! সাগর, উন্মুক্ত সাগর, তোমাদের ওখান থেকে কতো দূরে? তুমি কি সাগরের অবিশ্রান্ত প্রবল গর্জন শুনতে পাও? আমার কাছে সে গর্জন অতি পরিচিত। তবে ঈশ্বরই জানেন, আর কোনোদিন সেই গর্জন শুনতে পাবো কিনা।'[৫৫] ধারণা করি, কয়েক মাস হেনরিয়েটার সঙ্গে থাকার পর, আবার মনের গভীরে ক্লান্তি এসেছে। যাঁদের ফেলে এসেছিলেন, তাঁদের স্মৃতি আবার মনকে বিষণ্ন করেছে। হেনরিয়েটার সঙ্গে ঘর করবেন, অথচ মাদ্রাসকে ভুলে থাকবেন, রেবেকা এবং আত্মজ-আত্মজাদের ভুলে থাকবেন, সেটা কী করে সম্ভব! কিন্তু পরে দেখবো, এসব শোক তাঁকে মন্থন করলেও, তিনি এসব মনের একান্ত গভীরে পুষে রাখতে শিখেছিলেন। বন্ধু অথবা জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে এই শোক ভাগাভাগি করে নিতে পারেননি। এর দেড় মাস পরে লেখা আর-একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'কলকাতা আমার আদপে ভালো লাগে না। আমি কৃচিৎ বাইরে যাই; অথবা আদৌ যাইনে। এর চেয়ে সুন্দরবনও আমার বেশি ভালো লাগে!'[৫৬] তাঁর এই বৈরাগ্যও কি একেবারে বিচ্ছিন্ন ব্যাপার? আসলে, তাঁর চরিত্রের একেবারে গভীরে বৈরাগ্যের এই বীজ বপন করা ছিলো। তিনি ছিলেন আর-পাঁচজন মানুষের মতো বন্ধুবৎসল, প্রেমিক স্বামী এবং সন্তানবৎসল। কিন্তু সৃষ্টির বেদনা তাঁর অন্তরকে নিরন্তর নাড়া দিতো। তাঁর সেই অসাধারণ সৃষ্টিছাড়া হৃদয়ের জন্যেই জনারণ্যের

মধ্যে থেকেও তিনি এক-এক সময়ে নিঃসঙ্গ এবং উদাস হয়ে যেতেন। তখন সবকিছু তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হতো। আসলে তিনি যেন দুটি আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাস করতেন। তাঁর মধ্যে কবি হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং বস্তুবাদী ভোগের আকাঙ্ক্ষাও যেন এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বই তুলে ধরে। তাঁর জীবনের মাদ্রাস অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করার সময়েও আমরা আনন্দের মধ্যে তাঁর বিষাদ-মনস্কতা লক্ষ্য করেছি। পরেও তাঁর এই বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে।

এই মানসিক সংকটের সময়ে, তিনি নতুন একটি নাটক লেখার কাজ আরম্ভ করেন। অবশ্য এ নাটকের ধারণা তাঁর মাথায় এসেছিলো কয়েক মাস আগে এক রোববার। প্লটটা পেয়েছিলেন বহু বার পড়া গ্রীক পুরাণ থেকে। কিন্তু সেই কাহিনী তিনি স্থাপন করলেন ভারতীয় পুরাণের পটভূমিতে। এই প্লট নিয়ে তিনি প্রতাপচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং কেশব গাঙ্গুলির সঙ্গে আলাপও করেছিলেন। যতীন্দ্র ঠাকুর আর রাজারা শুনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন: চমৎকার!'[৫৭] গৌরদাসকে লেখা আগের চিঠি থেকে জানতে পাই, এই নাটকের প্রথম অঙ্ক লেখার কাজ ১৯ মার্চের আগে শেষ করেছিলেন। এ নাটকের নাম তিনি তখনো বোধ হয় ঠিক করেননি। কিন্তু পরে এর নাম দিয়েছিলেন *পদ্মাবতী*। তিনি মন্থর গতিতে কোনো কাজ করতে পারতেন না। এ ছিলো তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে। *পদ্মাবতী*ও তিনি রচনা করেন প্রায় ঝড়ের গতিতে। ছ সপ্তাহ পরে তিনি আবার বন্ধুকে লেখেন: 'চতুর্থ অঙ্ক লেখার কাজ শেষ হয়েছে। আজ সকালে এটা আমি যতীন্দ্র ঠাকুরের কাছে পাঠাচ্ছি।'[৫৮] কার্যকালে তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে পাঠিয়েছিলেন, নাকি রাজাদের কাছে, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কারণ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ৮ মে তারিখে তাঁকে যে-চিঠি লেখেন, তা থেকে দেখা যায় প্রতাপচন্দ্র সিংহ তখন এই নাটকের তিন অথবা চার অঙ্কের পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখছিলেন।[৫৯]


SERMISTA

A DRAMA IN FIVE ACTS

TRANSLATED FROM THE BENGALI

BY

[THE AUTHOR]

MICHAEL M. S. DUTT.

CALCUTTA:

I. C. BOSE & CO., PRINTERS AND PUBLISHERS,
STANHOPE PRESS, 16[illegible], BOW-BAZAR ROAD.

ইংরেজি *শর্মিষ্ঠার* নামপত্র

যা রচনা করছেন, তাতে মগ্ন হয়ে থাকা তাঁর চরিত্রের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। যখন তিনি কোনো নাটক অথবা কাব্য রচনা করতে করতে বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখেছেন, তখন সেই রচনা সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। *পদ্মাবতী*ও এর কোনো ব্যতিক্রম নয়। *পদ্মাবতীর* ধারণাটা যে নাটকের জন্যে খুব উপযুক্ত, সে সম্পর্কে গৌরদাসকে লিখেছেন: 'আমি কেবল তোমাকে বলতে পারি, নাটকের জন্যে এর চেয়ে ভালো প্লট খুব কমই থাকতে পারে।'[৬০] এই কাহিনী নিয়ে তিনি নিজে উচ্ছ্বসিত হলেও, এর মধ্যে খুব মৌলিকত্ব ছিলো না। আসলে এ নাটকে তিনি গ্রীক পুরাণের স্বর্ণ আপেলের কাহিনী দেশীয় দেবদেবীর নাম দিয়ে দেশীয় চেহারায় চালিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মন লালিত হয়েছিলো পশ্চিমা সাহিত্যের রসে। যথার্থভাবেই দেশীয় সাহিত্যের তুলনায় পশ্চিমা সাহিত্যকে তিনি অনেক উঁচু দরের বলে বিবেচনা করতেন। এ দুইয়ের মধ্যে কোনো তুলনা চলতে পারে, তিনি আদৌ তা

মনে করতেন না। অথচ তিনি নাটক লিখছিলেন দেশীয়দের জন্যে। তাঁরা কতোটা বিদেশী স্বাদের সাহিত্য বুঝে তার প্রশংসা করতে পারবেন, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। *শর্মিষ্ঠায়* তিনি যে-সামান্য বিদেশী রসের ভেজাল দিয়েছিলেন, তার জন্যে প্রাচীনপন্থীরা কেমন আঁতকে উঠেছিলেন, তিনি তা-ও লক্ষ্য করেছিলেন। সে জন্যে *পদ্মাবতীর* কাহিনী তিনি তৈরি করেছিলেন সুকৌশলে — যাতে তাঁর বিদেশী রুচি তৃপ্ত হয়, আবার দেশীয় দেবদেবীর নাম এবং আবহাওয়া দেখে পাঠক এবং দর্শকরাও খুশি হন।

দেশীয় মোড়কে কেবল বিদেশী মাল পাচার করার কৌশল তিনি নেননি, *পদ্মাবতীতে* দেশীয় উপাদানও তিনি কম রাখেননি। কারণ দেশীয় আঙ্গিক এবং রুচি তখনো তিনি যথেষ্ট পরিমাণে বর্জন করার সাহস জোগাড় করতে পারেননি। তবে এই নাটকে বড়ো রকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। বিশেষ করে সংলাপ রচনার সময়ে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চালু করা যায় কিনা। *পদ্মাবতীতে* তাঁর এই প্রচেষ্টা সীমিত সাফল্য লাভ করলেও, পরে তাঁর এই সাহস অনেক প্রশস্ত পথ খুলে দিয়েছিলো। তা ছাড়া, *শর্মিষ্ঠার* সঙ্গে তুলনা করলে কাহিনী সৃষ্টি, চরিত্র নির্মাণ, নাটকীয় পরিবেশ রচনা, সংলাপ তৈরি — সবকিছুতেই এ নাটকে তিনি অনেক বেশি সফল হয়েছিলেন। সংলাপের একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের এ মন্তব্যের সত্যতা বোঝা যাবে:

শর্মিষ্ঠা

> রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুক্ষণেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়, কেন না, দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, যেহেতু তারা সেখানে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে। (পরিক্রমণ) বাড়বানলে পরিতৃপ্ত হয়ে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অদ্য সেই রূপ হলেম? হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি কি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে বলে, প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর?

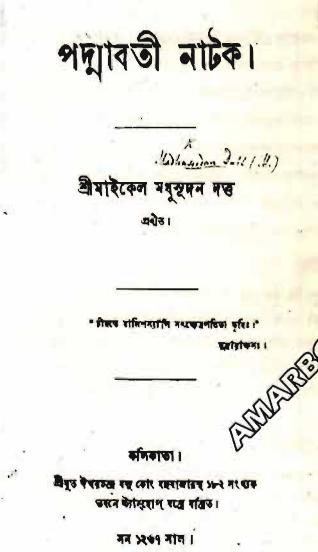
পদ্মাবতী

> রাজা। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) হরিণটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোন্ দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছি? আর তাই বা কেমন করে বলি। এই ত ভগবান্ বিন্ধ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া) এই পর্ব্বতময় প্রদেশে রথের গতির রোধ হয় বল্যে, আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণ ক্লেশ স্বীকার কর্য্যে অবশেষে কি আমার এই ফল লাভ হলো যে আমি একলা একটা নির্জ্জন বনে এসে পড়লেম? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে দর্শন দেয়; তা এ স্থলে কি মায়ামৃগ হয়ে আমাকে এত ব্যথা দুঃখ দিলে?

শর্মিষ্ঠার তুলনায় *পদ্মাবতীতে* ভাষা যে অনেকটা চলিত রীতির দিকে এগিয়ে এসেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সত্যি বলতে কি, এখানে *পদ্মাবতী* থেকে যে-উদ্ধৃতি দিয়েছি, সেটি এ নাটকের সাবলীল ভাষার সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত নয়। *শর্মিষ্ঠায়* কেবল ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামে চলিত ভাষার স্বাক্ষর দেখতে পাই এবং তা ভাষার অন্য অংশের সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু *পদ্মাবতীতে* চলিত ভাষার এলাকা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে — অন্য লৌকিক শব্দ ব্যবহার এবং হ্রস্ব বাক্য গঠনে। এরপরেও তিনি যার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি, তা হলো পৌরাণিক উপমা। অনেক সময়ে এসব উপমার কারণে তাঁর ভাষা যতোটা চলিত, ততোটা চলিত মনে হতো না।

পদ্মাবতী লিখতে আরম্ভ করেছিলেন খুব উৎসাহ এবং উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। তেসরা মের আগেই এ নাটকের চার অঙ্ক পর্যন্ত লেখাও হয়েছিলো। কিন্তু তারপরেই রচনায় হঠাৎ ছেদ পড়ে। দশ বছর আগে একটি অনামী কাব্য এবং *Rizia* সম্পর্কেও তিনি প্রথমে খুব উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। কিন্তু কোনোটাই শেষ করতে পারেননি। *পদ্মাবতী* সম্পর্কেও উৎসাহে ভাঁটা পড়ার মতো তেমন কোনো কারণ

ঘটেছিলো কিনা, বলা যাচ্ছে না। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, রাজাদের অনুরোধে তিনি *পদ্মাবতী* লেখার কাজ ফেলে রেখে প্রহসন রচনায় হাত দিয়েছিলেন। *পদ্মাবতী* নাটক সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের যে-চিঠির কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি, তাতে তিনি পোশাকী নাটক রচনা আপাতত বন্ধ রেখে প্রহসন লেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো: '*শর্মিষ্ঠা* অভিনয়ের কাজ আমরা চালিয়ে যাবো। তবে *শর্মিষ্ঠার* পরে আমাদের প্রহসনও অভিনয় করা দরকার। আমরা দেখাতে চাই যে, আমরা একই অভিনেতাদের দিয়ে একই সঙ্গে মহত্তম এবং হালকা বিষয়বস্তুর অভিনয় করাতে পারি।'[৬১]


পদ্মাবতী নাটক।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

[illegible]

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৬৭ সাল।

লিখিত কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু ধারণা করা হয় যে, এই চিঠি পাওয়ার পরেই তিনি *একেই কি বলে সভ্যতা?* এবং *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* প্রহসন দুটি রচনা করেন। এ সময়ে, তাঁর চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, তাঁর কোর্টের অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেট, মি হিউম প্রথমে সাত-আট সপ্তাহ অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর চলে যান ইংল্যান্ডে। কাজ করছিলেন শুধু জি এস ফ্যাগান। খুব ভদ্র বলে তাঁর সঙ্গে কবি কাজ করতে পছন্দ করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও অফিসের কাজ নিয়ে তাঁকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিলো। নিজেই লিখেছেন: 'রোজ দশটা থেকে পাঁচটা/সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অফিসের কাজ করতে হচ্ছে।'[৬২] কিন্তু এতো ব্যস্ততা থাকলেও তিনি থামতে পারছিলেন না; কারণ তিনি একই সঙ্গে খ্যাতির আকর্ষণ এবং একটা নেশা অনুভব করতে পারছিলেন। রাজারা চেয়েছিলেন একটিপ্রহসন, সৃষ্টির আনন্দে তিনি লিখে ফেললেন দুটি। এবং লেখা শেষ করে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন রাজাদের কাছে। *শর্মিষ্ঠা* অভিনীত হবার অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের যথেষ্ট আগেই তিনি প্রহসন দুটি রাজাদের দিয়েছিলেন, এমন অনুমান সঙ্গত। তা ছাড়া, তিনি *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* রচনার কাজও জুন মাসের দিকে আরম্ভ করেছিলেন। তবে, যখনকার কথা বলছি – অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত, তিনি বন্ধু এবং রাজাদের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশংসার বাক্য শুনলেও, তাঁর কোনো নাটক তখনো অবধি মঞ্চস্থ হয়নি। কিন্তু নিজের নাটক মঞ্চস্থ হবার ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ দুর্বলতা ছিলো। তাই রাজারা যখন *শর্মিষ্ঠার* অভিনয়ের উল্লেখ করে প্রহসন লেখার কথা বলেন, তখন তাঁর পক্ষে সে অনুরোধ উপেক্ষা করা শক্ত ছিলো। এভাবেই *পদ্মাবতী* রচনার কাজ তুলে রেখে তিনি প্রহসন লিখতে বসেছিলেন।

প্রহসন লিখতে গিয়ে তিনি কেন অমন সমকালীন সমস্যা বেছে নিলেন, প্রথমে তা স্পষ্ট না-হলেও, একটু তলিয়ে দেখলে কারণটা বোঝা যায়। আসলে ১৮৫০-এর দশকে প্রথমে বিধবাবিবাহ এবং পরে বহুবিবাহ নিয়ে কলকাতার হিন্দু সমাজে যে-জোর আন্দোলন আরম্ভ হয়, তা সাহিত্যের অন্য শাখার

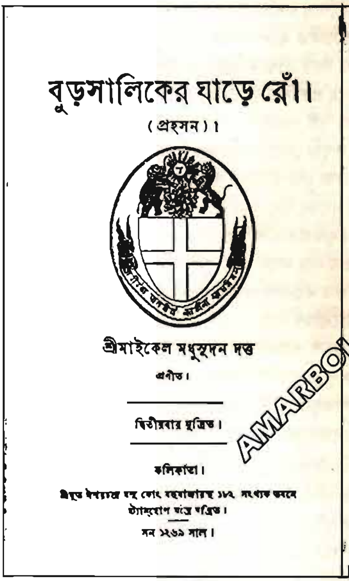
চেয়ে নাট্যরচনাকেই বেশি প্রভাবিত করেছিলো। এ ব্যাপারে রামনারায়ণের *কুলীনকুলসর্বস্ব* (১৮৫৪) একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলো। তা ছাড়া, উমেশচন্দ্র মিত্রের *বিধবাবিবাহ* (১৮৫৬) নাটকের সাফল্যও এই ধারাকে জোরদার করেছিলো। বস্তুত, একদিকে সমাজসংস্কার আন্দোলন যেমন বাংলা প্রহসন রচনাকে উৎসাহিত করেছিলো, তেমনি তখন ব্যাঙের ছাতার মতো যে-প্রহসন গজিয়ে উঠেছিলো তাও সমাজসংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছিলো।[৩] বিশেষ করে *কুলীনকুলসর্বস্ব* এবং *বিধবাবিবাহ নাটক* পাঠ্য এবং অভিনীত নাটক হিশেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। কেবল তাই নয়, মনে রাখা দরকার যে, *কুলীনকুলসর্বস্ব* প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক। মাইকেলও এটা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন। এবং অংশত সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা নাটকের জনপ্রিয়তা এবং অংশত সমাজ সংস্কার আন্দোলনের জনপ্রিয়তা তাঁকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিলো। তাই তিনি তাঁর প্রহসনের জন্যে নির্বাচন করেছিলেন সমকালীন সমাজের দুটি সমস্যা। অবশ্য তিনি বেশির ভাগ প্রহসন-রচয়িতাদের মতো সংস্কারের উদ্দেশ্যে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত কোনো সামাজিক বিষয় নির্বাচন না-করে, এমন বিষয়বস্তু পছন্দ করেছিলেন যা অসাম্প্রদায়িক এবং যার আবেদন আরো ব্যাপক — যে-সমস্যা হিন্দু সমাজের কোনো একটা ক্ষুদ্র অংশের নয়, বরং বৃহত্তর হিন্দু সমাজের। এর ফলে, নির্ভেজাল হাসির মাধ্যমে তিনি একই সঙ্গে কশাঘাত করলেন অত্যাধুনিক নব্যশিক্ষিতদের আর ধর্মের নামে যারা আসলে ভণ্ডামি করতো সেই রক্ষণশীলদের। পাশ্চাত্যয়ানার নামে তারা পশ্চিমের যে-হাস্যকর অনুকরণ করছিলো, তিনি তা দেখিয়ে দিয়ে ইংরেজি-শিক্ষিত নব্যদের ব্যঙ্গ করলেন। অপর পক্ষে, প্রাচীনদের তিনি বিদ্রূপ করলেন তাদের ভণ্ডামির স্বরূপ উন্মোচন করে। এই উভয় সমাজকে তিনি যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন, প্রহসন থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর অনেক সমালোচক ধারণা দিয়েছেন যে, তিনি নিজের সমাজ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রহসন দুটি পড়লে বোঝা যায়, খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেও অথবা আপাতদৃষ্টিতে জীবনযাত্রায় হিন্দু সমাজ থেকে দূরে সরে গেলেও, এই সমাজকে একেবারে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতা — উভয়ই তাঁর ছিলো।

কিন্তু এই প্রহসন দুটির বিষয়বস্তুর চেয়েও যা উল্লেখযোগ্য তা হলো: এ দুটি রচনা করার সময়ে তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রকে শিকেয় তুলে রাখতে পারলেন এবং পাশ্চাত্য নাট্যরুচি দিয়ে এই প্রহসনের আঙ্গিক, কাহিনী, চরিত্র এবং সংলাপ রচনা করার সুযোগ পেলেন। আর তাতে সাফল্যও লাভ করলেন কল্পনাতীত। *শর্মিষ্ঠা* রচনা করতে গিয়ে তিনি দেশীয় সাহিত্যের শেকল কাটতে পারেননি। *পদ্মাবতী*তে সে বাঁধন তিনি কেবল আলগা করেছিলেন। প্রহসনে এসে সে শেকল ছিন্ন করার সুযোগ পেলেন। এবং সংলাপ রচনা, চরিত্রচিত্রণ আর মঞ্চ পরিকল্পনা থেকে মনে হয় সেই স্বাধীনতা তিনি বেশ উপভোগও করেছেন। *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিলে দেখা যাবে এর আগেকার নাটক *পদ্মাবতী* থেকে এর সংলাপ কতো আলাদা:

> ভক্ত। (স্বগত) আহ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পক্ষী ছুঁড়ীটাকে পাওয়া দুষ্কর, কি দুঃখের বিষয়! এমন কনক রত্নটি তুলতে পাল্লেম না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় কর্যে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হল্যেন? যা হোক, এখন যে হানফের মাগ্‌টাতে পাওয়া গেছে এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একেবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা। (চতুর্দ্দিকং অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাত!

এখানে প্রমীলার হাতে পার্থের পরাজিত হবার যে-উপমা আছে, তা এই প্রহসনের জন্যে খুব উপযোগী, এমনটা বলা যায় না। বরং এর মধ্য দিয়ে তাঁর ধ্রুপদী উপমা-প্রীতিই প্রকাশ পেয়েছে। তবে এ উপমা সত্ত্বেও, এই সংলাপ সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রহসনের বেশ উপযোগী হয়েছে। ইচ্ছে করলে তিনি যে রীতিমতো চলিত ভাষায় লিখতে পারতেন, এ প্রহসন দুটি তার নির্ভুল প্রমাণ।

অবশ্য সফলতা একদিকে যদি বা এলো, অন্য দিকে এলো না। *শর্মিষ্ঠার* অব্যবহিত পরে প্রহসন অভিনয় করা হবে — এই প্রলোভন দিয়ে রাজারা তাঁর কাছ থেকে তড়িঘড়ি করে দুটি প্রহসন লিখিয়ে নিলেও তার কোনোটাই অভিনীত হলো না। *একেই কি বলে সভ্যতা?*-র মহড়া শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সে খবর পৌঁছে গেলো প্রভাবশালী নব্যশিক্ষিতদের কাছে। অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলির স্মৃতিচারণ থেকে জানা যাচ্ছে, নব্যশিক্ষিতরা এটাকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রতি একটা বিদ্রূপ বলে বিবেচনা করলেন। অমনি তাঁরা এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করার দাবি জানিয়ে তাঁদের একজন নেতাকে পাঠালেন রাজাদের কাছে। এই নেতার যথেষ্ট প্রভাব ছিলো রাজাদের ওপর। সুতরাং *শর্মিষ্ঠা* সাড়ম্বরে অভিনীত হলেও, রাজারা নব্যশিক্ষিতদের পরামর্শ শুনে *একেই কি বলে সভ্যতা?*-র অভিনয় করাতে সাহস পেলেন না।[৬৪] কেবল তাই নয়, তাঁরা এতে এতো বিরক্ত হয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় প্রহসনটি নিয়েও পাছে আপত্তি ওঠে সেই আশঙ্কায় তারও অভিনয় বন্ধ রাখলেন।


বুড়সালিকের ঘাড়ে রোঁ।
(প্রহসন)।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৬৯ সাল।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (দ্বিতীয় সং)

শর্মিষ্ঠার অভিনয় দেখে মাইকেল যতোটা খুশি হয়েছিলেন, প্রহসন দুটির অভিনয় হলো না দেখে, তার চেয়েও বেশি দুঃখিত হলেন। তাই বছর খানেক পরে দুঃখ করে কেশব গাঙ্গুলিকে লিখেছিলেন: 'মনে রাখবেন, আপনারা প্রহসন দুটির ব্যাপারে আমার ডানা ভেঙে দিয়েছিলেন।'[৬৫] প্রহসন দুটির অভিনয় বন্ধ করে রাজারা সত্যি সত্যি বাংলা নাটক এবং মাইকেল — উভয়েরই ক্ষতি করেছিলেন। প্রহসনে তিনি ভাষার যে-সাবলীলতা খুঁজে পেয়েছিলেন, আরও-একটু চর্চা করতে পারলে তা দিয়ে তিনি তাঁর নাটকের ভাষাকেও সাবলীল করতে পারতেন বলে মনে হয়। এবং তেমন অবস্থায়, পরিণতি লাভ করতে বাংলা নাটকের অতো দেরি করতে হতো না।

রাজারা অবশ্য জানতেন যে, তাঁরা অনুরোধ করে এই প্রহসন দুটি রচনা করিয়েছিলেন। সে জন্যে, অভিনয় করাতে না-পারলেও, প্রতাপচন্দ্র সিংহ এই প্রহসন দুটি ছাপানোর খরচ বহন করলেন। ১৮৬০ সালের গোড়ার দিকে — সম্ভবত জানুআরি-ফেব্রুআরি মাসে — প্রহসন দুটি প্রকাশিত হয়। সমকালীন নাটক এবং প্রহসনে যেসব সমাজ-সংস্কারমূলক বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছিলো, তার বেশির ভাগই সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশকে লক্ষ্য করে রচিত হয়েছিলো বলে বৃহত্তর সমাজ এসব নাট্যরচনাকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি। বরং এসব রচনায় সমাজের একাংশের বিকার দেখে সমাজের বাকি অংশ কৌতুক বোধ করেছে। কিন্তু মাইকেল যাদের আক্রমণ করলেন, তারা ধর্মীয় দিক দিয়ে সমাজের কোনো একটা নির্দিষ্ট অংশের মানুষ নয়, অথবা তাঁর দেখানো সমস্যাটাও সরাসরি ধর্মের

সঙ্গেও যুক্ত নয়। যাদের তিনি হুল ফোটালেন, গোটা হিন্দু সমাজে তাদের প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে ছিলো। সমাজে তাদের প্রভাবও ছিলো ব্যাপক। সে জন্যে, কবির নিন্দা হলো সমাজের বিভিন্ন তরফ থেকে। নব্যশিক্ষিতরা *একেই কি বলে সভ্যতা?* প্রহসনে তাঁদের ক্যারিকেচার দেখে এবং রক্ষণশীলরা *বুড় সালিকে* তাঁদের ভণ্ডামির প্রতিবিম্ব দেখে ভেদাভেদের কথা ভুলে গিয়ে একযোগে নিন্দার কোরাস গাইলেন।[৬৬] ওদিকে, অভিনয় না-হবার জন্যে কবি প্রথমে বিষণ্ণ হলেও, পরে নিন্দার জোর উপলব্ধি করতে পারলেন। তখন নিজেই ভাবলেন: এ প্রহসন প্রকাশ না-করাই ভালো ছিলো। তাঁর মনে হলো: 'এখনো বাংলা ভাষায় নাট্যামোদীদের রুচি নিয়ন্ত্রণের উপযোগী ভালো নাটক লেখা হয়নি অথবা সেসব নাটক অভিনয় করার মতো মঞ্চও তৈরি হয়নি, এমন অবস্থায় প্রহসন লিখে জনমতকে চটিয়ে দেওয়া বিচক্ষণতার কাজ নয়।'[৬৭]

চারদিকের জনমত দেখে কবি তাঁর প্রহসন সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত যে-সিদ্ধান্তেই পৌঁছে থাকুন না কেন, আসলে প্রহসনে তিনি দেশীয় নাট্যরীতি থেকে সত্যিকার মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন। তবে এই দুই প্রহসনে তিনি যেভাবে তাঁর পাঠক/দর্শকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন এবং সংলাপ রচনায় যে-স্বতঃস্ফূর্ততা দেখিয়েছেন, পরে তা অংশমাত্র তাঁর কাজে লেগেছিলো। কারণ এরপর তিনি মাত্র একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছিলেন। তা ছাড়া, এই প্রহসনের সার্থক অভিনয় হলে তিনি আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারতেন এবং পরবর্তী রচনায় তাঁর সদ্য-অর্জিত নৈপুণ্য খাটাতে পারতেন। সত্যি বলতে কি, তাঁর নাট্যপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্যে সময়টা ছিলো প্রতিকূল। পরে কেশব গাঙ্গুলিকে লেখা একটি তির্যক উক্তিতে তিনি যথার্থই লিখেছিলেন: সময়ের তুলনায় তিনি ছিলেন প্রাগ্রসর।[৬৮]

প্রহসন লিখতে গিয়ে *পদ্মাবতীর* রচনা তিনি মুলতুবি রেখেছিলেন। লেখাশেষ করে তিনি আবার *পদ্মাবতী* লেখার কাজে হাত দেন। ১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি তিনি এ নাটক শেষ করেছিলেন — এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়; যদিও ঠিক কখন আরো সুনির্দিষ্ট করে তা বলার জো নেই। তিনি যে-বিপুল উৎসাহ নিয়ে *পদ্মাবতী* লেখা আরম্ভ করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সে উৎসাহ তিনি বজায় রাখতে পারেননি। কোনো কোনো সমালোচক সে জন্যে লক্ষ্য করেছেন যে, *পদ্মাবতীর* প্রথম চার অঙ্কে যে-স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সাবলীলতা আছে, শেষ অঙ্কে তা অনেকাংশে অনুপস্থিত। যে-নাটকের প্লটকে কবি অত্যন্ত নাটকীয় বলে বিবেচনা করেছিলেন, সেই নাটকের শেষ পর্যায়ে তার প্রতি কেন আকর্ষণ হারিয়ে ফেললেন, তিনি নিজে সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। আমার ধারণা, তাঁর আগ্রহ অন্যদিকে চলে গিয়েছিলো। অতীতেও তাঁকে হঠাৎ পুরোনো বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে দেখা গেছে। এমন কি, পরবর্তী সময়েও আমরা তাঁকে এমন আচরণ করতে দেখবো।

পদ্মাবতীতে যে-অসাধারণ নাট্যসম্ভাবনা ছিলো, তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে না-পারলেও, এই রচনা তাঁকে অন্য পথের নির্দেশ দিয়েছিলো। এই নাটক লেখার সময়ে তিনি সংলাপে ইংরেজির মতো অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করা যায় কিনা, তা নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন — আগেই তা লক্ষ্য করেছি। তাঁর এই পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে তিনি এতোটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিলেন যে, এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'আমাদের নাটক গদ্যে না-লিখে, অমিত্রাক্ষরে লেখা উচিত।'[৬৯] তিনি অনেক কিছুই লিখেছিলেন জেদ করে। কিন্তু এসবের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। একেবারে আক্ষরিক অর্থে বাজি ধরে তিনি এই ছন্দ রচনা করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, ১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন *শর্মিষ্ঠা* অভিনয়ের জন্যে মহড়া চলছিলো, সে সময়ে একদিন রাজভ্রাতৃদ্বয়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং মাইকেলের মধ্যে বাংলা নাটক নিয়ে কথাবার্তা

চলছিলো। এক পর্যায়ে কবি বললেন যে, যতো দিন না বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলিত হচ্ছে, ততোদিন বাংলা নাটকের উন্নতি আশা করা যায় না। তার উত্তরে যতীন্দ্রমোহন বলেন যে, বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ বোধ হয় রচনা করা সম্ভব নয়। (ভারতীয় কোনো কোনো ভাষায় ১৩০ বছর পরে এখনো তা হয়নি।) সে কথার উত্তরে কবি বলেন যে, তেমন চেষ্টা করলে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর লেখা সম্ভব হতেও পারে। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন তা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। ঈশ্বর গুপ্ত এক সময়ে অমিত্রাক্ষরের প্যারোডি করে যা লিখেছিলেন, তিনি তার উল্লেখ করে কবিকে একটু ঠাট্টা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন:

> কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি
> ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।

বলা বাহুল্য, ঈশ্বর গুপ্তের এই প্যারোডিও অযোগ্য প্যারোডি। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ঠাট্টা শুনে মাইকেল অমনি চটে গেলেন। বললেন: 'বুড়ো ঈশ্বর গুপ্ত পারেননি বলে, আর কেউ বাংলায় অমিত্রাক্ষর লিখতে পারবে না, এটা আমি বিশ্বাস করিনে।' তর্কের শেষে তিনি বললেন: 'আমি শিগগিরই আপনার ভুল ভাঙিয়ে দেবো। আর যদি প্রমাণ করতে পারি, অমিত্রাক্ষর লেখার জন্যে বাংলা ভাষা যথেষ্ট উপযোগী, তা হলে কী হবে?' যতীন্দ্রমোহন বললেন: 'তা হলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আপনি কোনো কাব্য রচনা করলে, আমি তা আমার ব্যয়ে ছাপিয়ে দেবো।' হাত তালি দিয়ে কবি বললেন: 'দুতিন দিনের মধ্যেই আপনি কয়েকটি স্তবক দেখতে পাবেন।'[৭০]



যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

কয়েকটি স্তবক নয়, তিন-চার দিনের মধ্যে তিনি যতীন্দ্রমোহনকে দেখতে পাঠালেন *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের* গোটা প্রথম সর্গ। তিনি যেমন গৌরদাসের খোঁচা খেয়ে *শর্মিষ্ঠা* রচনা করেছিলেন, তেমনি যতীন্দ্রমোহনের খোঁচায় এখন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁর প্রথম বাংলা কাব্য রচনার সূত্রপাত করলেন। আসলে তিনি ছিলেন অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তবে অনেক সময়ে নিজের থেকে সেই শক্তিকে কাজে খাটানোর উৎসাহ অথবা উদ্যম পেতেন না। কিন্তু জেদের মুখে তাঁর সুপ্ত ক্ষমতা বন্যাধারার মতো সব বাধ ভেঙে বেরিয়ে পড়তো। পরেও এর দৃষ্টান্ত দুর্লক্ষ্য হবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অমিত্রাক্ষরের কোনো ঐতিহ্য না-থাকা সত্ত্বেও তিনি কী করে বাংলায় অতো দ্রুত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করতে সক্ষম হলেন? আসলে এটাকে যতোটা আকস্মিক বলে মনে হয়, কবির জন্যে অতোটা আকস্মিক ছিলো না। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁর কাছে কিছু নতুন ছিলো না। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে ১৭/১৮ বছর বয়সে তিনি একবার একটি

চতুর্দশপদী লিখতে চেষ্টা করেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। (কৈশোরক উচ্ছ্বাসবশত সেটিকে সনেট বলেই দাবি করেছিলেন।) তবে সে ছিলো নিতান্ত ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস। তা ছাড়া, তার সাফল্যও ছিলো খুব সীমিত। তারপর রীতিমতো অনুশীলনের সুযোগ পান *Visions of the Past* রচনা করার সময়ে। তৃতীয় বার পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পান কাব্যনাট্য *Rizia*-য় এসে। সুতরাং ভাষা ভিন্ন হলেও অমিত্রাক্ষরের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি ভালো করে অবহিত ছিলেন। এ ছন্দ নিয়ে তিনি কেবল ভাবেননি, এ নিয়ে রীতিমতো পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন। বাংলাতেও দু-চার পঙ্ক্তি রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন কিনা, কে জানে? পয়ার এবং ত্রিপদীর কঠোর শিকলে বাংলা ছন্দের হাত-পা যে বাঁধা এ তিনি হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলেন। যতি এবং অন্ত্যমিলের এই কঠোর নিয়মের মধ্যে থেকে ছন্দ এবং ভাষা যে তার কোমল সৌন্দর্য এবং স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয় – এ-ও তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। একটি চিঠিতে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, চীনা মেয়েদের যেমন লোহার জুতো পরিয়ে তাঁদের পায়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে আটকে রাখা হয়, বাংলা ছন্দের নিয়মও তেমনি ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করে।[১১] ছন্দ সম্পর্কে তাঁর এই বিশ্বাস এতো আন্তরিক এবং প্রবল ছিলো যে, কয়েক বছর পরে তিনি এ নিয়ে আবেগপূর্ণ একটি সনেটও লিখেছিলেন:

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে!
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুছ ভূষণে?

একবার অমিত্রাক্ষর রচনার আপাত অসাধ্য সাধন করার পর তিনি যে-উৎসাহ লাভ করেন, তা তাঁকে শত অসুবিধের মধ্যেও দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। অফিসে কাজের চাপ, হেনরিয়েটার সাত-আট মাসের গর্ভ, প্রহসন রচনা এবং *পদ্মাবতী* শেষ করার কাজ – ইত্যাদির মধ্যেও তিনি *তিলোত্তমার* দ্বিতীয় সর্গ লিখে ফেললেন। *তিলোত্তমার* ধারণাটি এতো অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কী করে সম্পূর্ণ অনায়ত্ত একটি ছন্দে লিখে ফেললেন, তা-ও নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের ব্যাপার। *তিলোত্তমার* কাহিনী তিনি প্রধানত ভিত্তি করেছিলেন হিন্দু পুরাণের ওপর। তবে কেবল দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, কাহিনীতেও তাঁর মৌলিকত্ব কম ছিলো না। এ ক্ষেত্রেও তিনি যে রাতারাতি সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তা নয়। *The Captive Ladie*-তেও এর আগে দেশীয় কাহিনীর সঙ্গে মৌলিক চিন্তাধারা মিশিয়ে কাহিনী সৃষ্টির কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। হিন্দু পুরাণের সঙ্গে গ্রীক পুরাণের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন *পদ্মাবতী* নাটকেও। সে কারণে, *তিলোত্তমাকে* যতোটা অভিনব এবং আকস্মিক মনে হয়, আসলে তা নয়। এ ব্যাপারে তাঁর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিলো অনেক আগে। *তিলোত্তমা* রচনার কয়েক মাস পরে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন: একজন খৃস্টান যুবক হিশেবে হিন্দু ধর্মকে তিনি থোড়াই পরোয়া করেন। কিন্তু হিন্দু পুরাণ এতো সুন্দর! যার সামান্য কল্পনাশক্তি আছে, সে-ই একে মোচড় দিয়ে অনেক রস বের করতে পারবে।[১২] সেই হিন্দু পুরাণ থেকে তিনি *তিলোত্তমার* জন্যে উদারভাবে উপকরণ ধার করেছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও *পদ্মাবতীর* মতো – ভিনদেশী ধারণাকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন দেশী দেবদেবীর ছদ্মবেশে। তবে দেশী-বিদেশী ভাবধারা এবং বিষয়বস্তুর অনুপাত যেমনই হোক না কেন, একদিকে দেবদেবী এবং অন্যদিকে অসুরদের রেখে তিনি যে-কাহিনীকাব্য রচনা করেন, তা আঙ্গিক এবং রসের বিচারে বাংলা কাব্যে একেবারে অভূতপূর্ব। তিনি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন

ছিলেন। গর্বের সঙ্গে তাই একাধিক জায়গায় বলেছেন: 'এ কাব্য হলো বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য।'[৭৩] এই কাব্য রচনা করার সময়ে প্রথম দিকে তিনি এতো উদ্দীপ্ত বোধ করেছেন, বিশেষ করে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে যে, *তিলোত্তমার* পাশাপাশি *রিজিয়া* এবং *সুভদ্রার* খানিকটাও এই নতুন ছন্দে রচনা করে ফেলেছিলেন।

এ ধরনের কাব্যের সঙ্গে তখনকার কলকাতার সাহিত্যরসিকদের তেমন কোনো পরিচয় না-থাকলেও, *তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্য যে বাংলা সাহিত্যের দরবারে এক অসাধারণ আগন্তুক, তা বুঝতে অনেকের কষ্ট হয়নি। যতীন্দ্রমোহন এবং রাজারা তো এর প্রশংসা করেইছিলেন, অন্য যাঁরা এই কাব্য পড়েছিলেন, তাঁরাও এর মধ্যে মৌলিকত্ব আছে, এটা বুঝতে ভুল করেননি। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছাত্রজীবন থেকে মাইকেলের চেনা। তিনি ১৮৫৯ সালে *বিবিধার্থ সংগ্রহ* পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। *তিলোত্তমার* প্রথম সর্গের পাণ্ডুলিপি দেখে অমনি তিনি তা ছোঁ মেরে নিয়ে নিলেন। মাইকেল এ সর্গ রচনা করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটি *বিবিধার্থ সংগ্রহে* ছাপা হয় শ্রাবণ (১৮৫৯) সংখ্যায়। তার পরের মাসে ছাপা হয় দ্বিতীয় সর্গ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কবির নাম তাতে ছাপা হয়নি। বরং রাজেন্দ্রলাল এই প্রকাশিত অংশের সঙ্গে একটা কৈফিয়ত জুড়ে দিয়েছেন। তিনি লেখেন:

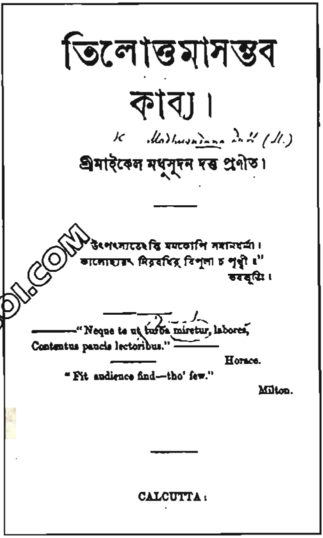
> কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অন্ত্যযমকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়: বর্ত্তমান প্রস্তাবে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।[৭৪]

পত্রিকার সম্পাদক কাব্যের অংশবিশেষ প্রকাশ করতে সাহস পেলেন; সেই অংশের কাব্যগুণ এবং ছন্দের অভিনবত্বের উচ্চ প্রশংসা করলেন — অথচ কবির নাম প্রকাশ করলেন না কেন, বলা মুশকিল। সম্পাদকের মন্তব্য থেকে মনে হয় না, সে নাম প্রকাশে তাঁর তেমন কোনো আপত্তি ছিলো। কারণ আপত্তি থাকলে অথবা এই কাব্যকে যথেষ্ট উঁচু মানের বলে মনে না-করলে, তিনি এই কাব্য প্রকাশই করতেন না। আমার ধারণা, আপত্তি ছিলো স্বয়ং কবির। তিনি অমিত্রাক্ষর লিখে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, কিন্তু পাঠকরা এই অভিনব ছন্দের কাব্যকে কেমনভাবে গ্রহণ করবেন, বিশেষ করে 'মাইকেল' নামের এক ম্লেচ্ছ কবির রচনাকে, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। সে জন্যে, পত্রিকায় নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। এক সময়ে কলকাতায় *The Captive Ladie* কাঙ্ক্ষিত সমাদর লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছিলো, সেই অভিমান এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবই হয়তো তাঁকে নিজের নাম গোপন রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলো — প্রথমে দেখতে চেয়েছিলেন পাঠক এবং সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়।

পত্রিকায় প্রকাশের অব্যবহিত পরে এই কাব্যের কোনো প্রতিকূল সমালোচনা শুনে তিনি নিরুৎসাহ হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু, *পদ্মাবতীর* মতো এই কাব্য রচনার কাজও হঠাৎ মাঝ পথে বন্ধ রেখেছিলেন। তারপর প্রায় পাঁচ-ছ মাস পরে তিনি এটা শেষ করেন। তা-ও এক বারে শেষ করেছিলেন কিনা সন্দেহ করি। কারণ, তিনি লিখেছেন: তৃতীয় সর্গের শেষে তিনি কাব্যটি সমাপ্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের অনুরোধে কাহিনীটি চতুর্থ সর্গ পর্যন্ত টেনে নেন। সুন্দ-উপসুন্দকে তিনি যে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়ে পাঠকদের সামনে হাজির করেননি, সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। গোড়াতে তিনি মোট পাঁচটি সর্গ লিখতে চেয়েছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখেছিলেন: 'পঞ্চম সর্গটি লিখিনি ছাপার জন্যে বেচারা যতীন্দ্রমোহনের খরচ বেড়ে যাবে বলে।'[৭৫] এ কোনো

যুক্তিপূর্ণ কৈফিয়ৎ নয়। আমার ধারণা, তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি যেভাবে সুন্দ-উপসুন্দের পরস্পরকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তাড়াহুড়ো করে কাব্যটি শেষ করেন, তার সঙ্গে বিস্তারিত প্রস্তুতি পর্বের সামঞ্জস্য নেই।

সে যাই হোক, খুব সম্ভব ১৮৬০ সালের জানুআরি মাসে ছাপার জন্যে তিনি এ কাব্যের পাণ্ডুলিপি শেষ করেন। ১৪ ফেব্রুআরি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে লেখেন: 'চতুর্থ সর্গ পড়ার কাজ শেষ করেছি। আমার ভয় হচ্ছিলো, আমার জন্যে পাছে ছাপার কাজে দেরি হয়ে যায়। তাই আমি খানিকটা অবসরের সময় বেছে নিয়ে বইটা শেষ করে ফেলেছি। পড়তে গিয়ে আমার এতো ভালো লেগেছিলো যে, নিজের অজ্ঞাতেই এই বই-এর শেষে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ফলে গেছে — কাব্যদেবী অকাতরে আপনার জন্যে গৌরব নিয়ে এসেছেন। তৃতীয় সর্গের চেয়েও এই সর্গটা ভালো হয়েছে।'[৭৬] পাছে ছাপার কাজে দেরি হয়ে যায়, যতীন্দ্রমোহন সে জন্যে দ্রুত পাণ্ডুলিপি পড়ে ফেললেও, ছাপার কাজে শেষ পর্যন্ত কিছু দেরি হয়েছিলো। ২৪ এপ্রিল কবি রাজনারায়ণ বসুকে যে-চিঠি লেখেন, তা থেকে জানা যাচ্ছে, তখনো সে বইটি প্রকাশিত হয়নি। তবে তিন সপ্তাহ পরে যখন আবার চিঠি লেখেন, তখন জানান যে, বইটি সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে।[৭৭]


তিলোত্তমাসম্ভব

কাব্য।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মমকোপি সমানধর্ম্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধির্ বিপুলা চ পৃথ্বী॥"
ভবভূতি।

——"Neque te ut turba miretur, labores,
Contentus paucis lectoribus."
Horace.

"Fit audience find—tho' few."
Milton.

CALCUTTA:

তিলোত্তমার নামপত্র

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর বাংলা পত্রপত্রিকায় এ কাব্যের মোটামুটি অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। মাস দুয়েকের মধ্যেই *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমালোচনা ছাপা হয়। দ্বারকানাথ সংস্কৃত পণ্ডিত হলেও প্রাচীনপন্থী ছিলেন না। তিনি কবির অভিনবত্ব দেখে তার নিন্দা করেননি। বরং তাঁর পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বের প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁর ভাষার সৌন্দর্য এবং নতুন ছন্দের অশেষ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সমালোচনা করেছিলেন তাঁর বিষয়বস্তুর এবং ভাষার কাঠিন্যের।[৭৮] *বিবিধার্থ সংগ্রহে* রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমালোচনা বের হয় বছরের শেষ দিকে। তাতে তিনি কবির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। কবির শব্দ ব্যবহারের সমালোচনা করলেও, 'বর্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই' বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[৭৯]

তিলোত্তমা যখন প্রথম লিখেছিলেন, তখন কবি এই কাব্যের মান সম্পর্কে ঠিক আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারেননি। তা ছাড়া, নিজের চার দিকে এমন কাউকে পাননি, যিনি এ কাব্যের যথার্থ সমালোচনা অথবা মূল্যায়ন করতে পারতেন। এ কাব্যে তিনি দেশীবিদেশী উপাদানের যে-সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন এবং যে-নতুন ছন্দ প্রবর্তন করেছিলেন, তা তাঁর পাঠকদের জন্যে এ কাব্যকে আরো কঠিন করে তুলেছিলো। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সাহিত্যিক এবং পণ্ডিতও

প্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৌন্দর্য বুঝতে পারেননি। কবির চিঠি থেকে জানা যায় যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৌন্দর্য বুঝতে এবং তা ঠিকমতো পড়তে বিদ্যাসাগরের বেশ কয়েক মাস সময় লেগেছিলো।[৮০] বস্তুত যতোটা প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য ছিলো, তিনি যে জীবদ্দশায় তা পাননি, তার কারণ সেকালের বাঙালি পাঠকদের যে-কাব্যরুচি ছিলো, সে তুলনায় তিনি অনেক প্রাগ্রসর রচনা লিখেছিলেন। কেবল তাই নয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও নতুন ধারণা লাভ করার অথবা নিজের সাহিত্যচিন্তাকে পরিষ্কার করার সুযোগ পাননি। অথচ তিনি যে-ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের ভক্ত ছিলেন, তাঁরা পরস্পর কেবল পরিচিত ছিলেন না, একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত এবং উপকৃত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বায়রন, কীটস, শেলী, স্কট, মূর, সাউদি এবং হান্টের মধ্যে যে-ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিলো, তার কথা মনে করা যেতে পারে। তাঁরা তাঁদের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কলরিজেরও কাছাকাছি এসেছিলেন।



রাজেন্দ্রলাল মিত্র

অপর পক্ষে, মাইকেলের সাহিত্যসঙ্গী কারা ছিলেন? রোম্যান্টিক কবিদের তুলনায় বলতে গেলে কেউ নন। কারণ, যতীন্দ্রমোহন এবং দুই রাজা-ভ্রাতা তাঁর পৃষ্ঠপোষক থাকলেও, কবির চিন্তাকে প্ররোচিত করার ক্ষমতা তাঁদের ছিলো না। গৌরদাস তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, কিন্তু তিনি সাহিত্যের সমজদার ছিলেন না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে তিনি মিশতেন। কিন্তু এঁরা কেউ কবি-নাট্যকার ছিলেন না। বিদেশী সাহিত্যে এঁদের জ্ঞান যে অগাধ ছিলো, তা-ও নয়। ছোটোবেলা থেকে কবির আর-এক বন্ধু ছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির চেয়ে বয়সে প্রায় তিন বছরের ছোটো হলেও, পারিবারিক ভিত্তিতেই তাঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কবি মাদ্রাস থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর, তাঁর সঙ্গে আবার রঙ্গলালের যোগাযোগ হয়। এ সময়ে রঙ্গলাল *এডুকেশন গেজেট* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। তবে কবি যখন রাজনারায়ণ বসুর কাছে রঙ্গলালের কথা উল্লেখ করে চিঠি লেখেন (১৮৬০ সালের মাঝামাঝি) তখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সাময়িকভাবে অধ্যাপনা করছিলেন। (রঙ্গলালের সঙ্গে নিজের তুলনা করে তিনি কি নিজের অদৃষ্টকে দোষারোপ করেননি!) এই রঙ্গলাল ছিলেন কবির একমাত্র কবিবন্ধু। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁকে পদ্যলেখক বলে উল্লেখ করেছেন। রঙ্গলাল বিদেশী সাহিত্য জানতেন না, তা বলেননি। কিন্তু রঙ্গলালের দৌড় বড়ো জোর বায়রন, মূর আর স্কট পর্যন্ত, তার বেশি নয় — এই সীমাবদ্ধতার কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।[৮১] তিনি যে-ধ্রুপদী কবিদের দিয়ে পরিণত জীবনে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁদের রচনার সঙ্গে রঙ্গলালের পরিচয় ছিলো সামান্যই। *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* তিনি তাঁর বন্ধুকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। শুনে তাঁর বন্ধু প্রশংসাও করেছেন। এমন কি, তিনি লিখেছেন, তাঁর রচনা দিয়ে

রঙ্গলাল প্রভাবিত হয়েছেন।[৮২] কিন্তু প্রভাবিত হলেও মাইকেলকে তিনি ভাবাতে পারেননি।

কয়েক মাস পরে বিদ্যাসাগরকেও মাইকেল গুণগ্রাহী হিশেবে পেয়েছিলেন। তবে বিদ্যাসাগর সৃজনশীল সাহিত্যিক ছিলেন না। কবি এক চিঠিতে লিখেছিলেন: 'V... (*তিলোত্তমা*) পড়ে নিন্দা করেছেন।'[৮৩] এই V প্রায় নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগর। অবশ্য অচিরেই বিদ্যাসাগর তাঁর একজন পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। আর বিধবাবিবাহ আন্দোলনে তাঁর অবদানের জন্যে কবিও তাঁর মূর্তি নির্মাণের জন্যে এক মাসের অর্ধেক বেতন চাঁদা হিশেবে দিতে চেয়েছেন।[৮৪] বছর দুয়েকের মধ্যে বিদ্যাসাগরের নামে তিনি একটি বইও উৎসর্গ করেন। বস্তুত, গোটা বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগর যে অতি অসাধারণ একজন মানুষ তিনি সেটা বিশেষ করেই জানতেন। সে জন্যে, বিদ্যাসাগর যখন তাঁর কাব্যের প্রশংসা করেন, তখন একাধিক চিঠিতে তা উল্লেখ করেছিলেন।[৮৫]



রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এমতাবস্থায়, *তিলোত্তমা*র মূল্যায়নের জন্যে কবি একমাত্র যাঁর দিকে তাকালেন, তিনি রাজনারায়ণ বসু। দুঃখের বিষয়, সাহিত্য-পাঠক, সমাজ-সংস্কারক এবং ভাবুক হলেও, রাজনারায়ণও কোনো সৃজনশীল সাহিত্যিক ছিলেন না। তবু তিনি তাঁকেই অনুরোধ জানান, *তিলোত্তমা* সম্পর্কে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* একটা সমালোচনা লেখার জন্যে। কলেজ-জীবনে রাজনারায়ণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিলো না, আগেই আমরা তা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু *বিবিধার্থ সংগ্রহ* পত্রিকায় *তিলোত্তমা* পড়ে তিনি প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন।[৮৬] হিন্দু কলেজ ত্যাগ করার প্রায় দু দশক পরে এই চিঠির মাধ্যমেই দু জনের মধ্যে নতুন করে পরিচয় এবং বন্ধুতা গড়ে ওঠে। রাজনারায়ণের মন্তব্যে তিনি খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিলো, তিনি এতো দিনে তাঁর কাব্যের একজন সত্যিকার সমজদার পেয়েছেন। সে জন্যে তিনি নিজের থেকে চিঠি লিখে রাজনারায়ণকে এমন কথাও বলেছেন যে, কলকাতায় থাকলে, তিনি তাঁকে এ কাব্য নিয়ে বক্তৃতা করার জন্যেও অনুরোধ করতেন। তিনি আরো লেখেন: রাজনারায়ণ কি কোনো স্কুল-পরিদর্শককে চেনেন না, যিনি *তিলোত্তমা*কে স্কুলের উঁচু শ্রেণীর পাঠ্য বই হিশেবে সুপারিশ করতে পারেন?[৮৭] পাঠ্যবই হলে অনেক কপি বই বিক্রি হবে – সেটা কবির প্রধান লক্ষ্য ছিলো না। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর কাব্য দেশের লোকেদের কাছে পৌঁছে যাক। তিনি আরো লিখেছিলেন: কাব্যতো শিগগিরই বের হচ্ছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো, কজন পড়বে! তিনি আশা করতে পারেননি, তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য পাঠকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না-দিলে, তাঁরা সত্যি সত্যি তা বুঝতে পারবেন। সে জন্যে, তিনি এ কাব্যের সমালোচনা লেখার জন্যে রাজনারায়ণকে অতো অনুরোধ করেছিলেন।

ওদিকে, অনেক প্রশংসা করলেও, রাজনারায়ণ শেষ পর্যন্ত এ কাব্যের সমালোচনা *তত্ত্বোধিনী পত্রিকায়* লেখেননি। তবে তা সত্ত্বেও, আধুনিক কাব্য অথবা অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ পাঠকরাও কবিকে বিস্মিত করে এ বই কিনেছিলেন এবং এক বছরের মধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয়েছিলো।

রাজনারায়ণ তখন *তিলোত্তমার* সমালোচনা না-লিখলেও, অথবা প্রাচীনপন্থীরা তাঁর কাব্যের ছন্দ এবং বিষয়বস্তুর সামলোচনা করলেও, ইংরেজি শিক্ষিত নবীনদের কাছ থেকে কবি অনুকূল সমালোচনা যথেষ্ট পরিমাণে শুনেছিলেন। সে জন্যে, প্রথমে অনিশ্চিত থাকলেও, এক সময়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লিখেছেন: 'কাব্যটা শুরু করেছিলাম ঠাট্টার মধ্য দিয়ে, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, আমি আসলে এমন একটা কাজ করে ফেলেছি, যা আমাদের কাব্যকে বেশ এগিয়ে দেবে। অন্তত, ভবিষ্যতে যাঁরা বাংলায় কবিতা লিখবেন, তাঁরা এ থেকে এটুকু শিখতে পারবেন যে, কৃষ্ণনগরের সেই লোকটা, যাঁকে বলা হয় বাংলা কাব্যের জনক, তাঁর থেকে ভিন্ন ভঙ্গিতে কবিতা লিখতে হবে। লোকটা নিজে প্রতিভাবান হলেও কী জঘন্য তাঁর কবিতা!'[৮৮] *তিলোত্তমা* থেকে তিনি যে-আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিলেন, বস্তুত, তাই তাঁকে *মেঘনাদবধ* এবং *বীরাঙ্গনার* মতো আরো উন্নত কাব্য রচনার প্রেরণা দিয়েছিলো।

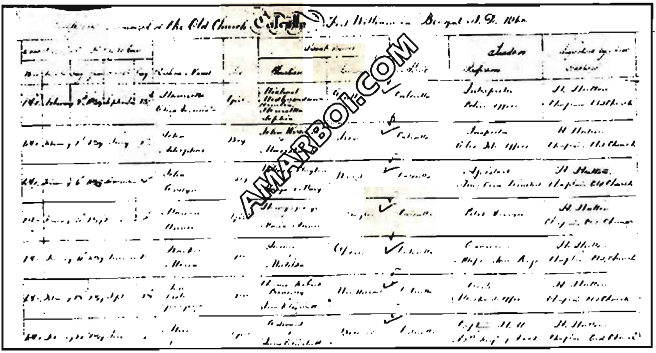
মাইকেল *তিলোত্তমার* প্রথম দু সর্গ লিখেছিলেন মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। যে-ছন্দে তিনি লিখেছিলেন, তার ওপর তখন তাঁর কোনো দখলও ছিলো না। তা ছাড়া, বাংলা শব্দভাণ্ডারও সে পর্যায়ে তাঁর ভালো আয়ত্তে ছিলো বলে মনে হয় না। এক বছর আগে *শর্মিষ্ঠা* লেখার সময়ে হিন্দু পুরাণও তাঁর কাছে অনায়ত্ত ছিলো। তা হলে তিনি এই অসাধ্য সাধন করলেন কী করে? এর সহজ উত্তর হলো: অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার পেছনে যেমন বাংলায় না-হোক, ইংরেজিতে তাঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিলো, তেমনি কাব্য রচনায়ও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিলো। তদুপরি, সন্দেহ করি, *The Captive Ladie* লেখার পর তিনি যে অনামী কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন এবং তার জন্যে তিনি যে-উপাদান সংগ্রহ করেন, তার অনেকটা *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* লেখার সময়ে কাজে লাগিয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে মাদ্রাসে তাঁর অনামী কাব্যটি সূর্যালোক না-দেখলেও, *তিলোত্তমা* গৌড়জনের মন ভোলাতে পেরেছিলো।

তিলোত্তমার দু সর্গ পর্যন্ত লেখার পর কবি যে কয়েক মাস এ কাব্য ফেলে রেখেছিলেন, তার কারণ সম্ভবত যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে বাজিতে জিতে এ কাব্য রচনায় তখনকার মতো তাঁর আগ্রহ হ্রাস পায়। কিন্তু এর পেছনে আরও দুটো কারণ ছিলো বলে মনে হয়। অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে তিনি রীতিমতো ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন। এর কারণ, প্রথমত তেসরা সেপ্টেম্বর তারিখে খুব ঘটা করে বেলগাছিয়া থিয়েটারে *শর্মিষ্ঠা* নাটক অভিনীত হয়। সেকালে একটা নাটকের অভিনয় খুব সহজ কাজ ছিলো না। এই অভিনয় উপলক্ষে তাঁর পক্ষে মহড়ায় নিয়মিত হাজির থাকা ছাড়া আরো কিছু বাড়তি দায়িত্ব পালন করাও সম্ভব। তবে তার চেয়েও গুরুতর কারণটা ছিলো পারিবারিক।

হেনরিয়েটার প্রথম সন্তানের জন্ম হয় ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে।[৮৯] এই উপলক্ষে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পরিবেশে নিঃসঙ্গ এবং সন্তান লালনে অভিজ্ঞতাহীন হেনরিয়েটাকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, হেনরিয়েটা তাঁর মাকে হারিয়েছিলেন এর সাড়ে ন বছর আগে এবং তাঁর ছোটো ভাই-এর জন্ম হয়েছিলো বিশ বছরেরও আগে। সুতরাং কোনো শিশুকে কিভাবে মানুষ করতে হয়, তিনি কাছ থেকে তা দেখার সুযোগ পাননি। অপর পক্ষে, মাইকেল ছিলেন আগে থেকেই চারটি সন্তানের জনক। এদের মানুষ করেছেন কিনা জানিনে, কিন্তু নিঃসন্দেহে এদের মানুষ হতে দেখেছেন। এই পরিবেশে তিনি যে হেনরিয়েটাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন, তা

প্রায় ধরে নেওয়া যায়। তিনি এবং তাঁর জীবনসঙ্গিনী এই সন্তানের নাম রাখেন হেনরিয়েটা অ্যালাইজা শর্মিষ্ঠা। হেনরিয়েটা নামটা, দেখাই যাচ্ছে, মায়ের দ্বিতীয় নাম থেকে নেওয়া। অ্যালাইজা হলো হেনরিয়েটার মায়ের নাম। আর, মেয়ের জন্মের মাত্র বারো দিন আগে *শর্মিষ্ঠা* নাটকের সফল অভিনয় দেখে কবি এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নাটকের নামটাও লাগিয়ে দিলেন মেয়ের নামের সঙ্গে। তৃতীয় নাম হলেও পরবর্তীকালে তিনি অনেক সময়ে তাঁর এই কন্যাকে শর্মিষ্ঠা নামেই শনাক্ত করতেন। এ থেকেও তাঁর প্রথম নাটকের প্রতি দরদের মাত্রা বোঝা যায়।

হেনরিয়েটা কলকাতায় আসার পর পরিচিত অথবা পড়শিদের কাছে তিনি তাঁকে নিশ্চয় স্ত্রী বলেই তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের যে কোনো চার্চে গিয়ে বিয়ে হয়নি অথবা রেবেকার সঙ্গে তাঁর যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি — এসব তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেননি। অসম্ভব নয় যে, শর্মিষ্ঠার ব্যাপটিজমের সময়ে এটা একটা ছোটোখাটো সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। তাঁদের কখন এবং কোথায় বিয়ে হয়েছিলো, ব্যাপটিজমের সময়ে পাছে বিব্রত হবার মতো সেই প্রশ্নটা ধর্মযাজকের মুখ থেকে শুনতে হয়, সম্ভবত সে জন্যে মেয়ের ব্যাপটিজম পিছিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে তাঁরা এই আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন মেয়ের জন্মের প্রায় পাঁচ মাস পরে — ১৮৬০ সালের দোসরা



কন্যা শর্মিষ্ঠার ব্যাপটিজমের দলিল

ফেব্রুআরি তারিখে — *তিলোত্তমা* ছাপানোর যখন উদ্যোগ চলছিলো এবং প্রহসন দুটি যখন হয় সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে অথবা দু-এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত হবার কথা। মাদ্রাসে বসে যখন তিনি প্রথম পিতা হতে যাচ্ছিলেন, তখন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লিখেছিলেন: হেই, আমার তারকারা উজ্জ্বল হচ্ছে।[১০] কিন্তু আগের অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি, সত্যি সত্যি মাদ্রাসে তাঁর প্রথম কন্যার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গ্রহ-নক্ষত্র হঠাৎ এমন কিছু ভালো ফল দিতে আরম্ভ করেনি। কিন্তু শর্মিষ্ঠার জন্মের সময়ে এবং তার পরবর্তী আড়াই বছর আর্থিক অবস্থার তেমন উন্নতি না-হলেও, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিলো। শর্মিষ্ঠার জন্মের ঠিক আগে এবং পরে কী বলে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন কে জানে!

ঠিক ন বছর এগারো মাস আগে — ১৮৪৯ সালের অগস্ট মাসে প্রথম সন্তানের পিতা হবার পর যে-আনন্দ পেয়েছিলেন এবং যে-সন্তানদের সঙ্গ থেকে প্রায় চার বছর বঞ্চিত ছিলেন, শর্মিষ্ঠা জন্মের পর

তিনি সেই আনন্দই নিশ্চয় পেয়েছিলেন! কিন্তু সেই সঙ্গে ফেলে-আসা সন্তানদের জন্যে দুঃখ কি ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়নি? শর্মিষ্ঠার আধো-আধো কথা এবং হাসি-কান্না কি ব্যর্থা, ফিবি, জর্জ আর মাইকেলের স্মৃতিই তাঁর মনে জাগিয়ে তোলেনি? ছোটো ছেলে মাইকেল মারা গিয়েছিলো কবি মাদ্রাস ত্যাগের অল্প দিন পরে। কিন্তু জীবিত তিনটি সন্তানও কার্যত তাঁর কাছে ছিলো মৃত। এই দাহ কি তাঁকে ভেতরে ভেতরে তুষানলের মতো দগ্ধ করেনি? তিনি যদি সাধারণ মানুষ হতেন, তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো যদি মোটা হতো, তা হলে এসব তাঁকে কম ব্যথিত করতো। কিন্তু স্পর্শকাতর হৃদয়ের অধিকারী কবির মনের গভীরে সূক্ষ্ম তারগুলো যে নিরন্তর পিলু-বারোঁয়ার ধুন বাজিয়েছে, কোথাও তিনি লিখিতভাবে না-বললেও, সেটা বোধ হয় অস্বীকার করার জো নেই।

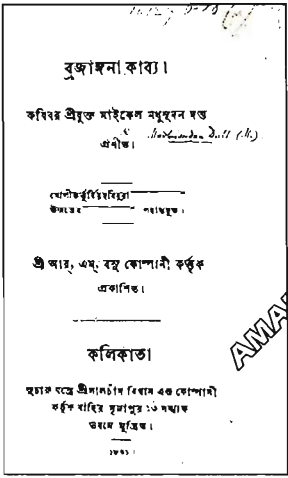
কিন্তু রেবেকা এবং ফেলে আসা সন্তানদের জন্যে কাতর হলেও সেই দুঃখকে কারো সঙ্গে তিনি ভাগ করে নিতে পারেননি। হেনরিয়েটার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না; এমন কি, গৌরদাসের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছেও মনের কথা প্রকাশ করে হাল্কা হতে পারেননি। গৌরদাস এবং রাজনারায়ণ বসুর মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা অবশ্য মাইকেলের আগের বিয়ে এবং পরিবারের কী হলো, তা নিয়ে কখনো কখনো জল্পনা-কল্পনা করতেন। কবি মারা যাবার পরে যেমন গৌরদাস বসাককে লেখা একটি চিঠিতে রাজনারায়ণ বসু এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছিলেন: 'তুমি আমাকে লেখোনি, কিন্তু আমি আগেই সন্দেহ করতাম যে, মধু (হেনরিয়েটাকে নিয়ে) পালিয়ে এসেছিলো।'[১১] বন্ধুরা মাইকেলকে ভালো করেই চিনতেন। তাঁরা জানতেন, পারিবারিক গোপন কথা তিনি কারো কাছে বলবেন না। সে জন্যে তাঁরা হয়তো তাঁকে এ ব্যাপারে একাধিক বার প্রশ্ন করেননি। আর তিনিও এ ব্যাপারে এড়িয়ে যাবার মতো কোনো উত্তর দেওয়া ছাড়া সঠিক উত্তর দেননি।

রেবেকাকে নিয়ে ঘর করলেও মাদ্রাসে থাকার সময়ে অন্তত দু বছর তিনি হেনরিয়েটার সঙ্গে প্রেম করেছিলেন বলে মনে হয়। দ্বৈতজীবন যাপন তাঁর তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছিলো। হেনরিয়েটা আসার পর, কলকাতায়ও সেই দ্বৈতজীবনের মহড়া চলতে থাকে — তবে এবারে লুকোনোর প্রয়াস হেনরিয়েটার কাছ থেকে। বস্তুত, কি মাদ্রাস, কি কলকাতা — কোথাও তিনি নিজেকে কারো কাছে ঠিক খুলে ধরতে পারেননি। তাঁর কাব্যেও — *বীরাঙ্গনায়* — দ্বিতীয় এক ব্যক্তির জন্যে প্রেম নিবেদনের কথা বেশ জোরালোভাবে প্রকাশ করেছিলেন। সে-ও কি আত্মজৈবনিক বিষাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি? কিন্তু দুঃখ তাঁকে কুরে কুরে খেলেও, রোম্যান্টিক কবি আশা করতে, স্বপ্নের জাল বুনতে ভালোবাসতেন। ভাঙা সংসার, লেগে-থাকা দুর্বহ দারিদ্র্য, কর্মস্থানে অসন্তোষ, নিঃসঙ্গতা — সবকিছুর মধ্যেও আরো খ্যাতির খোয়াব দেখেছেন, আইন পড়ে অনেক অর্থ উপার্জন করার আশা করেছেন, হেনরিয়েটা এবং নতুন সন্তানকে ভালোবেসেছেন, বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করেছেন।[১২] কবিত্বের মতো রসিকতাও ছিলো তাঁর সহজাত। এখানেও তাঁর ব্যক্তিত্বের দুটি কোঠা দেখতে পাই।

সে যাই হোক, কন্যার জন্মের কিছু আগে থেকে আরম্ভ করে চার-পাঁচ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর মাস (১৮৫৯) পর্যন্ত তিনি অন্য কোনো রচনায় হাত দেননি। এ সময়ে *তিলোত্তমার* পাণ্ডুলিপি মাজা-ঘষা করেছিলেন হয়তো, জানুআরি মাসের দিকে লেখাও শেষ করেছিলেন। এমন কি, *ব্রজাঙ্গনা* কাব্যের কিছু কবিতাও সম্ভবত এ সময়ে লিখেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ছিলো তুলনামূলকভাবে কম সৃষ্টিশীল। পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখা যাবে, এর পরের আড়াই বছর তিনি অনেক বেশি লিখেছিলেন। বলতে গেলে, সেটাই ছিলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে উর্বর সময়।

ডিসেম্বর-জানুআরি মাসে প্রকাশের জন্যে *তিলোত্তমার* চূড়ান্ত রূপ দিতে গিয়ে তিনি অমিত্রাক্ষরের ওপর তাঁর দখল আরো জোরদার করেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, অমিত্রাক্ষরের ভেতর যে-অসীম

সম্ভাবনা ছিলো, তা আরো ভালো করে উপলব্ধি করেন। তা ছাড়া, হিন্দু পুরাণকে ব্যবহার করে আধুনিক কালের উপযোগী মানবিক আগ্রহবিশিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির যে-অনন্ত সম্ভাবনার কথা আগে এক সময়ে লিখেছিলেন, এখন নিজে সেটা আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন। আমার বিশ্বাস, এই পরিবেশেই তাঁর মাথায় আসে *মেঘনাদবধ কাব্যের* ধারণা। সুন্দ-উপসুন্দের যে-কাহিনী তিনি *তিলোত্তমার* জন্যে নির্বাচন করেছিলেন, তার চেয়ে রামায়ণের কাহিনী যে অনেক বেশি নাটকীয় এবং জনপ্রিয়, এ-ও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু *মেঘনাদবধ কাব্য* (এবং *ব্রজাঙ্গনা*) তিনি লিখতে শুরু করেন কোনো রকমের ঢাক-ঢোল না-পিটিয়ে। এই দুটি বিষয়ের সঙ্গেই হিন্দু ধর্মীয় অনুষঙ্গ অত্যন্ত জোরালো। বাল্যকাল থেকে তিনি নিজেও রামায়ণ এবং রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন।


ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

শ্রী আর, এম, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী

ভবনে মুদ্রিত।

১৮৬১।

ব্রজাঙ্গনার নামপত্র

তাঁর রচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, তিনি পদাবলী পড়েছিলেন ভালো করে। তিনি নিশ্চয় অনেক বার কীর্তনও শুনেছেন। সত্যি বলতে কি, তাঁর পৈতৃক পরিবারের ধর্মবিশ্বাস যেমনই হোক না কেন, কীর্তনের প্রতি তাঁর টান ছিলো আন্তরিক। খৃস্টান তো আগেই হয়েছিলেন, এমন কি তিনি যখন বিলেত থেকে পুরোপুরি সাহেব হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন, তখনো নস্টালজিয়ার টানে হঠাৎ একদিন তিনি এক আগন্তুকের কাছ থেকে কীর্তন শুনেছেন, এমন ঘটনার কথাও জানা যাচ্ছে।[১৩] তবে পরিণত জীবনে তিনি রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে ধর্মীয় নয়, মানবিক প্রেমের সৌন্দর্য এবং আবেদনই দেখতে পেয়েছিলেন; এবং সেই আবেদনের কারণেই খৃস্টান হয়েও তিনি *ব্রজাঙ্গনা* লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যা লিখছিলেন, তা নিয়ে প্রায় কারো সঙ্গে আলাপ করেননি। এর কারণ, তিনি রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে যা দেখতে পেয়েছিলেন এবং চার দিকের লোকেরা এর মধ্যে যা দেখতে পেতেন, তা সম্পূর্ণ আলাদা। রাধা তাঁর চোখে জীবাত্মার প্রতীক নন, তিনি 'মিসেস রাধা' মাত্র। সেই *মিসেস রাধার* প্রেমের আন্তরিকতা এবং সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। প্রকৃত পক্ষে, তিনি বোধ হয় আশা করেননি, *ব্রজাঙ্গনার* বিষয়বস্তু নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলা যায়, অথবা সেটা কেউ ঠিকমতো বুঝতে পারবেন। কিন্তু তবু, একটি-দুটি করে তিনি মোট আঠারোটি আধুনিক পদাবলী লিখে ফেলেন। এবং মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যেই লেখার কাজ শেষ করে ছাপাতে দিয়েছিলেন।

কাব্যবিচারে *ব্রজাঙ্গনা* কতোটা সার্থক হয়েছে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশেষ করে এর আন্তরিকতা সম্পর্কে। রাধাকৃষ্ণের কাহিনীকে যাঁরা ধর্মীয় অনুষঙ্গে দেখতে পান, তাঁরা এই পদাবলীতে আন্তরিক ভক্তিভাবের অভাব দেখে এর প্রতি কম আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন। কিন্তু কবি যে এ কাব্য আন্তরিকতার সঙ্গেই লিখেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথম যৌবন থেকে তাঁর মধ্যে গীতলতার যে-ধারা বহমান ছিলো এবং যাকে তিনি অন্তহীন অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত এক ধরনের

মননশীলতার আবরণ দিয়ে এপিকী চেহারা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, *মেঘনাদবধ* লেখার ফাঁকে ফাঁকেও সেই গীতলতা *ব্রজাঙ্গনার* পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া, ভাষা এবং ছন্দ নিয়ে তিনি নিরন্তর যে-পরীক্ষানিরীক্ষা করছিলেন, *ব্রজাঙ্গনায়* তা নতুন দিগন্ত স্পর্শ করেছে। স্তবকবিন্যাস এবং অন্ত্যমিলে এ কাব্যে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বল্প-আলোচিত একটি দিকের পরিচয় দিয়েছেন

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি -
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে, কুসুমে রতনে
ব্রজের বালা?
আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী?
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার
বনশোভিনী?
অলি বঁধু তার; কে আছে রাধার
হতভাগিনী?

এই পঙ্ক্তিগুলোকে বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী খ্যাতনামা লিরিক কবিদের লেখা বলেই মনে হয় - অন্তত, মাইকেলের রচনা বলে চেনা যায় না।[১৪]

মেঘনাদবধ তিনি মোটামুটি নীরবে রচনা করতে শুরু করেছিলেন - *তিলোত্তমার* পাণ্ডুলিপি শেষ করার ঠিক পরে, সম্ভবত ১৮৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি একদিকে রাম-লক্ষ্মণ আর অন্যদিকে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিশেবে রাবণ এবং রাক্ষসদের যেভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন, তখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষিত আধুনিক ব্যক্তিদের পক্ষেও এ কাহিনীর তেমন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব ছিলো না। হতে পারে, সে জন্যেই *মেঘনাদবধ কাব্য* লেখার গোড়ার দিকে তিনি এ কাব্য সম্পর্কে তাঁর বন্ধুদের তেমন কিছু বলেননি। কাজ একটু এগিয়ে গেলে, তখন দেখাবার কথা ভেবে থাকবেন। তা ছাড়া, তখনো অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং কাব্য রচনায় তাঁর হাত কতোটা এসেছে, সে সম্পর্কে তিনি ষোলো আনা আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারেননি। ২৪শে এপ্রিল তিনি রাজনারায়ণ বসুকে যে-চিঠি লেখেন, তা থেকে আভাস পাওয়া যায়, *মেঘনাদবধ কাব্যের* বেশ খানিকটা ততোদিনে লেখা হয়ে গেছে। তা না-হলে তিনি এ চিঠিতে লিখতেন না: 'আমি আমার প্রিয় ইন্দ্রজিতের মৃত্যু উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি।' কিন্তু এতোটা রচনা করার পরও তিনি লিখেছেন: 'আমার মনে হয় না, এখনো আমি কাব্য রচনার কৌশল ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পেরেছি। সে জন্যে তোমাদের আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে কয়েকটা ছোটোখাটো মহাকাব্য লিখে হাত পাকিয়ে নিই!'[১৫] এই চিঠির সঙ্গে রাজনারায়ণের কাছে কবি *মেঘনাদবধ কাব্যের* প্রারম্ভিক অংশটা পাঠিয়েছিলেন। তাঁর জবানি থেকে জানা যাচ্ছে, এর আগেও তিনি এক বন্ধুকে এই সূচনা অংশটি দেখিয়েছিলেন এবং সেই বন্ধু বলেছিলেন: 'চমৎকার!'[১৬]

এ সময়ে বাল্যবন্ধু রঙ্গলাল প্রায়ই আসতেন মধুর সঙ্গে আলাপ করতে। যে-বন্ধু *মেঘনাদের* শুরুটা দেখে বলেছিলেন 'চমৎকার', তিনি রঙ্গলালও হতে পারেন। *তিলোত্তমা* পড়ে তিনি যে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা কবি উল্লেখ করেছিলেন। তবে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিচারবুদ্ধির ওপর তিনি ঠিক ভরসা করতে পারছিলেন না। সে জন্যে রাজনারায়ণের মতামত চেয়ে পাঠান। ছাত্রজীবনে রাজনারায়ণ প্রচুর সাহিত্য পড়তেন। *বিবিধার্থ সংগ্রহ* পত্রিকায় *তিলোত্তমা* পড়ে তিনি যে-

সমালোচনামূলক চিঠি লিখেছিলেন, তা দেখে কবি বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, রাজনারায়ণের সাহিত্যবোধ রয়েছে। তাঁর মতামত চাওয়ার আর-একটা কারণ বোধ হয় এই যে, সেই পর্যায়ে, ঐতিহ্যিক হিন্দু মূল্যবোধের প্রতি তাঁর আনুগত্যের আপেক্ষিক অভাব ছিলো। কবি ভালো করে জানতেন, রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম। বস্তুত, রাজনারায়ণ তাঁকে তাঁর ব্রাহ্ম ধর্ম বিষয়ক উপদেশমালার কপি পাঠিয়েছিলেন[৯৭] এবং *তিলোত্তমার* ইন্দ্র চরিত্রেরও প্রতিকূল সমালোচনা করেছিলেন। এই সমালোচনার কারণ, সে পর্বে পৌত্তলিকতা-বর্জিত ব্রাহ্ম ধর্মে তাঁর গভীর আস্থা - মাইকেল এমন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।[৯৮]

মে মাসের গোড়ায় *পদ্মাবতী* প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণের কাছে *মেঘনাদবধ কাব্যের* সূচনা অংশ সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়ে তিনি যে-চিঠি লিখেছিলেন, তার জবাবও পান এ সময়ে। কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটছিলো। নিজেই লিখেছেন: 'অফিসের কাজ করি; চার-পাঁচ ঘণ্টা আইন পড়ি, ল্যাটিন, গ্রীক আর সংস্কৃত শিখি - তারপর কবিতাও লিখি। একজন অলস লোককে ব্যস্ত রাখার জন্যে এসব কি যথেষ্ট নয়?'[৯৯] রাজনারায়ণ *মেঘনাদ* সম্পর্কে কী লিখেছিলেন, জানা যাচ্ছে না। কিন্তু অনুমান করি, অনুকূল সমালোচনাই করেছিলেন। তা ছাড়া, সৃষ্টির আনন্দে কবি তখন মশগুল। রাজনারায়ণের চিঠির উত্তর দিতে কদিন দেরি হয়ে গেলো। অবশ্য, তাঁর আত্মবিশ্বাস ততোদিনে যে বেশ মজবুত হয়েছে, চিঠির ভাষা থেকে সেটা একেবারে পরিষ্কার। তাই লিখেছেন: 'বিশ্বনাথের *সাহিত্যদর্পণ*কে আমি কদলী দেখাবো। কোনো আদর্শ নিতে হলে আমি তা নেবো য়োরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের কাছে থেকে - সংস্কৃত সাহিত্য থেকে নয়।'[১০০] অবশ্য সেই সঙ্গে এ-ও বলেছিলেন যে, পরিবর্তন আনতে হবে ধীরে ধীরে। কারণ, তিনি জানতেন একটা জাতির সাহিত্যরুচি এক দিনে গড়ে ওঠে না অথবা বদলে দেওয়া যায় না। সে জন্যে, কি নাটক লেখার সময়ে, কি কাব্য লেখার সময়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতামত তিনি অনেকটাই মেনে নিয়েছিলেন। *শর্মিষ্ঠা* অথবা *তিলোত্তমা* লেখার সময়ে তাঁর এই মানসিকতা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু *মেঘনাদবধকাব্য* লেখার আগে তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস লাভ করেছিলেন। বর্ধিত আত্ম-বিশ্বাসের কারণে *সাহিত্যদর্পণ*কে জলে ফেলে দেবার সাহসী উক্তি করলেও, শেষ পর্যন্ত মহাকাব্য সম্পর্কে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বিধান তিনি উড়িয়ে দেননি বা দিতে পারেননি। তার সঙ্গে আপোশ করেছিলেন।

একদিকে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবার জন্যে এবং অন্যদিকে খানিকটা লেখার পর সৃষ্টির নেশায় চুর হবার দরুন *মেঘনাদবধ* রচনায় এ সময়ে বেশ অগ্রগতি হয়। রাজনারায়ণকে লিখেছেন: '*মেঘনাদ* দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।' আশা করেছেন, বছরের শেষাশেষি রচনার কাজ সমাপ্ত হবে। রাজনারায়ণ যে এই কাব্যের সূচনা অংশটি পছন্দ করেছিলেন, তা জানতে পেরে লিখেছেন: 'শুরুটা তোমার ভালো লেগেছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।'[১০১] তবে তিনি যে-চালে কথাটা লিখেছেন, তাতে মনে হতে পারে, রাজনারায়ণ পছন্দ করেছেন, ভালো কথা, পছন্দ না-করলেও কিছু যেতো-আসতো না। কিন্তু না, রাজনারায়ণের মতামতকে তিনি মূল্য দিতেন। সে কারণে, *তিলোত্তমার* প্রশংসা অনেকের কাছে শোনা সত্ত্বেও, মে মাসের শেষে অথবা জুন মাসের প্রথম দিকে *তিলোত্তমা* প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনারায়ণকে সত্যিকার মতামত দেবার জন্যে বারবার অনুরোধ করেছেন। আশ্বাস দিয়ে বলেছেন: 'সমালোচনা আমি সহ্য করতে পারবো। তুমি যদি এ কাব্যের সমালোচনা করো, তা হলে, দোহাই তোমার, বন্ধু বলে আমাকে খাতির করো না। আমার যতোটা প্রাপ্য আমাকে ততোটাই আচ্ছামতো আঘাত কোরো। যারা সাহিত্যের লেজ নেড়েছিলো, আমি হচ্ছি তাদের মধ্যে অন্যতম ভেজা বেড়াল।' মে মাসের গোড়ার দিকে *পদ্মাবতী* প্রকাশিত হবার পর, সে নাটক সম্পর্কেও তিনি রাজনারায়ণের

মতামত চেয়ে আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছিলেন।[১০২] বস্তুত, তিনি মনে করতেন, বড়ো সমালোচক হবার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিলো। তাঁকে সে কথা তিনি মনেও করিয়ে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, বঙ্গদেশে সাহিত্য খানিকটা রচিত হলেও, সাহিত্য সমালোচনা কী বস্তু, সে সম্পর্কে পাঠকদের কোনো ধারণা ছিলো না। সে জন্যে, রাজনারায়ণকে অনুরোধ জানিয়েছেন, দেশবাসীর কাছে সঙ্গত এবং আলোকিত সমালোচনার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে।

রাজনারায়ণ এই কাব্যের কিছু দোষত্রুটির দিকে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এর মধ্যে বিশেষ করে ছিলো, কবির উপমা সম্পর্কে তাঁর আপত্তি। তাঁর মনে হয়েছিলো যে, মাইকেল চিরাচরিত উপমা ব্যবহার করেন, বিশেষত আদিরসাত্মক উপমা।[১০৩] রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী কবি রীতিমতো ভালোবাসতেন — *ব্রজাঙ্গনা* নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। তা ছাড়া, স্থির বিদ্যুতের মতো বহু-ব্যবহৃত উপমাও কবি *তিলোত্তমায়* লাগিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ এসবের সমালোচনা করেছিলেন একটি চিঠিতে। কবি এই সমালোচনা প্রসন্নতার সঙ্গে মেনে নেন। উত্তরে লেখেন: 'মনে কোরো না, তোমার সমালোচনা বন্ধ্যা জমিতে পড়েছে। *মেঘনাদে* দেখবে কোনো আদিরসাত্মক উপমা নেই, চাঁদের সঙ্গে পদ্মের ভালোবাসার কথা নেই, স্থির বিদ্যুতের উল্লেখ নেই, এমন কি, রাধার বিখ্যাত প্রেমের কথা একবারও নেই।' আদিরসাত্মক উপমা তিনি *তিলোত্তমায়* কেন ব্যবহার করেছিলেন, তার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বলেছেন: 'এ হলো কালিদাসের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বের জন্যে।'[১০৪] তিনি যে প্রথমে বিশপস কলেজে এবং পরে মাদ্রাসে বেশ ভালো সংস্কৃত শিখেছিলেন — অন্তত কালিদাস পড়ার মতো — সে কথাও তিনি রাজনারায়ণকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।

অন্য পাঁচজন শিল্পীর মতোই, মাইকেল কেবল সমালোচকদের মুখ চেয়ে লিখতেন না। মনের আনন্দেই লিখতেন। অবশ্য তিনি যে ভালো লিখছেন, এ আশ্বাস তিনি প্রতি নিয়ত চাইতেন। (সে কি আত্মবিশ্বাসের অভাবে? নাকি, মাদ্রাসে প্রথম কাব্য লিখে কাঙ্ক্ষিত খ্যাতি লাভে ব্যর্থ হওয়ার দরুন?) *মেঘনাদবধকাব্যে* তিনি বড়ো রকমের একটা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি ভালো-মন্দ সম্পর্কে জনপ্রিয় বিশ্বাসের আঁতে ঘা দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, রাম-রাবণ সম্পর্কে তাঁর গতানুগতিকতা-বিরোধী মনোভাবের মতো, পয়ারের ওপর স্টীম রোলার চালিয়ে তিনি যে-ছন্দ রচনা করেন, তা-ও ছিলো সমান অ-গতানুগতিক। এমন কি, যে-ভাষায় তিনি লিখেছিলেন, সেও অনেকাংশে তাঁর নিজের গড়া। এমতাবস্থায়, সমালোচকদের কাছ থেকে তাঁর আশ্বাসের দরকার ছিলো বৈকি! কিন্তু সমালোচকরা যেমনই দেখতে পান না কেন, *মেঘনাদবধকাব্যের* বেশ খানিকটা লিখে তিনি নিজে এই কাহিনীর সৌন্দর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারছিলেন। তাই রাজনারায়ণকে লিখেছেন: 'একজন উৎসাহী খৃস্টান তরুণ হিশেবে হিন্দু ধর্মকে আমি এক চুলও পরোয়া করিনে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের চমৎকার পৌরাণিক কাহিনী আমি ভালোবাসি। কী কাব্যিক! যার কল্পনা করার মতো ক্ষমতা আছে, তেমন কেউ একে ব্যবহার করে সুন্দরতম বস্তু তৈরি করতে পারবে।'[১০৫] নিজের ধর্মবিশ্বাস এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এখানে তিনি অতো খুলে বলতে পেরেছেন সম্ভবত রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন বলে। তিনি জানতেন, সে পর্যায়ে রাজনারায়ণ নিজেকে ঐতিহ্যিক হিন্দু ধর্ম থেকে দূরে ব্রাহ্ম বলে শনাক্ত করতেন।

মাইকেল চিঠিপত্রে অনেক বিষয়ে মন খুলতে পারতেন। বিশেষ করে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হতে পারতেন। তবে তাতে নিজের ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক খবর সামান্যই দিতেন। কিন্তু এই মাত্র যে-চিঠির উল্লেখ করলাম, সেই চিঠিতে তিনি হেনরিয়েটা সম্পর্কে দুটি তথ্য উল্লেখ করেন।

একটি সম্ভবত তাঁর পিতার মৃত্যু সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন: 'মাস পাঁচেক আগে ইংল্যান্ডে আমার স্ত্রীর এক আত্মীয় মারা গেছেন, তাঁর জন্যে আমি এখন শোক করছি।'[১০৬] পাঁচ মাস আগে ইংল্যান্ডে হেনরিয়েটার কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মারা যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে, আমার ধারণা, ইনি আসলে হেনরিয়েটার আত্মীয়দের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ – তাঁর পিতা এবং কবির প্রাক্তন সহকর্মী জর্জ জাইলস হোয়াইট। মৃত্যুকালে এঁর বয়স হয়েছিলো ৫৪ বছর। ইনি অবশ্য ইংল্যান্ডে মারা যাননি, ইনি মারা যান মাদ্রাসে, ৭ জানুআরি।[১০৭] কবি যে গোপনীয়তা অবলম্বন করেন, তার মধ্যে হেনরিয়েটার সত্যিকার পরিচয় গোপন করার প্রয়াস থাকতে পারে। মনে রাখা দরকার, এ চিঠিতে তিনি হেনরিয়েটাকে সরাসরি স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেও, তাঁর সঙ্গে কোনো দিনই বিয়ে হয়নি। এই দুর্বলতার কারণে, তিনি আগাগোড়া তাঁর সম্পর্কে খানিকটা গোপনীয়তা পালন করেছেন। মৃত্যুর অল্প আগে তিনি সন্তানদেরও তাঁদের জননীর পরিচয় দিয়ে যাননি। অবশ্য যাঁর সঙ্গে তিনি পনেরো বছর স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্রে বাস করেছেন, কিন্তু প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারেননি বলে, বিয়ে করতে পারেননি – তাঁকে তিনি নিজের অন্তরে স্ত্রী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেন বলে মনে করা যায় না।

আলোচ্য চিঠিতে হেনরিয়েটা সম্পর্কে কবি দ্বিতীয় যে-তথ্যটি উল্লেখ করেন, সেটি হলো, রাজনারায়ণের স্ত্রী *তিলোত্তমার* প্রথম পাঠিকা নন; তাঁর আগে হেনরিয়েটা এ কাব্য পড়েছেন। এ বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। হেনরিয়েটা বাংলা শিখে এ কাব্য পড়ে তার সৌন্দর্য বুঝতে পেরেছিলেন, তা মনে হয় না। কিন্তু, এটা থেকে তাঁর চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। তিনি কবির সত্যিকারের সঙ্গিনী হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যে বাংলা শিখেছিলেন, বছর চারেক পরে লেখা কবির আর-একটি চিঠি থেকেও তা জানা যায়। *The Captive Ladie, Upsori, Rizia* অথবা তাঁর অনামা কাব্যটি পড়ে রেবেকা কতোটা প্রশংসা করেছিলেন অথবা কবিকে কতোটা উৎসাহ দিয়েছিলেন, তা জানার উপায় নেই। কিন্তু এটা জানা যাচ্ছে, হেনরিয়েটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর জীবনসঙ্গী অর্ধেক বাস্তব বিশ্বে বাস করেন, অর্ধেক স্বপ্নের জগতে। সুতরাং গোটা মানুষটাকে পেতে হলে, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বোঝা দরকার, আর দরকার তাঁকে রচনায় সম্যক উৎসাহ দেওয়া।

নিজের কথা বলতে গিয়ে কবি রাজনারায়ণকে এক জায়গায় লিখেছেন: 'আসলে আমি দারুণ অলস। কিন্তু এক-একটা সময়ে আমার মধ্যে লেখার নেশা জেগে ওঠে। তখন আমি পাহাড়ী নদীর মতো তরতর করে এগিয়ে যাই।' তিনি অলস ছিলেন না মোটেই। তিনি রুটি-রোজগারের কাজ ছাড়াও কখনো কখনো রোজ বারো ঘণ্টা লেখাপড়া করতেন, আমরা আগে তা দেখেছি। খুব বন্ধুবৎসল হলেও, অলস গল্প করে তিনি সময় কাটাতে পছন্দ করতেন না। নিজের জীবনযাত্রার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন: 'কলকাতার খবরের কাগজ আমি একদম পড়িনে। বাড়ি থেকে বের হই কালেভদ্রে।'[১০৮] হেনরিয়েটা কলকাতায় আসার পর থেকে তাঁর সামাজিকতা করার সুযোগ আরো কমে যায়। নিঃসঙ্গ সঙ্গিনীকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে বাইরে গিয়ে তিনি সময় কাটাতেন না। তদুপরি, আগের সেপ্টেম্বরে কন্যার জন্মের পর এই সুযোগ আরো কমে যাওয়াই স্বাভাবিক।

তা ছাড়া, তিনি বাইরে যাবেন কোথায়? কার সঙ্গে আড্ডা দেবেন, অথবা কথা বলবেন? তিনি যে-ধ্রুপদী সাহিত্যের পৌরাণিক জগতে বাস করতেন, অনেক ইংরেজি-শিক্ষিত লোক থাকলেও, সে জগতে তাঁর সঙ্গে বিচরণ করার মতো অন্য কোনো দোসর তাঁর চারদিকে ছিলো না। এক জায়গায় চিঠিতে তিনি লিখেছেন, তিনি বাস করেন মৃতদের মধ্যে।[১০৯] আরো একটা কথা মনে রাখা যেতে পারে, মাদ্রাসে তাঁর ইংরেজ / অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বন্ধু ছিলো, কিন্তু কলকাতায় তেমন ঘনিষ্ঠ কোনো ইংরেজ অথবা ফিরিঙ্গি বন্ধু ছিলো না। কারণ, কলকাতায় দেশীয় আর ইংরেজদের মধ্যে একটা

দুর্লঙ্ঘনীয় কাঁটাতারের বেড়া ছিলো। ফ্যাগানের মতো লোককে তিনি পছন্দ করতেন; কিন্তু সামাজিক মেলামেশার জন্যে পুলিশ কোর্টের একজন দোভাষী অথবা লিগ্যাল ক্ল্যার্কের সঙ্গে জজের দূরত্ব ছিলো যোজন যোজন। বরং, কলকাতায় এলে, গৌরদাস তাঁর কাছে আসতেন গল্প করতে। ১৮৬০ সালে রঙ্গলালও তাঁর কাছে আসতেন বেশ ঘন ঘন। এ রকমের বাল্যবন্ধুদের সঙ্গেই তিনি যা আড্ডা দিতেন। নয়তো বাড়িতেই থাকতেন হেনরিয়েটার সঙ্গে।

গরমের সময়ে গেলাশের পর গেলাশ বীয়ার খেতেন বরফ দিয়ে। কখনো শেরি। কখনো আরো কড়া পানীয়। তবে লেখার নেশায় যখন বুঁদ হতেন, তখন সেটাই যথেষ্ট হতো। তখন আর শরাবের দরকার হতো না। সত্যি বলতে কি, তখন তিনি ইচ্ছে করেই মদ্যপান করতেন না। কারণ মদ্যপান করলে তিনি সীমা রাখতে পারতেন না। আর অপরিমিত পান করার পর কিছুতেই ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে উঠতে পারতেন না। রাজনারায়ণের কাছে হলপ করে লিখেছেন: *তিলোত্তমার* একটি লাইনও তিনি নেশার ঘোরে লেখেননি। উল্টো, মদের নেশা হলে তিনি লিখতেই পারেন না।[১১০] হেনরিয়েটা মাদ্রাসে থাকতে মদ্যপান করতেন কিনা, জানার উপায় নেই। ধারণা করি, করতেন না। তিনি ছিলেন বাড়ির অল্পবয়সী অবিবাহিত বেকার কন্যা; পিতা এবং বিমাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো মন কষাকষির; তদুপরি মাদক জাতীয় পানীয়ের দামও যথেষ্ট। এমতাবস্থায়, নিয়মিত মদ্যপান না-করারই সম্ভাবনা। কিন্তু কলকাতায় এসে তিনি অচিরেই মদ্যপায়ী মাইকেলের পানীয়-সঙ্গিনী হয়েছিলেন।

কবির চরিত্রে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব দেখা যায় — এ সম্পর্কে আগেই ইঙ্গিত করেছি। স্রষ্টা মাইকেল আর পার্থিব ভোগের প্রতি লোভী, নিজেকে জাহির করতে সদাব্যস্ত, অহঙ্কারী, গাম্লিক্, আর-পাঁচজন-সাধারণ-মানুষের-মতো একজন রক্তমাংসের মানুষ মাইকেলের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিলো। তিনি নিশ্চয় অনেক সময়ে রেবেকা অথবা হেনরিয়েটার স্তরে নেমে আসতে পারতেন, কিন্তু কখনো কখনো তিনি যে তাঁদের থেকে অনেক দূরে সরে যেতেন, তা বলাই বাহুল্য। অনুমান করি, হেনরিয়েটাও অচিরে বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর সঙ্গে গল্প করার চেয়ে লেখাপড়া করতেই তাঁর সঙ্গী বেশি পছন্দ করেন। এবং এই উপলব্ধি থেকে হেনরিয়েটা যদি বেশি করে নিঃসঙ্গ বোধ করে থাকেন, তা হলে অবাক হবার কিছু নেই।

নিজেকে বারবার অলস আখ্যা দিয়ে কবি যা বলতে চেয়েছেন, তা হলো: লেখার ব্যাপারে তাঁর একটা আলস্য আছে। কেবল চিঠি লেখার ব্যাপারে নয়, কাব্য, নাটক ইত্যাদি লেখার ব্যাপারেও তিনি এই আলস্য অনুভব করতেন। তবে একবার লিখতে শুরু করলে লেখার তোড়ে কোথায় ভেসে যেতেন, নিজেই তা টের পেতেন না। এ যে কেবল তাঁর রচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি, তা নয়। একবার আলসেমি কাটিয়ে উঠে বন্ধুদের যখন লিখতেন, তখনো কথার ঘোরে, ভাবনার উচ্ছ্বাসে অনেক সময়ে ভেসে যেতেন। হাতের লেখায় তাঁর এক-একটা চিঠির দৈর্ঘ্য বিবেচনা করলে বোঝা যায়, তিনি কাগজ-কলম নিয়ে বসলে লিখতে কতো ভালোবাসতেন।

জ্যোতিষীরা বলেন, আগুনের ঘরে যাদের জন্ম, তাদের উৎসাহ নাকি আগুনের মতো মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, আবার সেই উৎসাহকে অল্প সময়ের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলে সে আগুন নিভেও যায় অচিরে। পঁচিশে জানুআরি জন্ম হয়ে থাকলে,[১১১] পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী কবির জন্ম আগুনের নয়, তাঁর জন্ম বায়ুর ঘরে। কিন্তু বারবার তাঁর মধ্যে দ্রুত উৎসাহ জন্ম নিতে এবং দ্রুত আবার সে উৎসাহ নিভে যেতে দেখি। একনাগাড়ে তিনি দীর্ঘ দিন কিছু করতে পারেননি, লিখতে তো নয়ই। মাদ্রাসে *The Captive Ladie* শেষ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনামা কাব্যটি অথবা *Rizia* শেষ করতে

পারেননি। কলকাতায়ও *পদ্মাবতী* লেখার আগে খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু লিখতে লিখতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ ছাড়া, *তিলোত্তমা* তিন সর্গেই শেষ করতে চেয়েছিলেন। বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে লেখা আরম্ভ করেছিলেন; শেষ করেননি। প্রহসন লিখে খুব সফল হলেও, পরে মন্তব্য করেছিলেন, প্রহসন লেখার সময় হয়নি। কিন্তু ১৮৬০ সালের শুরু থেকে আরম্ভ করে পরের বছর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাঁর মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। এমন বিরতিহীন সৃষ্টির উৎসাহ তাঁর মধ্যে এর আগে অথবা পরে কখনো দেখা যায়নি।

পদ্মাবতী আগেই শেষ করেছিলেন – বছরের (১৮৬০) গোড়ার দিকে। তারপর বসেন *তিলোত্তমা* শেষ করতে। *তিলোত্তমা* শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে লিখতে আরম্ভ করেন *মেঘনাদবধ কাব্য*। এ কাব্য লেখার জন্যে তিনি সময় নিয়েছিলেন কমবেশি এক বছর। অন্য কোনো রচনার জন্যে তিনি এতো সময় নেননি অথবা এতোটা সময় তিনি কোনো রচনায় অব্যাহত মনোযোগও রাখতে পারেননি। বস্তুত, *রামায়ণ* থেকে কাহিনীর কাঠামো নিলেও *মেঘনাদবধে* তিনি এতো মৌলিকত্ব দেখিয়েছিলেন – অন্য ভাষায়, এতো নতুনত্ব সৃষ্টি করেছিলেন যে, একেবারে শেষ পর্যন্ত তিনি একটা চ্যালেঞ্জ এবং সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করেছেন। তাই গোড়াতে তিনি এ কাহিনী যতো বড়ো হবে বলে মনে করেছিলেন, খানিকটা লেখার পর বললেন, না, আরো বড়ো হবে। প্রথমে বলেছিলেন, মোট পাঁচটি সর্গ থাকবে। তারপরে বললেন, সর্গ থাকবে নটি। তারপর আবার বলেন, দশটি। আসলে, তাঁর প্রকৃতির কথা চিন্তা করলে *মেঘনাদবধকাব্য*কে একটা আশ্চর্য ঘটনা বলে মনে হয়। তবে *মেঘনাদবধ* রচনা করার সময়েও তিনি যে অন্য দিকে মনোযোগ দেননি, তা নয়। অগস্ট মাসের গোড়াতে যেমন, তিনি হঠাৎ নতুন একটি নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন – *কৃষ্ণকুমারী*।

মশগুল হয়ে কাব্য রচনা করতে করতে হঠাৎ তিনি নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন কেন, বলা মুশকিল। অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলি তাঁকে রাজপুতদের কাহিনী নিয়ে একটি নাটক লেখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু অনুরোধ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সাধের *মেঘনাদবধকাব্য* লেখার কাজ বন্ধ রেখে নাটক লিখতে আরম্ভ করবেন, এটাকে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। আমার ধারণা, হঠাৎ যেমন কথার ঝোঁকে *রত্নাবলী*র অনুবাদ করেছিলেন, অথবা *শর্মিষ্ঠা* লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তেমনি কোনো একটা ব্যাপার ঘটেছিলো। রাজাদের কাছ থেকে অনুরোধ আসাও সম্ভব। যদিও, দুটি প্রহসনের এবং *পদ্মাবতী* নাটকের অভিনয় না-করিয়ে রাজারা তাঁর বিশ্বাস খানিকটা ধসিয়ে দিয়েছিলেন। *কৃষ্ণকুমারী* লিখতে আরম্ভ করার কদিন পরে কেশব গাঙ্গুলিকে তিনি যে চিঠি লেখেন, তা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তিনি নিশ্চিতভাবে আশা করেছিলেন, এ নাটক বেলগাছিয়ায় অভিনীত হবে। 'একটা ঐতিহাসিক নাটক হওয়া সত্ত্বেও এতে আছে মাত্র পাঁচটি কি ছটি পুরুষ চরিত্র আর চারটি নারী চরিত্র। আমি এমন কোনো ছিদ্র রাখিনি যাতে কোনো কৈফিয়ত দিয়ে আমাদের (থিয়েটারের) ম্যানেজার ফসকে যেতে পারেন। ছোটো রাজা (ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ) যদি চারটি নারী চরিত্র নিয়ে আপত্তি করেন, তা হলে তাঁকে বলবেন, চারটির মধ্যে তিনটি চরিত্র অভিনয় করার লোক আমি জুটিয়ে দেবো।'[১১২]

কারণ যাই হোক, তেসরা অগস্ট *মেঘনাদবধ কাব্যের* দ্বিতীয় সর্গের কাজ শেষ করেই তিনি বসে যান নাটকের জন্যে রাজপুতদের একটা জুৎসই কাহিনী খুঁজতে। তেসরা অগস্ট ছিলো বুধবার। বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত জেগে তিনি টডের *The Annals and Antiquities of Rajasthan* পড়তে থাকেন। শুক্রবার ভোর রাতে অর্থাৎ ইংরেজি মতে শনিবার ভোর একটার সময়ে কাব্যদেবী তাঁর ওপর প্রসন্ন হলেন। তিনি একটা দারুণ প্লট পেয়ে গেলেন। তার পরের দিন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর রাজাদের আসরে গিয়ে দিয়ে আসেন নাটকের সারাংশ আর সেই সঙ্গে কী

কী চরিত্র থাকবে, তার তালিকা। এর তিন-চার দিন পরে কেশব গাঙ্গুলিকে চিঠি লেখেন। তাতে তাঁর চিরাচরিত স্বভাবের পরিচয় দিয়ে এই নতুন নাটকটি সম্পর্কে প্রচুর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন: 'একজন সত্যিকার নাট্যরসিক হিশেবে আপনি কৃষ্ণকুমারীর প্রেমে না-পড়ে পারবেন না, আমি যেমনটা পড়েছি। হে বিধাতঃ! কী যে একটা রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি হবে!' তারপর অভিনয়ের প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'আপনি কিন্তু রাজাদের একটু চাঙ্গা করে তুলবেন! বেলগাছিয়ার মতো এতো সুন্দর থিয়েটার এখন কিনা বাদুড় অথবা বাদুড়ের মতো লোকদের আড্ডায় পরিণত হয়েছে!'[১১৩] রাজারা কিন্তু অভিনয়ের ব্যাপারে তেমন কোনো উৎসাহ দেখাননি। তবে যতীন্দ্রমোহন উৎসাহী ছিলেন। বই ছাপানোর প্রস্তাব দিয়ে তিনি মাইকেলকে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কবির বিশেষ আগ্রহ ছিলো অভিনয়ে, বই প্রকাশে নয়। ততোদিনে তাঁর কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু *শর্মিষ্ঠার* অভিনয় শেষে তিনি যে-আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন — সে স্বাদ একবারই পেয়েছিলেন। এই চিঠিতে তিনি কেশব গাঙ্গুলিকে লিখেছেন যে, *কৃষ্ণকুমারী* ছাপানোর ব্যাপারে তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। তিনি চান এর অভিনয় হোক। এমন কি, তার জন্যে, তিনি একত্রে অভিনয়ের উদ্দেশে দরকার হলে একটি প্রহসনও লিখে দিতে রাজি ছিলেন। এর দু-এক দিন পরে লেখা আর-একটি চিঠি থেকেও বোঝা যায়, অভিনয়ের ব্যাপারে সুস্পষ্ট আভাস না-পেয়ে তিনি নাটক লেখা আরম্ভ করতে চাননি। কারণ তখন তিনি বরং *মেঘনাদবধকাব্য* লেখার কাজ চালিয়ে যাবার আগ্রহ দেখিয়েছেন।[১১৪]

নাটকের প্লট মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট রূপ নিলেও, তিনি সঙ্গে সঙ্গে নাটক লেখা শুরু করেননি। তখনও কেশব গাঙ্গুলির সঙ্গে নাটকে কি কি চরিত্র থাকবে — তা নিয়ে আলাপ চলেছে।[১১৫] সম্ভবত ১৫ অগস্ট তারিখে কেশব গাঙ্গুলির কাছ থেকে অভিনয় সম্পর্কে আশ্বাস লাভের পর তিনি লেখার কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু একবার লেখার কাজ শুরু হবার পর পাহাড়ী নদীর বেগে তাঁর কাজ চলতে থাকে। চতুর্থ অঙ্ক শেষ করেন মাস শেষ হবার কদিন আগে। লেখা শেষ করে কেশব গাঙ্গুলির কাছে চতুর্থ অঙ্কের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে নাটকটি সম্পর্কে প্রচুর উচ্ছ্বাস এবং গর্ব প্রকাশ করেন। হেনরিয়েটা কয়েক মাস আগে বাংলায় *তিলোত্তমা* পড়েছিলেন বলে কবি উল্লেখ করেছিলেন। অনুমান করি, *কৃষ্ণকুমারী* লেখার সময়ে তাঁকেও পড়ে শুনিয়েছেন এবং তিনি যে কতো সুন্দর একটি নাটক লিখছেন, তা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সে যাই হোক, কেশব গাঙ্গুলিকে বিরল বিনয় প্রকাশ করে তিনি লেখেন: 'বেলগাছিয়া থিয়েটারের একজন নগণ্য সদস্য হিশেবে এই থিয়েটারের গৌরব বাড়ানোর জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অন্য সদস্যরা যদি এর পরও ঝিমুতে থাকেন, তা হলে সেটা আমার অপরাধ নয়। ঈশ্বরের নামে বলতে পারি, এ নাটকটার আর কিছু না-থাকলেও এতে অভিনয়ের সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে।'[১১৬]

চতুর্থ অঙ্ক পড়ে কেশব গাঙ্গুলি *কৃষ্ণকুমারীর* চুল-চেরা সমালোচনা করেছিলেন — বিশেষ করে তিনি শেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে এ নাটকের তুলনা করেছিলেন। কবি তাতে খুশি হয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি এ নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন কেশব গাঙ্গুলির নামে। তা থেকে মনে হয়, অভিনেতা হিশেবে তাঁকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে তিনি কেবল গ্যারিক বলতেন না, আন্তরিকভাবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে বিবেচনা করতেন। অভিনেতার দৃষ্টিকোণ থেকে কেশব গাঙ্গুলি এ নাটকের যে-সমালোচনা করেছিলেন, কবি তা মেনে নিয়েছিলেন। দু-তিন দিন পরে — পয়লা সেপ্টেম্বর — কেশবের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কৈফিয়ত দিয়ে বলেছেন: 'এ নাটকটা বিচার করার সময়ে আপনি যদি শেক্সপীয়রের কথা অতোটা না-ভাবতেন, তা হলে ভালো হতো। আপনি যেসব ত্রুটির কথা লিখেছেন, সেগুলো ত্রুটি ঠিকই, কিন্তু তার প্রতিটির ঊর্ধ্বে ওঠা স্বয়ং শেক্সপীয়রের

পক্ষেও সম্ভব নয়। ... আপনি যেভাবে সূক্ষ্ম সমালোচনা করেছেন, তাতে বিশ্বের সকল নাট্যকারই ডুবে যাবেন, একমাত্র শেকসপীয়র ছাড়া। এমন কি, তিনিও বোধ হয় যথেষ্ট কাহিল হবেন।'[১১৭] কেশব গাঙ্গুলি সংলাপের ভাষার প্রশংসা করেছিলেন। মাইকেল তাতে খুব খুশি হন। তা ছাড়া, কেশব গাঙ্গুলি নাটকটার সামগ্রিকভাবে যে প্রশংসা করেছিলেন, তাতেও।

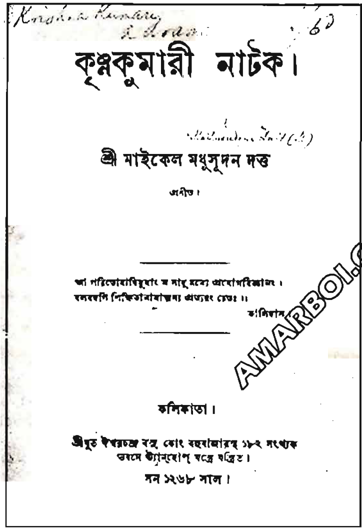
তিনি প্রাণপণ আশা করতে থাকেন যে, ছোটো রাজা নিশ্চয় অতঃপর এ নাটকের অভিনয় করাতে রাজি হবেন। 'কিন্তু তিনি যদি এর প্রশংসা করতে ব্যর্থ হন, তা হলে বুঝতে হবে আমরা বড্ডো আগে জন্মেছি।'[১১৮] নাটকটি লেখা শেষ করার দুদিন পরে কেশব গাঙ্গুলিকে তিনি যে-চিঠি লেখেন, তাতে আবার অভিনয়ের প্রসঙ্গ তোলেন। যতীন্দ্র ঠাকুর আর দীনু 'মিয়া'-কে নিয়ে ছোটো রাজার কাছে দরবার করলে তিনি রাজি হতে পারেন ইত্যাদি অনেক পরামর্শই দিয়েছেন কেশব গাঙ্গুলিকে। এমন কি, তিনি এ-ও লিখেছিলেন যে, ছোটো রাজাকে প্রধান চরিত্র জগৎসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করতে অনুরোধ করলে তিনি এ নাটকের অভিনয়ে উৎসাহ দেখাবেন। সব শেষে আশঙ্কা আর অভিমান করে বলেছেন: 'প্রহসন দুটির অভিনয়কে কেন্দ্র করে আপনারা আমার ডানা ভেঙে দিয়েছিলেন। এবারে এই নাটক নিয়ে আপনারা যদি আবার তেমন চাল দেন, তা হলে আমি বাংলায় লেখা ছেড়ে দিয়ে হিব্রু অথবা চীনা ভাষায় লিখবো।' ছোটো রাজার কাছে নিজে কথা পাড়ার ব্যাপারে ঠিক ভরসা পাননি। তাই লিখেছেন: 'রাজা নিমরাজি হলে, পরশু রোববার বেলগাছিয়ায় আমরা এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি।'[১১৯]

টডের বই থেকে *কৃষ্ণকুমারীর* কাহিনীর মূল কাঠামো পেলেও, গল্পটা মাইকেলের নিজেরই রচনা। যে-কাহিনী ছিলো রাজাদের ক্ষমতা এবং লোভের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে, তাকেই তিনি প্রেম এবং স্নেহের সঙ্গে কর্তব্যের দ্বন্দ্বে পরিণত করেন। রাজনীতির পটভূমিতে তিনি এই সূক্ষ্ম মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনকে অসীম সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। তা ছাড়া, ইতিহাস থেকে ভীমসিংহ, জগৎসিংহ, মানসিংহ এবং কৃষ্ণকুমারীর নাম নিলেও এগুলো এবং অন্য চরিত্রগুলো তাঁর নিজেরই কল্পনা করে নিতে হয়েছে। এ নাটকের কাঠামোয় শেকসপীয়রের প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না। সজ্ঞানেই তিনি শেকসপীয়রকে অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি তখনকার সমাজ এবং বাংলা ভাষা ও নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে সচেতনভাবে নানা রকমের রদবদল করে নিয়েছেন। যেখানে যেখানে শেকসপীয়রের কোনো কোনো চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিলো, তাও সরাসরি তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন, ধনদাসের চরিত্রের সঙ্গে ইয়াগোর, বলেন্দ্রসিংহের সঙ্গে বার্ডোর্ডের। তা ছাড়া, নিরপরাধ কৃষ্ণকুমারীকে প্রাণ দিতে হয় - নিতান্ত নিয়তির কারণে – তার এই আত্মত্যাগের ঘটনা চকিতে গ্রীক নাটক ইফিজিনিয়াকেও মনে করিয়ে দেয়।[১২০]

নারী চরিত্রগুলো কল্পনায় মাইকেল বিশেষ মৌলিকত্ব দেখিয়েছিলেন। য়োরোপীয় নারীদের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় নারীদের যে আসমান-জমিন ফারাক, সেটা ভালো করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন: তিনি যদি একটি বিদুষী চরিত্র অঙ্কন করে তাকে পুরুষদের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখান, তা হলে সেটা হবে অবিশ্বাস্য। 'আমার চারদিকে একটা গণ্ডী রয়েছে, তার বাইরে পা বাড়ানোর কোনো জো নেই। ফল হয়েছে এই যে, আমাকে বেশ কয়েকটি নারী চরিত্র আমদানি করতে হয়েছে, যাতে করে প্লটের মধ্যে নারীদের ব্যাপারে যে-ঘাটতি রয়েছে, সেখানটাতে একটা পরিপূর্ণতার ভাব দেখানো যায়।'[১২১]

অভিনয় হবে কিনা, তা নিয়ে নিঃসন্দেহ হতে না-পারায় প্রথম দিকে এ নাটক লেখায় তাঁর কতোটা উৎসাহ ছিলো, বলা মুশকিল। কিন্তু একবার খানিকটা লিখে ফেলার পর তিনি খুব অনুপ্রাণিত এবং

উদ্দীপ্ত হয়ে এ নাটক শেষ করেছিলেন। তিনি জানতেন, আঙ্গিক, চরিত্র চিত্রণ, ঘটনার নাটকীয়তা এবং সংলাপ রচনার দিক দিয়ে *শর্মিষ্ঠা* এবং *পদ্মাবতী*কে এ নাটক ছাড়িয়ে যাবে। সে কথা মনে রেখে লিখেছেন: 'আশা করি আমি একটি প্রগতিশীল জীব।'[১২২] রাজনারায়ণকে আর-এক চিঠিতে বিনয় করে লিখেছেন: 'তুমি যখন *কৃষ্ণকুমারী* পড়বে তখন হয়তো ভাববে যে, অনুশীলন করলে সাহিত্যের এ বিভাগেও এই লেখক মোটামুটি ভালোই করতে পারবে।'[১২৩] ভালো করতে পারবেন কেন, তিনি যে তখনকার বাংলা ভাষার যে-কোনো নাটকের চেয়ে ভালো নাটক রচনা করেছিলেন, তা তিনি ভালো করে জানতেন। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর যে-জ্ঞান ছিলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা বিনয়বশত তিনি এ মন্তব্য করে থাকবেন। তাঁর সীমাবদ্ধতা — অনায়ত্ত ভাষা, বাংলা ভাষায় নাট্য-ঐতিহ্যের অভাব এবং মঞ্চ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা তাঁর তুলনামূলকভাবে কম ছিলো — এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তবে তা সত্ত্বেও, এ নাটক তিনি যে খুব দরদ দিয়ে লিখেছিলেন, এ নাটক পড়লে তা বোঝা যায়। তা ছাড়া, তিনি নিজেও এ বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করেছেন। 'আমি যে এমন পাষণ্ড, তা আমিও এই নাটকের প্রুফ দেখার সময়ে কয়েকটা দৃশ্য পড়ে চোখের জল ফেলেছি।'[১২৪]


কৃষ্ণকুমারী নাটক।

শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

কালিদাস।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৬৮ সাল।

*কৃষ্ণকুমারী*র প্রচ্ছদপট

টডের বই-এ কৃষ্ণকুমারীর যে-কাহিনী দেওয়া ছিলো, তা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। মাইকেল লিখেছেন যে, তিনি এ কাহিনী পেয়েছেন টডের বই-এর প্রথম খণ্ডের ৪৬১ পৃষ্ঠায়।[১২৫] আসলে এ কাহিনীটি আছে ৪৬১ থেকে ৪৬৫ পৃষ্ঠায় — বিক্ষিপ্তভাবে। টড যে-কাহিনী বলেছেন, তা হলো:

> কৃষ্ণকুমারী ছিলো খুব সুন্দরী একটি কন্যার নাম, যাকে পাওয়ার জন্যে জয়পুরের জগৎ সিংহ আর মারোয়ারের (মাইকেলের ভাষায়, মরুদেশের) রাজা মান সিংহ তাঁদের সমস্ত বীরত্ব এবং ভারতবর্ষীয় লুণ্ঠন ক্ষমতা নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন। প্রাচীন কালের হেলেনের মতো সে নিজের এবং তার বিরোধীদের গৃহধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। জয়পুরের রাজা সিন্ধিয়ার (মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী) অর্থের দাবি প্রত্যাখ্যান করায়, তিনি কেবল যে জগৎ সিংহের বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন, তাই নয়; তিনি সমর্থন করলেন মানসিংহের প্রস্তাব। তিনি রানার কাছে দাবি করলেন জয়পুরের দৌত্য বাতিল করে দিতে। কিন্তু রানা সেটা করতে অস্বীকার করলে সিন্ধিয়া তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করা হয় এবং তাতে জয়পুরের সৈন্যরাও যোগ দেয় — যদিও তা ব্যর্থ হয়। সিন্ধিয়া গিরিপথ ধরে অগ্রসর হন এবং উপত্যকায় আট হাজার সৈন্যের লাশ ছড়িয়ে দিয়ে মেবারের রাজধানীর উপকণ্ঠে — কামানের পাল্লার মধ্যে — এসে ঘাঁটি স্থাপন করেন। আমীর খানও মানসিংহের দলে যোগ দান করেন। বিয়ের আয়োজন বাতিল করা এবং দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া ভীমসিংহের আর কোনো উপায় ছিলো না। সিন্ধিয়া উপত্যকায় এক মাস ছিলেন এবং তার মধ্যে একলিঙ্গের মন্দিরে রানার সঙ্গে তাঁর একদিন সাক্ষাৎ হয়।

ওদিকে, আহত অহঙ্কার নিয়ে জগৎ সিংহ এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তৈরি হন। তিনি এমন একটি বিশাল বাহিনী সমবেত করলেন, সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব শেষ হবার সময় থেকে যেমনটা আর দেখা যায়নি। রাজা মানসিংহও তাঁর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার জন্যে তৈরি হলেন। কিন্তু মারওয়ারে সিংহাসনের দাবি নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিলো। তাই মান সিংহের পক্ষে তাঁর গোষ্ঠীর আনুগত্য ছিলো বিভক্ত। সেখানে সিংহাসনের একজন দাবিদার দেখা দিলেন (ধনকুল সিংহ) এবং তাঁর সঙ্গে মানসিংহের লড়াই শুরু হলো। নানা ষড়যন্ত্র এবং সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানসিংহ শেষ পর্যন্ত জয়ী হন।

*

ষড়যন্ত্র শেষ হলেও সমস্ত ব্যাপারটার ওপর যবনিকা পড়ার শর্ত হিশেবে আর-একটি দাবি করা হয়। কোনো পক্ষই এই যুদ্ধের মূল কারণ — কৃষ্ণকুমারীকে বিয়ে করার দাবি ত্যাগ করবে না।

কৃষ্ণকুমারীর বয়স ছিলো মাত্র ষোলো। ইফিজিনিয়াকে যখন বিসর্জনের বেদীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, তখন তাঁর দেশ রক্ষা পেয়েছিলো — এই ছিলো এক মহৎ সান্ত্বনা। (অ্যামোনাইটদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে) জেফথা যেমন তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তাঁর কন্যাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং কন্যার আত্মত্যাগের ফলে যেমন পিতার খ্যাতি রক্ষা পেয়েছিলো, তার নীরব আত্মত্যাগের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিসর্জনের সর্বোত্তম তুলনা মেলে। .. তবে তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হয়নি। তার জন্যে তৈরি করা হয়েছিলো এক পাত্র পানীয়। পিতার নাম করে সেটা যখন তাকে দেওয়া হয়, কৃষ্ণা তখন সেই পাত্রের পানীয় নিঃশেষে পান করে। দাঁড়িয়ে সে প্রার্থনা জানায় তার পিতার দীর্ঘজীবন এবং উন্নতির জন্যে। মাতাকে সে সান্ত্বনা দেয়: 'মা, তুমি কেন কষ্ট পাচ্ছো? — এর ফলে আমার জীবনের দুঃখই তো হ্রাস পাচ্ছে। আমি মরতে ভয় পাইনে। আমি তোমার মেয়ে নই? আমি মৃত্যুকে ভয় পাবো কেন?' ... কৃষ্ণকুমারী ঘুমিয়ে পড়লো — যে-ঘুম থেকে সে আর কখনো জেগে উঠলো না।

এই কাহিনী-কণিকাকে মাইকেল কতোটা পরিবর্তন এবং নিজের মতো করে পরিকল্পনা করে নিয়েছিলেন, *কৃষ্ণকুমারী* পড়লে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বিশেষ করে ধনদাস, বিলাসবতী, মদনিকার উপ-কাহিনী এর মধ্যে যে-জটিলতা নিয়ে এসেছে, তা কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য এবং মানবিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। কাহিনীর শেষে কৃষ্ণাকে বিষ পান না-করিয়ে নাটকীয়তা দেবার জন্যে প্রথমে রাজভ্রাতা বলেন্দ্রকুমারকে দিয়ে হত্যা করানোর চেষ্টা দেখানো হয়। কিন্তু স্নেহের কাছে পরাজিত বলেন্দ্র কৃষ্ণাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়। তারপর কৃষ্ণা যথেষ্ট নাটকীয়তা সৃষ্টি করে নিজের খড়্গ দিয়ে আত্মহত্যা করে। *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের সঙ্গে *ইফিজিনিয়া অ্যাট আউলিসের* মিল আছে বলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকরা অনুমান করেছেন।[১২৬] কিন্তু অনুমানের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, টডের *রাজস্থান-কাহিনী*তেই হেলেন এবং ইফিজিনিয়ার উল্লেখ ছিলো। সুতরাং নাট্যকার সজ্ঞানে এই সামঞ্জস্য কাজে লাগিয়েছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী শেষ করে মাইকেল আবার *মেঘনাদবধ* রচনা আরম্ভ করেন। এবারে তৃতীয় সর্গ। মাঝখানে মাসখানেক কাব্য রচনার কাজ বন্ধ থাকলেও, আবার লিখতে শুরু করার পরেই লেখার উদ্দীপনা ফিরে এলো। কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন যে, আপাতত তিনি কেবল ছোটোখাটো মহাকাব্য রচনা করছেন।[১২৭] এভাবে হাত পাকানোর পরে লেখা হবে সত্যিকার মহাকাব্য। আপাতদৃষ্টিতে এই উক্তিকে আত্মবিশ্বাসের অভাব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসল ঘটনা এর উল্টো। এ সময়ে তিনি এতো উৎসাহিত বোধ করেন এবং নিজের রচনাকে এতো উন্নত মানের বলে বিবেচনা করেন যে, তার অর্থ দাঁড়ায়: আর হাত পাকানোর দরকার নেই। *মেঘনাদবধ কাব্যকে* যাতে রীতিমতো মহাকাব্যের চেহারা দেওয়া যায় এবং দেশীয় সমালোচকরা যাতে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র মতেও এর কোনো খুঁত ধরতে না-পারেন, তার জন্যে *মেঘনাদবধ* লেখার আগে তিনি ভালো করে *সাহিত্যদর্পণ* পড়ে নিয়েছিলেন। এবং মেঘনাদের মতো আঁটঘাট বেঁধেই সমরে নামতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী মহাকাব্যের দশটি সর্গ থাকা প্রয়োজন তিনি তা জানতেন।

কিন্তু *মেঘনাদবধের* দশটি সর্গ হবে কিনা, তিনি সে সম্পর্কে গোড়ার দিকে ঠিক নিশ্চিত ছিলেন না। এখন তৃতীয় সর্গ রচনা করার সময়ে ভাবনার পালে এমন হাওয়া লাগলো যে, তাঁর মনে হলো: কাহিনীটাকে তিনি পারবেন দশম সর্গ পর্যন্ত টেনে নিতে। রাজনারায়ণকে লিখলেন: 'কাব্যটাকে আমি দশটি সর্গ অবধি লম্বা করতে চাই, যাতে করে এ কাব্য মহাকাব্য হিশেবে যদ্দূর সম্ভব পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর তেমন না-হবার কোনো কারণও নেই; বিষয়টা সত্যি সত্যি বীরত্বপূর্ণ, কেবল বাঁদরগুলোই রসভঙ্গ করে, এই যা। তবে তার আর কী করা যায়, সেদিকেও আমি নজর রাখবো।'[১২৮] এ সময়ে নিজের কাব্য নিয়ে তিনি যে এতো উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, তার একটা কারণ এই যে, *তিলোত্তমার* ভক্ত-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। যে-বিদ্যাসাগর এক সময়ে অমিত্রাক্ষরের মাহাত্ম্য ধরতে পারেননি, তিনিও এ সময়ে *তিলোত্তমার* মধ্যে যথেষ্ট গুণ দেখতে পান। ওদিকে, *সোমপ্রকাশ পত্রিকা* এর অনুকূল সমালোচনা করে।[১২৯] এমন কি, পাদ্রি জেমস লঙ পর্যন্ত কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। কদিন আগে তিনি গৌরদাসকে বলেছিলেন: 'বেঁচে থাকলে দত্ত দেখো তোমাদের দেশের ভাষায় বিপ্লব ঘটাবে।'[১৩০] এর আগে কবি নিজেও আশা প্রকাশ করে লিখেছিলেন: 'সব ব্ল্যাঙ্ক ভার্স হো জাগা।'[১৩১] এখন এতো অনুকূল সমালোচনা দেখে তিনি স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। এবং *মেঘনাদবধকে* দশ সর্গ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন।

রচনার এই বর্ধিত পরিকল্পনা ছাড়া, সেপ্টেম্বর মাসে (১৮৬০) কবি ঠিক করে ফেলেন যে, পুরো কাব্য শেষ করা অবধি তিনি অপেক্ষা করে থাকবেন না, প্রথমে পাঁচ সর্গ শেষ হলে সেগুলো দিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করবেন। প্রকাশ করার ব্যাপারে আর্থিক অসুবিধে থাকতে পারতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা-ও নেই। কারণ দিগম্বর মিত্র এ কাব্য ছাপার জন্যে টাকা দিতে রাজি হয়েছেন। 'এ ব্যাপারে আমি কিন্তু সত্যি খুব ভাগ্যবান। আমার এসব অলস কাজকর্মের জন্যে সহজেই পৃষ্ঠপোষক আর খদ্দের পেয়ে যাই।'[১৩২] কিন্তু এক শতাব্দী পরে এখন মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে কবির চেয়ে অনেক ভাগ্যবান ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা। সামান্য অর্থ বিনিয়োগ করে তাঁরা মাইকেল-সাহিত্যের সঙ্গে আজও বেঁচে আছেন সাহিত্যের ইতিহাসে।

সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত *মেঘনাদ* রচনা নিয়ে কবি খুব ব্যস্ত থাকেন। আগের কয়েক মাস রাজনারায়ণ বসুকে প্রতি মাসে দু-তিনখানা করে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তিনি তাঁকে যে-চিঠিটি লেখেন, তার প্রায় চার মাসের মধ্যে আর-কোনো চিঠি পাওয়া যায় না। অক্টোবরের মাঝামাঝি হেনরিয়েটা দ্বিতীয় বারের মতো গর্ভবতী হন। হয়তো তা-ও কবিকে ব্যতিব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন করে থাকবে। তবে তা সত্ত্বেও, চার মাসের মধ্যে তিনি *মেঘনাদবধ কাব্যের* তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সর্গ শেষ করেন। তিনি লিখতেন ঝড়ের গতিতে। তারপর সব সময়ে মাজাঘষা করে রচনাকে উন্নত করতে চেষ্টা করতেন। তাঁর যেসব রচনার খসড়া এবং সংশোধিত সংস্করণ পাওয়া গেছে, সেগুলোর তুলনা করলে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন, ইংরেজিতে যাকে বলে পার্ফেকশনিস্ট। সেপ্টেম্বর মাসের ১০/১২ তারিখ থেকে ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে তিনি কেবল তিনটি সর্গ রচনাই করেননি, বরং তাদের যথেষ্ট পরিমার্জনাও করেছেন। ঠিক কখন থেকে এ কাব্য ছাপার কাজ শুরু হয়, তা জানা যাচ্ছে না; তবে বই আকারে *মেঘনাদবধকাব্যের* প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় (১৮৬১) সালের চৌঠা জানুআরি, শুক্রবার।

এ কাব্য ছাপাখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার প্রায় সপ্তাহ দুয়েক আগে, রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় বেড়াতে আসেন। তাঁর আসার কারণ অংশত ৭ পৌষ (২০ ডিসেম্বর ১৮৬০) উপলক্ষে ব্রাহ্ম সমাজে বক্তৃতা দান, অংশত কবির অনুরোধ। আসলে, তিনি আসার কথা লিখেছিলেন অক্টোবর

মাসের শেষ দিকে — দুর্গা পুজোর ছুটিতে। (সেবার দুর্গা পুজোর সরকারী ছুটি ছিলো ১৯ থেকে ২৬ অক্টোবর। ১৯ শুক্রবার ছিলো সপ্তমী পুজো।) তিনি একাধিক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, রাজনারায়ণের সঙ্গে দেখা হবে এই আশায় তিনি পুজোর ছুটির জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। কিন্তু পুজোর ছুটিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশব সেনের সঙ্গে রাজনারায়ণ নৌকোয় করে রাজমহল ভ্রমণ করতে যান। সঙ্গে অন্যান্যের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ছিলেন।[১৩৩] কবির সঙ্গে এই সাক্ষাৎ এবং এই সাক্ষাতের সময়ে কবি যে-আন্তরিকতা এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, সে কথা প্রায় তিরিশ বছর পরে রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বসুর কাছে।[১৩৪] তা ছাড়া, *আত্মচরিতেও* এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন।[১৩৫] এ যাত্রায় কবির লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়িতে রাজনারায়ণ একাধিক বার গিয়েছিলেন। প্রথম বার যখন যান তখন কবি *মেঘনাদবধের প্রুফ* দেখছিলেন। কদিন পরে আবার যান খাবার নিমন্ত্রণে। এখানে তিনি কবির মাদ্রাসের এক বন্ধুকে দেখতে পান এবং এবারেই প্রচুর মদ্যপানে উচ্ছ্বসিত কবি রাজনারায়ণের গালে অজস্র চুমু খান।[১৩৬] তাঁকে কবি *মেঘনাদবধের* একটি কপিও দেন, দ্রুত তা পড়ে তাঁর মতামত জানানোর জন্যে।

আগেও দেখা গেছে, কোনো লেখা শেষ করার পর অথবা কোনো রচনা প্রকাশিত হবার পর, তিনি সে সম্পর্কে বন্ধুরা কী ভাবছেন, তা জানার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। রাজনারায়ণের মতামত জানার জন্যে তিনি উদ্গ্রীব ছিলেন আরও বেশি। যে-দেশে সত্যিকার উন্নত এবং আধুনিক সাহিত্য গড়ে ওঠেনি অথবা সে সাহিত্যের কোনো সমজদার সমাজ তৈরি হয়নি, সে দেশে কবি 'মেদিনীপুরের কোনো একজন শিক্ষকের চেয়ে কারো মতামতকেই বেশি মূল্য দিতেন না।' সত্যি বলতে কি, তাঁকে তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তি বলে বিবেচনা করতেন। নিজেই লিখেছেন: 'তোমার মতামত আমার চারদিকের দশ লাখ লোকের 'বাহবা বাহবা' আওয়াজের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।'[১৩৭] রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে ফিরে যাবার কদিন পরে কবি তাঁকে তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখলেন: '*মেঘনাদবধ* সম্পর্কে তোমার রায় শোনার জন্যে আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে আছি।'[১৩৮] তবে রাজনারায়ণ কী বলেন, সেটা শোনার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে পারলেন না। তাই ঐ চিঠির শেষ দিকে উল্লেখ করেছেন যে, কাব্যটা দ্রুত প্রচারিত হচ্ছে।[১৩৯]

কবি অতো আশা করলেও রাজনারায়ণ *মেঘনাদবধ* সম্পর্কে তাঁর মতামত দ্রুত জানাতে পারেননি। এমন কি, তাঁকে কোনো চিঠিও লেখেননি। সে জন্যে ফেব্রুআরি মাসে অগত্যা তিনি নিজের থেকে আবার রাজনারায়ণকে লেখেন। 'কী ব্যাপার বন্ধু? আমার *মেঘনাদ* কি তোমার মনে এতোই অভক্তি জন্মিয়েছে, যাতে করে তুমি তার হতভাগা কবির সঙ্গেই যোগাযোগ ছিন্ন করতে চাও?'[১৪০] রাজনারায়ণের নীরবতায় হতাশ হলেও, কবি এ সময়ে বেশ খোশ মেজাজে ছিলেন। কদিন আগে — ১২ ফেব্রুআরি মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় — কালীপ্রসন্ন সিংহের *বিদ্যোৎসাহিনী সভা* তাঁকে একটা সংবর্ধনা দিয়েছিলো। এই সংবর্ধনায় যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় প্রমুখ অনেকে।[১৪১] তাঁকে এই অনুষ্ঠানে একটি রুপোর পানপাত্র উপহার দেওয়া হয়। ইংরেজি রীতি অনুযায়ীই এই উপহার নির্বাচিত হয়। এই সংবর্ধনাকে সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে কতোটা আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান বলা যায় অথবা এর মাধ্যমে কবি তাঁর অবদানের কতোটা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, বলা শক্ত। তবে কবিযশঃপ্রার্থী মাইকেল এমন সংবর্ধনা অথবা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এর আগে অথবা পরে কখনো পাননি। চিঠির ভাষা থেকে মনে হয়, তিনি খুশি হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতে পারাটা যে *মেঘনাদবধকাব্যের* রচয়িতার পক্ষে একটা অসাধারণ ঘটনা, তিনি সেটাও উল্লেখ করেছেন।[১৪২] বাংলায় সাহিত্য রচনা করলেও তিনি যে আর পাঁচজন বাঙালির মতো নন, তিনি যে আসলে আধা-ইংরেজ — এটা বোধ হয় আন্তরিকভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন।

খোশ মেজাজে থাকার আর-একটা কারণ, *মেঘনাদের* জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। অপ্রত্যাশিত নানা জনের কাছ থেকে তিনি *মেঘনাদবধ* সম্পর্কে, বিশেষ করে, কবি হিশেবে তাঁর নিজের সম্পর্কে প্রশংসার কথা শুনতে পাচ্ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। 'সারদাপ্রসাদ সেদিন আমাকে বলেছিলেন যে, দে(বেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) মতে, খুব কম হিন্দু [অর্থাৎ বাঙালি] লেখকই আছেন, যিনি ঐ লোকটার কাছে – মানে ৬ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোডের মোটা লোকটার – তোমার বন্ধুর কাছে দাঁড়াতে পারেন।'[১৪৩] দেবেন্দ্রনাথকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না। চিনতেন তাঁর জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে। আদালতে তাঁর সঙ্গে অনেক সময় তাঁর দেখা হতো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, এ সময়ে তিনি নাকি প্রায়ই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে যেতেন।

মেঘনাদবধ কাব্য রচনার সময়

১৮৬০, জুলাই –	"প্রথম সর্গ পাঠালাম" (রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি)
	"দ্বিতীয় সর্গের খানিকটা পাঠিয়েছিলাম ; প্রায় দুশো লাইন হয়ে গেছে" (ঐ)
১৮৬০, ৩ অগস্ট	"দ্বিতীয় সর্গ পড়ে মুগ্ধ হবে" (ঐ)
১৮৬০, ১? সেপ্টেম্বর –	"সব ব্ল্যাঙ্ক ভার্স হো জাগা" (ঐ)
১৮৬০, সেপ্টেম্বরের শেষ	"কয়েক সপ্তাহ আগে তোমাকে দ্বিতীয় সর্গ পাঠিয়েছি; তৃতীয় সর্গ লিখছি, মোট দশটি সর্গ করতে চাই" (ঐ)
১৮৬১, ৪ জানুআরি –	প্রথম খণ্ড (প্রথম পাঁচটি সর্গ) প্রকাশিত হয়।
১৮৬১, জানুআরি –	"ষষ্ঠ সর্গ শেষ করেছি। প্রায় ৭৫০ পঙ্ক্তি হয়েছে" (রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি)
১৮৬১, ২০ ফেব্রুআরি –	"ষষ্ঠ এবং সপ্তম সর্গ শেষ করেছি। অষ্টম সর্গ লিখছি" (ঐ)
১৮৬১, মে –	"দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হচ্ছে" (ঐ)
১৮৬১, মে-র শেষ দিক –	"এখনো নবম সর্গের কয়েক শো পঙ্ক্তি লেখা বাকি আছে" (ঐ)
১৮৬১, জুলাই –	"এক মাসের মধ্যে প্রকাশিত হবে" ((ঐ)
১৮৬১, ২৩ জুলাই-	"এর পর নবম সর্গ ছাপা হচ্ছে" (ঐ)
১৮৬১, অগস্ট –	"তোমাকে নতুন *মেঘনাদের* কপি পাঠানো হয়েছে" (ঐ)
১৮৬১, ২৯ অগস্ট –	"তোমার সমালোচনার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি" (ঐ)

এবং একবার নাকি *মেঘনাদবধকাব্যের* পাণ্ডুলিপি থেকে তাঁর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় খানিকটা সারদাপ্রসাদকে পড়েও শুনিয়েছিলেন।[১৪৪] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখনকার কথা লেখেন, তখন তাঁর বয়স এগারো বছর। (পরে রবীন্দ্রনাথও এই কথার সূত্র ধরে লিখেছিলেন যে, মাইকেল এক সময়ে তাঁদের বাড়িতে আসতেন।[১৪৫]) তাঁর এই সাক্ষ্য কতোটা নির্ভরযোগ্য, জানা নেই। মাইকেলের স্বরভঙ্গ দেখা দেয় ১৮৬৭ সালের পর, তিনি যখন ব্যারিস্টার হিশেবে হাইকোর্টে কাজ করতে আরম্ভ করেন। ১৮৬১/৬২ সালে তাঁর গলা ভাঙা-ভাঙা ছিলো বলে কোনো মন্তব্য কোথাও পড়িনি। তা ছাড়া, কবির জবানি থেকেও তাঁর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যাবার প্রত্যক্ষ কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে, হতে পারে, তিনি সারদাপ্রসাদের সঙ্গে দু-একবার গেছেন। সেটা যে কোনো নিয়মিত ব্যাপার ছিলো না – বলাই বাহুল্য।

রাজনারায়ণকে কবি আরও লিখেছিলেন যে, এ সময়ে বড়োবাজারের এক বেনিয়ানের কেরানি *মেঘনাদবধ* পড়ে খুব উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। পথচারী-মাইকেলকে দেখে এই কেরানি নাকি তাঁর উচ্ছ্বাস চাপতে পারেননি এবং কবির পরিচয় না-জেনেই তাঁর কাছে এ কাব্যের খুব প্রশংসা করেছিলেন।[১৪৬] এই বর্ণনা এবং মূল ঘটনার মধ্যে কতোটা মিল ছিলো, বলা যাচ্ছে না। কিন্তু

মেঘনাদবধ শিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের বসার ঘর ছেড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে পথ করে নিচ্ছে, এ কথা তিনি একাধিক বার বলেছেন। রাজনারায়ণকে এ কাব্যের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে লিখেছেন: 'কাব্যটা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। শুনতে পাই, অনেক হিন্দু মহিলাও এ কাব্য পড়ে



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কাঁদছেন।'[১৪৭] এ তথ্য কবিকে নিঃসন্দেহে আত্মতৃপ্তি দিয়ে থাকবে। তবে সেকালে এ কাব্য পড়ার মতো অথবা পড়ে বোঝার মতো কজন হিন্দু মহিলা কলকাতা তথা বঙ্গদেশে ছিলেন, সেটা এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে। কবি যা শুনে সত্যি সত্যি আত্মতৃপ্তি পেয়েছিলেন, তা হলো: বড়ো কবিদের সঙ্গে তাঁর তুলনা। 'অনেকে বলেন, এ কাব্য মিল্টনের চেয়েও ভালো হয়েছে। তবে সেটা নিতান্ত বাজে কথা, কারণ কোনো কিছুই মিল্টনের চেয়ে ভালো হতে পারে না। অনেকে বলছেন, আমার এ কাব্য কালিদাসের সমকক্ষ হয়েছে। সে কথায় আমার অবশ্য কোনো আপত্তি নেই। আমার মনে হয় না ভার্জিল, কালিদাস এবং ত্যাসোর মতো লিখতে পারা অসম্ভব। কারণ এঁরা মহান কবি হলেও, অমর নন; কিন্তু মিল্টন দেবতাদের মতো, অমর।'[১৪৮] *মেঘনাদবধ* সম্পর্কে কোনো মতামত না-জানানো সত্ত্বেও, রাজনারায়ণের প্রতি কবি এ চিঠিতে যে-প্রসন্নতা প্রকাশ করেন, তার আর-একটি কারণ, ফেব্রুআরি মাসে *Indian Field* পত্রিকায় রাজনারায়ণের লেখা *তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যের* সমালোচনা প্রকাশিত হয়।[১৪৯]

এর কিছুকাল পরের এক চিঠি থেকে জানা যায়, রাজনারায়ণ *মেঘনাদবধকাব্যের* মূল্যায়ন করে কবিকে লিখেছিলেন। রাজনারায়ণের সে চিঠির কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। কিন্তু কবির ভাষা থেকে মনে হয়, কিছু সমালোচনা থাকলেও, সে চিঠির মধ্যে প্রশংসাই বেশি ছিলো। এই পত্রের ওপর ভিত্তি করে লেখা রাজনারায়ণের সমালোচনাটি বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিলো প্রায় কুড়ি বছর পরে। এতে রাজনারায়ণ বলেছিলেন, *মেঘনাদবধ* হলো নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য। এই কাব্যে এখানে-সেখানে কিছু দোষ থাকলেও, তাঁর বিবেচনায় সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

> অধিকন্তু দোষ ধরিলে প্যারাডাইস লষ্টে মধ্যেও তাহা অল্প নাই। ... পাঁচ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত যে এত অল্প কালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমরের ইলিয়াড ও মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্টের ন্যায় এবং স্থল বিশেষে করুণ রসে বাল্মীকির সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর কাব্য বাংলা কাব্যে প্রচারিত হইবে?... তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। আমরা যখনই ইহা পাঠ করি তখনই ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়ই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত *মেঘনাদ* পাঠ করিবে।[১৫০]

কিন্তু কবি মারা যাবার পর রাজনারায়ণ বসু যখন *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা* করেন (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৭৮), তখন প্রশংসার চেয়ে তাতে সমালোচনা বেশি ছিলো। আসলে ততোদিনে জাতীয়তাবাদী ভাবনার দ্বারা রাজনারায়ণ অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেবল *হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে* এই মনোভাব লক্ষ্য করা যায় না, ১৮৬০-এর দশকে *জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা* এবং ১৮৭০-এর দশকে *সঞ্জীবনী* ও *হিন্দু জাতীয় মহাসভার* সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থেকেও তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা প্রতিফলিত হয়। এসব সভা কলকাতার অতি ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর বাইরে আদৌ পরিচিত হয়েছিলো কিনা, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। যা বিশেষ প্রাসঙ্গিক, তা হলো: এসবের মধ্য দিয়ে রাজনারায়ণের জাতীয়তাবাদী মনোভাব অভ্রান্তভাবে প্রকাশ পায়। সেই মনোভাব বঙ্গদেশে কোনো বিপ্লব নিয়ে না-এলেও, তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে চরিত্রগত পরিবর্তন এনেছিলো। একদিন রাজনারায়ণ *তিলোত্তমাসম্ভবের* ইন্দ্রকে অথবা *ব্রজাঙ্গনাকে* প্রশংসা করতে পারেননি — তাদের হিন্দু চরিত্রের জন্যে। বন্ধুকে তখন কবি বরং উপদেশ দিয়ে লিখেছেন: 'সাহিত্য বিচারের সময়ে কি ধর্মের কথা মনে রাখা যায়?'[১৫১] কিন্তু ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে এসে রাজনারায়ণ বিশেষভাবে সমালোচনা করেন মাইকেলের 'বিজাতীয়' মনোভাবকে।

> আর্য[illegible] প্রকাশ না [illegible] প্রতি [illegible] ও পক্ষপাত প্রকাশ করা,

> নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে হিন্দু জাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু তবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন, বিজাতীয় ভাবের দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন জাতীয় ভাবসম্পন্ন, তেমন অন্য কোন কবি নহেন।[১৫২]

রাজনারায়ণের এই সমালোচনাকে যথার্থ সাহিত্য সমালোচনা বলা যায় না। আসলে, এখানে তিনি সাহিত্য এবং জাতীয়তা তথা ধর্মীয় ভাবকে গুলিয়ে ফেলেছেন। তবে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাও তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিবর্তিত হয়েছিলো। ১৮৬০ সালের ডিসেম্বরে তিনি কবিকে বলেছিলেন: 'আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতন হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।'[১৫৩] কিন্তু ১৮৭৭ সালে বক্তৃতায় বলেন: 'তিনি (মাইকেল) তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট-পালতুন দেখা যায়।'[১৫৪]

রাজনারায়ণ তাঁর সমালোচনায় সাহিত্য বিশ্লেষণ মোটেই করেননি, তা বলা যায় না। মাইকেল যেসব ধ্রুপদী কবিকে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তুলনা করে তিনি কিছু ঢালাও মন্তব্য করেছিলেন।

> মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে প্রাঞ্জলতার অত্যন্ত অভাব। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর মনে হয় না। সকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল, যথা, — হোমর ও বাল্মীকি। শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের মধ্যে মিল্টনের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণ যেরূপ আছে, তাহাতে মাইকেল কখনই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন না। মিল্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসের রাজ-গাম্ভীর্য্য ও রচনার জমজমাট দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিল্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণই দৃষ্ট হয়।[১৫৫]

রাজনারায়ণের এই বক্তৃতায় মাইকেলের সাহিত্যানুরাগীরা বিরক্ত হয়েছিলেন। সে কথার উল্লেখ করে রাজনারায়ণ লিখেছেন: 'এই বক্তৃতা করিবার পর আমি অবগত হইলাম যে, আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য মাইকেল মধুসূদনের পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় পক্ষীয় লোকেরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেবল এই মাত্র প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক বলিয়াছি।'[১৫৬] প্রায় সওয়া শো বছর পরে এখন অবশ্য রাজনারায়ণ যতোটা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, মাইকেলকে তার চেয়ে অনেক বড়ো কবি বলে বিবেচনা করা হয়। এবং তাঁর উক্তিকে রীতিমতো স্ববিরোধিতা বলেই বিবেচনা করা যায়।

মেঘনাদবধের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার সময়ে তিনি ষষ্ঠ সর্গ লিখতে আরম্ভ করেন। সম্ভবত রাজনারায়ণকে তার খানিকটা শুনিয়েওছিলেন। কিন্তু জানুআরি মাসের (১৮৬১) প্রথম দিকে রাজনারায়ণ কলকাতা থেকে যাবার কয়েক ঘণ্টা পরেই কবি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছ/সাত দিন অসুস্থ ছিলেন। রসিকতা করে রাজনারায়ণকে লিখেছেন: 'মেঘনাদ আমাকে খতম করবে, না আমি তাকে খতম করবো, বস্তুত, তা নিয়ে একটা দড়ি টানাটানি চলছিলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। শেষ পর্যন্ত আমিই জয়ী হয়েছি, তার মানে তাকে আমি খতম করেছি; আর সেই সঙ্গে শেষ করেছি *মেঘনাদের ষষ্ঠ সর্গ* — প্রায় সাড়ে সাতশো পঙক্তি।'[১৫৭] ফেব্রুআরি মাসের শেষ দিকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, ততো দিনে তিনি সপ্তম সর্গ লেখার কাজ শেষ করে অষ্টম সর্গ লিখতে আরম্ভ করেন। তারপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অষ্টম সর্গ শেষ করে তিনি দ্বিতীয় খণ্ড ছাপাখানায় পাঠান। তবে মে মাসের দ্বিতীয় ভাগে তিনি রাজনারায়ণকে যে-চিঠি লেখেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, তখনো *মেঘনাদ* প্রকাশিত হয়নি। তার কারণ, তিনি এর রচনার কাজ শেষ করতে পারেননি। কয়েক শো

পঙ্‌ক্তি লেখা তখনো বাকি। এর আগের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করেছি, *পদ্মাবতী* এবং *তিলোত্তমাসহ* তাঁর অন্য একাধিক রচনার একেবারে সমাপ্তি পর্যায়ে পৌঁছে তিনি সেগুলো শেষ করার ব্যাপারে আলসেমি করেছেন। আমার ধারণা, নাটক অথবা কাব্য যা-ই রচনা করুন না কেন, শেষ দিকে পৌঁছে, লেখার নেশা ফিকে হয়ে যাবার জন্যে তিনি এমন গড়িমসি করতেন। তা ছাড়া, যেমনটা আগেই ইঙ্গিত করেছি, কোনো বিষয় নিয়ে তিনি দীর্ঘ সময় লেগে থাকতে পারতেন না। এ ক্ষেত্রে *মেঘনাদবধকাব্যই* একটা ব্যতিক্রম।

এ কাব্য রচনার কাজ তিনি আরম্ভ করেছিলেন ১৮৬০ সালের প্রথম দিকে। এপ্রিল মাসের চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, ততো দিনে খানিকটা লেখা হয়ে গেছে।[১৫৮] আর সে কাব্য শেষ করলেন ১৮৬১ সালের সম্ভবত মে-জুন মাসে। এতো দীর্ঘদিন তিনি কোনো রচনার দিকে তাঁর মনোযোগ এবং আগ্রহ অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি। কিন্তু *মেঘনাদবধ* তিনি লিখতে আরম্ভ করেন কারো সঙ্গে বাজি রেখে নয়, নিজের অন্তরের তাগিদে। এর কাহিনী, নাটকীয়তা, অন্তর্নিহিত স্পিরিট, এতে মৌলিকত্ব দেখানোর সুযোগ এবং, সর্বোপরি, তিনি একে যেভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং যেভাবে এ কাহিনী তিনি পুনর্নির্মাণ করছিলেন, তার ফলে তিনি তাঁর উৎসাহ বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। বস্তুত, কেবল উৎসাহ বাঁচিয়ে রাখা নয়, তিনি প্রথম সর্গের সাফল্য দেখে দ্বিতীয় সর্গ রচনা করেন আরো বেশি যত্নের সঙ্গে। রাজনারায়ণকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে এ কাব্য লেখার পেছনে তাঁর যে সজ্ঞান প্রযত্ন এবং প্রত্যাশা ছিলো, সে সম্পর্কে বেশ জানা যায়। রাজনারায়ণের প্রথম খণ্ড ভালো লেগেছিলো, তারই সূত্র ধরে তিনি লেখেন:

> আশা করি দ্বিতীয় খণ্ড তোমার আরও ভালো লাগবে। অন্তত আমি এটা শেষ করেছি অনেক বেশি যত্ন নিয়ে। তোমার কাছে গোপন করবো না — আমাকে স্বীকার করতে হবে, এর কোনো কোনো অংশ আমার হৃদয়কে অবিমিশ্র আত্মপ্রসাদে ভরে দেয়। তোমাকে বলতে পারি, বন্ধু, আমার কোনো ধারণাই ছিলো না যে, আমাদের মাতৃভাষা আমাকে এতো অফুরন্ত উপকরণ জোগাবে এবং তুমি জানো, আমি কোনো বড়ো পণ্ডিত নই। আমি অবশ্যই স্বীকার করবো যে, এটা আমার কাছে একটা রহস্য — কিভাবে ভাবনা এবং রূপকল্পগুলো তাদের সঙ্গে শব্দ নিয়ে এসেছে — এমন সব শব্দ যা জানতাম বলে আমি নিজেই মনে করিনি। তা ছাড়া, এ কাব্য আমি অলঙ্কারশাস্ত্র এতোটা মেনে রচনা করেছি যে, একজন ফরাসি সমালোচকও এর মধ্যে কোনো খুঁত খুঁজে পাবেন না। তুলনামূলকভাবে বলতে পারি, এ কাব্যটা দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে এবং খুব বিক্রি হচ্ছে। এ কাব্য বের হবার পর অমিত্রাক্ষরের সমালোচকদের মুখ বন্ধ হয়েছে। কী বলো দোস্ত, বড়ো রকমের একটা বিজয় না? আমাকে এরই মধ্যে লোকেরা মিল্টন এবং কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করতে আরম্ভ করেছেন। আমি এই উপাধির কতোটা যোগ্য, তা নিজে বলতে পারছিনে, কিন্তু এটা শুনে সত্যি খুব আত্মতৃপ্তি অনুভব করি। আরও কয়েক বছর যদি বেঁচে থাকি, তা হলে আমি আরও ভালো লিখতে পারবো, এটা তোমাকে বলতে পারি, কারণ আমার আরও অনুশীলন দরকার।[১৫৯]

তাঁর এই অনুশীলন করার প্রসঙ্গে একটা মন্তব্য করা যেতে পারে: তিনি একটু বেশি আত্মসচেতন ছিলেন। ইতিপূর্বে মন্তব্য করেছি, অহঙ্কার তাঁর চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাহিত্যের মান উন্নয়ন করার ব্যাপারে তাঁর কোনো গাফিলতি ছিলো না। নিরন্তর অধ্যয়ন এবং নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি নিশ্চিতভাবে সামনে এগিয়ে যাবার সাধনা করেছেন। সে কারণে *মেঘনাদবধের* প্রথম খণ্ড রচনার সময়ে ছন্দসহ *তিলোত্তমা*কাব্যে অনেক ত্রুটি দেখতে পেয়েছেন। আবার *মেঘনাদের* দ্বিতীয় সর্গ রচনার সময়ে প্রথম সর্গের ছন্দে অনেক ভুল চোখে পড়েছে। *তিলোত্তমাসম্ভব* তিনি নতুন করে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। *মেঘনাদবধ* সংশোধন করার সংকল্পও প্রকাশ করেছিলেন।[১৬০]

মেঘনাদবধের শেষাংশ লেখা, প্রুফ দেখা ইত্যাদি কবি যথাসময়ে করতে পারেননি। ফেব্রুআরি মাসে তিনি মেঘনাদের অষ্টম সর্গ রচনা করিছিলেন। কিন্তু এপ্রিলেও এই সর্গ ছাপা শেষ হয়নি। তখন

লিখতে আরম্ভ করেছিলেন নবম সর্গ। শেষ পর্যন্ত এই বই ছাপার কাজ শেষ হয় জুলাই মাসের শেষে।[১৬১] ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি যে-গতিতে লিখছিলেন, তাতে ততোদিনে লেখা শেষ হয়ে যাবার কথা। সে জন্যে এখানে প্রশ্ন ওঠে: এ সময়ে তিনি কি অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন? গৌরদাস বসাক আর রাজনারায়ণ বসুকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে এই প্রশ্নের উত্তর মেলে।

এ সময়ে খিদিরপুরের বাড়ি, মায়ের অলংকার এবং জমি-জমা নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে তাঁর যে-মামলা-মকদ্দমা চলছিলো, তার মধ্যে অন্তত দুটি চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে গিয়েছিলো। ফেব্রুআরির শেষে একটি মামলায় তিনি জয়ী হন।[১৬২] আর একটি মামলা আটকে ছিলো কলকাতায়। এ নিয়ে তিনি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন বলে মনে হয়। তা ছাড়া, এ সময়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মৃত্যুশয্যায়। তিনি মারা যান ২৯শে মার্চ তারিখে। তার কদিন আগে গৌরদাস কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন কটকের বালেশ্বর থেকে। পৈতৃক সম্পত্তি – কলকাতার বাড়ি – উদ্ধারের জন্যে কবির মামলার একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন গৌরদাস। তাঁর জ্ঞাতিদের পরস্পরবিরোধী নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই তিনি সাক্ষী দেন। তদন্ত করা ছাড়াও, এ বাড়ি এবং এ বাড়ির পরিবার সম্পর্কে তিনি বহু বছর ধরে অনেক কথা জানতেন, সে সূত্র ধরেও তাঁর পক্ষে সাক্ষী দেওয়া সম্ভব। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গৌরদাস তাঁর কাজের জায়গা – বালেশ্বরে – থাকায় মামলা আটকে ছিলো। এখন তিনি কলকাতায় আসায় প্রিন্সিপাল সদর আমীন চাইছেন অবিলম্বে তাঁর সাক্ষ্য নিতে। কিন্তু গৌরদাস কোনো কারণে যথাসময়ে সাক্ষ্য দেবার জন্যে সদর আমীনের দপ্তরে যেতে পারেননি। তাতে কবি উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। ঈশ্বরচন্দ্র মারা যাবার পরের দিন তিনি তাই লিখেছেন: 'তুমি যদি অবিলম্বে আদালতে না-যাও, তা হলে আমার বেচারী মায়ের অলংকারগুলো হারাতে হবে। দোহাই তোমার, তুমি কী করছো, আমাকে দেরি না-করে জানিয়ো। আগামী মাসের তেসরা রায় দেবার তারিখ ঠিক হয়েছে।'[১৬৩] গৌরদাস যথাসময়ে সাক্ষী দিতে পেরেছিলেন কিনা অথবা ঠিক সময়ে মামলার রায় প্রকাশিত হয়েছিলো কিনা, জানা যায় না। তবে অল্পকালের মধ্যেই কবি জয় লাভ করেন, তা রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়।[১৬৪]

আলোচ্য সময়ে আর-একটা কারণেও তাঁর পক্ষে ব্যস্ত থাকা সম্ভব। সে হলো: *নীলদর্পণে*র অনুবাদ। এ নাটকের অনুবাদ তিনি করেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু করে থাকলে, তা করেছিলেন এ সময়ে। *নীলদর্পণ* প্রকাশিত হবার পরে জেমস লঙের বিরুদ্ধে যখন মামলা ওঠে, তখন সেই মামলার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন এই বই-এর মুদ্রক – মি ম্যানুয়েল। তিনি তাঁর সাক্ষীতে বলেছিলেন যে, এই বই-এর ছাপার কাজ শুরু হয় এপ্রিল মাসে। ছাপা শেষ হয় মে মাসে। তিনি বলেন যে, পুরো পাণ্ডুলিপি তিনি একবারে পাননি। জেমস লঙ কয়েক পৃষ্ঠা করে নিয়ে আসতেন।[১৬৫] (মাইকেল এক রাতে *নীলদর্পণে*র অনুবাদ শেষ করেছিলেন বলে যে-উপাখ্যান প্রচলিত আছে, আদৌ অনুবাদ করে থাকলে, তা যে ঠিক নয়, ম্যানুয়েলের সাক্ষ্য থেকে তা অন্তত বোঝা যায়।)

*নীলদর্পণে*র অনুবাদ তিনি করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে জেমস লঙের কোনো সাক্ষ্য পেলে চূড়ান্তভাবে বলা যেতো। জেফ্রি এ. ওডি প্রোটেস্টেন্ট মিশনারিদের সম্পর্কিত তাঁর বই-এ লিখেছেন যে, জেমস লঙের তত্ত্বাবধানে মাইকেল *নীলদর্পণ* অনুবাদ করেছিলেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি জেমস লঙের দুটি চিঠির উল্লেখ করেছেন – একটি ২৪ অগস্ট (১৮৬১) তারিখে কলকাতার বিশপকে লেখা আর অন্যটি ১৫ তারিখে লন্ডনে তাঁর প্যারেন্ট কমিটিকে লেখা।[১৬৬] বার্মিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত জেমস লঙের চিঠিপত্রের যে-সংগ্রহের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ২৪ অগস্ট লেখা বলে কথিত চিঠিটির কোনো অস্তিত্ব নেই। আর ১৫ তারিখের চিঠিতে আদৌ মাইকেলের নাম নেই। এতে

তিনি কেবল লিখেছিলেন:

> বিচারের সময়ে যা সম্মান এবং সত্যবাদিতার কারণে প্রকাশ করতে পারিনি, এখন তা বলতে পারি — আমি এ বই সম্পাদনার এবং এটা অনুবাদ করার জন্যে একজন অনুবাদক নিয়োগের কাজ করেছিলাম সরকারের সচিবের পক্ষ থেকে।[১৬৭]

এমন কি, পরের বছর মার্চ মাসের পাঁচ তারিখে তিনি যখন মাদ্রাস থেকে ১৮৬১ সালের ঘটনাবলীর সমীক্ষা করেছেন, তখনো তিনি *নীলদর্পণ*সম্পর্কে অনেক কথাই লিখেছেন, কিন্তু কে অনুবাদ করেছেন, তা এড়িয়ে গেছেন।

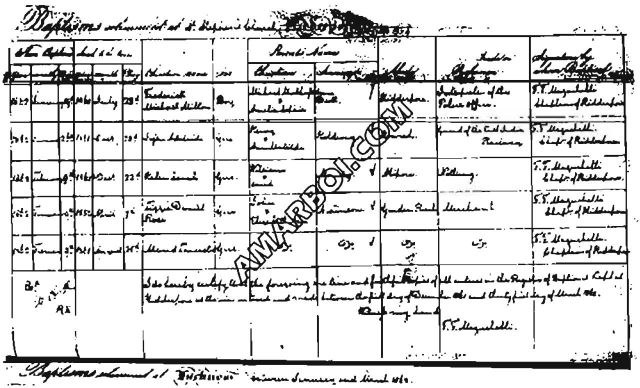
> গত বছরটা ছিলো আমার জন্যে ঘটনাবহুল — এর প্রথম ছ মাসে আমার কাজ ছিলো চিরাচরিত রুটিনমাফিক — অর্থাৎ দেশীয় পড়ুয়া এবং ক্যাটেকিস্টদের সঙ্গে শীতের সময়কার কার্যকলাপ — আমি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো-সহ বারাসত সফরে গিয়েছিলাম এবং সেখানে তাঁবুতে থাকার সময়েই ঐ এলাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে লেখক আমার কাছে *নীলদর্পণ* পাঠান।...
>
> কিন্তু আমার এই আরামের এবং ভালো-লাগা ঘটনাবলীতে হঠাৎ ছেদ পড়লো এবং কালো মেঘ দেখা দিলো। ... আমি মি সিটন কারকে *রবিনসন ক্রুসো* এবং *নীলদর্পণ*-সহ কিছু বই দিয়েছিলাম। মি সিটন কার ছিলেন আমাদের ভার্নাকুলার লিটারারি সোসাইটির একজন পুরোনো সদস্য। তিনি সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন এবং দেশীয় পত্রপত্রিকায় কী হচ্ছে তা জানার জন্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এর ফল হলো, আমি অনুরুদ্ধ হলাম একজন দেশীয়কে দিয়ে *নীলদর্পণে*র একটি অনুবাদ করানোর জন্যে, যার জন্যে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।[১৬৮]

এ পর্যন্ত *নীলদর্পণ* কোথায় কেমন করে পেলেন, কার আদেশে তা অনুবাদ করালেন — সবই বলা সত্ত্বেও, এর পরে লঙ আর কিছুতেই কিভাবে অথবা কাকে দিয়ে অনুবাদ করালেন, তার উল্লেখ করেননি। সুতরাং *নীলদর্পণে*র অনুবাদ মাইকেল করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে এখনো আমরা চূড়ান্তভাবে কিছুই বলতে পারিনে। তবে তিনি এ অনুবাদ করে থাকলে, তা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে গোপন করার কোনো প্রয়োজন হতো না। কারণ এই অনুবাদ করানো, তার খরচ জোগানো এবং সরকারী খামে করে তা বিভিন্ন জনের কাছে পাঠানো সবই হয়েছিলো সরকারের জ্ঞাতসারে, সম্মতিতে এবং খরচে।[১৬৯] সুতরাং এই অনুবাদ করায় মাইকেলকে তাঁর ওপরওয়ালারা ডেকে ভর্ৎসনা করেছিলেন বলে যে-গল্প চালু আছে,[১৭০] তা নিতান্তই কিংবদন্তী — সত্য নয়। সিটন কার এবং স্যার বার্টল ফ্রায়ারকে বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই বিচারের শেষ পর্যন্ত লঙ কিছুতেই নাম বলেননি। যে-দুটি পত্রিকা এবং যে-নীলকরদের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছিলো, তাদেরও জানা ছিলো, কারা এই অনুবাদ করিয়েছেন। এমন কি, বিচারের অব্যবহিত পরে সিটন কার নিজেও তাঁর দায় স্বীকার করেন।[১৭১] কিন্তু তা সত্ত্বেও লঙ কেন কোনোদিন অনুবাদকের নাম প্রকাশ করেননি, তা বলা শক্ত। আমার ধারণা, মাইকেলকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে থাকলে লঙ এ পর্যায়ে তা প্রকাশ করতেন। মাইকেল চমৎকার ইংরেজি-জানা বিখ্যাত কবি, এ তথ্য লঙ ভালো করেই জানতেন এবং তাঁর নাম উল্লেখ করলে অনুবাদের প্রামাণিকতা বাড়বে — এটা মনে করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও তিনি নাম বলেননি। এ থেকে মনে হয়, তিনি কোনো নাম-করা লোক দিয়ে অনুবাদ করাননি। জেফ্রি ওডি জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই বলেছেন যে, মাইকেল এই অনুবাদ করেছিলেন, তা না-হলে তাঁর কোনো তথ্য ছিলো না।

মাইকেল *নীলদর্পণ* অনুবাদ করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে আমার সন্দেহের আর-একটা কারণ এর ভাষা। রত্নাবলীর অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন যে, তিনি অনুবাদ করেছেন নাটকের সর্বোত্তম অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষায়। *নীলদর্পণে*র ভাষা দেখে সেই অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষার পরিচয়

পাওয়া যায় না। বস্তুত এ ভাষা থেকে মনে করা কঠিন যে, তিনি এই বই-এর অনুবাদক।

নীলদর্পণ সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও, *মেঘনাদবধ* রচনায় পারিবারিক দায়িত্ব থেকে বড়ো রকমের বাধা এসেছিলো, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথমত, লোয়ার চিৎপুর রোডের যে-বাড়িতে তিনি বাস করতেন, মে মাসে সেখান থেকে সরে যেতে হয়। কারণ, এ বাড়িটার তখন মেরামত হচ্ছিলো। বাড়ি বদল করে তাঁকে যেতে হয় বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে যে-খিদিরপুরে ছিলেন, সেই এলাকায় (যদিও নিজেদের বাড়িতে নয়)। তারপর কয়েক সপ্তাহ পরে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত নেন। দ্বিতীয়ত, হেনরিয়েটা দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করেন ২৩ জুলাই।[১৭২] এই সন্তান — দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম পুত্রের — নাম রাখা হয় ফ্রেডারিক মাইকেল মিল্টন ডাট। *শর্মিষ্ঠার* অভিনয়ের কদিন পরেই কন্যার জন্ম হয়েছিলো। তখন তার অন্যতম নাম দিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা। এবারে *মেঘনাদবধ* লেখার অব্যবহিত পরে পুত্রের নাম রাখলেন মিল্টন। এ থেকেও আভাস পাওয়া যায়, *মেঘনাদ* রচনার সময়ে তিনি মিল্টনের কথা কতোটা ভেবেছিলেন। তা ছাড়া, *মেঘনাদবধ* সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের খানিকটা



ফ্রেডারিক মাইকেল মিল্টনের ব্যাপটিজমের দলিল

পরিচয় পাওয়া যায় আর-একটা বিষয় থেকে — পরবর্তী সময়ে কবি তাঁর এই পুত্রকে অনেক সময়ে মেঘনাদ নামে ডাকতেন। পুত্রের জন্মে তিনি খুশি হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। আগেই যেমনটা উল্লেখ করেছি, তিনি ক্বচিৎ তাঁর সংসারের খবর দিতেন চিঠিপত্রে। কিন্তু পুত্রের জন্মের পরে রাজনারায়ণকে তিনি যে-চিঠি লেখেন, খুব সম্ভব অগস্টের প্রথম দিকে, তাতে এই ছেলের জন্মের খবর দিয়েছেন।[১৭৩]

মেঘনাদবধ রচনার শেষ পর্যায়ে তাঁর পরিচিত দুজন উল্লেখযোগ্য লোক মারা যান — ২৯ মার্চ মারা যান তাঁর অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, আর ১৪ জুন মারা যান *Hindoo Patriot* পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জি। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁকে নাট্যরচনায় খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, আর্থিক সংকট থেকে তাঁকে একাধিক বার উদ্ধার করেছিলেন, আমরা তা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি।[১৭৪] হরিশ মুখার্জিকেও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। হরিশ মুখার্জি প্রতিভাবান এবং সাহসী ছিলেন। সিপাহি বিপ্লব এবং নীল বিদ্রোহের সময়ে তিনি *Hindoo Patriot*-এর সম্পাদক হিশেবে নির্ভীক ভূমিকা পালন করেন। সিপাহী বিপ্লবের সময়ে তাঁর ভূমিকা ছিলো আরও সাহসী।

নীলকরেরা তখন চাষীদের ওপর যে-তীব্র নির্যাতন চালাচ্ছিলো, তিনি তার কঠোর সমালোচনা করেন এবং নীল কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেন। তা ছাড়া, নীলচাষীদের পক্ষে মামলা-মকদ্দমায় সহায়তা দিয়ে তাঁদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। মোট কথা, দেশে সৎ এবং সাহসী সম্পাদক এবং বুদ্ধিজীবী হিশেবে তিনি সুনাম এবং শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কলকাতার পত্রিকায় থাকে বস্তা পচা আবর্জনা[১৭৫] — এ কথা বলে সমালোচনা করলেও, হরিশ মুখার্জির প্রতি কবি কখনো অশ্রদ্ধার কোনো উক্তি করেননি। উল্টো, হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে যখন তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর জন্যে একটা ছাত্র বৃত্তি প্রবর্তনের প্রশ্ন ওঠে, তিনি তখন টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, তাঁর বন্ধুদের সমালোচনা করে বলেছিলেন, তাঁর জন্যে স্ট্যাচু তৈরি হবে না কেন?[১৭৬] অন্যদের উৎসাহের অভাবে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের উৎসাহও কমে যায়। তিনি হরিশ স্মৃতি রক্ষা তহবিলে দশ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন।[১৭৭] হরিশচন্দ্রের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয় জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে। সে যাই হোক, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ অথবা হরিশ মুখার্জির মৃত্যুর জন্যে *মেঘনাদ* রচনার কাজ হয়তো তেমনভাবে পিছিয়ে যায়নি, কিন্তু কবির মনের ওপর বড়ো রকমের প্রভাব পড়েছিলো, এমনটা অনুমান করা সম্ভব। বিশেষ করে এর পর তিনি যে আর কোনো নাটক লেখার পরিকল্পনা করেননি, তার অন্যতম কারণ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকাল মৃত্যু। পরে লক্ষ্য করবো, *Hindoo Patriot*-এর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ ঘটেছিলো।

মেঘনাদবধ মাইকেলের সাহিত্যিক-জীবনের বস্তুত ক্লাইম্যাক্স। *The Captive Ladie* লেখার মধ্য দিয়ে, এমন কি, বলা যায়, তারও আগে একেবারে কৈশোর থেকে তিনি কবি হিশেবে খ্যাতি লাভের জন্যে যে-সাধনা শুরু করেছিলেন, *মেঘনাদে* এসে তাতে সিদ্ধি লাভ করেন। যদিও তখনো একে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিবেচনা করেননি। ছোটোখাটো মহাকাব্য লিখে তিনি হাত পাকানোর যে-সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন,[১৭৮] তাঁর মতে, এ কাব্য ছিলো তারই একটি। *মেঘনাদবধ* লেখার সময়েও একজন সত্যিকার উঁচুদরের কবি হিশেবে তাঁর মনে হয়েছে যে, উৎকৃষ্ট কাব্য লেখার জন্যে যে-ক্ষমতা দরকার, তা তখনো তাঁর অনায়ত্ত। অথচ তা সত্ত্বেও, *মেঘনাদবধ* প্রকাশের অল্প দিন পরে তাঁর মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি লক্ষ্য করি। তাঁর মনে হলো: যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন! সবাইতো কালিদাস এবং মিল্টনের সঙ্গে তাঁর তুলনা করছে! আসলে তাঁর চরিত্রে ভোগ এবং বৈরাগ্যের আশ্চর্য এক সমন্বয় ঘটেছিলো। পাওয়ার আকর্ষণ ছিলো তাঁর, কিন্তু পাওয়ার পর আঁকড়ে ধরে রাখার বাসনা তীব্র ছিলো না। ব্যারিস্টারি পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিলেত যাত্রা করার কদিন আগে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি যা বলেছিলেন, তা থেকে তাঁর এই আসক্তিহীনতার পরিচয় মেলে।[১৭৯] তিনি লিখেছিলেন, যেভাবে তিনি চলে যাচ্ছেন, তাতে লোকেরা তাকে মাতৃভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করতে পারে। কিন্তু তিনি তো সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষায় সফলতা লাভ করেছেন, তাঁর মাতৃভাষাকে এগিয়ে দিয়েছেন, এখন যেতে আর বাধা কি? সাফল্য যদি আসতে দেরি করতো, তা হলে তিনি আরও পরে যেতেন; এমন কি, হয়তো আদৌ যেতেন না।[১৮০] কিন্তু সকাল-সকাল সাফল্য এবং সার্বজনিক স্বীকৃতি লাভের পর বসে বসে অলস কবিতা লেখার কোনো অর্থ হয় না। যে-কবিযশকে তিনি একদিন গণ্য করতেন সবচেয়ে দুর্লভ বস্তু হিশেবে, সেই কবিযশ লাভের পর তাকে নিয়ে তিনি তৃপ্ত থাকতে পারলেন না। অথবা তাকে আরও বাড়ানোর সাধনাকে শ্রেয় বলে ভাবলেন না। তখন সরস্বতীর সাধনা না-করে তিনি নজর দিলেন লক্ষ্মীর দিকে।

একজন সৃজনশীল লেখকের রচনা এবং জীবনের মধ্যে কতোটুকু যোগ আছে, সে নিয়ে অনেক সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকে বলেছেন, লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির কোনো যোগাযোগ না-ও থাকতে পারে। এবং সে জন্যে, কারো সাহিত্য বোঝার অথবা সে সাহিত্যের রস

আস্বাদনের জন্যে তাঁর জীবনী জানার কোনো আবশ্যক নেই।[১৮১] অপর পক্ষে, হেনরি জেমস বলেছেন, 'লেখক তাঁর বই থেকে নিজেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও, তাঁর প্রতিটি বই-এর প্রতিটি পাতায় তিনি হাজির থাকেন।'[১৮২] একজন ঔপন্যাসিক অথবা একজন নাট্যকার যেসব চরিত্র অঙ্কন করেন, তার প্রত্যেকটির সঙ্গে তাঁর নিজের মিল না-থাকতে পারে, তার অনেকগুলো হয়তো তাঁর চরিত্র থেকে একেবারে আলাদা। কিন্তু তাঁর উপন্যাস অথবা নাটকে বারবার যে-বলার কথাটা ফিরে ফিরে আসে, তা তাঁর নিজের। তার মধ্যে যে-অনুভূতির প্রকাশ ঘটে, সে তাঁর আন্তরিক অনুভূতি।

মাইকেল বারবার পৌরাণিক কাহিনী বেছে নিয়েছেন। এ থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তিনি পৌরাণিক জগতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেটা মোটেই ঠিক নয়। এমন কি, নতুন ভাষা ও ছন্দ এবং ভিন্নতর ভঙ্গিতে পৌরাণিক কাহিনী নতুন করে বলার লোভেও নয়। সত্যি বলতে কি, তাঁর মনোভাব ছিলো প্রাচীন জগৎ থেকে একেবারে আলাদা। কিন্তু তিনি ধ্রুপদী সাহিত্যের অত্যুৎসাহী পাঠক হিশেবে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য দেখতে পেতেন। সেই সৌন্দর্য তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলো নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পুরাণকে পরিবেশন করতে। তিনি পৌরাণিক কাহিনী বেছে নিয়েছিলেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর আধুনিক মানবিক মূল্যবোধকে প্রকাশ করার জন্যে। চতুর্দশ শতাব্দীর রেনেসান্সের পণ্ডিতরাও পুরোনো গ্রীক আর ল্যাটিন সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। কিন্তু সেটা প্রাচীন কালে ফিরে যাবার জন্যে নয়, বরং সেই সাহিত্যের প্রচার এবং নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে আধুনিক মানবিক মূল্যবোধকে প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। তাঁদের হিউম্যানিস্ট বিশেষণের কারণ সেটাই। উনিশ শতকে যে-বঙ্গীয় রেনেসান্স হয়েছিলো বলে দাবি করা হয়, তার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ যাঁদের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করা যায়, তাঁদের একজন নিঃসন্দেহে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর আগে রামমোহন রায় হিন্দু শাস্ত্র অনুবাদ এবং প্রচার করেছিলেন, সেই শাস্ত্র দিয়ে প্রাচীন ভারতে ফিরে যাবার জন্যে নয়, বরং তার মাধ্যমে সমকালীন সমাজকে সংস্কার করার জন্যে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও একই উদ্দেশ্যে প্রাচীন শাস্ত্র অনুবাদ করেছিলেন এবং তার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য কেবল শাস্ত্রে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদ এবং প্রচার করেও তিনি সমকালীন সাহিত্য রুচিকে উন্নত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর – উভয়ই রেনেসান্সের হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বলে আখ্যায়িত হতে পারেন। তাঁদের পর যিনি এই বিশেষণের সবচেয়ে প্রধান দাবিদার, তিনি মাইকেল। পার্থক্য এই যে, তিনি আদৌ শাস্ত্র অনুবাদ করেননি, সাহিত্যেরও অনুবাদ করেছিলেন সামান্যই। তিনি পৌরাণিক কাহিনীর নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং ধ্রুপদী সাহিত্যের ওপর ভিত্তি করে নতুন সাহিত্যের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ভারতীয় পুরাণের মধ্যে নতুন এবং অসাধারণ সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিলেন। *শর্মিষ্ঠা*, *পদ্মাবতী*, *তিলোত্তমা* এবং *মেঘনাদবধে* একে-একে তিনি তাঁর এই একান্ত পুরাণ-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। নয়তো প্রাচীন ভারতবর্ষে ফিরে যাবার মনোভাব তাঁর মোটেই ছিলো না। মধ্য এবং প্রাচীন যুগের ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কেমন ছিলো, তার খানিকটা প্রকাশ আমরা ইতিপূর্বে তাঁর *The Anglo-Saxon and the Hindu*-র মধ্যে দেখতে পেয়েছি।

মেঘনাদবধের বিষয়বস্তু এবং মাইকেল-মানস নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে। সবচেয়ে বিতর্কিত আলোচনা হয়েছে হিন্দু দেবতা রামের প্রতি তাঁর প্রতিকূল এবং রাক্ষসরাজ রাবণের প্রতি তাঁর অনুকূল মনোভাব নিয়ে। তাঁর সমকালেও এই সমালোচনা সবচেয়ে প্রবল ছিলো। রাজনারায়ণকে লেখা একটি চিঠিতে কবি স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সহানুভূতি ছিলো বিশেষ করে রাক্ষসদের জন্যে এবং তিনি রাম আর তাঁর তুচ্ছ অনুসারীদের অপছন্দ করেন। অন্য আর-এক চিঠিতে লিখেছেন: 'এই কাহিনী থেকে আমি মহৎ একটা কাব্য লিখতে পারতাম, কিন্তু বাঁদরগুলো রসভঙ্গ করে।'[১৮৩] কিন্তু

তাঁর সমালোচকরা তাঁর এই বক্তব্যটাই সবচেয়ে সত্য মনে করে একে হিন্দুদের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবের একেবারে মোক্ষম প্রমাণ হিশেবে হাজির করেছেন। কিন্তু এখানে কবি আসলে একটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বীর রাক্ষসদের প্রতিপক্ষ হিশেবে বানরদের দেখাতে সংকোচ বোধ করেছেন। কারণ তার ফলে রাক্ষসদের বীরত্ব ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক এই দৃষ্টিকোণ থেকে *মেঘনাদবধের* বিচার করেননি। তবে কবি যে বহিরাগত এবং আগ্রাসী রামের চেয়ে রাক্ষসদেরই জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে সমর্থন করেছেন, তাঁরা তাকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন।

আসলে তাঁর সমস্ত অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা এবং জীবনদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে-নব্যরামায়ণ লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই রামায়ণে রামের বদলে রাবণ দেখা দিলেন নায়ক হিশেবে। এটা সেকালের কোনো হিন্দু কবির পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি এই অভূতপূর্ব ধারণা কোথায় পেলেন? প্রথম যৌবন থেকে পাশ্চাত্যের উদার ভাবনা এবং সাহিত্য দিয়ে তাঁর মন লালিত হয়েছে। ঐতিহ্যিক চিন্তাধারাকে বাদ দিয়ে তিনি গোড়া থেকেই স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, রাম এবং রাবণকে এমন ঐতিহ্য-বিরোধী ভাবমূর্তিতে তিনি কল্পনা করতে পারতেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এ ক্ষেত্রে যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, তা হলো তাঁর ধর্মান্তর। সন্দেহের কারণ নেই যে, খৃস্টান হবার দরুন এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ স্বীকরণের ফলে এই অসাধ্য সাধন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিলো।

সমালোচক হিশেবে যাঁরা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে উৎসাহী, তেমন অনেকে আবার এমনও বলেছেন যে, সিপাহী বিপ্লবের পর যে-নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনা জন্ম নিচ্ছিলো, রাম-রাবণের সংঘর্ষ দিয়ে কবি সেটাকেই প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই রামের বদলে রাবণের পক্ষ নিয়েছে।[১৮৪]

মধুসূদনের একান্ত নিজস্ব এই দৃষ্টিভঙ্গির এমন সরলীকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালিরা পরাধীনতার জ্বালায় একেবারে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন, ইতিহাস এমন সাক্ষ্য দেয় না। তা হলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ সিপাহী বিপ্লবকে সাজানো সংসারে বর্গীর হামলার মতো একটা উপদ্রব বলে বিবেচনা করতেন না। মাইকেলের সহপাঠী এবং বন্ধু রাজনারায়ণ বসু সিপাহী বিপ্লবকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, আগেই আমরা তা লক্ষ্য করেছি। বস্তুত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজ রাজত্ব থেকে যে-সমৃদ্ধি এবং নিশ্চিত নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন, কোনো মধ্যযুগীয় শক্তিকে স্বাগত জানিয়ে তাকে বিনষ্ট করতে তাঁরা তৈরি ছিলেন না।

এ বিষয়ে কবির মনোভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি জটিল ছিলো বলে মনে হয়। কারণ, তাঁর নিজের স্বরূপ বা আত্মপরিচয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা রাজনারায়ণদের মতো অতোটা সিধে ছিলো না। রাজনীতির তিনি ধার ধারতেন না। তখন পর্যন্ত দেশের পরাধীনতা সম্পর্কে কোনো প্রবল মনোভাব তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়নি। দেশের পরাধীনতায় তিনি যে-খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তার কোনো প্রকাশ তাঁর রচনায় প্রকটভাবে দেখা দেয়নি। এমন কি, চলতি ঘটনাবলীর প্রতিও মাদ্রাসে পত্রিকা সম্পাদনা করার সংক্ষিপ্ত সময় ছাড়া জীবনের অন্য পর্যায়ে তিনি নিতান্ত অনীহা দেখিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও নিজের পরিবার, সমাজ, এবং ধর্ম ত্যাগ করে তিনি যোজন যোজন দূরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী রেবেকা এবং জীবনসঙ্গিনী হেনরিয়েটা ছিলেন আধা-ইংরেজ। তাঁদের সঙ্গে সংসার করার ফলে আত্মপরিচয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা যদি আরও ধোঁয়াটে হয়ে থাকে, তা হলেও বিস্মিত হবার কারণ নেই। সর্বোপরি, ইংরেজি সভ্যতার প্রতি তাঁর কী গভীর ভালোবাসা ছিলো, তা-ও আগেই আমরা দেখেছি। ধর্মে বিশেষ আগ্রহ না-থাকলেও, তিনি নিজেকে বেশ জোর গলায় খৃস্টান বলে পরিচয়

দিতেন। নিজেকে তিনি ইংরেজ মনে করতে পারতেন না ঠিকই – বিশেষ করে চামড়ার রঙের দরুন – কিন্তু তাই বলে তিনি কি নিজেকে অসঙ্কোচে বাঙালি বলে সনাক্ত করতেন? অথবা ভারতীয় বলে? বলা শক্ত। বরং চার্চের মতো কোনো একটা জায়গায় গিয়ে রাতারাতি ধর্মের মতো চামড়ার রং এবং জন্মের পরিচয় বদল করতে পারলে, অসম্ভব নয় যে, তিনি তাও চেষ্টা করতেন। ইংরেজদের প্রতি তাঁর যেটুকু বিরূপতা এসেছিলো, তা এসেছিলো তিনি ইংরেজদের যে-বর্ণবাদী, বৈষম্যমূলক এবং প্রভুচিত আচরণ লক্ষ্য করেছিলেন, তা থেকে। 'ছোটো' ইংরেজের অনেক সংকীর্ণ ব্যবহারের তিনি শিকার হয়েছিলেন। মোট কথা, সবকিছু মিলে তিনি যৌবন থেকে এক ধরনের স্বরূপের সংকটে ভুগতেন বলে মনে হয়। তবে জীবনের সব পর্যায়ে তাঁর স্বরূপ-ভাবনা যে একই রকম ছিলো, তা ভাববার কারণ নেই। এহেন জটিল মানসিকতার অধিকারী মাইকেল সিপাহী বিপ্লবকে এক কথায় ভালো অথবা মন্দ বলে বিবেচনা করতেন বলে মনে হয় না। য়োরোপে গিয়ে তাঁর এই আত্মপরিচয়ের সংকট কিভাবে ঘনীভূত হয় এবং নতুন মোড় নেয়, যথাসময়ে আমরা তা দেখতে পাবো। তবে এখানেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেই সংকটের সময়ে একাধিক সনেটে তিনি মাতৃভূমিকে নতুন চোখে দেখেছিলেন। তাঁর সেই মনোভাব *মেঘনাদবধ* আলোচনা প্রসঙ্গেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কয়েক বছরের মধ্যে দেশ সম্পর্কে তাঁর ভালোবাসা ধীরে ধীরে কেলাসিত রূপ নেয়। *ভারত-ভূমি* সনেটটি তিনি শুরু করেছেন একটি ইটালীয় কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে:

> কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি! ইতালি!
> এ দুখজনক রূপ দিয়াছেন বিধি।

উদ্ধৃত এই দুই পঙ্‌ক্তি থেকেই বোঝা যায়, এ কবিতায় তিনি ভারতবর্ষের দুঃখের কথা বলবেন। তবে তিনি কেবল দুঃখের কথাই বলেননি, সেই সঙ্গে স্বদেশকে তিনি আনুগত্যহীন, নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে অসমর্থ এবং দুর্বল বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

> নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী;
> রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি;
> পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধিনী
> (হা ধিক!) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্মতি!

যখন যে-বিজয়ী এসেছে, ভারতবর্ষ তারই কাছে নিজেকে অনাবৃত করে দিয়েছে। এখানে তিনি কেবল মুসলিম বিজয়ীদের কথা বলেছেন বলে মনে হয় না। বরং সমকালীন ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির সামনে ভারতের পরাজয়ের ইঙ্গিতও দুর্লক্ষ নয়। *আমরা* কবিতায়ও তাঁর এই ক্ষোভ দেখতে পাই।

> আমরা, – দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
> পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে? –
> কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
> ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
> নির্গন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব কি মতে?
> বামন দানবকুলে, সিংহের ঔরসে
> শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে?

কেবল নিজেদের ধিক্কার দেননি, সেই সঙ্গে আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন:

> রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
> রস-শূন্য দেহ তুই? অমৃত-আসারে
> চেতাইবি মৃত-কল্পে? পুনঃ কি হরষে,
> শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে?

বঙ্গদেশে যে-জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১৮৬০-এর দশক থেকে ধীরে ধীরে উন্মেষ লাভ করতে আরম্ভ করে, সেই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে দীক্ষা না-নিলেও, এ কবিতা দুটিতে দেশপ্রেম এবং পরাধীনতা সম্পর্কে তাঁর যে-মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁর অন্তরেব অন্তস্তল থেকে উৎসারিত। বস্তুত, এ চেতনা তাঁর হৃদয়ের গহীনে স্ফটিকের মতো ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছিলো। এবং এমন মনে করার কারণ নেই যে, এ চেতনা তিনি কেবল প্রবাসে দৈবের বশেই স্বীকরণ করেন।

মেঘনাদবধে তাঁর এই চেতনা অতো প্রকট না-হলেও ক্রিয়াশীল ছিলো নিঃসন্দেহে। কিন্তু তিনি যদি পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক না-হয়ে, হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতেন, তা হলে মনে মনে তিনি রাবণের – রাক্ষসদের পক্ষ নিতে পারতেন না। তিনি কোনো কোনো জায়গায় রাম এবং লক্ষ্মণকে বীর এবং মহান বলে দেখাতে চেয়েছেন ঠিকই; তবে তা-ও সেই বিখ্যাত বীরদের প্রতিপক্ষ হিশেবে রাবণ কতো বড়ো, তা দেখানোর উদ্দেশ্যে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, মাইকেল কেবল স্বধর্ম এবং স্বসমাজ ত্যাগ করেননি; তিনি খৃস্টান সমাজেও গৃহীত হননি। সে জন্যে, তিনি কোনো সমাজকে পুরোপুরি আপন বলে মেনে নিতে পারেননি। ফলে, তিনি হিন্দু থাকেননি; খৃস্টানও হতে পারেননি। তিনি যা হয়েছিলেন, তা একজন অসাম্প্রদায়িক *মানুষ*। তদুপরি বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে নিত্য সহবাসে তিনি যে-ঔদার্যের অধিকারী হন, তা-ও তাঁকে রাবণ, মেঘনাদ এবং বীরবাহু থেকে আরম্ভ করে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা পর্যন্ত সবগুলো চরিত্রকে মানুষ হিশেবে দেখতে সাহায্য করেছিলো। আর বানরদেরও তিনি নিতান্ত বানর হিশেবেই দেখেছিলেন, কোনো দেবতা হিশেবে নয়। তাঁর এই নির্ভেজাল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে তাঁর পক্ষে *রামায়ণের* কাহিনীর এই নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছিলো।

রাম এবং রাবণ সম্পর্কে মাইকেল কাব্যে যা লিখেছেন, মনে হয় না, তা থেকে তাঁর পক্ষপাত সবার কাছে অতোটা স্পষ্ট হতো। বরং অনেক জায়গাতেই বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে তিনি রামকে রাবণের চেয়ে বড়ো করেই দেখিয়েছেন। কিন্তু রাম এবং তাঁর বানর সৈন্যদের সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, তা থেকে বাঙালি সমালোচকদের এ সম্পর্কে আর-কোনো সন্দেহ ছিলো না। নয়তো তাঁর রচনা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে রামের প্রতি তাঁর যে অনেকটাই দরদ ছিলো, তা বোঝা যেতো। সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভিন্ন সময়ে লালিত একজন সমালোচক, ক্লিন্ট সীলি একটি চমৎকার প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, রাবণকে বড়ো বললেও কবি অনেক সময়ে তাঁর বর্ণনা দেবার জন্যে যেসব উপমা ব্যবহার করেছেন, তা রাবণকে বড়ো না-করে, বরং ছোটোই করে। অপর পক্ষে, রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেক সময়ে তিনি তাঁর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন।[১৮৫] আমার মনে হয়, সীলির এই মন্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে।

The Captive Ladie, Rizia এবং *তিলোত্তমাসম্ভবের* মধ্য দিয়ে তিনি যে-বীররস, ঐশ্বর্য এবং জাঁকজমক পরিবেশনের প্রযত্ন করছিলেন, তাও চূড়ান্ত রূপ নেয় *মেঘনাদবধকাব্যে*। এর পরে তাই বীররস পরিবেশনের আগ্রহ তিনি অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেন। এমন কি, *মেঘনাদবধের* একেবারে গোড়াতে তিনি বীররস পরিবেশনের উদাত্ত ঘোষণা দিলেও, আসলে এ কাব্যের নাম থেকে আরম্ভ করে প্রধান ঘটনা পর্যন্ত সব কিছুই গভীর বিষাদে ঢাকা। একটি সমৃদ্ধিশালী এবং পরিপূর্ণ সুখের পুরী কিভাবে ভাগ্যদোষ আর বহিরাগতের হামলা, গৃহশত্রুর ষড়যন্ত্র এবং অন্যায় সমরে রাতারাতি শোকপুরীতে পরিণত হতে পারে, এ কাব্যের বহিরঙ্গে কবি সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। বিশেষ করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, রাবণের মতো একজন দায়িত্বপূর্ণ ও প্রজাবৎসল রাজা এবং একজন আদর্শ স্বামী ও পিতা কিভাবে, আপাতদৃষ্টিতে, ভাগ্যদোষে প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতে উন্মূলিত বটের মতো সকল গৌরব হারিয়েছেন।

এ কাব্য লিখতে শুরু করার অল্প দিন পরে — তখনো তিনি প্রথম সর্গ শেষ করেননি — তখনই রাজনারায়ণকে ভাবী ট্র্যাজেডির প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিলেন।[১৮৬] সুতরাং, গোড়াতে তিনি বীররসের একটি কাব্য লিখতে চাইলেও সৃজনশীলতার টানে তিনি রচনা করেছিলেন একটি ট্র্যাজিক কাব্য, এমনটা মনে করার কারণ নেই। বস্তুত, তিনি প্রথম থেকেই জানতেন এ কাব্যে তিনি কী লিখবেন। এ কাব্যের অনেকটা জুড়ে তাঁকে বর্ণনা করতে হবে লঙ্কার ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, আড়ম্বরের চিত্র, আর থাকবে বীরবাহু, মেঘনাদ, রাম এবং লক্ষ্মণের অসাধারণ বীরত্ব এবং প্রচণ্ড সংঘাতের কথা — এমনটা তিনি প্রথমেই পরিকল্পনা করেছিলেন। এসব বর্ণনা করার জন্যে তাঁকে বীররসের আশ্রয় নিতে হবে, তা-ও তাঁর অজানা ছিলো না। কিন্তু কাব্যের কেন্দ্রে থাকবে মেঘনাদের হত্যা আর নিঃস্ব রিক্ত রাবণের মর্মস্পর্শী ট্র্যাজেডি, কাব্য পরিকল্পনা করার গোড়া থেকে এ-ও তাঁর কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ছিলো। সুতরাং বীররস পরিবেশন করার যে-প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, সে ছিলো নিতান্ত আংশিক ভাষণ।

মাইকেলের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কোদণ্ডটঙ্কারের কথা তিনি যতোবারই অথবা যতো জোরেই বলুন না কেন, অন্তরের অন্তস্তলে তিনি ছিলেন নির্ভেজাল রোম্যান্টিক এবং লিরিক কবি। তিনি নিজেও এ সম্পর্কে ষোলো আনা সজাগ ছিলেন। সত্যি বলতে কি, *মেঘনাদবধে* বীররসের আড়ালে কবি-চরিত্র আদৌ ঢাকা থাকেনি। সেখানে যুদ্ধবিগ্রহের তলা দিয়ে ফল্গুধারার মতো গীতলতা বহমান। *মেঘনাদবধের* চতুর্থ সর্গের সঙ্গে মূল কাহিনীর যোগাযোগ নেই এবং সে কারণে এই সর্গটা না-থাকলেই ভালো হতো — এ কথা কবি নিজে লিখেছেন।[১৮৭] কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ আর সহমর্মিতা নিয়ে এই সর্গটি রচনা করেছিলেন। কারণ, রণভেরী বাজানোর চেয়ে গীতলতায় ভেসে যাওয়াই ছিলো তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। সে জন্যে, রচয়িতার দ্বিধা সত্ত্বেও, এই সর্গটি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলো। এবং অনেকে এই সর্গটিকেই এ কাব্যের শ্রেষ্ঠ সর্গ বলে বিবেচনা করতেন। কবি অবশ্য সে সম্পর্কে নিজেও সচেতন ছিলেন। বস্তুত, এ কাব্যের যেখানেই রোম্যান্টিক হবার সুযোগ ছিলো, মাইকেল সেখানেই স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। তারপর কাব্যটি শেষ করতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। শেষ দিকে বীররস পরিবেশন করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ কাব্য রচনার সময়ে তিনি তাই একাধিক বার রাজনারায়ণকে লিখেছেন: 'আর বীররস নয়। রোম্যান্টিক এবং লিরিক কাব্যের বিরাট সম্ভাবনা আছে আমাদের সাহিত্যে। অতঃপর সেদিকে পা বাড়াবো।'[১৮৮] কবি তাঁর সংকল্প থেকে সরে যাননি। *মেঘনাদবধের* পর তিনি আর কোনো দিন পুষ্পক রথে চড়ে যুদ্ধযাত্রা করেননি। এমন কি, একটু পরে দেখতে পাবো, *বীরাঙ্গনাকাব্যে* বীর নারীদের কথা লিখলেও সে কাব্যের মূল সুর নিতান্তই রোম্যান্টিক এবং তা বিষাদে আচ্ছন্ন।

মেঘনাদবধকাব্য লিখতে অতো সময় লাগায় কবি মাঝেমধ্যে অন্য দিকে তাকিয়েছেন। যেমন, পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে লিখেছিলেন *কৃষ্ণকুমারী নাটক*। তা ছাড়া, *ব্রজাঙ্গনার* বেশির ভাগ পদও তিনি এ সময়ে রচনা করেছিলেন। আর রচনা করেছিলেন, বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম সনেট। ছাত্রজীবনেই তিনি ইংরেজিতে বেশ কতোগুলো সনেট লিখেছিলেন। *মেঘনাদবধ* লেখার সময়ে তাঁর মনে হয়েছিলো, বাংলা ভাষায়ও সনেট প্রবর্তন করা সম্ভব। তারপর প্রথম সনেটটি লিখে তাঁর মনে হলো যে, বাংলা ভাষায় কেবল সনেট লেখা সম্ভব নয়, বরং তাঁর মতো প্রতিভাবান লোকেরা সনেটের চর্চা করলে বাংলা সনেট ইটালিয়ান সনেটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।[১৮৯]

তিনি যে-বিষয়ে তাঁর প্রথম সনেট লিখেছিলেন, সে তাঁর একান্ত অন্তরের কথা। এক সময়ে তিনি সত্যি সত্যি মনে করতেন, বাংলা ভাষা শেখার অযোগ্য। সে সময়ে তিনি সজ্ঞানে বাংলা ভাষা ভুলে

যাবার জন্যেও তিনি কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন খানিকটা সফল করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর অবহেলিত বাংলা ভাষার মাধ্যমে। *শর্মিষ্ঠা* প্রকাশের সময় থেকে যে-জয়যাত্রায় তিনি বেরিয়েছিলেন, *মেঘনাদবধে* এসে তাঁর মনে হলো, তিনি সে পথের শেষে পৌঁছে গেছেন। অন্তত তিনি এ সময়ে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই আত্মপ্রসাদের কেলাসিত প্রকাশই আলোচ্য সনেটটিতে — *কবি-মাতৃভাষায়:*

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?

এ কবিতায় কবি তাঁর দুটি ভ্রান্তির কথা বলেছেন — অর্থলোভ আর তার জন্যে দেশে দেশে ভ্রমণ। মাদ্রাস-যাত্রা কি তা হলে অর্থলোভে? কিন্তু মনে হয়, এটা নিতান্তই কথার কথা। আসলে তিনি তাঁর ভ্রান্তি এবং মরীচিকার পেছনে জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় করার জন্যে নিজের প্রতি ধিক্কারই দিতে চেয়েছেন। তিনি যে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা না-করে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই ভ্রান্তিকে তিনি বড়ো করে দেখেছিলেন। বছর চারেক পরে তিনি যখন কবিতাটি আবার নতুন করে লেখেন, তখন তাঁর উপলব্ধি আরও গভীর হয়েছে। অর্থলোভের চেয়ে তখন ভাষার প্রশ্নটা তাঁর মনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তখন সে জন্যে লিখেছিলেন,

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন; -
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

এখানে সরাসরি অর্থলোভের কথা বলেননি। বরং পর-ধন-লোভ বলে একই সঙ্গে সাহিত্য এবং অর্থের অনুষঙ্গ দিতে পেরেছেন। কবিতার শেষেও

পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

— বলে অর্থলোভের বদলে সাহিত্য-যশের দিকেই বিশেষ করে ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভার্সাইতে লেখা সংশোধিত সনেটটি ছন্দের সাবলীলতা, ভাষার মাধুর্য এবং, সর্বোপরি, আন্তরিকতায় বেশি সুন্দর হয়েছে। কিন্তু তাই বলে প্রথম সনেটটিকে কোনোক্রমে কম সফল বলে মনে হয় না। বস্তুত, ১৮৬০ সালে *মেঘনাদবধ* রচনার সময়েই তিনি সনেট লেখা পরিকল্পনা করেন এবং তাতে সাফল্য লাভ করেন, যদিও তখনই আরও সনেট লেখেননি, বা লিখতে পারেননি।

মেঘনাদবধ শেষ করে কবি আত্মতৃপ্তির একটা নিশ্বাস ফেলেছিলেন। মনে হয়, তিনি নিজেকে নিয়ে

খুশি হয়েছিলেন। 'একখানা ট্র্যাজেডি, একটি পদাবলী সংকলন আর একটি সত্যিকার মহাকাব্যের অর্ধেক — কি বলো বন্ধু, এক বছরের মধ্যে — এবং সে বছরেরও মাত্র অর্ধেক হয়েছে — কি যথেষ্ট নয়? আমি যদি অন্য কিছুর জন্যে কোনো কৃতিত্ব দাবি করতে না-পারি, অন্তত একটা পরিশ্রমী কুকুর হিশেবে প্রশংসা পেতে পারি, তাই না?' — রাজনারায়ণকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন।[১১০] *মেঘনাদবধ* শেষ করে তিনি একদিকে যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন, তেমনি অন্য দিকে একটা সংকটে পড়েন। সংকট — অতঃপর তিনি কী করবেন, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তহীনতার। রাজনারায়ণকে তিনি এ সময়ে একাধিকবার এ বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এইমাত্র যে-চিঠিটি উল্লেখ করলাম, সেটি তিনি লিখেছিলেন *মেঘনাদবধ* শেষ করে; মহররমের ঠিক পরে। 'আমি সবেমাত্র মহররমের হৈচৈ থেকে কাটিয়ে উঠেছি।' সে বছর মহররম হয়েছিলো ১৯ জুলাই। লেখার সুনির্দিষ্ট কোনো কিছু নেই, সে জন্যে তিনি ভাবছিলেন, কী নিয়ে লেখা যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে মহররম দেখে তাঁর মনে হলো: 'মুসলমানদের মধ্যে যদি কোনো বড়ো কবির জন্ম হয়, তা হলে তিনি হোসেন এবং তার ভাই-এর মৃত্যু নিয়ে চমৎকার একটা মহাকাব্য রচনা করতে সক্ষম হবেন। আর সেই বিষয়ের প্রতি তিনি সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের আগ্রহও জাগিয়ে তুলতে পারবেন। আমাদের (অর্থাৎ হিন্দুদের) এ রকমের কোনো বিষয় নেই।'[১১১] (কয়েক বছর পরে মীর মশাররফ হোসেন গদ্যে এ কাহিনী লিখে যে-জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তা কবির দূরদৃষ্টি এবং বিচারবোধের প্রমাণ দেয়।)

মহররম নিয়ে তিনি নিজে কাব্য লেখার কথা অবশ্য ভাবেননি। কারণ, তিনি মুসলিম সংস্কৃতি সম্পর্কে অতো ভালো জানতেন না। বা মুসলিম সংস্কৃতি থেকে নেওয়া একটা বিষয় তাঁর মধ্যে অতোটা আন্তরিক আবেগও জাগাতে পারতো কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু মুসলমানদের বিষয় নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা দরকার, এটা তিনি বেশ জোর দিয়ে একাধিকবার বলেছিলেন। মাদ্রাসে তিনি যখন *Rizia* রচনা করছিলেন, তখনকার কথা আলোচনা করার সময়েও আমরা এটা লক্ষ্য করেছি। মুসলমান নামের বিরুদ্ধে হিন্দু সাহিত্যিক এবং পাঠক মহলে যে-বিরূপ মনোভাব ছিলো, তা দূর করা প্রয়োজন, তিনি সে কথাও বলেছেন। তাঁর চিন্তাধারা কতোটা সঠিক সে প্রশ্নে না-গিয়েও বলতে পারি যে, তাঁর বিবেচনায়, জাতি হিশেবে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি তেজী এবং তাঁদের মহিলারাও অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। সুতরাং তাঁদের নিয়ে নাটকীয় সংঘাতপূর্ণ সাহিত্য রচনা সম্ভব।[১১২] কবির এতো আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, তিনি অবশ্য মুসলমানী বিষয় নিয়ে কিছু রচনা করতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে কারণটা আপাতদৃষ্টিতে তাঁর নিজস্ব নয়। আসলে, তিনি কিছুতেই তাঁর বন্ধুদের এ বিষয়ে রাজি করাতে পারেননি। তবে তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, তিনি *মেঘনাদবধ* রচনার সমকালে রিজিয়াকে নিয়ে একটি কাব্যনাট্য লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। বিলেত থেকে ফিরেও নাকি তিনি তৃতীয় বারের মতো *Rizia* লেখার কথা ভেবেছিলেন।

মেঘনাদবধ রচনার কাজ যখন শেষ হবার পথে, তখন তিনি লিরিক লেখার কথা চিন্তা করেছিলেন এবং সে সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে চিঠি লিখেছিলেন — আমরা আগেই তা উল্লেখ করেছি। এখন জুন মাসের (১৮৬১) শেষ দিকে *মেঘনাদবধের* নবম সর্গ ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়ে, তিনি *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* জন্যে একটি কবিতা রচনা করেন। বলা হয়, এ কবিতা লেখার অনুরোধ এসেছিলো সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে।[১১৩] তখন সত্যেন্দ্রনাথের বয়স ঠিক উনিশ বছর। সারদাপ্রসাদের মাধ্যমে কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়া অসম্ভব নয়। সে যাই হোক, সত্যেন্দ্রনাথ নাকি কবির কাছে চেয়েছিলেন একটি ব্রহ্মসঙ্গীত। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার অব্যবহিত পরে কিছু কাল ছাড়া, কোনো দিনই ধর্মে মাইকেলের উৎসাহ প্রবল ছিলো না। ফরমাইশি রচনা — বিশেষ করে ব্রহ্মসঙ্গীতের মতো ফরমাইশি রচনা লিখতে তিনি তৈরিও ছিলেন না। তিনি লিখলেন, তাঁর হৃদয়-মোচড়ানো

ঘনীভূত আবেগের একটি লিরিক — *আত্মবিলাপ*। এই কবিতা লেখার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই তিনি রাবণের বিলাপ লিখেছিলেন। সেই বিলাপ তাঁকে *আত্মবিলাপ* লেখার ধারণা দিয়েছিলো, নাকি মনে মনে তিনি নিরন্তর যে-আত্মবিলাপ করছিলেন, যে-পাপবোধ তাঁকে অনুক্ষণ তুষানলে দগ্ধ করছিলো, তা-ই রাবণের বিলাপ লেখায় তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলো, বলা মুশকিল। আমার ধারণা, উভয়ই উভয়কে প্রভাবিত করেছিলো। রাবণের বিলাপে যে-অসাধারণ আন্তরিকতা এবং আবেগ লক্ষ্য করি, নিজের হৃদয়ে তুলনীয় অনুভূতি না-থাকলে, তা লেখা কঠিন হতো। রাবণের যে-শোক দেখতে পাই, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে যে পতনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, তার পেছনে তাঁর কোনো পাপ রয়েছে, এটা তাঁর জানা ছিলো, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কোন পাপ — সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিলো না। সীতাহরণ করে তিনি যে অন্যায় করেছেন, এটা তিনি মনে করতে পারেননি। তাঁর মূল্যবোধ দিয়ে সূর্পণখার অপমানের প্রতিকার করার জন্যে তিনি যা করেছেন, তাকে তিনি পাপ বলে গণ্য করতে পারেননি। অপর পক্ষে, *আত্মবিলাপ* লেখার সময়ে ভালো করে জানতেন তিনি কী 'পাপে'র শাস্তি পাচ্ছেন।

আত্মবিলাপ রচনার সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিলো মাত্র ৩৭ বছর। বয়স হয়ে যাচ্ছে, অমূল্য আয়ু অকারণে নষ্ট হচ্ছে — এসব কথা ভাববার সময় তখনো তাঁর আসেনি। বরং ততোদিনে *তিলোত্তমাসম্ভব* এবং *মেঘনাদবধ কাব্য* প্রকাশের মাধ্যমে ছোটোবেলা থেকে বড়ো কবি হওয়ার এবং কবি হিশেবে যশ লাভের যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা অনেকাংশে চরিতার্থ হয়েছে। নিজে বলেছেন, বাংলা ভাষার প্রথম সত্যিকার কাব্য তিনিই লিখেছেন। তদুপরি, বাড়তি খ্যাতিও পেয়েছেন অলীক কুনাট্যরঙ্গের বদলে *শর্মিষ্ঠা*, *পদ্মাবতী* এবং *কৃষ্ণকুমারী* নাটক আর দুটি প্রহসন রচনা করে। এসব নাট্যরচনা যে তাঁকে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকে পরিণত করেছিলো, উচ্ছ্বসিতভাবে তাও বন্ধুকে লিখেছিলেন। সত্যি বলতে কি, তখনকার কলকাতার বাঙালি সমাজে তাঁর চেয়ে বহু গুণ আয় করতেন অনেকে, বড়ো বড়ো পদে অধিষ্ঠিতদের সংখ্যাও কম ছিলো না; কিন্তু এখন এক শতাব্দী পরের মূল্যমানেই নয়, সমকালীন বিচারেও তাঁরা কেউ মাইকেলের ধারে-কাছে যেতে পারতেন না। তিনি বাঙালি সমাজে একটি বিশিষ্ট আসন দখল করে নিয়েছিলেন।

কেবল তাই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও, কৈশোর থেকে নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করার যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাতেও সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের, এমন কি, বিশপস কলেজের আমলেও তিনি খাঁটি ইংরেজ ললনা অথবা শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেছিলেন কিনা, সন্দেহ করি। কারণ, তখনো অবধি কোনো বাঙালি পুরুষ কোনো ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেননি। কিন্তু ১৮৬১ সালে *আত্মবিলাপ* লেখার অনেক আগেই তিনি একটি শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সে বিয়ে ভেঙে যাবার পর ঘর করছিলেন আর-একজন শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে। মোট কথা, পছন্দ করে বিয়ে করার যে-স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা সফল হয়েছিলো।

তাঁর আর এক স্বপ্ন ছিলো অনেক টাকাপয়সার, অর্থস্বাচ্ছন্দ্যের। মাদ্রাসে তাঁর যথেষ্ট টানাটানির পর ১৮৬১ নাগাদ তাও অংশত সফল হয়েছিলো। পুলিশ কোর্টের লিগ্যাল ক্লার্ক হিশেবে মাসিক বেতন ১২৫ টাকা ছাড়াও বইপত্র থেকে তাঁর বাড়তি আয় ছিলো। কিন্তু, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, *আত্মবিলাপ* লেখার আগে সম্পত্তি নিয়ে যে-চারটি মামলা চলছিলো, তার তিনটির ফয়সালা হয়। একটিতে জয়ের ফলে তাঁর বাৎসরিক আয় আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা বেড়ে যাবে, খুশি হয়ে তিনি তা বন্ধুকে লিখেছিলেন।[১২৪] তা ছাড়া, খিদিরপুরের বাড়িও তিনি ফিরে পেয়েছিলেন। এমন কি, মায়ের অলঙ্কার বাবদে পেয়েছিলেন ১৩০০ টাকা।[১২৫] সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর্থিকভাবে তেমন লাভবান হননি, কিন্তু তুলনামূলক অর্থস্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। মোট কথা, তাঁর সারা জীবনের

পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তাঁর জন্যে ১৮৬১ সাল ছিলো বেশ সুখের সময়। প্রেম, অর্থস্বাচ্ছন্দ্য এবং যশ লাভ, এই তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি তখন কমবেশি সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেই আপাত সুখের সময়ে তিনি *আত্মবিলাপ* লিখেছিলেন। এবং এতে তিনি তিনটি বিষয়ের জন্যে হাহাকার করেছেন, প্রেম, অর্থ আর যশোলাভ। বলেছেন, এই তিন মুক্তার লোভে তিনি শতমুক্তাধিক আয়ু ক্ষয় করেছেন। এ কবিতার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার সুর আছে যে, একে অকারণ দুঃখবিলাস বলে মনে করা শক্ত। তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ সময়ে এই অকাল হাহাকারের কারণ কী? এক কথায় এর উত্তর হলো, ব্যক্তিজীবনে, আরও পরিষ্কার করে বললে, পারিবারিক জীবনে তাঁর অন্তহীন অনুতাপ আর হতাশা থেকেই তিনি এ কবিতা রচনা করেছিলেন।

মাদ্রাস পর্বের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না-থাকলেও, তাঁর পারিবারিক জীবন বেশ সুখের এবং পরিতৃপ্তির ছিলো। রেবেকার প্রতি তাঁর ভালোবাসার গভীরতা কতোটা ছিলো, তার আভাস পেয়েছি *The Captive Ladie*-র আলোচনা প্রসঙ্গে। সন্তানের জন্মে তাঁর উচ্ছ্বাস এবং চিঠিপত্র ও কবিতায় পরিবার সম্পর্কে তাঁর প্রশান্ত তৃপ্তির কথা থেকেও তাঁর সুখী জীবনের খবর মেলে। রেবেকাও কবিকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন বলে ধারণা করি। সবার বিরোধিতার মুখে তিনি মাইকেলের মতো একজন চালচুলোহীন, আত্মীয়সহায়হীন কৃষ্ণাঙ্গকে বিয়ে করেছিলেন। এবং বিয়ে করে রীতিমতো নজির স্থাপন করেছিলেন। বিয়ের পরে তিনি দারিদ্র্য, রুগ্নতা, পরপর সন্তানধারণ, স্বামীর বোহীমিয়ান জীবনযাত্রা, সবকিছুই সহ্য করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রেবেকাও মানুষ হয়েছিলেন তুলনামূলকভাবে স্নেহহীন পরিবেশে। সুতরাং কবির ভালোবাসা পেয়ে তিনি আর সবকিছু তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন। স্ত্রীকে নিয়ে কবি মাদ্রাসে কপোত-কপোতীর মতো প্রেমঘন নীড় গড়ে তুলেছিলেন।

তারপর মাদ্রাস ত্যাগের পর থেকে সেই পরিবারের সঙ্গে চিরদিনের মতো তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় একজন স্ত্রী যতোটা আহত হয়, রেবেকা তার চেয়ে স্বভাবতই বেশি আহত হয়েছিলেন। তা ছাড়া, হেনরিয়েটার সঙ্গে গোপন প্রণয়ের খবর প্রকাশিত হওয়ায়, কবি কেবল রেবেকার কাছে বিব্রত হননি, অতি-ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের চোখেও ছোটো হয়ে যান। মনে রাখা দরকার, এই বন্ধুরাই তাঁকে বিয়ে করতে সাহায্য করেছেন, চাকরি পেতে সাহায্য করেছেন, কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও শ্বেতাঙ্গ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করেছেন। নেইলর, নর্টন, কেনেট (জুনিয়র), সেলাফেন্ট, এমনি কয়েকজন বন্ধুর নাম। এখন নিজের স্ত্রীর প্রতি তাঁর প্রবঞ্চনার খবর প্রকাশিত হওয়ায়, তাঁর আর মুখ দেখানোর, অন্তত মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর উপায় ছিলো না। সে জন্যে তিনি কোনোদিন, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও, আর মাদ্রাসে ফিরে যেতে পারেননি — যদিও কলকাতায় আসার পরে রেবেকার সঙ্গে একটা আপোশ করার চেষ্টা হয়েছিলো বলে মনে হয়। আমার ধারণা, রেবেকা এবং সন্তানদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ না-থাকলেও দুই পক্ষ একে অন্যের খবর রাখতো। পরের আলোচনায় দেখা যাবে, কবির মৃত্যুর পরেও মাদ্রাসের সন্তানরা কেমন করে তাঁর ব্যারিস্টার-পরিচয় নিয়ে গর্ব করেছে।[১১৬] রেবেকার সঙ্গে আপোশ হতে পারে — এ জন্যে কবি অন্তত দু বছর অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ১৮৫৮ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যখন রেবেকার সঙ্গে তাঁর কোনো সমঝোতা হলো না, তখন তিনি কলকাতায় আসার আহ্বান জানান হেনরিয়েটাকে।

প্রথম দিকে হেনরিয়েটার সঙ্গে নতুন সংসার পেতে তিনি রঙিন নেশায় বুঁদ হয়ে সময় কাটিয়েছিলেন — এমনটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। কিন্তু হেনরিয়েটার সঙ্গে মিলনে প্রমত্ত হলেও, রেবেকার প্রতি তাঁর ভালোবাসা চলে গিয়েছিলো, এমনটা মনে করার কারণ নেই। তা ছাড়া, সন্তানবৎসল কবি

কী করে একটি-দুটি নয়, চারটি সন্তানের কথা ভুলে যাবেন? তার ওপর, ১৮৫৮ সাল থেকে আড়াই বছর নিরবচ্ছিন্ন নৈকট্যের পরে, তাঁর নেশা হয়তো ফিকে হয়েছিলো। সেই পর্যায়ে তিনি *বিলাপ* করতে আরম্ভ করেন। হেনরিয়েটার গর্ভে তাঁর প্রথম যে-সন্তান জন্মেছিলো, *আত্মবিলাপ* লেখার আগে সেই শর্মিষ্ঠার বয়স হয়েছিলো প্রায় পৌনে দু বছর। আর দ্বিতীয় সন্তান ততো দিনে হয় জন্মেছে, নয়তো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তার জন্ম নেবার কথা। কিন্তু তারই মধ্যে অতীতের স্মৃতি তাঁকে একেবারে মন্থন করেছে। বিশেষ করে অপরাধবোধে তিনি একেবারে কাতর এবং বিহ্বল হয়েছেন।

তিনি যখন মাদ্রাস ত্যাগ করেন, তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিলো না। সহায়হীন স্ত্রী এবং চারটি শিশুকে বলতে গেলে অকূলে ভাসিয়ে তিনি কলকাতা যাত্রা করে যে-অপরাধ এবং চরম নিষ্ঠুরতা করেছিলেন, সে সম্পর্কে একজন স্পর্শকাতর মানুষ হিশেবে তিনি নিজেও ষোলো আনা সচেতন ছিলেন। তাঁর সারা জীবনের ঘটনাবলী, এমন কি, তাঁর রচনাবলী সাক্ষ্য দেয়, তিনি হৃদয়হীন ছিলেন না। নিশ্চয় অপরাধবোধ এবং অনুশোচনার তুষানলে তিনি দগ্ধ হচ্ছিলেন। তদুপরি, তিনি যেহেতু তাঁর এই কীর্তির কথা কারো সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেননি, সে জন্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি আরো বেশি করে বিধ্বস্ত হয়েছেন। এ সময়ে যদি তিনি কারণবারি পানের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন, তা হলে আশ্চর্য হবার কারণ নেই।

বলা বাহুল্য, *আত্মবিলাপ* লেখার প্রেরণা কবি পেয়েছিলেন একেবারে অন্তরের অন্তস্তল থেকে। এ কবিতায় তাঁর ঐকান্তিক হতাশা এবং অপরাধবোধ, এমন কি, পাপবোধ নির্ভুলভাবে চোখে পড়ে। *আত্মবিলাপ* লেখার সময় পর্যন্ত অর্থলোভে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন — এমন কথা বলার কারণ ছিলো না। বরং ইংল্যান্ড যাত্রা করার পরে এ কথা বললে তা প্রাসঙ্গিক হতো। যশোলোভে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন, সে কথাও এ পর্যায়ে আদৌ প্রযোজ্য নয়। কিন্তু

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!

এ কথা তিনি সে পর্যায়ে আন্তরিকভাবেই অনুভব করেছিলেন। খৃস্টান হয়ে তিনি সে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতেন, তা নয়। ধর্মে তাঁর বিশ্বাসও অটল ছিলো না। কিন্তু খৃস্টানদের সনাতন পাপবোধ তাঁকে বেশ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো বলে মনে হয়। *আত্মবিলাপ* লেখার সমকালে কেবল রাবণের মুখে নয়, *মেঘনাদবধ* এবং *বীরাঙ্গনা কাব্যের* বহু চরিত্রের মুখেই পাপের ফল ভোগ করার কথা শুনতে পাই। *আত্মবিলাপেও* ঘটেছে অংশত সেই পাপবোধের প্রতিফলন।

নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের প্রসঙ্গ ছাড়া, প্রথম যৌবনে তিনি যে অংশত কবি হবার আশায়, অংশত আয়োজিত বিয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং অংশত বিলেত যাবার পথ প্রশস্ত হবে মনে করে [সাধিতে মনের সাদ] খৃস্টান হয়ে বাবা-মাসহ সমস্ত আপন জনকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন তার জন্যেও তাঁর মনে কি কোনো অপরাধবোধ এবং অনুশোচনা ছিলো না? শুধু বাবা-মাসহ নিজের পরিবারকে হারানো নয়, সত্যি বলতে কি এই এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি নিজের শেকড়ও ছিন্ন করেছিলেন আজন্মের একান্ত আপন প্রতিবেশ থেকে। তার জন্যেও কি তিনি অপরাধ বোধ করেননি? প্রকৃত পক্ষে, অসামান্য হতাশা এবং নিঃসঙ্গতা থেকেই তিনি *আত্মবিলাপ* লেখেননি, বরং তিনি যে পাবকশিখার মতো হেনরিয়েটার মোহে তাঁর সব আপনজনদের থেকে যোজন যোজন দূরে সরে

গিয়েছিলেন — এই নিদারুণ দুঃখ, পাপ- এবং অপরাধ-বোধ থেকেই এক অসাধারণ আবেগের মুহূর্তে অমন মর্মভেদী বিলাপ করেছিলেন। পাছে এই আর্তনাদে কোনো রকম কৃত্রিমতা দেখা দেয় সে জন্যেই কি তিনি সদ্য-উদ্ভাবিত বিদগ্ধ অমিত্রাক্ষর বর্জন করে সনাতন সরল ত্রিপদীর ছন্দে এ বিলাপ প্রকাশ করেছিলেন? অসম্ভব নয়। সত্যি সত্যি, *আত্মবিলাপ* তাঁর এক অতি অসাধারণ আন্তরিকতাপূর্ণ আত্মজৈবনিক রচনা। কয়েক বছর পরে ভার্সাইতেও নিজের মনের কথা বলার একটা ঝোঁক এসেছিলো তাঁর জীবনে, কিন্তু তখনকার নস্টালজিয়াপূর্ণ সনেট আর কলকাতায় বসে লেখা এই বিলাপে আসমান-জমিন ফারাক। শুধু বক্তব্য এবং রসের পার্থক্য নয়, *আত্মবিলাপ* আর সনেটের ভঙ্গিও আলাদা।

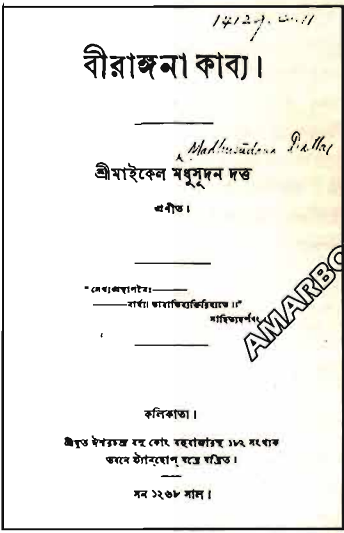
মেঘনাদবধের পর *আত্মবিলাপের* মতো একটি উল্লেখযোগ্য খণ্ড কবিতা লিখলেও, কবি তখন মনঃস্থির করে উঠতে পারেননি, অতঃপর তিনি কী লিখবেন। রাজনারায়ণ সিংহলবিজয়ের যে-কাহিনী সরবরাহ করেছিলেন, তাকে বেশ ভালো মনে হলেও, শেষ পর্যন্ত এই কাহিনী তাঁর মনে কোনো আবেগের সৃষ্টি করেনি। যে-কাহিনী সাধারণ মানুষের কাছে অজানা, সে কাহিনী নিয়ে লেখা মহাকাব্য কতোটা জনপ্রিয় হবে, সে বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় ছিলো। সে জন্যে *সিংহলবিজয়ের* পরিকল্পনা করলেও অথবা তার প্রথম ২৪ পঙ্‌ক্তি লিখে ফেললেও, তা নিয়ে তিনি সিংহলের দূর পথে যাত্রা করতে পারেননি। লিরিক কবিতা লেখার কথাও ভেবেছিলেন একাধিক বার। কিন্তু *মেঘনাদবধ* লেখা শেষ করার কয়েক সপ্তাহ পরে রাজনারায়ণকে এক চিঠিতে নিজেই আবার বলেছেন, মাঝেমধ্যে তিনি কেবল একটা-আধটা লিরিক কবিতা আর সনেট লিখবেন — এটা তিনি ভাবতে পারছেন না।[১১৭] এ সময়ে গদ্যে লেখার কথাও তাঁর মাথায় এসেছিলো। মোট কথা, বিষয়বস্তু নির্বাচন নিয়ে তিনি অন্তত মাস তিনেক একটা সংকট এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন।

তদুপরি, দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দেবার পরে হেনরিয়েটার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তিনি তা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন এবং বিপদগ্রস্ত হন। বোঝা যায়, ওষুধপত্র খাওয়ানো থেকে আরম্ভ করে চিকিৎসকদের কথামতো তিনি কোনো কিছু করতেই বাকি রাখেননি। পরের বছর ফেব্রুআরি মাসে রাজনারায়ণ বসুকে যে-চিঠি লেখেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, হাওয়া বদলের জন্যে তিনি হেনরিয়েটাকে নিয়ে নৌকোয় ছিলেন কিছুদিন। সম্ভবত এই সময়ে তিনি যশোরে যান। তারপর যান বর্ধমানে। বর্ধমানে যান স্থলপথে। হেনরিয়েটার স্বাস্থ্য খানিকটা ভালো হবার পর, নিশ্চিন্ত কবি আবার সাহিত্যসেবার জন্যে মনে মনে তৈরি হলেন। 'বন্ধু, এবারে আমি আবার তোমাদের সেবায় নিজেকে দেবার জন্যে প্রস্তুত।'[১১৮]

বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু কাল ঠিক মনঃস্থির করতে না-পারলেও, একটা বিষয় সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিলো না — সে হলো: আর বীররসের কবিতা তিনি লিখবেন না। যদিও এ পথে সাফল্য এসেছিলো প্রত্যাশারও বেশি। '*তিলোত্তমা* আর *মেঘনাদই* যথেষ্ট।' তা ছাড়া, করুণ রস সৃষ্টিতে তিনি যে স্বাভাবিক সাফল্য দেখাতে পারছিলেন, সেটাও তিনি বিবেচনা করেন। 'নিজেই জানতাম না আমি এতো করুণ রসের অধিকারী।' '*মেঘনাদ, কৃষ্ণকুমারী*, লক্ষ্মণের জন্যে রামের বিলাপ, স্বামীর জন্যে প্রমীলার বিলাপ ইত্যাদির জন্যে অনেককে চোখের জল ফেলতে হবে।'[১১৯] এমন কি, তাঁর নিজের বিলাপও কিছু কম আন্তরিক ছিলো না।

কি নিয়ে লেখা যায়, তা ভাবতে ভাবতে এক সময়ে কোনো রকমের ঢাক-ঢোল না-পিটিয়ে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন একটি নতুন কাব্য। *সিংহলবিজয়* নয়, তার বদলে লিখে ফেলেন *বীরাঙ্গনা*। তিনি নীরবে এই কাব্য লেখার কারণ বিশ্লেষণ করার আগে এর বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের দিকে নজর দেওয়া যাক। আপাতদৃষ্টিতে তিনি *বীরাঙ্গনার* পত্রাবলী রচনা করেন রোমান কবি ওভিদের (পুরো নাম Publius Ovidius Naso) *Epistulae Heroidum* কাব্যের অনুকরণে। খৃস্টের জন্মের অব্যবহিত

পরে রচিত এই কাব্যে ওভিদ পত্রাকারে কয়েকজন নায়িকার প্রেমের কথা প্রকাশ করেছিলেন। আঙ্গিকের দিক দিয়ে চিঠি হলেও, আসলে এগুলো অনেকটা নাটকীয় স্বগতোক্তির মতো। মাইকেল ওভিদ থেকে নিয়েছিলেন দুটি জিনিশ — কাব্যের মূল বিষয়বস্তু প্রেম আর পত্রের আঙ্গিক। কিন্তু তিনি এর মালমশলা জোগাড় করেছিলেন ভারতীয় পুরাণ থেকে। তিনি বেছে নেন পুরাণ থেকে কয়েকটি বিখ্যাত নারী চরিত্র। এই পত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এসব চিঠিতে আছে এই নারীদের অভিমান আর অনুযোগের কথা। কাব্যের নাম *বীরাঙ্গনা* হলেও এই নারীরা কেউই বীররসে উদ্দীপ্ত হয়ে এইসব পত্র লেখেননি। আর কবিও বীররসে ভেসে মহাগীত পরিবেশন করার জন্যে এ কাব্য রচনা করেননি। আসলে এ কাব্যে তাঁর নিজের পুরোনো প্রেম এবং গভীর অপরাধ-বোধের নির্ভুল প্রমাণ মেলে। তিনি কয়েক মাস আগে যে-*আত্মবিলাপ* লিখেছিলেন রেবেকা এবং সন্তানদের প্রতি তাঁর অপরাধবোধ থেকে, এ কাব্যের উৎস নিহিত আসলে সেখানেই। *আত্মবিলাপে* তিনি নিজের দিকটা লিখেছিলেন, কিন্তু *বীরাঙ্গনায়* তিনি লেখেন রেবেকা যা বলতে পারতেন, সে কথা। এই থীম একান্তভাবে তাঁর নিজের। সে জন্যেই তিনি এ কাব্য লেখার আগে এ নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলেননি। এ *আত্মবিলাপেরই* সম্প্রসারণ।


বীরাঙ্গনা কাব্য।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

[illegible]

সাহিত্যদর্পণঃ

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৬৮ সাল।

বীরাঙ্গনার নামপত্র

যেহেতু নিজের অন্তর থেকে এ কাব্য লেখার ধারণা এবং উৎসাহ পেয়েছিলেন, সে জন্যে একবার লিখতে আরম্ভ করার পরেই পাল-তোলা নৌকোর মতো সে লেখা এগিয়ে চললো তরতর করে। সংসারের ঝামেলা শেষে সাহিত্যচর্চার জন্যে তিনি এখন তৈরি — রাজনারায়ণকে এ কথা লেখার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে তিনি এ কাব্য লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। আলোচ্য চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, ততোদিনে তাঁর পরিকল্পিত মোট একুশটি পত্রের মধ্যে এগারোটি লেখার কাজ শেষ করে তিনি তা ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঠিক এই সময়ে সংশোধিত *তিলোত্তমাও* পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

বীরাঙ্গনার প্রথম এগারোটিতে তিনি যেসব পত্র রচনা করেছেন সেগুলো হলো দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কেকয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা, অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী আর নীলধ্বজের প্রতি জনা। সবগুলো চিঠিই মহিলাদের, তাঁদের স্বামী অথবা প্রেমিকের কাছে লেখা — এ ছাড়া, আপাতদৃষ্টিতে এসব পত্রের মধ্যে কোনো মিল নেই। এক-একজন মহিলা এক-একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে এসব পত্র লিখেছেন। সমস্যা আলাদা, পাত্র-পাত্রী আলাদা। কিন্তু চিঠিগুলো পড়লে সহজেই মহিলাদের বক্তব্যে পুরোপুরি না-হলেও তাঁদের ভাবাবেগে একটা অখণ্ড

সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

এই মহিলারা তাঁদের পুরোনো প্রেমের এবং ক্ষেত্রবিশেষে সৌন্দর্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে নিজেদের অভিমান এবং অনুযোগের কথা বলেছেন। তাঁদের প্রধান অনুযোগ স্বামী/প্রেমিক তাঁদের কথা ভুলে গেছেন এবং/অথবা তাঁদের প্রতি অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। শকুন্তলা যেমন বলেছেন:

এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি,
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে?
এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কোন্ ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার এ উক্তি অবশ্যই যথার্থ। কিন্তু রেবেকা যদি কবিকে এ কথা বলতেন, তা হলে তা কি সমান প্রযোজ্য হতো না?

নিন্দে অনুসূয়া যবে মন্দ কথা কয়ে,
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়, — কি বল্যে
বুঝাবে এ দৌঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে?

অনুসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা নাম দুটি পাল্টে দিয়ে নেইলর, সেলাফেন্ট অথবা কেনেটের নাম ব্যবহার করলে এই পত্র রেবেকাও কি মাইকেলকে লিখতে পারতেন না? জীবনীর সঙ্গে রচনার যোগাযোগ বোঝাতে গিয়ে লিয়ন ইডেল বলেছেন যে, একজন ঔপন্যাসিক অথবা একজন নাট্যকার নানা ধরনের বহু চরিত্র অঙ্কন করেন। আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কোনো মিল থাকে না। কিন্তু ঐসব উপন্যাস এবং নাটকে বারবার যে-বক্তব্য এবং মূল বিষয়টি ফিরে ফিরে আসে, তার মধ্য দিয়ে লেখককে অভ্রান্তভাবে চোখে পড়ে।[২০০] *বীরাঙ্গনার* পত্রগুলো বিশ্লেষণ করলেও তেমনি নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে মাইকেলের হৃদয়। এবং সেটা কেবল শকুন্তলার বক্তব্য থেকে নয়, কমবেশি এগারোটি চিঠি থেকেই। এমন কি, অসমাপ্ত চিঠিগুলোও কোনো ব্যতিক্রম নয়।

তারা সোমকে লিখেছিলেন:

যেদিন, — কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যেদিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ, — অতুল জগতে! -
যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে, — ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে!

রেবেকাও প্রথম পরিচয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মাইকেলকে এ কথা লিখতে পারতেন। অথবা 'হা ধিক, কি পাপে,/ হায়রে কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি / এ ভালে?' বলে আক্ষেপ করতে পারতেন। রুক্মিণীর অনুতাপ

স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, একজনে
কায় মনঃ ; ... — ক্ষম গুণনিধি! -
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে!
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে?

ভাগ্যদোষের কথা জনাও বলেছেন:

তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি

তুমি! কোন সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?

এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!

রেবেকাও একই ভাষায় তাঁর ভাগ্যদোষের কথা বলতে পারতেন। হয়তো বলেওছেন। তিনিও মাইকেলের সঙ্গে পরিচয়ের পর গভীরভাবে তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন এবং সব রকমের বাধাকে অগ্রাহ্য করে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। এমন কি, স্বামী মাদ্রাস ত্যাগ করার এক মাস আগেও তাঁর সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। সে কারণে এখন তাঁকে ত্যাগ করার জন্যে তিনি নিজেকে অন্তত দোষারোপ করতে পারছিলেন না। বরং বারবার নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করেছেন। রেবেকা কি কলকাতায় স্বামীর কাছে কোনো চিঠিপত্র লিখেছিলেন? তা জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু লিখলে শকুন্তলা, তারা, রুক্মিণী অথবা জনার মতো একই ভাষায় একই ভঙ্গিতে তিনি লিখতে পারতেন। রেবেকার চিঠি পেয়ে তা থেকে কবি কি সত্যি সত্যি অভিমানিনী এবং প্রবঞ্চিতা নারীর মনোভাব অনুভব করেছিলেন, নাকি তিনি কেবল কল্পনাই করতেন রেবেকা কী লিখতে পারতেন? — এ তথ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়: রেবেকা 'বীরাঙ্গনা'দের ভাষায় লিখলে তা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হতো না।

রেবেকা এবং কবির বিচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক মনে হয় দশরথের প্রতি কেকয়ী এবং অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর চিঠি দুটি। বিয়ের সময় রেবেকার বয়স ছিলো — আগেই লক্ষ্য করেছি — মাত্র ১৭। তারপর কবি মাদ্রাস ত্যাগ করার আগেই অল্প বিরতিতে তাঁর চার-চারটি সন্তান হয় এবং ততোদিনে তাঁর সৌন্দর্য অনেকাংশে হ্রাস পাওয়ারই কথা। কবি মাদ্রাস ত্যাগের সময় রেবেকার বয়স হয়েছিলো প্রায় ২৫। তারপর ১৮৬২ সালের শুরুতে তাঁর বয়স আরও ছ বছর বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কবি তখন পুরোনো প্রেমিকার চেহারাটা কেবল কল্পনা করে নিতে পারতেন। সেই কল্পনার রেবেকা লিখতে পারতেন:

না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে!
নহে গুরু উরুদ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব! নম্রশিরঃ এবে
উচ্চ কুচ! সুধাহীন অধর! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত; ***
কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি! -
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে! ***
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে; নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি; -
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে!

*

কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?

এ পর্যন্ত নিজের কথা। তারপরের কথাটা আরও প্রাসঙ্গিক, আরও গুরুত্বপূর্ণ:

কোন অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?

*

কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইলা মনঃ তব?

একমাত্র কৌশল্যা নামটা বদলে হেনরিয়েটা করে দিলে এ চিঠির নিচে রেবেকার স্বাক্ষর থাকা মোটেই অসঙ্গত হতো না। রেবেকা অবশ্য দ্রৌপদীর জবানিতেও লিখতে পারতেন।

যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে
দ্রৌপদী?

*

কবীশ্বর তুমি
গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে।

*

স্মরিয়া তোমারে,
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবানিশি।
পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি
স্মৃতিসৃতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী
পূর্ব্বের কাহিনী যত শুনি তার মুখে!

*

এ ছলনা; কহ, কি কারণে?
এস ফিরি, নররত্ন! কে কোথা বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী?

*

কি কাজ উত্তরে?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে!

যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা অথবা নলের প্রতি দময়ন্তীর পত্রেও প্রাসঙ্গিকতার অভাব নেই। কবি মাদ্রাস ত্যাগের তিন মাসের মধ্যে রেবেকা শিশুপুত্র এবং দু কন্যাকে নিয়ে (অন্য পুত্রটি ততো দিনে মারা গিয়েছিলো) যে অসহায় আশ্রয়হীন অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন, শর্মিষ্ঠার জবানির সঙ্গে তার বোধ হয় তেমন কোনো পার্থক্য ছিলো না।

দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা
কুরঙ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে!
হে রাজন্, শিশুত্রয় লয়ে নিজে সাথে
চলিল শর্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে রেখ তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?

রেবেকা রাজবালা ছিলেন না সত্য, কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনী এবং সে কালের পরিপ্রেক্ষিতে মাইকেলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব কম ছিলো না। তিনি যে কবিকে বিয়ে করেছিলেন, তার মধ্যে সাহসিকতা যেমন ছিলো, তেমনি ত্যাগও একেবারে কম ছিলো না। তিনি সঙ্গতভাবেই তাঁকে নিশ্চয় বলতে পারতেন -

বিজন বনে অৰ্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।

এই পত্রকাব্যের ধারণা ওভিদের কাছ থেকে পেলেও, ওভিদ আর মাইকেলের নায়িকাদের বক্তব্য এবং মনোবেদনা অভিন্ন নয়। তা ছাড়া, মাইকেল যাঁদের বেছে নিয়েছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে সেই নায়িকাদের মধ্যেও কোনো ঐক্য নেই। কিন্তু কবি অভিমান এবং অনুযোগের যোগসূত্র দিয়ে বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন অবস্থানের কয়েকজন ক্ষুব্ধ এবং বিরহিণী নারীকে সফলভাবে একটি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং আগের আলোচনা থেকে দেখা গেছে যে, এ কাব্য রচনার একটা প্রধান প্রেরণাই ছিলো আত্মজৈবনিক। মাদ্রাসে ফেলে-আসা তাঁর প্রথম প্রেমিকার সম্ভাব্য বিরহ, প্রবঞ্চনাজনিত ক্ষোভ এবং মর্মস্পর্শী বেদনা এ কাব্যের প্রায় প্রতিটি পত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। রেবেকার সীমাহীন ক্ষোভ এবং সন্তানদের প্রতি নিজের অবিচারের কথা কল্পনা করে কবি অপরাধ-বোধে জর্জরিত হতেন এবং নিজেকে নিজে আঘাত করতেন। রেবেকা এবং হেনরিয়েটা — এই দুই নারীর মাঝখানে পড়ে তিনি ছিন্নভিন্ন এবং বিপন্ন হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি এই সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষরের যাত্রা শুরু হয়েছিলো *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* দিয়ে। সমকালীন সমালোচকরা এ কাব্যের ছন্দকে সফল বলে মেনে নিয়েছিলেন। এক শতাব্দীর দূরত্ব থেকে এখন এই ছন্দের, বিশেষ করে কবির কিছু কিছু শব্দ প্রয়োগের মুদ্রাদোষ অথবা অন্য ধরনের খুঁত চোখে পড়ে। কিন্তু এই ছন্দকে অসাধারণ এবং প্রশংসনীয় বলে স্বীকার না-করে উপায় নেই। বস্তুত, যে-ভাষায় সেকালে চালু ছিলো দুটি মাত্র প্রামাণ্য ছন্দ — পয়ার আর ত্রিপদী, সে ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দকে একেবারে বিপ্লবাত্মক বিবেচনা না-করে পারা যায় না। *মেঘনাদবধে* এসে কবি এই ছন্দ এবং তাঁর শব্দ প্রয়োগকে আরও উন্নত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কবির ছন্দবোধ এবং শব্দ-নির্বাচন এতো দ্রুত উন্নত হচ্ছিলো যে, *মেঘনাদবধের* দ্বিতীয় খণ্ড লেখার সময়ে তিনি প্রথম খণ্ডের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছিলেন। আগেই বলেছি, এ সময়ে তিনি প্রথম খণ্ড পুরোপুরি সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি তা করার সুযোগ পাননি। এই ছন্দকে তিনি পরিমার্জনার মাধ্যমে নিখুঁত এবং পরিপূর্ণ করে তুলতে পেরেছিলেন *বীরাঙ্গনায়*। শব্দ ব্যবহারেও তাঁর একান্ত নৈপুণ্য লক্ষ্য করি এই কাব্যে। বিশেষ করে আভিধানিক শব্দের বদলে প্রতিদিনের জীবন থেকে তিনি বহু শব্দ সফলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। বস্তুত, ভাষা এবং ছন্দ সম্পর্কে তিনি এতো সচেতন শিল্পী ছিলেন যে, মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে *শর্মিষ্ঠা* থেকে *বীরাঙ্গনার* উৎকর্ষে পৌঁছেছিলেন। এক সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে এমন সমালোচনাও হয়েছিলো যে, তিনি অন্ত্যমিল দিয়ে কবিতা লিখতে পারেন না বলে অমিত্রাক্ষরে কবিতা লেখেন।[২০১] এই নিন্দুকদের জবাব দেবার জন্যেই যেন তিনি *ব্রজাঙ্গনা* লিখেছিলেন অন্ত্যমিল রেখে। এবং তাতে আধুনিক বাংলা কাব্যের সেই শৈশব অবস্থায় তিনি দেখিয়েছিলেন পঙ্‌ক্তি এবং স্তবক বিন্যাসে কতো বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। *বীরাঙ্গনায়* আমরা সকল পরীক্ষানিরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক সফল কবিকে দেখতে পাই। অতঃপর পাকা ফিস্ট নিয়ে তিনি যখন আঙ্গিক, ভঙ্গি এবং উপস্থাপনার দিক দিয়ে নবতর কাব্য উপহার দেবার জন্যে একেবারে প্রস্তুত, সেই মুহূর্তে হঠাৎ বিদায়ের বাঁশি বেজে উঠলো। তিনি যেমন হঠাৎ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বাংলা সাহিত্যের আসরে দেখা দিয়েছিলেন, তেমনি আকস্মিকভাবে সেই আসর ত্যাগ করার সংকল্প ঘোষণা করলেন। *বীরাঙ্গনা* প্রকাশিত হবার মাত্র চার মাসের মধ্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের কক্ষ থেকে ছিটকে পড়লেন অনেক দূরে। এর মাস আটেক আগেই তিনি রাজনারায়ণকে লেখা তাঁর সেই বিখ্যাত চিঠিতে বলেছিলেন, তিনি বাংলা

সাহিত্যের আসরে এক বিশাল ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হবেন।[২০২] ধূমকেতু বলার কারণ, সে বাঁধা পথে চলে না, উৎকেন্দ্রিকতা এবং আকস্মিকতা তার বৈশিষ্ট্য। এবং সেই আকস্মিকতায় সবাইকে চমকে দেওয়া এবং বিস্মিত করা তাঁর লক্ষ্য। তারপর আবার আকস্মিকভাবে তাঁর অন্তর্ধান হবে ঠিকই, কিন্তু ইতিহাসে তাঁর ব্যতিক্রমী আবির্ভাবের কথা লেখা থাকবে চিরদিন।

প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে? — এ কেবল রাবণের কথা নয়; রাবণের স্রষ্টা মাইকেল সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। যখন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার জন্যে সব আয়োজন একেবারে সম্পন্ন, সে সময়ে ভাগ্য তাঁকে ঠেলে দিলো সর্বনাশের দিকে। আশার ছলনে তিনি পা বাড়ালেন চোরাবালির পথে। তবে এ জন্যে তিনি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করতে পারেন না। তিনি সত্যি সত্যিই স্বকৃতভঙ্গ। তাঁর জীবনের মস্তো বড়ো একটা ট্র্যাজেডি এই যে, তিনি *আত্মবিলাপ* লেখার পর, তার মানে একবার নিজের ভুল বুঝতে পারার পর সংশোধনের পথে না-গিয়ে সত্যিকার আত্মহননের পথে পা বাড়ালেন। আগের আলোচনা থেকে দেখেছি, তখনো পর্যন্ত অন্তত অর্থলোভে তিনি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেননি। কিন্তু যখন সাফল্য দেখা দিতে শুরু করেছে, সাহিত্যক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত যশের ভাগীদার হতে আরম্ভ করেছেন, এমন কি, মামলা-মকদ্দমা শেষে আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে তিনি মায়াময় স্বর্ণমৃগ দেখতে পেলেন। যোগ-বিয়োগ করে দেখলেন হিশেব মিলে যাচ্ছে। কাঙ্ক্ষিত কবিযশ পেয়ে গেছেন, সচ্ছলতাও এক পা দূরে মাত্র। সত্যিকার ধনী হবার এতো বড়ো সহজ সুযোগ তিনি ছেড়ে দেবার কথা ভাবতে পারলেন না।

কম বেতনের চাকরি করতে গিয়ে কবি বারবার তাঁর ভাগ্যকে দোষারোপ করেছেন। একাধিক চিঠিতে তিনি এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। রাজনারায়ণ বসু একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: আইন আর কবিত্ব — এ দুটি একত্রে একেবারে অসাধারণ। এর উত্তরে তিনি লিখেছেন: 'অন্যরা আয় করবে আর আমি কেন বসে বসে অলস কবিতা লিখবো?'[২০৩] আর যে-কথাটা সরাসরি লেখেননি, কিন্তু খুব ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন, তা হলো: বহু অযোগ্য এবং অর্ধশিক্ষিত লোক তাঁর তুলনায় অনেক বেশি টাকাপয়সা আয় করছিলেন এবং সাধারণ লোকেরা তাঁকে নয় বরং তাঁদেরই বেশি খাতির করে। আগেই দেখেছি, এই ক্ষোভ থেকে তিনি ১৮৫৯ সালের জানুআরি মাসে আইন পরীক্ষা দেওয়ার সংকল্প নিয়েছিলেন। কিন্তু সে বছর এবং তার পরবর্তী দু বছর আইন পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। ফলে তাঁর উকিল হয়ে গাদা গাদা টাকা কামাই করার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়নি। এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ওকালতি পরীক্ষায় পাশ করলে তাঁর জন্যে সেটা মন্দের ভালো হতো। কারণ, তা হলে ব্যারিস্টার হতে গিয়ে এবং ব্যারিস্টার হয়ে তাঁর যে-চরম সর্বনাশ হয়েছিলো, তা বোধহয় হতো না। সাহিত্য সৃষ্টিতে বিঘ্ন হতে পারতো, কিন্তু শেষ জীবনে দারিদ্র্য এবং রোগ ভোগের যে-অসাধারণ অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিলো, তা হতো বলে মনে হয় না।

এক সময়ে তিনি রোজ পাঁচ-ছ ঘণ্টা করে আইন অধ্যয়ন করছিলেন পরীক্ষা দেবেন বলে। এ থেকে বোঝা যায়, আইন পরীক্ষাকে তিনি কতোটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষা দেবার সুযোগ যখন এলো, ততোদিনে চার-চারটি মামলায় জয়ী হয়ে তিনি বেশ কিছু সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। হিশেব করে দেখলেন, এই সম্পত্তি বন্ধক রেখে তিনি বিলেতে গিয়ে উকিল নয়, একেবারে ব্যারিস্টার হয়ে আসতে পারবেন। তখন কলকাতায় প্রায় ৩০ জন ব্যারিস্টার এবং ৮৪ জন অ্যাটর্নি ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন সবাই ইংরেজ অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান।[২০৪] কবি দেখলেন, তিনি যদি ব্যারিস্টার হয়ে আসতে পারেন, তা হলে উকিলের চেয়ে অনেক বেশি আয় করতে পারবেন। তা ছাড়া, প্রথম বাঙালি ব্যারিস্টার হিশেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন এবং খ্যাতি লাভ করাও তাঁর পক্ষে অনেক সহজ

হবে। তিনি পরিকল্পনা করলেন, একা যাবেন ইংল্যান্ডে। এতে হেনরিয়েটার তরফ থেকে আপত্তি আসতে পারতো। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, হেনরিয়েটা এতে প্রবল আপত্তি করেননি।

ব্যারিস্টার হবার ব্যাপারে কবি বাড়তি উৎসাহ পেয়েছিলেন বন্ধুদের কাছ থেকে। তাঁদের একজন — গৌরদাস বসাক — নিজেই এক সময়ে ব্যারিস্টার হবার কথা ভেবেছিলেন। তবে সবচেয়ে বেশি বাস্তব সাহায্য এবং উৎসাহ যিনি দিয়েছিলেন, তিনি হলেন, যাঁকে তিনি তাঁর শেষ কাব্য *বীরাঙ্গনা* উৎসর্গ করেছিলেন — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নিজে সৃজনশীল সাহিত্যিক হলেও, বিদ্যাসাগর কেবল আকাশ-কুসুম রচনা করেননি; সাফল্য তাঁর কাছে ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈষয়িক দিক দিয়ে সেকালের শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে সফল হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। বৈষয়িকতার সেই মানদণ্ড এবং মানসিকতা দিয়ে তিনি বন্ধুদের দেখতে অংশত অভ্যস্ত ছিলেন। তা ছাড়া, ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দেবার এক ধরনের জেদও তাঁর মধ্যে ছিলো। বাঙালিদের মধ্যে কোনো ব্যারিস্টার নেই এবং ব্যারিস্টারি পড়ার মতো বিদ্যা ও অর্থ শিক্ষিতদের মধ্যে বলতে গেলে কারো নেই — এটাও নিশ্চয় তাঁকে পীড়া দিতো। সে জন্যে, তাঁরা নিজেরা যা হতে পারেননি — প্রধানত বিত্তের অভাবে — মধুকে দিয়ে সেটাই এখন বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সমাজের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে, নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় কাঠামো সর্বত্র দেশীয়দের উন্নতির পথ অত্যন্ত সীমিত। অথচ স্বজাতিকে নিয়ে গর্ব করার নতুন চেতনাও শিক্ষিত সমাজে দানা বাঁধছিলো দ্রুত গতিতে, বিশেষ করে সিপাহী বিপ্লবের পর। আইসিএস হবার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মনোমোহন ঘোষের বিলেত গমন[২০৫] অথবা দেশীয়দের ব্যারিস্টারি পড়ার হুজুগ — এই নবজাত স্বাজাত্যবোধের অংশবিশেষ। বিদ্যাসাগর যে কবিকে সম্পত্তি বন্ধক রাখার ব্যবস্থাসহ যাবার ব্যাপারে নানা রকমের সহযোগিতা দিয়েছিলেন — এটা তার প্রধান কারণ।

ভাগ্য অবশ্য কবির প্রতি প্রসন্ন ছিলো না। সে জন্যে তাঁর বেলায় হিতে বিপরীত ঘটলো। বিদ্যাসাগর এবং তাঁর অন্য বন্ধুদের এই সহযোগিতা এবং সাহায্য তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে উন্নতির পথে এগিয়ে দিলেও, আসলে *ঠেলে* দিলো সর্বনাশী এক অন্ধকার গহ্বরের দিকে — যেখান থেকে তিনি আর কোনো কালে বেরিয়ে আসতে পারেননি। গ্রীক নাটকের নিয়তিবাদে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কতোটা বিশ্বাস করতেন জানিনে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যে নিয়তি বারবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। *আত্মবিলাপেও* তিনি ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করেছেন। সেই অন্ধ নিয়তি এবার বিলেতের নাম করে তাঁকে অনিবার্য পতনের পথে ডেকে নিলো।

তিনি বিলেত চলে যেতে পারেন এবং তাঁর সাহিত্যজীবন হয়তো ফুরিয়ে এসেছে — এ সম্ভাবনার কথা জানিয়ে তিনি রাজনারায়ণকে চিঠি লিখেছিলেন ফেব্রুআরির শেষ দিকে মার্চের গোড়ার দিকেও হতে পারে, কারণ চিঠিতে তিনি লিখেছেন — *বীরাঙ্গনা* সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে — এ কাব্য প্রকাশের তারিখ ২৬ ফেব্রুআরি, ১৮৬২)। তাতে তিনি লিখেছেন: 'আমি বিলেত যাবার জন্যে জোগাড়যন্তর করছি। সেখানে আইন অধ্যয়ন করবো। কাব্যদেবীকে তাই বাধ্য হয়ে বিদায় জানাতে হবে।'[২০৬] এ চিঠির ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর বিলেত যাবার কথা বেশ কিছুদিন থেকে আলোচিত হচ্ছিলো। এ ব্যাপারে পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়াও হয়েছিলো। বিলেত যাবার এবং সেখানে লেখাপড়া করার খরচ জোগানোর ব্যবস্থা করতে বিদ্যাসাগর সাহায্য করেন — এ কথা কবি রাজনারায়ণকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।[২০৭] তিনি হিশেব করে দেখেছিলেন যে, গোটা ব্যাপারটার জন্যে তাঁর ব্যয় হবে প্রায় হাজার বিশেক টাকা। এবং আগের বছর মামলায় জিতে পৈতৃক

সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের পর ধার করে এই টাকা ব্যয় করার মতো সামর্থ্যও তাঁর হয়েছিলো।

কল্পনার বিলেত যাবার জন্যে তিনি নানা ধরনের ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছিলেন নানা জনের সঙ্গে। পরিবার আর নিজের টাকাপয়সার ব্যবস্থাটাই ছিলো তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরী। পৈতৃক আমলের কর্মচারী মহাদেব চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে তাঁর সম্পত্তি থেকে তাঁকে বেদখল করার চেষ্টায় তাঁর জ্ঞাতিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করা সত্ত্বেও, তাঁকে নিজের তালুক চক মুনকিয়া এবং গদারডাঙ্গা পত্তনি দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এক সময়ে মতিভ্রম হয়ে তাঁর স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করলেও, এখন তাঁর প্রতি মহাদেব অনুগত থাকবেন। তা ছাড়া, পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে গৌরদাস বসাক এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র সহায়তা করলেও শেষ দিকে মহাদেব চট্টোপাধ্যায় মামলা পরিচালনার খরচ বহন করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি নগদ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। অংশত সেই টাকা শোধ দেবার জন্যে এবং অংশত কিছু বাঁধা আয়ের অধিকারী হবার জন্যে তিনি মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে পত্তনিদার নিযুক্ত করেন। চুক্তি অনুযায়ী ১২৬৮ সন থেকে ১২৭৪ সন পর্যন্ত সাত বছরের জন্যে তাঁর আয় প্রতি বছরের জন্যে ২৯৯৭ টাকা ৮ আনা নির্ধারিত হয়। ঠিক হয় যে, এই টাকা মহাদেব চট্টোপাধ্যায় প্রতি বছর মোট চার কিস্তিতে শোধ দেবেন। – পৌষ মাসে ৩৭৪ টাকা ৮ আনা, মাঘ মাসে ৭৪৯ টাকা ৮ আনা, ফাল্গুনে ১১২৪ টাকা ৩ আনা আর চৈত্র মাসে ৭৪৯ টাকা ৫ আনা।[২০৮]

মহাদেব যাতে নিয়মিতভাবে টাকা দেন, সে ব্যাপারে জামিন থাকতে রাজি হন রাজা দিগম্বর মিত্র – কবি যাঁকে কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে *মেঘনাদবধ কাব্য* উৎসর্গ করেছিলেন। তাতেও কবি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। কারণ দিগম্বর মিত্র বিখ্যাত এবং ব্যস্ত মানুষ, পত্তনিদারের সঙ্গে সব সময়ে যোগাযোগ করার মতো সুযোগ তার না-ও হতে পারে। সে কারণে, দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন আরও একজন – পিসতুতো ভাই বৈদ্যনাথ মিত্রের ওপর। খানিকটা এ কাজের বিনিময়ে, খানিকটা পিতার নির্দেশে তিনি বৈদ্যনাথ এবং তাঁর ভাই দ্বারকানাথকে বছরে তিন শো টাকা করে দেবার ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন।[২০৯] তদুপরি এঁদের সম্পত্তিও দান করেছিলেন অনেক টাকার। বিলেত যাবার আগে মাইকেল যেসব দলিল করেছিলেন, তার একটি থেকে দেখা যায় এঁরা দুজনই ছিলেন তাঁর পিতার 'প্রতিপালিত'।[২১০] চক মুনকিয়া এবং গদারডাঙ্গার বাৎসরিক খাজনা ছিলো ১৫০০ টাকা।[২১১] মহাদেব চট্টোপাধ্যায়কে তিনি যে-পত্তনি দেন, তার তারিখ (১ অক্টোবর ১৮৬১) থেকে বোঝা যায় যে, ব্যারিস্টারি পড়তে যাবেন, এ নিয়ে রাজনারায়ণ বসুকে চিঠি লেখার অন্তত মাস ছয়েক আগে থেকে এ সম্পর্কে তিনি চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং কথাবার্তা বলছিলেন। তবে বিষয়টা পাকাপাকিভাবে ঠিক হয় ফেব্রুআরি মাসের শুরুতে এবং তখন তিনি বন্ধুকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে চিঠি লেখেন।

বিলেত যাবার খরচ তিনি জোগাড় করেছিলেন নানা সূত্র থেকে। তার মধ্যে একটা হলো পৈতৃক বাড়ি বিক্রি। বাসগৃহ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা ছিলো। মাথা গোঁজার একটা জায়গা হলেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। মাদ্রাসে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একাধিক বার বাড়ি বদল করেছিলেন। পরবর্তী আলোচনায়ও দেখতে পাবো, আয় অনুযায়ী তিনি কতো বার বাড়ি বদল করেছেন। খিদিরপুরে তাঁদের যে-বাড়ি ছিলো, তাকে তিনি তাঁর অথবা তাঁর পরিবারের বাসোপযোগী বলে বিবেচনা করেননি। তার কারণ কি বাড়ির অবস্থা, নাকি বাড়ির অবস্থান, তা জানা যায় না। মামলায় এই বাড়ির অধিকার পাওয়ার পরে তিনি খিদিরপুরে বাস করলেও, এই বাড়িতে বাস করেননি। অথচ বাল্য এবং যৌবনের বাসগৃহ সম্পর্কে তাঁর মনে একটা নস্টালজিয়া থাকাই তো স্বাভাবিক। অন্তত এটা জানা যায় যে, একবার এ বাড়িতে গিয়ে এর নতুন মালিকের কাছে তিনি তাঁর মা এবং এ বাড়ির জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।[২১২] কিন্তু মাঝে-মধ্যে এ রকমের হঠাৎ-জেগে-ওঠা

দুঃখ দেখা দিলেও, বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি বাড়িতে থাকার কথা চিন্তা করেননি। করলে, অতো শস্তায় এ বাড়ি তিনি বিক্রি করতেন না। কিন্তু বিলেত যাবার উজ্জ্বল স্বপ্নে তিনি এ সময়ে এতোই মশগুল ছিলেন যে, পৈতৃক বাড়ি অকাতরে উড়িয়ে দিতে তাঁর তেমন আটকায়নি। আলিপুর আদালতের একটি দলিল থেকে দেখা যায়, সাত হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি এ বাড়ি বিক্রি করেছিলেন বাল্যবন্ধু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোভাই হরিমোহনের কাছে।[২১৩] হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সব টাকা তখন শোধও দেননি।

পৈতৃক সম্পত্তি সংলগ্ন জমিও তিনি বিক্রি করেন। তবে হরিমোহনের কাছে নয়। এ জমি কেনেন জেমস ফ্রেডারিক নামে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। ইনি ছিলেন অরিয়েন্টাল ব্যাংকের কর্মচারী। বস্তা তৈরির একটা কারখানাও ছিলো এঁর। এঁর কাছে এই জমি বিক্রি করে তিনি পেয়েছিলেন ১৬০০ টাকা।[২১৪] এ সময়ে মহাদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁকে ১০ এপ্রিল তারিখে এক হাজার এবং ১ জুন তারিখে ১৫৮৬ টাকা ৯ আনা আট পাই দিয়েছিলেন।[২১৫] ১ জুন তারিখে দেওয়া টাকার মধ্যে এক হাজার টাকা ছিলো ধার এবং বাকি টাকা ছিলো সম্পত্তি বাবদ। পরে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে টাকা নিয়ে যে-তিক্ততা দেখা দেয়, তার অনেকটাই দেখা দিয়েছিলো এই টাকা ধার করার শর্ত থেকে। মাইকেল এই টাকা গ্রহণের শর্ত হিশেবে স্বীকার করেন যে, তিনি বিদেশ থাকার সময়ে মহাদেব তাঁকে প্রতি বছর তিন হাজার টাকার বদলে দেবেন দু হাজার টাকা। কিন্তু কবি ফিরে আসার পর সম্পত্তির পুনর্জরিপ করাবেন। যদি এই জরিপ থেকে দেখা যায় যে, সম্পত্তির আয় দু হাজার টাকার বেশি, তা হলে মহাদেব তাঁকে বাড়তি টাকা শোধ করবেন। আর যদি দেখা যায় যে, জমি থেকে আয় দু হাজার টাকার কম, তা হলে মাইকেল ধার-করা এক হাজার টাকা শতকরা ১০ টাকা সুদ-সহ মহাদেবকে ফিরিয়ে দেবেন।[২১৬]

বাড়ি বিক্রির টাকা দিয়ে বিলেত যাবার সব খরচ তিনি জোগাড় করতে পারেননি। তা ছাড়া, তিনি যাবার সময়ে হেনরিয়েটা এবং দুই সন্তানের জন্যে কিছু টাকা ব্যাংকে রেখে যেতে চেয়েছিলেন। সে জন্যে তিনি এ সময়ে পরিচিতদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেন। মথুরামোহন কুণ্ডু, সাগর দত্ত এবং মধুসূদন মজুমদার নামে তিন ভদ্রলোকের কাছ থেকে তিনি ধার করেছিলেন যথাক্রমে ১৭০০, ৮০০ এবং ৫০০ টাকা।[২১৭] বিদ্যাসাগরের কাছ থেকেও কবি এক হাজার টাকা ঋণ করেছিলেন। এসব টাকা দিয়ে বিলেত যাবার জাহাজের ভাড়া এবং এই ঘাটতি পূরণের কথা ভেবে থাকবেন। কিন্তু পরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করবো, কবির আয়-ব্যয়ের হিশেব নির্ভুল ছিলো না।

যে-কোনো উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখলে মধু চিরকাল তা নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে পছন্দ করতেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। বন্ধুকে – রাজনারায়ণ বসুকে – লিখলেন: 'বোধ হয় সামনের মাসেই বিলেত যাচ্ছি। আর *কবি* মধু নয়, দোস্ত্, এবারে মাইকেল এম এস ডাট এস্কোয়ার, ইনার টেম্পলের ব্যারিস্টার! হা! হা! হা! দারুণ ব্যাপার, তাই না?'[২১৮] কিন্তু এমন রঙিন স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হবে তো? বড়ো করে আশা করতে ভয় পান তিনি। এর আগেও বিলেত যাবার গোলাপী স্বপ্ন দেখেছিলেন। মাস খানেকের মধ্যে যাত্রা করবেন – সে বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত ছিলেন; কিন্তু শেষ তক যাওয়া হয়নি। মাদ্রাসে বড়ো একটা চাকরি পাবেন, সে আশাও ব্যর্থ হয়েছিলো। *The Captive Ladie* লিখে ভেবেছিলেন, বিলেত না-গিয়েই ইংরেজি সাহিত্যে বড়ো রকমের ছাপ রাখতে পারবেন – সে স্বপ্নও অচিরে বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে খানখান হয়ে গিয়েছিলো। বারবার এ রকমের স্বপ্নভঙ্গের জন্যে বড়ো রকমের আশা করতেও তিনি ভরসা পাচ্ছিলেন না। সে জন্যে 'হা! হা! হা!' বলে অট্টহাস্য করলেও, পরক্ষণে লিখেছেন: 'আশা করি আমি হতাশ হবো না।' কিন্তু তিনি শুনতে না-পেলেও,

প্রতিধ্বনির মতো প্রায় একই সময়ে ভাগ্যদেবীও হা! হা! করে অট্টহাস্য করছিলেন। ভাগ্যদেবী যেন অশ্রুত দৈববাণীতে বলেছিলেন: 'তোমার বিলেত যাওয়ার সাধ পূরণ হবে, কিন্তু তাতে আশা তোমার পূরণ হবে না। ব্যারিস্টারও হবে কিন্তু সে বিদ্যা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারবে না।'

যখন বিলেত যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, সেই ব্যস্ততার মধ্যে বন্ধুরা তাঁর ওপর একটা গুরু দায়িত্ব চাপালেন – *Hindoo Patriot* পত্রিকা সম্পাদনার কাজ। আগের বছর ১৪ জুন এই পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জি মারা যান – ইতিপূর্বে আমরা তা দেখতে পেয়েছি। তিনি মারা যাবার পর থেকে এ পত্রিকা পরিচালনায় অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিলো। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ছাপাখানা-সহ এ পত্রিকা কিনে নিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং এর সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছু দিন সম্পাদনার কাজ করেছিলেন। কিন্তু পত্রিকার হাল তাঁরা কেউই শক্ত হাতে ধরতে পারেননি। সে জন্যে কবির বন্ধুরা ভেবেছিলেন মাদ্রাসে পত্রিকা সম্পাদনার যে-অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, তা দিয়ে তিনি এই ডুবন্ত পত্রিকাকে ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। অংশত হরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির কারণে এবং অংশত বিদ্যাসাগর ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতো দুজন প্রভাবশালী বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকের অনুরোধে তিনি এই কাজ হাতে নেন। যেভাবে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে মাদ্রাসে তিনটি পত্রিকার কাজ করেছিলেন, তাতে তিনি নিজেও আশা করেছিলেন যে, এই পত্রিকার মান উন্নত করতে পারবেন। কলকাতার পত্রিকা সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে উঁচু ছিলো না, তা আগেই বলেছি। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, তিনি হাত দিলে সে পত্রিকার চেহারায় তার ছাপ পড়তে বাধ্য। তাই রাজনারায়ণকে লিখেছেন: 'আগামী সোমবারের সংখ্যাটাকে আমার সম্পাদিত সংখ্যা বলে চিনতে তোমার বেগ পেতে হবে না।'[২১৯]

এই চিঠির পরবর্তী অংশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পত্রিকার কথা ভাবতে গিয়ে উদ্দীপ্ত বোধ করলেও, তিনি সত্যি সত্যি উত্তেজিত বোধ করছেন বিলেত যাবার প্রসঙ্গে। সে জন্যে কিছুতেই বিলেত যাবার প্রসঙ্গটা ভুলতে পারেননি। অচিরে যাওয়া হবে সেই বিলেতে, যেখানে যাবার স্বপ্ন দেখেছেন প্রথম যৌবন থেকে। অবশ্য তখন ভেবেছিলেন, বিলেত যাবেন কবি হতে। এখন ভাবছেন, বিলেত যাবেন ব্যারিস্টার হতে। এ কথা ভেবে কি তিনি নিজের অজ্ঞাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন? আমার মনে হয়, ফেলেননি। কারণ, ইতিমধ্যে আশাতীত কবিখ্যাতি লাভ করে-ছিলেন – হোক না বাংলায়! এই কথা মনে রেখে তিনি রাজনারায়ণকে যে-চিঠি লিখেছিলেন – তার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। বস্তুত, সাহিত্যিক হিশেবে বিতর্কাতীত প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি ভেবেছিলেন: কবি হবার জন্যে কে আর বিলেত যায়! সরস্বতীর নয়, এবারে তিনি গলায় পরবেন লক্ষ্মীর বরমাল্য।

Hindoo Patriot-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কয়েক সপ্তাহের বেশি ছিলো বলে মনে হয় না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চিঠি থেকে মনে হয় যে, এই পত্রিকা থেকে কোনো টাকাপয়সা না-পাওয়ায় কবি এর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাইছিলেন।[২২০] আরও জানা যাচ্ছে, তিনি যখন পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে মোটামুটি কথা হয়েছিলো যে, তিনি সপ্তাহে দু-তিনটে করে লেখা দেবেন আর সম্পাদনার কাজ তদারকি করবেন। তিনি তাঁর এই দায়িত্ব গুরুত্বের সঙ্গে পালন করছিলেন। কিন্তু টাকাপয়সা না-পাওয়ায় যতীন্দ্রমোহনের কাছে অভিযোগ করেন। পত্রিকার কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে যতীন্দ্রমোহন তাঁকে অন্তত আর-এক মাস ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করেন। 'তারপরও যদি পত্রিকার পরিচালকরা আপনাকে নিয়মিত টাকাপয়সা না-দেন, তা হলে আমি আর আপনাকে এ ব্যাপারে বিরক্ত করবো না।'[২২১] যতীন্দ্রমোহনের এ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি বেশি দিন এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বস্তুত, এ সময়ে বিলেত যাবার ব্যাপারে সব রকমের আয়োজন করতে তিনি বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এসব আয়োজনের মধ্যে একটা ছিলো হেনরিয়েটা এবং দুই সন্তানের নিরাপত্তার পাকা ব্যবস্থা করা। ছোটো ছোটো সন্তানের একটি সংসারকে কোথাও কেবল এক অসহায় মহিলার দায়িত্বে ফেলে গেলে তাদের কী গুরুতর বিপদ হতে পারে, রেবেকার পরিবার দেখলে তিনি তা চাক্ষুষ উপলব্ধি করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। কিন্তু কল্পনায় নিশ্চয় রেবেকাদের দুরবস্থার কথা গভীরভাবে অনুভব করে থাকবেন। এবারে আবার কলকাতায় দুটি সন্তান এবং তাদের জননীকে যাতে তেমন বিপদে পড়তে না-হয়, তিনি অবশ্যই সেটা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে পথে একাধিক বাধা ছিলো। আত্মীয়দের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা তখনো একেবারে মিটে যায়নি। মামলায় হেরেও তাঁরা আপীল করেছেন। আপীলে হেরে নতুন করে মামলা করেছেন, ইত্যাদি। সে কারণে, রাজনারায়ণকে আগের চিঠিটি লেখার কিছু দিন পরে — মার্চ মাসে — আবার লেখেন: 'যতোটা তাড়াতাড়ি বিলেত যেতে পারবো বলে ভেবেছিলাম, ততোটা তাড়াতাড়ি যাওয়া হচ্ছে বলে মনে হয় না। আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে-মামলা এখনো চলছে তার আগুন না-নিভিয়ে আমি দেশ ছাড়তে চাইনে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে — তারা বদমাশের চূড়ান্ত, নয়তো এই পৃথিবীতে তাদের মতো বোকা আর নেই। মামলায় প্রায় ফতুর হয়ে গেছে, তবু কথাবার্তা শোনার পাত্র তারা নয়!'[২২২] এই চিঠি লেখার মোটামুটি তিন মাস পরে তিনি সত্যি সত্যি একদিন বিলেত যাত্রা করলেন।

কলকাতা থেকে মাদ্রাসে পালিয়ে যাবার আগে পরিচিত পরিবেশ এবং স্বজনদের ফেলে যাবার কথা ভেবে, তাঁর মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো, আমরা তার কোনো হদিস পাইনি। তবে পরিবারের প্রতি তাঁর মনে যে-তিক্ততা তৈরি হয়েছিলো, তার কথা নিজেই লিখেছিলেন। সেই তিক্ততা দিয়ে বিচ্ছেদের বেদনাকে তিনি খানিকটা লঘু করার প্রয়াস পেয়ে থাকবেন। কিন্তু মাদ্রাসে যাবার পরেও তিনি যে বঙ্গদেশকে ভুলতে পারেননি, আমরা তাঁর কবিতা এবং চিঠিপত্র থেকে দেখতে পেয়েছি। এবারে বিলেত যাবার আগে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিলো, রাজনারায়ণকে লেখা দুটি চিঠি থেকে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম চিঠিতে লিখেছেন: 'যদি বেঁচে থেকে ফিরে আসতে পারি, তা হলে দেখা হবে। তা না-হলে এক শো বছর পরে আমার দেশের লোকেরা হয়তো ক্ষীণতম বেদনার সঙ্গে বলবে

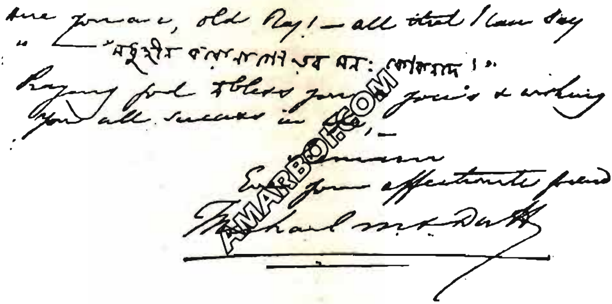
Far away - Far Away,
From the land he love'd so well
Sleeps beneath the colder ray.[২২৩]

বিলেত যাত্রার আগে দেশ, পরিচিত পরিবেশ এবং আপনজনদের জন্যে তাঁর মন যে বিষণ্ন এবং বিরহবিধুর হয়েছিলো, তা বোঝাই যাচ্ছে। তা ছাড়া, জীবিত ফিরে আসতে পারবেন কিনা, সে সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুশ্চিন্তা অস্বাভাবিক নয়।

জাহাজে ওঠার পাঁচ দিন আগে বন্ধুকে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে তাঁর একটা অপরাধ- বোধও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে সাহিত্যচর্চা না-করে কেবল অর্থলোভে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছিলেন — সেই অপরাধবোধ। সে জন্যে কৈফিয়তের সুরে বলেছেন: 'বন্ধু, আমি আমার স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, আশা করি তুমি নিশ্চয় তা মনে করবে না। নতুন কাব্যটি যে-অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে, তা যদি না-হতো, তা হলে আমি অবশ্যই আমার যাত্রা পিছিয়ে দিতাম। অথবা হয়তো যেতামই না। আমার দায়িত্ব আমি তা হলে পৌরুষের সঙ্গে পালন করতাম। কিন্তু আমরা সকাল-সকাল বিজয় লাভ করেছি। এমতাবস্থায় এ দায়িত্ব আমি এখন তরুণদের হাতে সমর্পণ করতে পারি। তা ছাড়া, দূর থেকেও আমি তাঁদের গতিবিধি পরিচালনায় ক্ষান্ত হবো না।'[২২৪] *মেঘনাদবধের*

সাফল্য সম্পর্কে কবির মনে কোনো রকমের সন্দেহ ছিলো না। কারণ বারো মাসের মধ্যে এ কাব্যের প্রথম খণ্ডের এক হাজার কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিলো এবং দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ আরম্ভ হয়েছিলো। এই সটীক সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কবির ভাষায়[২২৫], একজন সত্যিকার *বিএ* – হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনিও রাজনারায়ণ বসুর প্রতিধ্বনি করে *মেঘনাদবধ কাব্য*কে বাংলা ভাষার প্রথম সত্যিকার কাব্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।[২২৬] *মেঘনাদবধ* লেখার সময়ে তিনি মনে করেছিলেন, এই কাব্য লিখে তিনি হাত পাকাচ্ছেন, কিন্তু সেই কাব্যই যখন সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করলো, তখন সেই সাফল্য দেখে ভাবলেন, কবি হিশেবে তিনি যে-যশ লাভ করতে পারতেন, তা পুরোপুরিই লাভ করেছেন; এবারে অর্থস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বেঁচে থাকার সাধনা করতে পারেন।

মানুষ হিশেবে তাঁর অনেক কিছুর প্রতি দুর্বলতা ছিলো। কিন্তু অর্থ এবং যশের মধ্যে কোনটার প্রতি তাঁর দুর্বলতা বেশি ছিলো, বলা শক্ত। তবে অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি তাঁর লোভ ছিলো না। তিনি জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন; 'বড়োলোকের' মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চেয়েছিলেন। তার



জন্যে টাকাপয়সার দরকার। নয়তো টাকাপয়সা হিশেবে টাকাপয়সার প্রতি তাঁর তেমন কোনো আকর্ষণ ছিলো না। আয়ের চেয়ে টাকা ব্যয় করতেই তাঁর উৎসাহ ছিলো সমধিক। অর্থ ছাড়া তাঁর আন্তরিক দুর্বলতা ছিলো প্রশংসা এবং যশের প্রতি। একজন সত্যিকার *বিএ* তাঁর কাব্য সম্পাদনা করছেন – এটাকে তিনি একটা স্বীকৃতি বলে বিবেচনা করেছেন। তদুপরি রাজনারায়ণকেও তিনি তাঁর খ্যাতি এবং যশ রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়ে যেতে চাইলেন। (যদিও তখনো রাজনারায়ণ *মেঘনাদবধের* কোনো সমালোচনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেননি। কবি আশা করেছিলেন যে, তিনি যাবার পরেও রাজনারায়ণ *মেঘনাদ* এবং *বীরাঙ্গনার* সমালোচনা লিখবেন। কবি অবশ্য ভুল প্রত্যাশা করেছিলেন। পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যেও রাজনারায়ণের *মেঘনাদ*-সম্পর্কিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়নি।) 'প্রিয় রাজ, তোমার বন্ধুকে কিন্তু ভুলে যেয়ো না। তা ছাড়া, তোমার বন্ধুর খ্যাতি যাতে টিকে থাকে, সে দিকেও যত্ন নিয়ো।'[২২৭]

এই চিঠির সঙ্গে তিনি একটি ছোট্টো কবিতা পাঠান – *বঙ্গভূমির প্রতি*। কবিতাটি সম্পর্কে তাঁর নিজের মূল্যায়ন হলো – 'আশা করি কবিতাটি ভালো না-হলেও, অন্তত সম্মানজনক হয়েছে।' এ কবিতা তিনি শুরু করেন তাঁর প্রথম যৌবনের নায়ক বায়রনের একটি পঙ্‌ক্তি দিয়ে – My Native

Land! Good-Night![২২৮] আন্তরিকতায় এ কবিতাটি অসাধারণ। সাধারণভাবে, তাঁর কবিতায় প্রচুর জাঁকজমক আছে – এ সম্পর্কে একমত হলেও, আন্তরিকতা কতোটুকু আছে সে সম্পর্কে সমালোচকরা একমত নন। কিন্তু *আত্মবিলাপের* মতো এই ছোটো কবিতায়ও অসাধারণ আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে!
প্রবাসে, দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে, – নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে।

সাহিত্য সাধনা ছেড়ে দিয়ে বিদেশ যাত্রা করার জন্যে তাঁর মনে যে-অপরাধ বোধ দেখা দিয়েছিলো, এ কবিতায়ও তা অনুপস্থিত নয়। সে জন্যে, কবিতায় শুরুতে বলেছেন: মনের সাধ পূরণ করতে গিয়ে যদি ভুল করি, তবু তোমার মনের লালপদ্মকে মধুহীন কোরো না। মনের এই সাধ কেবল বিলেত যাওয়া হলে, তিনি এই কৈফিয়ত দিতেন না। কিন্তু নিজে ভালো করেই জানতেন যে, তিনি সাহিত্যের আসর ত্যাগ করে অনেক ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রে যাত্রা করছিলেন কবি হবার জন্যে নয় – ব্যারিস্টার হবার জন্যে। তিনি আশা করেছেন, জন্মভূমি তাঁর এই অপরাধ ক্ষমা করবেন। এ কৈফিয়ত দেবার পর, এ কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি যেন তাঁর শেষ ইচ্ছাই ব্যক্ত করেছেন – স্বদেশের প্রতি, বন্ধুদের প্রতি, সাহিত্যানুরাগীদের প্রতি। তাঁর মূল কথাটি হলো: 'মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।' চেতনায় এবং অবচেতনে কবির মনে মৃত্যুচিন্তা ছিলো প্রবল। চিঠিপত্রে বহুবার সে কারণে তিনি নানা ভাষায় বলেছেন: অতো দিন যদি বেঁচে থাকি; বিধাতা যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন ইত্যাদি। এ কবিতায়ও সেই চিন্তা স্পষ্ট করে প্রকাশ পেয়েছে – এবং দূরদেশে যাত্রার আগে সেটা স্বাভাবিকও। কিন্তু যে-অসাধারণ চিত্রকল্প দিয়ে সেটি প্রকাশ করেছেন, সেটা তাঁর জন্যেও খুব সাধারণ নয় – প্রবাসে এ দেহ-আকাশ থেকে জীবতারা যদি দৈবের বশে খসে যায়; তা হলে খেদ নেই কোনো! বরং তিনি কবিতার শেষে আবার প্রার্থনা করেছেন, কি বসন্ত, কি শরতে তিনি যেন বঙ্গভূমির স্মৃতিজলে পদ্মের মতো সর্বদা ফুটে থাকেন।

যাবার আগে রাজনারায়ণকে তিনি যেমন আন্তরিকতা ঢেলে চিঠি লিখেছিলেন, অন্য কাউকে তেমন লিখেছিলেন কিনা, তা জানা নেই। প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাসের সঙ্গে যাবার ঠিক আগে দেখা হয়েছিলো কিনা, তাও জানা যায় না।[২২৯]

৫

প্রবাসে দৈবের বশে

'বিশ্বাস করো, প্রিয় বন্ধু, বাংলা একটি অসাধারণ সুন্দর ভাষা; এর পরিমার্জনের জন্যে দরকার কেবল প্রতিভাবান কয়েকজন লোকের। আমরা নিজেরা যেমনটা শিক্ষা পেয়েছি, সেই শিক্ষার মতো ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে এ ভাষার কথা সামান্যই জানা আছে, অথবা লোকেরা এ ভাষাকে কেবল ঘৃণা করতে শিখেছে, সেটা নিতান্ত ভ্রান্তি; এর আছে অসাধারণ মূল্যবান ভাষিক উপাদান। আহা, আমি যদি এই ভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারতাম! কিন্তু তুমি তো জানো জীবিকা উপার্জনের কোনো কাজ না-করে কেবল সাহিত্যিক জীবন যাপন করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। আমি বড়ো গরিব, বা বলতে পারো, চিরকাল গরিব অবস্থা মেনে নেবার মতো মনোভাব আমার নেই — আমি তার চেয়ে অনেকটা গর্বিত। তোমার যদি টাকা থাকে, তুমি তা হলে 'বড় মানুষ', তা না-হলে কে তোমাকে পোছে? আমরা এখনো একটা মর্যাদাহীন জাতি। আমাদের দেশের 'বড় মানুষ' কারা? চোরবাগান আর বড়োবাজারের নামহীন লোকেরা। ... আমি যদি সাহিত্যিক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যের জন্যে তেমন কিছু না-করে থাকি, তা হলে আমি যা করেছি, তা নিয়েই আমাদের জাতির সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ, সেই আমার সাহিত্যিক প্রতিভা পুরোপুরি লালন করার মতো সঙ্গতি আমার নেই।'[১] বিলেত যাবার আসল কারণ গৌরদাসকে লেখা এই চিঠিতে কবি অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন।

বন্ধুদের কাউকে নিজের খ্যাতি রক্ষার, কাউকে টাকাপয়সা আদায়ের এবং কাউকে পরিবারের দিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব দিয়ে — আপাতদৃষ্টিতে সব রকমের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে — ৯ জুন (১৮৬২) সোমবার সকাল বেলায় কলকাতা থেকে তিনি বিলেতের উদ্দেশ্যে পাল তোলেন। বয়ঃসন্ধি কাল থেকে আরম্ভ করে তিনি বিলেত যাবার ধ্যান করেছিলেন। অবশেষে *ক্যান্ডিয়া* জাহাজে চড়ে সেই স্বপ্নরাজ্যের উদ্দেশ্যে তাঁর যাত্রা।

তাঁর জাহাজ মাদ্রাসে গিয়ে পৌঁছে তিন দিন পরে — ১২ জুন তারিখে।[২] স্মৃতি-ভরা মাদ্রাসকে দেখে তাঁর সমগ্র অন্তর বেদনায় মথিত হয়েছিলো, বলা বাহুল্য। প্রায় চার বছর ধরে হেনরিয়েটার সঙ্গে ঘর করলেও, রেবেকাকে তিনি ভুলতে পারেননি। তা ছাড়া, রেবেকার প্রতি মনোভাব যেমনই হোক না কেন, ছোটো ছোটো যে-সন্তানদের তিনি ফেলে গিয়েছিলেন — ব্যর্থা, ফিবি, জর্জ আর মাইকেল — তাঁদের জন্যে তাঁর মন কেমন উতলা হয়েছিলো, তা-ও শুধু অনুমান করা যেতে পারে। কবি মাদ্রাস ছাড়ার তিন মাসের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র মাইকেল মারা গেলেও ব্যর্থা ততোদিনে তেরো বছরের কিশোরী

হতে চলেছে। ফিবি এগারো বছরের বালিকা। জর্জের বয়স দশ হতে বাকি এক মাস। কেমন হয়েছে ওরা দেখতে! কী পড়ছে? কোন স্কুলে পড়ে? লেখাপড়ায় কেমন হয়েছে? কেমন করে চলছে ওদের সংসার? নানা প্রশ্নই তাঁর মনকে ব্যাকুল করে থাকবে। পারলে একবার গিয়ে দেখেও আসতেন হয়তো। মাদ্রাসে এই জাহাজ দু দিন ছিলো। তখন দূর থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন কিনা, কে জানে? তিনি কি এই দু দিনের মধ্যে একবারও মাদ্রাস শহরে গিয়ে স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো দেখে আসেননি? অথবা পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেননি? রিচার্ড নেইলর তখন ডভটন কলেজের শিক্ষক। তাঁর সঙ্গে কি কোনো যোগাযোগ হয়নি? প্রমাণের অভাবে আজ আর নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সুখের বিলেতযাত্রার পথে তাঁর মন যে বারবার ব্যাকুল এবং ব্যথায় বিদীর্ণ হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কলকাতায় যাঁদের তিনি ফেলে এসেছিলেন, তাঁদের জন্যেও তাঁর ব্যাকুলতা কিছু কম ছিলো না।

মাদ্রাস ছেড়ে *ক্যান্ডিয়া* যতো এগিয়ে যেতে থাকে আরব সাগরের দিকে, তাঁর মন ততোই ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নে উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকবে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে এই জাহাজের প্রায় চার সপ্তাহ লেগেছিলো। জাহাজ গিয়ে প্রথমে নোঙ্গর করেছিলো এডেনে। তারপর লোহিত সাগর ধরে আরও এগিয়ে গিয়ে ছোট্টো সুয়েজ বন্দরে।[৩] সেখানে জাহাজ বদল করার পালা। (এর তিন বছর আগে সুয়েজ খাল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিলো। কিন্তু সে কাজ শেষ হয় আরও সাত বছর পরে। সুয়েজ খালের উদ্বোধন করা হয় ১৮৬৯ সালে।) সায়েদ বন্দরে যাত্রীদের উঠতে হয় অন্য একটি জাহাজে — *সিলোনে*। ৬ জুলাই রোববার এই জাহাজ গিয়ে ভিড়েছিলো আলেকজান্দ্রিয়ায়। যাত্রীরা তখন ঘুরে এসেছিলেন দু হাজার বছরের চেয়েও পুরোনো এই শহর। চার দিন পরে ৯ জুলাই রাতের বেলায় তাঁরা পৌঁছে যান মল্টায়।[৪] তার উত্তর দিকে মাত্র কয়েক শো মাইল দূরে গ্রীস। এ দেশের সভ্যতার বিস্তারিত ইতিহাস এবং সাহিত্যের সঙ্গে কবির যে নিবিড় পরিচয় ছিলো, তেমন পরিচয় সহযাত্রীদের মধ্যে সম্ভবত কারো ছিলো না। মনে মনে যে-হোমারের জগতে নিরন্তর ঘুরে বেড়াতেন তিনি, সেখান থেকে তা বেশি দূরে ছিলো না। তাঁর প্রথম যৌবনের নায়ক লর্ড বায়রন যেখানে মারা যান, তা-ও ছিলো বেশ কাছেই। অনুমান করি, তিনি সেই জগতের কথা ভেবে কখনো অতীতমুখো হয়েছেন, কখনো বা দিন দশেক পরে তিনি লন্ডনের রাজপথে ঘুরে বেড়াবেন — সেই কথা ভেবে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। বর্তমান এবং অদূর অতীত থেকে তাঁর মন বার বার সরে গেছে অনেক দূরে। তাঁর এই সময়কার মনের অবস্থা কেমন ছিলো তাঁর সামান্য আভাস পাওয়া যায় গৌরদাসকে লেখা একটি চিঠি থেকে। কলকাতা থেকে রওয়ানা হবার ঠিক এক মাস দুদিন পরে আফ্রিকার উপকূলের ধার দিয়ে যখন জাহাজ চলছিলো — তখন লিখেছিলেন এ চিঠি।

> *সিলোন* জাহাজ থেকে তোমাকে কয়েকটা লাইন লেখার জন্যে বসেছি। কি বলবো ভাই, এ জাহাজটাকে মনে হচ্ছে পরীর দেশের একটি ছোটোখাটো ভাসমান প্রাসাদের মতো। এই জাহাজের প্রতিটি জিনিশ যে কী জাঁকজমকপূর্ণ সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এই জাহাজে যে-স্যালুনগুলো আছে তা প্রাসাদের মতো, আর ক্যাবিনগুলো রীতিমতো রাজসিক। তবে এসব বিবরণ আমি তোমাকে বিস্তারিতভাবে জানাতে পারবো ইংল্যান্ডে গিয়ে তোমাকে লেখার সময় পেলে। এই মুহূর্তে আমি যাচ্ছি বিখ্যাত ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে। আমাদের জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে উত্তর আফ্রিকার পাহাড়ী উপকূল। ... মাত্র ৩২ দিন আগে আমি কলকাতায় ছিলাম। কী দ্রুত ভ্রমণ করছি, তাই না? ... আমি দিব্বি দিয়ে বলতে পারি, আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমি প্রতি মুহূর্তে সেই দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যার কথা আমি অতো ভেবেছি আমার ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু সত্য কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত!

এ চিঠির মধ্যে কবির মনের দুটো অসাধারণ দিক ধরা পড়ে। তিনি এরই মধ্যে নিজের স্বরূপ নিয়ে সংকটে পড়েছিলেন। স্বদেশের ভিড়ে চিরদিন নিজেকে তিনি অন্য এক জগতের, সমাজের অন্য এক

স্তরের মানুষ বলে বিবেচনা করে এসেছেন। কিন্তু এখন শ্বেতাঙ্গদের ভিড়ে তিনি স্বদেশ এবং স্বদেশের মানুষদের সম্পর্কে একটু যেন বেশি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলেন। জাহাজ-ভর্তি ভিনদেশীদের সঙ্গে নিজেকে ঠিক মেলাতে পারলেন না। সাড়ে ছ বছর আগে মাদ্রাস থেকে তিনি যখন কলকাতায় ফিরে যান, তখন জাহাজের ভারতবর্ষমুখী বিদেশী যাত্রীরা এবং/অথবা জাহাজ-কর্তৃপক্ষ ইংরেজ-বনে-যাওয়া মাইকেলকে নাম দিয়েছিলেন মিস্টার হোল্ট, সেটাকে তিনি নিতান্ত ঠাট্টা হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এবারে ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশ-অভিমুখী বিদেশীদের ভিন্ন চেহারা দেখতে পেলেন তিনি।

> আহা, এই জাহাজে যদি আমাদের দেশের অর্ধ-ডজন লোকও থাকতো! তা হলে তাঁদের নিয়ে আমাদের নিজেদের একটা দল তৈরি করতাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তিনি স্বভাবের দিক দিয়ে সরল হলেও, সাধারণ মানুষের মতো অতি-সরল অথবা একমাত্রিক চিন্তায় অভ্যস্ত ছিলেন না। মস্তো বড়ো সৃজনশীল একজন শিল্পীর জন্যে যা স্বাভাবিক — তিনি এমন একটি জটিল মনের অধিকারী ছিলেন, যা তাঁকে অসুখী করতে বাধ্য। প্রাচ্যে জন্মেও তাঁর মনন এবং মানসিকতা গড়ে উঠেছিলো পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং মূল্যবোধে। আবার তিনি যখন পাশ্চাত্যকে সমস্ত অন্তর দিয়ে আলিঙ্গন করতে গেছেন, তখন প্রাচ্যের প্রতি তাঁর সহজাত দরদ তাঁকে কিছুতেই পাশ্চাত্যের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হতে দেয়নি। এই দুয়ের সমন্বয় তিনি কোনো দিন করতে পারেননি, যেমন পারেননি লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মধ্যে কোনো একজনকে পুরোপুরি বর্জন করে অন্য একজনকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে। তিনি অসুখী ছেলের মতো মানসিকতা নিয়েই প্রথম যৌবন থেকে বড়ো হয়েছিলেন। কলকাতায় থাকতে যে-হরির খোঁজ নেননি, সেই হরিকে স্মরণ করে এখন তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

> আমাদের হরি' কোথায় জানো? জানলে তার কাছে আমার কথা মনে করিয়ে দিয়ো।... আজ সাগরটা যে কী শান্ত, তুমি কল্পনাও করতে পারিবে না, একেবারে আমাদের নিজেদের হুগলি নদীর মতো। এখনকার আবহাওয়া হলো অনেকটা আমাদের দেশে অঘ্রান মাসের শুরুতে যেমনটা থাকে, খুব ঠাণ্ডা নয়, আবার খুব গরমও নয়।

বোঝা যায়, ইতিমধ্যে তিনি নিজেকে প্রবাসী বলে বিবেচনা করছেন। স্বদেশকে মনে পড়ছে বারবার। সবকিছুকে আজ তুলনা করে দেখতে চাইছেন দেশের পাঁচটা জিনিশের সঙ্গে।

নিজের লক্ষ্যের কথাও তাঁর বিশেষ করে মনে পড়ে — যে-কাজে এসেছেন, সফলভাবে তা শেষ করা চাই। তিনি তো আর কবি হতে চান না! ভালো করে আইন শিখে দেশে ফিরে গিয়ে অনেক উপার্জন করবেন। বড়োলোক না-হলে সমাজে তাঁর কোনো মর্যাদা থাকে না। এবারে কেবল কপর্দকহীন কবিখ্যাতি অর্জন করে তিনি সুখী হতে চান না, তিনি চান অর্থ-প্রতিপত্তি দিয়ে সমাজের ওপরতলায় আসন নিতে। জীবনটাকে উপভোগ করতে চান নানাভাবে, নানা উপকরণ দিয়ে। পরবর্তী দু বছরে লেখা একাধিক চিঠিতে বাঙালিদের মধ্যে একজন ব্যারিস্টারও নেই — তিনি এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ কথা ভেবে উদ্দীপ্ত বোধ করেছেন যে, ব্যারিস্টার হতে পারলে তিনি প্রচুর সম্মান পাবেন আর সেই সঙ্গে করতে পারবেন একচেটিয়া ব্যবসা। নতুন প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টও ব্যবসার বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে। কলকাতা ত্যাগ করার আগে তিনি জেনে এসেছিলেন সদর দেওয়ানি আদালত আর সুপ্রিম কোর্ট থাকছে না, তার বদলে জুলাই মাস থেকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হবে হাই কোর্ট। সেই হাই কোর্টের উদ্‌বোধন হয় পয়লা জুলাই।[৬] সেদিন যখন আরব সাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কি মনে মনে ভাবেননি সেই হাইকোর্টের কথা? সেই জন্যে, লক্ষ্যের কথা সদাজাগরূক তাঁর হৃদয়ে:

> আমার আশঙ্কা হয় [ইংল্যান্ডে যাবার পর] বন্ধুদের দেবার জন্যে আমার তেমন সময় হবে না, কারণ আমি আমার পেশা ভালো করে শিখতে চাই, আর চাই সম্মান অর্জন করতে।[৭]

বিদেশ থেকে লেখা তখনকার অনেক চিঠিতেই তাঁর এ ধরনের স্বাদেশিকতা এবং নিজের সংকল্প সম্পর্কিত মনোভাব দেখা যাবে।

১৪ জুলাই *সিলোন* জাহাজ গিয়ে পৌঁছে জিবরল্টারে। তারপর সেদিনই আবার যাত্রা শুরু করে। ১৯ জুলাই শনিবার সূর্য ওঠার আগে এই জাহাজ গন্তব্যে পৌঁছে সাউথ্যাম্পটন বন্দরে।[৮] ধারণা করি, দুপুরের দিকে তিনি গিয়ে পৌঁছে যান তাঁর স্বপ্নে-দেখা লন্ডন নগরীতে। এখানে তিনি মনোমোহন ঘোষ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে উঠেছিলেন বলে মনে হয়।[৯] লন্ডন দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এ প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায়। যদিও অনেক বড়ো বড়ো বাড়িঘরের স্থাপত্য দেখে তাঁর মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ তিনি কলকাতায়ই দেখেছেন। পরবর্তী চার সপ্তাহ তিনি মনোমোহন এবং সত্যেন্দ্র-নাথের সঙ্গে ভালো করে লন্ডন ঘুরে দেখেছেন এবং পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছেন ভর্তি হবার।

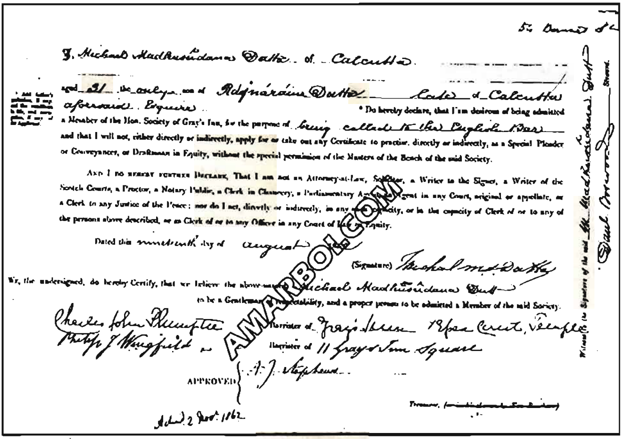
তিনি যে-লক্ষ্য নিয়ে ইংল্যান্ডে এসেছিলেন তাকে কতোখানি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন, সেটা বোঝা যায়, কতো দ্রুত তিনি আইন পড়ার জন্যে ভর্তি হলেন, তা থেকে। পরবর্তী টার্ম শুরু হবার কথা নভেম্বর মাসে। বস্তুত, তিনি আরও তিন মাস পরে লন্ডনে এলে কোনো অসুবিধে হতো না। কিন্তু কোনো বিলম্ব তাঁর সহ্য হচ্ছিলো না। উনিশে আগস্ট তিনি ভর্তি হন গ্রেজ ইনে।[১০] এর আগে ইনার টেম্পলে যান বলে মনে হয়। ইনার টেম্পলে লেখাপড়া শিখবেন বলেই তিনি ঠিক করে এসেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এখানে ভর্তি হননি।

ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে লন্ডনে চারটি প্রতিষ্ঠান ছিলো — লিঙ্কনস ইন, ইনার টেম্পল, গ্রেজ ইন আর মিডল টেম্পল। এই চারটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রে বলা হয় ইনস অব কোর্ট। সবগুলোই তিন শো বছরেরও বেশি পুরোনো এবং বনেদী। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিলো লিঙ্কনস ইন। সেখানে ছিলেন ৬২জন বেঞ্চার বা শিক্ষক। ইনার টেম্পলে বেঞ্চার ছিলেন ৪৬ জন। মিডল টেম্পলে ৩৯জন। সে তুলনায় সবচেয়ে ছোটো ছিলো গ্রেজ ইন — বেঞ্চারের সংখ্যা মাত্র ১৯। এঁদের মধ্যে প্রধান বেঞ্চার ছিলেন জর্জ লঙ। অন্য বেঞ্চারদের নাম হলো: রবার্ট গ্রীন ব্রেডলি, জন টীড, টমাস গ্রীনউড, স্যামুয়েল টার্নার, টমাস গ্রীন, স্যর জে. রমিলি, টমাস চ্যান্ডেলস, টমাস মার্শাল, উইলিয়াম ওয়াইল্ড, জেমস ব্যাস্ট, উইলিয়াম হেনরি ডডকিন, জন হাডলস্টন, রবার্ট লাশ, হেনরি ম্যানিস্টি, আর্চিবল্ড স্টীফেনস, উইলিয়াম হিল্ডমার্চ, টমাস সাউথগেট আর জন লী। লন্ডনে তাঁর ভর্তি অনুমোদন করেন আর্চিবল্ড স্টীফেনস। ভর্তির সময়ে তাঁর জামিন থাকেন টেম্পলের অধিবাসী চার্লস জন প্লাম্‌ট্রী আর ১১ নম্বর গ্রেজ ইন স্কোয়ারের বাসিন্দা ফিলিপ জে. উইংফীল্ড। এঁরা দুজনেই ছিলেন ব্যারিস্টার।[১১]

তাঁর স্বরূপের সঙ্কটের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। গ্রেজ ইনের রেজিস্টারে তিনি যেভাবে নিজের নাম লিখিয়েছিলেন, তা থেকেও এই সঙ্কটের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। এখানকার ভর্তির রেজিস্টারে তিনি নিজের নাম লিখেছিলেন — Michael Madhusudana Datta। পিতৃ-পরিচয় দিয়ে লিখেছেন only son of Rajnaraina Datta. (সত্যিকার বয়স ৩৮ হলেও অজ্ঞাত কোনো কারণে লিখিয়েছিলেন ৩১।) যে-মাইকেল নিজের নাম অনেক আগেই পুরোপুরি ইংরেজি ধরনে লিখতে আরম্ভ করেন, তিনি হঠাৎ কোন প্রেরণায় একেবারে সংস্কৃত-ঘেঁষা বানানে নিজের নাম লিখলেন দেশ থেকে ছ হাজার মাইল দূরে এসে, তা অনুমান করা শক্ত নয়। চিরকাল তিনি মনে মনে ইংল্যান্ডে বিচরণ করেছেন, স্বদেশের অনেক কিছুকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেছেন। কিন্তু আজ স্বদেশ থেকে এতো দূরে এসে স্বদেশকে ভোলার সুযোগ পেয়েও ভুলতে পারলেন না, বরং তাঁকেই চাইলেন আঁকড়ে ধরতে

নিজের পরিচয়ের খুঁটো হিশেবে। এর সঙ্গে প্রতিতুলনা করা যেতে পারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামের বানান। মাইকেলের ঠিক দু বছর এগারো মাস আগে ১৮৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর – জ্ঞানেন্দ্রমোহন যখন লিংকনস ইনে ভর্তি হন, তখন তিনি তাঁর নামের বানান লিখেছিলেন যতোটা ইংরেজি ধরনে লেখা যায়, তেমন করে – Ganneundro Mohun Tagore। তা ছাড়া, পিতার নামও তিনি লিখেছিলেন ইংরেজি রীতিতে – Prosonno Kumar Tagore।[১২]

ইনার টেম্পলে ভর্তি না-হয়ে মাইকেল কেন যে গ্রেজ ইনে ভর্তি হলেন, তা জানার উপায় নেই। হঠাৎ তাঁর মন পরিবর্তনের কারণও অজ্ঞাত। তিনি যখন লন্ডনে পৌঁছেন, ততোদিনে কি ইনার টেম্পলে সব আসন পূরণ হয়ে গিয়েছিলো? (অসম্ভব না-হলেও এটাকে খুব বিশ্বাসযোগ্য কারণ বলে মনে হয়


I, Michael Madhusudana Dutta of Calcutta

aged 21 the only son of Rajnarain Dutta late of Calcutta aforesaid Esquire * Do hereby declare, that I am desirous of being admitted a Member of the Hon. Society of Gray's Inn, for the purpose of being called to the English Bar and that I will not, either directly or indirectly, apply for or take out any Certificate to practise, directly or indirectly, as a Special Pleader or Conveyancer, or Draftsman in Equity, without the special permission of the Masters of the Bench of the said Society.

And I do hereby further Declare, That I am not an Attorney-at-Law, Solicitor, a Writer to the Signet, a Writer of the Scotch Courts, a Proctor, a Notary Public, a Clerk in Chancery, a Parliamentary Agent, or Agent in any Court, original or appellate, or a Clerk to any Justice of the Peace; nor do I act, directly or indirectly, in any such capacity, or in the capacity of Clerk of or to any of the persons above described, or as Clerk of or to any Officer in any Court of Law or Equity.

Dated this nineteenth day of August

(Signature) Michael M. Dutta

We, the undersigned, do hereby Certify, that we believe the above-named Michael Madhusudana Dutt to be a Gentleman of respectability, and a proper person to be admitted a Member of the said Society.

Charles John Plumptre Barrister of Gray's Inn 1 Paper Court, Temple

Philip J Wingfield " Barrister of 11 Gray's Inn Square

APPROVED { J. Stephens

Treasurer

Admd 2 Nov. 1862

গ্রেজ ইনে ভর্তির আবেদনপত্র। নামের বানানে পরিবর্তন লক্ষণীয়।

না। কারণ পরের টার্ম শুরু হতে তখনো সাড়ে তিন মাস বাকি।) দূর থেকে ভালো করে না-জেনে তিনি মনে মনে ইনার টেম্পলকে নির্বাচন করেছিলেন। লন্ডনে পৌঁছার পর মনোমোহন অথবা অন্যেরা কি তাঁকে ভিন্ন রকমের পরামর্শ দিয়েছিলেন? অসম্ভব নয়। আর-একটা সম্ভাব্য কারণ – গ্রেজ ইন সবচেয়ে ছোটো প্রতিষ্ঠান বলে সেখানে কোনো বাড়তি সুবিধে আশা করেছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে, সেখান থেকে ব্যারিস্টার হওয়াও তুলনামূলকভাবে সহজ ছিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তিনি কলকাতায় ফিরে গিয়ে যখন ব্যারিস্টার হিশেবে কাজ শুরু করেন, তখন কলকাতা হাইকোর্টে ৪০ জনের বেশি ব্যারিস্টার ছিলেন। কিন্তু গ্রেজ ইন থেকে পাস করা একজন ব্যারিস্টারও ছিলেন না। তাঁর আগে যে-দুজন বাঙালি ব্যারিস্টার হয়েছিলেন – জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর আর মনোমোহন ঘোষ – তাঁরা দুজনেই ব্যারিস্টার হয়েছিলেন লিঙ্কনস ইন থেকে।[১৩]

কয়েক সপ্তাহ তিনি মনোমোহন এবং সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস করেছিলেন বলে তাঁর চিঠি থেকে আভাস পাওয়া যায়। খুব সম্ভব গ্রেজ ইনে ভর্তি হবার পর তিনি অন্যত্র বাসা ভাড়া করেন। আর সত্যেন্দ্রনাথ এবং মনোমোহনও তখন অন্য জায়গায় চলে যান। কবির ভর্তির আবেদনপত্রে তাঁর ঠিকানা

দেওয়া আছে ৫৪ ব্যর্নার্ড স্ট্রীট। এই রাস্তা হলো রাসেল স্কোয়ারের গায়ে লাগানো এবং গ্রেজ ইনের অদূরে। এই ঠিকানায় মনোমোহন এবং সত্যেন্দ্রনাথ থাকতেন, না তিনি তাঁদের কাছ থেকে এসে এখানে বাস করেন, তার হদিস করতে পারিনি। ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে কবি মনোমোহনকে যে-চিঠি লেখেন, তা থেকে মনে হয়, কদিন আগেই তিনি এঁদের সঙ্গে একত্রে বাস করছিলেন।

> (ওখান থেকে) চলে আসার পর আমার খুবই বিষণ্ন এবং মন-মরা মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার এ অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হবে। বিশেষ করে তোমরা যখন শিগগিরই শহরের বাইরে যাচ্ছো। বলা বাহুল্য, তোমাদের দুজনের জন্যে আমার মন খুব খারাপ। সারাক্ষণ তোমাদের কথা মনে পড়ছে। ... আমার সত্যি সত্যি খুব একঘেয়ে এবং বিষণ্ন লাগছে। তোমাদের কাছাকাছি কোনো শস্তা এবং ছোটো বাসা পাওয়া যায় কিনা, আমাকে দয়া করে জানিয়ো। তোমরা এখন যেখানে গেছো, তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছো জেনে আমার ভালো লাগছে।[১৪]

মাইকেল রাজকীয় ব্যাপারে, জাঁকজমকপূর্ণ বিষয়ে খুব উৎসাহ বোধ করতেন। সাহিত্য এবং



১৮৬০-এর দশকে গ্রেজ ইন

ইতিহাসে রাজাদের যে-কাহিনী এবং লন্ডন মহানগরীর যে-বর্ণনা পড়েছিলেন, তা তিনি যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন নিজের চোখ দিয়ে। সে জন্যে, বিষণ্ন মন নিয়ে ঘরে বসে থাকতে চাননি, বরং লন্ডন এবং তার ধারে-কাছে যে-জায়গাগুলো ছিলো, তা তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে চেয়ে-ছিলেন। ১৫ সেপ্টেম্বর, যেমন, তিনি যে-বাড়িতে থাকতেন তার অন্য এক ভাড়াটের সঙ্গে ট্রেনে করে বের হলেন দক্ষিণ লন্ডন ভালো করে ঘুরে দেখার জন্যে। প্রথমে তাঁরা যান বিখ্যাত কিউ [বট্যানিক্যাল] গার্ডেনে। ভারতবর্ষ থেকে আনা গাছপালাও তিনি সেখানে নিশ্চয় দেখে থাকবেন। তারপর রিচমন্ডে। কিন্তু যা তাঁকে তাক লাগিয়ে দেয় তা হলো হ্যাম্পটন কোর্ট – সাড়ে তিন শো বছর ধরে যা ছিলো ইংল্যান্ডের রাজপ্রাসাদ।

> আমি যে কী আশ্চর্যজনক জিনিশ দেখেছি, তা তোমাদের বর্ণনা করতে পারবো না। কিন্তু কী দুঃখের বিষয় যে,

তোমরা লন্ডনের বাইরে যাও না অথবা এসব আশ্চর্যজনক জায়গাগুলো দেখো না। আমরা আমাদের তরুণ বয়সে যেসব শুকনো ঐতিহাসিক তথ্যাদি পড়েছি, এসব জায়গা সেই তথ্যাদির সঙ্গে একটা রোম্যান্টিক বাস্তবতা জুড়ে দেয়। আমি তো এরই মধ্যে হ্যাম্পটন কোর্টের বেশ প্রেমে পড়ে গেছি। এ দেশের কঠোর আবহাওয়ায় যতোটা প্রাচ্য হতে পারে, হ্যাম্পটন কোর্টকে আমার তাই মনে হলো। এই প্রাসাদের অনেকগুলো ভাগ আছে, যাকে বলা যায়: মহল; আর প্রত্যেক ভাগেরই আছে নিজস্ব উঠোন। প্রাসাদের ভেতরে যে-চিত্রগুলো আছে আর এর কারুকার্য-করা সিলিংগুলো চমৎকার।[১৫]

কিন্তু যতো সুন্দর হোক লন্ডনের চারদিক, যতো দেখার মতো জায়গা থাক, তাঁর মূল লক্ষ্যের কথা তিনি ভুলতে পারেন না। মনোমোহন এবং সত্যেন্দ্রনাথকেও তিনি সে কথা মনে করিয়ে দিতে চান। ১৪ নভেম্বর তিনি আবার মনোমোহনকে লেখেন:

কাজ চালিয়ে যাও ভাইয়েরা। যতো পারো সম্মান অর্জন করো। আমরা এটা করার জন্যেই এসেছি। মনে রেখো সমস্ত দেশ T... সম্পর্কে নীরব, কিন্তু আমি বলতে পারি যে, আমাদের তিন জনের কথা নিয়ে আমাদের দেশের লোকেরা অনেক সময়ে আলোচনা করেন।[১৬]



মনোমোহন ঘোষ

প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই T জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। কবি যেদিন কলকাতা ত্যাগ করেন, তার দু দিন পরে – এগারোই জুন তারিখে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্যারিস্টার হন। তবে তিনি দেশের সঙ্গে তাঁর শিকড়ের বন্ধন কেটে ফেলেছিলেন। তা ছাড়া, বিলেতে তিনি ব্যারিস্টার হবার জন্যেও আসেননি। তিনি আগে থেকে লন্ডনে বাস করছিলেন। এক সময়ে তিনি ব্যারিস্টার হবার জন্যে ভর্তি হন লিঙ্কনস ইনে। মাইকেল জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মতো খৃস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু দু জনের মধ্যে পার্থক্য ছিলো অনেক। জ্ঞানেন্দ্র-মোহন তাঁর শিকড় উপড়ে ফেলে একেবারে ইংরেজ বনে গিয়েছিলেন। আর মাইকেল সাহেব হয়েও, বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালি সমাজের সঙ্গে এক ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। সে জন্যে, তিনি যখন ব্যারিস্টার হবার লক্ষ্য নিয়ে বিলেত যাত্রা করেন, তখন কলকাতার শিক্ষিত সমাজ তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অনেক প্রত্যাশা করেছে। তেমনি আইসিএস হবার বড়ো লক্ষ্য নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ এবং মনোমোহন যখন বাঙালিদের মধ্যে সবার আগে বিলেত আসেন, তখনো তাঁদের দিকে দেশবাসী প্রত্যাশার সঙ্গে তাকিয়েছেন। কবি সেই প্রত্যাশার কথা তাঁর তরুণ বন্ধুদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা তখন বাস করছিলেন লন্ডনের বাইরে - উইন্ডসরে। ৮ জানুআরি তিনি মনোমোহনকে লেখেন:

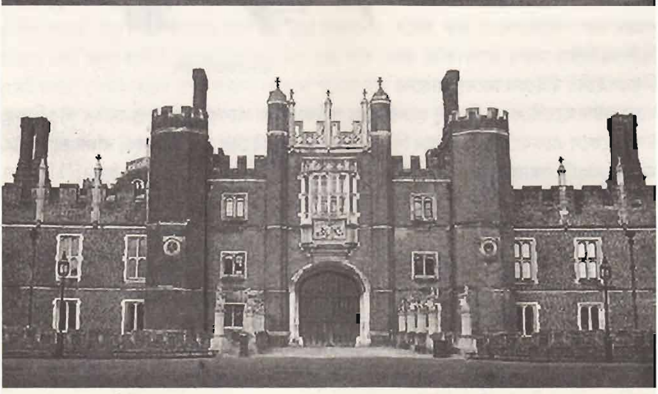
গত দু দিন লন্ডন ভয়ানক কুয়াশায় ঢাকা ছিলো। এ যে কী বর্বরোচিত দেশ! ... তুমি এবং আমাদের খুদে ইন্দ্র (সত্যেন্দ্রনাথ) ভালো করছো জেনে আমি খুশি হয়েছি। মনে রেখো, ভাইয়েরা, আমাদের গোটা জাতির নজর রয়েছে তোমাদের ওপর।[১৭]

নিজের কথাও ভোলেননি। এবং মনে হয়, এ সময়ে তিনি রীতিমতো কঠোর পরিশ্রম করছিলেন তাঁর লেখাপড়া নিয়ে।

> তোমার শ্রদ্ধাভাজন পিতার কাছে আমার ভক্তি জানিয়ো। তাঁকে বোলো যে, আমি যদি দেশে ফিরে যাবার সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তা হলে তিনি যাঁকে এক কালে স্নেহ করতেন এবং নিজের ছোটো ভাই-এর মতো গণ্য করতেন, আমার সেই বাবার সম্মান যাতে নষ্ট না-হয়, তার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।
>
> আপতত বিদায়! তুমি যদি আমাকে অনুমতি দাও, তা হলে আমি তোমাদের শেকসপীয়র পাঠে সাহায্য করবো – তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত নাটকগুলো সম্পর্কে তোমাদের মাঝেমধ্যে প্রশ্ন পাঠিয়ে। তোমরা কোন কোন নাটক পড়ছো আমাকে জানিয়ো।[১৮]

প্রথম যৌবনে তিনি যখন বিলেত যাবার জন্যে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তখন সামনে ব্যারিস্টার হবার





হ্যাম্পটন কোর্ট: ইংল্যান্ডের রাজাদের সাড়ে তিন শো বছরের রাজপ্রাসাদ

কোনো স্বপ্ন ছিলো না। কিন্তু ১৮৬২ সালে শেষ পর্যন্ত তিনি যখন বিলেত যান, তখন তিনি যে আদৌ সাহিত্যের দিকে নজর দিয়েছেন, সমসাময়িক তৃতীয় প্রজন্মের রোম্যান্টিক কবিদের রচনা পড়ে তার প্রশংসা করেছেন — তাঁর কোনো চিঠিপত্র থেকে তার আভাস পাওয়া যায় না। অথবা তিনি পরে সামান্য হলেও যে-টুকু কাব্য চর্চা করেছেন, তা থেকেও তার কোনো পরোক্ষ প্রমাণ মেলে না। বরং আমরা দেখতে পাবো, সে সময়কার ইংরেজি অথবা ফরাসি কাব্যসাহিত্যের যে-ধারা আধুনিক বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলো, তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হননি। প্রথম বারে যতোদিন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে লন্ডনে ছিলেন, ততোদিন তিনি সাহিত্যচর্চা নয়, কেবল আইন অধ্যয়নের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন।

অপরিচিত এবং বন্ধুহীন পরিবেশে স্বদেশ এবং স্বজন তাঁর হৃদয়কে বিশেষ করে অধিকার করে রাখে। স্বদেশে যখন ছিলেন, তখন ভিড় থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার প্রযত্ন করতেন। তিনি যে চারদিকের লোকজনের তুলনায় আলাদা এবং অনেক বড়ো, সে ব্যাপারে সব সময়ে সচেতন থাকতেন। কিন্তু অনেক দূরে এসে এখন সেই স্বদেশ এবং স্বসমাজকে ভালো করে দেখতে পেলেন। এই স্বদেশ এবং সমাজকে তিনি কতো ভালোবেসেন, তাও অনুভব করেন। এই পরিস্থিতিতে কোন জগতের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে করবেন, তা নিয়ে সত্যি সত্যি সংকটে পড়লেন তিনি। চেষ্টা করেও এখন ভিন দেশ এবং ভিন সমাজের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারলেন না। তাঁর স্বপ্নের ইংল্যান্ড এবং যে-ইংল্যান্ডকে তিনি সত্যি সত্যি দেখতে পেলেন, তার মধ্যে হয়তো বা তেমন সাদৃশ্যও খুঁজে পাননি। (না-দেখা ইয়ারো, সব সময়েই দেখা-ইয়ারোর থেকে আলাদা!) সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে-বড়ো ইংরেজকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, লন্ডনের ভিড়ে তাকেও কি দেখতে পেয়েছেন? মাদ্রাস এবং কলকাতায় তিনি ইংরেজদের বর্ণবাদ দেখেননি, তা নয়। যদিও সেখানে লাখ লাখ লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় ইংরেজদের বর্ণবাদ তাঁকে হয়তো অতোটা পীড়া দেয়নি। কিন্তু কলকাতা থেকে জাহাজে ওঠার পরেই তিনি অন্য রকমের পরিবেশ লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছিলেন। সে জন্যে, দ্রুত এবং কৃতিত্বের সঙ্গে নিজের কাজ শেষ করে দেশে ফিরে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। নিজের পরিবার ফেলে এসেছিলেন — সে-ও অবশ্য একটা পিছুটান হিশেবে কাজ করেছে। এ কারণে, তিনি বারবার নিজের লক্ষ্যের কথা স্মরণ করেছেন এবং মনোমোহন আর সত্যেন্দ্রনাথকেও তা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

এভাবে সব কিছু চলতো পারতো। কিন্তু হঠাৎ বাধা এলো একেবারে অপ্রত্যাশিত পথে। যাঁর কাছে নিজের তালুক পত্তনি দিয়ে এসেছিলেন, সেই মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ১৮৬২-৬৩ সালের জন্যে যে-টাকা পাবেন বলে আশা করেছিলেন, বছরের শেষ দিকে (১৮৬২) অথবা পরের বছরের প্রথম দিকে তা পেলেন না। এই টাকার প্রথম কিস্তি পাওনা হয়েছিলো ডিসেম্বর মাসে। মহাদেবের কাছে ১৮৬১ সাল বাবদেও প্রায় ৫০০ টাকা পেতেন বলে দাবি করেছেন। কোনো রকমের হুঁশিয়ারি ছাড়া সেই মহাদেব তাঁকে টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন। প্রথম চুক্তি অনুযায়ী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন আর চৈত্র (ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল) মাসে মোট প্রায় তিন হাজার টাকার (দ্বিতীয় চুক্তি অনুযায়ী দু হাজার টাকার) কিছু লন্ডনে মাইকেলকে এবং কিছু কলকাতায় হেনরিয়েটাকে দেবার কথা। কিন্তু মহাদেব চট্টোপাধ্যায় এই টাকার মধ্যে ২৩ নভেম্বর তারিখে হেনরিয়েটাকে দিয়েছিলেন মাত্র এক শো টাকা।[১৯] কবিকে কোনো টাকা পাঠাননি।

লন্ডনের ছোটো একটি ঘরে বসে লেখাপড়া করার যে-প্রাত্যহিক নিয়ম তিনি করে নিয়েছিলেন, হেনরিয়েটার চিঠি পেয়ে তাতে ছেদ পড়লো। সম্পূর্ণ বন্ধুহীন পরিবেশে হেনরিয়েটা এবং তাঁদের দুটি ছোটো সন্তান হয়রানির শিকার হচ্ছেন, এ কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হন। কলকাতা ছাড়ার আগে ব্যবস্থা হয়েছিলো মহাদেব হেনরিয়েটাকে মাসে মাসে ১৫০ টাকা দেবেন। এই টাকার একটা অংশ তিনি

অগ্রিমও দিয়েছিলেন মে-জুন মাসে (১৮৬২)। যাবার আগে কবি সেই টাকা অরিয়েন্টাল ব্যাংকে রেখে গিয়েছিলেন।[২০] কিন্তু তিনি কলকাতা ছাড়ার পর মহাদেব, যেমনটা এই মাত্র লক্ষ্য করেছি, নভেম্বর মাসে হেনরিয়েটাকে কেবল ১০০ টাকা দিয়েছিলেন। কবি হেনরিয়েটাকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর জ্ঞাতি ভাই-এরা যতো দিন না তাঁর মায়ের অলংকার ফিরিয়ে দেন, ততো দিন তিনি যেন

মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পাদিত দলিলের প্রতিলিপি

ডৌল বন্দবস্ত রূপেয়া জেলা জসহারের অন্তপাতি সুন্দরবনের ২২০ নম্বর লাটের মধ্যেগত চকমুনকিয়া ও গদারডাঙ্গা তালুকদার ও গাঁতিদার শ্রীমাইকেল মধুশুদন দত্ত মফস্বল তালুকদার ও দরগাঁতিদার শ্রীমক্ষ্যদা দেবী জওজে শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায় সাকিন পাইকপাড়া – পরগণে হোগলা থানা নওয়াবাদ হালসাকিন বাহিরশীমলা – সহর কলিকাতা – ইতি -

আসামী জুমনা

ইং সন ১২৬৮ সাল বাং সন ১২৭৪ সাল শালীয়ানা মুদ্দত ৭ বৎসর কোম্পানি ২৯৯৭৷৷

ইং সন ১২৭৫ সাল সর্ব্বকার জন্য কোম্পানি ৩৫০১

আমার বিষয় উদ্ধার ও দেনা পরিশোধ জন্য আপনার স্বামি অনেক সাহায্য ও যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অদ্য পর্য্যন্ত আমার মকদ্দমার খরচ ও দেনা পরিশোধ জন্য ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে উক্ত দুই চক তাঁহাকে কামি বন্দবস্ত করিয়া দিবার অঙ্গীকার ছিল তদনুজাই তাঁহার প্রার্থনা মতে উপরের লিখিত ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পণে উক্ত চকমুনকিয়া ও গদারডাঙ্গা ১২৬৮ সনের প্রথমাবধি আপনাকে মফস্বলে তালুক ও তাঁতিদার করিয়া দেওয়া গেল এবং-তাহার শালিয়ানা জমা ইং ১২৬৮ নাং ১২৭৪ সাল মুর্দ্দত ৭ বৎসর মং ২৯৯৭৷৷ উনত্রিশ শত সাড়ে সাতানব্বই টাকা ও ইং ১২৭৫ সাল সর্ব্বদার জন্য মঃ ৩৫০১ পৌত্রিশ শত এক টাকায় অবধারিত হইল আপনি উক্ত উভয় চকের হাসিল পতিত রাইয়তি খামারদীগর আবাদীয়াতে ও জলকর ও বনকর ও ফলকর ইত্যাদি দরোবস্ত হকুকে দখলিকার হইয়া মালগুজারির টাকা নিম্নলিখিত কিস্তিবতী-বন্দী মোতাবেক সন বসন মাহ বমাহ কিস্তী বকিস্তী সরবরাহ পূর্ব্বক পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে দান বিক্রয় অধিকারিণী হইয়া ভোগ দখল করিবেন কিস্তী খেলাপ করিলে শতকরা মাসীক ১ এক টাকা হিসাবে শুদ দিতে হইবেক ... যে পর্য্যন্ত আমি অন্য কোন নিয়ম না করিব সে পর্য্যন্ত আমার প্রাপ্য টাকার মধ্যে আপনি ও আপনার ওয়ারিশান সন সন মঃ ৩০০ তিন শত টাকা শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় ও তাঁহাদের ওয়ারিশানকে দীবার তাহাদের নিকট রশীদ লইবেন ঐ রশীদ ও কালেকট্রিরি দাখিলা আমার নিকট দাখিল করিলে ঐ টাকার দাখিলা পাইবেন ... ইতি সন ১২৬৮ আটসট্টি সাল – তারিখ ৯ই আশ্বিন -

কাত কিস্তী বন্দী

ইং ১২৬৮ সাল না ৭৪ সাল

মুদ্দত ৭ সাল বৎসর

মাহ পৌষ ৷৷	৩৭৪ টাকা ১১ আনা	৪৩৭ টাকা ১১ আনা
মাহ মাঘ ৷৷	৭৪৯ টাকা ৬ আনা	৮৭৫ টাকা ৮ আনা
মাহ ফাল্গুন	১১২৪ টাকা ১ আনা	১৩১২ টাকা ৫ আনা
মাহ চৈত্র ৷৷	৭৪৯ টাকা ৬ আনা	৮৭৫ টাকা ৮ আনা
	২৯৯৭ টাকা ৮ আনা	৩৫০১ টাকা

তাঁদের কোনো রকম আমলে না-আনেন।[২১] কিন্তু কবি কলকাতা ত্যাগ করার পর জ্ঞাতি ভাই-এরা অলংকার তো ফিরিয়ে দেনইনি, তদুপরি মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে ২৬/২৭ বছরের একটি নির্বান্ধব মহিলাকে নানাভাবে বিব্রত করার প্রয়াস পান। পরে কবি এটাকে অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে মহাদেব চট্টোপাধ্যায় এবং তার নিজের জ্ঞাতি ভাইদের ষড়যন্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন।[২২] তাঁরা কি আশা

করেছিলেন, মাইকেল দেশছাড়া, এই অবস্থায় তাঁর পরিবারকেও যদি দেশ-ছাড়া করা যায়, তা হলে তাঁরা তাঁর সম্পত্তিতে আবার হাত দিতে পারবেন?

এই পরিস্থিতিতে কী করা যায়, তা নিয়ে মাইকেল এবং হেনরিয়েটা উভয় নিঃসন্দেহে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হেনরিয়েটা লন্ডনে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কবির সম্মতি নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন — এমনটা অনুমান করাই সঙ্গত। এ সময়ে বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে তিনি পরামর্শ এবং টাকা আদায়ে সাহায্য পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। কবির চিঠি থেকে জানা যায় যে, বিলেত যাত্রার আগে হেনরিয়েটাকে মহাদেব ১০ জানুআরি (১৮৬৩) তারিখে ৫০ টাকা, ফেব্রুআরি মাসে ৯৫ টাকা, এবং ২২ মার্চ তারিখে ১৩০০ টাকা শোধ দেন।[২৩]

এ হিশেব থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে, মহাদেব ১৮৬২-৬৩ সালের মোট পাওনা দু হাজার টাকার মধ্যে ১৫৪৫ টাকা শোধ দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে পাওনা ছিলো ৪৫৫ টাকা। নিঃসন্দেহে তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন। তবে তা সত্ত্বেও, বিদ্যাসাগরের কাছে মহাদেব এবং তাঁর জামিনদারদের কবি যতোটা দায়ী করেন, তাঁরা আসলে ততোটা দায়ী ছিলেন না। কবির পরবর্তী চিঠিপত্র থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, এ ব্যাপারে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়েরও একটা বক্তব্য ছিলো। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কয়েকটি চিঠি আদান-প্রদানের পর মহাদেবের প্রতি কবির ভাষা এবং মেজাজ তাই অনেকটা নরম হয়েছিলো।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিলেত যাবার আগে টাকা আদায় করতে পারা সত্ত্বেও, হেনরিয়েটা চলে গেলেন কেন? ভবিষ্যতে যাতে আবার ঝামেলায় পড়তে না-হয়, সেটা একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু আর-একটা কারণের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গৌরদাস এবং বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে কবি বারবার কলকাতায় তাঁর নামে মিথ্যে অপবাদ রটনা করার জন্যে 'শত্রুদের' দায়ী করেছেন এবং এতে কান না-দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু অপবাদটা কিসের, তা উল্লেখ করেননি। কারো কারো লেখা থেকে মনে হয়, এ অপবাদ ছিলো কবির ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে — সোজা কথায় — নারীঘটিত অপবাদ।[২৪] এর বছর খানেক পরে এমন অপবাদও রটেছিলো যে, তিনি ফ্রান্সের কারাগারে বন্দী আছেন।[২৫] নারীঘটিত অপবাদ যদি হেনরিয়েটার কানে উঠে থাকে, তা হলে তাঁর পক্ষে বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। স্ত্রী এবং তিন-চারটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও মাইকেল কিভাবে তাঁর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, আর যেই ভুলুক, হেনরিয়েটার তা ভোলার কথা নয়। তা ছাড়া, কবির চিঠি থেকে জানা যায়, তাঁর আত্মীয়রা হেনরিয়েটাকে যথেষ্ট বিব্রত করেছিলেন। কিন্তু কারণ যাই হোক, তিনি লন্ডনে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

ওদিকে, লন্ডনেও চিরদিনের বেহিশেবী কবি অর্থ সংকটে পড়েন। এই সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মাঝেমধ্যে তিনি মনোমোহনের কাছ থেকে ধারও করেন। যেখানে তিনি থাকতেন, সেই বাড়িওয়ালার কাছে ধার হওয়াও স্বাভাবিক। আসলে লন্ডনে বসে নিজে আড়াই শো টাকা আর কলকাতায় হেনরিয়েটা দেড় শো টাকা করে পাওয়ার যে-ব্যবস্থা তিনি করে গিয়েছিলেন, তা মোটেই সন্তোষজনক ছিলো না। কারণ ব্যয়ের চেয়ে তাঁর আয় ছিলো কম। মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তাঁর বছরে (শেষ চুক্তি অনুযায়ী) দু হাজার টাকা পাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু কলকাতা এবং লন্ডন মিলে মাসে চার শো টাকা করে ব্যয় হলে বছরে আরও প্রায় তিন হাজার টাকার ঘাটতি পড়ার কথা। ধার করে বিলেত যাবার খরচ জোগাড় করলেও, এই ঘাটতি পূরণের স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা তিনি করে যেতে পারেননি। প্রবাসে তাঁর দারুণ ভোগান্তির বীজ তিনি নিজেই বপন করে গিয়েছিলেন।

মহাদেব টাকা পাঠানো বন্ধ করায় কবি যে-দুজনকে জামিন রেখে এসেছিলেন — দিগম্বর মিত্র আর বৈদ্যনাথ মিত্র — তাঁদের তিনি জরুরী চিঠি লেখেন। কিন্তু কারো কাছ থেকে কোনো স্পষ্ট জবাব

পাননি। দিগম্বর মিত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিলো তার প্রমাণ মেলে *মেঘনাদবধ কাব্য* তাঁকে উৎসর্গ করার ঘটনা থেকে। ওদিকে, বৈদ্যনাথ তাঁর নিজের জ্ঞাতি এবং আবাল্য তাঁর পিতার প্রতিপালিত। এঁকে এবং এঁর সহোদর দ্বারকানাথকে (ডায়মন্ড হারবারের উকিল) তিনি বিলেত যাত্রার মাত্র দু দিন আগে — ৭ জুন তারিখে — চক মুনকিয়ার সাড়ে চার আনা, সাগরদাঁড়ীর পৈতৃক বাড়ির অংশ ও অন্য কিছু সম্পত্তি দান করেছিলেন।[২৬] এই সম্পত্তির দাম ছিলো মোট পাঁচ হাজার টাকা।[২৭] এখন তাঁরা কিভাবে মাইকেলের দুঃসময়ে এমন নীরব ভূমিকা পালন করেন, সেটা নিতান্ত বিস্ময়ের ব্যাপার।

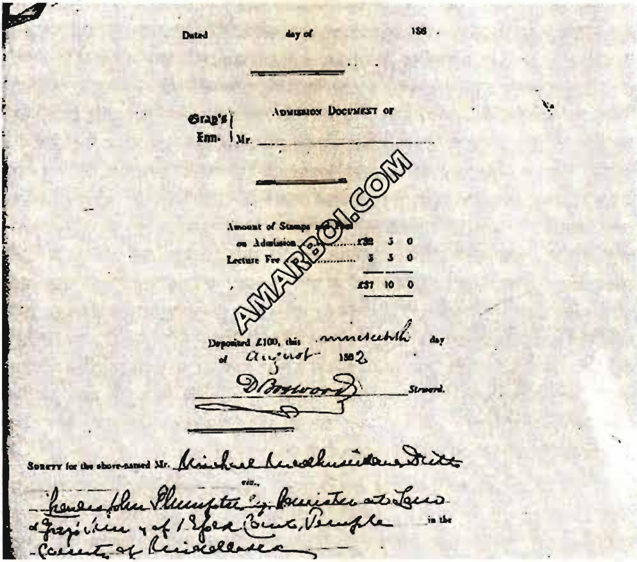
কবি কলকাতা ত্যাগ করার সাড়ে ন মাস পরে — ১৮৬৩ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে হেনরিয়েটা কলকাতা ত্যাগ করে লন্ডনের পথে যাত্রা করেন। তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন সম্ভবত ২৩ মার্চ — *বেঙ্গল* জাহাজে করে। কলকাতা ত্যাগ করার আগের কয়েক মাস কবির জ্ঞাতিদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হওয়া ছাড়াও তিনি আর্থিক সংকটে ছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু বিদেশ যাত্রা করার আগে যেখানে যতো টাকা পাওনা ছিলো তা আদায় করার ব্যাপারে সব রকমের চেষ্টা করেন।[২৮] (আগেই দেখেছি, তিনি মহাদেবের কাছ থেকে জানুআরি মাস থেকে তিন কিস্তিতে ১৪৪৫ টাকা আদায় করতে সমর্থ হন।) তারপর নিরুপায় এই নারী দুটি সন্তানকে নিয়ে কলকাতা থেকে লন্ডনে গিয়ে পৌঁছেন দোসরা মে (১৮৬৩) তারিখে।[২৯]

পরিবার লন্ডনে যাবার ফলে কবির বিপদ বেড়ে যায় অনেক গুণ। পরিবার এলে সবাইকে নিয়ে তিনি কোথায় থাকবেন, কি করবেন — এটা নিশ্চয় আগে থেকে ভেবে রেখেছিলেন। তবে তিনি কোথায় কিভাবে থাকেন, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। হেনরিয়েটার পিতা, জর্জ জাইলস হোয়াইট জন্মেছিলেন লন্ডনের উপকণ্ঠ ফুলহ্যামে। সেই সূত্রে কোনো আত্মীয়ের কাছে হেনরিয়েটা আশ্রয় পেয়েছিলেন, এটা মনে করা শক্ত। অনুমান করি, তিনি কলকাতা থেকে যে-টাকাপয়সা নিয়ে আসেন, তা দিয়ে খুব কম ব্যয়ের একটি বাড়ি ভাড়া করেন এবং কোনো মতে সংসার চালাতে থাকেন। তিনি সংসার গুছিয়ে বসার পর, জুন মাসে কবি বিশেষ তাড়া দিয়ে দিগম্বর মিত্রকে চিঠি লেখেন মহাদেবের কাছে তাঁর পাওনা টাকাপয়সার ব্যাপারে। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত এই টাকার পরিমাণ ছিলো এক হাজারেরও কম। কিন্তু কবির হিশেবে তিন হাজারেরও বেশি। তিনি আশা করতে থাকেন দিগম্বর মিত্র এবং বৈদ্যনাথ মিত্র পৌষ মাস আসার আগে টাকা আদায় করে পাঠাতে পারবেন। পত্তনির শর্ত অনুযায়ী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের পৌষ মাসে পরবর্তী বছরের (১৮৬৩-৬৪) প্রথম কিস্তি টাকা দেবার কথা। পৈতৃক বাড়ি যাঁর কাছে বিক্রি করেছিলেন, সেই হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও কবি তখনো পাঁচ শো টাকা পেতেন। আলিপুর কোর্টের বি এন মিত্রের কাছে পেতেন এক হাজার টাকা। তাঁদের কাছেও তাগাদা দিয়ে চিঠি লেখেন।

জুন মাসে (১৮৬৩) তিনি গ্রেজ ইনে চারটি টার্ম পড়া শেষ করেন। প্রতিটি টার্মে ছটি করে ডিনার খেতে হতো। এবং সাধারণ ক্ষেত্রে মোট ৭২টি ডিনার খাওয়ার পর অর্থাৎ ১২টি টার্ম লেখাপড়া করার পর ব্যারিস্টার হিশেবে ডাক পড়তো। এই হিশেবে তাঁর ব্যারিস্টার হতে তখনো দু বছর বাকি। দেশ ছাড়ার আগে তিনি হিশেব করে দেখেছিলেন যে, কলকাতায় হেনরিয়েটার জন্যে দেড় শো এবং লন্ডনে তাঁর নিজের জন্যে আড়াই শো — এই মোট চার শো টাকা করে মাসে পেলে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করতে পারবেন। পরিবার লন্ডনে আসার পর তিনি লক্ষ্য করেন যে, মাসে চার শো থেকে সাড়ে চার শো টাকার কম সংসার চালানো যায় না। এই হিশেবে পরবর্তী দু বছরের জন্যে তাঁর আরও অন্তত দশ হাজার টাকা ব্যয় হবার কথা। যাতে এ টাকা নিয়মিত পেতে পারেন, তার জন্যে তিনি তাঁর প্রতিনিধিদের ওপর জুন মাস থেকে যথেষ্ট চাপ দিতে থাকলেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশা এবং

কলকাতার সাড়া এক পথে যায়নি। হিশেবে আরও গরমিল দেখা দিলো হেনরিয়েটা কলকাতা ছেড়ে চলে আসায়। কলকাতায় থাকলে তিনি পরিচিতদের কমবেশি প্রভাবিত করতে পারতেন।

সন্তানদের নিয়ে জাহাজে আসার জন্যে হেনরিয়েটার অনেক টাকা — দু হাজার টাকার চেয়ে বেশি — খরচ হয়েছিলো। তার পরও তাঁর হাতে কিছু টাকা অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু এই টাকা দিয়ে বেশি দিন য়োরোপে থাকা যাবে না, বেহিশেবী কবির পক্ষেও এটা হিশেব করতে কষ্ট হয়নি। তিনি বিবেচনা করে দেখলেন যে, লন্ডনে থাকলে তুলনামূলকভাবে ব্যয় অনেক বেশি হবে। তার কারণ সেখানকার জীবনযাত্রা মহার্ঘ। তদুপরি, সেখানে যেহেতু পরিচিত কয়েকজন লোক আছেন, সে জন্যে তিনি তাঁর মানমর্যাদার অনুপযুক্ত অবস্থায় বাস করতে পারেন না। এই অবস্থায় তিনি ভাবতে শুরু করেন, অবশিষ্ট সামান্য টাকা নিয়ে তিনি লন্ডন ছেড়ে এমন একটা জায়গায় যাবেন যেখানে থাকতে ব্যয় কম হবে এবং


Dated day of 186 .

Gray's Inn. Admission Document of Mr.

Amount of Stamps and Fees on Admission £32 5 0
Lecture Fee 5 5 0
£37 10 0

Deposited £100, this nineteenth day of August 1862

D Bosworth Steward.

Surety for the above-named Mr. Michael Madhusudan Dutt

গ্রেজ ইনের হিসাবের খাতায় টাকা জমা দেবার প্রমাণ

তাঁকে কেউ চিনবেও না। নিদেন পক্ষে নিজের পরিবারকে রাখবেন সেখানে। তারপর টাকাপয়সা এসে গেলে তখন আবার গ্রেজ ইনে ফিরে লেখাপড়া শেষ করবেন। এ রকমের জায়গা হিশেবে তিনি নির্বাচন করলেন ফ্রান্সের ভার্সাইকে। অজানা জায়গায় গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার সাহস অনেকেরই হয় না। বিশেষ করে বাঙালিদের এ ব্যাপারে কোনো খ্যাতি নেই। কিন্তু কবির মধ্যে এই অ্যাডভেঞ্চারের মনোভাব ছিলো — আগেই আমরা তা লক্ষ্য করেছি। আসলে এ তাঁর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইংল্যান্ডের কোনো গ্রাম বেছে না-নিয়ে তিনি ফ্রান্সে যাবার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন, তার কোনো ব্যাখ্যা

এ যাবৎ কেউ দেননি। কিন্তু তাঁর চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করলে এ সম্পর্কে কোনো আভাস পাওয়া যায় না, তা নয়। বিদ্যাসাগর এবং গৌরদাসকে লেখা তাঁর বেশ কয়েকটি চিঠিতে তিনি ইংল্যান্ডের আবহাওয়াকে দোষারোপ করেছেন। ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা তাঁকে এ ব্যাপারে দায়ী করবেন না।

কিন্তু আসল কারণ সম্ভবত তখনকার ইংরেজ সমাজের বর্ণবাদ। সাম্প্রতিক কালে মধ্য-ভিক্টোরিয়ান আমলের বর্ণবাদ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি ভালো গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে দেখা যায়, তখনকার ইংল্যান্ডে বেশ কয়েক হাজার কালো লোক বাস করতেন এবং তাঁদের দারিদ্র্যের সীমা ছিলো না। তার চেয়েও বড়ো কথা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের অনেক লোক এদের প্রতি সহানুভূতিবর্জিত ব্যবহার করতেন। ১৮৬৫ সালের *টাইমস* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে যেমন লন্ডনের দু শো ভারতীয় ভিখিরির করুণাবস্থা এবং তাঁদের প্রতি সমাজের নিতান্ত নির্দয় আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন একজন ছাত্র। হেনরি মেহিউও তাঁর বইতে (১৮৬১) ভারতীয় ভিখিরিদের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন।[৩০] ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত *The Asiatics in England* নামে আর-একটি বইতে দেখতে পাই, লন্ডনের রাস্তায় ভারতীয় নাবিকরা কী শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন।[৩১] মাইকেল ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যক্তি। কলকাতা অথবা মাদ্রাসে তিনি ইংরেজদের বর্ণবাদী মনোভাব দেখে তাঁদের বন্ধু হতে পারেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিলেন সবাই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, অথবা এমন ইংরেজ যাঁরা বর্ণবাদী ছিলেন না। ইংল্যান্ডে আসার পর তিনি বাধ্য হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে থেকেছেন, কিন্তু ঘরে-বাইরে ইংরেজদের প্রভুসুলভ মনোভাব দেখে তাকে মেনে নিতে পারেননি। ফ্রান্সে তিনি এই মনোভাব দেখতে পাননি। সে জন্যে গৌরদাসকে পরে লিখেছিলেন, 'ফ্রান্সে তোমাকে কেউ ড্যামড্ নিগার বলে গালি দেবে না। এখানে তুমি তোমার প্রভুদেরও প্রভু।'[৩২] শ্যামলা চামড়ার মাইকেল লন্ডনে আসার ষোলো বছর পরে আসেন প্রায় ইংরেজদের মতো ফর্শা চামড়ার এবং ইংল্যান্ডের সমাজে আগে থেকে পরিচিত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে দেখে রাস্তার ছেলেমেয়েরা কি রকম ব্ল্যাকি বলে বিস্ময় এবং কৌতূহল প্রকাশ করেছিলো রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে তা লিখেছিলেন। এমন কি, তিনি যখন ডক্টর জন স্কটের বাড়িতে টাকা-দেওয়া অতিথি হিশেবে থাকতে চান, তখন সে বাড়ির দুই কন্যা 'জঙ্গলি' রবীন্দ্রনাথের প্রতি কেমন মনোভাব দেখিয়েছিলেন, তাঁর চিঠি থেকে তার সকৌতুক কিন্তু সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩৩] ডক্টর স্কট এবং তাঁর স্ত্রী মেরীর স্নেহবশত রবীন্দ্রনাথের প্রতি বাড়ির আবহাওয়া অচিরে বদলে গেলেও মাইকেলের ভাগ্য ততো ভালো ছিলো না।

আমরা জানি, মাদ্রাসে যাবার ব্যাপারে এবং সেখানে চাকরি পেতে কবিকে সহায়তা করেছিলেন বিশপস কলেজের বন্ধু চার্লস এগবার্ট কেনেট। ভার্সাই যাবার বুদ্ধি এবং সেখানে গুছিয়ে বসার ব্যাপারেও কোনো পরিচিত লোকের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন — এমনটা অনুমান করা সঙ্গত। এই পরিচিত ব্যক্তি কে — আরও তথ্য উদ্‌ঘাটিত না-হলে বলা সম্ভব নয়। ১৮৬৩ সালের অনেকটা সময় রেভারেন্ড জেমস লঙ ফ্রান্সে কাটিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কবির পরিচয় এবং যোগাযোগ ছিলো। ভারতবর্ষীয়দের ইংল্যান্ড যাবার ব্যাপারে লঙের বিশেষ উৎসাহও ছিলো। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দিগম্বর মিত্রের পুত্র (এবং আরও কয়েকজন) বিলেতে যাচ্ছেন বলে তিনি তাঁর বিভিন্ন সময়ের চিঠিতে উৎসাহের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[৩৪] কিন্তু প্যারিস থেকে লেখা তাঁর কোনো চিঠিতে কবির নাম খুঁজে পাইনি। সে যাই হোক, মাদ্রাসে গিয়ে মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামে পড়িয়ে তিনি এক সময়ে জীবিকা উপার্জন করেছিলেন। অসম্ভব নয় যে, এবারে ভেবেছিলেন ফরাসিদের ইংরেজি পড়িয়ে তিনি জীবিকা উপার্জন করবেন। কাজ করার কোনো রকমের ভরসা না-পেয়ে অথবা মাত্র কয়েক সপ্তাহ সেখানে

থাকতে হবে, এ কথা ভেবে তিনি ভার্সাইতে গিয়েছিলেন – এটা বিশ্বাস করা শক্ত। তিনি যথার্থই অনুমান করেছিলেন যে, কলকাতায় টাকাপয়সা নিয়ে যে-জট তৈরি হয়েছে, তা খুলতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে। তবে যতোটা সময় লাগবে বলে তিনি ধারণা করেছিলেন, পরে দেখা যাবে, সময় এবং প্রয়াস লেগেছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি।

ফ্রান্সে বাস করার জন্যে লন্ডনের তুলনায় মাসে প্রায় এক শো টাকা কম লাগবে – আপাতদৃষ্টিতে এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি লন্ডন ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু আয় করার ভরসা যদি করেও থাকেন, তা সফল হয়নি। আগের আলোচনা থেকে দেখেছি, তিনি ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করতেন না। বস্তুত, ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বেশ কয়েক বার তাঁর জীবনের গতি আমূল পাল্টে ফেলেছিলেন। তাঁর খৃষ্টান হওয়া, মাদ্রাসে যাওয়া, হেনরিয়েটার সঙ্গে প্রেম করা, রেবেকা এবং সন্তানদের ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসা, ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত আসা – সবই এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এসব ঝুঁকি থেকে তিনি যে সব সময়ে ভালো ফল পাননি, তা কি নিজে হাড়ে হাড়ে টের পাননি? নিরন্তর কল্পনার জগতে বিচরণ করলেও, মাঝেমধ্যে এটা তিনি অনুভব করে থাকবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেমন ১৮৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি একবারে অজানা মাদ্রাসের দিকে পাল তুলেছিলেন, তেমনি এবারে যাত্রা করলেন সম্পূর্ণ অজানা ভার্সাই শহরের দিকে। ১৮৬৩ সালের জুন মাসের ১৭ তারিখে গ্রেজ ইনে ট্রিনিটি টার্মের লেখাপড়া শেষ করার পরপরই তিনি লন্ডন ছেড়েছিলেন। গ্রেজ ইনে ভর্তির সময়ে তিনি যে-টাকা (এক শো পাউন্ড) জমা রেখেছিলেন, এ সময়ে তিনি তার মধ্য থেকে ২০ পাউন্ড ধার করেন।[৩৫] এ থেকে অনুমান হয়, হেনরিয়েটা যে-টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন, তার পরিমাণ বেশি ছিলো না। তাঁর জীবনীকারদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি প্রথমে প্যারিসে এবং তারপরে ভার্সাইতে বাস করেন।[৩৬] এই বক্তব্যের পক্ষে কোনো তথ্য অথবা যুক্তি তাঁরা দেননি। আমার কাছে এটাকে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন সেখানে কম ব্যয়ে বেঁচে থাকার জন্যে। প্যারিস তখনো বড়ো নগরী এবং সেখানকার জীবনযাত্রা ভার্সাই থেকে মহার্ঘ হবে – এটা জানা কথা। সমকালীন একটি ইংরেজি ভ্রমণ কাহিনী থেকে দেখেছি, তখন প্যারিসের একটা মোটামুটি ভালো রেস্তোরাঁয় এক বেলা খেতে ব্যয় হতো দেড় শিলিং – তখনকার প্রায় দুই ফ্রাঁ।[৩৭] সেকালে এ অর্থ দিয়ে অনেকের এক সপ্তাহ চলে যেতো। আসলে যা হয়ে থাকবে, তা হলো: তিনি ভার্সাইতে যাবার পথে কদিন প্যারিসে থাকেন। এর আগে তিনি কখনো প্যারিসে গেছেন বলে মনে হয় না। কাজেই আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও প্যারিস ঘুরে দেখা তাঁর মতো কৌতূহলী ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক।

প্যারিস থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত ভার্সাই নগরীতে ছিলো ফ্রান্সের এক কালের প্রতাপশালী রাজার প্রাসাদ। রাজা চতুর্দশ লুই সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বিশাল এবং বিলাসবহুল প্রাসাদ তৈরি করেন। তাঁর কর্মচারী, প্রহরী এবং সৈন্যসামন্ত আর তাঁদের পরিবার মিলে এই ছোট্টো শহর গড়ে ওঠে ১৬৭১ সাল থেকে। রাজার প্রাসাদ এতো বড়ো ছিলো যে, প্রাসাদেই প্রায় হাজার খানেক কর্মকর্তা এবং তাঁদের প্রায় চার হাজার সহায়ক কর্মচারী বাস করতেন। এক শো বছরের চেয়েও বেশি সময় ধরে এই শহর ছিলো ফ্রান্সের রাজধানী। সে জন্যে ফরাসি বিপ্লবের প্রথম ঢেউও বয়ে গিয়েছিলো এই শহরের ওপর দিয়ে। মাইকেল যখন এই শহরে বাস করতে যান, তার ২৬ বছর আগে লুই ফিলিপ রাজপ্রাসাদকে একটা মিউজিয়মে পরিণত করেন। সমস্ত য়োরোপের মধ্যে এখনো যেসব জায়গা দেখতে সবচেয়ে বেশি লোক ভিড় জমান, ভার্সাই প্রাসাদ তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৬০ এর দশকে এই শহরের জনসংখ্যা ছিলো মাত্র হাজার চল্লিশ। (সওয়া শো বছর পরে এখনো এর জনসংখ্যা এক লাখের কম। ১৯৮২ সালের জনসংখ্যা ৯১ হাজার।) কবি এই শহর ছেড়ে কলকাতা চলে আসার

মাত্র কয়েক বছর পর জর্মান সৈন্যরা ১৮৭০ সালে প্যারিস দখল করে। এর পর আর একবার ভার্সাই শহর প্রশাসনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৭১ সালে জর্মান সম্রাটের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় এই শহরে। জর্মানরা চলে যাবার পর আট বছর ধরে ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ ছিলো ফরাসি প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্ট-ভবন।

ভার্সাইতে তাঁর জীবনের পরবর্তী আড়াই বছরের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, তিনি সেখানে কোনো কাজ পাননি। সামান্য যে-টাকাপয়সা তখনো হাতে ছিলো, তা দিয়ে যাতে সবচেয়ে বেশি সময় টিকে থাকা যায়, তার জন্যে তিনি অথবা হেনরিয়েটা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। জানুআরি মাস নাগাদ, তাঁর যে-সঞ্চয় ছিলো, তা ফুরিয়ে যায়। তারপর থেকে জমতে থাকে দেনা। তিনি ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন রু দ্য শাঁতিয়ে নামে একটি রাস্তায়। এই রাস্তার ১২ নম্বর বাড়িতে। তিন তলার এই বাড়িটি ছিলো নিতান্তই ছোটো এবং এই বাড়িতে থাকতো ১৮টি পরিবার। ভার্সাই-এর সরকারী আর্কাইভসে রক্ষিত নথি থেকে দেখা যায়, ১৮৬৪-৬৭ সালে এই বাড়ির মোট আঠারোটি পরিবারের মধ্যে বারোটি পরিবার দাতব্য তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য নিয়েছিলো।[৩৮] এ থেকে বোঝা যায়, তিনি কতো নিচু মানের এবং শস্তা একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন এবং পড়শি হিশেবে তিনি কোন ধরনের লোকদের পেয়েছিলেন।

অবশ্য এই পরিবেশকে মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর কোনো উপায় ছিলো না। তদুপরি, নিজের বাড়ি যেমনই হোক না কেন, ভার্সাই ছিলো সুন্দর শহর। বিশেষ করে বিশাল রাজপ্রাসাদ এই ছোট্টো শহরটিকে এর ক্ষুদ্রতা থেকে অনেক ওপরে টেনে তুলেছিলো। আগেই দেখেছি, তিনি হ্যাম্পটন কোর্টের প্রেমে পড়েছিলেন। এখন তার চেয়ে অনেক বড়ো এবং আড়ম্বরপূর্ণ এই ভার্সাই প্রাসাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে তাঁর সময় লাগেনি। তাঁর ফ্ল্যাট থেকে এই প্রাসাদের দূরত্ব ছিলো আধ-মাইলের মতো। তিনি যে মাঝেমধ্যে এই প্রাসাদের কাছে গিয়ে এর বাগানে বসে থাকতেন, বাগানের পাশের খিড়কির পুকুরে মাছ আর হাঁসদের খেতে দিতেন, তা তাঁর নিজের জবানি থেকে জানা যায়।[৩৯] তিনি যখন ভার্সাইতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন, তখন গরমের সময়। তিনি অথবা তাঁর পরিবার লন্ডনের শীত মোটেই পছন্দ করেননি। অপেক্ষাকৃত গরম আবহাওয়ায় এসে তাঁরা আরাম বোধ করেন। এ ছাড়া, ফুলে-ফুলে এ প্রাসাদের বাগানই নয়, সমস্ত ভার্সাই সুন্দরী হয়ে ওঠে — এখনকার ঘনবসতি আর ব্যাপক সবুজ নিধনের পরেও সেটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এক দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি, অন্য দিকে মোটামুটি গুছিয়ে বসার পর তুলনামূলকভাবে স্বস্তির সময়ে তাঁর মনে আবার কবিত্ব জেগে ওঠে। তিনি আর-একটি মহাকাব্য লেখার পরিকল্পনা করেন। এবারে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন মহাভারত থেকে — দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। এ কাব্য তিনি রচনা শুরু করেন ৯ সেপ্টেম্বর (১৮৬৩) তারিখে।

এটি যে একটি মহাকাব্য হবার কথা ছিলো, তা গোড়াতেই বন্দনা অংশে তিনি বলে নিয়েছেন। *মেঘনাদবধের* পুনরাবৃত্তি তিনি করতে চাননি — 'নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী / কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে' — তাঁর এই প্রতিশ্রুতি থেকে এটা বোঝা যায়। তিনি এ কাব্যের মাত্র তিরিশ পঙ্‌ক্তির মতো লিখেছিলেন। কিন্তু এটুকু লেখার পরেই পরিশীলনে বিশ্বাসী কবি নিজের রচনা নিয়ে অতৃপ্তি বোধ করেন। তা ছাড়া, তিনি অনুভব করেছিলেন যে, নবীন ছন্দে এ কাব্য রচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি *মেঘনাদবধের* মতো এ কাব্যও শুরু করেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ দিয়ে। সে জন্যে, তিনি এ অংশটি দ্বিতীয় বার লিখে ফেলেন। এবারে সত্যি সত্যি তিনি পরীক্ষা করলেন নতুন ছন্দ নিয়ে। লিখলেন সেই ছন্দে — পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের দৌলতে যা সমিল প্রবহমান পয়ার বলে বিখ্যাত হয়েছে।

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ রণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণামহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে, –
গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষা চরণে
বাগ্‌দেবি! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে,
দয়ার আসরে উর দেবি শ্বেতভুজে



ভার্সাই রাজপ্রসাদ, পেছনের দিক এবং উপর থেকে

মাইকেল এই ছন্দে লিখেছিলেন মাত্র তিরিশ পঙ্‌ক্তি। তা না-হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সমিল প্রবাহমান পয়ার ছন্দ সৃষ্টি করার কৃতিত্বও তাঁরই প্রাপ্য হতো। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ কাব্য তিনি শেষ করতে পারেননি। নিদারুণ আর্থিক সংকট এবং প্রতিকূল প্রতিবেশ নিশ্চয় একটা কারণ। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কারণ তিনি নিজেই বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছেন: 'সেই নেশাটা কেটে গেছে।'[৪০] সে

জন্যে কাহিনীটাকে এগিয়ে নিতে পারলেন না। অথচ নতুন ছন্দে নতুন কাহিনী শোনাবার যে-বাসনা তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিলো, তাও তাঁকে অলস হয়ে বসে থাকতে দেয়নি। সুতরাং প্রায় অভিন্ন ভাষায় 'নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে' – এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি রচনা শুরু করলেন 'সুভদ্রা-হরণ'। এবারে লিখলেন ৬১ পঙ্‌ক্তি। কিন্তু এবারেও কাহিনীর ভেতরে ঢুকতে পারলেন না। তার আগেই উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। তার পর তিনি নির্বাচন করলেন পাণ্ডববিজয়ের কাহিনী। প্রারম্ভে সেই একই প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করি – 'সে মহাকাহিনী নবরঙ্গে বঙ্গজন'কে শোনাবেন। কিন্তু সতেরো পঙ্‌ক্তির বেশি লিখতে পারেননি।

যে-কাব্য তিনি লিখতে পারেননি, তা কেমন হতো, সে সম্পর্কে মন্তব্য করা অসঙ্গত। কিন্তু অনুমান করি, তিনি তাঁর প্রস্তাবিত মহাকাব্য লিখতে পারলে তার মধ্যে *মেঘনাবধকাব্যের* চেয়ে বেশি পরিণতি লক্ষ্য করা যেতো। *মেঘনাদবধ* লেখার পরে তিনি যে কেবল ছন্দের ক্ষেত্রে অনেক দক্ষতা অর্জন



মাইকেল যে-বাড়িতে থাকতেন, তার ওপর ৩ জুলাই ১৯৬৭ তারিখে ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ভারতীয় দূতাবাস এবং ফরাসি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এই স্মৃতিফলকটি লাগানো হয়।

করেছিলেন, তাই নয়, য়োরোপে এক বছর থাকার অভিজ্ঞতাও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক প্রশস্ত এবং পরিণত করেছিলো। প্রসঙ্গত, *মেঘনাদবধে* তাঁর প্রাসাদ বর্ণনার কথা মনে রাখা যেতে পারে। তিনি যখন এ কাব্য লিখেছিলেন তখনো তিনি কোনো রাজপ্রাসাদ দেখেননি। অংশত মূল কাহিনী, অংশত কল্পনার ওপর ভিত্তি করে তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু, ধরা যাক, হ্যাম্পটন কোর্ট এবং ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ দেখার পরে তিনি যদি লিখতেন, তা হলে ঐশ্বর্যের বর্ণনা কেবল আরও বাস্তবসম্মত হতো,, তাই নয়, অনেক বেশি আড়ম্বরও দেখা দিতো বলে অনুমান করা যায়।

আসলে গদ্যময় পরিবেশ কাব্য রচনায় আন্তরিক অনুপ্রেরণা দিতে পারেনি। তাঁকে দৃষ্টি এবং মন দিতে হয়েছে প্রতিদিনের সমস্যার দিকে। টাকা ফুরিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে লন্ডনে ফিরে গিয়ে মিকেলমেস টার্ম ধরার সময়ও এগিয়ে আসছিলো। সুতরাং একটার পর একটা পত্রাঘাত করতে থাকলেন দিগম্বর মিত্র, বৈদ্যনাথ মিত্র, বি এন মিত্র এবং হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু তাঁর পৌনঃপুনিক পত্রাঘাত সত্ত্বেও, এঁদের কাছ থেকে এ সময়ে তিনি কোনো টাকাপয়সা পাননি। এমন কি, যাঁর ওপর অমন ভরসা করেছিলেন, সেই দিগম্বর মিত্রের কাছ থেকে কোনো চিঠিও না।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে (১৮৬৩) তিনি আবার লন্ডন যাত্রা করেন। পরিবার থাকলো ভার্সাইতে। নভেম্বর মাসের মিকেলমেস টার্মের দৈর্ঘ্য মাত্র ২৪ দিনের — দোসরা থেকে পঁচিশে। সেখানে আরও ছটি ডিনার খেয়ে তিনি দ্রুত আবার ফিরে যান ভার্সাইতে। মনোমোহন ঘোষের কাছ থেকে তিনি আড়াই শো টাকা ধার করার কথা লিখেছিলেন[৪১], সেটা এ সময়ে কিনা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এ সময়ে তিনি গ্রেজ ইনে আবার অনুরোধ জানান তাঁর জমা-দেওয়া টাকা থেকে ২৫ পাউন্ড ধার দেবার জন্যে। তিনি যে পরিবার নিয়ে বিদেশে-বিভুঁয়ে অর্থসঙ্কটের মুখে দারুণ বিপদে আছেন, দরখাস্তে তা লিখতে ভুলে যাননি। তাঁর এই করুণ আবেদন গ্রেজ ইনের পেনশন কমিটি বিবেচনা করে ২২ ডিসেম্বর (১৮৬৩)। এবং তাঁর আবেদন মোতাবেক তাঁকে ২৫ পাউন্ড ধার দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।[৪২] এই টানাটানির সময়ে হেনরিয়েটা তৃতীয় বারের মতো গর্ভবতী হন। উদ্বিগ্ন কবি তাঁর জামিন এবং দেনাদারদের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে চিঠিপত্র লিখতে থাকেন। তারপর জানুয়ারি মাস থেকে জমতে থাকে তাঁর দেনার বোঝা। দেনা বাড়িওয়ালার কাছে, দেনা পাড়ার দোকানদারদের কাছে। নিজেদের যে-সব মূল্যবান জিনিশপত্র ছিলো, একে একে সেসব চলে যায় বন্ধকী দোকানের ভাণ্ডারে। তবু কলকাতা থেকে তিনি কোনো টাকা পাননি — যদিও এপ্রিল মাস (১৮৬৪) নাগাদ কবির হিশেব অনুযায়ী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর প্রায় চার হাজার টাকা অথবা ৪০০ পাউন্ড পাওনা হয়েছে।[৪৩] তা দিয়ে সপরিবারে তাঁর পক্ষে ভার্সাই-এর মতো জায়গায় খেয়ে-পরে প্রায় ষোলো মাস বেঁচে থাকা সম্ভব ছিলো। চরম অর্থকষ্টের মধ্যে এ সময়ে তিনি শারীরিক পরিশ্রমের কাজসহ কোনো রকমের কাজ করেছেন কিনা জানার উপায় নেই। অবশ্য তেমন কাজ করার মতো মানসিকতা তাঁর ছিলো না।

তিনি আশা করে থাকেন যে, তাঁর জামিনদারদের তাগাদা দিয়ে তিনি মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারবেন। ১৮৬৩ সালের জুন মাস থেকে আরম্ভ করে পরের বছর মার্চ মাসের আগেই কবি দিগম্বর মিত্রকে পাঁচখানা চিঠি লেখেন। কিন্তু দিগম্বর মিত্রের কাছ থেকে একখানা চিঠিরও উত্তর পাননি। হতাশ কবি তেসরা মার্চ (১৮৬৪) তারিখে দিগম্বর মিত্রকে ষষ্ঠ চিঠি লেখেন। দিগম্বর মিত্র যাতে চিঠি পাওয়ার কথা অস্বীকার করতে না-পারেন, তার জন্যে এ চিঠি তিনি পাঠান তাঁর পুরোনো সহকর্মী, পুলিশ অফিসের কর্মচারী প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের[৪৪] চিঠির মধ্যে। যথাসময়ে (প্রায় তিন মাস পরে) তিনি প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের কাছ থেকে তাঁর চিঠির জবাব পান, কিন্তু দিগম্বর মিত্র তখনো নীরব। তবে তিনি যে তাঁর কথা একেবারে ভুলে যাননি, ফেব্রুআরি মাসে বৈদ্যনাথ মিত্রের একখানা বিরল পত্রে তিনি সে কথা জানতে পেরেছিলেন। বৈদ্যনাথ লিখেছিলেন যে, মহাদেব চট্টোপাধ্যায় মাইকেলকে পাঠানোর জন্যে ৫০০ টাকা নিয়ে এসেছিলেন। (ততো দিনে ১৮৬২-৬৩ সাল বাবদে তাঁর অবশ্য পাওনা হয়েছিলো এক হাজার টাকার চেয়েও বেশি।) এজন্য, দিগম্বর মিত্র তাঁকে এক হাজার টাকা নিয়ে আসার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। বৈদ্যনাথ ভরসা দিয়েছিলেন, সে টাকা সত্বর পাঠানো হবে। 'অতি ত্বরায়' টাকা পাঠানোর কথা আলিপুর কোর্টের বি. এন. মিত্রও লিখেছিলেন ফেব্রুআরি মাসে।[৪৫]

তদুপরি, দিগম্বর মিত্র তাঁর প্রথম অনেকগুলো চিঠির উত্তর না-দিলেও, জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা অগস্টের প্রথম সপ্তাহে তাঁর কাছ থেকেও কবি (এক বছরের ব্যবধানে) একটি চিঠি পান। এর পূর্ববর্তী দশ মাসের মধ্যে তিনি দিগম্বর মিত্রকে মোট আটখানা চিঠি লিখেছিলেন। ইতিমধ্যে বেকার অবস্থায় রু দ্য শাঁতিয়ের দোকানদারদের কাছ থেকে ধার করে আর পরিচিতদের দয়ায় তিনি এবং তাঁর পরিবার কোনো মতে বেঁচে থাকেন। তিনি যে-বাড়িতে ছিলেন, তার বাসিন্দাদের মধ্যে বেশির ভাগ সরকারী দাতব্য তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য পেলেও, তিনি কোনো সাহায্য পেয়েছিলেন বলে মনে

হয় না। কবির দারুণ অভাব সত্ত্বেও তাঁর নাম ভার্সাই-এর সরকারী আর্কাইভসে রক্ষিত নথিতে খুঁজে পাইনি। তা থেকে ধারণা হয়, তিনি ভিন দেশের নাগরিক হওয়ায় সরকারী দাতব্য তহবিল থেকে সাহায্য পাননি। তবে সেকালে সরকারী সাহায্যের চেয়ে চার্চও কম সাহায্য করতো না। তিনি যে চার্চের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তাঁর চিঠি থেকে তা জানা যায়। একবার সাহায্য নেবার কথা তিনি নিজেও উল্লেখ করেছেন।[৪৬] এ ছাড়া, কতো বার তিনি চার্চের সাহায্য নেন, তার বৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই। ১২ নম্বর রু দ্য শাঁতিয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু ডানে গেলেই রাস্তার বাঁ দিকে একটি গলি। সেখানে একটি চার্চ। কবির বাড়ি থেকে মিনিট তিনেকের পথ। চরম অভাবের সময়ে তিনি এবং তাঁর পরিবার এই চার্চের দয়া পেয়েছিলেন, এ প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায়। তা ছাড়া, তিনি পেয়েছিলেন তাঁর ফ্ল্যাট-বাড়ির অন্য দরিদ্র বাসিন্দাদের কাছ থেকে সহানুভূতি এবং দয়া। তাঁদের কেউ কেউ তাঁর ঘরের সামনে খাবার রেখে যেতেন — নগেন্দ্রনাথ সোম এ কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৭] আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না, তিনি এ রকমের দয়া গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু চরম অভাবের মধ্যে মানুষ আত্মসম্মানও বিসর্জন দিতে পারে। এ সময়ে মাঝেমধ্যে তাঁকে যে অনাহার এবং অর্ধাহারে থাকতে হতো — তাঁর চিঠি থেকে তার আভাস পাওয়া যায়।[৪৮] তাঁর দারিদ্র্য কী শোচনীয় ছিলো, পরের আলোচনা থেকে আমরা তা দেখতে পাবো।

তিনি ভাবতে পারেননি, তাঁর প্রতিনিধি এবং অন্য বন্ধুরা এতো মাসের মধ্যেও তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবেন না। দেশ থেকে যে-কোনো মুহূর্তে টাকা আসবে - এই ভরসায় তিনি মে মাস (১৮৬৪) নাগাদ আপাদমস্তক ঋণজালে জড়িয়ে পড়েন। যাঁদের কাছ থেকে তিনি ধার করেছিলেন, তাঁর ওপর বিরক্ত হয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত আদালতে নালিশ করেন, অথবা নালিশ করবেন বলে ভয় দেখান। তাঁর কোনো সম্পত্তি ছিলো না, যা বিক্রি করে তাঁর ঋণ শোধ করা সম্ভব হতো। সে কারণে তিনি আশঙ্কা করতে থাকেন যে, ঋণদায়ে তাঁকে কারাগারে যেতে হবে এবং তাঁর পরিবারকে আশ্রয় নিতে হবে সরকারী দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। একদিকে জেল এবং অন্যদিকে অনাহারে মারা যাবার ভয়ানক আশঙ্কার মুখে, তদুপরি অসুস্থ শরীর নিয়ে, কলকাতা ত্যাগ করার দু বছর পরে — ১৮৬৪ সালের দোসরা জুন তারিখে তিনি চিঠি লেখেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। চিঠিতে তিনি অবশ্য বিদ্যাসাগরকে তাঁর বিদ্যার কথা নয়, মনে করিয়ে দেন তাঁর দয়ার কথা।

> দিগম্বর মিত্রের ওপর ভরসা করে আমি যে-নিদারুণ অবস্থায় পড়েছি আপনি একমাত্র বন্ধু যিনি তা থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারেন। এ অবস্থায় আপনার প্রতিভার নিত্যসঙ্গী যে-বিরাট শক্তি এবং আপনার পুরুষোচিত যে-হৃদয়, তা নিয়ে আপনার কাজ করতে হবে। একটি দিনও নষ্ট করা যাবে না। ... দিগম্বর মিত্র নিষ্ঠুরভাবে আমাকে যে-সাগরে ডুবতে দিয়েছেন, আপনি যদি অক্টোবর মাসের মধ্যে আমাকে তা থেকে রক্ষা করেন, এবং আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি যে, আপনি তা অবশ্যই করবেন, তা হলে আমি গ্রেজ ইনে ফিরে যাবো এবং সেখান থেকে যথাসময়ে ভারতে ফিরে যেতে পারবো। তা না-হলে আমার বিনাশ সুনিশ্চিত। আমি মনে করিনে, আপনি তা হতে দেবেন। ... আপনাকে যে-ঝামেলা দিচ্ছি, তার জন্যে আমি কি আপনার কাছে ক্ষমা চাইবো? — আমি তা মনে করিনে, কারণ আপনাকে আমি অন্তত এতোটা জানি যাতে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, আপনি একজন বন্ধু এবং আপনার এই দেশবাসীর মর্মান্তিক সর্বনাশ আপনি হতে দেবেন না। ... দয়া করে আমাকে উপরের ঠিকানায় ফ্রান্সে লিখবেন, কারণ ঈশ্বর এবং তাঁর নিচে আপনি সাহায্য না-করলে আমার পক্ষে এ দেশ ত্যাগ করার পার্থিব কোনো সম্ভাবনা নেই। ... আমার দুঃখের কথা শুনে আপনার কোমল হৃদয় ভেঙ্গে যাবে।

তখন ফ্রান্স থেকে ভারতবর্ষে চিঠি যেতে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ লেগে যেতো। সুতরাং এ চিঠি বিদ্যাসাগর জুলাই মাসের মাঝামাঝির আগে পাননি। কিন্তু চরম হতাশা এবং শোচনীয় দুর্দশার মধ্যে অপেক্ষা করার অথবা ধৈর্য ধরার মতো মনের অবস্থা কবির ছিলো না। পরবর্তী চার সপ্তাহে বিদ্যাসাগরকে

তিনি চারটি চিঠি লেখেন। প্রতিটি চিঠিতেই নিজের শোচনীয় অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ৯ জুনের চিঠিতে যেমন লেখেন, দিগম্বর মিত্র, বৈদ্যনাথ মিত্র আর মহাদেব চট্টোপাধ্যায় একযোগে তাঁকে কেমন অকল্পনীয় বিপদে ফেলেছেন।

> আমি সব সময়ে ভাবতাম দিগম্বর মিত্র একজন বদান্য, উষ্ণ হৃদয়ের মানুষ। একমাত্র ঈশ্বর জানেন কিসে আমাদের প্রতি তাঁর মনের পরিবর্তন হলো। আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, তাঁর ওপর অতো ভরসা করার জন্যে তিনি আমাদের যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছেন। অবশ্য আমার মতো একজন গরিব মানুষ তাঁর ওপর অখুশি হলে তাঁর কী আসে-যায়। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনে, তিনি তাঁর নিজের বিবেকের কাছে কী বলে জবাবদিহি করবেন। কয়েক হাজার টাকা [মহাদেব] প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একটা মস্তো ব্যাপার। এর জন্যে সে যা কিছু করতে প্রলুব্ধ হতে পারে। কিন্তু দিগম্বর মিত্র কী করে এমন একটা ঘৃণ্য ব্যাপারে সম্মতি দেন? এর জবাব আমার জানা নেই। সত্যি নেই। মহাদেব চট্টোপাধ্যায় হলো একটা নিচ, কাপুরুষ এবং সংকীর্ণমনা লোক (যদিও এক সময়ে আমি তাঁর সম্পর্কে অন্য রকম ভাবতাম)। সে টাকা দিতে ঘৃণা করে -- যেন সে টাকাটা তার নিজের। বৈদ্যনাথ মিত্র হলো আফিমখোর, আপনি বুঝতেই পারেন, তার কাছ থেকে কি আশা করা যায়।
>
> আপনি জেনে খুশি হবেন যে, এক সুন্দরী দয়ালু এবং করুণাময়ী ফরাসি তরুণীর দয়ায় জেলে যাওয়ার অপমান থেকে আমি বেঁচে গেছি। এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় রেলগাড়িতে। সেই থেকে তিনি আমাদের ব্যাপারে খুব আগ্রহ দেখিয়েছেন। তা ছাড়া, আমাদের দুঃসময়ে তিনি আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাঁর টাকাপয়সা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। তিনি আমাদের বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে এমনভাবে কথা বলেন, যা কেবল একজন ফরাসি মহিলার পক্ষেই বলা সম্ভব। বাড়িওয়ালা তাঁর কথায় লন্ডনে আমার এক বন্ধুর জামিনে আমাদের এ মাসের শেষ পর্যন্ত থাকতে দিতে রাজি হন। ... একমাত্র ঈশ্বর জানেন, তাঁরা [দিগম্বর ও অন্যান্য] যদি আমাকে মে মাসের ৯ অথবা ২৩ তারিখের ডাকে টাকা না-পাঠিয়ে থাকেন, তা হলে আমরা কি করে বেঁচে থাকবো। হায়, তাঁরা যে পাঠিয়েছেন, তা মনে করারই বা আমার কি কারণ আছে? আমি এর মধ্যে তিনটি টার্ম খুইয়েছি। আমি যেমনটা হিশেব করেছিলাম, তার চেয়ে য়োরোপে আমার এখন এক বছর বেশি থাকতে হবে -- যদি আদৌ গ্রেজ ইন আমাকে গ্রহণ করে।

মাইকেল সহজে অন্যকে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু দিগম্বর মিত্রদের আচরণে তিনি ততোদিনে সন্দেহপ্রবণ হতে আরম্ভ করেছেন। সে জন্যে, তাঁর মনে হলো, কি জানি, দিগম্বর মিত্ররা চেষ্টা করতে পারেন, যাতে বিদ্যাসাগরও তাঁকে সাহায্য না-করেন। তাই লিখলেন:

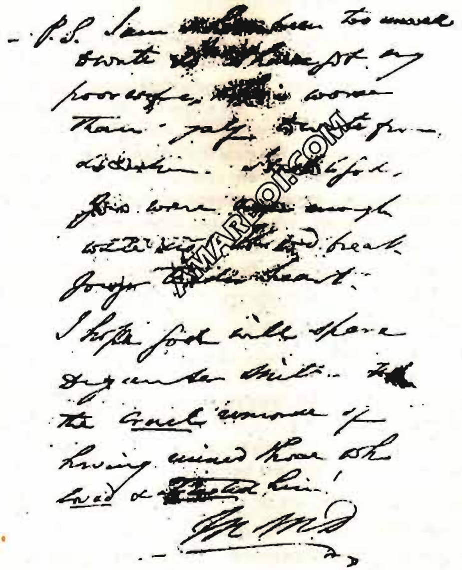
> লোকেরা আপনার পথে হয়তো বাধা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আশা করি, আপনি সব বাধা দূর করতে সমর্থ হবেন। আপনি যদি আমাকে আগামী অক্টোবর শেষ হবার আগেই কলকাতার ঐ লোকগুলোর হাত থেকে মুক্ত না-করেন, তা হলে আমি চিরতরে ডুবে যাবো। আমি আপনার উত্তর আশা করছি অগস্ট মাসের ২০/২১ তারিখের দিকে। আশা করি তার তার আগেই আমরা অনাহারে মারা যাবো না। ... কলকাতার লোকেরা আপনার কাছে নিশ্চয় আমাদের বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে। আপনি তাতে কান দেবেন না। আপনার কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।

এ সময়ে কলকাতা থেকে মাসে চারটি ডাক যেতো য়োরোপের উদ্দেশে। বোম্বাই হয়ে যেতো ৫ আর ১৮ তারিখে; এবং সরাসরি কলকাতা থেকে যেতো ৯ আর ২৩ তারিখে। এর মধ্যে বোম্বাই-এর ডাক য়োরোপে যেতে দু-চার দিন কম সময় লাগাতো। সে জন্যে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ জানান বোম্বাই-এর ডাকে চিঠি পাঠাতে। বিদ্যাসাগরকে লেখা তাঁর প্রথম চারটি চিঠিতে (২, ৯ ও ১৮ জুন এবং ৪ জুলাই) তিনি প্রধান যে-অনুরোধ জানান, তা হলো: তাঁর সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা পাঠাতে। তিনি লেখেন যে, তাঁর সম্পত্তির বার্ষিক খাজনা ১৫০০ টাকা। সুতরাং বিদ্যাসাগর যেন এই সম্পত্তি ক্যালকাটা ল্যান্ড মর্টগেজ কম্পেনির কাছে বন্ধক রেখে অবিলম্বে ১৫ হাজার টাকা তুলতে চেষ্টা করেন। এর মধ্য থেকে তিনি দু হাজার টাকা যেন ফ্রান্সে পাঠান। তারপর কলকাতায় তাঁর যে-চার হাজার টাকা ঋণ রয়েছে সেটা শোধ করে বাকি ৯ হাজার টাকাও যদ্দুর সম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেন।

তাঁর অভাব যে কী তীব্র, তা বোঝা যায়, ১৮ জুন তারিখের চিঠি থেকে। এতে তিনি লিখেছেন:

> কলকাতা থেকে ৯ মে যে-ডাক ছেড়েছে, তা এখানে পৌঁছে গেছে; কিন্তু আমি এবারেও হতাশ হয়েছি। অনাহার থেকে বাঁচার জন্যে আমি বাধ্য হয়েছি একজন ইংরেজ পাদ্রির কাছে আবেদন জানাতে। তিনি তাঁর দরিদ্র-তহবিল থেকে আমাকে ২৫টি ফ্রঁ ধার দিয়েছেন। সেটা হলো ন টাকার মতো। একমাত্র ঈশ্বর জানেন, এ মাসের বাকি দুটো ডাকের কোনোটায় টাকা না-এলে আমাদের কী হবে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তা হলে আমাদের একেবারে বিনাশ হবে। হে বিধাতঃ, [*বৈদ্যনাথ মিত্ররা*] কি আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন যাতে আমরা য়োরোপে খতম হয়ে যাই?

কবি লোকের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলেন। এ কারণে তিনি এই চিঠিটি বিদ্যাসাগরকে পাঠান পূর্বোক্ত প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের চিঠির সঙ্গে — একই খামে। অবশ্য সে কথা তিনি চিঠিতে উল্লেখও করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, একবার বিদ্যাসাগরের আশ্রয় চাইবার পর, তাঁর আর *মেঘনাদবধের* রামের

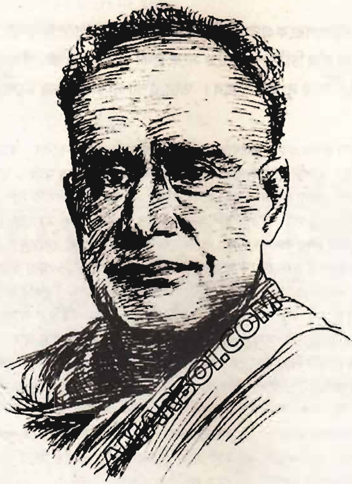


P. S. I am & have been too unwell to write, so I have got my poor wife, who is worse than myself, to write from dictation. I wish to God, you were near enough to see us! It wd. break your heart. I hope God will spare Digumber Mitter for the cruel remorse of having ruined those who believed & trusted him!

M. M. D.

দোসরা জুনের চিঠির শেষ পৃষ্ঠা

মতো 'বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে' বলে কাঁদতে হবে না। 'আমি যদি ভারতবর্ষে ফিরে যাবার জন্যে বেঁচে থাকি তা হলে আমি আমার দেশবাসীকে বলবো যে, আপনি কেবল বিদ্যাসাগর নন, আপনি করুণাসাগরও।' বিদ্যাসাগর তাঁর দয়ার জন্যে সেকালে দয়ার সাগর নামে সুবিদিত হয়েছিলেন। কারো দুঃখ দেখলে তাঁকে সাহায্য করা তাঁর অন্যতম ধর্ম ছিলো। সে জন্যে, কবির



"করুণাসাগর" বিদ্যাসাগর: "
ঈশ্বরের পর যাঁর কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন"কবি

এই প্রশংসা শোনার জন্যে তিনি অপেক্ষা করে থাকেননি। তাঁর এই চিঠি পৌঁছার আগেই তিনি তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ওদিকে, এই চিঠি লেখার সপ্তাহ খানেক পরে – জুন মাসের শেষ সপ্তাহে – দিগম্বর মিত্রের কাছ থেকে কবি ৮০০ টাকা পান – যদিও ততোদিনে তাঁর পাওনা হয়েছিলো – কবির হিশেব অনুযায়ী – বকেয়াসহ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা, আর দ্বিতীয় চুক্তি অনুযায়ী তিন হাজার টাকা। ফেব্রুআরি মাসে বৈদ্যনাথ যে-হাজার টাকা পাঠানোর কথা লিখেছিলেন, এই আট শো টাকা সেই টাকারই অংশ। ফেব্রুআরি মাসে পাঁচ শোর বদলে এক হাজার টাকা নিয়ে আসার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও মহাদেব মে মাসের মাঝামাঝি কেন মাত্র আট শো টাকা নিয়ে এলেন, তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। সে যাই হোক, এই টাকা দিয়ে যে-ধার ছিলো, কবি তারও সবটা শোধ করতে পারেননি। কিন্তু তবু এই টাকা পেয়ে তিনি আবার নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে বাঁচার ক্ষীণ আলোক দেখতে পান। দিগম্বর মিত্রের প্রতিও তাঁর মনোভাব খানিকটা নরম হয়। এ সময়ে তিনি তাঁর প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বসুকেও চিঠি লিখেছিলেন। খুব সম্ভব, তাঁর কাছ থেকেও এ সময়ে অথবা এর অল্প দিন পরে তিনি কিছু টাকা পান। পরবর্তী বছরের প্রথম ছ মাসে বই-এর রয়্যাল্টি বাবদ তাঁর এক হাজার টাকা আয় হয়েছিলো, কবি নিজে তা

বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন। তবে ১৮৬৪ সালের জুন মাসে তিনি দিগম্বর মিত্রের কাছ থেকে যে-টাকা পেয়েছিলেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিলো নিতান্ত অপ্রতুল। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তিনি তাই আবার চিঠি লেখেন বিদ্যাসাগরকে। তার পরের সপ্তাহে আরও একখানা। এতে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বিদ্যাসাগর ইতিমধ্যে নিশ্চয় তাঁর চিঠি পেয়ে তাঁর তরফ থেকে দরকারী সব ব্যবস্থা নিয়েছেন।

দোসরা অগস্ট অর্থাৎ বিদ্যাসাগরকে প্রথম চিঠি লেখার ঠিক দু মাস পরে কবি তাঁকে ষষ্ঠ চিঠি লেখেন। তিনি জানতেন, বিদ্যাসাগর তাঁর চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাঠালেও, তা পৌঁছার সময় হয়নি। কিন্তু তখন তাঁর শিরে সংক্রান্তি। ঘরে দুঃসহ অভাব। তার ওপর দু-চারদিনের মধ্যে হেনরিয়েটার সন্তান প্রসব কর‍্যার কথা।

> আমি আপনার ওপর আরও একটা পত্রাঘাত করছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার উদ্বেগের জন্যে আমি লিখতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি ভাবতে পারবেন না আমি কী অসহ্য যন্ত্রণায় আছি। হায়, আমি যে-লোকেদের পেছনে রেখে এসেছি, তাঁরা হলেন – বাইবেলের ভাষায় – কতোগুলো বিষাক্ত সাপ। অবশ্য দিগম্বর মিত্রকে আমি এর অন্তর্ভুক্ত করছিনে। কারণ তিনি অন্য রকমের মানুষ। কিন্তু মহাদেব চট্টোপাধ্যায় এবং ঐ বি. এন. মিত্র! একমাত্র ঈশ্বর জানেন, তাঁরা আপনাকে কতোটা ঝামেলা দেবেন। কিন্তু, প্রিয় বিদ্যাসাগর, আমাকে আপনার অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। ... ২০ জুনের [আসলে ২০ মের] চিঠিতে দিগম্বর মিত্র আমাকে এক মাসের মধ্যে আরও এক হাজার টাকা পাঠানোর কথা লিখেছিলেন। জুলাই মাসের সব ডাক যোরোপে পৌঁছে গেছে। তবু তাঁর কাছ থেকে কালির একটি আঁচড়ও আমি পাইনি। আমরা সবেমাত্র যে-নিদারুণ [অভাবের] তীর ছেড়ে এসেছি, আবার সেই দিকে ভেসে যাচ্ছি। ...এখানে আমার প্রায় ১৭/১৮ শো টাকা দেনা হয়েছে। আর তিনি কিনা আমাকে ৮০০ টাকা পাঠিয়েই তারপর সব দরজা বন্ধ করে দিলেন! ঈশ্বরের নামে বলছি, এটা অসহ্য! ... আমার স্ত্রীর যে-কোনো দিন সন্তান হবে। কিন্তু ঘরে ২০ টাকার বেশি নেই। দোহাই ঈশ্বরের, প্রিয় বন্ধু, দয়া করে আমাকে এসব থেকে বাঁচান এবং এই লোকগুলোর কবল থেকে আমাকে ভবিষ্যতেও রক্ষা করুন। ... আপনার ওপর আমার গভীর বিশ্বাস আছে, আশা করি, আপনি আমাকে হতাশ করবেন না। যদি করেন, তা হলে আমি যেভাবে পারি ভারতে ফিরে যাবো, তারপর জেনেশুনে পূর্বপরিকল্পিতভাবে একটি কি দুটি খুন করে ফাঁসিতে ঝুলবো।

এ চিঠির ভাষা থেকেই বোঝা যায়, এ সময়ে দুর্বিষহ অভাবের মুখে কবি কী রকম মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে সেটা অস্বাভাবিকও ছিলো না। এই চিঠি লেখার পরের দিন ভোর বেলায় হেনরিয়েটার একটি মেয়ে হয়। কবি নিজে এ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন, তাঁর স্ত্রী একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন।[৪৯] কিন্তু তিন মাস পরে গৌরদাসকে যে-চিঠি লেখেন, তাতে বলেন, মেয়েটি বেশিক্ষণ বাঁচেনি।[৫০] এই কন্যাকে সমাধিস্থ করার দলিল থেকেও মনে হয়, এ সন্তানটি জন্মের পর মারা যায়।[৫১]

এই শোক এবং তার চেয়েও তীব্র অভাবের মধ্যে ১৮ অগস্ট তিনি আবার বিদ্যাসাগরকে চিঠি লেখেন। প্রথম চিঠিটি লেখার পর দু মাস ষোলো দিন কেটে গিয়েছিলো – তাঁর মনে ক্ষীণ আশা জেগেছিলো যে, ইতিমধ্যে তাঁর কাছ থেকে তিনি একটি চিঠি পাবেন। তা ছাড়া, তাঁকে তিনি হয়তো ক্রমাগত চাপের মুখেও রাখতে চেয়েছিলেন। তাই আরও একবার নিজের নিদারুণ দুরবস্থার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দেন:

> দিগম্বর মিত্র তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তিনি মাসখানেকের মধ্যেই এক হাজার টাকা পাঠাচ্ছেন। মস্তো একটা আহাম্মুকের মতো আমি সেই কথা বিশ্বাস করে কেবল মাসখানেক চলার মতো টাকা রেখেছিলাম। কিন্তু দিগম্বর আবার নীরব এবং আমাদের প্রতি উদাসীন হয়ে গেছেন এবং আমরা চরম দুরবস্থায় পড়েছি। কারণ আমার স্ত্রী এ মাসের তিন তারিখে একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন এবং আমার হাতে একটি কানাকড়িও নেই। এ চিঠি লেখার জন্যে যে-ডাকটিকিট লেগেছে, তা-ও কেনা হয়েছে বন্ধকী দোকান থেকে টাকা জোগাড়

> করে! কোনো লোকের সঙ্গে কেউ কি এমন লজ্জাজনকভাবে ব্যবহার করেছে? বন্ধুবর, আপনি জানেন বদমাশ মহাদেবের কাছে এখনো আমি তিন হাজারের চেয়ে বেশি টাকা পাই, আলিপুর আদালতে এক হাজার আর খিদিরপুরের হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ৫০০! ... আমার স্ত্রী এবং আমি দুজনেই মনে করি যে, আপনি নিশ্চয় ইতিমধ্যে আমাদের কাছে লিখেছেন এবং টাকা পাঠিয়েছেন। এবং আগামী ডাকে আমরা তা পাবো। আমি আশা করছি আমাদের এই আশা সুখের সঙ্গে পূরণ হবে।

কবি এবং তাঁর জীবনসঙ্গিনী সত্যি সত্যি আশায় বুক বেঁধেছিলেন, কারণ তাঁরা জানতেন, তাঁরা যাঁর সাহায্য চেয়েছেন, তিনি কেবল করুণাসাগর নন, তিনি যথার্থই বিবেকবান এবং দায়িত্বশীল। তাঁরা একটি একটি করে দিন গুনতে থাকেন। ওদিকে, অভাবের চাপও বাড়তে থাকে। এর মধ্যে রোববার ২৮ অগস্ট তারিখে মেলা বসেছে বাইরে। ঠিক আঠারো দিন পরে শর্মিষ্ঠার বয়স হবে পাঁচ বছর। আর পুত্র ফ্রেডারিকের বয়স তিন বছর পুরো হয়েছে এক মাসপাঁচ দিন আগে। হেনরিয়েটা কবির কাছে এসে সজল চোখে বললেন, 'ঘরে আছে ৩ ফ্রাঁ। শর্মিষ্ঠা মেলায় যেতে চাইছে তার ছোটো ভাইকে নিয়ে।' কবি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: 'আমরা যাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছি, তাঁর আছে প্রাচীন ঋষির মতো প্রতিভা এবং বিচক্ষণতা, ইংরেজের মতো শক্তি আর বাঙালি মায়ের মতো অন্তর। আজ ডাক আসার কথা। দেখো আজকের ডাকে নিশ্চয় টাকা আসবে।' কবির অনুমান ভুল ছিলো না। এর ঘণ্টাখানেক পরেই তিনি পেলেন বিদ্যাসাগরের চিঠি আর সেই সঙ্গে দেড় হাজার টাকা। – যে-টাকা দিয়ে বেশির ভাগ ধার শোধ দিয়েও কিছু টাকা নিজেদের হাতে থাকলো।[৫২] কবি এতে কেমন খুশি হয়েছিলেন এবং কতোটা স্বস্তি লাভ করেছিলেন, তা খানিকটা বোঝা যায় বিদ্যাসাগরকে লেখা পরবর্তী চিঠি থেকে। এতে তিনি বিদ্যাসাগরকে এই টাকা পাওয়ায় সংবাদ আর সেই সঙ্গে অশেষ কৃতজ্ঞতা লিখে জানান। (আমার মহান, আমার বিখ্যাত, আমার সত্যিকার বন্ধু, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো!) কিন্তু তাঁর সমস্যার তখনো সত্যিকার কোনো সমাধান হয়নি। তাই বিদ্যাসাগরকে মনে করিয়ে দেন:

> আমার অবশ্যই আপনাকে আবার বলা দরকার যে, আপনি যদি আমার সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে টাকা জোগাড় না-করেন, তা হলে আমার পক্ষে এখানে বেঁচে থাকা অথবা ব্যারিস্টার হয়ে তারতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ আমি প্রায় এক বছরের মধ্যে কলকাতা থেকে একটি পয়সাও পাইনি। এবং এখানে আমার অনেক ধার হয়েছে। সেসব দেনা শোধ করার জন্যে আমার অবশ্যই যথেষ্ট টাকা পেতে হবে। সেই বদমাশ মহাদেব চট্টোপাধ্যায় যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না-করতো, দিগম্বর যদি আমাকে ভুলে না-যেতেন, তা হলে এসব হতো না, কারণ আমরা মোটেই বেহিশেবী নই, এবং আমার স্ত্রী চমৎকারভাবে সংসার চালাতে পারেন। কিন্তু টাকা না-পেলে আমরা কী করবো। চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি এখনো তিন হাজার টাকার চেয়ে বেশি পাই, তবে তা যথেষ্ট হবে না। আমার আরও টাকা লাগবে।[৫৩]

এ সময়ে কবির মাসে আড়াই শো টাকা করে লাগতো। ন মাসে তাঁর সেই হিশেবে সওয়া দু হাজার টাকা ঋণ হয়েছিলো। এ ছাড়া, হেনরিয়েটার সন্তান জন্মদান এবং অন্যান্য কারণে সব মিলে তাঁর ধার হয়েছিলো প্রায় ২৬ শো টাকা।[৫৪] আর দিগম্বর মিত্র এবং বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে তিনি তখন পর্যন্ত মোট টাকা পেয়েছিলেন দু হাজার তিন শো। এই দুই দফা টাকা দিয়ে তিনি মোট ১২ শো টাকার ধার শোধ করেন। এ ছাড়া, সংসার চালানোর জন্যে হাতে রাখেন ৮০০ টাকা। তিনি জানতেন, লন্ডনে ফিরে যেতে হলে সব ধার শোধ করে যেতে হবে এবং সেখানে থাকার জন্যেও যথেষ্ট টাকা লাগবে। এ সময়ে তিনি পরিকল্পনা করেন যে, তিনি একা ফিরে যাবেন লন্ডনে। আর পরিবার রেখে যাবেন ভার্সাইতে – যেমনটা তিনি আগের বছরের নভেম্বর মাসেও করেছিলেন। এর পক্ষে তিনি যুক্তি দেখান যে, ফ্রান্সে পরিবার রেখে তিনি একা লন্ডনে থাকলে ব্যয় হবে কম। তিনি হিশেব করেন যে, তা হলে তিনি নিজে লন্ডনে মোটামুটি এক শো টাকায় এবং তাঁর পরিবার ভার্সাইতে আড়াই শো টাকায় – এই

মোট সাড়ে তিন শো টাকায় থাকতে পারবেন। (কলকাতা থেকে লন্ডনে আসার সময়ে তিনি নিজের জন্যে মাসে আড়াই শো টাকা লাগবে বলে হিশেব করেছিলেন।) তিনি বেশ জোর দিয়ে লেখেন যে, পরের জুলাই মাস (১৮৬৫) পর্যন্ত তাঁকে পরিবার থেকে আলাদা বাস করতে হবে।[৫৫] এ ধারণা তাঁর কেন হয়েছিলো বলা মুশকিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই ধারণার বিরোধী ছিলেন। পরে দেখতে পাবো, তিনি বারবার পরিবার ফ্রান্সে রেখে যাবার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন আর বিদ্যাসাগর বারবার তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, তাঁরা একত্রে থাকলে ব্যয় কম হবে।

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া অবধি তিনি বিদ্যাসাগরকে যতোগুলো চিঠি লিখেছেন, তার প্রত্যেকটিতে সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করার অনুরোধ জানিয়েছেন। সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হলে তাঁর দলিলপত্র লাগবে, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি লাগবে – এ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বিদ্যাসাগরকে জানান যে, তাঁর কাগজপত্র আছে তাঁর প্রতিনিধি – দিগম্বর মিত্র আর বৈদ্যনাথ মিত্রের কাছে। পৈতৃক সম্পত্তি জীবনের একটা পর্যায়ে যেহেতু পাওয়ার আশা করেননি এবং এ সম্পত্তি যেহেতু তাঁর নিজের কষ্ট করে অর্জনও করতে হয়নি, সে কারণে এর প্রতি তাঁর দরদ ছিলো সীমিত। কিছু কাল পরে আর-একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'ব্যারিস্টার হিশেবে কলকাতায় গিয়ে আমার যদি একেবারে নতুন করে ভাগ্য তৈরি করতে হয়, আমি তা হলে কিছু মনে করবো না।'[৫৬] অপর পক্ষে, বিদ্যাসাগর কবির মতো বেহিশেবী ছিলেন না। বরং বিষয়বুদ্ধি তাঁর যথেষ্টই ছিলো। হিতাকাঙ্ক্ষী হিশেবে তিনি সম্পত্তি বন্ধক দেবার প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর প্রথম চিঠিতে বিদ্যাসাগর এ সম্পর্কে কবির কাছে লিখেছিলেন। কিন্তু কবি তখন সে প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। তবে দু সপ্তাহ পরে তিনি যখন বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় চিঠির জবাব দেন, তখন বন্ধক না-দিয়ে অন্য কোনো উপায়ে টাকা ধার করার পরামর্শ তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। আসলে ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু হাই কোর্টের উকিল (পরে বিচারপতি) অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে টাকা ধার পাওয়ার আশ্বাস লাভ করেছিলেন। এই কথা কবি পরবর্তী এক বছর তাঁর চিঠিপত্রে বেশ কয়েক বার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। সব জায়গায়ই বলেছেন 'আপনার বন্ধু'। এর কারণ জানা নেই। এমন হতে পারে, বিদ্যাসাগর প্রথমে তাঁর নাম জানাননি। সে যাই হোক, কেবল ধার করা নয়, বি. এন. মিত্র এবং মহাদেব চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গেও বিদ্যাসাগর যোগাযোগ করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে বকেয়া টাকা উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন। প্রথম কিস্তিতে বিদ্যাসাগর যে-এক হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন, কবি অনুমান করেছেন যে, সে টাকা তিনি আদায় করেছিলেন বি. এন. মিত্রের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগর কার কাছ থেকে কতো টাকা আদায় করতে সমর্থ হন, তাঁর চিঠিপত্র রক্ষা না-পাওয়ায়, এখন আর তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে তিনি যে-ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তা যথেষ্ট মনে করে কবি বিষয়টা তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

> আমি এক সময়ে যেভাবে আমার সম্পত্তি বন্ধক রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তা বাতিল করতে এবং সব কিছু আপনার হাতে ছেড়ে দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ আমি আপনাকে বিবেচনা করি একটা শক্তির মিনার হিশেবে। এবং আমি বেশ নিশ্চিত যে, সম্ভাব্য সকল রকমের পরিস্থিতির জন্যে আপনার ব্যবস্থা যথেষ্ট হবে।[৫৭]

ওদিকে, দিগম্বর মিত্র এবং মহাদেব চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে মাইকেল যে-রূঢ় ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, তার জন্যে বিদ্যাসাগর তাঁকে ভদ্র কিন্তু দৃঢ়ভাবে ভর্ৎসনা করেন। এ থেকেও ধারণা হয়, মহাদেব চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে কবি যে-অভিযোগ করেছিলেন, তার সবটা সঠিক নয়। আগেই লক্ষ্য করেছি যে, কবি এক হাজার টাকা গ্রহণের মাধ্যমে মহাদেবের সঙ্গে নতুন একটি অলিখিত চুক্তি করেছিলেন। কয়েক বছর পরে কবি যখন তাঁর সম্পত্তি মহাদেবের কাছে বিক্রি করেন, তখনকার

দলিল থেকেও এর সমর্থন মেলে। এ দলিল থেকে দেখা যায় যে, ১৮৬১ সালের পত্তনির দলিলে বছরে তিন হাজার টাকা করে দেবার কথা থাকলেও, কবি একটি রোকা দিয়ে এই টাকার পরিমাণ আড়াই হাজার করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের ভর্ৎসনার জবাবে কবি নমনীয় মনোভাব দেখান। তা-ও দলিল-অতিরিক্ত কোনো সমঝোতার ইঙ্গিত দেয়। তবে কথা যেমনই থাক না কেন, কবি বিদ্যাসাগরকে জানিয়েছিলেন যে, মহাদেব লোকটি মোটেই সরল নন, বরং ঠকবাজ। বিশেষণ হিশেবে তাঁর নামের আগে 'বদমাশ' শব্দটি তিনি বেশ কয়েক বার ব্যবহার করেন। কলকাতা ছাড়ার আগে মহাদেব কিভাবে তাঁকে চক মুনকিয়ার আয় নিয়ে বিভ্রান্ত করেছিলেন, তিনি সে ঘটনারও উল্লেখ করেন।[৫৮] তাঁর সঙ্গে আদান-প্রদানের ব্যাপারে কবি যে-স্বার্থহীন অথবা দৃঢ় আচরণ করেননি, মহাদেব তার সুযোগ নিয়ে টাকা পাঠানোর ব্যাপারে নানা রকমের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি যে খুব সৎ লোক ছিলেন, তা বলা যায় না। ওদিকে, বিদ্যাসাগর তাঁকে অতোটা অসৎ বলে বিবেচনা করতেন না। সে জন্যে এর পরেও একাধিক চিঠিতে মহাদেব সম্পর্কে কবির ধারণা বদল করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সরল মাইকেল এতোই চটে গিয়েছিলেন যে, বিদ্যাসাগর সহজে তাঁর মনোভাব বদল করতে পারেননি। তেসরা অক্টোবরের চিঠিতে যেমন দেখতে পাই তখনো মহাদেব নির্দোষ — এ কথাটা কবি মেনে নিতে পারছেন না।

> আমার অবশ্যই খোলা মনে আপনার কাছে স্বীকার করতে হবে যে, মহাদেবের সঙ্গে আমার হিশেবপত্তর সম্পর্কে আমি মনে মনে সত্যি সত্যি অস্বস্তি বোধ করি। তিনি কোন কোন কিস্তি টাকা দেননি, আমি আপনাকে তার একটা তালিকা দিয়েছি। আমি দেশ ছাড়ার আগে তখন পর্যন্ত পাওনা সব টাকা তিনি শোধ দিয়েছিলেন, আমি এ কথা বিশ্বাস করিনে অথবা বিশ্বাস করতে পারিনে। আমি সে জন্যে আশা করি আপনি এ ব্যাপারে তন্নতন্নাশ করে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে নেবেন। আপনি যদি সন্তুষ্ট হন, তা হলে আমি তাঁর সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করেছি, তা প্রত্যাহার করবো।

এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, তিনি ততোদিনে বিদ্যাসাগরের ওপর ভরসা করে আবার নিশ্চিন্ত বোধ করতে আরম্ভ করেছেন। কেবল তা-ই নয়, যে-দিগম্বর মিত্রকে মাত্র অল্পদিন আগে অভিশাপ দিচ্ছিলেন, তাঁর সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব ততোদিনে অনেকটা নরম হয়েছে।[৫৯] অবশ্য ইতিমধ্যে দিগম্বর নিজেও কবিকে আর-একটি চিঠি লেখেন — যা তাঁর হাতে পৌঁছে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে। উপরের চিঠিতে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন: 'আমি আজ ব্যস্ত, দিগম্বর মিত্রকে লিখতে পারছিনে। আগামী ডাকে লিখতে চেষ্টা করবো। তাঁকে আমার সৌজন্য জানাবেন।'

এর পরবর্তী এক বছর বিদ্যাসাগরের কাছে তিনি যেসব চিঠি লিখেছেন, তা থেকে জানা যায়, সম্পত্তি বন্ধক না-দিয়ে প্রয়োজনীয় টাকা তোলার জন্যে বিদ্যাসাগরকে কতো প্রয়াস পেতে হয়েছে এবং কবি এক থোকে বেশি টাকা পাওয়ার জন্যে কি রকম উতলা হয়ে উঠেছেন। কারণটা তিনি নিজেই বিদ্যাসাগরের কাছে কয়েক বার ব্যাখ্যা করেছেন — একবারে টাকা না-পেলে সব দেনা শোধ করে এবং পরবর্তী কয়েক মাসের জন্যে টাকা হাতে না-নিয়ে লন্ডন যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া, তিনি বিদ্যাসাগরকে এও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, এক-এক কিস্তিতে অল্প টাকা পাঠালে উপকার না-হয়ে, অপকারই হয়। যেহেতু, পরের কিস্তি টাকা আসার আগেই আগের কিস্তি টাকা শেষ হয়ে যায়।[৬০] হিতাকাঙ্ক্ষী হিশেবে বিদ্যাসাগর সম্পত্তি বিক্রি না-করে ধার করে এবং পাওনা টাকা আদায় করে পাঠাতে চেয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, এই টাকা তিনি দ্রুত জোগাড় করতে পারবেন এবং কবিও দ্রুত লন্ডনে ফিরে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করতে পারবেন। কিন্তু, আমরা পরে দেখতে পাবো, ভার্সাই-এর ঋণ শোধ দিয়ে লন্ডনে যাবার জন্যে যে-টাকার দরকার ছিলো, তা জোগাড় করতে বিদ্যাসাগরের লেগেছিলো প্রথম চিঠি পাওয়ার পরে এক বছরেরও বেশি। ভার্সাইতে এই এক বছর বাস

করার জন্যে কবির ব্যয় হয়েছিলো কম পক্ষে তিন হাজার টাকা। ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করার জন্যে তাঁর বাকি ছিলো আরও পাঁচটি টার্ম অধ্যয়ন করা। বিদ্যাসাগর প্রথমেই সম্পত্তি বন্ধক রেখে (এমন কি, বিক্রি করে) কবির চাহিদা মতো এগারো হাজার টাকা পাঠাতে পারতেন, তা হলে কবি ব্যারিস্টারি শেষ করতে পারতেন ১৮৬৫ সালের নভেম্বর মাসে। ফলে শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে যতো টাকা পাঠাতে হয়েছিলো, কবির ততো টাকা লাগতো না। তদুপরি, মহাদেব চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্যের কাছে তাঁর পাওনাও বহাল থেকে যেতো।

বস্তুবাদী ভোগের প্রতি কবির ছিলো সীমাহীন প্রলোভন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি ছিলেন জন্ম-রোম্যান্টিক এবং বিষয়বুদ্ধিবর্জিত। টাকাপয়সা, আয়-ব্যয় এসব নিয়ে আলোচনা করা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। আলোচ্য অর্থসংকটের কালে তিনি যে চিঠিপত্র লিখেছেন, তা লিখেছেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে এবং তা থেকে তাঁর চরিত্রের এ দিকটি বেশ ভালো বোঝা যায়। আসলে, অসহনীয় অভাবে তিনি যখন সপরিবারে প্রায় অর্ধাহারে ছিলেন, তখনো নিজের স্বভাব ভুলতে পারেননি। তখনো বারবার করে লেখাপড়া, ভাষা শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে তাঁর চিঠিতে। বিদ্যাসাগরকে লেখা তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি যেমন বলেছেন

> যদিও আমি এখানে খুব উদ্বিগ্ন এবং দুরবস্থায় আছি, তবু এরই মধ্যে আমি ফরাসি ভাষা প্রায় আয়ত্ত করে ফেলেছি। আমি এ ভাষা ভালোই বলতে পারি। তবে লিখতে পারি আরও ভালো। আমি ইটালিয়ান ভাষাও শিখতে আরম্ভ করেছি।[৬১] এ ছাড়া, য়োরোপ ত্যাগ করার আগে স্প্যানিশ এবং পর্তুগীজ ভাষা যদি না-ও পারি, অন্তত জর্মন ভাষা আমি শিখতে চাই। ... ফরাসিরা বিদেশী ভাষা সাধারণত ভালোবাসে না। তা সত্ত্বেও, সংস্কৃত ভাষা এখানে অজ্ঞাত নয়। এই মফস্বল শহরেও অর্ধ-ডজন লোক পাবেন যাঁরা এ ভাষা সম্পর্কে কিছু জানতে চান। আমার নিজের শোচনীয় দুর্গতির জন্যে অন্য কিছু লেখার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। নয়তো আমি এ সম্পর্কে অনেক কথা লিখতে পারতাম।

মাসখানেক পরে তিনি আবার যখন লিখেছেন, তখন জানিয়েছেন -

> য়োরোপ ছাড়ার আগেই আমি একজন য়োরোপীয় পণ্ডিতে পরিণত হতে চাই। ফরাসি এবং ইটালিয়ান ভাষায় আমার বেশ অগ্রগতি হচ্ছে। শিগগিরই জর্মান শেখা শুরু করতে হবে। তা ছাড়া, ল্যাটিন, ফরাসি এবং ইটালিয়ান ভাষা শেখার পর, স্প্যানিশ এবং পর্তুগীজ ভাষাও কঠিন হবে না। আপনি ভাবতেও পারবেন না, ল্যাটিনে কী চমৎকার কাব্যসাহিত্য রয়েছে। ত্যাসো হচ্ছেন য়োরোপের কালিদাস। আমি সত্যেন্দ্রনাথকে সেদিন ইটালিয়ানে একটা লম্বা চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু সে তার জবাব দিয়েছে ইংরেজিতে। অবাক না-হয়ে পারিনি। সে তো গত বছর খানিকটা ইটালিয়ান পড়েছিলো!

দেশ এবং দেশবাসীদের নিয়ে গর্ব করার যে-মনোভাব তাঁর মধ্যে কলকাতা ত্যাগ করার পর থেকে লক্ষ্য করেছিলাম, অভাবের মধ্যে তা খানিকটা চাপা পড়লেও তিনি তা মুছে ফেলতে পারেননি। লন্ডনে মনোমোহন ঘোষ আর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কী করছেন সে সম্পর্কে সব সময়ে চোখ-কান খোলা রেখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ আইসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরপরই এগারোই জুলাই (১৮৬৪) সে কথা লিখে জানিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরকে। তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, তিনি এতে এতোই উদ্দীপ্ত বোধ করেন যে, সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে নিজের দারুণ দুরবস্থা এবং উদ্বেগের মধ্যেও একটি সনেট রচনা করেন। এই সনেট থেকে বোঝা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যে তিনি কতো গর্বিত হয়েছিলেন!

> সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুলপতি
> অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্যবলে
> ফিরিলা কানন-বাসে; তুমি হে তেমতি,
> যাও সুখে ফিরি এবে ভারতমণ্ডলে,....
> দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে

এ তোমার কীর্ত্তিবার্ত্তা।....

মনোমোহন যে পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি, তাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। 'এক সময়ে আমি মনে করতাম, দুজনের মধ্যে মনোমোহনই বেশি চালাক। এখন অবশ্য বুঝতে পারছি, আমার ভুল হয়েছিলো।' পরের মাসে তিনি জানান,

> বেচারা মনু আবার ফেল্ করেছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে সে পাশ করতে পারবে না। পরীক্ষা আগের তুলনায় কঠিন করা হয়েছে। তা ছাড়া, সে গ্রীক এবং ল্যাটিন জানে না। আসল ব্যাপার হলো, আমাদের যুবক নয় — পাঠানো দরকার ১২/১৪ বছরের ছেলেদের। একটা প্রাথমিক ইংরেজি শিক্ষা একেবারে অপরিহার্য। আমার মনে হচ্ছে, বেচারা মনুকে আইন শিখতে হবে। অবশ্য সেখানেও প্রশ্ন হলো: তার কি আইনে সফল হবার মতো মেধা আছে? সে কি ইংরেজ জুরিদের সামনে ভেঙে না-পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইংরেজ [ব্যারিস্টারের] বিরোধিতার মুখে মামলার আর্জি করার মতো যথেষ্ট ইংরেজি জানে? আমার খুব সন্দেহ হয়, মিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরও সেটা পারবেন কিনা — যদিও তিনি আরও উচ্চমানের শিক্ষা পেয়েছেন, অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং বয়সেও বড়ো।

মনোমোহন লেখাপড়ায় যেমনই হন না কেন, তাঁর প্রতি মাইকেলের গভীর দরদ এবং আন্তরিক স্নেহ ছিলো। পারিবারিক সূত্রে তিনি আগে থেকেই তাঁকে চিনতেন। নিজের অভাব এবং উদ্বেগের মধ্যেও তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন ভার্সাইতে বেড়িয়ে যেতে। আশা করেন, তাতে মনোমোহন সান্ত্বনা পাবেন। তা ছাড়া, কবি ভাবলেন, তিনি তাঁকে ফরাসি এবং ইটালিয়ান ভাষায় কিছু সাহায্যও করতে পারবেন। কেবল দেশবাসীদের কথা নয়, নিজের লেখাপড়ার কথাও তিনি এক মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারেননি। বিদ্যাসাগরকে অনেক বার মনে করিয়ে দিয়েছেন, গ্রেজ ইনে তাঁর তিনটি টার্ম নষ্ট হয়েছে। অক্টোবরের মধ্যে যথেষ্ট টাকাপয়সা না-পাঠাতে পারলে অন্তত আরও একটি টার্ম নষ্ট হবে। তদুপরি, গ্রেজ ইন তাঁকে গ্রহণ করবে কিনা, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।



সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবশ্য এ পর্যায়ে তিনি যে-চিঠিগুলো লেখেন, তা থেকে মনে হয়, গ্রেজ ইন তাঁকে গ্রহণ করবে না, এটা তিনি কখনো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু ব্যারিস্টার হতে এবং ভারতবর্ষে ফিরে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে আরও বেশি টাকা ব্যয় হবে — এ চিন্তা তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন করেছে।

সেপ্টেম্বর মাসে মনোমোহন ঘোষ তাঁর নিমন্ত্রণে ভার্সাইতে আসেন। এর আগেই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে কবি এক কিস্তি টাকা পেয়েছিলেন। তা ছাড়া, মনোমোহন সেখানে থাকার সময়ে — সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে — আরও এক কিস্তি টাকা পান। এবারে পান প্রায় এক হাজার টাকা। বিদ্যাসাগর যে-কম্পেনির কাগজ পাঠিয়েছিলেন, কবি তা বিক্রি করেন মোট ৯৬ পাউন্ড ১৩ শিলিং ৪ পেনিতে।[৬২] এই খবর তিনি বিদ্যাসাগরকে লেখেন চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে। তা থেকেও আভাস পাওয়া যায়, দুর্বিষহ অভাবের চাপ একটু কমার সঙ্গে সঙ্গে টাকাপয়সার অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ তিনি ভুলতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর মনোভাবও অনেকটা উদ্বেগবর্জিত। বরং তিনি ভাবতে আরম্ভ করেন নিজের

অধ্যয়ন, স্বদেশ এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে।

মনে মনে হিশেব করেন, কখন সত্যেন্দ্রনাথ বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে কলকাতায় পৌঁছে যাবেন। তাঁকে সংবর্ধনা জানাবেন তাঁর সুখী এবং গর্বিত দেশবাসীরা। তেসরা অক্টোবরের চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি লেখেন: 'এতো দিনে আপনি নিশ্চয় সত্যেন্দ্রনাথকে দেখেছেন।[৬৩] আমাদের দেশের প্রথম কভেনেন্টেড সিভিলিয়ন। ... সে একজন চমৎকার লোক।' মনে মনে তিনি কি সত্যেন্দ্রনাথকে ঈর্ষা করেছেন? করা অসম্ভব নয়। প্রথম যৌবনে তিনি যা পিতার বিরোধিতার জন্যে করতে পারেননি, সত্যেন্দ্রনাথ তাই করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ঈর্ষায় কোনো সংকীর্ণতা ছিলো না। বরং তিনি আপসোস করেন, তাঁর ব্যারিস্টার হতে দেরি হয়ে যাচ্ছিলো বলে। 'অন্তত এক বছর পিছিয়ে গেছে।' নভেম্বরে তাঁর ইংল্যান্ডে যাওয়া হচ্ছে কিনা, সে সম্পর্কে লেখেন:

> আমার ইংল্যান্ডে যাওয়া হচ্ছে কিনা অথবা সেখানে গিয়ে লেখাপড়া শুরু করতে পারবো কিনা, তা আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন বলছি এ জন্যে যে, টাকা চেয়েছি আমি, কিন্তু পাঠিয়েছেন আপনি। আমি যেতে পারিনে এবং এখনো পর্যন্ত আমার কোনো ধারণা নেই আপনি কী করতে পেরেছেন [*অর্থাৎ কতো টাকা পাঠাতে পেরেছেন*]। আগামী ডাকে আমি আমার অবস্থান বুঝতে পারবো।

বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে দ্বিতীয় কিস্তিতে তিনি যে-টাকা পেয়েছিলেন, তাঁর সব ঋণ শোধ দেবার জন্যে তা যথেষ্ট ছিলো না। কারণ তিনি পান হাজার খানেক টাকা আর তখন তাঁর ধার ছিলো ১৪০০ টাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সেই পরিবেশে তাঁর পুরোনো 'নবাবী' চাল এবং মেজাজ ফিরে পান। তাঁর বাড়িওয়ালা এবং রু দ্য শাঁতিয়ের দোকানদারদের তিনি ততোদিনে বুঝিয়ে দিয়েছেন — তিনি বড়ো লোক কিন্তু সাময়িকভাবে বেকায়দায় পড়েছিলেন। ভাবটা এই: 'আমি তো আগেই বলেছিলাম। এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো!' গৌরদাস বসাকের কাছ থেকে তিনি এ সময়ে একটি চিঠি পান। সে চিঠির জবাবে তিনি যা লেখেন, তা থেকেও পুরোনো মধু — যিনি এক মোহর দিয়ে চুল ছাঁটিয়ে অন্যের কাছে গর্ব করতে ভালোবাসতেন — সেই মধুর গলা অভ্রান্তভাবে শোনা যায়।

> আমি এখানে — ফ্রান্সে কেন, তুমি নিশ্চয় তা জানার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়েছো। আমি তোমাকে বলছি। এ দেশে বাস করাটা যেমন আরামের, লন্ডন তার অর্ধেকও নয়। লন্ডনের তীব্র আবহাওয়া মিসেস ডাটের সহ্যও হয় না। আমি অবশ্য এই পৃথিবীর যে-কোনো দেশে বাস করার মতো শক্ত মানুষ। তা ছাড়া, সেখানকার তুলনায় এখানে ফরাসি এবং ইটালিয়ান ভাষা আয়ত্ত করার সুযোগ অনেক বেশি। আমি এখন এ দুটি ভাষা অবলীলার সঙ্গে লিখতে এবং পড়তে পারি। এ দুটি ভাষা ছাড়া, আমি জর্মান ভাষাও শিখতে চাই। বস্তুত, ইতিমধ্যে আমি শিখতে আরম্ভ করেছি। সুতরাং তুমি যদি কোনো দিন আমাকে আবার দেখতে পাও, তা হলে শেষ বার আমাদের যখন দেখা হয়েছিলো, তার চেয়ে আমাকে একটু বেশি শিক্ষিত দেখতে পাবে। আমি আইন অধ্যয়নেও অবহেলা করছিনে। তবে ঠিক শুরুত্বের সঙ্গে শুরু করিনি। আমি কয়েকটা টার্ম অবহেলা করেছি এবং য়োরোপে আমার একটু বেশি দিন থাকতে হবে — এই যা। কিন্তু তার জন্যে আমার কোনো আপসোস নেই। আহা, আমি যদি আমার সারা জীবন এখানে থাকতে পারতাম আর বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের জন্যে মাঝেমধ্যে ভারত যেতে পারতাম! কিন্তু তেমন টাকাপয়সা আমার নেই — যদিও তার জন্যে যে খুব একটা ধনী হবার দরকার আছে, তা নয়।[৬৪]

আকৈশোর গৌরদাস কবির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। কিন্তু চিঠির এ পর্যন্ত তিনি একবারও উল্লেখ করেননি, আগের এক বছর তিনি কী দুঃসহ দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছেন। জেলে যেতে যেতে রক্ষা পেয়েছেন। অর্ধাহারে এবং উদ্বেগে ভাগ্যের কাছে মাথা কুটেছেন। আর শেষ পর্যন্ত কিভাবে বিদ্যাসাগরের দয়ায় আবার বেঁচে উঠেছেন। এখানে মাইকেল-চরিত্রের একটা দিক যেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, তেমনটা অন্য কোথাও দেখা যায় না। যদিও মনোমোহন ঘোষের কাছে লেখা চিঠিতেও এই নিরুদ্বিগ্ন কুছ পরোয়া না-করার ভাব খানিকটা লক্ষ্য করা যায়। গৌরদাসকে এ চিঠি লেখার চার দিন পরে নিজের সত্যিকার

অবস্থা গোপন করে মনোমোহন ঘোষকে লিখেছিলেন:

> আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, এ বছর (১৮৬৪) আমি লন্ডনে ফিরে যেতে পারবো। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। এখানে অনেক কিছু আছে, যা আমার মনোযোগ দখল করতে পারে, এবং যা প্রায়ই আমার সেসব উদ্বেগ ভুলিয়ে দিতে পারে, সব মানুষই যেসব উদ্বেগের উত্তরাধিকারী। আমি আশা করি আমার জীবনধারা শান্তিপূর্ণভাবেই বয়ে যাবে। ... তাঁকে [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে] বোলো যে, আমি আমার প্রবাসকে বেশ কাজের বলে বিবেচনা করছি।[৬৫]

এই চিঠিতে তিনি মনোমোহনকে আরও জানিয়েছিলেন ক দিন আগে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীকে কুর্নিশ করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে পাল্টা কুর্নিশ পেয়েছেন। সেই সঙ্গে আরও লিখেছেন, তিনি রাজবাড়ির উদ্যানে গিয়ে বসে থাকেন এবং তাঁর দিকে যখন দস্যুদলের মতো মাছের ঝাঁক এবং রাজহাঁসের দল ছুটে আসে, তখন তিনি তাদের খেতে দেন। (মনোমোহন নিজেও তিন সপ্তাহ আগে মাইকেল-পরিবারে থাকার সময়ে রাজবাড়ি এবং রাজ-উদ্যান দেখে গিয়েছিলেন।) যেহেতু আমরা জানি, তাঁর জীবনে এ সময়ে কী উদ্বেগ এবং অনটন নেমে এসেছিলো, সে জন্যেই গৌরদাস এবং মনোমোহনকে লেখা তাঁর চিঠি দুটি থেকে অভ্রান্তভাবে তাঁর কল্পনাবিলাসী মনের স্বরূপ অনুভব করতে পারি। এ সময়ে তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকেও একটি চিঠি লিখেছিলেন।[৬৬] তাতেও নিজের সমস্যার কথা গোপন রাখেন। বস্তুত, গৌরদাস, মনোমোহন (এবং যতীন্দ্রমোহনের) কাছে লেখা তাঁর চিঠি থেকে আমরা তাঁর নিজেকে জাহির করার মানসিকতা এবং বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করতে পারি। তাঁর কল্পনাবিলাসী মনের স্বরূপ আরও উন্মোচিত হয় ওপরে উল্লিখিত গৌরদাসের কাছে লেখা চিঠির শেষের অংশে।

> মাত্র কয়েক ফ্রাঁ দিয়ে আমি বর্ধমানের মহারাজা স্বপ্নেও যা কল্পনা করতে পারেন না, তার চেয়ে ভালো খাবার খাই। মাত্র কয়েক ফ্রাঁ দিয়ে আমি যে-আনন্দ উপভোগ করি, তা জোগাড় করতে তাঁর অগাধ অর্থের অর্ধেকের বেশি চলে যাবে — না, না, তা দিয়েও তা পাওয়া যাবে না। এমন সঙ্গীত, এমন নৃত্য, এমন সৌন্দর্য! আমাদের পুরোনো শাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে 'অমরাবতী' এ হলো তাই। ... আমি যখন খাই, তখন যে-লোকটি আমার পেছনে এসে দাঁড়ায়, ভারতবর্ষের সবচেয়ে নামজাদা রাজকুমারের দিকেও সে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাবে। একটা ভেজা দিনে যে-মেয়েটি আমার পা থেকে কর্দমাক্ত বুট খুলে নেয়, ভারতবর্ষের সবচেয়ে ধনী রাজাকে সে ছুঁয়ে দেখতেও ঘৃণা বোধ করবে।

রু দ্য শাঁতিয়ে-র ১২ নম্বর বাড়িটি এবং তার বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিলো — আগেই তার আভাস দিয়েছি। তা ছাড়া, ওপরের চিঠিটি লেখার কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত দত্ত-পরিবার কেমন চরম দুর্গতির মধ্যে এবং অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছিলো, তাও লক্ষ্য করেছি। তাঁর এই বড়াইকে সে জন্যেই একেবারে ফাঁকা আওয়াজ বলে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। সেই সঙ্গে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না তাঁর চরিত্রের সেই সুপরিচিত দিকটিকে — অতিরঞ্জিত করে নিজেকে প্রকটন করার দিকটি। প্রশ্ন হলো: তা হলে কবি কি মিথ্যাবাদী ছিলেন? বাস্তব এবং তাঁর বক্তব্যের এতো বড়ো অসঙ্গতি সত্ত্বেও আমি সে কথা বলতে অনিচ্ছুক। যে-জীবন তিনি তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে যাপন করার স্বপ্ন দেখতেন সারাক্ষণ, যে-জীবন সে দেশের অভিজাতরা যাপন করতেন, কিন্তু নিজে যা পারেননি, সেই স্বপ্নের কথাই তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে তাঁর কৈশোরের বন্ধুকে বর্ণনা করেছেন। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই অসঙ্গতি নিশ্চয় মিথ্যে, কিন্তু কল্পনাবিলাসী কবির জন্যে এটা অনৃত ভাষণ নয়। এ হলো কবির অতিশয়োক্তি। এ মিথ্যে থেকে তাঁর অহং তৃপ্তি পায়, কিন্তু অন্য কারো ক্ষতি হয় না।

তদুপরি, তিনি আর্থিক সংকটের মধ্যেও ভার্সাই-এর কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের সমাজে মিশতে পেরেছিলেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে ভক্ত মহিলাদের নিয়ে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের এক-একটা চক্র গড়ে উঠতো। এই চক্রের মধ্যে যাঁদের বলা যায়, সামাজিক

মহিলা, তাঁরাও থাকতেন। তা ছাড়া, উনিশ শতকের বাংলার মতো বারাঙ্গনা-গমনও সাহিত্যিক-শিল্পীদের জন্যে মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিলো না। এ ব্যাপারে ইংল্যান্ডের ভিক্টোরীয় সমাজের সঙ্গে ফ্রান্সের মস্তো একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কবির পক্ষে এ রকমের একটা চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়। তিনি যে রু দ্য শাঁতিয়ের বাড়ির দরজা বন্ধ করে সেখানে বসে সারা দিন ফরাসি আর ইটালিয়ান শেখেননি, তা তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়। আগেই দেখছি, তিনি বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠিতে বলেছেন যে, ভার্সাই-এর মতো একটি মফস্বল শহরেও সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী অর্ধ-ডজন লোক আছেন। এই লোকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিলো এবং তিনি সংস্কৃতসহ তাঁর ধ্রুপদী ভাষাজ্ঞান দিয়ে তাঁদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে চেষ্টা করেছেন, এটা অনুমান করা কঠিন নয়। তিনি যে বড়ো কবি, নাট্যকার, ব্যারিস্টার এবং জমিদার — সে কথা তিনি তাঁর পরিচিতদের ফলাও করে বলেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভার্সাইতে থাকা কালে তাঁর যে-কন্যার জন্ম হয়, তার মৃত্যুর সার্টিফিকেটে তাঁর পরিচয় লেখা আছে ব্যারিস্টার হিশেবে — যদিও তখনো তিনি ব্যারিস্টার হননি। তিনি যে ভার্সাই-এর বন্ধুদের তাঁর লেখা সনেট পড়ে শুনিয়েছেন এবং তাঁরা তার প্রশংসা করেছেন, গৌরদাসকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে তা জানা যায়।[৬৭] তিনি যে সমাজের ওপরতলার একজন মানুষ — কোনো ভাগ্যান্বেষী নন, সে সম্পর্কে ইংরেজিতে লিখে জানানোর জন্যে তিনি বিদ্যাসাগরকেও অনুরোধ জানিয়েছিলেন। (বিদ্যাসাগর তাঁকে সাধারণত চিঠি লিখতেন বাংলায়।) ভার্সাইতে বেকায়দার মধ্যে থাকলেও তিনি তাঁর উঁচু সামাজিক অবস্থানের দোহাই দিয়ে কবি-সাহিত্যিকদের চক্রে মিশে এমন ভোজসভায় হয়তো অংশ নিয়েছেন যেখানে একটি পরিচারক অথবা পরিচারিকা তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং ঐ চক্রের কোনো নারীর সঙ্গে তাঁর এমন ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব, যে তাঁর কর্দমাক্ত জুতো তাঁর পা থেকে একবার খুলে নিয়েছে। আমরা পরের আলোচনা থেকে দেখতে পাবো, তাঁর চারটি সনেট থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, ফ্রান্সের কোনো এক নারীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো। সুতরাং গৌরদাসকে তিনি যা লিখেছিলেন, তা একেবারে অমূলক না-ও হতে পারে।

সর্বোপরি, ফ্রান্সে তিনি এমন কতোগুলো মূল্যবোধ লক্ষ্য করেছিলেন, যা ছিলো ইংল্যান্ড এবং ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক উন্নত এবং এটা দেখে তিনি তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ না-করে পারেননি।

> এখানে ছোটোবড়ো সবাই তোমাকে ড্যাম্ড্ নিগার হিশেবে নয় — একজন মানুষ হিশেবে বিবেচনা করবে। এখানে চলে এসো, তুমি তা হলে অচিরেই ভুলে যাবে যে, তুমি নিচ এবং পরাধীন একটি জাতির লোক। এখানে তুমি তোমার প্রভুদেরও প্রভু। ... আমি ফ্রান্সের সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীকে কুর্নিশ করার এবং তাঁদের কাছ থেকে পাল্টা কুর্নিশ পাওয়ার সম্মান অর্জন করেছি। এটা য়োরোপ, ভাই, ভারতবর্ষ নয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজরা দেশীয়দের কেমন নিচ দৃষ্টিতে দেখে 'ড্যামড নিগার' হিশেবে তিনি সেটাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। য়োরোপীয় আদর্শ তাঁকে আগে থেকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। বিশেষ করে ইংরেজদের মধ্যে যে-বর্ণবিদ্বেষ লক্ষ্য করেছিলেন, ফ্রান্সে এসে তিনি তা তেমন করে দেখতে পাননি। সে জন্যে য়োরোপীয় আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর সেই দুঃসময়ের মধ্যেও ছেলেমেয়েকে পুরোপুরি য়োরোপীয় করে তোলার সংকল্প নিয়েছিলেন।

> শর্মিষ্ঠা এরই মধ্যে বেশ ফরাসি হয়ে উঠেছে। সে যেভাবে গরগর করে কথা বলে তুমি তা শুনলে বিশ্বাস করতে পারবে না যে, সে হুগলি নদীর তীরে জন্মেছিলো। আমার ছেলে মিল্টনও বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ... সন্তানদের শিক্ষার জন্যে আমি আমার পরিবার য়োরোপে রেখে যাবো।

অভাবের চাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় সেই পরিবেশে নিজের কাব্যচর্চা করছেন কিনা, সে প্রসঙ্গেও কিছু না-বলে পারেননি। বিশেষত যাঁকে বলছেন, তিনি যখন তাঁর 'ভাবী জীবনী-লেখক' হবেন বলে

তিনি প্রত্যাশা করছিলেন!

> সম্প্রতি কাব্যচর্চা কিন্তু তেমন এগুচ্ছে না। তবে ফরাসি এবং ইটালিয়ান কাব্যের অনুকরণে ছিটেফোঁটা কিছু লেখার চেষ্টা করেছি। আগের সেই নেশাটা কেটে গেছে। আর কোনোদিন আসবে কিনা, তাও জানিনে। তুমি তো জানো আমি লিখি মাঝেমধ্যে, এক-একটা ঝোঁকের মাথায়।

নেশা যে কেটে গেছে, তা আগেই লক্ষ্য করেছি। এই চিঠিতে তিনি যে-ফরাসি কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো জঁ দে লা ফঁতেনের (১৬২১-৯৫) অনুকরণে তিনটি শিশুপাঠ্য নীতিকবিতা – ময়ূর ও গৌরী, কাক ও শৃগালী এবং রসাল ও স্বর্ণলতিকা। লা ফঁতেন ১৬৬৮ থেকে ১৬৯৪ সালের মধ্যে ১২টি সর্গে *ফাবৃল শোয়াজি* নামে নীতিগল্প প্রকাশ করেছিলেন। মাইকেল সেখান থেকে তাঁর এই কবিতা তিনটির ধারণা পান। বলা মুশকিল; এতো বিষয় থাকতে তিনি কেন নীতিমূলক কবিতা পছন্দ করলেন। তাঁর উল্লিখিত ইটালিয়ান কবিতা হলো পেত্রার্কার (১৩০৪-৭৪) অনুকরণে রচিত সনেট। এই চিঠি লেখার তিন মাস পরে কবি চারটি সনেট পাঠিয়েছিলেন গৌরদাসের কাছে।[৬৮] যদিও ততোদিনে লিখে ফেলেছিলেন অনেকগুলো। গৌরদাসকে উল্লেখ করেছেন – শিগগিরিই তাঁর এক খণ্ড কবিতা প্রকাশিত হতে পারে।

সনেট যে মাইকেল ভার্সাইতে প্রথম রচনা করলেন, তা নয়। তরুণ বয়সে তিনি ইংরেজিতে বেশ কয়েকটি সনেট লিখেছিলেন। শেকসপীয়রের আদর্শে রচিত তাঁর এই সনেটগুলো লেখার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন প্রধানত তাঁর প্রিয় শিক্ষক রিচার্ডসনের কাছ থেকে। বিদেশী ভাষায় এই সনেটগুলো রচনা করেছিলেন একটি সতেরো/আঠারো বছরের তরুণ, এটা বিবেচনা করলে তাঁর এই সনেটগুলো যথেষ্ট উঁচু মানের বলতে হবে। তার বহু বছর পরে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'কবি-মাতৃভাষা' সনেটটি লেখেন কলকাতায় থাকার সময়ে – আমরা আগেই তা লক্ষ্য করেছি। তবে এটা ছিলো তাঁর রচনার মধ্যে একটা ব্যতিক্রম। কিন্তু এবারে ইটালিয়ান শিখতে গিয়ে নতুন করে আগ্রহ দেখালেন সনেটে – বিশেষ করে পেত্রার্কার সনেটে।

তিনি বিশেষ করে পেত্রার্কাকে কেন বেছে নিয়েছিলেন, সে প্রশ্ন অবান্তর নয়। তবে এর কারণ খুঁজে পাওয়া আদৌ কঠিন নয়। পেত্রার্কা ছিলেন পণ্ডিত-কবি। প্রিয়াকে নিয়ে লেখা তাঁর কবিতায় রোম্যান্টিকতার ছড়াছড়ি আছে; কিন্তু তিনি নিরন্তর বিচরণ করতেন ধ্রুপদী সাহিত্যের জগতে। মাইকেলও ছিলেন হুবহু সে রকমের। মনে-প্রাণে রোম্যান্টিক হওয়া সত্ত্বেও, তিনিও সারাক্ষণ চর্চা করতেন ধ্রুপদী ভাষা এবং সাহিত্য। আইনজীবীর সন্তান ছিলেন পেত্রার্কা। তাঁর পিতা তাঁকে বাধ্য করেছিলেন আইন পড়তে। কিন্তু পিতা মারা যাবার পরে তিনি আর কোনোদিন আইনের দিকে তাকিয়ে দেখেননি। অতঃপর তিনি ডুব দেন ধ্রুপদী সাহিত্য এবং প্রাচীন বিদ্যার বিশাল সরোবরে। অবশ্য প্রাচীন ভাষা এবং সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি প্রাচীন জগতে ফিরে যেতে চাননি। বরং অন্য রেনেসান্সের পণ্ডিতদের মতো প্রাচীন ভাষা এবং সাহিত্য দিয়ে তিনি সমকালীন ভাষা এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেও তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন মানবিক আদর্শের জয়গান। মাইকেল এই আদর্শে দীক্ষা নিয়েছিলেন ভার্সাইতে যাবার অনেক আগে থেকে। রেনেসান্সের মানবিকতার প্রতিফলন ঘটেছিলো *তিলোত্তমাসম্ভব* থেকে *বীরাঙ্গনা* পর্যন্ত কবির প্রতিটি রচনায়। এখন নিবিড়ভাবে পেত্রার্কার সাহিত্য পড়তে গিয়ে তিনি পেত্রার্কার সঙ্গে তাঁর মনন এবং মানসের আশ্চর্য মিল দেখতে পেলেন। পেত্রার্কার ছিলো সাহিত্য পাঠের অতৃপ্ত তৃষ্ণা। এখানেও মাইকেল পেত্রার্কার সঙ্গে নিজের অসামান্য মিল খুঁজে পান। সে জন্যে ইটালির কবি অমন করে বাঙালি কবির হৃদয় হরণ করেছিলেন। বেশ কম বয়সেই পেত্রার্কা এতো কবি-খ্যাতি লাভ করেন যে, তিনি রাজকবি হবার আহ্বান পান একই সঙ্গে প্যারিস এবং রোম থেকে। ১৩৪১ সালে তিনি অবশ্য রোমের আহ্বানই

মেনে নিয়েছিলেন। রাজকবিদের প্রতি মাইকেলেরও একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিলো।

কবি যখন ভার্সাইতে বসে সনেট মকশো করছিলেন, তার পাঁচ শো বছর আগে প্রিয়তমা লরার উদ্দেশ্যে রচিত *Canzoniere* কাব্যের শ তিনেক সনেটের মধ্য দিয়ে পেত্রার্কা সনেটকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন। তিনি সনেট এবং খণ্ড কবিতার এমন আদর্শ স্থাপন করেন, যা পরবর্তী চার/পাঁচ শতাব্দী ধরে য়োরোপীয় সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ফ্রান্স, জার্মেনি, ইংল্যান্ড, স্পেন ইত্যাদি দেশে তাঁর যে-অনুকরণ এবং অনুসরণ চলতে থাকে, তাকে এক কথায় বলা হতো পেত্রার্কিজ্‌ম্ বা পেত্রার্কাবাদ। মাইকেলের সমসাময়িক ফ্রান্সের অত্যাধুনিক কবি বোদলেয়ারেও পেত্রার্কার প্রভাব অব্যাহত ছিলো – যদিও সীমিত পরিমাণে। পেত্রার্কা তাঁর কাব্যকে এমন পরিশীলিত এবং নাগরিক রূপ দিয়েছিলেন, রেনেসান্সের সময়কার এবং তার পরবর্তী কবিরা যাকে আধুনিকতার প্রথম সোপান হিশেবে গণ্য করেন।

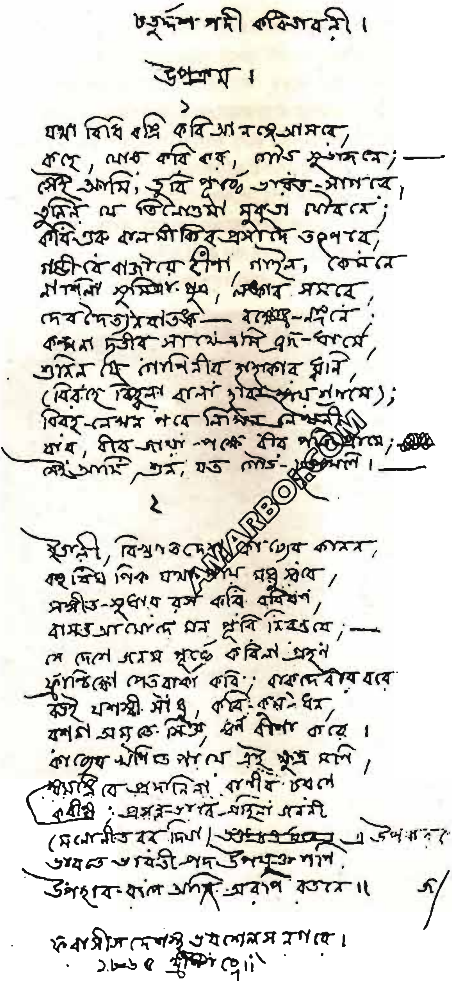
পেত্রার্কা লরার (ইটালীয় উচ্চারণ লাউরা) প্রেমে পড়েছিলেন তেইশ বছর বয়সে। দূর থেকেই তাঁকে ভালোবেসেছিলেন। মিলন হয়নি কোনো দিন। তা ছাড়া, লরা মারাও যান অকালে। তারপর পেত্রার্কা বেঁচে থাকেন অনেক কাল। কিন্তু লরাকে উদ্দেশ্য করে চলতে থাকে তাঁর সনেট এবং অন্য কবিতা রচনার সাধনা। লরার প্রেম এবং বন্ধুত্ব; লরার অনুপস্থিতি, বিরহ এবং অসুস্থতা; প্রেম এবং অনুশোচনা; প্রেম এবং মৃত্যু; প্রেম এবং ধর্ম; লরার চোখ এবং চুল; লরার জন্যে শোক; প্রেম, খ্যাতি এবং হতাশা, অন্য এক নারীকে দেখে লরাকে মনে পড়া ইত্যাদি ছিলো তাঁর এসব সনেটের বিষয়বস্তু। এই সনেটগুলোর বিষয়বস্তু মাইকেল কোথাও অনুসরণ করেননি। যেমন পেত্রার্কার সনেট তাঁর আদর্শ হলেও, আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর সনেটে প্রেম কার্যত অনুপস্থিত। বস্তুত, তিনি অনুসরণ করেন পেত্রার্কার সনেটের কাঠামো। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও, অন্ত্যমিলে অনেক জায়গায় পেত্রার্কার আদর্শ তিনি মান্য করেননি। পেত্রার্কার সনেটের অষ্টকে অন্ত্যমিল ছিলো প্রায় সর্বত্র কখখককখখক। আর ষট্‌কে গ এবং ঘ এর নানা রকমের বিন্যাস – গঘগঘগঘ, গঘঘগগঘ ইত্যাদি। মাইকেল অষ্টকে পেত্রার্কার আদর্শ অনেক জায়গায় অনুসরণ করেছেন, কিন্তু ষট্‌কে নয়। তদুপরি, তাঁর অনেক সনেট তাঁর তরুণ বয়সের সনেটের মতো শেকসপীয়রের আদর্শে রচিত।

ডিসেম্বর মাসের (১৮৬৪) দ্বিতীয় সপ্তাহে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে তিনি তৃতীয় কিস্তি টাকা পেয়েছিলেন। তুলনামূলক স্বাচ্ছন্দ্যের এই সময়ে তাঁর মন থেকে কয়েক মাসের আগেকার তিক্ত স্মৃতির কালো মেঘ অনেকটা কেটে গিয়েছিলো এবং তার পরিবর্তে দেখা দিয়েছিলো নরম আলোর মতো বাল্য এবং কৈশোরের সুখস্মৃতি। মনে মনে নিজেকে যতোই য়োরোপীয় ভাবুন না কেন, ছ হাজার মাইল দূরে ফেলে-আসা মাতৃভূমির জন্যে তাঁর সমস্ত অন্তর এ সময়ে উতলা হয়ে উঠেছিলো। এই অনুকূল পরিবেশে তাঁর সনেট লেখার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলে।

তাঁর সনেটের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে মোদ্দাভাবে বিষয়বস্তু অনুযায়ী সেগুলোকে নিচের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

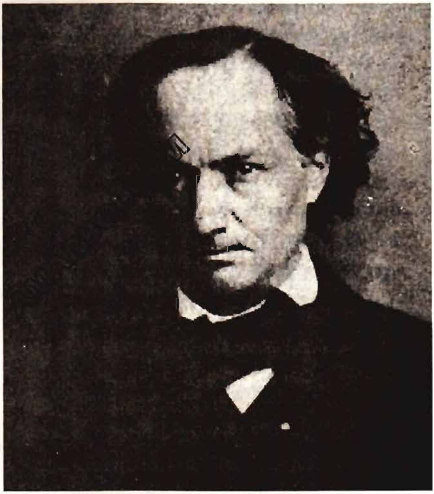
> ১. স্বদেশের নস্টালজিক স্মৃতি (৩১টি); ২. ব্যক্তি / কাব্য নিয়ে সনেট (২৮টি); ৩. অর্থ এবং কবি-খ্যাতি নিয়ে আপন অন্তরের দ্বন্দ্ব (১২টি); ৪. করুণ, বীর, রৌদ্র, শৃঙ্গার ইত্যাদি রস বিষয়ক সনেট (৬টি); আর ৫. সৃষ্টিরহস্য এবং বিচিত্র রসের (২৭টি) সনেট।

নস্টালজিক স্মৃতি নিয়ে সনেটই তিনি নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন। স্বদেশের মাটি ও মানুষ নিয়ে লেখা সনেটগুলোর মধ্যে 'কপোতাক্ষ' (তাঁর নিজের বানানে কবতক্ষ) বিশেষ নাম-করা। ২৬ অক্টোবর তিনি গৌরদাসকে যে-চিঠি লেখেন, তাতে কপোতাক্ষের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা



পেত্রার্কার প্রতি মাইকেলের স্বহস্তে লেখা প্রশস্তি।
তাঁর পেতরার্কা বানান লক্ষণীয়।

করেছেন, কিন্তু 'কপোতাক্ষ নদ' সনেটটির কথা উল্লেখ করেননি। বোঝা যায়, বাল্যবন্ধু গৌরদাসের চিঠি পড়ে কবির মনে বাল্যস্মৃতির যে-ঢেউ জেগে উঠেছিলো, তা-ই অতঃপর একটির পর একটি নস্টালজিক সনেট লিখতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। 'কপোতাক্ষ'-এর মতো স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় অনেকগুলো কবিতা রচনা করে ফেলার পর এক খণ্ড কাব্য প্রকাশের উদ্দেশ্য মনে রেখে তিনি বাকি সনেটগুলো রচনা করেন বলে মনে হয়। এসব সনেটের মধ্যে এমন কতোগুলো সনেট ছিলো যাতে তাঁর আবেগ ঘনীভূত হয়ে প্রকাশ পায়নি। তাঁর *চতুর্দশপদী কবিতাবলিতে* মোট সনেট ছিলো এক শোটি। মনে হয় সংখ্যা পূরণের তাগিদেই যেন তিনি শেষ দিকের সনেটগুলো রচনা করেন। বিভিন্ন রস নিয়ে লেখা সনেটগুলো যদি তিনি শেষ পর্যায়ে লিখে থাকেন, তা হলে অবাক হবো না। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের এ আদর্শ তাঁকে এসব সনেট লেখার পথ দেখিয়েছিলো। আরও একটা কথা এখানে মনে করা যেতে পারে। সে হলো: মুখে যতোই *সাহিত্যদর্পণের* মতো ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রকে অস্বীকার করুন না কেন, কাব্য এবং নাটক রচনা করার সময়ে তিনি সেসব একেবারে অস্বীকার অথবা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। কলকাতায় তিনি যখন সৃষ্টিযজ্ঞে মশগুল তখনকার চিঠিপত্রের সঙ্গে তাঁর নাটক এবং কাব্য মিলিয়ে দেখলে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বোঝা যাবে। বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে কবি যে-সনেটগুলো রচনা করেন, বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তাদের কোনো কোনোটা তিনি লিখেছেন নিতান্ত লেখার খাতিরে অথবা আনুষ্ঠানিকতা পালন করার তাগিদে – স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের তাড়নায় নয়। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য করবো।



শার্ল বোদলেয়ার : মাত্র ৩৯ বছর বয়সে

মাইকেলের কাব্যরুচি সম্পর্কেও এখানে কিছু বলা যেতে পারে। য়োরোপের সভ্যতা এবং সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও সমকালীন য়োরোপীয় সাহিত্যের হালচাল তিনি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তখন ইংরেজি সাহিত্যে চলছিলো তৃতীয় প্রজন্মের রোম্যান্টিক কবিতার ধারা। সেই সঙ্গে সূত্রপাত হয়েছিলো মধ্য-ভিক্টোরিয়ান ধারার। আর ফ্রান্সে রোম্যান্টিক-উত্তর নব্য-রোম্যান্টিক / প্রতীকী কাব্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন শার্ল পিয়ের বোদলেয়ার। মাইকেল ভার্সাইতে যাবার ঠিক ছ বছর আগে বোদলেয়ার তাঁর বিখ্যাত কাব্য *লে ফ্ল্যর দ্যু ম্যল* প্রকাশ করেন। এই কাব্যের অশ্লীলতা এবং ধর্মদ্রোহিতার দায়ে আদালতে তাঁর জরিমানা হয়েছিলো তিন শো ফ্রঁ। (পরের জানুআরি মাসে তিনি যখন রানীর কাছে এই অর্থ দেবার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে জরিমানা মৌকুফ করার আবেদন জানান, তখন এই জরিমানা কমিয়ে ৫০ ফ্রঁতে নামানো হয়। বোদলেয়ারকে খরচ সমেত দিতে

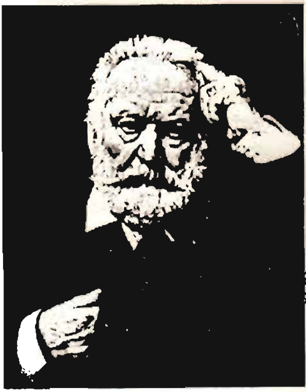
হয়েছিলো মোট ৫৩.৭০ ফ্রঁ। তবে একই সময়ে সরকার তাঁকে এক শো ফ্রঁর একটি অনুদান দেয়।) জরিমানা ছাড়াও, এ কাব্যের ছটি কবিতা তখন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। (এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় প্রায় এক শো বছর পরে — ১৯৪৯ সালে।)[৬১] প্রকৃত পক্ষে, এ কাব্য কেবল সাহিত্যের আসরে ঝড় তোলেনি, নৈতিকতার প্রশ্নে শিক্ষিত সমাজে তীব্র বিতর্কেরও সূচনা করেছিলো। এ কাব্যের কথা শোনেননি, ফ্রান্সে তেমন শিক্ষিত এবং বিদগ্ধ লোক তখন কমই ছিলেন। প্রায় এক শো চল্লিশ বছর পরে এখনো সাধারণ লোকের চোখে বোদলেয়ার পাপ এবং বিকারের প্রতীক বলে পরিচিত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লিখলেও তিনি আসলে লিখেছিলেন বিংশ শতকের আধুনিক সভ্যতার এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে-ক্ষতবিক্ষত আধুনিক মানুষের কবিতা। পরবর্তী প্রতীকবাদী কাব্যধারারও তিনি পথিকৃৎ। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে আস্থা না-থাকলেও, তিনি তাঁর কাব্যে ধর্মোত্তীর্ণ এক ঈশ্বরের অন্বেষণ করেছেন। অরূপ এবং জীবনের তাৎপর্য খুঁজেছেন রূপের মধ্যে। ক্লেদের মধ্যেও কুসুমের সৌন্দর্য এবং পবিত্রতা দেখতে পেয়েছেন তিনি।

নিষেধের গণ্ডি ভঙ্গ করে এবং প্রচলিত মূল্যবোধে অকল্পনীয় আঘাত করে তিনি যে-নান্দনিক জগৎ সৃষ্টি করেন, সমকালীন সমাজের অনেকে তা অনুধাবন করতে সমর্থ হননি। মাইকেলও সমর্থ হয়েছিলেন কিনা, বলা সম্ভব নয়। এমন কি, তিনি যে সমসাময়িক ফরাসি ভাষার সবচেয়ে বিতর্কিত এবং বৈপ্লবিক এই কবির নাম শুনেছিলেন — সে কথাও কোথাও উল্লেখ করেননি। যদিও পরের আলোচনায় লক্ষ্য করবো, তাঁর একটি কবিতার নামকরণে *ফ্লর দ্যু ম্যল* নামটি প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। তা ছাড়া, আরও দুটি কবিতার বিষয়বস্তুতেও বোদলেয়ারের ছাপ পড়া একবারে অসম্ভব নয়। তবে এ মিল কাকতলীয়ও হতে পারে। বোদলেয়ারের কাব্য পড়ে থাকলেও, তাঁর কবিতার অদ্ভুত গতিময়তা এবং নান্দনিক তাৎপর্য তিনি ঠিক অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, বোদলেয়ার যে-অর্থে আধুনিক, মাইকেল সে অর্থে আধুনিকও ছিলেন না। বোদলেয়ারে কল্পনার যে-অভিনবত্ব এবং ভাবের যে-গভীরতা লক্ষ্য করা যায়, মাইকেলে তা অনুপস্থিত।

তবে একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্যে এই দুই কবির সাদৃশ্য না-থাকলেও, এই দুই বোহীমিয়ান কবির ব্যক্তিগত জীবন এবং মনোভাবে — অসংযম, অমিতব্যয় এবং আত্মহননের প্রবণতায় — অনেক আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। মাইকেলের মতো বোদলেয়ার ছিলেন ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। কেবল কাব্যচর্চাকে তরুণ বয়স থেকে তিনি প্রধান কাজ হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬২ সালের ৯ জুন মাইকেল কলকাতা থেকে য়োরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার ঠিক একুশ বছর আগে, ১৮৪১ সালের ৯ জুন বোদলেয়ার যাত্রা করেছিলেন কলকাতার উদ্দেশে। কিন্তু জাহাজে তিনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। তা ছাড়া, মরিশাসে জাহাজ ভেড়ার পর তিনি ঠিক করেন, তিনি আর পুব দিকে যাবেন না। এ কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁর কলকাতা অথবা ভারতবর্ষে যাওয়া হয়নি। তার বদলে পরের ফেব্রুআরি মাসে ফ্রান্সে ফিরে যান তিনি। কিন্তু তাঁর সেই স্বল্পকালীন যাত্রা বিফল হয়নি। সত্যি বলতে কি, সেই যাত্রা তাঁর মনোজগৎ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়ে এসেছিলো ব্যাপক পরিবর্তন। তাঁর পিতা মারা যান শার্লের বয়স যখন পুরো ছ বছরও হয়নি। তিনি যে-সম্পত্তি রেখে যান শার্লের জন্যে, একুশ বছর বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই সম্পত্তিতে পেয়েছিলেন প্রায় পূর্ণ অধিকার। অমনি দু হাতে তিনি টাকা ওড়াতে আরম্ভ করেন। দু বছর পুরো হবার আগেই তিনি অর্ধেক টাকা খরচ করে ফেলেন। অতঃপর তাঁর মা বাকি সম্পত্তি ট্রাস্টিদের হাতে সমর্পণ করেন। ট্রাস্টিরা ঠিক করে দিলেন যে, শার্ল পাবেন কেবল সেই সম্পত্তি থেকে সারা বছরে যে-লাভ হবে, সেই টাকা। মূলে তিনি হাত দিতে পারবেন না। অমিতব্যয়ী শার্ল এতে খুব বেকায়দায় পড়েন। তিনি হাতে যে-টাকা পেতেন তার পরিমাণ ছিলো বছরে মাত্র ৭৫ পাউন্ডের মতো। বেহিশেবী শার্লের এ দিয়ে আদৌ

চলতো না। লিখে আয় করার তাঁর সংকল্প আর্থিক দিক দিয়ে কেবল অংশত সফল হয়েছিলো। ধীরে ধীরে তিনি জড়িয়ে পড়েন ব্যাপক ঋণজালে। তিনি যখন প্রায় নিঃস্ব তেমন অবস্থায়, ১৮৬২ সালে তাঁকে দেউলে ঘোষণা করা হয়। এর পর তাঁর সীমিত আয়ের প্রায় সবটাই আসতো তাঁর বই আর পত্রিকার লেখা থেকে। দু বছর পরে বক্তৃতা দিয়ে বাড়তি টাকা উপার্জনের জন্যে তিনি বেলজিয়াম যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা মোটেই সার্থক হয়নি। উল্টো, সেখানে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ওদিকে অল্প বয়সেই তিনি নানা নারীরসংসর্গ লাভ করেন। পরপর বেশ কয়েকটি নারীকে তিনি ভালোও বেসেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম প্রেম — কৃষ্ণাঙ্গ এক মহিলা — মাদাম জ্যান দুভাল সমাজের ওপরতলার বারবণিতা ছাড়া অন্য কিছু ছিলেন না। কবি অন্য একাধিক নারীর প্রতি আকৃষ্ট হলেও এবং



ভিক্তর উগো

তাঁর প্রতি জ্যান দুভালের আনুগত্য প্রশ্নসাপেক্ষ হলেও প্রথম প্রেমিকার প্রভাব তিনি মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারেননি। উপদংশ এবং অপরিমিত মদ্যপানে মাত্র বছর তিরিশেক বয়সেই তিনি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যান। শেষ পর্যন্ত ১৮৬৭ সালে ৪৬ বছর বয়সে তিনি পক্ষাঘাতে মারা যান। তাঁর একটি চিঠি থেকে বোঝা যায়, তাঁর এবং মাইকেলের সমস্যার মধ্যে বেশ মিল ছিলো। ১৮৫২ সালের ২৭ মার্চ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে বোদলেয়ার তাঁর পুরোনো এবং দুরারোগ্য সমস্যাগুলোর ব্যাপারে তাঁর মাকে জানান: 'এই অবস্থায় আমি নিজে যে-লক্ষ্যবস্তুগুলো অর্জন করবো বলে ঠিক করেছি, তা কোনো কালে অর্জন করতে পারবো না। এই লক্ষ্যগুলো হলো — আমার ধার শোধ দেওয়া, আর্থিক নিরাপত্তা লাভ, খ্যাতি অর্জন করা এবং তোমাকে যে-দুঃখ দিয়েছি, তা দূর করা।'[১০] শেষটি ছাড়া, বাকি লক্ষ্যগুলো মাইকেলেরও ছিলো। বোদলেয়ারের মতো অনাচারী না-হলেও, মাইকেল অন্য নারীর সংসর্গ করেছিলেন কিনা, নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ফ্রান্সে থাকার সময়ে অন্তত একটি ক্ষেত্রে করেছিলেন বলে অনুমান করি। কিন্তু অপরিমিত মদ্যপানের দ্বারা নিশ্চিতভাবে তিনি বোদলেয়ারের মতো অকালে আত্মহননে সমর্থ হয়েছিলেন।

সমকালীন ফরাসি কবি ভিক্তর উগো এবং ইংরেজ কবি অ্যালফ্রেড টেনিসনকে উদ্দেশ্য করে মাইকেল দুটি সনেট লিখেছিলেন।[১১] তা থেকে কারো কারো মনে হতে পারে যে, তিনি বোধ হয় এ দুজন কবির ভক্ত ছিলেন অথবা তাঁদের কাব্য দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেটা আদপে ঠিক নয়। উগো আর টেনিসন ছিলেন সে সময়কার যথাক্রমে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত কবি। ১৮৬৫ সালে এঁদের বয়স ছিলো যথাক্রমে ৬৩ আর ৫৬। ফ্রান্সের রোম্যান্টিক কাব্য-আন্দোলনের প্রধান নায়ক হিশেবে উগোর নাম অবিস্মরণীয়। ঔপন্যাসিক এবং প্রতিষ্ঠান-বিরোধী রাজনীতিক হিশেবেও তাঁর নাম কম ছিলো না। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার দরুন তাঁকে দু দশকের জন্যে স্বেচ্ছানির্বাসন নিতে হয়েছিলো। এই নির্বাসনে যাবার ছ বছর আগে ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপের কাছ থেকে তিনি সম্মান এবং খেতাব লাভ করেন। প্রজাতন্ত্র হবার পরেও তিনি শাসকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সম্মান এবং খাতির পেয়েছিলেন। তবে উগো যে-ধরনের মানবতাবাদী রোম্যান্টিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন

এবং সত্যিকার অর্থে জনগণের কবি ছিলেন, মাইকেলের মানসিকতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। মাইকেল পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে রেনেসান্সের হিউম্যানিস্ট আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। বিশেষ করে *মেঘনাদবধকাব্যে* তিনি দৈবশক্তির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামী স্পিরিটের জয়গান করেছেন। কিন্তু উগোর মতো গণসচেতন কবি তিনি ছিলেন না। ওদিকে, টেনিসন ছিলেন তৃতীয় প্রজন্মের রোম্যান্টিক কবি। মাইকেল তাঁকে নিয়ে সনেট রচনা করার পনেরো বছর আগে রাজকবি হিশেবে তিনি শিরোপা লাভ করেছিলেন। রাজকবিদের মাইকেল দেখতেন বিশেষ ঈর্ষা এবং শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। নিজেও রাজকবি হবার স্বপ্ন দেখেছেন — বোধ হয় সারা জীবন। টেনিসন এবং উগোর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দুটি সনেট রচনা করে তিনি যেন রাজকবিদের প্রতি তাঁর আন্তরিক দুর্বলতাই প্রকাশ করেন।

মাইকেলের সর্বশেষ কবিতাগুচ্ছ — *চতুর্দশপদী কবিতাবলি* — আঙ্গিক এবং আস্বাদের দিক দিয়ে তাঁর আগেকার কবিতা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে আলাদা। কিন্তু এ কবিতার মধ্যেও ব্যক্তি মাইকেলকে সমানভাবে — এমন কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাব্য এবং নাটকের আলোচনার সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, তিনি আপাতদৃষ্টিতে পৌরাণিক বিষয়বস্তু নির্বাচন করলেও, আসলে তাঁর অনেক রচনাই আত্মজৈবনিক। এবং আত্মজৈবনিক প্রেরণা যতো প্রবল, তাঁর সে রচনা ততো আন্তরিক এবং প্যাশন-পরিপূর্ণ। সনেটের মধ্য দিয়েও তিনি এই কথাটা আর-এক দফা প্রমাণ করেন। যেসব সনেটে তিনি তাঁর বাল্যের লীলাক্ষেত্র ফেলে আসা সাগরদাঁড়ির স্বপ্ন দেখেছেন অথবা স্মরণ করেছেন স্বদেশের কথা, সেসব সনেটেই তাঁর ভাবাবেগ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। 'কপোতাক্ষ নদ' এই প্রসঙ্গে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এ নদকে তিনি বিরলে বসে সতত স্মরণ করেছেন। তাঁর চেতনা এবং অবচেতনায় এই নদ, বস্তুত, একাকার হয়ে গিয়েছিলো। এই আন্তরিকতা এবং গভীরতা পাঠককে নাড়া না-দিয়ে পারে না।

সতত (যেমতি লোকে নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!...
এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।

লক্ষ্য করা যেতে পারে, কৃশাঙ্গ কপোতাক্ষের ঘোলাটে জল এখানে কবির দৃষ্টিতে জননীর স্তন্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে এবং ভাষাও প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ ভাষা থাকেনি, তা রূপ নিয়েছে সঙ্গীতের। তাঁর অন্য সনেটগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, নদীতীরের বটবৃক্ষ, ভাঙ্গা শিবমন্দির, বউ কথা কও পাখি, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, রামায়ণ, সীতা, মহাভারত, সরস্বতী, ঈশ্বরী পাটনী, শ্যামা-পক্ষী, শ্রীমন্তের টোপর — সবই তাঁর মনকে উদ্বুদ্ধ করেছে। হিন্দু ধর্মের বন্ধন তিনি কাটিয়ে এসেছিলেন বহু কাল আগে। মনে-প্রাণে একটা ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গেও নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা, বিজয়া দশমী, শ্রীপঞ্চমী, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি অনুষঙ্গ তাঁর মনকে নস্টালজিক বোধে উতলা করেছে।

কবিকে চেনার জন্যে অবশ্য এ সনেটগুলোর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্য কয়েকটি সনেট, যাতে তিনি একান্তভাবে বলেছেন নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। তিনি কবিযশ লাভ করার স্বপ্ন

দেখেছিলেন, আবার বড়োলোক হয়ে জীবনকে উপভোগ করার স্বপ্নও দেখেছিলেন। জীবনের কোনো পর্বে তিনি এর একটিকে পুরো বর্জন এবং অন্যটিকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কখনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি, লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মধ্যে কে তাঁর বেশি আরাধ্য। কলকাতা থেকে বিলেত যাত্রা করার আগে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন: আর কবি-মধু নয়, অতঃপর মাইকেল এম এস ডাট ব্যারিস্টার অ্যাট ল। এ থেকে মনে হতে পারে যে, অতঃপর তিনি কবি-খ্যাতির চেয়ে বড়োলোক হবার বাসনাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সনেটগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, লক্ষ্মীর প্রতি সীমাহীন দুর্বলতা সত্ত্বেও, তিনি স্বীকার করেছেন, যে-অমরত্বের কাঙাল, সরস্বতীই তাঁকে তা দান করতে পারেন। একটি সনেটে বলেছেন

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে, –
কিন্তু যে কল্পনারূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে!

এ কবিতায় তিনি যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিয়েছেন। অবশ্য তিনি যা পাননি – পার্থিব সম্পদ – তাঁর ভাষায় যা বড়বাজার আর চোরবাজারে অনেকের আছে – তাঁর জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস এখানেও গোপন থাকেনি। কিন্তু যা পেয়েছেন – কবিখ্যাতি – তা যে অমূল্য, এ বিবেচনাও স্পষ্ট। কয়েক বছর আগে যখন তিনি বাংলা সাহিত্যাকাশে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে রাতারাতি – তাঁর নিজের ভাষায় - 'সর্বশ্রেষ্ঠ' সাহিত্যিক বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তখন ভেবেছিলেন, সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু স্বদেশ থেকে ছ হাজার মাইল দূরে এবং কয়েক বছরের ব্যবধানে তাঁর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছিলো। যা সৃষ্টি করেছেন, তা টিকে থাকবে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ উঁকি দিয়েছে মনের মধ্যে।

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগর তীরে? ...
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,–
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে?

কিন্তু সন্দেহ যাই থাক এবং সে পথ যতো দুর্গম হোক, তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে কামনা করেছেন, তিনি যেন সেই দুর্লভ যশের ভাগীদার হতে পারেন। তিনি ভালো করেই জানতেন, যশের তুঙ্গে আরোহণ করা দুঃসাধ্য সাধনা।

তবুও উঠিতে তথা – সে দুর্গম স্থলে –
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে
বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,...

কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি ভরসা করেছেন, কালের বিশাল চত্বরের একটি ধারে তাঁর জন্যে ছোটোখাটো একটি আসন থাকবে।

শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি; 'ওরে বাছা না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?

যশের মন্দিরে ওই; ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে!'

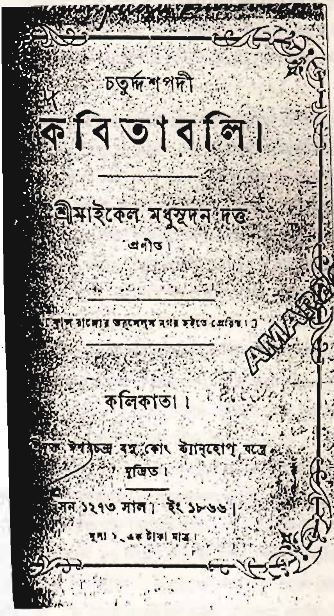
পেত্রার্কার সনেট তাঁকে অনুপ্রেরণা দিলেও, আগেই বলেছি, পেত্রার্কার সনেটের মতো প্রেম তাঁর সনেটের বিষয়বস্তু হতে পারেনি। পেত্রার্কা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন অজ্ঞাত-পরিচয় এক নারীর প্রতি, যাঁর সঙ্গে কোনো কালে তাঁর মিলন হতে পারেনি। কিন্তু তবু নিরন্তর তিনি সেই নারীর উদ্দেশ্যে সনেটের মালা গেঁথেছেন। মাইকেল যখন তাঁর সনেটগুচ্ছ রচনা করেন, তখন কোনো নারী তাঁকে এমন গভীর প্যাশনের সঙ্গে টানেননি। বস্তুত, এক শো সনেটের মধ্যে সব মিলে মাত্র পাঁচটি সনেট আছে নারীদের লক্ষ্য করে লেখা — ১৩, ১৪, ২৬, ৫৮ এবং ১০০ সংখ্যক সনেট। এর মধ্যে 'পরিচয়' শীর্ষক সনেট দুটি (১৩ ও ১৪), ২৬ সংখ্যক 'কুসুমে কীট' এবং শিরোনামহীন ৫৮ সংখ্যক সনেটটি একই নারীর উদ্দেশ্যে লিখিত বলে অনুমান করি। ১৩ সংখ্যক সনেটে আছে এক নারীর কাছে তাঁর নিজের পরিচয় দান। তারপর ১৪, ২৬ এবং ৫৮ সংখ্যক সনেটে এই নারীর প্রতি তাঁর প্রেম এবং তার সঙ্গে মিলনের কথা বলা হয়েছে।

যে-ফরাসি সুন্দরী কবিকে কারাগারের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং শেষোক্ত সনেট তিনটিতে যে-নারীর বর্ণনা পাই - তাঁরা এক নন। কবির যিনি উপকার করেছিলেন, তিনি বড়োঘরের মহিলা। অবস্থাপন্ন।[৭২] কিন্তু পূর্বোক্ত ১৪ এবং ২৬ সংখ্যক সনেটে যে-নারীকে দেখতে পাই, সুন্দরী হলেও তিনি যে-পরিবেশে বাস করেন, আপাতদৃষ্টিতে, তা উন্নত নয়। কবির ভাষায়, 'সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে।' এ বর্ণনা থেকে এই নারীর অবস্থা পুরোপুরি পরিষ্কার না-হলেও 'কুসুমে কীট' অর্থাৎ ২৬ সংখ্যক সনেটের বর্ণনা সংশয়হীন। সেখানে বলেছেন — 'কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহু-গ্রাসে?' এই সনেট থেকে বোঝা যায়, এই 'বন-সুন্দরী' কোনো অত্যাচারী পুরুষের নির্যাতনে সংকটাপন্ন ছিলেন। এই নারীর সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব। তবে কবির ভালোবাসা আন্তরিক কিনা, সে বিষয়ে এই নারী সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ১৪ সংখ্যক সনেটটিতে কবি তাঁকে নিজের ভালোবাসা সম্পর্কে আশ্বাস দিয়েছেন: 'ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে / এ বৃথা সংশয় কেন?'। আর ২৬ সংখ্যক সনেটটিতে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এই সুন্দরী নারীর প্রতি। কবির অন্যতম জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোম বলেছেন যে, ১৩ এবং ১৪ সংখ্যক সনেট কবি প্রথমে লিখেছিলেন ফরাসি ভাষায়। তার পর এই সনেটের ভাব অবলম্বন করে বাংলা সনেট দুটি রচনা করেন।[৭৩] কোন তথ্যের ভিত্তিতে জীবনীকার এই মন্তব্য করেছেন, তা জানা যায় না। কিন্তু সত্য হলে এ থেকে পরোক্ষ প্রমাণ মেলে যে, কবি রক্তমাংসের কোনো নারীকে নিয়ে এই সনেট রচনা করে হয়তো তাঁকেই এই সনেট উপহার দেন। এই নারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী ধরনের ছিলো, তার আভাস মেলে ৫৮ সংখ্যক সনেট থেকে। এই সনেটে তিনি এই নারীকে চারুনেত্রা বলে সম্বোধন করেছেন। তার পর বলেছেন: আমিতো বীর লক্ষ্মণ নই, তা হলে তোমার সঙ্গে প্রেমের মল্লযুদ্ধে কেন পরাজিত হবো না! মদনের বরে প্রেমের ব্যাপারে তুমি মেঘনাদের মতো শিক্ষা পেয়েছো। তুমি বড়ো ভয়ঙ্করী। গিরির আড়াল থেকে তুমি তোমার শত্রুকে নাগপাশে বাঁধো।

দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ডলো অধরে;
মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি!—
এ বড় অদ্ভুত রণ! তব শঙ্খ-ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল! শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে!—

একে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদনি,
ক্লান্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে?

এখানে কবি দৈহিক মিলনের যে-বর্ণনা দিয়েছেন, সমগ্র বাংলা কবিতার পরিপ্রেক্ষিতেও তাকে অসাধারণ বলা যেতে পারে। এই বর্ণনার মধ্যে যে-রকমের আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায়, তাতে একে নৈর্ব্যক্তিক মনে করা শক্ত। বস্তুত এই সনেট কটি তাঁর বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমের এবং নারী-সংসর্গের প্রমাণ বলে মনে করলে বোধহয় অন্যায় হবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এই সনেট কটি পড়লে মনে হয় না যে, এই নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেও দু কূল প্লাবিত-করা প্রেমের বন্যায় তিনি ভেসে গিয়েছিলেন।


চতুর্দ্দশপদী
কবিতাবলি।
শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।
ফ্রান্স রাজ্যের ভর্সেলস নগর হইতে প্রেরিত।
কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে
মুদ্রিত।
সন ১২৭৩ সাল। ইং ১৮৬৬।
মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলির নামপত্র

'কুসুমে কীট' নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ। চকিতে বোদলেয়ারের *ফ্ল্যর দু ম্যলকে* মনে করিয়ে দেয়। বোদলেয়ার যেমন ক্লেদজ কুসুমের মধ্যে সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছিলেন, মাইকেলও তেমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন সম্ভবত সমাজের নিচের তলার কোনো 'রাহুগ্রস্ত' সুন্দরী মহিলাকে দেখে। তিনি ভার্সাই-এর যে-সাহিত্যিক-শিল্পীর চক্রের সঙ্গে মেশামেশি করেছিলেন তার মাধ্যমে এই নারীর সাহচর্য লাভ করে থাকবেন। এর পক্ষে কোনো রূপজীবী অথবা রু দ্য শাঁতিয়ের যে-বাড়িতে বাস করতেন, সেখানকার কোনো নিম্নশ্রেণীর মহিলা হওয়াও সম্ভব। তবে এ মহিলার পরিচয় যেমনই হোক না কেন, মাইকেল একজন 'অসতী' এবং সমাজের চোখে কলঙ্কিনীকে নিয়ে কবিতা রচনা করে বাংলা কাব্যের দিগন্তকে প্রসারিত করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কামের যথেষ্ট ছড়াছড়ি রয়েছে। *বিদ্যাসুন্দরে*ও তার বিশদ প্রকাশ ঘটেছে। তবে তফাৎ হলো সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভারতচন্দ্রে কামের বর্ণনা নৈর্ব্যক্তিক, মাইকেলে আত্মকথনমূলক — ভারতীয় সাহিত্যে যা অভিনব। যৌনতা সম্পর্কে বাঙালি সমাজে দ্বৈত মান চালু থাকায় এবং ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ ভিক্টোরীয় আদর্শ দিয়ে প্রভাবিত হওয়ায়, বারবনিতা অথবা সন্দেহভাজন চরিত্রের মহিলাদের নিয়ে কবিতা রচনা করা উনিশ শতকের কোনো বাঙালি কবির জন্যে প্রত্যাশিত ছিলো না। এই সনেট দুটি রচনা করে কবি সত্যি সত্যি এক নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু বোদলেয়ারে অনুরূপ বিষয়-নির্ভর কবিতার সঙ্গে এই জাতীয় সনেট দুটির মিল নিতান্তই বহিরঙ্গের। বোদলেয়ারের কাব্যাদর্শ এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনা মাইকেলে নেই। বস্তুত, তাঁর এ সনেটগুলো থেকে বোদলেয়ারের পরোক্ষ প্রভাব প্রমাণিত হয় না, কিন্তু তাঁর কাব্যধারার বিবর্তনে ফরাসি সমাজে তাঁর বসবাসের প্রভাব প্রমাণিত হয়।

এই সনেটগুচ্ছের মধ্যে সত্যিকার প্রেমের কবিতা হলো: ১০০ সংখ্যক শিরোনামহীন সনেটটি। মাইকেলের কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন যে, এই সনেটটি হেনরিয়েটার উদ্দেশ্যে লেখা।[৭৪] কিন্তু সনেটটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি লেখা রেবেকাকে লক্ষ্য করে। তার কারণ, যাঁর সঙ্গে কবি তখন বাস করছিলেন, তাঁকে লক্ষ্য করে তিনি কেন বলবেন

প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে?

এই নারী তাঁর হৃদয়ে যে-ছবি এঁকেছেন, তা মোছার আশঙ্কা আছে, কিন্তু তিনি তা হতে দেবেন না — এটাই এই পঙ্ক্তিগুলো থেকে মনে হয়। যাঁর সঙ্গে তিনি ঘর করছিলেন, তাঁর সম্পর্কে এ কথা খাটে না। তদুপরি, আড়াই পঙ্ক্তি পরেই তিনি বলেছেন

দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে,

হেনরিয়েটা — অর্থাৎ যাঁর সঙ্গে তিনি স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করছেন, তাঁকে 'দূরে কি নিকটে' বলার দরকার করে না। তিনি নিকটেই আছেন। 'দূরে'র প্রশ্ন উঠছে রেবেকার সঙ্গে বাস করছেন না বলেই। সবশেষে একটি পঙ্ক্তিতে যে-ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা আরও স্পষ্ট —

অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে

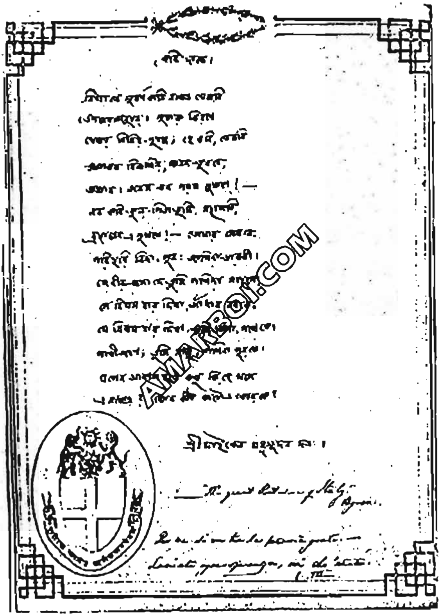
হেনরিয়েটা তখনো স্মৃতিতে পরিণত হননি, তিনি তখনো রক্তমাংসের মানুষ হিশেবে কবির সঙ্গে বসবাস করছিলেন। কিন্তু এর পরের পঙ্ক্তিতে কবি যা বলেছেন, তাঁর সমালোচকরা সেটাকেই আগের পঙ্ক্তিগুলোর বক্তব্য বিচার না-করে বেদবাক্যের মতো এবং আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছেন — সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে। আগের পঙ্ক্তির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে মনে হয় কবি বলেছেন — নিত্য তোমার অধিষ্ঠান স্মৃতির মঠে। তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে সংসারের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তোমার স্মৃতি সতত আমার সঙ্গিনী।

সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখতে পাই যে, তিনি কয়েকটি সনেটে কেবল স্বদেশের প্রতি নয়, নিজের ভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই ভাবধারার উল্লেখ না-করলে, তাঁর মনোজগৎকে পুরোপুরি দেখা যাবে না। কলকাতায় লেখা 'কবি-মাতৃভাষা' সনেটটির দুটি পাঠান্তর ছাড়াও, *চতুর্দশপদীর* সবশেষের কবিতায় বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং প্রথম জীবনে এই ভাষার প্রতি অযত্ন করায় আন্তরিক অনুতাপ প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি তিনি অনেক জায়গাতেই তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন — কখনো চিঠিতে, কখনো কবিতার ছন্দে। এসব বিশ্লেষণ করলে এবং তাঁর জীবনের নানা ঘটনার সঙ্গে এগুলো মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর মনোভাব ছিলো একই সঙ্গে আন্তরিক আকর্ষণ এবং অকৃত্রিম অবহেলার — অন্য কথায় — ভালোবাসা এবং ঘৃণার।

নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে — ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূরে বনে!

এ অবস্থায় তিনি আর-কিছু করতে পারবেন না, তিনি তা জানেন; কিন্তু বঙ্গভূমি যাতে জ্যোতির্ময়ী হয়ে ওঠেন তিনি কেবল এই কামনা করেন। এই কামনা দেশ এবং ভাষার প্রতি তাঁর নিষ্কাম প্রেমের

প্রমাণ। সেই সঙ্গে আরও একবার লক্ষ্য করা যায়, স্বদেশ থেকে দূরে এসে, তাঁর মধ্যে যে-স্বরূপের সংকট দেখা দিয়েছিলো, তা তখনো কেটে যায়নি। বরং তা কেলাসিত রূপে এই সনেটগুলোতে প্রকাশিত। ভারতবর্ষ যে পরাধীন — এ কথাও তিনি একাধিক সনেটে কাতরতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এককালের গৌরবোজ্জ্বল ভারতের সন্তান হয়েও সেকালের ভারতবাসীদের অক্ষমতার জন্যে তিনি অনুতাপ বোধ করেছেন — 'আমরা, — দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে ... বামন দানবকুলে, সিংহের ঔরসে / শৃগাল।'



দান্তের শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত সনেট।

তাঁর সনেটের প্রসঙ্গে একটি কবিতার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয় — যেটি তিনি রচনা করেন দান্তের পঞ্চ শতবার্ষিকী উপলক্ষে। এটি তিনি ইটালির রাজাকে পাঠান। হিন্দু কলেজে পড়ার সময় থেকে তিনি দান্তের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত। তা ছাড়া, নিজে যখন *মেঘনাদবধ কাব্য* রচনা করেন, তখন সজ্ঞানে দান্তের রচনা থেকে ধার করেছেন। এখন সেই প্রখ্যাত কবির বিশেষ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।[৭৫] তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে অনেকগুলো সনেটই রচনা করেছিলেন। তবে তিনি যে এই সনেটটি ইটালির রাজার কাছে পাঠান, তার পেছনে কাজ করেছে সেই মানসিকতা যার প্রেরণায় তিনি ফ্রান্সের নখ-

দন্তহীন রাজা এবং রানীকে কুর্নিশ করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন। রাজকীয় সব কিছুই তাঁকে দারুণ উদ্‌বুদ্ধ করতো। ভেবে অবাক হই, লন্ডনে তিনি ভিক্টোরিয়াকে কেন কুর্নিশ জানানোর চেষ্টা করলেন না, অথবা তাঁর উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখলেন না। হয়তো, ভারতবর্ষের একজন সাধারণ প্রজার কুর্নিশ এবং কবিতা যথেষ্ট সমাদৃত হবে না, এ কথা ভেবে তিনি সময় এবং উদ্যম ব্যয় করেননি।

১৮৬৪ সালের একেবারে শেষ দিকে কিছু সময়ের জন্যে সনেট রচনায় সাময়িকভাবে নিমগ্ন হলেও, কবি বেশি কাল তাতে ডুবে থাকতে পারেননি। টাকাপয়সার সমস্যা আবার দেখা দেয় ডিসেম্বর মাসে (১৮৬৪)। তিনি জানতেন বারবার বিদ্যাসাগরকে তাড়া দিলে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে। তা সত্ত্বেও ২৬ নভেম্বর বিদ্যাসাগরকে তাগাদা দিয়ে একটি চিঠি লেখেন। কেবল তাই নয়, এর দশ দিন পরে তিনি আবার বিদ্যাসাগরকে লিখতে বসেন। অভাবের মুখে তিনি কতোটা অসহায় বোধ করছিলেন, এ চিঠি থেকে তার আভাস পাওয়া যায়।

> গত রাতে লন্ডনের ইনগুলো বড়োদিন উপলক্ষে বন্ধ হয়েছে। আবার খুলবে আগামী ১১ জানুআরি। ... আমি যদি পরিস্থিতির চাপে পড়ে ইংল্যান্ড ছাড়তে বাধ্য না-হতাম, তা হলে এটা দিয়ে আমার ন'টা টার্ম শেষ হতো। আগামী বছর এ সময়ে আমি কলকাতায় ফিরে যেতে পারতাম।
>
> আমি বারবার একই কথা বলে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করতে চাইনে। আমার গত দুটি চিঠিতেই আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছি। তাই না? এখন আমার অবস্থা, আমাদের দেশের কবিদের ভাষায়, ঠিক চাতকের মতো, মেঘের জন্যে অপেক্ষা করে আছি, যে-মেঘ আমার তৃষ্ণা মেটাবে। ... আপনাকে মনে করিয়ে দিই — এ মাসের শেষে আমার হাতে একটি পয়সাও থাকবে না। এবং আপনি যদি ইতিমধ্যে ব্যবস্থা না-নিয়ে থাকেন, তা হলে আমার আবার খুব দুরবস্থায় পড়তে হবে।
>
> আপনাকে বিরক্ত করতে আমার একদম ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু আমি এমন মরিয়া হয়ে উঠেছি বলেই আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আমার প্রতি কারো কোনো সহানুভূতি নেই। আপনিও যদি আমাকে ত্যাগ করেন, তা হলে আমি ডুবে মরবো।
>
> ...আজ ডাক আসার কথা। সুতরাং এ চিঠি আমি বেলা বারোটা পর্যন্ত বন্ধ করবো না। আমি ভেবে পাচ্ছিনে, আজ আমরা কোনো চিঠি পাবো কিনা। বিদায়!
>
> এখন বারোটার বেশি বাজে এবং আপনার চিঠির কোনো পাত্তা নেই। সুতরাং এখানেই আমার চিঠি শেষ করতে হচ্ছে, তা না-হলে এ চিঠি আজকের ডাকে পাঠানো যাবে না।[৭৬]

ছ দিন পরে — দোসরা ডিসেম্বর তিনি বিদ্যাসাগরকে আবার লেখেন যে, তাঁর সব টাকা ফুরিয়ে গেছে। সেই টানাটানির মুখে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তিনি বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে ২,৪৯০ ফ্রঁ (এক হাজার টাকা) পান। এ টাকা পাওয়া সত্ত্বেও তিনি খুব বিচলিত হন। টাকা পাওয়ার পর ১৮ ডিসেম্বর তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি বিদ্যাসাগরকে জানান যে, এ সময়ে তাঁর ধারের পরিমাণ ছিলো ১৪০০ টাকা। বিদ্যাসাগরের পাঠানো টাকা দিয়ে তিনি ৪০০ টাকার ধার শোধ করেন। এক শো টাকার গরম কাপড়চোপড় কেনেন (কৈফিয়ত দিয়ে বলেছেন, 'এ বছর এখানে বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে।')। আর তাঁর হাতে থাকে ৫০০ টাকা। তিনি বলেছেন যে, এই টাকা দিয়ে জানুআরি মাসের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিতে পারবেন। তবে তখনকার মতো বেঁচে থাকা সম্ভব হলেও এ টাকা দিয়ে সব ধার-দেনা শোধ দিয়ে লেখাপড়া করতে গ্রেজ ইনে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় — তা-ও তিনি জানিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের চিঠিতে চাহিদা মতো টাকা পাঠানোর কোনো আশ্বাস ছিলো না। কবি এতে সত্যি সত্যি দমে যান। তা হলে কি করুণাসাগরও বিমুখ হলেন? অতঃপর তিনি কোন দিকে মুখ ফেরাবেন? হতাশ মাইকেল বুঝতে পারেন, গ্রেজ ইনে ১৮৬৫ সালের প্রথম টার্ম তো বটেই, এমন কি, হয়তো দ্বিতীয় টার্মও তিনি হারাবেন। তার অর্থ হবে ভারতবর্ষে আরও দেরি করে ফেরা, আরও অর্থ ব্যয়, আরও ভোগান্তি। এই একান্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, তাঁকে বিপদের

হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে।[৭৭]

এই চিঠিতে 'করুণাসাগর' বলে তিনি বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করেছিলেন। সেই সঙ্গে নিজের অসহায়তা এবং বিদ্যাসাগরের ওপর তাঁর নির্ভরতার পরিমাণ বোঝানোর জন্যে তিনি পূর্বোক্ত চিঠিতে ইংরেজির সঙ্গে একটি বাংলা অনুচ্ছেদ জুড়ে দেন। নিজের মনের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে ভূমিকা করে বলেছেন — যেমনটা কেউ মাতৃভাষায় বলবে:

> আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, এ হতভাগার বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদজালে পড়িয়াছেন। কিন্তু কি করি? আমার এমন আর একটি[৭৩] বন্ধু নাই যে তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমন্যুর মতন মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরবদলে প্রবেশ করিয়াছেন; আমার এমন শক্তি নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান করি; অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রুদল সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক; এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক! এ কথাটী যেন সর্ব্বদা স্মরণ-পথে থাকে!

বাংলা ভাষায় লিখে তিনি যে কেবল নিজের মনের কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করেন, তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি আশা করেন, বাংলায় লিখলে তা বিদ্যাসাগরের অন্তরকে বেশি করে স্পর্শ করবে। বিদ্যাসাগর তাঁর চিঠিতে কী লিখেছিলেন, তা জানার উপায় নেই। তবে বোঝা যায়, যে-পরিমাণ টাকা কবি চেয়েছিলেন, মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করে এবং নিজের বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে অতো টাকা তিনি জোগাড় করতে পারেননি। বরং তিনি মহাদেব চট্টোপাধ্যায়দের কাছ থেকে যথেষ্ট বিরোধিতার মুখোমুখি হন। বৈদ্যনাথরা কাগজপত্র দিতেও গড়িমসি করে থাকবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কবি লেখেন, তাঁকে একাই শত্রুদলের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে হবে।[৭৮] মনে হয়, তিনি অন্য যাঁদের কাছে টাকা পেতেন, তাঁদের সবার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে বিদ্যাসাগর ব্যর্থ হন।

বিদ্যাসাগর মাইকেলকে আরও লিখেছিলেন যে, তাঁকে সম্পত্তির হস্তান্তর সম্পর্কে ঢালাও ক্ষমতা না-দিলে তাঁর পক্ষে আর টাকা ধার করে পাঠানো সম্ভব হবে না। এ ধরনের ঢালাও ক্ষমতা দেবার ব্যাপারে কবির কিছু দ্বিধা ছিলো। তা ছাড়া, অক্টোবর মাস থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিলো না। মনোমোহন ঘোষকে কৌতুক করে তিনি নিজের স্বাস্থ্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

> তুমি চলে যাবার পর পেটের পীড়ায় আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি; আমার ধারণা হলো মিলনান্তক নাটক শেষ হয়ে আসছে এবং এর পরেই যবনিকা পতন। কিন্তু এই দেখো, আমি এখনো ঠিক টিকে আছি। আমার ভূমিকা এখনো শেষ হয়নি। ইনীয়াস যেমন দীড্রাকে বলেছিলো: 'মশাল এখনো জ্বলছে!'[৭৯]

হালকা চালে লেখা হলেও তিনি যে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়েছিলেন, তা বোঝা যায়। এর আগে, জুন মাসে, তিনি নিজে লিখতে পারছিলেন না এবং লেখাচ্ছিলেন হেনরিয়েটাকে দিয়ে। তদুপরি অক্টোবরের শেষ দিক থেকে তাঁর চোখের অসুখ হয়। তিনি কারণ দেখিয়ে বলেছেন, হয়তো খুব বেশি লেখাপড়া করার জন্যে। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, তাঁর আশঙ্কা হয়েছিলো যে, তিনি এর ফলে অন্ধও হয়ে যেতে পারেন। এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষে প্যারিসে গিয়ে একটা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদন করা সহজ ছিলো না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিঠি থেকে বুঝতে পারলেন যে, ঢালাও ক্ষমতা দিয়ে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি না-পাঠালে তাঁকে আবার নিদারুণ অর্থ সংকটে পড়তে হবে। সে জন্যে তাঁর শারীরিক অসুবিধে যাই থাক না কেন, প্যারিসে গিয়ে একজন আইনজীবীকে ধরে তিনি একটি পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদন করান। সেই পাওয়ার অব অ্যাটর্নি পাঠিয়ে দিয়ে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখলেন:

> আপনি দেখতে পাবেন যে, পাওয়ার অব অ্যাটর্নির ব্যাপারে আমি আপনার উপদেশ মতো কাজ করেছি। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে, আমার ভাগ্য, আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, আমার আপনজনদের স্বার্থ,

না, না, আমার নিজের জীবন আপনার হাতে তুলে দেবার জন্যে আমি কতোটা প্রস্তুত। এবং আমি আপনাকে আবার বলছি, আমি আমার লক্ষ্য অর্জন করতে না-পারলে আর কখনো ভারতবর্ষে গিয়ে আমার মুখ দেখাবো না। ... এই সঙ্গে যে-দলিল [পাওয়ার অব অ্যাটর্নি] পাঠালাম, আশা করি তা দিয়ে আমার পক্ষ থেকে সবই করতে সমর্থ হবেন। ... আপনি আমার চিঠি থেকে হয়তো জানতে পেরেছেন যে, আমি মিকেলমেস টার্মটি এবারেও ধরতে পারিনি। এবং বোধহয় আরও দুটি টার্ম হারাবো। তার অর্থ আমি গ্রেজ ইনে ফিরে যেতে পারবো যখন আসলে আমার সেখান থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার কথা ছিলো – যদি মহাদেব চট্টোপাধ্যায় আর দিগম্বর মিত্র আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না-করতেন।[৮০]

কবি যখন এ চিঠি লেখেন, তখন তাঁর ধারের পরিমাণ প্রায় এক হাজার টাকা। কিন্তু তাঁর হাতে নগদ ছিলো মাত্র পাঁচ শো টাকা – যা দিয়ে জানুআরির শেষ পর্যন্ত চলে যাবে বলে তিনি আশা করেছেন। তিনি আরও একবার বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, তিনি যেন এক থোকে এতোটা টাকা পাঠান যাতে ধার শোধ করে তাঁর হাতে ভার্সাই অথবা লন্ডনে তিন মাস চলার মতো টাকা থাকে। বিদ্যাসাগরের উপদেশ মতো এ সময়ে তিনি তাঁর পরিবার লন্ডনে নিয়ে যেতে রাজি হন। তবে, তিনি বিদ্যাসাগরকে মনে করিয়ে দেন যে, তার জন্যে মোট ২৯ শো টাকা দরকার – ১২৫০ টাকা মার্চ পর্যন্ত থাকার খরচ, ১০০ টাকা যাবার খরচ, ৮০০ টাকা শস্তা একটা বাড়ি সাজিয়ে নেবার খরচ, আর সেখানে গিয়ে তিন মাস থাকার জন্যে ২৫০ টাকা হিশেবে ৭৫০ টাকা।

আশা করি আমাদের বন্ধু এই টাকা আপনার হাতে এক্ষুণি এবং এক থোকে দিয়ে দেবেন, তা না-হলে, প্রিয় বন্ধু, আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় প্রত্যেক বার অল্প পরিমাণ টাকা পাঠালে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়। 'এ কথাটীও যেন স্মরণ-পথে থাকে।' আমার মনে হয় না আমাদের ৯/১০ হাজার টাকার চেয়ে বেশি নিতে হবে। আমি ফিরে গিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আপনার বন্ধুর টাকা ফেরত দেবো। কোনো লোকসান হলে সম্পত্তি থেকে আপনার বন্ধু সেটা পুষিয়ে নিতে পারবেন। আমি তাঁকে চিরদিন একজন বন্ধু এবং উপকারী বলে বিবেচনা করবো। তিনি যদি আমার একটি জীবনবীমা চান, তা হলে লন্ডন গিয়ে আমি তা করে নিতে পারবো।[৮১]

ইংরেজি-বাংলা মেশানো এ রকমের একটি মর্মস্পর্শী চিঠি লেখার পরেও মাইকেল নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। আট দিন পরে – ২৬ ডিসেম্বর তারিখে আর একটি চিঠিতেও প্রায় একই অনুরোধ জানান। এবারেও বাংলায় তাঁকে মনে করিয়ে দেন: 'এই কথাটী যেন সর্ব্বদা স্মরণ-পথে থাকে!' অবশ্য এতো দ্রুত আরও একটি পত্রাঘাত করার অন্যতম কারণ, তিনি ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে আর-এক দফা টাকা পেয়েছিলেন। এবারে ৪০০ টাকা।

আপনি আমার যে-অসাধারণ উপকার করছেন, তার জন্যে আপনার প্রতি আমার সকৃতজ্ঞ অনুভূতি প্রকাশ করার সময় এটা নয়। আমার পক্ষ থেকে আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ – না, না, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ না-পেলে আমার বিনাশ ছিলো সুনিশ্চিত। আমার গত চিঠির সঙ্গে আপনাকে আমার একমাত্র প্রতিনিধি করে পাওয়ার [অব অ্যাটর্নি] পাঠিয়েছি। যেভাবে এই পাওয়ার দেওয়া হয়েছে, তাতে সবচেয়ে খুঁতখুঁতে উকিলও সন্তুষ্ট হবেন। আশা করি এ ব্যাপারে আমার আর কোনো ব্যয় হবে না। গত বারে যে-পাওয়ার পাঠিয়েছি, সে বাবদে আমার প্রায় ৩০ টাকা খরচ হয়েছে। আপনি এতে দেখতে পাবেন যে, আমার পক্ষ থেকে কোনো কাজে হাত দিলে আপনি দরকার বোধে আপনার পছন্দ মতো যে-কাউকে আপনার সঙ্গে নিতে পারার ক্ষমতাও আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আপনি যে-ভদ্রলোকদের নামোল্লেখ করেছেন, তাঁরা যেহেতু নিজেরা বিরাট বড়ো লোক নন, সে জন্যে তাঁরা আমার মতো একজন সাধারণ লোকের জন্যে দরদ বোধ করবেন! যে-ভদ্রলোক আমাকে উদ্ধার করতে রাজি হয়েছেন, তাঁর জানা উচিত যে, আপনার অথবা আমার মতো লোক সকল নীচ কৌশলের উর্ধ্বে এবং (বিনয়ের সঙ্গে বলতে পারি) আপনি অথবা আমি কেউই এখনো এতো বুড়ো হইনি যে, শিগগির এই বদখত পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো।

কবি বারবার এক থোকে বেশি টাকা চাওয়া সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর কয়েক বারই অল্প পরিমাণে টাকা পাঠাতে থাকেন। কারণ কবি তাঁকে যে-পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দিয়েছিলেন, তা দিয়ে তিনি আইনজ্ঞ

অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বড়ো অঙ্কের টাকা ধার পাননি। কিন্তু ডিসেম্বর-জানুআরি মাসে দুবার টাকা পেয়ে এবং জানুআরি মাসে, মাইকেলের ভাষায়, তাঁদের জীবন পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে দেবার মতো পাওয়ার অব অ্যাটর্নি পাঠিয়ে দেবার পর তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে মাস তিনেক অপেক্ষা করার জন্যে তৈরি হয়ে থাকেন।[৮২]

জানুআরি মাসে অভাবের তাড়না যখন একটু কম, তেমন সময়ে গৌরদাসের একটি চিঠি পেয়ে কবি তার উত্তর দেন। এ চিঠি থেকে আবার দেখা যায় চিরদিনের সেই রোম্যান্টিক কবিকে – যিনি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন, টাকাপয়সার কথা নয়, ভালোবাসেন লেখাপড়া, সাহিত্য এবং নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে। বিদ্যাসাগরকে তিনি যে-সব বিষয় নিয়ে এর আগের ক মাস যতোগুলো চিঠি লিখেছিলেন, এ চিঠির বিষয়বস্তু তাদের থেকে একেবারে আলাদা, এর মেজাজও সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই সময়ে তিনি একজনের কাছে চরম অভাবের এবং অন্য একজনের কাছে পরম পরিতৃপ্তির কথা কী করে লিখেছেন, ভাবলে অবাক না-হয়ে পারা যায় না। তবে এটা তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। আগের অক্টোবর মাসেও (১৮৬৪) তাঁকে এমনি যুগপৎ দু রকমের চিঠি লিখতে দেখেছি – এক দিকে বিদ্যাসাগরকে, অন্য দিকে গৌরদাস এবং মনোমোহন ঘোষকে। এই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দুটি চিঠির ধারা বিশ্লেষণ করলে মাইকেল-মানস সহজেই চোখে পড়ে। গৌরদাসকে লেখা আলোচ্য চিঠির গোড়াতেই তিনি বলেছেন, 'দোহাই তোমার, তোমার বন্ধু সম্পর্কে কোনো বদমাশ যখন এমন কিছু বলে যা তোমার বন্ধুর উপযুক্ত নয়, তখন তাকে নীরব এবং ঘৃণা-মেশানো হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ো। কারণ আমি বোকা নই অথবা পাগলও নই।'[৮৩] এর পর তিনি যে-রকম সরলভাবে নিজের বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন, তা থেকে স্ফটিকের মতো তাঁর অন্তরের তলদেশ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়।

> তুমি ভাবতে পারবে না, আমার অভ্যাস, আমার রুচি, জগৎ সম্পর্কে আমার ধারণা, এমন কি, আমার চেহারাকে য়োরোপ কিভাবে পাল্টে দিয়েছে। আশা করি সেদিন বেশি দূরে নয়, ভাই, যখন তুমি নিজেই এটা যাচাই করে দেখতে পারবে। আমি আর সেই বেপরোয়া, ঝোঁকের-মাথায়-কাজ-করা চিন্তাভাবনা-বর্জিত লোকটি নেই। আমি এখন হলাম একজন দাড়িওয়ালা পণ্ডিত যে ছটি য়োরোপীয় ভাষায় এবং কয়েকটি এশীয় ভাষায় তার বন্ধুদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে পারে। তুমি ভাবতেও পারবে না আমি কি রকমের বড়ো বড়ো দাড়িগোঁফ গজিয়েছি। আশা করছি, তোমাকে আমার একটা ছবি পাঠাতে পারবো। অবশ্য আমি এখনো রোম্যান্টিকই আছি, কারণ, তুমিতো জানোই, এটা হলো আমার প্রকৃতি; তা ছাড়া, আমি তো খানিকটা কবিও! এর ওপর ব্যাপক পরিমাণে কল্পনাশক্তি আমাকে বাস্তব জগতের জন্যে বেশ অনুপযুক্ত করে তৈরি করেছে। আমার নিজের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা আর অস্পষ্ট অভিলাষ আছে, তবে আমি আস্তে আস্তে বিজ্ঞ হচ্ছি বৈকি! আমার এই অহঙ্কারের জন্যে আমাকে ক্ষমা করো – তবে কারো না কারো কাছে তো আমার হৃদয় খুলতে হবে! এবং সেটা যদি আমি আমার পুরোনো বন্ধু এবং ভাই-এর কাছে না-করি তো কার কাছে করবো?

এখানে কবি নিজের হৃদয় অনাবৃত করার কথা নিজেই বলেছেন। এভাবে নিজের কথা তিনি কমই বলেছেন। তারপর নিজের সম্পর্কে জনশ্রুতির উল্লেখ করে আবার বলেছেন:

> যখন লোকে আমার সম্পর্কে বাজে কথা বলে, আমার সম্পর্কে অলস এবং জঘন্য মিথ্যে কথা রটায় আমি তখন বিরক্ত বোধ করি। সত্যের ভ্রূকুটি মিথ্যাকে মিলিয়ে দিক। এ রকমের ভীরু পরশ্রীকাতরতাকে যেমন করে সামাল দিতে হয়, তেমন করে সামাল দিয়ো, ভাই!

বোঝা যায়, বন্ধু সম্পর্কে কোনো বদনাম শুনে গৌরদাস তাঁকে সে সম্পর্কে লিখেছিলেন। সেই কথার সূত্র ধরে তিনি চিঠি শুরু করেন। কলকাতায় তাঁর বদনাম হচ্ছে – এ কথা কবি তাঁর চিঠিতে বারবার উল্লেখ করেছেন, কখনো বিদ্যাসাগরের কাছে, কখনো গৌরদাসের কাছে। গৌরদাসকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি চিঠিতেও বদনামের কথা আছে। কিন্তু কী ধরনের বদনাম, কবি অথবা তাঁর বন্ধুরা কেউ তার ব্যাখ্যা দেননি।

খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু একজন জীবনীকার অন্য রকম মন্তব্য করায় প্রসঙ্গত এখানে একটি ছোটো তথ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায় — কবি কখন দাড়ি-গোঁফ গজান। চিঠির ওপরের অংশ থেকে পষ্ট বোঝা যায়, তিনি তখন ভার্সাইতে ছিলেন।[৮৪] অবশ্য তাঁর দাড়ি দেশীয় স্টাইলের দাড়ি ছিলো না। তিনি দাড়ি রেখেছিলেন য়োরোপীয় স্টাইলে — গালপাট্টা বড়ো করে।

সে যাই হোক, এ চিঠিটি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য অন্য একটি কারণে। এ চিঠি থেকে মাইকেল-মানসের দু-একটি দিক স্পষ্ট করে চোখে পড়ে। তিনি যে বাস্তবতার রূঢ় আলোতে নিজেকে স্থাপন না-করে কল্পনার আলো-আঁধারে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন, এখানে আর-একবার তার নির্ভুল স্বাক্ষর দেখা যায়। এখানে তাঁর দুরবস্থা এবং দারিদ্র্যের কথা বন্ধুর কাছে একেবারে লুকিয়ে রেখেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গৌরদাসের সঙ্গে আজীবন গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, তিনি কখনো নিজের আর্থিক সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে মন খুলে কথা বলেননি। তা ছাড়া, আগের অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি — মাদ্রাস থেকে ফেরার আগে তাঁর পারিবারিক জীবনে যে-প্রলয়ঙ্করী ঝড় বয়ে গিয়েছিলো, তিনি তাও তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর কাছে প্রকাশ করেননি। কলকাতায় ফেরার পর গৌরদাস তাঁকে পঞ্চাশ টাকা ধার দিয়েছিলেন, জানা যায়। কিন্তু ঐ একবারই। তারপর মাইকেল বহু বার দারুণ আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন। তা সত্ত্বেও গৌরদাসের সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে তাঁর কোনো আদান-প্রদান হয়েছে বলে জানা যায় না। তবে মৃত্যুর আগে গৌরদাস যখন কবিকে উত্তরপাড়া থেকে নিয়ে আসেন, তখন অর্থসাহায্য দেওয়া সম্ভব। আসলে ছেলেবেলা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতরে মানুষ হওয়ায়, তাঁর মধ্যে একটা গর্ব জন্ম নিয়েছিলো। এবং তাঁর ছেলেবেলার বন্ধুদের কাছে সে গর্ব খুব প্রচ্ছন্নও ছিলো না। সে জন্যে, চরম অর্থসঙ্কটের সময়েও তিনি তা নিয়ে গৌরদাসের কাছে মন খুলতে পারেননি। বিদ্যাসাগরকে তিনি যে নিজের সমস্যা বিশদভাবে জানিয়েছিলেন, সেটা নিতান্ত বাধ্য হয়ে — নিজের এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের জীবন বাঁচানোর দায়ে। তা ছাড়া, বিদ্যাসাগর একই চত্বরে লেখাপড়া করলেও তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু ছিলেন না। মনোমোহনের কাছ থেকেও একাধিকবার ধার নিয়েছিলেন, কিন্তু বাধ্য হয়ে। আলোচ্য চিঠিতে দেখতে পাই, গৌরদাস সমস্যার কথা উল্লেখ করায়, সে সম্পর্কে সামান্য আভাস দিয়েই কবি সোজা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন

> আমার বিশিষ্ট বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাকে হাত ধরে [এ বিপদ থেকে] পার করেছেন। তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবে আমার সঙ্গে কি রকমের দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়টা খুব গুরুতর এবং এ নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইনে। মাসের পর মাস আমি একটা আটকে-পড়া জাহাজের মতো ফ্রান্সে বন্দী হয়েছিলাম।

চরম অভাব এবং বিপদের কথা গোপন রাখলেও, ফলাও করে যা প্রচার করেছেন, তা হলো তিনি কতোগুলো ভাষা শিখেছেন এবং এসব ভাষা দিয়ে তিনি স্বদেশের কী উপকার করতে চান।

> আমার চরম দুরবস্থাকে যদ্দূর সম্ভব ভালো কাজে লাগিয়ে য়োরোপের তিনটি প্রধান ভাষা — ইটালিয়ান, জর্মান এবং ফ্রেঞ্চ শেখার মতো মনের জোর এবং সংকল্প আমার ছিলো। এসব ভাষার যে-সাহিত্য আছে, তারই দরুন এসব ভাষা শেখা মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রিয় গৌর, তুমি জানো, য়োরোপের একটা নাম-করা ভাষা শেখা হলো একটা বড়ো এবং চমৎকার আবাদী জমিদারি লাভ করার মতো — অবশ্য মননশীলতার জমিদারি। আমি যদি দেশে ফেরার জন্যে বেঁচে থাকি, তা হলে, আমার মাতৃভাষার মাধ্যমে আমার শিক্ষিত বন্ধুদের এসব ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। ... আমাদের মধ্যে যদি কেউ থাকে যে পশুর মতো হারিয়ে না-গিয়ে পেছনে তাঁর নাম রেখে যেতে চায়, তা হলে সে মাতৃভাষার চর্চা করুক। ... যারা মনে করে যে, তাদের মধ্যে নতুন চিন্তাধারা আছে, তারা মাতৃভাষার দিকে ধাবমান হোক। তুমি এবং আমাদের দেশের যে-ভদ্রলোকেরা নিজেদের সোয়াথী, মেকলি, কার্লাইল এবং থ্যাকারে বলে বিবেচনা করেন, তাঁদের জন্যে এখানে ছোটোখাটো একটা লেকচার দিলাম। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, তাঁরা সে রকমের কিছুই নন। যে-তাঁর নিজের মাতৃভাষা ভালো করে আয়ত্ত করেননি, তেমন কেউ

যদি নিজেকে শিক্ষিত বলে দাবি করেঠ, তা হলে তাঁর ভানকে আমার ঘৃণা হয়।

য়োরোপ যাত্রা করার পর কবি যে স্বদেশে এবং স্বজন সম্পর্কে বিশেষ করে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, আগেই তা বলা হয়েছে। কিন্তু যে-মাইকেল একদিন বাংলা ভাষা ভুলে যাবার ভান করেছেন এবং তা নিয়ে গর্ব করেছেন, সেই মাইকেল এখানে নিজের মাতৃভাষা এবং স্বরূপ সম্পর্কে যে-উক্তি করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই। মানুষের সত্যিকার পরিচয় যে টাকাপয়সা দিয়ে নয় এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি যে টাকাপয়সার চেয়ে অনেক বড়ো, তিনি চিঠির শেষ দিকে তা জোর দিয়ে বলেছেন। অথচ দেশের লোকেরা টাকাপয়সাকে বেশি দাম দেয় — ঘৃণার সঙ্গে তিনি বন্ধুকে এ কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তারপর আবার ঠাট্টা করে বলেছেনঃ 'টাকা করো, ভাই, টাকা করো।' এর আগের চিঠিতে বিদ্যাসাগরের কাছেও ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেনঃ 'কিন্তু লেখাপড়া তো টাকাপয়সা নয়। এবং আমাদের মতো নিচু জাতির জন্যে টাকাপয়সাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'[৮৫] তাঁর এ সময়কার চিঠিপত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রবাসে দৈবের বশে তিনি কিভাবে নিজের ভাষা এবং দেশের প্রতি অনুরাগ অনুভব করেছিলেন। আত্মপরিচয়ের যে-সঙ্কট তাঁর মধ্যে ছিলো, এ সময়ে তার অন্তত একদিকের নিষ্পত্তি হয়েছিলো। অতঃপর তিনি নিজেকে নিরন্তর 'কালো ইংরেজ' বলে শনাক্ত করেননি। বরং নিজেকে অনেক সময়ে বাঙালি বলেই চিহ্নিত করেছেন। তদুপরি, ময়ূরপুচ্ছ পরা যে-দেশীয়রা নিজেদের কালো সাহেব বলে গণ্য করতেন, অকাতরে তাঁদের নিন্দা করেছেন — যদিও নিজে চিঠি লিখেছেন ইংরেজিতে, এবং এই কালো সাহেবদের গালও দিয়েছেন ইংরেজিতে। এ তাঁর বহুমুখী, এমন কি, পরস্পরবিরোধী সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং প্রবণতারও প্রতিফলন।

ডিসেম্বর মাসের (১৮৬৪) শেষে এবং জানুয়ারি মাসের (১৮৬৫) গোড়ায় বিদ্যাসাগরকে যখন লিখেছিলেন, তখন তিনি আশা করেছিলেন যে, এপ্রিল মাস নাগাদ লন্ডনে ফিরে যাবেন। গৌরদাসকে লেখা ওপরের চিঠিতেও সে কথা উল্লেখ করেছেন। মে মাসের ২৭ তারিখ থেকে গ্রেজ ইনে ট্রিনিটি টার্ম শুরু হবার কথা। তিনি ধারণা করেছিলেন, এই টার্ম ধরতে পারবেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য অতো প্রসন্ন ছিলো না। বিদ্যাসাগরের লেখা ২২ মার্চের চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছেছিলো সম্ভবত ২৫ এপ্রিল। এ চিঠি থেকে তিনি জানতে পান যে, তাঁর পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ঋণদাতাদের মনঃপূত হয়নি।[৮৬] প্রথম ঋণদাতা অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজেই উকিল বলে কবির পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মধ্যে ফাঁক দেখতে পাচ্ছিলেন। আর দ্বিতীয় ঋণদাতা শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নও তাঁকে ঋণ দিতে তেমন ভরসা পাননি। তাঁর সম্পত্তি পুরোপুরি নির্ঝঞ্ঝাট ছিলো না। তাঁর সাগরদাঁড়ির সম্পত্তির তিনি যেমন কোনোদিন দখল পাননি। (এই দখল না-পাওয়া সম্পত্তিই তিনি দান করেছিলেন পিসতুত ভাই বৈদ্যনাথ এবং দ্বারকানাথ মিত্রকে।) তদুপরি তিনি খৃস্টান। ১৮৪৯ সালের আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ধর্মান্তরিত সন্তানদের অধিকার পাকাপাকিভাবে স্থাপিত হয়েছিলো বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। সর্বোপরি, তিনি নিজে ছিলেন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। প্রবাসে তাঁর মৃত্যু হলে, তাঁর জ্ঞাতিদের বিরোধিতার মুখে চক মুনকিয়া এবং গদার ডাঙ্গার সম্পত্তিতে দখল পাওয়া যাবে কিনা, ঋণদাতারা তা বিবেচনা করে থাকবেন। জীবনবীমা নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে সে কারণে। এমতাবস্থায় ঋণদাতারা এমন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি চাইছিলেন যা থেকে তাঁরা তাঁদের টাকাকড়ির নিরাপত্তা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারবেন। তাই তাঁরা বিদ্যাসাগরের মতো সুপরিচিত ব্যক্তিদেরও এই আদান-প্রদানের সঙ্গে জড়িত করতে চাইছিলেন। বিদ্যাসাগর ছাড়া তাঁরা অন্তত আরও দুজনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন। কবির চিঠি থেকে এই দু জনের নাম জানা যায়। একজন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন কৃষ্ণদাস পাল।[৮৭] এঁরা দুজনেই ছিলেন কলকাতার সুপরিচিত ব্যক্তি। তদুপরি, কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন জমিদার সমিতি — ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা।

বিদ্যাসাগরের চিঠি পেয়ে কবি মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁকে তিনি লিখেছেন: তিনি অথবা বিদ্যাসাগর সব রকমের নোংরা কাজের উর্ধ্বে — এটা ঋণদাতাদের বোঝা উচিত।[৮৮] বিষয়ী ঋণদাতারা অবশ্য এই সহজ কথাটা অতো সহজে বুঝতে চাননি। এমতাবস্থায় কবি নতুন করে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি পাঠালেন এপ্রিলের শেষে। এই চিঠির সঙ্গে তিনি একটা হিশেবও পাঠান। তাতে জানান যে, ভার্সাই-এর ধার শোধ করার জন্যে এবং বছরের শেষ পর্যন্ত থাকার খরচ বাবদ তাঁর মোট ব্যয় হবে পাঁচ হাজার টাকা — জুন মাস পর্যন্ত থাকার খরচ আর ধার বাবদে তিন হাজার, জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আড়াই শো টাকা করে দেড় হাজার, আর চিকিৎসা, কাপড়চোপড় ইত্যাদির জন্যে আরও পাঁচ শো — মোট পাঁচ হাজার।[৮৯] কিছু দিন আগেই বলেছিলেন তিন হাজার। বস্তুত, এই একবারই নয়, পরবর্তী এক বছর তিনি বারবার তাঁর টাকার অঙ্ক বাড়িয়েছেন। বিদ্যাসাগরের চিঠি পেয়ে তাঁর বিশেষ করে হতাশ হবার কারণ কেবল এ নয় যে, এর ফলে লন্ডনে ফিরে যাওয়া পিছিয়ে গেলো; তাঁর হতাশ হবার অব্যবহিত কারণ ছিলো সেই মুহূর্তে তাঁর অসহনীয় অনটন। চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে সে কথা জানাতে তিনি ভুলে যাননি। 'এই মুহূর্তে আমার হাতে একটি পয়সাও নেই। আমাদের জীবন রক্ষার জন্যে সরকারী বন্ধকী দোকান থেকে আমার কিছু টাকা অবশ্যই জোগাড় করতে হবে।'[৯০] মুশকিল হলো: বন্ধক রাখার মতো বেশি জিনিশ তাঁর হাতে ছিলো না। যা ছিলো, তা বন্ধক দিয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকা যায় না। সে জন্যে পরের মাসে তাঁকে দেখতে পাই প্যারিসে গিয়ে একটি ব্রিটিশ দাতব্য তহবিল থেকে টাকা জোগাড় করতে চেষ্টা করছেন। টাকার পরিমাণ মাত্র দু শো — ও রকমের অঙ্কের টাকা তিনি জীবনে অনেক বার পেয়েছেন এবং অকাতরে উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন অবস্থার ফেরে পড়ে সেই সামান্য টাকা পাওয়ার জন্যে তাঁকে যে-অপমানজনক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাতে তিনি মনে মনে খুব আহত হন। কিন্তু তাঁর অন্য কোনো পথ খোলা ছিলো না।

> আমাদের অবস্থা খুবই করুণ। একটি ব্রিটিশ দাতব্য তহবিলের কাছে আমার দু শো টাকা ধার চেয়ে আবেদন করতে হয়েছে। আপনি ভাবতে পারবেন না, কমিটির সামনে যখন হাজির হতে হয়, আমার নিজেকে তখন কী রকমের অপমানিত মনে হয়েছিলো। সেখানে এমন কতোগুলো ইতর এবং দুর্গন্ধওয়ালা বদমাশ ছিলো। 'বিপদে পড়লে অদ্ভুত লোকের সঙ্গেও সহবাস করতে হয়।' এই দাতব্য তহবিলের সভ্যরা, আমার অবশ্যই বলতে হবে, আমাকে খুব ভালো করে খতিয়ে দেখেছিলো, বিশেষ করে স্যর জোসেফ ক্লিফ (কলকাতার সাবেক রোম্যান ক্যাথলিক বিশপের ভাই)[৯১] এবং লর্ড ডিগ্রেসি।[৯২] আমাকে লেখা আপনার শেষ চিঠিটি তারা অনুবাদ করানোর জন্যে রেখে দিয়েছে। অবশ্য প্যারিসে বাংলা পড়তে জানে এমন কাকে তারা পাবে, আমার জানা নেই। কলকাতার দু জন লোক সেখানে আছেন বটে — মিস্টার ডি সৌজা আর মিস্টার মেন্ডিস — তবে তাঁরা হলেন মেটে ফিরিঙ্গি, যাঁরা বলেন 'বাবু তুমি ভাল আছি?' আমি তাদের সিদ্ধান্ত জানতে পারবো আগামী সোমবার।[৯৩]

বোঝা যায়, এ চিঠি দিয়ে কবি নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরের ওপর টাকা পাঠানোর চাপ বহাল রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বোঝা যায়, তিনি কী রকমের টানাটানির মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন।

বিদ্যাসাগর যদি নতুন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি পাওয়ার দু সপ্তাহের মধ্যেও টাকা জোগাড় করতে পেরে থাকেন, তা হলেও জুলাই মাসের একেবারে শেষ দিকে কবি টাকা পেয়েছিলেন — তার আগে নয়। ১৮ জুলাই বিদ্যাসাগরকে নিজেদের করুণ অবস্থার বিবরণ দিয়ে অধীর কবি লিখে জানান:

> এটা বোঝাই যাচ্ছে আপনি জুনের প্রথম ডাকে (৭ অথবা ৯) আমাকে লিখতে পারেননি। কারণ সে ডাক এখানে পৌঁছে গেছে। আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না আমি কী শোচনীয় এবং উদ্বিগ্ন অবস্থায় আছি। হে ঈশ্বর! আমাদের কী হবে? যে-পাওয়ার [অব অ্যাটর্নি] পাঠিয়েছি তা কি যথেষ্ট হয়েছে? সে যাই হোক, আমি ২৩ জুনের ডাকের দিকে জ্বলন্ত উদ্বেগের সঙ্গে তাকিয়ে থাকবো। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তা এখানে পৌঁছে যাবে। আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। আমি জানিনে, কি করে মনটাকে চাঙ্গা করতে পারি। এই অবস্থায় আমার একমাত্র সান্ত্বনা হলো এই যে, আমার বিষয়টা এখন আপনার হাতে আছে এবং আপনি

> আমাদের বিদেশে-বিভূঁইয়ে কুকুরের মতো মরতে দেবেন না। ... আশা করি আপনি চট্টোপাধ্যায়কে শাস্তি দিতে চেষ্টা করছেন।

২৩ জুনের ডাক ভার্সাইতে পৌঁছে ২৫ জুলাই-এর দিকে। তখনই কবি টাকা পেয়েছিলেন কিনা, ঠিক বলা যাচ্ছে না। যা বলা যাচ্ছে, তা হলো: যতো টাকা চেয়েছিলেন, এবারেও বিদ্যাসাগর ততো টাকা পাঠাতে পারেননি। তবে কবির সৌভাগ্য, তখন যে-টাকা পেয়েছিলেন, তা দিয়ে অন্তত ভার্সাই-এর সব দেনা শোধ করে লন্ডন গিয়ে গুছিয়ে বসতে পেরেছিলেন। তিনি যে এ সময়ে মোটামুটি অর্থকষ্টের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ হলো: এ সময়ে বিদ্যাসাগরকে লেখা তাঁর কোনো চিঠি পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো দু-একটা লিখেছেন – যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি। কিন্তু টাকার তাগাদা জানিয়ে পরের বছর জানুআরি মাসে (১৭.১.১৮৬৬) তিনি বিদ্যাসাগরকে যে-চিঠি লেখেন তা থেকে জানা যায় যে, এ সময়ে তিনি বিদ্যাসাগরের চিঠির জবাবও সময়মতো দিচ্ছিলেন না। এই চিঠিতে তিনি এক সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তিনটি চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে, পকেটে টাকা থাকায় এ সময়ে তাঁকে ঘন-ঘন বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখতে হয়নি।

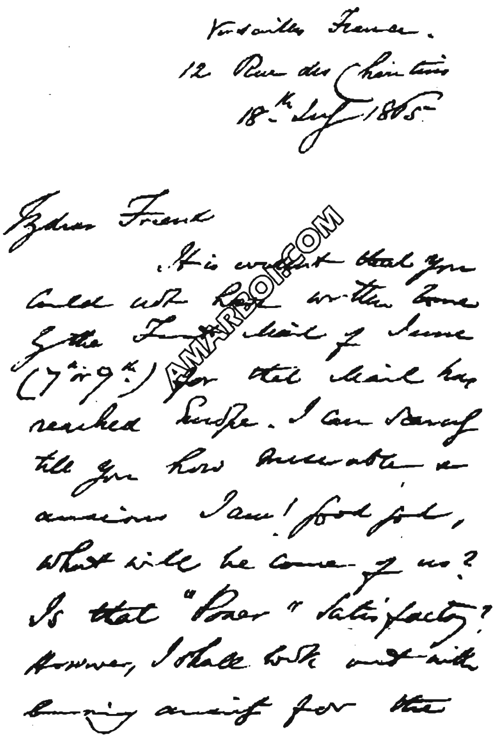
জানুআরি মাসের (১৮৬৬) এই চিঠি থেকে দেখা যায়, তখন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মাইকেলের জন্যে সাত হাজার টাকা ধার করেছিলেন। এর মধ্য থেকে তিনি তাঁকে পাঠান ছ হাজার টাকা। কারণ তিনি কবির কাছে এক হাজার টাকা পেতেন – যা তিনি লন্ডন যাবার আগেই তাঁকে ধার দিয়েছিলেন। অনেক দিনের পুরোনো ধার এবং কবি এক সময়ে বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন, ধার-করা টাকা থেকে তাঁর এবং অন্যদের পাওনা চার হাজার টাকা কেটে রাখার জন্যে। বিদ্যাসাগর সম্ভবত সে কারণে কবির এতো টানাটানির মধ্যেও এক হাজার টাকা কেটে রাখেন। তিনি এই সাত হাজার টাকা ধার করা ছাড়াও, মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বি এন মিত্রের কাছ থেকেও টাকা আদায় করে পাঠিয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ সোম মাইকেলের এই চিঠির বরাত দিয়ে বলেছেন যে, তখন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ন শো একত্রিশ টাকা, ন আনা আট পাই আদায় করেছিলেন আর তাঁর কাছে তখনো পাওনা ছিলো দশ হাজার এক শো টাকা।[১৩] কিন্তু এ হিশেবে সঠিক নয়। কবির চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৮৬৪ এবং ১৮৬৫ সালে তিনি মহাদেব চট্টোপাধ্যায় বাবদ পেয়েছিলেন মোট তিন হাজার টাকা। এ তিন হাজারের মধ্যে দিগম্বর মিত্র পাঠিয়েছিলেন ৮০০ টাকা। বাকিটা আদায় করে পাঠান বিদ্যাসাগর। আর ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মহাদেবের কাছে শেষ চুক্তি অনুযায়ী পাওনা হয়েছিলো ছ হাজার টাকা, পুরোনো চুক্তি অনুযায়ী ন হাজার টাকা। সুতরাং এ পর্যায়ে মহাদেব খুব বেশি ঋণী ছিলেন বলে মনে হয় না।

এর পর এক বছর লন্ডন এবং ভার্সাইতে থাকার খরচ, গ্রেজ ইনের বেতন এবং অন্যান্য খরচ, দেশে ফেরার খরচ এবং ভার্সাইতে পরিবারের জন্যে ব্যাংকে টাকা রেখে আসার জন্যেও বিদ্যাসাগরকে আরও বারো হাজার টাকা পাঠাতে হয় কবির তালুক বন্ধক রেখে। তিনি যে অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের কাছে তালুক বন্ধক রেখেছিলেন, তা জানা যায় বিদ্যাসাগরকে লেখা অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি থেকে।[১৪] চিঠিটি তিনি লেখেন কবি দেশে ফিরে আসার মাস দুয়েক পরে। তা ছাড়া, ১৮৬৭ সালে লেখা বিদ্যাসাগরের একটি চিঠি থেকে জানা যায়, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকেও কম্পেনির কাগজ নিয়ে বিদ্যাসাগর কবির কাছে পাঠিয়েছিলেন। কবি এ টাকা ধার করেন কলকাতায় ফেরার পর। তবে ১৮৬৪ সালের অক্টোবরেও কম্পেনির কাগজ পেয়েছিলেন।[১৫] বিদ্যারত্নের কাছে সব মিলে কতো টাকা ধার হয়েছিলো, তা জানা যায় না।

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকে টাকা ধার করার কথা জীবনীকারগণ

উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ২৫ ফেব্রুআরি ১৮৬৬ তারিখে লেখা কবির একটি চিঠি থেকে জানা যায়, রাণী স্বর্ণময়ীর কাছ থেকেও বিদ্যাসাগর টাকা ধার করেছিলেন।

> আপনি যে রকম সন্তোষজনকভাবে রাণী স্বর্ণময়ীর সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। এর ফলে আমাকে বিপদে ফেলার এবং আমার সর্বনাশ করার জন্যে মহাদেব চট্টোপাধ্যায় এবং তার চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, আপনার বন্ধু যাতে সরে দাঁড়ান সে জন্যে সেই .... গোপনে আপনার বন্ধুর কানে ব্যাপারটা পৌঁছে দিয়েছে। বিশ্বাস করুন সেই লোকটা যে-কোনো রকমের বদমায়েশি করার উপযুক্ত।[১৭]


Versailles France.
12 Rue des Chantiers
18th July 1865

My dear Friend
It is evident that you could not have written some of the First Mail of June (7th & 9th) for that mail has reached Europe. I can scarcely tell you how miserable & anxious I am! Good God, what will become of us? Is that "Power" satisfactory? However, I shall write and with burning anxiety for the

বিদ্যাসাগররকে লেখা কবির চিঠি

এ সময় পর্যন্ত বিদ্যাসাগর কার-কার কাছ থেকে ঠিক কতো টাকা ধার করেছিলেন অথবা টাকা আদায় করে কবিকে মোট কতো টাকা পাঠান, সবগুলো চিঠি রক্ষা না-পাওয়ায় এখন আর তা নির্দিষ্ট করে

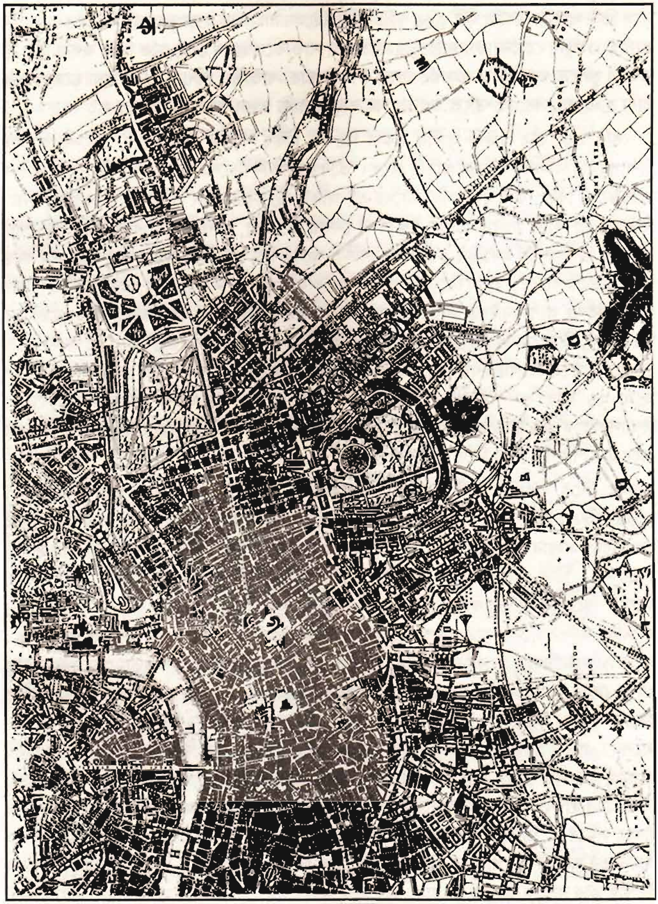
বলার জো নেই। বিদ্যাসাগরের পাঠানো টাকা ছাড়াও, কবি নিজে তাড়া দিয়ে তাঁর প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বসুর কাছ থেকে একাধিক কিস্তিতে টাকা আদায় করেছিলেন।[১৮] ব্যারিস্টার হবার জন্যে তাঁর সব মিলে যে-অর্থ ব্যয় (কুড়ি হাজার টাকারও বেশি) হয়, তা তখন অন্য যাঁরা ব্যারিস্টারি পড়েছিলেন, তাঁদের তুলনায় অনেক বেশি। তিনি নিজে ১৮৬৫ সালে লিখেছিলেন, গৌরদাস যদি ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডনে যেতে চান, তা হলে তার জন্যে আট/দশ হাজার টাকার বেশি ব্যয় হবে না।

কবি যখন জুলাই-এর শেষে অথবা অগস্টের (১৮৬৫) প্রথম দিকে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে টাকা পান, ততোদিনে ট্রিনিটি টার্ম শেষ। পরবর্তী মিকেলমেস টার্ম শুরু হবার কথা নভেম্বরের প্রথম দিকে। সে জন্য অবিলম্বে লন্ডনে যাবার তাঁর কোনো তাড়া ছিলো না। খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে সপরিবারে তিনি লন্ডন যাত্রা করেন। অন্তত তিনি যে অক্টোবরের আগেই লন্ডনে গিয়ে পৌঁছেছিলেন তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ এই যে, তিনি সেখানে এক বছরের চুক্তিতে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন এবং পরের অগস্ট মাস (১৮৬৬) থেকে সেই বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে বিশেষ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসাগরকে বারবার মনে করিয়ে দেন যে, তিনি যদি সেপ্টেম্বর মাস শেষ হবার আগে সব পাওনা মিটিয়ে দিয়ে অন্য বাড়িতে চলে যেতে না-পারেন, তা হলে বিলেতের বাড়ি ভাড়ার কঠোর আইন অনুযায়ী তাঁকে পরবর্তী এক বছরের জন্যে অতিরিক্ত ভাড়ায় বাড়িটা রাখতে বাধ্য করা হতে পারে।[১৯]

লন্ডনে তিনি যে-বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন, তা থেকে তাঁর তখনকার মনোভাব খানিকটা আঁচ করা যায়। যখন মাদ্রাসে ছিলেন, সে সময়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর আয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি বারবার বাড়ি বদল করতেন। মাদ্রাস থেকে ফেরার পর কলকাতায় আগাগোড়া আয় (শেষের এক বছর ছাড়া) একই রকম ছিলো। বাড়ি বদলের তাই কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। (৬ নম্বর লোয়ার চিৎপুরের বাড়ি মেরামত হচ্ছিলো বলে ১৮৬১ সালের মাঝামাঝি তাঁকে অবশ্য অল্প দিনের উঠে যেতে হয়েছিলো খিদিরপুরের ৬ নম্বর জেমস লেনে। প্রথম দিকে সে বাড়ি অল্প দিনের মধ্যে ছেড়ে দেবার পরিকল্পনা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত আর ছাড়া হয়নি। বা পরিকল্পনা থাকলেও সাধ্যে কুলোয়নি।) আর ১৮৬৩ সালে হেনরিয়েটা হঠাৎ সন্তানদের নিয়ে লন্ডনে চলে আসায়, তখন বিপন্ন কবি কোনো মতে মাথা গোঁজার মতো একটা বাড়ি ভাড়া করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। দারুণ অভাবের মধ্যে ভার্সাইতেও কোনো ভালো বাড়িতে থাকতে পারেননি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনে এসে কবি একটা ভালো বাড়ি নিতে পারতেন। তবে জীবনে ঐ একবার তিনি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়ে বাড়ি ভাড়া করেছিলেন নিজের পকেটের কথা মনে রেখে।

সত্যি বলতে কি, লন্ডনে না-বলে, বরং বলা উচিত তিনি বাড়ি ভাড়া করেছিলেন লন্ডনের অনেকটা বাইরে – শেফার্ডস বুশে। (তাঁর সেই বাড়ির পাশেই এখন গড়ে উঠেছে বিবিসি টেলিভিশনের বিশাল ভবন এবং তাঁর সেই বাড়ির ওপর তৈরি হয়েছে লন্ডন ট্রান্সপোর্টের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র / কার পার্ক।) কেবল নামে নয়, কাজেও শেফার্ডস বুশ তখন ছিলো জঙ্গলে ভরা নগরীর উপকণ্ঠে ছোট্টো একটি পাড়া। রাস্তার এক পাশে কয়েকটি বাড়ি, অন্য পাশে একটি বিশাল নার্সারি। কয়েকটি বড়ো খামারও ছিলো এ রাস্তার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে। উড লেন বৃহত্তর লন্ডনের পোস্টাল ডায়রেক্টরিতে তখনো আলাদা রাস্তার মর্যাদা লাভ করেনি – শেফার্ডস বুশ বলেই পরিচিত ছিলো। কবি যে-বাড়িতে ছিলেন, সেখান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে তিন-চার মিনিট হাঁটলে পাওয়া যেতো বড়ো রাস্তা – আক্সব্রিজ রোড। সেই রাস্তা ধরে সোজা পুব দিকে আধ মাইল হাঁটলে একটা বড়ো বাজার-এলাকা – নটিং হিল। কিন্তু খোদ লন্ডন শহর ছিলো অন্তত আড়াই মাইল দূরে। আর সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে গ্রেজ ইন। কয়েক মাস পরে একটি চিঠিতে কবি নিজেও লন্ডনকে আলাদা একটা শহর বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বাড়ির পেছনে

ছিলো ব্রিস্টল-ব্যর্মিংহ্যাম অ্যান্ড টেমস জাঙ্কশন রেল লাইনের ওপর শেফার্ডস বুশ নামে ছোটো একটি রেল স্টেশন। এ ছাড়া, ১৮৬৩ সালে মেট্রোপলিটান লাইনের একটি স্টেশনও তৈরি হয় এখানে। অনুমান করি, অতো দূরের গ্রেজ ইনে তিনি এই রেল স্টেশন দিয়েই যাতায়াত করতেন। বাড়িগুলোর নাম থেকে এই পাড়ার 'বন চেহারার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। এই রাস্তার কয়েকটি বাড়ির নাম যেমন



সেকালের শেফার্ডস বুশ। ক চিহ্নিত জায়গায় কবি থাকতেন; খ চিহ্নিত জায়গায় গ্রেজ ইন, গ চিহ্নিত জায়গায় শেষ দু মাস ছিলেন; ঘ চিহ্নিত জায়গায় ক্ষেত্রমোহন থাকতেন।

উড হাউস, উড কটেজ, উইলো ভেইল, লাইম গ্রোভ ইত্যাদি। যে-বাড়িতে তিনি থাকতেন, তার নাম ছিলো লোর্ন কটেজ বা লোর্ন হাউস। তবে পোস্টাল ডায়রেক্টরিতে এ বাড়ির নাম নয়, উল্লিখিত হয়েছে এ বাড়ির নম্বর।

শহরের বাইরে অনভিজাত পাড়ায় বাড়ি ভাড়া করেই কবি টাকা বাঁচানোর চেষ্টা করেননি; সেই সঙ্গে তিনি আর-একটা হিশেবী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন বাৎসরিক হারে ভাড়ার চুক্তি করে। আসলে ভার্সাইতে তিনি যে-নিদারুণ দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সেই স্মৃতি তিনি অথবা তাঁর স্ত্রী তখনো ভুলতে পারেননি। তদুপরি যেভাবে তিনি তাঁর 'খাজাঞ্চি' বিদ্যাসাগরের কথা মতো চলতে বাধ্য হচ্ছিলেন, তাতেও তাঁকে অগত্যা অল্প ভাড়ার বাড়ি পছন্দ করতে হয়েছিলো।

কবি এবং তাঁর সঙ্গিনী তৃতীয় একটা হিশেবী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের বাড়িতে টাকাপয়সার বিনিময়ে একজন অতিথি রেখে। তবে অতিথি নির্বাচনের ব্যাপারে হিশেবী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন কিনা, বলা মুশকিল। তাঁদের এই অতিথি ছিলেন একজন বাঙালি — ক্ষেত্রমোহন দত্ত। তিনি ১৮৬৫ সালে লন্ডনে আসেন উচ্চশিক্ষা নেবার উদ্দেশ্যে, যদিও কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবেন, সে সম্পর্কে মনঃস্থির করতে পারেননি। অনেক দিন এটা-ওটা চেষ্টা করার পর, শেষ পর্যন্ত তিনি ডাক্তারি পড়েন। প্রথম দিকে এই ভদ্রলোককে কবি খুব পছন্দ করতেন। হেনরিয়েটাও। আর ক্ষেত্রমোহনও আপাতদৃষ্টিতে কবির পরিবারকে খুব পছন্দ করতেন। হেনরিয়েটা তাঁর এতো যত্ন নিতেন যে, তিনি হেনরিয়েটাকে, সম্ভবত ঠাট্টা করে, মা বলতেন।[১০০] 'ঠাট্টা করে' এ জন্যে বলছি যে, এ সময়ে হেনরিয়েটার বয়স ছিলো ৩০ বছরের চেয়ে কয়েক মাস কম। আর ক্ষেত্রমোহনের বয়স ছিলো ২৬ বছর।[১০১] যে-জন্যে তাঁকে কবি অতিথি রাখেন, তা অবশ্য তেমন সার্থক হয়নি। বিদ্যাসাগরকে এক চিঠিতে লিখেছেন যে, ক্ষেত্রমোহনের জন্যে যে-ব্যয় হয়েছে, হেনরিয়েটা তার চেয়ে এক পয়সাও বেশি নিতে পারেননি।[১০২]

প্রথম দিকে একাধিক চিঠিতে কবি ক্ষেত্রমোহনের ব্যাপারে খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত পণ্ডিত ডক্টর গোল্ডস্টুকার কবিকে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে অবৈতনিক বাংলার অধ্যাপকের পদ নেবার আহ্বান জানালে তিনি নিজে তা গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ বেতন ছাড়া তাঁর সংসার চলবে না — তিনি গোল্ডস্টুকারকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন।[১০৩] সংস্কৃত এবং আরবি ভাষার পণ্ডিত হিশেবে থিয়োডর গোল্ডস্টুকার (১৮২১-১৮৭২) তখন খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর জন্ম জার্মেনির কনিংসবার্গে। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি ডাক্তারি পাশ করেন বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অবশ্য চিকিৎসাবিদ্যার দিকে তিনি যাননি। তাঁর সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক মতামতের দরুন তাঁকে ব্যর্লিন ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর ১৮৪২ থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে বসবাস করেন। মাঝখানে ১৮৪৪ সালে প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ এইচ এইচ উইলসনের নিমন্ত্রণে লন্ডনে আসেন। পরে উইলসনের সঙ্গে লন্ডনেই কাজ করেন। ১৮৫২ সালে তিনি নিযুক্ত হন ইউনিভার্সিটি কলেজে লন্ডনের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। তিনি *প্রবোধচন্দ্রিকা* সম্পাদনা করেন। তা ছাড়া, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনা করেন। উইলসনের অভিধানের জন্যেও কাজ করেন তিনি। কবি লন্ডনে থাকার সময়ে — ১৮৬৬ সালে — তিনি স্থাপন করেন স্যান্সক্রিট টেকস্ট সোসাইটি। রাজনৈতিক মতামতের জন্যে তিনি পরিচিত ছিলেন দারুণ বিতর্কিত মানুষ হিশেবে। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ হিশেবে তাঁর ব্যাপক স্বীকৃতি ছিলো। কবি তাঁর কথা প্রথম জানতে পান মনোমোহন ঘোষের কাছ থেকে। ভার্সাইতে থাকার সময়ে তিনি মনোমোহনকে লেখেন যে, গোল্ডস্টুকারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি উৎসুক হয়ে আছেন। তিনি লন্ডনে ফিরে আসার পর গোল্ডস্টুকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়

হয়। তাঁকে উদ্দেশ্য করে কবি যে-সনেটটি রচনা করেন সেটি ১৮৬৫ সালের শেষ অথবা ১৮৬৬ সালের প্রথম দিকের রচনা বলে মনে হয়। কবির সঙ্গে পরিচয় হলে গোল্ডস্টুকার দেখতে পান যে, তিনি রীতিমতো একজন ভাষাবিদ এবং পণ্ডিত। সেই সূত্রেই তিনি কবিকে ইউনিভার্সিটি কলেজে বাংলার অধ্যাপক হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

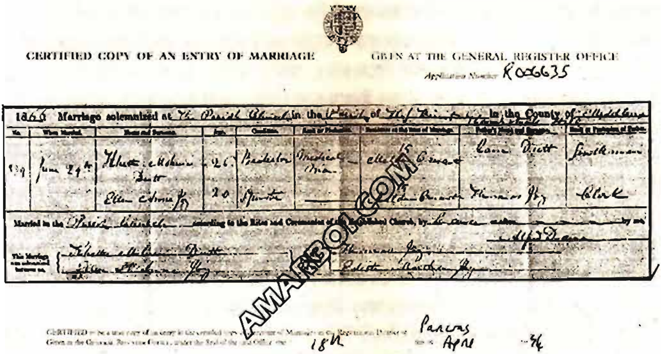
নিজে অবৈতনিক অধ্যাপকের পদটি কবি গ্রহণ করতে না-পারলেও তিনি ক্ষেত্রমোহন দত্তকে ডক্টর গোল্ডস্টুকারের কাছে নিয়ে গিয়ে এ পদটি তাঁকে দেবার জন্যে অনুরোধ জানান। গোল্ডস্টুকারও রাজি হন ক্ষেত্রমোহনের আবেদনপত্র সমর্থন করতে। তবে শেষ পর্যন্ত ক্ষেত্রমোহন এ পদটি পাননি। তিনি যে কোনো পণ্ডিত ছিলেন না, গোল্ডস্টুকার নিজে হয়তো তা টের পেয়েছিলেন। ক্ষেত্রমোহনের প্রতি কবি যথেষ্ট উষ্ণতা দেখালেও তাঁদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বস্তুত ফেব্রু-আরি মাসের (১৮৬৬) মধ্যে ক্ষেত্রমোহন দত্তের সঙ্গে কবির পরিবারের সম্পর্ক টক হয়ে যায়। ২৫ ফেব্রুআরি কবি তাঁর চিঠিতে ক্ষেত্রমোহন সম্পর্কে লেখেন: 'ক্ষেত্রমোহন দত্ত আমাদের ছেড়ে চলে গেছে শহরে থাকার জন্যে, কারণ সে মেডিকল লেকচার ইত্যাদিতে যোগ দিতে চায়। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে নিজের মন নিজে ভালো করে জানে না। সে অবশ্য নিজের ইচ্ছায় চলে গেছে। তার সঙ্গে আমার মাঝেমধ্যে দেখা হয়।'[১০৪] শহরে থাকার কথা বলে গেলেও, ক্ষেত্রমোহন ঠিক শহরে ছিলেন না। তিনি যে-বাড়িতে টাকা দিয়ে অতিথি থাকেন, সেটি ছিলো শহরের বাইরে — চক ফার্মের কাছে। তবে শেফার্ডস বুশ শহর থেকে যতোটা দূরে ছিলো, এই জায়গাটা ততো দূরে ছিলো না।

পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গে কবির সম্পর্ক রীতিমতো শত্রুতার চেহারা নেয়। তিনি একাধিক চিঠিতে এঁর সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কাছে কটূক্তি করেন (তাঁর ভাষায় — 'ভাগ্যিস সব বাঙালি ক্ষেত্রমোহনের মতো নয়!'[১০৫])। ক্ষেত্রমোহন বিয়ের বাজারে ঘোরাঘুরি করছেন এবং নিজের ফাঁপানো পরিচয় দিয়ে একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করতে চেষ্টা করছেন, ১০ই জুনের (১৮৬৬) চিঠিতে এও তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন। তিনি এ খবর পেয়েছিলেন, ক্ষেত্রমোহন যে-মহিলাকে বিয়ে করেন, তাঁর বাবার এক বন্ধুর কাছ থেকে। এই ভদ্রলোক ছিলেন ভারতীয় সেনা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। মাইকেল যা লেখেননি, তা হলো, তাঁর বাড়ি থেকে বিদায় নেবার চার-পাঁচ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন যে-বাড়িতে টাকা দিয়ে অতিথি ছিলেন, সেই বাড়িরই মেয়ে অ্যালেন অ্যান জয়কে বিয়ে করেন। টমাস জয়ের কন্যা অ্যালেনের বয়স ছিলো কুড়ি বছর। এ বিয়ে হয় উত্তর লন্ডনের হ্যাভারস্টক হিলের চার্চে — ২৯ জুন (১৮৬৬) তারিখে। বিয়ের দলিলে বর এবং কন্যা উভয়ের ঠিকানাই দেওয়া আছে ১৫ নম্বর মন্সে ক্রিসেন্ট। আর ক্ষেত্রমোহনের পরিচয় দেওয়া আছে — জেন্টেলম্যান।[১০৬] এ থেকে বোঝা যায়, কবি যে লিখেছিলেন ক্ষেত্রমোহন ফাঁপানো পরিচয় দিয়ে বিয়ে করতে চেষ্টা করছেন[১০৭], সে কথা সত্য। ইংরেজ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে জেন্টেলম্যান শব্দের বিশেষ অভিধা ছিলো, সেটা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে। কলকাতায়, এবং সম্ভবত লন্ডনে, তাঁর নামে যে-সব বদনাম হয়েছিলো, তার অনেকটার প্রণেতাই ক্ষেত্রমোহন, ক্ষুব্ধ কবি একাধিক চিঠিতে এ অভিযোগ করেছেন।[১০৮] এমন কি, পরে দেখতে পাবো, ক্ষেত্রমোহন তাঁর আরও বড়ো রকমের ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

১৮৬৫ সালের শেষ দিকে অপেক্ষাকৃত আর্থিক সচ্ছলতার সময়ে বিদ্যাসাগরকে কবি আগের মতো ঘন-ঘন চিঠিপত্র না-লিখলেও জানুআরি মাসের (১৮৬৬) দিকে হাতের টাকা ফুরিয়ে আসায় তিনি আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এ সময়ে বিদ্যাসাগরকে তিনি একাধিক চিঠিতে মনে করিয়ে দেন যে, তাঁর অনেক টাকা লাগবে — পরবর্তী এক বছর য়োরোপে থাকার জন্যে, দেশে ফিরে যেতে এবং ফিরে গিয়ে

ব্যবসা সাজিয়ে বসতে।[১০৯] সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে অন্তত আরও চারবার মনে করিয়ে দেন যে, লন্ডনে সে বছর অন্য বছরের তুলনায় জিনিশপত্রের দাম ছিলো অনেক বেশি। স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, কোনো বৃদ্ধও তাঁর জীবনে এর আগে কখনো জিনিশপত্রের এতো দাম দেখেননি। এর একটা কারণও তিনি দেখিয়েছেন — রেন্ডারপেস্ট নামে গবাদি পশুর একটা রোগের দরুন মাংসের দাম বড্ডো চড়া।[১১০] একটা পরিবারের সারা মাসে যে-পরিমাণ মাংস লাগতে পারে, তাতে ঐ একটা জিনিশ মহার্ঘ হলে মাসিক ব্যয় খুব বাড়ার কথা নয়। আসলে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে নিয়মিত টাকাপয়সা পাওয়ায় কবির খরুচে স্বভাবই এ সময়ে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

ভার্সাই থেকে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন, লন্ডনে মাসে ব্যয় হবে আড়াই শো টাকা। কিন্তু লন্ডনের জীবনযাত্রা মহার্ঘ হওয়ায় একাধিক বার লিখে জানান যে, ৩৬০ টাকা বা ৩৬ পাউন্ডের চেয়ে


CERTIFIED COPY OF AN ENTRY OF MARRIAGE GIVEN AT THE GENERAL REGISTER OFFICE

Application Number R 006635

ক্ষেত্রমোহনের বিয়ের দলিল

কমে সেখানে ব্যয় নির্বাহ করা খুব শক্ত। কয়েক মাসের মধ্যে ৩৬০ টাকাকে আরও বাড়িয়ে বলেছেন, ৪৫০ টাকার কমে এখানে থাকা যায় না। বিদ্যাসাগর তাঁর বায়না বারবার বেশ ধৈর্যের সঙ্গেই শোনেন। ছ হাজার টাকা পাওয়ার পরেও বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে তিনি ফেব্রুআরি মাসে এক হাজার টাকা (১০১ পাউন্ড) এবং এপ্রিল মাসে দেড় হাজার টাকা (১৫১ পাউন্ড) পান। কিন্তু চিরদিনের বেহিশেবী কবির নবাবী মেজাজ এ সময়ে তাঁকে আবার পেয়ে বসে। তিনি আরও সাড়ে চার শো পাউন্ড চেয়ে পাঠান।[১১১] জুন মাস নাগাদ (১৮.৬.৬৬) এই অঙ্ক আরও বাড়িয়ে বলেন, বারো শো পাউন্ড — ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকার এবং বারে ডাক পড়ার খরচ ৫০০ পাউন্ড, হেনরিয়েটার জন্যে রেখে যাবেন ২০০ পাউন্ড, দেশে যাবার খরচ ২০০ পাউন্ড আর দেশে গিয়ে ব্যবসা গুছিয়ে বসার জন্যে আরও তিন/চার শো পাউন্ড। এই দরাজ হিশেব থেকে বোঝা যায়, তিনি এ সময়ে খরচের ব্যাপারে কী রকমের সংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন। হেনরিয়েটাও তাঁর খরচের লাগাম ধরে রাখতে পারেননি। তদুপরি, এই জুন মাসেই কবি এবং হেনরিয়েটা বেশ ভেবে-চিন্তে আরও একটি সিদ্ধান্ত নেন, যা পরবর্তী কালে তাঁদের সর্বনাশের অন্যতম কারণ হয়েছিলো। এই সিদ্ধান্তের কথা তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে জানান এভাবে:

> আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, আমার বেচারী স্ত্রী এবং আমি সম্প্রতি আমাদের অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে করতে কিভাবে রাতের পর রাত অনিদ্রায় কাটিয়েছি। আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমি যদি আপাতত একাই দেশে চলে যাই, তা হলেই ভালো হবে। ওরা আসবে কয়েক মাস পরে

— যতো দিনে আমি আমার প্র্যাক্টিস খানিকটা গুছিয়ে বসতে পারি।[১১২]

কবি এখানে তাঁর মনের সত্যিকার ইচ্ছে বিদ্যাসাগরের কাছে প্রকাশ করেননি। পরে দেখতে পাবো, তিনি অন্তত এই একটি ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অ-সরল ব্যবহার করেছিলেন।

তিনি যতো টাকা চেয়েছিলেন, ততো টাকা জোগাড় করা বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কারণ এই অর্থের পরিমাণ ছিলো তাঁর সম্পত্তির দামের চেয়েও বেশি। কবি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। সে জন্যে পূর্বোক্ত চিঠির শেষে বলেছেন, 'হায়রে, আমাকে এতো টাকা দেবে কে? আপনি যদি ধনী হতেন, তা হলে আমার অবস্থা এতো করুণ হতো না, আমি তো আপনার উদার হৃদয়ের কথা জানি! আপনার কি মনে হয়, আমি যতীন্দ্র ঠাকুরের কাছে একটা চিঠি লিখলে কোনো কাজ হবে?... চেষ্টা করে দেখতে ভয় পাবো কেন?' বিদ্যাসাগরের করুণ হৃদয়ে বাড়তি করুণা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই চিঠির শেষে লিখেছেন: 'আমি আমার স্ত্রীকে বলি, আমি যখন কলকাতায় ফিরে যাবো, তখন আপনি আপনার বাড়ির একটি ছোটো ঘর আমাকে ছেড়ে দেবেন, আর দেবেন আমার বেঁচে থাকার মতো যথেষ্ট পরিমাণে ডাল-ভাত।'[১১৩]

এভাবে মন ভেজাতে চাইলেও, তিনি যতো টাকার জন্যে বায়না ধরেছেন, সেটা জোগাড় করা যে বিদ্যাসাগরের সাধ্যের বাইরে, তা জানতেন বলে জানুআরি মাস থেকে তিনি বিদ্যাসাগরকে টাকা ধার করার একটা বিকল্প পথের কথা বলে আসছিলেন। এ সময়ে তিনি খবর পান যে, বোম্বাই-এর একজন ধনী পারসি ভদ্রলোক তিনজন ছাত্রকে বিলেতে পাঠিয়েছেন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে। সুতরাং তিনি ভাবলেন, যখন ব্যারিস্টারি পড়ছেন, তখন দেশীয় লোক হিশেবে তিনিও সাহায্য পেতে পারেন। নিদেন পক্ষে এই ভদ্রলোক টাকা ধার দিতে রাজি হতে পারেন। বিদ্যাসাগরকে লেখা তাঁর যে-চিঠিগুলো রক্ষা পেয়েছে, তার মধ্যে চারটিতে এই প্রসঙ্গ আছে। মনে হয় প্রথম দিকে বিদ্যাসাগর এতে কোনো উৎসাহ দেখাননি। কিন্তু কবির টাকার চাহিদা বাড়তে থাকায় শেষ পর্যন্ত তিনি এ ব্যাপারে সম্মতি জানিয়ে যে-চিঠি লেখেন, কবি তা পান ১০ জুন তারিখে। এ চিঠি পেয়েই তিনি দেখা করতে যান বোম্বাই-এর নাম-করা পারসি নেতা দাদাভাই নওরোজির (১৮২৫-১৯১৭) সঙ্গে।[১১৪] তিনি কবির সাত বছর আগে লন্ডনে আসেন কামা নামে একটি ভারতীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিশেবে। অল্পকালের মধ্যে তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেতো বটেই, এমন কি স্থানীয় লোকদের মধ্যেও প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হন। ১৮৬৬ সালে লন্ডনে তিনি ভারতীয়দের নিয়ে ঈস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি তৈরি করেন। কবি তাঁর কাছে আরজি পেশ করায় বাস্তববাদী মানুষ দাদাভাই নওরোজি সঙ্গে সঙ্গে তা খারিজ করে দেন। কবির ভাষায় — 'মিস্টার নওরোজি আমার পরিকল্পনার ওপর ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। টাকাপয়সার জগতে এখন যা চলছে, তিনি সে বিষয়ে বললেন। আর বললেন, এ রকম অবস্থায় আমার অনুরোধ গ্রাহ্য হবে না।'[১১৫]

হতাশ হয়ে আট দিন পরে তিনি আর-একটি চিঠি লেখেন বিদ্যাসাগরকে। তিনি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে এতো টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের বুদ্ধিতে তিনি দু বছর আগে সম্পত্তি বিক্রি করার অভিপ্রায় ত্যাগ করেছিলেন। এখন অগত্যা আবার বিক্রির কথা ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু সম্পত্তি বিক্রি করলে লোকে যে হাসাহাসি করবে, এ তিনি জানতেন। তা ছাড়া, বিদ্যাসাগরও তাঁকে লিখেছিলেন যে, তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে এসে যে-পরিমাণ ব্যয় করেছেন, তাতে লোকে হাসাহাসি করছে। তারা আরও বলছে যে, কবিকে এভাবে ডুবতে সাহায্য করছেন বিদ্যাসাগর। কবি তাঁর জবাবে বিদ্যাসাগরকে সান্ত্বনা দিয়ে লেখেন:

আমি জানি, আপনি যদি সম্পত্তি পুরোপুরি বিক্রি করতে বাধ্য হন, তা হলে কোনো কোনো লোক আমাদের

> ঠাট্টা করবে। তারা অট্টহাস্য দিয়ে বলবে, তারা আগেই এটা বলেছিলো। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এতে বিচলিত হবার মতো লোক আপনি নন — আপনি এর চেয়ে শক্ত মনের মানুষ। তা ছাড়া, বিবেচনাবর্জিত আজে-বাজে লোক কী বলছে, তাতে কী আসে-যায়? আপনি এবং আমার অন্য বন্ধুরা যদি এ কাজটা করতে আমাকে সাহায্য করেন, তা হলে আমি ব্যারিস্টার হবার পর চমৎকার একটা পেশা নিয়ে আমার জীবন শুরু করতে পারবো এবং তখন পর্বতের মতো ভারী বিশাল বোঝায় আমার দুর্বল পিঠ ভেঙে পড়ার মতো কোনো ঋণও আমার থাকবে না।

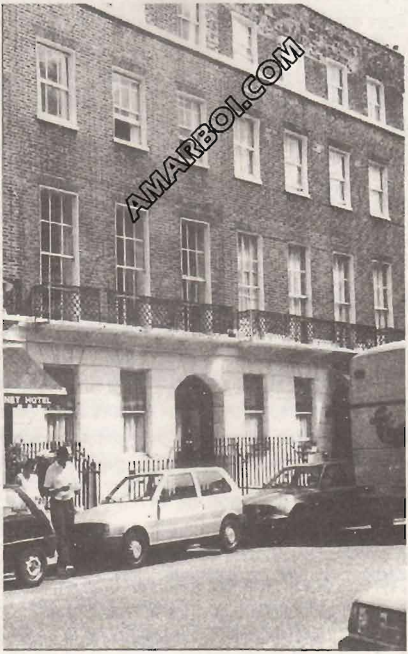
নিজেকেও তিনি সান্ত্বনা দেন এই বলে:

> আমার নিজের সম্পত্তি যা খুশি তাই করার অধিকার আমার আছে। বুদ্ধিমান কোনো লোক বলবে না যে, আপনি আমার ক্ষতি করতে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি যেমনভাবে নতুন করে আমার জীবন শুরু করার কথা ভাবছি, সেভাবে কেউ কাউকে জীবন শুরু করতে সাহায্য করলে, তাকে নিশ্চয় ক্ষতি করা বলে না। অন্য লাখ লাখ মানুষের মতো আমারও ঝুঁকি নিতে হবে বৈকি। তারপর আমার নিজের হৃদয় এবং মনের সামর্থ্য অনুযায়ী হয় আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো, নয়তো ডুবে যাবো। ... তবে আপনি যদি আমার লক্ষ্য হাসিল করার মতো বিরাট অঙ্কের টাকা জোগাড় করতে পারেন, তা হলে তাড়াহুড়ো করে কিছু করা ঠিক হবে না। তেমন অবস্থায় আমি দেশে গিয়ে দেখবো মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কী করা যায়। যদি কোনো উপকারী বন্ধু এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করেন, খুব ভালো কথা, তা না-হলে, আপনি অবশ্যই সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করবেন। আপনি অক্টোবরে অথবা তার আগেই এ সম্পর্কে আমার নির্দেশ জানতে পারবেন।[১১৬]

এর পরের প্রায় পাঁচ মাসের মধ্যে কবির লেখা কোনো চিঠি আমাদের হাতে আসেনি। অপর পক্ষে, তিনি এ সময়ে শেফার্ডস বুশের বাড়ির সব ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে লন্ডনের কেন্দ্রে নতুন বাড়িতে উঠে আসেন। তিনি এ সময়ে গ্রেজ ইনের অনেক টাকার বকেয়া বেতনও চুকিয়ে দেন। তারপর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেন নির্ধারিত ৭২টি ডিনার খাবার আগেই তাঁকে ব্যারিস্টারির সনদ দেবার জন্যে 'বারে' আহ্বান জানানোর। তিনি ডিনার খেয়েছিলেন মোট ৬০টি — অর্থাৎ গ্রেজ ইনে দুটি টার্ম কম ছিলেন। তাঁর আবেদন অনুযায়ী যথাসময়ে বারে তাঁর ডাকও পড়ে। এই ডাক পড়ে মিকেলমেস টার্মের মাঝামাঝি সময়ে — ১৭ নভেম্বর (১৮৬৬)।[১১৭] এসব থেকে বোঝা যায়, জুন মাসের চিঠি পেয়ে বিদ্যাসাগর কবির চাহিদা মতো না-হলেও, যথেষ্ট পরিমাণে টাকা পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের কাছে চক মুনকিয়া এবং গদার ডাঙ্গা তালুক বন্ধক দেবার কাজ সম্পন্ন করেন। এবারেও বিদ্যাসাগর হিশেবী বুদ্ধি এবং হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিয়ে সম্পত্তি বিক্রি না-করে বন্ধক দেবার ব্যবস্থা করেন।

বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে কবি ঠিক কতো টাকা পেয়েছিলেন, আগেই বলেছি, সুনির্দিষ্টভাবে তা বলা যায় না। কিন্তু তিনি যে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট টাকা পেয়েছিলেন তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ আছে। আমরা আগের আলোচনায় একাধিক বার লক্ষ্য করেছি, যখনই অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেছেন, তখনই তিনি ভালো বাড়ি ভাড়া করতেন। লন্ডন বাসের শেষ দু মাসের জন্যে তিনি কেন্দ্রীয় লন্ডনে যে-বাড়ি ভাড়া করেন, শেফার্ডস বুশের বাড়ির সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না। শেফার্ডস বুশ কেমন গ্রাম্য এলাকা ছিলো, ইতিমধ্যে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। সেই এলাকার যাঁরা বাস করতেন, তাঁরা কেউ ইঁট তৈরি করতেন, কেউ মদ তৈরি করতেন, কেউ ঘর সাজানোর ছোটোখাটো কাজ করতেন। কবির পাশের বাড়িতে — ১৩ নম্বরে — থাকতেন হেনরি উডস, ছোট্টো শেফার্ডস বুশ স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার। ১৫ নম্বরে থাকতেন জন স্টিফেনশন। তাঁর পেশা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু মাইকেল যে-বাড়িতে থাকতেন, ১৮৬১ সালের সেন্সাস থেকে দেখা যাচ্ছে, সেখানে বিরাট পরিবার নিয়ে যে-ভদ্রলোক বাস করতেন — উইলিয়াম ডে, তাঁর পেশা ছিলো রুটি-বিস্কুট-মিষ্টি তৈরি করা।[১১৮]

অপর পক্ষে, মিসেস জুপের কাছ থেকে কবি রাসেল স্কোয়ারের গায়ে-লাগানো ৭ নম্বর বেডফোর্ড প্লেসে যে-বাড়ি ভাড়া নেন, সে রীতিমতো উচ্চ মধ্যবিত্তের এলাকা। এই রাস্তার ৯ এবং ১০ নম্বর বাড়িতে থাকতেন দু জন সার্জন। ১১ এবং ২২ নম্বর বাড়িতে থাকতেন দুজন ধর্মযাজক। ৪ এবং ১৮ নম্বর বাড়িতে থাকতেন দুজন সলিসিটর। ২৩ নম্বর বাড়িতে থাকতেন একজন হীরা এবং মুক্তা ব্যবসায়ী। ২৫ নম্বর বাড়িতে বাস করতেন একজন ডাক্তার।[১১৯] কবির এই বাড়ি থেকে ব্রিটিশ মিউজিয়মের সদর দরজার দূরত্ব দু শো গজও নয়। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য, তিনি এই বাড়ি ভাড়া নেবার ১২ বছর পরে তরুণ রবীন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়ার সময়ে যে-বাড়িতে থাকতেন, ৭ নম্বর বেডফোর্ড প্লেস থেকে সে বাড়ি চার-পাঁচ মিনিটের পথ।[১২০] রাসেল স্কোয়ারের এই বাড়ির সঙ্গে আগের বাড়ির আর-একটা মস্তো পার্থক্য এই যে, শেফার্ডস বুশের বাড়ি ছিলো কলেজ থেকে সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে, আর এ বাড়ি কলেজের একেবারে কাছে — মাত্র কয়েকটা রাস্তা দূরে। মোট কথা, সাড়ে তিন বছর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করার পর তিনি লন্ডনবাসের একেবারে শেষ দিকে পছন্দসই এলাকায় থাকার সুযোগ পেয়ে-ছিলেন। তবে এটা সম্ভব হয়েছিলো বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যের ফলে, সে কথা বলা বাহুল্য।



রাসেল স্কোয়ারের যে-বাড়িতে মাইকেল থাকতেন - ৭ নম্বর বেডফোর্ড প্লেস

বিদ্যাসাগর তাঁর জন্যে যা করেছিলেন, তার প্রতি কবির সচেতনতা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় এ সময়ের প্রতিটি চিঠিতে। ১৭ নভেম্বর শুক্রবার রাতের বেলায় তাঁর ডাক পড়েছিলো গ্রেজ ইন সোসাইটির বারে। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে সে সময়ে ব্যারিস্টার হিশেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সুখের খবর তিনি অন্য কোনো বন্ধুকে নয়, সবার আগে জানিয়েছেন বিদ্যাসাগরকে। পরের দিন তিনি বিদ্যাসাগরকে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তাতে বলেছেন:

> প্রিয় বন্ধু,
>
> আমি নিশ্চিত আপনি জেনে দারুণ খুশি হবেন যে, গত রাতে গ্রেজ ইন সোসাইটি আমাকে বারে ডেকে পাঠিয়েছিলো এবং আমি অবশেষে ব্যারিস্টার হয়েছি। এর সব কিছুর জন্যে আমি ঋণী প্রথমে ঈশ্বর এবং তাঁর নিচে আপনার কাছে। এবং আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আমি চিরদিন আপনাকে আমার সবচেয়ে বড়ো উপকারী এবং সবচেয়ে খাঁটি বন্ধু বলে বিবেচনা করবো। আপনি না-হলে আমার যে কী হতো! ... প্রিয় বিদ্যাসাগর, আমি জানি আপনি ছাড়া আমার কোনো বান্ধব নেই'

কবির যেমন অনেক ভালো বন্ধু ছিলেন, তেমনি লোককে শত্রুতে পরিণত করারও তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো। যে-ক্ষেত্রমোহন দত্তকে এক সময়ে তিনি তাঁর বাড়িতে অতিথি রেখেছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে অতো প্রশংসা করেছিলেন, সেই ক্ষেত্রমোহন গ্রেজ ইন সোসাইটির কাছে কবির চরিত্র এবং অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করে অভিযোগ করতে চেয়েছিলেন।[১২১] তিনি যে তাঁর নিন্দা রটাচ্ছিলেন এবং শত্রুতা করছিলেন, কবি সে সম্পর্কে জানতেন। সে জন্যে বিদ্যাসাগরকে এই ঘটনার কিছু কাল আগে লেখা একটি চিঠিতে তিনি ক্ষেত্রমোহনের বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন।[°] সেই সূত্র ধরে এবারের চিঠিতে লেখেন: 'সেই পাজিটা (আমার সম্পর্কে) গ্রেজ ইন সোসাইটিতে লিখবে বলে একেবারে সংকল্পবদ্ধ ছিলো। তবে আমাদের সবার সৌভাগ্যক্রমে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে ভয় দেখিয়ে তার কুমতলব থেকে সরিয়ে রাখে। আমি এই নোংরা বদমাশটার মতো এতো সংকীর্ণমনা, এতো নিচ, এতো নীতিহীন, এতো 'পরশ্রীকাতর' কোনো বাঙালিকে জানিনে।'[১২২] তাঁর এই তিক্ততার কারণ বোঝা কঠিন নয়। তাঁর পরে অনেক বাঙালি ব্যারিস্টার হয়েছেন। কিন্তু কাউকে তাঁর মতো বিপরীত স্রোতে সেই পথে যেতে হয়েছে বলে মনে হয় না। পরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতার হাই কোর্টে তিনি অ্যাটর্নি হিশেবে প্র্যাক্টিস করার অনুমতিও সহজে লাভ করতে পারেননি। কিন্তু তিনি নিজে ব্যারিস্টার হবার ঘটনাকে গণ্য করেছিলেন প্রতিকূল ভাগ্যের বিরুদ্ধে একটা বড়ো রকমের বিজয় বলে। তিনি জানতেন ইংল্যান্ডে তিনি ব্যারিস্টার হিশেবে প্র্যাক্টিস করবেন না। তা সত্ত্বেও, অনেকটা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যারিস্টার হবার তিন দিন পরে তিনি লন্ডনে ইংলিশ ব্যারিস্টারদের তালিকায় নিজের নাম লেখান।[১২৩] কতো আশা, কতো আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি এ সময়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছিলেন, সেটা অনুমান করা অসম্ভব নয়। কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ নয়, তিনি নিশ্চয় আশা করেছেন, অতঃপর তিনি সেই ভোগবিলাসের অধিকারী হতে পারবেন, চিরকাল যা কেবল স্বপ্নে দেখেছেন, কিন্তু বাস্তবে যা কখনো উপভোগ করার সুযোগ পাননি।

ব্যারিস্টার হবার পর কবি দেশে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হন। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনা মতো, হেনরিয়েটা এবং সন্তানদের য়োরোপে রেখে যাবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। ব্যারিস্টার হয়ে — আপাত-দৃষ্টিতে ভাগ্য খুলে যাবার ব্যবস্থা করে — কলকাতায় ফেরার পর তাঁর জীবনে সমৃদ্ধির পরিবর্তে যে-করুণ ট্র্যাজেডি নেমে এসেছিলো, যথাসময়ে দেখতে পাবো, তার একটা কারণ ছিলো পরিবার য়োরোপে রেখে যাবার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। পরিবার য়োরোপের রেখে যাবার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর তাঁকে ঠিক কী ভাষায় লিখতেন, তা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বিদ্যাসাগরকে অস্পষ্ট উত্তর দিতেন। অপর পক্ষে, ১৮৬৫ সালের গোড়ার দিকে একটি চিঠিতে তিনি গৌরদাস বসাককে স্পষ্ট লিখেছিলেন যে,

তিনি পরিবার য়োরোপে রেখে যাবেন। কিন্তু একই সময়ে এবং পরবর্তী কালেও তিনি বিদ্যাসাগরকে এমনভাবে লিখেছেন যেন তিনি পরিবার রেখে যেতে চান না। পরিবার রেখে যাবার পক্ষে তিনি গৌরদাসের কাছে যে-যুক্তি দিয়েছেন, তা হলো: এর ফলে সন্তানরা য়োরোপীয় হয়ে উঠবে। তাঁর সন্তানরা যে দ্রুত ফরাসি ভাষা শিখছে, তাতে তিনি উচ্ছ্বসিত এবং গর্বিত হয়েছেন।[১২৪] ব্যারিস্টার হিশেবে পাকাপোক্ত হবার আগে পর্যন্ত কয়েক মাসের জন্যে পরিবার য়োরোপে রেখে যেতে চান বলে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে যে-চিঠি লিখে-ছিলেন, তার মধ্যে আসলে পুরো সত্য প্রকাশ পায়নি।[১২৫] তা ছাড়া, তিনি এবং হেনরিয়েটা এ সিদ্ধান্ত তখনই নিয়েছেন বলে যে-মন্তব্য করেছিলেন, তা-ও সঠিক নয়। স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করার আগে পরিবার রেখে যাবার যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন তিনি কি বিবেচনা করে দেখেছিলেন যে, এর ফলে স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের বিরহ হবে? অথবা এর জন্যে অর্থ ব্যয়ও হবে প্রচুর? তদুপরি যখনকার কথা বলছি (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৬৬) তখন আবার হেনরিয়েটা চার-পাঁচ মাসের গর্ভবতী। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এবং সহায়হীন পরিবেশে গর্ভবতী স্ত্রী এবং যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বছরের দুটি শিশুকে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে কাণ্ডজ্ঞানহীন না-বলে পারা যায় না। এতো মূল্য দিয়ে তিনি কী অর্জন করতে চেয়েছিলেন, সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু তিনি ঝোঁকের মাথায় এ সিদ্ধান্ত নেননি। স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে অনেক চিন্তাভাবনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ব্যারিস্টারি পাশ করার পর কবি লন্ডনে আট-দশ দিনের বেশি ছিলেন বলে মনে হয় না। এ থেকেও ইংল্যান্ডের সমাজের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা চোখে পড়ে। যে-লন্ডনে এতো কষ্ট করে ছিলেন, এখন নির্ভাবনায় সেখানে কিছুদিন বাস করে সময়টা উপভোগ করতে পারতেন। কিন্তু তা না-করে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবার যাত্রা করলেন ভার্সাইয়ের দিকে, আপাতদৃষ্টিতে যে-ভার্সাই তাঁকে কোনো বিশেষ সুখ অথবা সম্মান দিতে পারেনি। কিন্তু তিনি যে তাঁর পরিবার সেখানেই রেখে গেলেন, তা থেকে মনে হয় দারিদ্র্য জর্জরিত এবং পাওনাদারদের হাতে নিগৃহীত হলেও ভার্সাই তাঁর মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। সেখানে আগের বার বাড়ি ভাড়া করেছিলেন নিতান্ত গরিবদের পাড়ায়, গরিবদের সঙ্গে। কিন্তু মনে মনে তিনি সারাক্ষণই বাদশাহী খোয়াব দেখতেন। অনেক সময় তিনি পড়ে থাকতেন রাজপ্রাসাদের উদ্যানে। এবারে তিনি ব্যারিস্টার। কলকাতায় গেলে তিনি হাজার হাজার টাকা আয় করবেন। এখন আর পঁচিশ ফ্রাঁর জন্যে কোনো পাদ্রির কাছে হাত পাততে হবে না। তিনি সেখানকার যে-কারো সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সমর্থ। তা ছাড়া, একদিন যারা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেনি, চরম অভাবের দিনে উপহাস করেছে, তাদেরও দেখিয়ে দিতে চান, তিনি সমাজের কোন তলার মানুষ। সুতরাং এবারে তিনি বাড়ি ভাড়া নিলেন রাজ-প্রাসাদের পেছনে যে-পুকুর আছে তারই পাশে, প্রাসাদের খিড়কির দরজার ঠিক পরে — ৫ নম্বর মোরপা সড়কে। রাজবাড়ি সম্পর্কে তাঁর মনে একটা মোহ এবং আবেশ ছিলো। এতো জায়গা থাকতে তিনি যে দ্বিতীয় বার ভার্সাইতেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন, তা থেকেও এই মোহ প্রকাশ পায়।

ব্যারিস্টার হবার অব্যবহিত পরে তিনি বিদ্যাসাগরকে জানিয়েছিলেন যে, মার্সেই বন্দর থেকে রওয়ানা করবেন ১৯ জানুআরি (১৮৬৭)।[১২৬] কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি যখন আবার চিঠি লেখেন, তখন যাবার সময়টা দু সপ্তাহ এগিয়ে আনেন। এবারে জানান, তিনি যাত্রা করতে চান ৫ জানুআরি — যদি কিনা তার আগে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে টাকা পান। যাবার খরচ এবং হেনরিয়েটাকে দিয়ে যাবার জন্যে টাকার দরকার ছিলো। তিনি বিদ্যাসাগরকে জানিয়েছিলেন, যেতে লাগবে প্রায় দু শো পাউন্ড আর হেনরিয়েটার জন্যে ব্যাংকে রেখে যেতে চান দু শো পাউন্ড।[১২৭]

ব্যারিস্টার হয়ে তিনি তাঁর পিতার সম্মান রক্ষা করবেন – চার বছর আগে লন্ডনে পৌঁছে তিনি তেমন সংকল্পের কথা মন খুলেই বলেছিলেন। তা ছাড়া, পরিচিত এবং বন্ধুদের দেখাবেন, দু হাতে আয় করবেন – ইত্যাদি অনেক অভিপ্রায় তাঁর মনে ছিলো। কিন্তু ভার্সাইতে যাবার অব্যবহিত পরেই কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারলেন না। তিনি চাইলেন আসন্ন বড়ো দিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিনটি পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে যেতে। ৯ ডিসেম্বরের (১৮৬৬) চিঠিতে পরিবার পেছনে রেখে যাবার কারণ ব্যাখ্যা করেন এভাবে:

> আমার মনে হয়, আমি যতো দিন না কলকাতায় ভালো করে গুছিয়ে বসতে পারি, ততোদিন আমার পরিবার এখানেই রেখে যাওয়া উচিত হবে। ফ্রান্সে জীবন ধারণ করা শস্তা এবং আমার আশঙ্কা হচ্ছে, একজন ব্যারিস্টারের মানানসই জীবনযাত্রা আমি শুরু করতে পারবো না যদি না আপনি আমার জন্যে যতো টাকা জোগাড় করতে পারবেন তার চেয়ে বেশি টাকা পাই। একা আমি যেখানে খুশি এবং যেমন খুশি থাকতে পারি; কিন্তু স্ত্রী এবং সন্তানরা থাকলে ব্যাপারটা বদলে যাবে। আশা করি আপনি মনে করবেন না যে, আমি আপনার উপদেশ হাল্কাভাবে নিতে পারি; কিন্তু য়োরোপে বাস করা বেশি খরচের ব্যাপার বলে আপনি যে-ধারণা করেছেন, তা ভুল। আমার এই দাবি আপনার কাছে যেমন অবিশ্বাস্যই মনে হোক না কেন, আমি বলতে পারি, অনেক ব্যাপারে সারা পৃথিবীর মধ্যে য়োরোপে জীবন ধারণ সবচেয়ে শস্তা।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে তিনি একবারও উল্লেখ করেননি যে, য়োরোপীয় করে তুলতে চান বলে সন্তানদের য়োরোপে রেখে যাচ্ছেন। এ কথা শুনলে বিদ্যাসাগর কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন, তিনি তা ভালো করে জানতেন। মনের কথা তাঁর কাছে খুলে বলার সাহস হয়নি। তা ছাড়া, খরচের ব্যাপারেও তিনি যা বলেছেন, তা ঠিক নয়। এই চিঠির একেবারে শেষ দিকে তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, 'আমি যেমনটা হিশেব করেছিলাম, দেখতে পাচ্ছি আমার তার চেয়ে বেশি ব্যয় হচ্ছে।'[১২৮] তাঁর এ উক্তি স্ববিরোধী। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে এ কথা না-বলে উপায় ছিলো না – কারণ, তিনিই টাকা পাঠাচ্ছিলেন কলকাতা থেকে।

ব্যারিস্টার হলে তাঁকে অন্যদের তুলনায় একেবারে ভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে – এ ধারণা তিনি কোথায় পেয়েছিলেন, বলা মুশকিল। তবে আইনজীবী পিতার পরিবারে অর্থস্বাচ্ছন্দ্য এবং কলকাতার ব্যারিস্টারদের আয়ের পরিমাণ দেখে তাঁর এ ধারণা হওয়া সম্ভব। তদুপরি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর কলকাতা থেকে লন্ডনে বন্ধুদের জানিয়েছিলেন যে, তিনি রোজ কুড়ি পাউন্ড বা দু শো টাকা কামাই করছেন। মাসে ছ হাজার টাকা আয় হলে জীবনযাত্রা কেমন হতে পারে – কবি তা হিশেব করে দেখেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা ছিলো না। তিনি নিজেকে তাঁর চেয়ে বড়ো মনে করতেন। ওদিকে, মনোমোহন ঘোষকে তিনি আন্তরিকভাবে স্নেহ করলেও তাঁর মেধা সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো মোহ ছিলো না। ব্যারিস্টার হিশেবে তিনি যে এঁদের ছাড়িয়ে যাবেন – এটা চিন্তা করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এবং বড়ো ব্যারিস্টার হিশেবে তাঁর আয়ও হবে বেশি – এও তিনি ভেবে থাকবেন।

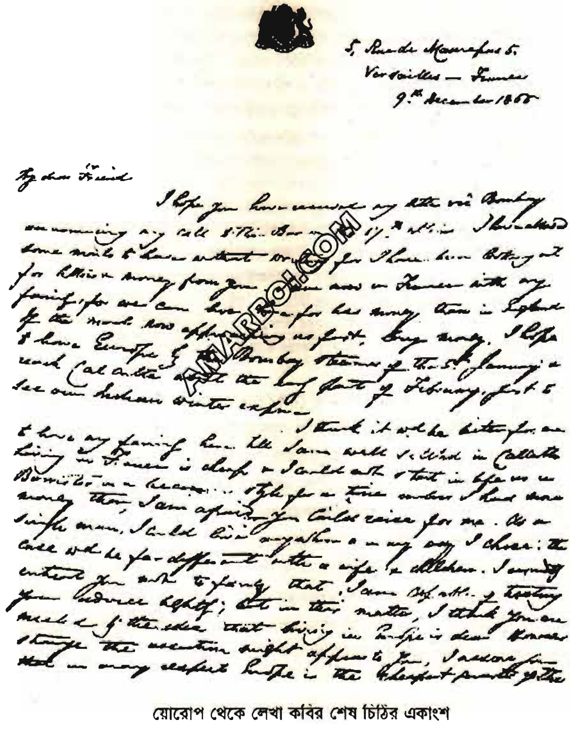
বস্তুত, কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় যতো ঘনিয়ে এসেছে এবং শারীরিকভাবে তিনি কলকাতার যতো কাছে এগিয়ে গেছেন, ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা ততোই গোলাপি হতে থাকে। আমরা আগেই তাঁর একটি চিঠিতে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি এক সময়ে মনে করেছিলেন, কলকাতায় ফিরে যাবার পর বিদ্যাসাগর তাঁকে তাঁর একটি কক্ষ ছেড়ে দেবেন আর দেবেন পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাল-ভাত। তার জন্যেই তিনি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায়। ভার্সাই থেকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিতে দেখা যায়, তাঁর প্রত্যাশাকে তিনি কতোটা প্রশস্ত করেছিলেন:

> আমি যখন কলকাতায় যাবো, তখন একটা বাড়ির উপরতলা ভাড়া করতে চাই। নিচের তলায় থাকবে

অ্যাটর্নির অথবা ঐ জাতীয় কোনো অফিস। কয়েকটি কক্ষ সুন্দর করে সাজাতে চাই। যতো দিন না মামলা আসতে শুরু করে, ততো দিন সেখানে বাস করবো একজন বাবুর্চি আর খিদমতগারকে নিয়ে।[১২৯]

কার্যকালে দেখতে পাবো, কলকাতায় পৌঁছে তিনি ওপরতলার ঘর নিয়েও সুখী থাকতে পারেননি। নিজের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ততো দিনে আরও ফেঁপে উঠেছিলো।

কবির চিঠিগুলো পড়লে অনেক জায়গায় দেখা যায়, তিনি জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে উল্লেখ



য়োরোপ থেকে লেখা কবির শেষ চিঠির একাংশ

করেছেন — অতো দিন যদি বাঁচি ইত্যাদি। এভাবে বলা তাঁর একটা ভঙ্গি ছিলো, নাকি তিনি সত্যি সত্যি জীবনের অনিত্যতা নিয়ে অতো ভাবিত ছিলেন, বলা শক্ত। ভার্সাই থেকে দেশের উদ্দেশে যাত্রা করার আগে বিদ্যাসাগরকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিতে তিনি তাঁর অবর্তমানে তাঁর সম্পত্তি কে কতোটা

পাবে, সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। বলতে গেলে এ চিঠিটি ছিলো তাঁর অনানুষ্ঠানিক উইল। তখন জাহাজে চলাচল করা এখনকার মতো নিরাপদ ছিলো না ঠিকই, কিন্তু তিনি যেভাবে বিদ্যাসাগরকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে মনে হয় তাঁর ভেতরে এই নিরাপত্তাহীনতা একটু বেশি মাত্রায় ছিলো।

> এবারে আমি অনেক গুরুতর একটি বিষয়ের দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমার বলার বোধ হয় কোনো প্রয়োজন নেই যে, আপনি আমার একমাত্র বন্ধু। আমি অচিরে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করতে যাচ্ছি। জীবন অনিশ্চিত। 'জীবিত অবস্থায়ও আমরা মৃত্যুর মধ্যে আছি।' আমার যদি কিছু হয়, তা হলে আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা আপনি ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারবে না। আমি মারা গেলে আপনি আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে আমার সত্যিকার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বাকি টাকা এখানে আমার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন এবং তাঁরা কী করবে — সে বিষয়ে নির্দেশ দেবেন। আমি নিশ্চিত যে, আপনি আপনার নিজের ছোটো ভাই-এর বিধবা স্ত্রী এবং সন্তানদের প্রতি যে দৃষ্টি রাখতেন, আমার স্ত্রীর দিকেও সমান সহানুভূতি রাখবেন। যাদের রেখে গেলাম, আপনাকে অবশ্যই তাদের বন্ধু এবং অভিভাবক হতে হবে।
>
> আমার মনে হয় না আপনি জানেন যে, বই থেকে আমার বেশ আয় হয়। এই আয় বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। আমি সেই আয় ফ্রান্সের ভার্সাইনিবাসী মাদমোজেল হেনরিয়েটা এলাইজা শর্মিষ্ঠা দত্ত এবং তার উত্তরাধিকারীদের দিয়ে যেতে চাই। আর আপনি এবং আপনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আমার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব নেবেন। আপনি এবং আপনার সঙ্গে যুক্ত অন্য ব্যক্তিরা হবেন এই দানের ট্রাস্টি। এই সন্তানের মৃত্যু হলে এই দানের ভাগী হবে মাস্টার ফ্রেডারিক মাইকেল মিল্টন দত্ত এবং তার উত্তরাধিকারীরা। এই শেষোক্ত সন্তানের মৃত্যু হলে এই দানের উত্তরাধিকারী হবে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমার স্ত্রী অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সফাইয়া দত্ত এবং তার পর আমার অন্য উত্তরাধিকারীরা। আমি কলকাতা পৌঁছার আগে আমার মৃত্যু হলে আমার দানপত্র অবশ্যই এই চিঠির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করতে হবে। আপনি এবং অন্য ট্রাস্টিরা এই অর্থ হে. অ্যা. শ. দত্ত অথবা ফ্রে. মা. মি. দত্তের শিক্ষার খরচ অথবা আমার স্ত্রীর ব্যয়ের জন্যে য়োরোপে পাঠিয়ে দেবেন। আমি একা হলে ভাবতাম না। কারণ আমি ভীরু নই। কিন্তু অসহায় স্ত্রী এবং সন্তান রেখে যাওয়া অনেক গুরুতর ব্যাপার।[১৩০]

এই চিঠি থেকে কবির তখনকার মনের অবস্থা বেশ বোঝা যায়। এক দিকে তাঁর মনে তখন ব্যারিস্টার হিশেবে নতুন করে জীবন শুরু করার রঙিন স্বপ্ন জাল বুনেছিলো, অন্য দিকে পরিবারের জন্যে পিছু টান এবং অনিশ্চয়তা বোধ মনকে কাতর করেছিলো। ব্যারিস্টার হয়ে তিনি অনেক টাকা আয় করবেন, বড়ো লোক বলে সমাজে মর্যাদা লাভ করবেন, এবং, তার চেয়েও বড়ো কথা, জীবনকে উপভোগ করবেন — এ বিষয়ে তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন বলে মনে হয় না। তবে চায়ের কাপ এবং ঠোঁটের মধ্যেও ব্যবধান অনেক — এ তিনি ভালো করে জানতেন। আগের কয়েক বছরের, এমন কি, তাঁর সারা জীবনের স্বপ্নভঙ্গের অনেক অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি এ সত্য অনুভব করেছিলেন। সে জন্যে, বিদ্যাসাগরের কাছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার কথা প্রকাশ করেছেন: নিজের কাছ থেকে আমি এ কথাটা গোপন করতে পারিনে যে, এই পেশায় প্রবেশ করার জন্যে আমি নিজেকে প্রায় ভিখিরি করে ফেলেছি। অতঃপর দেখা যাক 'এ বৃক্ষে কি ফল ফলিবে।'[১৩১]

৬

কি ফল লভিনু হায়

'আমার পদমর্যাদার জন্যে কতোগুলো জিনিশ দরকার এবং তার জন্যে কিছু বিসর্জনও প্রয়োজন।'[১] 'শিগগিরই আমার আবার টাকার টানাটানিতে পড়তে হবে। গাড়ি ভাড়া বাবদে রোজ আমার অনেক টাকা ব্যয় হচ্ছে। তা ছাড়া, আমার ভৃত্যরা মার্চ মাসের বেতন চাইছে। হোটেলের বিল অবশ্য এ মাসের শেষ অবধি ফেলে রাখা যাবে। হে ঈশ্বর, আমার কী হবে?'[২] পদমর্যাদার কথা কবি লিখেছিলেন বিলেতে থাকার সময়ে। কিন্তু যেমনটা ধারণা করেছিলেন, তার চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেন কলকাতায় ফেরার মাত্র দু মাস পরে।

বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে যথাসময়ে টাকা পেয়ে জানুআরি মাসের (১৮৬৭) পাঁচ তারিখে ফ্রান্সের মার্সেই বন্দর থেকে তিনি ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ফেরার জন্যে। ততোদিনে তিনি রীতিমতো কল্পনার জাল বুনতে আরম্ভ করেছিলেন — দেশে ফিরে ব্যারিস্টার হিশেবে কাজ শুরু করবেন, সম্মান এবং খ্যাতি লাভ করবেন; আর সেই সঙ্গে দু হাতে টাকা রোজগার করবেন। সেই মুহূর্তে সরাসরি কলকাতার কোনো জাহাজ ছিলো না। অগত্যা তাই যাত্রা করেন বোম্বাই-এর জাহাজে। তারপর বোম্বাই থেকে কলকাতায়। জাহাজের যাত্রীদের তালিকা থেকে তাঁর কলকাতায় পৌঁছানোর তারিখ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেকালের বেশির ভাগ যাত্রী-তালিকা পূর্ণাঙ্গ হতো না। তাই তাঁর নাম খুঁজে পাইনি।

তিনি ঠিক কবে কলকাতায় পা রেখেছিলেন সেই তারিখটার চেয়েও যা জরুরী তা হলো: এ সময়ে তাঁর মনোভাব। তিনি বিলেত-ফেরত। ব্যারিস্টার। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন, এতো দিন জীবনকে উপভোগ করার জন্যে যে-রঙিন স্বপ্ন বুনছিলেন, এবারে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সোনালি সুযোগ একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বিশপস কলেজে পড়ার সময়ে মাঝেমধ্যে তিক্ততা হলেও পিতা তাঁকে বেশ দরাজ হাতে টাকা দিতেন। পিতা টাকা দেওয়া বন্ধ করার পর থেকে কুড়ি বছর ধরে নিরন্তর আর্থিক অনটনের সঙ্গে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে। অচিরে অনটনের হাত থেকে রক্ষা পাবেন — এটা চিন্তা করে তিনি উল্লসিত বোধ করেন। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা নীল-নকশা এঁকে ফেলেন: নগরীর সবচেয়ে অভিজাতদের পাড়ায় তিনি বাস করবেন। ভালো গাড়ি হাঁকাবেন। খানসামা, খিদমদগারের দ্বারা পরিবৃত থাকবেন। রাজপথ দিয়ে তিনি যখন চলাফেরা করবেন লোকেরা যেন তাঁকে দেখে দূর থেকে সম্মান জানান আর তাঁর বিলাসিতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

য়োরোপ থেকেই তিনি সংকল্প করে এসেছিলেন: তাঁকে একজন ব্যারিস্টারের উপযুক্ত জীবন যাপন করতে হবে। কিন্তু 'আপনি আমার জন্যে যে-টাকা ধার করতে পারবেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তার

চেয়ে বেশি টাকা না-পেলে আমি অন্তত কিছু কালের জন্যে শানশওকতের সঙ্গে ব্যারিস্টারের জীবন শুরু করতে পারবো না।'[৩] একজন ব্যারিস্টারের জন্যে মানানসই জীবন শুরু করতে পারবেন না — ডিসেম্বর মাসে (১৮৬৬) এ আশঙ্কা প্রকাশ করলেও, মাত্র দু মাস পরে তিনি যখন কলকাতায় পা রাখলেন, তখন আর এ জীবন শুরু করার ব্যাপারে কোনো বিলম্ব সহ্য করতে পারছিলেন না। সেই মুহূর্তে তিনি ছিলেন — যাকে পোশাকী ভাষায় বলে — রিক্তহস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথমেই নিজের থাকার জায়গা ঠিক করলেন কলকাতার সবচেয়ে ব্যয়বহুল স্পেন্সেস হোটেলে। গভমেন্ট হাউসের অদূরে অবস্থিত কলকাতার এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ হোটেলটি নির্মিত হয়েছিলো ১৮৩০ সালে। এই হোটেলে ওঠার পেছনে তাঁর যুক্তি ছিলো, একজন ব্যারিস্টার হিশেবে তিনি যে-সে পাড়ায় অথবা যে-সে জায়গায় বাস করতে পারেন না।

মাদ্রাসে অজ্ঞাতবাস শেষে তিনি যখন কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তখনও তাঁর হাত একেবারে রিক্ত ছিলো। তিনি ভবিষ্যৎকে তখন দেখতে পাচ্ছিলেন অনিশ্চিতভাবে। সেবার প্রথম কিছু কাল থাকতে হয়েছিলো বন্ধুদের বাড়িতে। নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্যে নিতে হয়েছিলো পুলিশ অফিসে কনিষ্ঠ কেরানির চাকরি — তাও এক বন্ধুর সৌজন্যে। তাঁর মতো অতো বড়ো একজন বিদ্বান এবং যোগ্য ব্যক্তিকে কেউ যে তখন যথোচিত আসনটি দিতে পারেনি — চিন্তা করে বাঙালি সমাজকে অনুকম্পা করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। সেবারে তিনি বাড়ি ভাড়া করেছিলেন লোয়ার চিৎপুর রোডে। ছ নম্বর বাড়ি। (১৮৬১ সালের মাঝামাঝি তিনি এই বাড়ি ছেড়ে দিলে এ বাড়িতে বাস করতে আসেন এ. মার্টিন — জাহাজ থেকে মাল খালাশ করা যার পেশা। কোথায় 'মহাকবি' মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর কোথায় এ. মার্টিন!) বাড়িটি মন্দ না-হলেও, সে পাড়াটাকে ভদ্রলোকদের পাড়া বলে গণ্য করা শক্ত। পাঁচ নম্বর বাড়িটি ছিলো ব্রজনাথ মিত্রের সোডা এবং লেমনেড তৈরির দোকান। অন্য পাশে সাত নম্বরে অল্পদিন আগেও ছিলো ঘোড়া আর গাড়ি ভাড়া দেবার দোকান। দশ এবং এগারো নম্বর তখনো গাড়ি আর ঘোড়া ভাড়া দেওয়ার দোকান। এ ছাড়া, তৈরি কাপড়-চোপড় এবং নানা ধরনের দোকান সেই রাস্তায়।[৪] বেশির ভাগ বাসিন্দাই হিন্দুস্তানী। দুর্ভাগ্যক্রমে এ হেন পাড়ায় তাঁকে সে সময়ে বাস করতে হয়েছিলো। এবারেও তাঁর হাতে যে টাকা আছে, তা নয়। তবে জানেন, এবারে ব্যারিস্টার হিশেবে তিনি অনেক অর্থ আয় করবেন। একজন সফল আইনজীবীর আয় কতো বাল্যকালে নিজেদের বাড়িতেই তিনি তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তা ছাড়া, তিনি আরও জানেন, বড়োবাজার এবং চোরবাজারের গদি আগলে যারা বসে আছে, তাদের অনেকের টাকা থাকলেও তারা তা ঠিকমতো ব্যয় করতে জানে না। তিনি দেখিয়ে দেবেন: কী করে টাকা ব্যয় করে য়োরোপের লোকদের মতো পরিচ্ছন্ন এবং বিদগ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। স্পেন্সেস হোটেলে তিনি যেন সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে উঠলেন। অথচ এর মাত্র দু মাস আগে লিখেছিলেন যে, তিনি এমন একটা বাড়ি ভাড়া নেবেন, যার ওপর তলায় তিনি থাকবেন, আর নিচের তলায় থাকবে তাঁর অফিস।

ওদিকে, মাইকেল ফিরে এসে স্পেন্সেস হোটেলে উঠেছেন — এই খবর পেয়ে প্রিয় বন্ধু বিদ্যাসাগর — কবির ভাষায়, ঈশ্বরের পরই যিনি তাঁকে তাঁর দুঃস্বপ্নের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য দিয়েছিলেন — সেই বিদ্যাসাগর এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করতে এলেন বললে ভুল হয়, এলেন তাঁকে বরণ করতে। এর মাত্র সাত সপ্তাহ আগে — ১৪ ডিসেম্বর (১৮৬৬) তারিখে মেরি কার্পেন্টারের সঙ্গে উত্তরপাড়া থেকে ফেরার সময়ে গাড়ি উল্টে গিয়ে তিনি নিজে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন।[৫] তখনো তিনি সে আঘাত পুরো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। (সত্যি বলতে কি, তিনি কোনো দিন আর পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেননি।) তবু তিনি অধীর হয়েছিলেন ব্যারিস্টার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। আর দুঃসময়ের বন্ধুকে দেখে কবিও কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা এবং প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হন।

তাঁকে জড়িয়ে ধরে অজস্র বার মুখ চুম্বন করেন। বিব্রত বিদ্যাসাগর তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ না-হয়ে পারেননি। যে-দুস্তর বাধা অতিক্রম করে কবি শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টার হতে পেরেছিলেন, তাতে তাঁর অবদান কম ছিলো না। কবির কৃতিত্ব এবং সাফল্যকে তিনি অনেকটা নিজের কৃতিত্ব এবং সাফল্য বলে গণ্য করে থাকবেন। সেই বিজয়ী এবং খ্যাতিমান বন্ধুর জন্যে তিনি তাঁর অনুগত সুহৃদ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৩ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলেন। এ বাড়ি ছিলো কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের ধারে। সুন্দর এলাকা, চমৎকার বাড়ি। সে সময় বাঙালিদের এমন বাড়ি কমই ছিলো। বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন, সাহেব হলেও এ বাড়ি মধুর পছন্দ না-হয়ে পারে না। কিন্তু রাজকৃষ্ণের বাড়িতে গিয়ে একদিন ভূরি ভোজ করে এলেও, কবি সে বাড়িতে থাকতে রাজি হলেন না। বিদেশে বিলাসিতার যে-ছবি তিনি কাছ থেকে দেখে এসেছিলেন, পটভূমি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তাঁর মোহ কাটাতে পারলেন না। সেই মোহ তাঁকে স্পেন্সেস হোটেলেই বন্দী করে রাখলো।

কবির এই সিদ্ধান্ত জানতে পেয়ে বিদ্যাসাগর অপমানিত বোধ করেছিলেন কিনা, জানা নেই; কিন্তু নিঃসন্দেহে অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। একজন জীবনীকারের মতে, বিদ্যাসাগর নিজ মুখে এর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।[৬] এই সেই মধু, যাঁকে তিনি চরম দুরবস্থা থেকে বাঁচিয়েছিলেন অল্প দিন আগে? যে-মধু মাত্র কয়েক মাস আগে তাঁকে লিখেছিলেন যে, তিনি এসে উঠবেন তাঁরই বাড়ির একটি ঘরে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ডালভাত পেলেই খুশি হবেন? বিদ্যাসাগর তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন! কিন্তু কবি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। দুঃসাহসী এবং হঠকারী সিদ্ধান্ত তিনি এই প্রথম বার নেননি। তবে বিলাসী জীবন যাপন করার উদ্দেশে হোটেলে থাকার যে-সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন, তার চেয়ে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত খুব কম নিয়েছিলেন। পরে এ সিদ্ধান্ত তাঁর চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছিলো। ফেরার আগে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন যে, ভালো করে প্র্যাক্টিস শুরু করার আগে পর্যন্ত স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। এবং এঁদের জন্যে ভার্সাইতে মাসে খরচ হবে মাত্র আড়াই শো/ তিন শো টাকা। তার অর্থ, তাঁর মতো কল্পনাবিলাসীও তখন অবধি অদূর ভবিষ্যতে পরিবারের জন্যে মাসে আড়াই শো/ তিন শো টাকার চেয়ে বেশি ব্যয় করতে পারবেন বলে ভাবেননি। সেই মাইকেল মাত্র আট সপ্তাহের ব্যবধানে এবং ব্যারিস্টারি শুরু করার আগেই ফেব্রুআরি মাসের (১৮৬৭) গোড়ার দিকে কী করে স্পেন্সেস হোটেলে থাকার খরচ জোগাতে পারবেন বলে ভাবতে পারলেন, সেটা ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয়, তিনি ঋণ করে ঘি খাওয়ার মহামন্ত্রটা শিখেছিলেন; কিন্তু মন্ত্রের বাকি অংশ — কী করে যাবৎ জীবন সুখে থাকতে হয় — সেটা শেখেননি।

যখনকার কথা বলছি, তখন পর্যন্ত তিনি একটি পয়সাও আয় করতে পারেননি। তখনো বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁকে হোটেলে থাকার বিলাসিতা করতে হয়। এ সময়ে তিনি কয়েক মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মারফত অনেক টাকা ধার করেন। তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির দাম যতো ছিলো, তার চেয়েও বেশি পরিমাণ টাকা তিনি য়োরোপে থাকার সময়েই ধার করেছিলেন। তবে ঘটনাচক্রে য়োরোপে এমন অবস্থায় পড়েছিলেন যে, ধার না-করে তাঁর উপায় ছিলো না। কিন্তু পরিবার য়োরোপে রেখে এসে এবং নিজে 'ব্যারিস্টারের জীবন' যাপন করতে গিয়ে ঋণের যে-দুর্বহ বোঝা তিনি তুলে নেন, তা স্বেচ্ছাকৃত। তখন কলকাতায় ব্যারিস্টার ছিলেন মাত্র জনা চল্লিশ। আর বাঙালি ব্যারিস্টার তাঁকে নিয়ে মাত্র তিন জন। এমতাবস্থায় ব্যারিস্টার হয়ে ভাগ্যকে তিনি কমবেশি গড়ে তুলতে পারতেন — তাতে তাঁর মেজাজ যতোই অ-ব্যারিস্টারসুলভ এবং কবিত্বপূর্ণ হোক না কেন। কিন্তু বেহিশেবি মনোভাব দিয়ে তিনি নিজের ভাগ্যকে নিজেই তছনছ করেন। তবে এ তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই স্বকৃতভঙ্গ। বিদ্যাসাগর কি তাঁর লাগাম

টেনে ধরতে পারতেন? মনে হয়, সেটা ছিলো তাঁর সাধ্যের অতীত। এ পর্যায়ে তিনি যদি ধার করতে সাহায্য না-করতেন, তা হলে নিজেই ধার করতে চেষ্টা করতেন। মাঝখান দিয়ে তাঁদের বন্ধুত্বে চিড় ধরতো। তাই বিরক্ত হলেও, বিদ্যাসাগর ঋণ করতে সাহায্য করেন তাঁকে।

অন্য কোথাও না-থেকে বিশেষ করে স্পেন্সেস হোটেলে তাঁর থাকার কারণ জানা না-থাকলেও অনুমান করা অসম্ভব নয়। তিনি কলকাতায় ফেরার মাত্র এক মাস আগে মনোমোহন ঘোষ হাই কোর্টে ব্যারিস্টার হিশেবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর চেম্বার করেছিলেন স্পেন্সেস হোটেলের ১৫ নম্বর কামরায়।[৭] মনোমোহনের সঙ্গে কবির লন্ডনে যে-ধরনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো, তা থেকে মনে হয়, হোটেলে থাকার ধারণা হয়তো তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তবে তিনি তাঁর বেহিশেবি মনোভাবের চূড়ান্ত পরিচয় দেন এই হোটেলে থাকার সময়ে নানা রকমের আতিশয্য দেখিয়ে। অন্যদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো ছাড়াও, নিজের ভোজনের ব্যাপারেও তিনি দারুণ অসংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাবুর্চি রেখেছিলেন এমন একজনকে যে এক সময়ে ছিলো দ্বারকানাথ ঠাকুর আর কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাবুর্চি। তবে বাবুর্চি রাখার ঘটনাটা ঠিক এ সময়ের, না কিছু পরের, তা জানা যায় না। ধারণা করি, ভালো জুড়িগাড়িও হাঁকিয়েছেন। তা ছাড়া, একজনের জায়গায় রেখেছেন একাধিক খিদমতগার। মোট কথা, গাছে কাঁঠাল দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা উপভোগ করার নানা রকমের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আসলে, ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন এবং প্র্যাক্টিস শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রভূত প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি আসবে — এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিলো না।[৬] যাতে দ্রুত এই কাজে যোগ দিতে পারেন, তার জন্যে কলকাতায় আসার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে — ২০ ফেব্রুআরি — ব্যারিস্টার হিশেবে কাজ করার অনুমতি চেয়ে তিনি হাই কোর্টে আবেদন করেন। এই আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন যে, তিনি গ্রেজ ইনে দশটি টার্ম লেখাপড়া করেছেন এবং আগের বছর মিকেলমেস টার্মে ব্যারিস্টার হয়েছেন। সুতরাং তাঁকে হাই কোর্টে ব্যারিস্টার হিশেবে গ্রহণ করা হোক।[৮] তাঁর প্রবাসের সময়ে ঠিকমতো টাকাপয়সা না-পাঠানোর জন্যে তিনি দিগম্বর মিত্রকে কতোটা দায়ী করেছিলেন, আগের অধ্যায়ে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এই আবেদনপত্রের সঙ্গে তিনি সেই দিগম্বর মিত্রের একটি প্রশংসাপত্র জুড়ে দেন। দিগম্বর মিত্রের প্রতি কবির ধারণা বদল করার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর অবশ্য আগে থেকে চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে তাঁর মনোভাব খানিকটা নরমও হয়েছিলো। এ ছাড়া, আমার বিশ্বাস, তিনি কলকাতায় ফেরার পর দিগম্বর মিত্র তাঁকে উষ্ণতার সঙ্গে স্বাগত জানিয়ে পুরোনো তিক্ততা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন।[৯] নয়তো, কলকাতায় অতো পরিচিত লোক থাকা সত্ত্বেও কবি বিশেষ করে দিগম্বর মিত্রের প্রশংসাপত্র দাখিল করবেন কেন!

অতিসম্প্রতি ব্যারিস্টারি পাশ করলেও, কলকাতায় তিনি আদৌ আগন্তুক ছিলেন না। শ্বেতাঙ্গ সমাজও তাঁকে চিনতো। তাঁর সাহিত্য-খ্যাতির কথাও তাদের কাছে একেবারে অজানা ছিলো না। তাঁর এই পরিচিতি তাঁর জন্যে একই সঙ্গে ভালো এবং মন্দ ফল দিয়েছিলো। একদিকে দেখতে পাই, আবেদনপত্র পেশ করার দু সপ্তাহ পরে, ৬ মার্চ তারিখে — হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর বার্নস পীকক তাঁকে ব্যারিস্টার হিশেবে গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁর এই মত সমর্থন করেন বিচারপতি জি লখ, বেইলি, জে পি নর্মান আর এফ বি কেম্প। পরের দিন বিচারপতি এফ এ বি গ্লোভার এবং সিটন-কারও এই মতের প্রতি সমর্থন জানান। সিটন-কার বিশেষ করে উল্লেখ করেন যে, অল্প দিন আগেই মনোমোহন ঘোষকে গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও তিনি মাত্র আটটি টার্ম আইন অধ্যয়ন করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, মি দত্তের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। মাইকেলকে গ্রহণের পক্ষে

শম্ভুনাথ পণ্ডিতও সমর্থন জানান। কিন্তু বিচারপতি এল এস জ্যাকসন লেখেন যে, তিনি মত দেবার আগে কিছু খোঁজ-খবর নিতে চান।[১০] অন্যদিকে, ২৫ মার্চ তারিখে মাইকেলকে গ্রহণ করার ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা প্রকাশ করেন বিচারপতি এ জি ম্যাকফারসন।

> আমার মনে হয় যতোদিন না আরো বেশি এবং আরো সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি অ্যাডভোকেট হবার মতো লোক, ততোদিন মিস্টার দত্তকে অ্যাডভোকেট হিশেবে গ্রহণ করা উচিত হবে না। মিস্টার দত্তের অতীত এবং কলকাতা পুলিশ কোর্টের দোভাষী হিশেবে তাঁর চাকরির খতিয়ান থেকে মনে হয় যে, তিনি তেমন ব্যক্তি নন। তাঁর আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত কাগজপত্র এতোই অপ্রতুল যে, তা থেকেও মনে হয়, তিনি উপযুক্ত লোক নন। আমার জানা মতে, বাবু দিগম্বর মিত্রের মতামতের (যদি তার কোনো বিশেষ মূল্য থাকে) অন্য অনেকেই বিরোধিতা করেন। এটা বেশ লক্ষণীয় যে, মি দত্ত ইংল্যান্ডের কারো চিঠিপত্র দাখিল করেননি। এমন কি, কোনো সরকারী কর্মকর্তার অথবা তিনি সেখানে যাবার আগে যাঁদের অধীনে কাজ করেছিলেন, তাঁদের কোনো চিঠিও নয়।

বিচারপতি ম্যাকফারসনের তীব্র বিরোধিতার মুখে বিচারপতি নর্ম্যান পরের দিন তাঁর সম্মতি প্রত্যাহার করেন। তা ছাড়া, বিচারপতি জন বাড ফিয়ার — দেশীয়দের যিনি মোটামুটি ভালো চোখে দেখতেন — তিনিও চৌঠা এপ্রিল তারিখে ম্যাকফারসনের প্রভাবে মাইকেলের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

> মিস্টার দত্ত যতো কম টার্ম লেখাপড়া শিখেছেন এবং তাঁর বদনামের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তাঁকে হাই কোর্টে গ্রহণ করার পক্ষে সম্মতি দিতে পারছিনে — যতোদিন না মিস্টার দত্তের যোগ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট শংসাপত্র এবং চরিত্র সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়।[১১]

দরখাস্ত করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কবি বুঝতে পারলেন, এবারেও তাঁর প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি এক পথে গেলো না। ব্যারিস্টারি পাশ করে প্র্যাকটিস করার অনুমতি চাইলে, তা পেতে কোনো অন্তরায় দেখা দিতে পারে — কল্পনাচারী কবি হওয়া সত্ত্বেও — এটা তিনি ভাবতে পারেননি। সে জন্যে, তিনি মনে মনে নানা রঙের যে-জাল বুনছিলেন, এক খোঁচায় তা ছিঁড়ে গেলো।

ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি কখনো তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। তবে কবিও সহজে হার স্বীকার করার পাত্র ছিলেন না। আকাশচুম্বী আত্মবিশ্বাস থাকায়, শত বিরোধিতার মুখেও তিনি লড়ে যেতেন। এবারেও সে বিষয়ে কুণ্ঠিত হলেন না। হাই কোর্টের একমাত্র দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতও সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সহায় হলেন। তিনি কবির পক্ষে তদবির করতে আরম্ভ করলেন। তা ছাড়া, বিচারপতি জ্যাকসন এবং নর্ম্যান যে-খোঁজখবর নিচ্ছিলেন, তারও একটা অনুকূল প্রভাব পড়লো। চৌঠা এপ্রিল তারিখে বিচারপতি নর্ম্যান লিখলেন:

> আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, আমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে এতোটা জানি — যাতে তাঁকে বাদ দেওয়া যায়? প্যাটারসন বরং তাঁকে রীতিমতো গ্রহণ করার পক্ষপাতী। মিস্টার দত্ত অমায়িক লোক নন এবং মাঝেমধ্যে মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়েন — এ ছাড়া প্যাটারসন তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না। তিনি বরং বলেন যে, মিস্টার দত্ত খুব বুদ্ধিমান লোক।[১২]

বিচারপতি নর্ম্যানের এ রকমের সম্মতি সত্ত্বেও, মাইকেলকে নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধায় প্রধান বিচারপতি স্যর বার্নস পীকক তাঁকে গ্রহণ করার পক্ষে যে-মত দিয়েছিলেন, তা প্রত্যাহার করেন।[১৩] ওদিকে, বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত গোটা ব্যাপারটাকে বিবেচনা করেন দেশীয়দের বিরুদ্ধে 'সাহেবদের' একটা ষড়যন্ত্র বলে। তিনি তাই মন্তব্য করেন: 'এ বিষয়ে না জিতলে মান থাকবে না।'[১৪] ১১ এপ্রিল তারিখে তিনি কবিকে উপদেশ দেন কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাঁর চরিত্র এবং যোগ্যতা সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশংসাপত্র জোগাড় করতে। মধুসূদন অমনি ত্রাহি বিদ্যাসাগর বলে চিঠি লেখেন:

আজ সকালে আমি পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বলেছেন যে, আমার একমাত্র উপায় হলো সবচেয়ে নাম-করা দেশীয় ব্যক্তিদের যতোগুলো সম্ভব প্রশংসাপত্র জোগাড় করা। ... শম্ভুনাথ বলেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, আমাদের শত্রুরা বিচারপতিদের মন জয় করে নিয়েছে এবং সে কারণে যেমন বুনো ওল আমাদের তেমনি বাঘা তেঁতুল জোগাড় করতে হবে। তিনি চান, আপনি কলকাতায় চলে আসুন। আমি নিজে যে কী বলবো ঠিক বুঝতে পারছিনে। আমি ভালো করে জানি, এরই মধ্যে আমি আপনাকে অনেক ঝামেলা দিয়েছি! আমাদের কাগজপত্র নিয়ে আগামী সপ্তাহের গোড়াতেই হাজির হতে হবে, কারণ একটুও সময় নষ্ট করার উপায় নেই।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে এক কালে ধূমকেতুর মতো উদিত হয়ে বাঙালি সমাজের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, গর্ব করার জন্যে বাঙালিদের একটা অবলম্বন দিয়েছিলেন – সেই সূত্র ধরে তাঁর বন্ধুরও অভাব ছিলো না। বিপদের সময়ে বিদ্যাসাগর তো বটেই, কলকাতার নামজাদা লোক অনেকে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। দিগম্বর মিত্রকে অপছন্দ করলেও, সেদিনই (১১ এপ্রিল) সকালের দিকে গিয়ে কবি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। দিগম্বর মিত্র তাঁকে পাঠিয়ে দেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে – তাঁকে নিয়ে শোভাবাজারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের কাছে যাবার জন্যে। রাজেন্দ্রলালের কাছ থেকে তিনি যান রামগোপাল ঘোষের কাছে। তিনি একটি প্রশংসাপত্র দেবার প্রতিশ্রুতি দেন পরের শনিবারে – ১৪ এপ্রিল তারিখে।[১৫] মোট কথা, বাধার সম্মুখীন হবার সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের সংগ্রামী মাইকেল সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১১ থেকে ২২ এপ্রিলের মধ্যে তিনি তখনকার কলকাতার সবচেয়ে নাম-করা ব্যক্তিদের অনেকের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। যে-মাইকেলকে এমনিতে মনে হয় অন্তর্মুখী, তিনি দরকার হলে কতোটা বহির্মুখী হতে পারতেন অথবা জনসংযোগে তৎপরতা দেখাতে পারতেন, আলোচ্য প্রশংসাপত্রগুলো তার একটা প্রমাণ। যাঁরা তাঁর চরিত্র এবং ক্ষমতার প্রশংসা করে এ সময়ে লিখেছিলেন তাঁদের কয়েক জনের নাম দেখা যাবে পরের পৃষ্ঠার তালিকা থেকে।

এঁরা বেশির ভাগই তাঁর চরিত্র এবং ক্ষমতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। অনেকে উল্লেখ করেছেন, তাঁর পিতা ছিলেন নাম-করা উকিল। আর তিনি নিজে যে নাম-করা সাহিত্যিক সেটাও তাঁরা উল্লেখ করতে ভুলে যাননি। এটা অনুমান করা শক্ত নয় যে, শম্ভুনাথের মতো এঁরাও কবিকে হাই কোর্টে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না ইংরেজ এবং ফিরিঙ্গি ব্যারিস্টারদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে – এটা বিবেচনা করে থাকবেন। যাঁরা তাঁর পক্ষে শংসাপত্র দিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন কলকাতার সুপরিচিত নাগরিক। ব্যবস্থাপক সভার দুজন সদস্য ছাড়াও, কলকাতার সবচেয়ে নাম-করা চারটি জমিদার পরিবারের প্রতিনিধিরা, সুপরিচিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে তিনজন এবং আইনজীবীদের মধ্য থেকে ন জন খুব প্রবীণ সদস্য তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। আইনজীবীদের মধ্যে দুজন – অনুকূল মুখোপাধ্যায় এবং দ্বারকানাথ মিত্র – আবার পরবর্তী দু বছরের মধ্যে হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এতোজন বিশিষ্ট নাগরিকের জোরালো সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট তাঁর আবেদনপত্র আর আটকে রাখতে পারছিলো না। এ আবেদনপত্র আটকে দিলে সেটা যে দেশীয়দের চোখে খুব দৃষ্টিকটু এবং বর্ণবৈষম্য-মূলক আচরণ বলে গণ্য হবে, এটা বিচারপতিরা চিন্তা করে থাকবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনপত্র দাখিল করার প্রায় আড়াই মাস পরে – তেসরা মে বৃহস্পতিবার বিচারপতিরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অ্যাডভোকেট হিশেবে গ্রহণ করা হোক।[১৬] পরের সোমবার – ৭ মে তারিখে নবতম ব্যারিস্টার হিশেবে কবি নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

এতো বছরের আশা শেষ পর্যন্ত সফল হতে যাচ্ছে দেখে সেদিন কবি কেমন উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরসহ তাঁর বন্ধুরা কেমন খুশি হয়েছিলেন – তা আমরা কেবল অনুমান করতে পারি। ঠিক চার বছর এগারো মাস আগে রাজনারায়ণ বসুকে তিনি নিজের সম্পর্কে লিখেছিলেন: আর কবি

মধুসূদন নয় – অতঃপর এম এস ডাট ব্যারিস্টার অ্যাট ল। সেই লেখার মধ্যে কেবল স্বপ্ন ছিলো না, নিজেকে নিয়ে খানিকটা রসিকতাও ছিলো। আজ আর রসিকতা নয়, সত্যি সত্যি তিনি ব্যারিস্টার হয়েছেন। এতোকাল পরে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে (অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়মন) তিনি ব্যারিস্টার। এতো বড়ো সুখের দিনে কলকাতার এক কালের নাম-করা উকিল রাজনারায়ণ দত্তকে তাঁর কি মনে পড়েনি? লন্ডন থেকে লিখেছিলেন: তিনি তাঁর সম্মান রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।[১৭] জাহ্নবী দেবীকে স্মরণ করে তাঁর বড়ো বড়ো চোখ কি অশ্রুসিক্ত হয়নি? এমন কি, এদিনে

নাম	পরিচয়	তারিখ
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	জমিদার	১৩ এপ্রিল
রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কুমার হরেন্দ্রকুমার বাহাদুর	বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য	১৪ এপ্রিল
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	সম্পাদক এবং ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউটের পরিচালক	১৪ এপ্রিল
কৃষ্ণকিশোর ঘোষ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র চৌধুরী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারকানাথ মিত্র	হাই কোর্টের উকিল উকিল, পরে হাই কোর্টের বিচারপতি উকিল কলকাতার সবচেয়ে প্রবীণ উকিলদের অন্যতম উকিল, পরে হাই কোর্টের বিচারপতি	১৫ এপ্রিল
প্যারীচাঁদ মিত্র	এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সাহিত্যিক	১৫ এপ্রিল
রাজেন্দ্র মল্লিক দেবেন্দ্র মল্লিক	জমিদার	১৫ এপ্রিল
রমানাথ ঠাকুর	বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য	১৬ এপ্রিল
গোলাম মহাম্মদ	টিপু সুলতানের পুত্র	১৬ এপ্রিল
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যাপক	২০ এপ্রিল
রমানাথ লাহা, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজনাথ মিত্র, তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়	অ্যাটর্নি	বিভিন্ন তারিখ
হরলাল শীল, যাদবকৃষ্ণ সিংহ, ও. সি. দত্ত, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	জমিদার	বিভিন্ন তারিখ

যাঁরা কবিকে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন, তাঁদের নির্বাচিত তালিকা

হেনরিয়েটা, শর্মিষ্ঠা-মেঘনাদ, আর বহু যুগের ওপার থেকে রেবেকা-ব্যর্থা-ফিবি-জর্জকেও হয়তো মনে করেছেন। পরিশেষে আর একটা চিন্তাও এক টুকরো মেঘের মতো মনের এক কোণে উঁকি দিয়েছিলো কিনা কে জানে! – এ বৃক্ষে অভিপ্রেত ফল ফলবে তো? তবে সে চিন্তা দেখা দিয়ে থাকলেও, তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি। কারণ তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিলো পর্বতপ্রমাণ। তাঁর মতো লেখাপড়া জানা, তাঁর মতো ভাষাবিদ, তাঁর মতো ধারালো বুদ্ধির লোক বাঙালি সমাজে কজন আছে? মনোমোহন

ঘোষ (অথবা জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর) পারবে তাঁর মতো অনর্গল ইংরেজিতে জেরা করতে, বিচারকের সামনে আর্জি পেশ করতে? সফলতা আসবে কিনা – প্রশ্নটা তা নয়। প্রশ্ন হলো: সফলতা কতোটা দ্রুত আসবে! প্র্যাক্টিস জমিয়ে বসতে কতোটা সময় লাগবে!

মাইকেল বসস্থান হিশেবে বেছে নিয়েছিলেন স্পেন্সেস হোটেলকে। চেম্বারও খোলেন সেখানে।[১৮] মনোমোহন ছাড়া অন্য কোনো ব্যারিস্টারের তখন এমন ব্যয়বহুল হোটেলে চেম্বার ছিলো না। ব্যয়বহুল বিবেচনা করে মনোমোহনও দীর্ঘদিন এ হোটেলে চেম্বার রাখেননি। কিন্তু মাইকেল মনোমোহনের অনুকরণে অন্যত্র সরে যাওয়ার কথা ভাবেননি। ওদিকে, তিনি যেমনটা আশা করেছিলেন, সাফল্য তেমন মাত্রায় অথবা তেমন দ্রুত লয়ে এলো না। জুন মাসের শেষ পর্যন্ত *ইংলিশম্যান* পত্রিকায় হাইকোর্টের প্রধান মামলাগুলোর খবর পড়ে দেখেছি কোনো মামলার কৌসুলি হিশেবে এম এম



কলকাতা হাই কোর্ট: ১৮৭২ সালে এ ভবন নির্মাণের পর অল্পকালই মাইকেল বেঁচেছিলেন।

ডাটের নাম খুঁজে পাইনি। বাঙালি ব্যারিস্টার পেলে বাঙালি মক্কেলরা সব সার বেঁধে তাঁর দিকে ছুটে আসবেন – এ আশা তিনি করে থাকলে ভুল করেছিলেন। তবে এ সময়ে বাঙালি উকিলদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, আশুতোষ ধর, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এন. দত্ত, উমেশচন্দ্র এবং যোগীন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জি, আর. এন. বসু, ডি. এন. বসু, এম. সি. চ্যাটার্জি, নরেন্দ্রনাথ সেন ইত্যাদি নাম *ইংলিশম্যান* পত্রিকায় বারবার উল্লিখিত হয়েছে। মাইকেল কেবল যে নতুন এবং অভিজ্ঞতাহীন, তাই নয়; যে-সামাজিক শুভেচ্ছার ওপর মক্কেল পাওয়া অংশত নির্ভর করে তাও তাঁর সামান্যই ছিলো। ইংরেজ বনে গিয়ে বাঙালি সমাজ থেকে তিনি নিজেকে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। আবার ইংরেজ সমাজও তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারেনি। এর ফলে কোনো দিক থেকেই তাঁর কাছে দলে দলে মক্কেল এলো না।

তারপর ধীরে ধীরে তিনি কিভাবে মক্কেল পেতে আরম্ভ করেন , নিজের ব্যবসা ফেঁদে বসেন, সেই কাহিনী আমাদের জানা নেই। এমন কি, য়োরোপে জীবন উপভোগ করার 'উন্নত' দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করে দেশে ফিরে কি কি উপকরণ দিয়ে নিজের জীবন উপভোগ করার চেষ্টা করেছিলেন – তারও বিবরণ

তাঁর বন্ধু অথবা জীবনীকারেরা লিখে যাননি। কেবল জানা যায়, জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে তিনি টাকাপয়সা সব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। একা মানুষ, কিন্তু হোটেলে ভাড়া নিয়েছিলেন তিনটি ঘর। সেখানে তিনি একটি দুটি নয়, প্রতি বেলায় নাকি ছটি ডিশ খেতেন। তা ছাড়া, বন্ধু-বান্ধবদের দেশীয় এবং বিদেশী খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। ভোজ দিতেন মাঝেমধ্যে। আর নিজের সুরাগারে রাখতেন শেরি, শ্যাম্পেন, হুইস্কি, বিয়ার — নানা রকমের শরাব এবং তা অকাতরে বিলাতেন বন্ধুদের।[১৯] এভাবে অনেক টাকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তা নয়। কিন্তু তাঁকে কেবল এমন স্থূল উদর-পূজারী হিশেবে কল্পনা করা অসম্ভব। জীবনের গভীর আস্বাদ নেবার জন্যে তিনি অন্য কী উপাচার সাজিয়ে ছিলেন, আজ আর তা জানার উপায় নেই। সমসাময়িক অনেক নাম-করা লোকের মতো তিনি রক্ষিতা রাখেননি, এটা অবশ্য নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

প্রথম কয়েক মাস বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা বজায় ছিলো। বিপদে-আপদে প্রধানত তাঁর কাছেই সাহায্য চেয়েছেন। বিদ্যাসাগরকে লেখা তাঁর এ সময়ের সব চিঠি রক্ষা পায়নি। কিন্তু যে-চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসেছে, তা থেকে অনেক খবর জানা যায়। বিশেষ করে তাঁর আর্থিক অবস্থার কথা। তা ছাড়া, জানা যায় জরুরী একটা বিষয় — তাঁর স্বাস্থ্যের সংবাদ। আলোচ্য চিঠিগুলোর অনেকটাতে কোনো তারিখ নেই। তবু আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে তাদের আনুমানিক তারিখ নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব নয়। এসব চিঠি থেকে দেখা যায়, ব্যারিস্টারি শুরু করার মাস ছয়েক পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে আরম্ভ করে।[২০] সুনির্দিষ্ট করে জানা যায়, নভেম্বর মাস (১৮৬৭) থেকে তাঁর গলার অসুখ শুরু হয়। পরে দেখা যাবে, এই রোগ শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যারিস্টারির কাজে একটা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এ সময় থেকে তাঁর সাধারণ স্বাস্থ্যও খারাপ হতে শুরু করে। যেসব টুকরো খবর বিভিন্ন জনের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, তা থেকে মনে হয়, স্বাস্থ্যের প্রতি তিনি কখনো খুব একটা সুবিচার করতেন না। কেবল অতিরিক্ত কারণবারি পান নয়, অপরিমিত এবং অখাদ্য খেয়ে তিনি উচ্চরক্তচাপ এবং হৃদরোগও অর্জন করেছিলেন। অব্যাহত আর্থিক অনটন নিয়ে তিনি যে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা করতেন, তাও তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর খারাপ ফল ফেলেছিলো। জীবনে তিনি বিশ্রামও খুব কম করেছেন। ক্বচিৎ যখন অবসর পেয়েছেন, তখন মগ্ন হয়েছেন অধ্যয়ন এবং সাহিত্যচর্চায়। চরম প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি কেমন করে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারতেন, আগের অধ্যায়ে আমরা তা দেখতে পেয়েছি।

কলকাতায় এসেও প্রথম দশ মাস তিনি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে। তা সত্ত্বেও, সাহিত্যচর্চা অথবা লেখাপড়ার প্রতি প্রেম ভুলে যেতে পারেননি। *হেক্টরবধ* তিনি এ বছরই রচনা করতে আরম্ভ করেন - নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে।[২১] এ রচনায় গদ্য নিয়ে তিনি যে-পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন তার ব্যাপকতা থেকে অনুমান করা সম্ভব, তিনি এ রচনার পেছনে প্রচুর সময় ব্যয় করেছিলেন। মোট কথা, কলকাতায় ফেরার পর তাঁর অর্থ উপার্জনের মন্ত্র সাধন না-হলেও, বছর দুয়েকের মধ্যে দ্রুত তিনি শরীরের পাতন ঘটিয়েছিলেন এবং নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন এক কালের অফুরন্ত জীবনীশক্তি।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে চিড় ধরে টাকা ধার করা এবং তা শোধ দেবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তবে তার জন্যে তিনিই দায়ী ছিলেন, বিদ্যাসাগর নন। তাঁর চরম বেহিশেবী আচরণের দরুন এ সময়ে তাঁর ঋণের বোঝা জমতে থাকে। কারণ, তিনি মনে করতেন যে, একবার প্র্যাক্টিস জমিয়ে বসতে পারলে রাশি রাশি টাকা আসবে এবং সেই ভরসাতেই তিনি ঋণ করতেন। কিন্তু কার্যকালে তিনি পুরোনো ধার পরিশোধ করতে পারেননি; বরং নতুন ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। ধার এবং

ধারের সুদ শোধ দেবার জন্যে আলোচ্য কালে তাঁর ওপরে যে-চাপ আসে, তাতে তিনি কম বিব্রত বোধ করেননি, তবে তা সত্ত্বেও তিনি ধার করতে থাকেন। তিনি কলকাতায় পা দেবার দু মাসের মধ্যে —৮ এপ্রিল (১৮৬৭) তারিখে—প্রধান উত্তমর্ণ অনুকূল মুখোপাধ্যায় তাঁর ধার এবং বন্ধকের সুদ পরিশোধ করার জন্যে বিদ্যাসাগরকে তাগাদা দিয়ে চিঠি লেখেন।

> এই মুহূর্তে আমার টাকার খুব প্রয়োজন। দয়া করে আমাকে তিন হাজার টাকা ফেরত দেবার এবং বন্ধকের বারো হাজার টাকার সুদ দেবার ব্যবস্থা করবেন। আপনি জানেন, এ বাবদে এ যাবৎ কোনো সুদ দেওয়া হয়নি। এখন মিস্টার মাইকেল যেহেতু এখানে, কোনো বিলম্ব না-করে তাঁর এসব ব্যাপার মিটিয়ে ফেলা উচিত।[২১]

কেবল অনুকূল মুখোপাধ্যায় টাকার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নও টাকার জন্যে চঞ্চল এবং উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তা জানা যায় বিদ্যাসাগেরের চিঠি থেকে। বিদ্যাসাগর এতে কেবল বিরক্ত হননি, রীতিমতো বিপন্ন বোধ করেছেন। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকে তিনি ধার করেছিলেন শিগগিরই সে টাকা শোধ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। প্রথম বিধবাবিবাহের বর হিশেবে বিদ্যারত্ন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে পরিচিত ব্যক্তি। তাই বলে তিনি আদর্শবাদী বলে বিখ্যাত ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন বস্তুবাদী। অনেকে বলেন, দেশোদ্ধারের নিষ্কাম ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বিধবাবিবাহ করেননি, বরং এ বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন ইনাম হিশেবে মিলবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ — এই লোভে।[২২] যথাসময়ে টাকা ফেরত না-পাওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই বিদ্যাসাগরকে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর কথায় তিনি এ টাকা ধার দিয়েছিলেন। এ কথা বলে তিনি বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার মতো লোক ছিলেন না। তাই কবি যাতে শ্রীশচন্দ্রের পাঁচ হাজার টাকা অবিলম্বে ফিরিয়ে দেন, এবং অনুকূলচন্দ্রের সুদ পরিশোধ করেন, তার জন্যে তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময়ে বিদ্যাসাগরের নিজের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো না। তখনো বইপত্র এবং সংস্কৃত প্রেস থেকে তাঁর আয় অব্যাহত থাকলেও, তিনি বিধবাবিবাহ নিয়ে ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের ধার নিজে পরিশোধ করে দেবার মতো সামর্থ্য তাঁর ছিলো না। কবিকে ধার শোধের ব্যাপারে জুলাই মাসের শেষে অথবা অগস্টের শুরুতে (১৮৬৭) বর্ধমান থেকে যে-চিঠিটি লেখেন, তা থেকে তাঁর এই ব্যাকুলতা এবং তিক্ততা সহজে লক্ষ্য করা যায়। মাস আটেক আগে তিনি দুর্ঘটনায় আহত হবার পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য আদৌ ভালো যাচ্ছিলো না। তিনি স্বাস্থ্য লাভের আশায় নানা রকমের সাধ্যসাধনা শুরু করেছিলেন। বর্ধমানেও গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। তাঁর সেই শারীরিক এবং মানসিক সংকটের দরুন তাঁর চিঠিতে কিছু অতিরিক্ত তিক্ততা দেখা দিয়ে থাকবে।

> অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোনক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না, সুতরাং তাঁহারা অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া যে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্ব লক্ষণ ঘটিয়াছে।
>
> যৎকালে আমি অনুকূল বাবুর নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানির কাগজ ধার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দি। তাঁহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এই অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয়স্থলে আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূল বাবু সত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই।
>
> এক্ষণে কিরূপে আমার মানরক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্ব্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনাদের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমার পরিত্রাণ করেন। পীড়াশান্তি এবং স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত

পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া এবং অন্ততঃ ছয় মাস কাল তথায় থাকা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিস্তার না করিলে কোন মতেই যাইতে পারিব না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যাহা বিহিত বোধ হয় করিবেন,...[২৩]

বিদ্যাসাগরের এ চিঠি পেয়ে কবি ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে হিশেবী ছিলেন না বটে, কিন্তু যিনি তাঁকে চরম দুর্দিনের সময়ে বাঁচিয়েছিলেন এবং ধার করেছিলেন তাঁরই জন্যে, সেই বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা তাঁর কম ছিলো না। তিনি বুঝতে পারলেন, এর পরে ঋণ শোধ দেবার জন্যে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবার ব্যাপারে আর দ্বিধা করলে চলবে না।

কয়েক মিনিট আগে আমার হাতে আপনার যে চিঠি পৌঁছেছে, তা থেকে আমি দারুণ কষ্ট পেয়েছি। আপনি জানেন, এ পৃথিবীতে বলতে গেলে এমন কিছু নেই যা আমি আপনার জন্যে করতে পারবো না। আমার জন্যে যে-অপ্রীতিকর বোঝা আপনি তুলে নিয়েছেন, তা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে আপনি যে-কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন — তাতে আমার সম্মতি রয়েছে জানবেন।[২৪]

কবির চিঠি পাওয়ার কদিন পরে বর্ধমান থেকে ফিরে এসে বিদ্যাসাগর তাঁর কথা মতো ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করেছিলেন কিনা, তা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু এর চার-পাঁচ মাসের মধ্যেও ঋণ শোধ করা সম্ভব হয়নি, তা জানা যায়। ইতিমধ্যে টাকার জন্যে শ্রীশচন্দ্র আরও ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করার হুমকি দেন। বিদ্যাসাগর তার পরিপ্রেক্ষিতে কবিকে কী লিখেছিলেন, সে চিঠি আমরা পাইনি, কিন্তু ডিসেম্বর মাসে কবি তাঁকে কী উত্তর দেন, তা আমাদের জানা আছে। তিনি লেখেন:

আপনি ভালো নেই জেনে দুঃখিত হলাম। এ দিকে আমিও বিছানা থেকে উঠতে পারছিনে। আমি শ্রীশচন্দ্র সম্পর্কে আর কী বলবো? সে আপনাকে আদালতে নিলে আপনার জন্যে সেটা হবে মর্মান্তিক আঘাত আর আমি তা হলে [ক্রোধে] উন্মাদ হয়ে যাবো। শ্রীশ নিশ্চয় অতোটা পাষণ্ডের মতো হবে না। আপনি জানেন আমার কোনো টাকা নেই। তা ছাড়া, আমার গলা এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের কারণে গত নভেম্বর মাস থেকে বেশ অসুস্থ আছি। আপনার কি মনে হয় না যে, অনুকূলকে কিছু একটা করতে রাজি করানো যাবে? আমি গত দু সপ্তাহ বের হইনি এবং কখন আবার উঠে দাঁড়াতে পারবো, তাও জানিনে। ... যারা চায় না যে, আপনি আমার প্রতি সহৃদয় আচরণ করুন, তারা আমার বেহিশেবী ব্যয় এবং অন্যান্য বিষয়ে আপনার কাছে নিশ্চয় অনেক কথা বলে; কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন একটা অলৌকিক শক্তি ছাড়া প্র্যাক্টিস শুরু করার প্রথম বছরেই কারো পক্ষে পাঁচ হাজার টাকা ধার শোধ করা, 'ভদ্রলোকের' মতো বাস করা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের য়োরোপে রাখা সম্ভব নয়! .. আমি আরও জানতে পেরেছি যে, কোনো কোনো লোক আমার বিরুদ্ধে আপনাকে চটিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। আপনি বোকা নন এবং সেটাই আমার সান্ত্বনা। ... নীলকমলকে আমি নিজেই লিখবো। ... দেখি আসন্ন ছুটির সময়ে কিছু টাকা জোটাতে পারি কি না।[২৫]

কবির এই আবেদনে অনুকূল সাড়া দিয়ে অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিদ্যাসাগর আরও টাকা ধার করেছিলেন কিনা, তা আমাদের জানা নেই। সম্ভবত করেননি। এমন কি, নিজেও ধার শোধ দেবার মতো টাকা জোগাড় করতে পারেননি। কিন্তু তিনি অনুভব করলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ধার পরিশোধ করে বিদ্যাসাগরকে দায়মুক্ত না-করলে চলবে না। তাঁকে তিনি আন্তরিকভাবে আপনজন বিবেচনা করতেন। এবং মনে করতেন যে, তাঁর কাছে তিনি আবদার করতে পারেন। সেই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে অমন পত্রাঘাত পেয়ে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। নিশ্চয় খুব অভিমানও হয়েছিলো তাঁর ওপর। সেই অভিমান নিয়ে তিনি নিজের তালুক বিক্রি করার উদ্যোগ নেন। অনুকূল মুখোপাধ্যায়কে উপস্বত্বভোগী বন্ধক দিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি বাঁচানোর তিনি যে-পরিকল্পনা করছিলেন,[২৬] তা আর বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যাসাগর উদ্‌যোগ নেননি। অনুকূল মুখোপাধ্যায়ও নতুন ঋণ দিতে সাহস পাননি। সুতরাং বিদ্যাসাগরকে চিঠি লেখার দু-এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি তাঁর তালুক বিক্রির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। বাকি থাকে কেবল একটা সিদ্ধান্ত — কাকে বিক্রি করবেন এ সম্পত্তি।

আগেই বলেছি, শ্রীশচন্দ্র এই সম্পত্তি একুশ হাজার টাকায় কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন — যদিও এই তালুক দুটির খাজনা ছিলো দেড় হাজার টাকা এবং তখনকার সহজ হিশেব অনুযায়ী এর দাম হবার কথা খাজনার কুড়ি গুণ অর্থাৎ তিরিশ হাজার টাকা। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে ফেব্রুআরি মাসে (১৮৬৮) কবি মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে (তাঁর স্ত্রী মোক্ষদা দেবীর নামে) এ সম্পত্তি বিক্রি করেন।[২৭] শ্রীশচন্দ্রের কাছ থেকে একুশ হাজার টাকার প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে — যে-মহাদেব অতীতে তাঁকে এতো ভুগিয়েছেন, তাঁর কাছে কুড়ি হাজারে বিক্রি করলেন কেন, জীবনীকার তার ব্যাখ্যা দেননি। আমার বিশ্বাস, মহাদেব চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল (রাজনারায়ণ দত্ত বেঁচে থাকার সময় থেকে) এই সম্পত্তি সরাসরি দেখাশোনা করেছিলেন এবং এর ফলে এই সম্পত্তিতে তাঁর দখলি স্বত্ব ভালোভাবে কায়েম করেছিলেন। আসল জমিদারের অনুপস্থিতিতে প্রজারা তাঁকেই গণ্য করতেন জমিদার হিশেবে। অন্য কেউ এ সম্পত্তি কিনলে সহজে এর দখল পেতেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিলো। এই পরি িতিতে অন্য কোনো ক্রেতা এগিয়ে আসেননি। ফলে এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তিনি মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শেষ পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হন। এবং মহাদেব তার পুরো সুযোগ গ্রহণ করে যে-দাম দেবার প্রস্তাব দিলেন, তিনি সেই দাম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। অন্যায় সুযোগ নিয়ে মহাদেব কম দামে এই তালুক কিনেছিলেন — গৌরদাস বসাকও তাঁর স্মৃতিচারণে তা উল্লেখ করেছেন।[২৮]

এই সম্পত্তি থেকে তিনি যে-কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছিলেন তার মধ্যে উনিশ হাজার টাকা দিতে হয়েছিলো অনুকূল মুখোপাধ্যায়কে। শ্রীশচন্দ্রকে টাকা দেবার কথা কোথাও উল্লিখিত হয়নি। বিদ্যাসাগরও এর পরে ধার শোধ দেবার জন্যে কবিকে প্রবল তাগাদা দেননি। এ থেকে অনুমান করি যে, সম্পত্তি বিক্রি করার আগেই শ্রীশচন্দ্রের ধার পুরো না-হলেও অংশত শোধ হয়েছিলো। কোন সূত্র থেকে টাকা পেয়েছিলেন, কার অথবা কাদের কাছ থেকে টাকা এনে এই পুরোনো ধার শোধ দিয়েছিলেন, সে তথ্য অজ্ঞাত। এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর কোনো বোঝাপড়া হয়েছিলো কিনা, তাও আমাদের অজানা।

অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পুরো ধার এবং শ্রীশচন্দ্রের অন্তত আংশিক ধার শোধ হওয়ায় বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু কবির প্রতি তাঁর আস্থা কতোটা ফিরে এসেছিলো, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বরং এ নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সম্পর্ক যে খানিকটা তিক্ত হয়েছিলো, কবির চিঠি থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। অনেকের কথা থেকে বিদ্যাসাগরের ধারণা হয়েছিলো যে, মধু যতোটা আর্থিক অনটনে আছেন বলে দাবি করেন, আসলে তিনি অতোটা টানাটানির মধ্যে নেই। এবং তিনি যতো কম আয় করেন বলে দাবি করেন, তাঁর প্রকৃত আয়ও তার চেয়ে বেশি। এই ইঙ্গিতের কথা মনে রেখে কবি লেখেন:

> অনেক লোক আছে ঈশ্বর যাদের পাওনা-আদায়কারী সরকারের মনোবৃত্তি দিয়েছেন। [পারলে] টাকা বাঁচানোর জন্যে তারা নিজেদের স্ত্রী এবং কন্যাদের উলঙ্গ রাখতো। এ রকমের লোকেরা আপনার কাছে আমার সম্পর্কে যা খুশি তাই বলতে পারে। কিন্তু আপনাকে আমি বলছি, 'জনরব' থেকে যেমনটা মনে হয়, আমি তেমন সফল হতে পারিনি।[২৯]

তবে আগেই যেমনটা বার বার দেখা গেছে — সরল মানুষ হিশেবে তিনি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ অথবা অভিমান দীর্ঘ দিন পুষে রাখতে পারতেন না। তাই এর পরেও অভিমান ভুলে গিয়ে চরম বিপদের মুখে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য চাইতে দ্বিধা বোধ করেননি। এবং তার জন্যে দীর্ঘদিন দেরিও করতে হয়নি। বিদ্যাসাগরের চিঠি থেকে দেখা যায়, পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করার মাত্র

সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই কবি আর্থিক অনটনে পড়েন এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

স্পেন্সেস হোটেল তাঁকে প্রথম দিকে খুব খাতির করেছিলো। কিন্তু ধার জমতে থাকায়, সেখানে ধীরে ধীরে তাঁর সম্মানে টান পড়ে। একটি চিঠিতে টাকা চেয়ে বিদ্যাসাগরকে তিনি যা লিখেছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় আয়-ব্যয়ের হিশেব মেলাতে তিনি কি রকম ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর অর্থ সংকট কেমন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিলো। 'এ মাসে আমি যা আয় করছি, তার সবটাই দিচ্ছি এই হোটেলে, কারণ এখানে ঋণী থাকার চিন্তাটা আমার ভালো লাগছে না।'[৩০] কিন্তু সবচেয়ে টান পড়েছিলো য়োরোপে পাঠানোর টাকায়। এর প্রায় ন মাস আগে হেনরিয়েটা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন।[৩১] তার অর্থ ফ্রান্সে তিনটি সন্তানের সংসার নিয়ে তাঁর ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিলো। হেনরিয়েটা এ সময়ে কী অর্থকষ্টের মুখোমুখী হন, তা কবির একাধিক চিঠি থেকে প্রকাশ পায়।[৩২] বিদেশে-বিভুঁইয়ে টাকাপয়সা না-থাকলে কি বিপদে পড়তে হয়, দু বছর আগে নিজেই তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে এসেছিলেন। এই বিপদের মুখে বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনি যে সঙ্গতির চেয়ে বেশি বাবুগিরি করছেন, সে সম্পর্কে নিজেও জ্ঞানপাপীর মতো সচেতন ছিলেন: 'আমি পূর্ব-পর বিবেচনা করিনি এবং ঠিকমতো সংসার চালাতে পারিনি।' কাকুতি-মিনতি করে তিনি তাঁকে চিঠি অনেক বারই লিখেছেন, কিন্তু এ চিঠির তুলনা কমই মেলে:

> আপনি যদি ইতর শ্রেণীর লোক হতেন অথবা হতেন আপনাকে যারা ঘিরে থাকে, সেই লোকদের মতো একজন সাধারণ মানুষ, তা হলে আমি আপনাকে আমার ব্যাপারে আবার জড়িয়ে পড়ার অনুরোধ জানাতে দ্বিধা করতাম, বিশেষ করে শ্রীশ লোকটা যখন যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়েছে। কিন্তু বাঙালি হলেও, আপনি একজন 'মানুষ', এবং আমি বিশ্বাস করি আমার মতো বিপদগ্রস্ত একজন লোককে বাঁচানোর জন্যে আপনি যেকোনো রকমের ঝুঁকি নিতে তৈরি থাকবেন। আমার বেচারী স্ত্রী খুবই আর্থিক অনটনের মধ্যে আছে - আপনাকে যখন আমি প্রথম লিখেছিলাম প্রায় তেমনি খারাপ অবস্থায়, এবং আমি এ পরিস্থিতিতে একেবারে অসহায়। ... আপনি স্বভাবতই একজন মহৎ লোক, এবং বাঙালি হলেও (আমি যদি খুব ভুল না-করে থাকি) আপনি আমার কষ্ট বুঝতে পারবেন এবং আমার প্রতি সহানুভূতি বোধ করবেন। ... আগামী ২৫ তারিখে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে যে-ডাক যাবে, তার আগে আপনি এ টাকাটা আমাকে জোগাড় করে না-দিলে য়োরোপে বসে তারা প্রায় মরে যাবে।
>
> এ যাবৎ আপনার মতো মহৎ কোনো বাঙালির জন্ম হয়নি। লোকেরা আপনার কথা বলে উচ্ছ্বসিত হৃদয় নিয়ে আর সজল চোখে। এবং আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রুও এ কথা বলতে সাহস পাবে না যে, আমি একটা খারাপ লোক। দয়া করে আমার দিকে নজর দিন এবং এমন একজন লোককে সাহায্য করুন যে আপনাকে ভালোবাসে এবং যার আপনি ছাড়া পরোয়া করার মতো কোনো বন্ধু নেই। নিজে গিয়ে এ কথা আপনার কাছে বলার মতো সাহস আমার নেই। সে জন্যে, আমাকে ডেকে পাঠাবেন না। বরং সেই দুঃসাহস এবং শক্তি নিয়ে কাজ শুরু করুন, যা আপনাকে হাজার হাজার লাখপতির চেয়েও বেশি প্রিয়, বেশি সম্মানিত, বেশি শ্রদ্ধাভাজন করেছে। আপনি নিশ্চয় জানেন আমি প্রত্যাখ্যাত হবো না। অনুকূল আপনাকে এবং আমাকে যে-টাকা দেবার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার মধ্য থেকে এক হাজার টাকা পাঠানোর জন্যে তাঁকে দয়া করে লিখুন। এটা-ওটা বলে এবং সবিনয়ে আমার প্রার্থনা না-মঞ্জুর করে একজন জঘন্য বাঙালির মতো আমাকে একটা বাজে চিঠি লিখবেন না। পরিশেষে আমি আমার বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এবং এ রকমের পরিস্থিতিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন কাজ করতেন, তিনি তেমন করুন।[৩৩]

ভৃত্য-পরিবৃত স্পেন্সেস হোটেলের নরম শয্যায় শুয়ে অনিদ্রায় ছটফট করতে থাকা কবিকে অভ্রান্তভাবে দেখার জন্যে দ্বিতীয় কোনো চিঠির দরকার নেই। চরম বিলাসিতার কোট-পাতলুনের তলায় নিদারুণ দারিদ্র্যের লজ্জা তিনি কি রকম লুকিয়ে রেখেছিলেন, তা বোঝার জন্যেও আর কোনো দলিল নিষ্প্রয়োজন। এ চিঠির মধ্যে তাঁর কাতর অনুনয় এবং আন্তরিক তিক্ততা এক যোগে প্রকাশ পেয়েছিলো এবং তিনি নিজে তা ভালো করে জানতেন। সে জন্যে চিঠির ওপর তিনি লিখে দিয়েছিলেন:

'ব্যক্তিগত — আশা করি আপনি পড়ে এ চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলবেন।' বিদ্যাসাগর অবশ্য দয়া করে চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলে বিপন্ন কবির লজ্জা নিবারণ করেননি। সেটা তাঁর দয়ার সাগর নামের সঙ্গে কতোটা সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে, বলা শক্ত। তবে মাইকেল-জীবনীর একটি দিক জানার জন্যে এ চিঠিটি অমূল্য বলে বিবেচিত হতে পারে। সে কারণে বিদ্যাসাগরকে ধন্যবাদ।

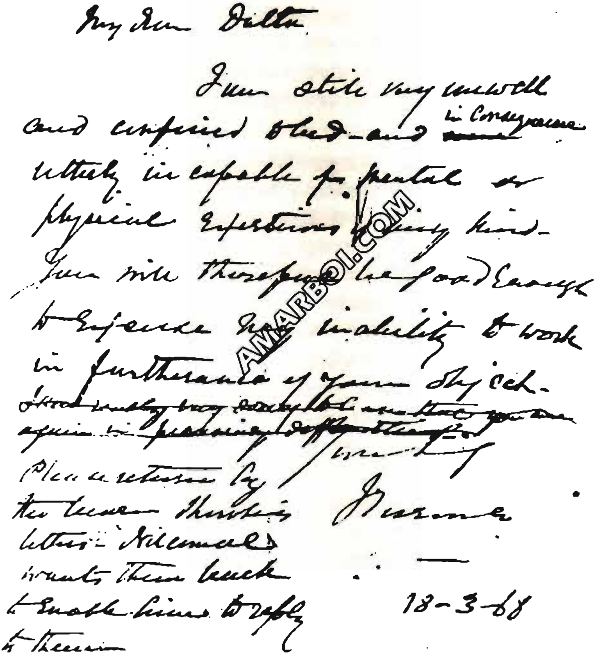
একদিকে ব্যারিস্টার হিশেবে প্র্যাক্টিস করার অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে তদবির, অন্যদিকে পাওনাদারদের চাপ — দুই মিলে এম এম ডাট ব্যারিস্টার অ্যাট ল-এর জীবন আলোচ্য কালে খুব যে উপভোগ্য হয়েছিলো, তা মনে করার আদৌ কোনো কারণ নেই। যিনি উজান স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে ব্যারিস্টার হয়েছিলেন এবং দেশে ফিরে এসেছিলেন জীবনকে উপভোগ করার স্বপ্ন নিয়ে, তাঁর কাছে বাস্তবতার এই রূঢ় আঘাত কতোটা হতাশাজনক মনে হতে পারে, পুরোটা না হলেও, তার খানিকটা অনুমান করা সম্ভব। এই কল্পনাতীত হতাশায় অনেকে সংকল্প হারিয়ে ফেলতেন। কিন্তু তিনি হারালেন না। হিন্দু কলেজের পড়ুয়া ছাত্রদের সঙ্গে, বিশপস কলেজে বর্ণবিদ্বেষী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, অরফ্যান অ্যাসাইলামে নামহীন-গোত্রহীনদের অদ্ভুত পাঠক্রম পড়াতে গিয়ে, মাদ্রাস হাই স্কুলে গুণের আদর করতে না-জানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, কলকাতায় পুলিশ কোর্টে 'ইতরজনদের' মধ্যে, লন্ডনে বর্ণবাদী সমাজে, ভার্সাইতে দারিদ্র্যের সঙ্গে — সর্বত্র তিনি সংগ্রাম করে টিকে থেকেছেন, অনেক সময়ে সংগ্রাম করে বিজয়ীর বরমাল্য আদায় করেছেন। এখন ব্যারিস্টার হয়ে নিজের মাটিতে ফিরে তিনি হতাশ হবার পাত্র নন। এ সময়ে তিনি ভেবে থাকবেন, যে, ঝড়ের মুখে কিছুক্ষণ হাল ধরে রাখতে পারলেই পালে লাগবে অনুকূল হাওয়া। আর — যতোই অমান্য করুন তাঁর উপদেশ এবং ইচ্ছা — দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর নিশ্চয় দৃঢ়ভাবে তাঁকে রক্ষা করবেন সর্বনাশের খর স্রোত থেকে।

কিন্তু নিচের চিঠির বয়ান থেকে দেখা যায়, দুঃখ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করলেও, বিদ্যাসাগর কবিকে সাহায্য দিতে সম্মত হননি।

> আমি এখনো খুব অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী। ফলে আমার কোনো রকমের মানসিক অথবা শারীরিক পরিশ্রম করার সামর্থ্য নেই। সে জন্যে আপনার উদ্দেশ্য সফল করার ব্যাপারে আমার অপারকতা দয়া করে ক্ষমা করবেন। ~~আপনি আবার আর্থিক অনটনে পড়েছেন জেনে আমি সত্যি খুব দুঃখিত হয়েছি।~~[৩৭]

পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি থেকে কবি এক হাজার টাকা পেয়েছিলেন। ব্যারিস্টারিও করছিলেন। তা সত্ত্বেও অতো অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আর্থিক অনটনে পড়ে — সম্ভবত ধার করার জন্যে — বিদ্যাসাগরের সাহায্য চাওয়ায় বিদ্যাসাগর বিরক্ত হয়েছিলেন। সে কারণে চিঠির শেষ বাক্যটি কেটে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমনভাবে কেটেছিলেন যাতে বাক্যটা পড়তে অসুবিধে না-হয়। বিদ্যাসাগরের এ চিঠি থেকে মনে হয়, পুরোনো ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর, তিনি আর নতুন কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু কবির প্রতি আন্তরিক প্রীতিবশত তিনি তাঁর বিপদের মুখে নিরাসক্ত হয়ে বসে থাকতে পারেননি। কারণ, এর পরও যুদ্ধংদেহি শ্রীশচন্দ্রের ধার শোধ দিতে বিদ্যাসাগর তাঁকে নিশ্চয় সাহায্য করেছিলেন। তবে কিভাবে এ ঋণ শোধ হয়েছিলো তা পরিষ্কার জানা যায় না। বিদ্যাসাগরের এবং কবির কোনো কোনো জীবনী-লেখক বলেছেন যে, এই ঋণ শোধ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে মাত্র আট হাজার টাকায় সংস্কৃত প্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি করতে হয়েছিলো।[৩৮] এই উক্তি সত্য কিনা, প্রমাণের অভাবে বলা শক্ত। বিদ্যাসাগর নিজে যদি শ্রীশচন্দ্রের পাঁচ হাজার টাকা শোধ দিয়ে থাকেন, তা হলেও তিনি সে কথা কোথাও লেখেননি অথবা অন্যদের বলেননি। মাইকেলকে লেখা তাঁর পরবর্তী চিঠিপত্রে অথবা তাঁকে লেখা মাইকেলের চিঠিপত্রে এর কোনো ইঙ্গিতও নেই। এর কারণ বোঝা যায় না। ১৮৬৯ সালে বিদ্যাসাগর যখন কাশিমবাজারের

মহারানী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায়কে অনুরোধ জানিয়ে টাকা ধার করেন, তখনো চিঠিতে বিধবাবিবাহের কারণে তাঁর ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন, মাইকেলের ধার শোধ দিতে গিয়ে ঋণী হবার কথা বলেননি। তদুপরি, আরও মনে রাখা যেতে পারে যে, তিনি যদি মাইকেলের ঋণ নিজেই সবটা শোধ দিয়ে থাকেন, তা হলেও তার জন্যে সংস্কৃত প্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি করার দরকার ছিলো না।[৩৬] কেবল শ্রীশচন্দ্রের ধার শোধে সাহায্য নয়, মাস ছয়েক পরে – ১৮৬৮ সালের শেষ দিকে – বিদ্যাসাগরকে লেখা কবির দুটি চিঠি থেকেও জানা যায় যে, তখনো বিদ্যাসাগর কবির বৈষয়িক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। এই চিঠিতে কবি একটি দলিল রেজিস্ট্রি করার জন্যে রেজিস্ট্রি অফিসে যাবার কথা জানিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর তারিখটাকে ১৮৬৮-র অক্টোবর থেকে


My dear Dutt

I am still very unwell and confined to bed – and in consequence utterly incapable of mental or physical exertion of any kind – You will therefore be good enough to excuse my inability to work in furtherance of your object.

Yours truly

Please return by the bearer Thursday's letters – Nilcomal wants them back to enable him to reply to them

18-3-68

কবিকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি

পরিবর্তন করে ১৮৬৮ সালের নভেম্বর করলে তিনি যেতে পারবেন।[৩৭] এই দলিল কিসের তা জানা যায়নি। কিন্তু মনে হয়, নতুন কোনো ধার জোটানো অথবা পুরোনো কোনো আর্থিক সমস্যা মোচনের সঙ্গে এর যোগ ছিলো। এই দলিলের বিস্তারিত দিকগুলো জানা গেলে তাঁর টাকাপয়সা আদান-প্রদানের নতুন কোনো দিক উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

যে-ব্যারিস্টার হবার লোভে কবি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এবং নাটক বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিতে পারেননি, সেই ব্যারিস্টারি থেকে তিনি কি ফল লাভ করেছিলেন, এখানে সংক্ষেপে তার আলোচনা করা যেতে পারে। এ আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার কারণ এ নয় যে, এটা কিছু কম কৌতূহলের বিষয়। আসল কারণ, এ সম্পর্কে তথ্য সামান্যই পাওয়া যায়। আগেই একটি চিঠি থেকে লক্ষ্য করেছি, ব্যারিস্টারি শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যে তিনি মক্কেল পেতে আরম্ভ করেন। ব্যারিস্টার হিশেবে তিনি কেমন, সেটা তখনো মক্কেলদের জানা ছিলো না। এই অপরিচিতি একই সঙ্গে মক্কেল পাওয়ার ব্যাপারে সুবিধে এবং অসুবিধের সৃষ্টি করেছিলো। এ সময়ে তাঁর যে-আয় হতো , তা দিয়ে হোটেলের বিরাট খরচ এবং য়োরোপে টাকা পাঠানোর ব্যয় তিনি নির্বাহ করেছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত ব্যারিস্টারি-জীবন আরম্ভ করার বছর খানেকের মধ্যে – ১৮৬৮ সালের মাঝামাঝি নাগাদ – তিনি সবচেয়ে বেশি নাম করেছিলেন। ব্যারিস্টারি যে তাঁর কাজ নয়, এ দুর্নাম তখনো ছড়িয়ে পড়েনি। ১৮৬৮ সালে তিনি শ্রীরামপুরের জমিদার গোপীকৃষ্ণ গোসাঁই-এর মামলাসহ একাধিক মামলায় জয়ী হয়েছিলেন।[৩৮] এ সময়ে আর-একটি উল্লেখযোগ্য মামলা – ঠাকুর বনাম ঠাকুর -এর সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন, যদিও এর প্রধান কৌঁসলি হিশেবে নয়।

হিন্দু কলেজে তাঁর সহপাঠী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে তিনি কলেজ-জীবনে পছন্দ করেননি। পরেও না। এর পেছনে ঈর্ষা থাকা সম্ভব । জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পিতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর রাজনারায়ণ দত্তের তুলনায় অনেক নাম-করা উকিল এবং বহু গুণে ধনী ছিলেন। তাঁর আভিজাত্যের মাপে তাঁদের তুলনাই চলতো না। পড়ুয়া ছাত্র হিশেবেও জ্ঞানেন্দ্রমোহন মধুর চেয়ে বেশি সফল ছিলেন। (প্রসঙ্গত, ১৮৪২ সালে তাঁরা উভয়ে যে-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার ফলাফলের দিকে নজর দেওয়া যায়। মাইকেল ভালো ইংরেজি জানতেন – এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই পরীক্ষায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন মাইকেলের তুলনায় ইংরেজিতে অনেক ভালো ফলাফল করেছিলেন।[৩৯]) তবে খৃস্টান হওয়ায় দুজনই পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলায় জড়িয়ে পড়েন। ১৮৬৮ সালের ৩০ অগস্ট প্রসন্নকুমার ঠাকুর মারা যান। তাঁর উইলে তিনি লেখেন যে, তাঁর তখনকার আয় ছিলো বছরে আড়াই লাখ টাকারও বেশি এবং এই আয় আরও বাড়ছিলো। এই বিশাল সম্পত্তি তিনি দিয়ে যান তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের, ভ্রাতুষ্পুত্রদের জীবিত এবং ভাবী সন্তানদের, পিতৃব্য পুত্র, নিজের দু কন্যা, দু কন্যার সন্তানদের এবং নিজের কর্মচারীদের। তা ছাড়া, প্রচুর অর্থ রেখে যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং একাধিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্যে। এই উইল থেকে বিশেষভাবে লাভবান হন উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, দুর্গাপ্রসাদ মুখার্জি, ললিতমোহন ঠাকুর, সুরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রমথনাথ ঠাকুর প্রমুখ। কিন্তু সবচেয়ে লাভবান হন কবির এক সময়ের পৃষ্ঠপোষক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।[৪০] একমাত্র যাঁকে তিনি সম্পত্তির কানাকড়িও দেননি, তিনি তাঁর ধর্মচ্যুত পুত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন। সম্পত্তির বর্ণনা দেবার পরই প্রসন্নকুমার তাঁর উইলে বলেন যে, একমাত্র পুত্রের জন্যে – তাঁর বিবেচনায় – যথেষ্ট ব্যবস্থা করার পর, তাঁর যে-সম্পত্তি আছে তা তিনি উপরে বর্ণিত ব্যক্তিদের এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে দান করছেন।[৪১]

তিনি এই উইল করেন ১৮৬২ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে। তার কয়েক মাস আগে পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্যারিস্টার হয়েছেন। এরপর তিনি দুবার এই উইলের খানিকটা সংশোধন এবং সংযোজন করেন মারা যাবার অল্পদিন আগে – ২৩ মার্চ এবং ২৫ জুলাই (১৮৬৮) তারিখে। তিনি নিজে নাম-করা উকিল ছিলেন। তদুপরি তিনি এই উইল করিয়েছিলেন কলকাতার নাম-করা একাধিক ইংরেজ আইনজীবীকে দিয়ে।[৪২] তা সত্ত্বেও, তিনি মারা যাবার ঠিক পরে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে মামলা শুরু হয়। মামলার বাদী ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন। মধুসূদন খৃস্টান হওয়ায়, রাজনারায়ণ

দত্ত যতোটা আঘাত পেয়েছিলেন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টান হওয়ায় প্রসন্নকুমার তার চেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন কিনা জানা নেই। কিন্তু প্রসন্নকুমারের আরও সন্তান ছিলো। রাজনারায়ণের ছিলো না। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে রাজনারায়ণেরই আপাতদৃষ্টিতে বেশি কষ্ট পাওয়ার কথা। প্রসন্নকুমার যখন মারা যান, তখন জ্ঞানেন্দ্রমোহন যে (মাইকেলের মতো) কলকাতা থেকে দূরে ছিলেন, তা-ও নয়। তখন তিনি কলকাতাতেই বাস করছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর অভিযোগে বলেন যে, হিন্দু আইন অনুযায়ী তাঁর পিতা তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। তিনি আরও যুক্তি দেখান যে, তাঁর পিতা যেহেতু তাঁর সম্পত্তির একটা অংশ পেয়েছেন উত্তরাধিকার হিশেবে – সে কারণেও তিনি তাঁকে সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে পারেন না। উইলে সম্পত্তির বর্ণনায় প্রসন্নকুমার স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতা গোপীমোহনের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে বেশ খানিকটা সম্পত্তি লাভ করেছিলেন।[৪৩]

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের প্রধান আইনজীবী ছিলেন সেকালের খুব সফল উকিল আশুতোষ ধর। কিন্তু মাইকেলকেও তিনি কৌঁসুলি রেখেছিলেন। নিজের সম্পত্তি আদায় করতে গিয়ে ১৮৪৯ সালের চার আইনের বিষয়ে মাইকেলকে ভালো করে জানতে হয়েছিলো। সন্তান ধর্মান্তরিত হলে সম্পত্তিতে অধিকার থাকবে কিনা, এ আইন ছিলো সে বিষয়ে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন সম্ভবত সে কারণে তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন। মামলার শেষ আর্জির আগে তিনি জে. পিট কেনেডি, টমাস ইংগ্র্যাম এবং গ্রিফিথ এভান্সকেও নিয়োগ করেন।[৪৪] এই মামলা ছিলো সেকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মামলাগুলোর একটি। ১৮৬৯ সালের ২২ মার্চ এই মামলা শেষ হয়, আর ২৬ মে তারিখে রায় প্রকাশিত হয়। মামলায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ঠিক জয়ী হতে পারেননি – যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বেঁচে থাকা পর্যন্ত তিনি সম্পত্তির কোনো অধিকার পাবেন না – এই রায় দেওয়া হয়।[৪৫] মাইকেল এই মামলায় কৌঁসুলি থাকলেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। তাই পত্রপত্রিকায় এ মামলার যে-খবর প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়নি। দুঃখ করে সে কথা তিনি গৌরদাস বসাকের কাছে লিখেছিলেন।[৪৬] (*ইংলিশম্যান* পত্রিকায় সংক্ষেপে তাঁর নাম উল্লিখত হয়েছিলো – মি দত্ত।[৪৭]) এই মামলার রায় লিখতে গিয়ে জাস্টিস ফিয়ার বহু জায়গায় কেনেডির উল্লেখ করেন। মাইকেলের নাম কোথাও লক্ষ্য করিনি। এ মামলার রায় বের হবার পর যখন আপীল করা হয়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন তখন আর মাইকেলকে আর রাখেননি। এ মামলা থেকে কবি নিঃসন্দেহে কিছু টাকা আয় করেছিলেন। কিন্তু পরিণামে তিনি তাঁর বন্ধু যতীন্দ্রমোহন এবং তাঁর সমর্থক রমানাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষণা হারিয়েছিলেন।

ব্যারিস্টার হিশেবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করতে না-পারলেও, ১৮৬৮-৬৯ সালে মক্কেল তিনি মোটামুটি পেতেন। বিভিন্ন জনের সমসাময়িক রচনা থেকে মনে হয়, তিনি এ সময়ে মাসে দেড়-দু হাজার টাকা আয় করতেন।[৪৮] মামলা তিনি কেবল হাই কোর্টে করতেন না, অনেক সময়ে যেতেন মফস্বলে। কখনো কৃষ্ণনগর, কখনো বর্ধমান, কখনো যশোরে। একবার গিয়েছিলেন বারুইপুরে। তখন সেখানে হাকিম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[৪৯] সুদূর ঢাকা এবং পুরুলিয়ায়ও তিনি গিয়েছিলেন। মফস্বলে তাঁকে যাঁরা নিয়ে যেতেন, তাঁরা 'ব্যারিস্টার' নিতেন বিচারককে প্রভাবিত করে মামলায় জয়ী হবার প্রলোভনে, অনেক ক্ষেত্রে একবারই। যতোদিন স্পেন্সেস হোটেলে ছিলেন, তখন কতো মক্কেল পেতেন, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। কিন্তু ভার্সাই থেকে পরিবার ফিরে আসার পর, তিনি যখন তাঁর চেম্বার সরিয়ে নেন ৭ নম্বর ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে, তখনকার একদিনের খবর থেকে জানা যায়, তাঁর কাছে মাঝেমধ্যে কতো মক্কেল আসতেন। ১৮৬৯ সালের ৩০ জুলাই এই চেম্বারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন গৌরদাস বসাক। কিন্তু সেদিন মক্কেলদের

নিয়ে তিনি এতো ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর প্রিয় বন্ধুর সঙ্গেও কথা বলার সুযোগ পাননি।[৫০] হতাশ হলেও, গৌরদাস তাতে ক্ষুণ্ন হননি। তিনি আন্তরিকভাবে চাইতেন, তাঁর বন্ধু যাতে ব্যারিস্টার হিশেবে বিখ্যাত হতে পারেন এবং চুটিয়ে ব্যবসা করতে পারেন — যেমনটা এক সময়ে রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র এবং অন্যান্য সফল আইনজীবী করেছেন। এমন কি, কবি যে আইনজীবী হবার জন্যে তাঁর সাহিত্য-জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন তাতেও গৌরদাসের দুঃখ ছিলো না।[৫১] কারণ পদ্য-লিখিয়ের চেয়ে একজন অর্থবান এবং নাম-করা ব্যারিস্টার তখনকার সমাজের তুলাদণ্ডে অনেক বেশি সফল বলে গণ্য হতেন।

তবে কবির চেম্বারে ভিড়ের দরুন দেখা করতে না-পারার ঘটনা মোটেই প্রতিদিনের ঘটনা নয়। বরং কাজ কমে যাচ্ছে, সে কথাও কবির চিঠিপত্র থেকে জানা যায়। এ বছরের (১৮৬৯) মার্চ মাসে লেখা একটি চিঠিতে তিনি যেমন গৌরদাসের কাছে দুঃখ করে লিখেছিলেন যে, হাই কোর্টের আপীল বিভাগে তেমন কাজ নেই। বিশেষ করে নতুন স্ট্যাম্প আইনের দরুন লোকে মামলা করতে পারছে না। এই কারণে আপীল বিভাগ ছেড়ে তিনি হাই কোর্টের অরিজিন্যাল সাইডে কাজ শুরু করেছেন। এ সময়ে মামলা-মকদ্দমা এতো কম পাচ্ছিলেন যে, লাখনৌ গিয়ে প্র্যাক্টিস করার কথাও ভেবেছিলেন।[৫২] এর তিন বছর আগে এলাহাবাদ হাই কোর্ট স্থাপিত হয়েছিলো। সেখানে তখনো ব্যারিস্টারদের ভিড় জমেনি। আশা করেছিলেন, সেখানে গেলে একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারবেন। বস্তুত, তিনি যেমনটা আয় করবেন বলে কল্পনা করেছিলেন, তা যে তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়, এটা তিনি প্র্যাক্টিস শুরু করার বছর দেড়েকের মধ্যে টের পেয়েছিলেন। সে কারণে, অন্য কিছু করা যায় কিনা, তিনিও তা-ও ভাবছিলেন। ১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শুনতে পান যে, কোর্ট অব স্মল কজেজ-এর বিচারক জর্জ মৌন্ট ফ্যাগান অবসর নিয়ে বিলেতে চলে যাচ্ছেন এবং তাঁর জায়গাতে বিচারক নিযুক্ত হবার কথা হচ্ছে এন টমসনকে। এ খবর তিনি ফ্যাগানের কাছ থেকেই শুনে থাকবেন। এক সময়ে পুলিশ কোর্টে তিনি ফ্যাগানের সঙ্গে কাজ করেছিলেন এবং তাঁকে পছন্দ করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। ফ্যাগান থাকতেনও মাইকেলের খিদিরপুরের বাড়ির একেবারে কাছে। এ খবর শুনেই কবি বিদ্যাসাগরের কাছে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তাঁকে অনুরোধ জানান, এই চাকরিটা তাঁকে দেবার জন্যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর উইলিয়াম গ্রের কাছে তদবির করতে। সেই সঙ্গে তিনি আরও জানান যে, সরকার এই পদের জন্যে চাইছে একজন ব্যারিস্টার। (ফ্যাগানও ব্যারিস্টার ছিলেন।) এর মাত্র কয়েক মাস আগে ধার শোধ এবং জমি বিক্রি নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ টক হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও, এখন এই পদের জন্যে তাঁকে অনুরোধ করা থেকে বোঝা যায়, এটা পাওয়ার জন্যে তিনি কতো আগ্রহী হয়েছিলেন। অতীতের তিক্ততার কথা মনে করে তিনি আরও লেখেন

> ব্রাহ্মণ হলেও, আমি নিশ্চিত যে, আপনি সেই পুরা কালের ক্রুদ্ধ দুর্বাসার বংশধর নন। আমি এটা বিশ্বাস করতে পারিনে যে, আমার কোনো আহাম্মুকির দরুন আপনার মহৎ হৃদয় আপনার খুব ভক্ত কিন্তু হতভাগ্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছ থেকে অন্য দিকে ফিরে যেতে পারে।[৫৩]

তখন প্রথম বিচারক ফ্যাগানের বেতন ছিলো আড়াই হাজার টাকা। দ্বিতীয় বিচারক এন এইচ টমসনের দেড় হাজার আর তৃতীয় বিচারক হরচন্দ্র ঘোষের বারো শো।[৫৪] ব্যারিস্টার হয়ে আসার পর মাইকেল এক সময়ে মাসে ছ হাজার টাকা আয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এখন আড়াই হাজার টাকার চাকরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে রীতিমতো তদবির করতে আরম্ভ করলেন। এ থেকে বোঝা যায়, ব্যারিস্টার হিশেবে তাঁর আপেক্ষিক ব্যর্থতার কথা তিনি নিজেও অনুভব করতে পারছিলেন। স্বাস্থ্যও এ সময়ে তাঁর উদ্বেগের কারণ হয়েছিলো। ভাঙ্গা গলা নিয়ে মামলায় আর্জি অথবা সওয়াল-জওয়াব করা অথবা বিচারকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যে শক্ত ব্যাপার, তাও তিনি অনুধাবন করে থাকবেন। তিনি আরও

লক্ষ্য করেছিলেন যে, তিনি তাঁর কথা দিয়ে বিচারকদের মনে তেমন আস্থা স্থাপন করাতে পারেন না। আসলে, তিনি যে কেবল হাই কোর্টে প্রবেশ করার সময়ে বিচারকদের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাই নয়, পরবর্তী কালেও বিচারকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হয়নি। এ ব্যাপারে বিচারপতিদের তুলনায় তাঁদের প্রতি তাঁর মনোভাব বেশি দায়ী ছিলো বলে মনে হয়। জ্যাকসন, কেম্প, ম্যাকফারসন প্রমুখ বিচারপতিকে তিনি মোটেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেননি। বিচারপতিদের প্রতি তাঁর এই মনোভাবের সূচনা একেবারে গোড়া থেকে, কারণ বিচারপতিরা তাঁকে যে একদিন ব্যারিস্টার হিশেবে গ্রহণ করতেও আপত্তি করেছিলেন, এটা তাঁর পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তদুপরি, নিজের সম্পর্কে তাঁর যে-পর্বতপ্রমাণ উচ্চ ধারণা ছিলো, তার ফলে তিনি এই বিচারপতিদের বোধহয় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেও পারেননি। মাঝেমধ্যে মামলা পরিচালনার সময়ে তিনি বিচারকদের ধারালো কথা শোনাতেন, এমন কি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন। একটি দৃষ্টান্ত থেকে এর স্বরূপ বোঝা যাবে। একবার বিচারপতি জ্যাকসন তাঁর আর্জি শুনে বিরক্ত হয়ে বলেন: 'The Court orders you to plead slowly, the Court has ears.' রসিক এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন: 'But pretty too long, my Lord.'[৫৫] এ রকমের উত্তর শুনে অনেকে নিশ্চয় তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু জন্তুবিশেষের সঙ্গে তুলনা করায় বিচারপতি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হতে পারেননি – এটা বলাই বাহুল্য।

অথচ একজন সফল ব্যারিস্টারের সঙ্গে বিচারকদের সম্পর্কে থাকা দরকার পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বন্ধুত্বের। হাই কোর্টে প্রবেশের ব্যাপারে যিনি তাঁকে সবচেয়ে সহায়তা করেছিলেন, সেই বিচারক শম্ভুনাথ পণ্ডিত মারা যান মাইকেল প্র্যাক্টিস শুরু করার (৭ মে ১৮৬৭) ঠিক তিরিশ দিন পরে – ৬ জুন তারিখে। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর মাধ্যমে অন্য বিচারপতিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং সম্পর্ক ভালো হতে পারতো। শম্ভুনাথের পর বিচারপতি হন অনুকূল মুখোপাধ্যায়। তিনি বিদ্যাসাগরের কথায় ধার দিলেও কবির প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো সহানুভূতি ছিলো বলে মনে হয় না। মোট কথা, আইনজীবী হবার ব্যাপারে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী আদৌ আনুকূল্য করেনি। ব্যারিস্টার হিশেবে তাঁর আর-একটা দোষের কথাও আমরা জানতে পাই। তিনি অনেক সময়ে আইনের উল্লেখ না-করে অপ্রাসঙ্গিকভাবে আওড়াতেন কবিতার পঙ্‌ক্তি।[৫৬] মোট কথা, ব্যারিস্টার হিশেবে তিনি না বিচারকদের মধ্যে, না মক্কেলদের মধ্যে সুনাম অর্জন করতে পেরেছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন সেকালের বঙ্গদেশের সবচেয়ে লেখাপড়া-জানা লোকদের অন্যতম।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, তিনি যাঁদের সঙ্গে মিশতেন, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। কিন্তু সবার সঙ্গে মিশতেন না। তিনি যে ধনী এবং সুপরিচিত উকিলের পুত্র, লেখাপড়ায় ভালো, কবিতা লেখেন, প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পান, কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপাল তাঁকে বিশেষ স্নেহ করেন – ইত্যাদি তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড আত্মম্ভরিতার জন্ম দিয়েছিলো। তাঁর বিশপস কলেজের অধ্যাপক তাঁর এই আত্মম্ভরিতার কথা সেকালেই লিখেছিলেন।[৫৭] তিনি জনতার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারতেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এমন একটি পেশা বেছে নিলেন, যাতে জনতার সঙ্গেই তাঁর কাজ করতে হয়। ব্যারিস্টারি ছিলো তাঁর স্বভাবের একেবারে বিরোধী। সে জন্যে, ব্যারিস্টার হবেন বলে তিনি যখন সংকল্প করেছিলেন, তখনই নিজের সর্বনাশের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিলেন। বস্তুত, জীবন নিয়ে তিনি বারবার জুয়া খেলেছেন। এখন ব্যারিস্টারিতে সীমিত সাফল্য লক্ষ্য করে তিনি ভাবলেন যে, বাঁধা আয়ের জজিয়তি পেলে কল্পনায় বিলাসিতার যে-ছবি এঁকে-ছিলেন, তেমন জীবন যাপন করতে না-পারলেও, অন্তত সপরিবারে সচ্ছলভাবে বেঁচে থাকতে পারবেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য এবারেও তাঁর প্রতি স্মিতহাস্য করেনি। বিদ্যাসাগর ছোটো লাটের কাছে সুপারিশ করেছিলেন কিনা, জানা নেই।

করে থাকলেও, সে চাকরি কবি পেলেন না। কারণ ফ্যাগান তখন অবসর না-নিয়ে তার বদলে য়োরোপে গেলেন কেবল ছুটি কাটাতে।

ব্যারিস্টারি থেকে তাঁর আর্থিক অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হতে পারেনি — এ কেবল মক্কেলের অভাবে নয়। মক্কেলদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার মতো কৌশল অথবা মনোবৃত্তিও তাঁর ছিলো না। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকে বলেছেন যে, দুঃসহ অনটনের মধ্যেও তিনি পরিচিতদের কাছ থেকে টাকা নিতে পারতেন না। যখন তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব করুণ, তখনকার একটি গল্প থেকে তাঁর এই মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক পরিচিত ব্যক্তি এ সময়ে তাঁর এক আত্মীয়কে নিয়ে তাঁর কাছে যান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মামলা নিতে রাজি হন। কিন্তু, অনুরোধ করা সত্ত্বেও, তার কাছ থেকে টাকা নিতে রাজি হননি। তবে ভাঁড়ারের অবস্থা বিবেচনা করে শেষে বাজার করার জন্যে পাঁচটি টাকা হেনরিয়েটাকে দিতে অনুরোধ করেন।[৮৮] এ জাতীয় আরও একটি গল্প তাঁর জীবনীকারেরা উল্লেখ করেছেন। গান শুনে তিনি এক মক্কেলের মামলা বিনে পয়সায় করে দিয়েছিলেন।[৮৯] এ গল্প দুটি কতোটা সত্য বলা যাচ্ছে না। অতিরঞ্জন থাকা সম্ভব। কিন্তু এ থেকে কবির বিষয়বুদ্ধির অভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত, আর্থিক অবস্থা খারাপ হবার সবচেয়ে বড়ো কারণ তাঁর নিজের স্বভাবের মধ্যেই লুকানো ছিলো।

*

ব্যারিস্টার হিশেবে যৎকিঞ্চিৎ সাফল্য আসা সত্ত্বেও, তাঁর অর্থকষ্টের আর-একটি কারণ পরিবার য়োরোপে রেখে আসার হঠকারী সিদ্ধান্ত। তীব্র অভাবের মধ্যে তিনি নিজে যখন ভার্সাইতে ছিলেন, পরিবারের জন্যে মোটামুটি সে রকমের ব্যয় হবে বলে তিনি গোড়াতে মনে করে থাকবেন। কিন্তু কার্যকালে ব্যয় হয়েছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি। একজন ব্যারিস্টারের স্ত্রী হিশেবে এই প্রথম বার হেনরিয়েটা ছুটি কাটানোর জন্যে দূরে কোথাও যাওয়া শুরু করেন। কনিষ্ঠ পুত্র অ্যালবার্ট নেপোলিয়নের জন্মের সাড়ে তিন মাস পরে যেমন তিনি এক মাসের জন্যে অবকাশ কাটাতে যান প্যারিসের উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্রবন্দর ডীয়েপে।[৯০] তদুপরি, মোরপা সড়কের অভিজাত পাড়ায় ভদ্রলোকদের মধ্যে জীবন যাপন করতে গিয়েও তাঁর ব্যয় হচ্ছিলো যেমনটা ধারণা করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি। তিন বছর আগে রু দ্য শাঁতিয়ের গরিব পাড়ায় থাকার সময়ে যে-ধরনের জীবন যাপন করেছিলেন, এবারে তিনি তেমন জীবন যাপন করতে পারেন না! পাণ্ডিত্য এবং ধারালো বুদ্ধি সত্ত্বেও স্বামী যে ব্যারিস্টারিতে তেমন সফলতা অর্জন করতে পারছেন না — এ খবরও বোধ হয় তিনি দূর থেকে জানতেন না। সুতরাং তাঁর প্রত্যাশা এবং স্বামীর কাছ থেকে যে-টাকাপয়সা পাচ্ছিলেন, তার মধ্যে কোনো সঙ্গতি ছিলো না। অভিজাত পরিবেশে তাঁর পরিবার বাস করবে — এ ছিলো কবির চিরদিনের প্রত্যাশা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরিবার যাতে সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে, তিনি তেমন টাকাপয়সা পাঠাতে পারেননি। সে জন্যে, তিনি নিজে যেমন বিলাসবহুল স্পেন্সেস হোটেলে বসেই আর্থিক অনটনে ছটফট করছিলেন, হেনরিয়েটাও তেমনি রাজপ্রাসাদের পাশে থেকেও এক দিকে নিঃসঙ্গতা, অন্য দিকে অব্যাহত আর্থিক অনটনের মধ্যে অত্যন্ত অসুখী সময় কাটাচ্ছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে হেনরিয়েটা মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কবিকে সঙ্গ দিতে গিয়ে মদ্যপান তিনি শুরু করেছিলেন কলকাতায় থাকতেই। কিন্তু ভার্সাই-বাসের সময়ে রীতিমতো আসক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর এ সময়কার একটি হোটেলের বিল রক্ষা পেয়েছে। তা থেকে দেখা যায়, হোটেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে রোজ দু বোতল ওয়াইন সরবরাহ করতো।[৯১] এই সুরা তিনি একাই পান করতেন, না কি তাঁর কোনো বন্ধু তাঁকে সঙ্গ দিতেন, তা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু একটা কথা অনায়াসে বলা যেতে পারে, তা হলো:

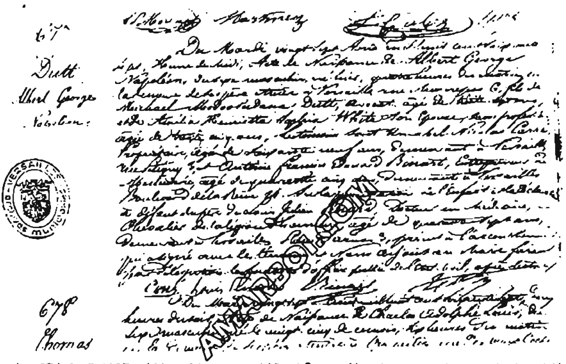
দু বোতল ওয়াইন কোনো সুস্থ লোক রোজ পান করতে পারে না, অথবা পান করলে সুস্থ থাকতে পারে না। এ সময়ে হেনরিয়েটা শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর এ সময়কার জীবনযাত্রা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে তিনটি ছোটো ছোটো সন্তান নিয়ে চরম সংকটের মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন, তা বোঝার জন্যে গবেষণা নিষ্প্রয়োজন।[৮২]

সংকটে পড়ে মাতাল হলেও, হেনরিয়েটা কাণ্ডজ্ঞান হারাননি। তিনি হঠাৎ এ সময়ে একটা সিদ্ধান্ত নেন — কলকাতায় ফিরে যাবার। ঠিক ছ বছর আগে তিনি এমনি আকস্মিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কলকাতা ছেড়ে বিলেত যাবার। সেদিন যেমন চরম প্রতিকূল পরিবেশে মরিয়া হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এবারেও পরিস্থিতি ছিলো তেমনি চরম। বিলেত যাবার সময়ে অবশ্য একটা সুবিধে ছিলো — মহাদেবের কাছ থেকে টাকা আদায় করে জাহাজের ভাড়া জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু এবারে? এবারে সে সুযোগও ছিলো না। সে কারণে ১৩ মার্চ (১৮৬৯) তিনি এক পরিচিত ফরাসি ভদ্রলোকের কাছে ব্যাকুল একটি চিঠি লিখলেন, প্যারিসের স্টীম নেভিগেশন কম্পেনিকে প্রভাবিত করে তাঁকে কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা করে দিতে। তিনি লিখেছিলেন যে, তাঁর কাছে এমন টাকাপয়সা নেই যাতে তিনি তাঁর সন্তানদের নিয়ে ফ্রান্সে বসবাস করতে পারেন। তিনি আরও লেখেন যে, তাঁর যেসব জিনিশপত্র আছে, তা বিক্রি করে তিনি ন শো কি এক হাজার ফ্রঁ জোগাড় করতে সক্ষম হবেন। এই টাকার বিনিময়ে জাহাজ কম্পেনি তাঁর দুটি ছোটো সন্তান এবং তাঁকে ভারতবর্ষে যেতে না-দিলে তিনি সন্তানদের নিয়ে খুব দুরবস্থায় পড়বেন।[৮৩] এখানে লক্ষ্য করার একটি বিষয় হলো: তিনি জাহাজ কম্পেনির অনুকম্পা লাভের আশায় অনৃত ভাষণের আশ্রয় নিতেও দ্বিধা বোধ করেননি। তিনি লিখেছিলেন, তাঁর এবং তাঁর দুটি ছোটো সন্তানের যাত্রার ব্যবস্থা করার জন্যে। কিন্তু এ সময়ে তাঁর আসলে তিনটি সন্তান ছিলো। ছোটোটির বয়স এক বছর দশ মাস। অবশ্য হতে পারে, অতো কম বয়সী সন্তানের ভাড়া লাগবে না — এ কথা মনে করে তিনি তার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তখন মার্সেই থেকে কলকাতা পর্যন্ত ভাড়া ছিলো প্রায় আড়াই হাজার ফ্রঁ। সুতরাং জাহাজ কম্পেনি মাত্র এক হাজার ফ্রঁর বিনিময়ে একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং নয় ও সাত বছরের দুটি সন্তানকে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি। তবে তারা ভাড়া খানিকটা কমাতে রাজি হয়েছিলো। পূর্বোক্ত চিঠিটি লেখার কদিন পরে সৌভাগ্যক্রমে তিনি টাকা পান (মাইকেলের কাছ থেকে)।[৮৪] সঙ্গে সঙ্গে কম ভাড়ার টিকিট কিনে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ভারতবর্ষগামী প্রথম জাহাজে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তিনি ঠিক কবে কলকাতা পৌঁছেছিলেন, জাহাজের যাত্রীদের তালিকা থেকে তার খবর জোগাড় করতে পারিনি। তবে মে মাসের প্রথমার্ধের মধ্যে — এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কলকাতায় পৌঁছে তিনি দু বছর চার মাস পরে মাইকেলকে দেখতে পান। দেখতে পান শারীরিকভাবে তিনি কেমন আছেন; ব্যারিস্টার হিশেবে তাঁর কতোটা পসার হয়েছে এবং তাঁর আয়ব্যয় কেমন। আগের বার কলকাতায় যখন ছিলেন, তখন স্বামীর আয় ছিলো সামান্য — বেতন এক শো পঁচিশ টাকা। ৬ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোড অথবা ৬ নম্বর জেমস লেইনে সেই অল্প আয় দিয়ে সংসার চালানো তাঁর পক্ষে সহজ ছিলো না। তারপর ভার্সাইতেও সময় কেটেছে দুঃস্বপ্নের মধ্যে। কিন্তু তখন কষ্ট স্বীকার করেছেন স্বামী ব্যারিস্টার হয়ে একদিন সংসারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসবেন — এই আশায়। তা সত্ত্বেও, কলকাতায় ফেরার আগেকার দু বছরে সেই স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো নমুনা তিনি দেখতে পাননি। দু বছর আইন-ব্যবসা করেও স্বামী যে ঋণ ছাড়া অন্য কিছু সঞ্চয় করতে পারেননি, তা দেখে তিনি বিচলিত বোধ করে থাকবেন। তদুপরি, স্পেন্সেস হোটেলে পাশের কামরায় বসে স্বামী নানা লোকের ভিড়ে সময় কাটান আর কখনো কখনো মামলার সূত্র ধরে তাঁকে যেতে হয় মফস্বলে — এটা দেখে তিনি প্রসন্ন মনে তাকে মেনে নিতে পেরেছিলেন কিনা, বলা মুশকিল। তাঁর পক্ষে ভাবা অসম্ভব নয়

যে, তাঁর এবং সন্তানদের কাছ থেকে স্বামী সরে গেছেন অনেক দূরে। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখেও তিনি উদ্বিগ্ন বোধ করে থাকবেন। কারণ ততোদিন কবি অসম্ভব মোটা হয়েছেন। ৪৫ বছর বয়সেই প্রৌঢ়ত্ব তাঁকে আপাদমস্তক অধিকার করেছে। ভাঙ্গা গলাও তাঁর এক কালের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একদম বেমানান। সাড়ে দশ বছর আগে এঁরই গলায় বরমাল্য পরাতে তিনি এসেছিলেন সুদূর মাদ্রাস থেকে!

বিদেশে থাকার সময়ে মাইকেল একাধিক বার বিদ্যাসাগরের কাছে হেনরিয়েটার সাংসারিক বুদ্ধির প্রশংসা করেছিলেন।[৩০] সেই সাংসারিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে হেনরিয়েটা কবিকে হোটেল ছাড়তে রাজি করান। তবে তিনি যথেষ্ট সাংসারিক বুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। হোটেলের বিলাসিতা ছেড়ে তিনি চেয়েছিলেন একটি ভদ্র বাড়িতে গুছিয়ে বসতে। সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজের এবং



Tuesday, 27th April, 1867, midday. A boy named Albert George Napoleaon, was born yesterday at 4 in the morning in the house of his mother and father at 6 rue Maurapas in Versailles. He is the son of Michael Modoosudana Dutt, advocate, aged 37 years, and his wife, Amelia Henrietta Sophia White, aged 31, jobless. The witnesses are Annabel Nicolas Carre, landlord, aged 69, of 3 rue Petigny in Versailles, and Antoine Francois Edouard Binart, Carpenter, aged 45, of 14 Boulevard de le Reine in Versailles. The child was declared to the Alderman/Deputy Mayor, acting as the Registrar, not by his father, but by Louis Julien Penard, Doctor of Medicine, Knight, aged 47, of 3 Place d'armes, who delivered the baby.

কনিষ্ঠপুত্র নেপোলিয়ানের জন্মসংক্রান্ত দলিল

সন্তানদের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করার স্বপ্নও দেখাও তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই আশা নিয়ে জুন মাসে (১৮৬৯) তাঁরা ৬ নম্বর লাউডন স্ট্রীটে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাঁরা এমন একটা বাড়ি নির্বাচন করলেন, যার ভাড়া ছিলো মাসে চার শো টাকা। সেকালের বিবেচনায় যা ছিলো খুবই ব্যয়বহুল। বাড়ি পছন্দ করার ব্যাপারে হেনরিয়েটা কবির বিলাসিতার লাগাম টেনে ধরতে পারেননি। অথবা তাঁদের যা আয়, তাতে তাঁরা এ বাড়ির ভাড়া জোগাতে পারবেন কিনা, সে ব্যাপারে তিনি যথোচিত উপদেশ দিতে পারেননি।

কবি এ বাড়ি সাজিয়েছিলেন অত্যাধুনিক আসবাবপত্র, চিত্র এবং বিলাসিতার নানা উপকরণ দিয়ে। বিদেশ থেকে তিনি কিনে এনেছিলেন তাঁর প্রিয় কবি এবং নাট্যকারদের আবক্ষ মূর্তি। সেসব তাঁর বসার ঘর অলঙ্কৃত করেছিলো। তাঁর বাড়ির বাগান ছিলো একেবারে বিদেশী স্টাইলের — এমন কথাও তাঁর জীবনীকারেরা বলেছেন।[৩১] তাঁর জুড়িগাড়িও ছিলো তাঁর 'মর্যাদার সঙ্গে মানানসই'। যে-লাউডন স্ট্রীটে তিনি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন, সে জায়গাটা ছিলো কলকাতার সবচেয়ে বিলাসবহুল পাড়াগুলোর

পড়েছে এই রাস্তা। এ রাস্তায় তখন একজনও দেশীয় লোক থাকতেন না। ১ নম্বরে থাকতেন বি ক্ল্যার্ক, প্রকৌশলী। ২ এবং ৩ নম্বরে থাকতেন দুটি বিদেশী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। ৪ নম্বরে থাকতেন ই ক্যামেরন, হংকং অ্যান্ড শাংহাই ব্যাংকের প্রতিনিধি। এ রাস্তার ৯ নম্বর বাড়িতে থাকতেন ক্যাপ্টেন হোয়াইট, নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা। আর ১২ নম্বরে কর্নেল বার্ন, ভারত সরকারের সামরিক সচিব। ৬ নম্বর বাড়িতে মাইকেল ওঠার আগে সেখানে থাকতেন ভারত সরকারের মিলিটারি অ্যাকাউন্ট বিভাগের সহকারী জেনরেল অ্যাকাউন্টেন্ট – একজন লেফটেনেন্ট কর্নেল।[৬৮]

স্পেন্সেস হোটেলে থাকার সময়ে হেনরিয়েটা লক্ষ্য করেছিলেন যে, মক্কেল হিশেবে কবির কাছে অনেক সাধারণ মানুষ ভিড় করে। ব্যারিস্টারি করতে হলে এটা মেনে না-নিয়ে উপায় নেই। মনোমোহন ঘোষ প্র্যাক্টিস শুরু করার বছর খানেকের মধ্যে স্পেন্সেস হোটেল ছেড়ে দিয়ে ৪৮ নম্বর চৌরঙ্গি রোডে ব্যালার্ডস বিল্ডিং নামক চমৎকার বাড়িতে উঠেছিলেন।[৬৯] একই বাড়িতে তিনি প্র্যাক্টিস করতেন এবং বসবাস করতেন। বছর দুয়েক পরে তিনি চলে যান ১৪ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে।[৭০] সেখানেও তিনি কেবল বসবাস করতেন না, সেই সঙ্গে প্র্যাক্টিসও করতেন। মোট কথা, তিনি নিজের কাপড়ের মাপে কোট তৈরি করতে জানতেন। কিন্তু কবির এই কাণ্ডজ্ঞান ছিলো না। সুতরাং বিরাট দোতলা বাড়ি ভাড়া করলেও (এই বাড়িটা এতো বড়ো ছিলো যে, এক সময়ে এখানে থাকতো চারটি পরিবার।) সেখানে প্র্যাক্টিস না-করে, তিনি ওল্ড পোস্ট অফিস রোডের ৭ নম্বর বাড়িতে নিজের চেম্বার খোলেন। এই রাস্তা ছিলো ব্যারিস্টারদের পাড়া। সেকালের মোট জনা চল্লিশ ব্যারিস্টারের মধ্যে বারো জনের চেম্বার ছিলো এই রাস্তায়।[৭১] এভাবে স্পেন্সেস হোটেল ছেড়ে ব্যয়সংকোচের প্রয়াস চালানো হলেও, একই সঙ্গে ব্যবস্থা হলো বাড়তি ব্যয়ের।

বিলাসিতার উপকরণ এবং ভৃত্যপরিবৃত এই সংসার চালানোর জন্যে, বলা বাহুল্য, অনেক খরচ হতো। তাঁর ধারের খতিয়ান থেকে মনে হয় তিনি যতো টাকা আয় করতেন, তাঁর সংসার বাবদে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় হতো। অথচ হেনরিয়েটা সম্পর্কে বারবার কবির অকুণ্ঠ প্রশংসা থেকে মনে হতে পারে, হেনরিয়েটা সুগৃহিণীর মতো মিতব্যয়িতার সঙ্গে সংসার চালাতে পারতেন। কিন্তু লন্ডন এবং লাউডন স্ট্রীটে তিনি যেভাবে সংসার পরিচালনা করেন, তাতে মনে হয় না, তিনি আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারতেন। তিনি মাঝেমধ্যে দৃঢ় হাতে সংসারের লাগাম টেনে ধরার, স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা কি করতেন না? করতেন বলেই মনে হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখাতে সক্ষম হতেন বলে মনে করা শক্ত। সে জন্যে 'সুগৃহিণী' হেনরিয়েটার ব্যয়-সংকোচের পরিকল্পনা কল্পনাই থেকে যায়।

আলোচ্য কালে কবি ব্যারিস্টারিতে যৎকিঞ্চিৎ সাফল্য দেখালেও দুর্দিনের জন্যে কোনো সঞ্চয় করতে পারেননি। হোটেলে থাকার সময়ে কবি পরিচিতদের প্রায়ই ভোজ দিতেন, মদ্যপান করাতেন। হেনরিয়েটাকে নিয়ে লাউডন স্ট্রীটে বসবাস করতে আরম্ভ করার পর এই পথে তাঁর ব্যয় কমে গিয়েছিলো মনে করা সঙ্গত। তবে তখন ব্যয়ের বিকল্প পথ খুলে যেতে সময় লাগেনি। পাশ্চাত্যে বছরে অন্তত একবার কাজকর্ম বন্ধ রেখে বাড়ি থেকে দূরে কোথাও গিয়ে ছুটি কাটানোর রীতি খুব জনপ্রিয়। ভার্সাই থাকার সময়ে হেনরিয়েটা এ রকম দূরে গিয়ে ছুটি কাটাতেন – আগেই তা উল্লেখ করেছি। তিনি কলকাতায় ফেরার পর মাইকেলের ব্যয় করার একটা নতুন পথ তৈরি হয়েছিলো এভাবে ছুটি কাটানোর মাধ্যমে। বাঙালিরা সেকালে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যেতো, কিন্তু ছুটি কাটানোর এই পাশ্চাত্য ধারণা তাদের মধ্যে তখনো অজ্ঞাত ছিলো। লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে ওঠার কয়েক সপ্তাহ পরে অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে জুলাই মাসে কবি সপরিবারে যান উত্তরপাড়ায়। এখানে তাঁরা ছিলেন প্রায় তিন মাস।

তারপর উত্তরপাড়া থেকে যান চন্দননগরে।[৩২] সাড়ে চার বছর ফ্রান্সে থাকায় হেনরিয়েটা ফরাসি ভাষা ভালোই শিখেছিলেন। কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং পুত্র (ফ্রেডারিক) মেঘনাদ ফরাসি ভাষা শিখেছিলো প্রায় মাতৃভাষা ইংরেজির মতো। আর স্বয়ং মাইকেলের ফরাসি ভাষা প্রধানত কেতাবী ভাষা হলেও, তিনি সে ভাষা বলতে পারতেন। ফ্রান্সের প্রতি নস্টালজিয়ার কারণেই ছুটি কাটাতে তাঁরা চন্দননগরে গিয়েছিলেন। সেখানে তখনো ফরাসি নাগরিকরা ছিলেন আর ছিলো ফরাসি সংস্কৃতির চর্চা। কিছু কাল পরে — সম্ভবত পরের বছর — শ্রীরামপুরের একটি বাগানবাড়িও তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন, সেখানে ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে।[৩৩]

এই অবকাশ যাপন পরিবার এবং কবির স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো ফল দিয়ে থাকবে। কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে এটা দুভাবে তাঁর ক্ষতি করেছিলো। প্রথমত এর ফলে তিনি সদ্য যে-ব্যবসা শুরু করেছিলেন, তাতে ছেদ পড়ে। দ্বিতীয়ত, এটা ছিলো খুব ব্যয়বহুল। তিনি নিজেই সে কথা লিখেছিলেন গৌরদাসকে। 'আমি এই মুহূর্তে শহরে আছি, কারণ শহরের বাইরে থাকা একটা বিলাসিতা, যা একজন নবীন ব্যারিস্টারের পক্ষে জোগানো সহজ ব্যাপার নয়।'[৩৪] কিন্তু অতো ব্যয় করা সহজ নয় — জেনেও যিনি স্পেন্সেস হোটেলে থেকেছেন, চার শো টাকা ভাড়ার বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, শহরের বাইরে অবকাশ যাপন করতে এসেছেন, দারিদ্র্যকে যিনি জেনেশুনে স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন — তাঁকে দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচাবে কে? তদুপরি, তাঁর ভাগ্য অথবা পরিবেশও তাঁকে আনুকূল্য করেনি। তিনি যে নির্ভরযোগ্য ব্যারিস্টার নন — ১৮৭০ সাল নাগাদ এই অখ্যাতি দানা বাঁধতে থাকে। ফলে প্র্যাক্টিস কমে আসে। তা ছাড়া, স্বরভঙ্গ দেখা দেয় আরও গুরুতরভাবে। শারীরিক পটুত্বও হারিয়ে ফেলেন। এতো কাল যে অতিরিক্ত মদ্যপান এবং এবং অনিয়ম করেছেন, এখন সেই বিষবৃক্ষে ফল ধরে। যকৃতের অসহযোগ এ সময়েই শুরু হয়। তবু সংসার চালানোর জন্যে সেই ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি মফস্বলে যেতে থাকেন। ওদিকে, মফস্বলে গেলে অনিয়ম ঘটে। স্বাস্থ্যের ওপর প্রতিক্রিয়া হয়। স্বাস্থ্য খারাপ হলে কাজ করার ক্ষমতা আরও কমে যায়। এমন একটা আবর্ত চক্রকে পড়ে দ্রুত তিনি সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যান। এমন কি, এ পর্যায়েও তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না যে, আর মাত্র আঠারো মাসের মধ্যে তাঁর ভাগ্যে নেমে আসবে চরম দুর্দশা। তা না হলে তিনি আর-একটু সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেতেন। হয়তো আরও কিছু দিন বেঁচে থাকতেন।

নিজের শক্তি ফুরিয়ে এসেছে এবং ব্যারিস্টারি করে রাশি রাশি টাকা আসার সম্ভাবনা সদূর পরাহত — এটা অবশ্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭০ সালে তিনি একটা চাকরি পেতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। দু বছর আগে স্মল কোর্টের বিচারক হতে না-পারলেও, এ বছর জুন মাসের গোড়ায় তিনি হাইকোর্টে একটা কাজ পান। কোনো নির্দিষ্ট বেতনের চাকরি নয় — তাঁকে নিযুক্ত করা হয় প্রিভি কাউন্সিলের রেকর্ডসমূহের পরীক্ষক হিশেবে। *ইংলিশম্যান* পত্রিকায় তাঁর নিয়োগের পর যে-সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়, তা থেকে মনে হয়, প্রিভি কাউন্সিলে মামলার যে-নথিপত্র বাংলা থেকে তরজমা করা হতো, তিনি তার তদারকি করতেন।

> হাই কোর্টের প্রিভি কাউন্সিল রেকর্ডের পরীক্ষক হিশেবে মিস্টার মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল-এর নিয়োগের ব্যাপারে কোনো দিক থেকে আপত্তির কারণ আছে বলে মনে হয় না। এই কাজের সঙ্গে যে-দায়িত্ব জড়িত আছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ; এবং এ কাজ ঠিকমতো করতে পারবেন এমন কোনো ব্যক্তি, যাঁর সন্দেহাতীতভাবে ক্ষমতা আছে এবং যাঁর পেশাদারী চরিত্র উন্নত শ্রেণীর। এর থেকে ভালো পছন্দ করা প্রায় অসম্ভব ছিলো। তা ছাড়া, এমন আর-একজন দেশীয় লোক খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না যিনি ইংরেজি ভাষার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

তাঁর বেতন কতো ছিলো, অ্যাকাউন্টেন্ট জেনরেলের লেজার থেকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু তাঁর বেতন দূরে থাক, লেজারে তাঁর নাম পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। অথচ হাই কোর্টের প্রতিটি বিচারক এবং সহায়ক কর্মচারীর বেতনের খবর তাতে দেওয়া আছে। আসলে, তাঁর কোনো নির্দিষ্ট বেতন ছিলো না এবং *ইংলিশম্যান* পত্রিকায়ও তার আভাস দেওয়া হয়েছে।

> আমাদের যেমনটা জানা আছে, এ কাজের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট বেতন নেই। কিন্তু তাঁরা সত্যিকার কতোটা কাজ করছেন, সেই অনুযায়ী বেশ দরাজ হাতে তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। কখনো কখনো এই টাকার পরিমাণ বেশ যথেষ্ট হতে পারে — মাসে এক হাজার টাকার কম নয়।[৭৮]

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তিনি এই চাকরি থেকে অনেক টাকা পেতেন না। পেতেন মাসে বড়ো জোর হাজার খানেক টাকা। তা ছাড়া, এটা তাঁর সার্বক্ষণিক কাজও ছিলো না। তিনি এক যোগে পরীক্ষকের কাজ এবং আইন ব্যবসা চালিয়ে গেছেন। তবে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় তিনি আইন-ব্যবসা থেকে খুব বেশি আয় করতেন বলে মনে হয় না। *ইংলিশম্যান* পত্রিকায় তাঁর নিয়োগ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায়, ধারণা হতে পারে যে, এই নিয়োগ বোধ হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সিদ্ধান্ত এবং তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে এই মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। আসলে, তাঁর নিয়োগ ছিলো উপলক্ষ্য মাত্র, *ইংলিশম্যান* ভিন্ন কারণে এই মন্তব্য প্রকাশ করে। এই পত্রিকা বলতে চেয়েছিলো যে, হাই কোর্টের আপীল বিভাগের যে-অনুবাদকরা আছেন, তাঁদের বেতন খুব সামান্য এবং সুনির্দিষ্ট। এর ফলে কোনো যোগ্য লোক এই কাজে আকৃষ্ট হন না। অযোগ্য লোকেরা যে-অনুবাদ করেন, তা অনেক সময়েই বিকৃত এবং মূলের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। সুতরাং সরকারের উচিত অবিলম্বে অনুবাদ বিভাগের সংস্কার করা।[৭৬]

কবি কতোদিন পরীক্ষকের কাজ করেছেন, তা ঠিক জানা যায় না। তবে বছর খানেকের বেশি নয়। ১৮৭১ সালের *বেঙ্গল ডায়রেক্টরি*তে মাইকেলের পরিচিতিতে তাঁকে পরীক্ষক বলে উল্লেখ করা হলেও, ১৮৭২ সালের পরিচিতিতে তাঁকে বলা হয়েছে তিনি ব্যারিস্টার এবং তাঁর চেম্বার হলো ঢাকায়।[৭৭] ১৮৭১ সালের দ্বিতীয় ভাগে তিনি ৭ নম্বর ওল্ড পোস্ট অফিস রোডে তাঁর চেম্বার ছেড়ে দেন। কারণ, ভঙ্গস্বাস্থ্য মাইকেল তখন যে-কটি মামলা পাচ্ছিলেন, তা দিয়ে এই রাস্তায় চেম্বার খোলা রাখা যায় না। কিন্তু এ সময়েও তিনি লাউডন স্ট্রীটে তাঁর বাড়ি ছেড়ে দেননি এবং সংসার চালানোর জন্যে তখনো তাঁর অনেক টাকার দরকার হচ্ছিলো। আসলে ব্যারিস্টারিতে ব্যর্থ হবার পরেও বিলাসিতার জাড্য কাটিয়ে উঠতে তাঁর এবং জীবনসঙ্গিনী হেনরিয়েটার সময় লেগেছে। আবার ভালো সময় আসবে — এই মরীচিকা তখনো তাঁকে নিরাসক্ত চোখে তাকাতে দেয়নি। পরে যে দেনার বিপুল দায়ে ডুবে গেছেন, সেই দায়ের অনেকটা এ সময়ে তিনি নিজেই অর্জন করেছিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে 'সুগৃহিণী' হেনরিয়েটা কেন অপেক্ষাকৃত কম খরচের বাড়িতে চলে যাননি, অথবা চলে যেতে কবিকে বাধ্য করেননি, সেটা একটা রহস্য। বেনিয়াপুকুরের মতো একটা জায়গায় সময়মতো চলে গেলে, ধারের অমন বিশাল পাহাড় জমে উঠতো বলে মনে হয় না। সংসার চালানোর জন্যে তাঁকে আলোচ্য কালে মফস্বলে যাবার এক-একটা বড়ো রকমের ঝুঁকি নিতে হয়েছে। তাঁর ঢাকা সফর ছিলো এমনি একটা অ্যাডভেঞ্চার।

তিনি ঢাকায় যান একটা মামলার কাজে। তখন কলকাতা থেকে ঢাকা যাওয়া সহজ ছিলো না। কবির স্বাস্থ্যও ছিলো খারাপ। এর আগে থেকেই যকৃৎ এবং প্লীহার রোগে তিনি কাতর হয়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসক ছিলেন তখনকার কলকাতার নাম-করা ডাক্তার — ডাক্তার পামার।[৭৮] তাঁর চিকিৎসায় তিনি টিকে ছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হচ্ছিলো না। কারণ, তিনি মদ্যপান একটুও কমাতে রাজি ছিলেন না। ধূমপানও করতেন। সেপ্টেম্বর মাসের (১৮৭১) গোড়ার দিকে তিনি ঢাকায় যান এবং সেখানে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। অসুস্থ অবস্থায় সেখানে দিন দশেক থাকতে হয়। নিজে এই

অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন: 'সেখানে প্রায় মারা যাচ্ছিলাম!'[৬৭] একটু ভালো হয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় ফেরেন। ঢাকায় তিনি কেবল একটি মামলায় নগদ কিছু টাকা পাওয়ার জন্যে গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর প্রত্যাশা ছিলো আরও বড়ো। কলকাতায় অনেক ব্যারিস্টার আছেন। এমন কি, বাঙালি ব্যারিস্টারই তিনি ছাড়া আরও তিনজন। সে কারণে তিনি সম্ভবত আশা করেছিলেন যে, ঢাকায় প্র্যাক্টিস করলে ব্যারিস্টার হিশেবে বিনা প্রতিযোগিতায় ব্যবসা করতে সক্ষম হবেন। *বেঙ্গল ডায়রেক্টরি*তে তাঁর চেম্বার লেখা হয়েছে ঢাকায় — এ থেকেও আভাস পাওয়া যায় যে, কবি আইন-ব্যবসা করার অভিলাষ ঘোষণা করে ঢাকায় গিয়েছিলেন।

তিনি যাওয়ার পর ঢাকার আদালতে কতোটা হৈচৈ পড়েছিলো, তার কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। কিন্তু মফস্বল শহর ঢাকায় যে স্বল্প সংখ্যক সাহিত্যামোদী ছিলেন, তাঁরা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। 'মহাকবি' মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তাঁরা একটি সংবর্ধনা দেন।[৬৮] এই সংবর্ধনার উত্তরে কবি যা বলেন, তা থেকেও মনে হয়, তিনি কেবল একটি মামলার জন্যে সেখানে যাননি। তিনি ঢাকার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি ঢাকাবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন, ঢাকার প্রতিটি ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা আছে আর সরস্বতী সেখানকার নিত্য-অতিথিনী। যে-দুই দেবীর তিনি সাধনা করেছিলেন, তাঁদের দুজনকেই তিনি যদি সেখানে প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে, বেদে অথবা পুরাণে তার উল্লেখ না-থাকলেও এই শহরই তাঁর জন্যে আদর্শ। তিনি ভাবলেন, অবশেষে ঢাকায় তাঁর ভাগ্য খুলে যাবে।

> পীড়ায় দুর্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
> সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
> তব করে, হে সুন্দরি!

অতএব কবি ঢাকা-সুন্দরীর আনুকূল্য কামনা করেন।

> বিপজ্জাল যবে
> বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।
> কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
> দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি?

এই সনেটে কবি একদিকে নিজের অতি শোচনীয় অবস্থার কথা প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে প্রত্যাশা করেছেন নতুন করে জীবন শুরু করার। তিনি নিজের দুরবস্থা বোঝানোর জন্যে এতে দুটি ট্র্যাজিক উপমা দিয়েছেন। একটি হিমালয়-পুত্র মৈনাক গিরির সাগরে আত্মগোপন করার। অন্যটি যুদ্ধে পরাজিত ও ধিক্কৃত দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে পলায়নের মর্মস্পর্শী কাহিনীর। অহঙ্কারী মৈনাক গিরি দৈবশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে কাপুরুষের মতো সাগরে লুকোতে বাধ্য হয়। আর নিজে মহাবীর হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোধন জীবন বাঁচানোর জন্যে যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে একাকী আত্মগোপন করেছিলেন দ্বৈপায়ন হ্রদে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারেননি। যুধিষ্ঠিরের কথায় উত্তেজিত হয়ে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন সেই হ্রদ থেকে। তারপর গদাযুদ্ধে ভগ্নোরু হয়ে প্রাণত্যাগ করেন তিনি। মৈনাক গিরি এবং দুর্যোধন — উভয়ের ক্ষেত্রেই অহঙ্কার এবং দর্পের শোচনীয় অপমান এবং পরাজয় লক্ষ্য করা যায়। কবিও তাঁর সীমাহীন অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে রাজধানী কলকাতার আড়ম্বরের বদলে আগ্রহভরে মফস্বল শহর ঢাকার আতিথ্য নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। সকল উচ্চাশা জলাঞ্জলি দিয়ে কবি ঢাকার কাছে নিজের প্রার্থনা জানিয়েছেন:

> করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি ভাগ্যবতী!

কবি যে ঢাকার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন, তার মধ্যেও আছে করুণ পরাজয় এবং মরিয়া হয়ে আত্মরক্ষা

করার শেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু আন্তরিক এবং সকরুণ প্রত্যাশা সত্ত্বেও তিনি ঢাকায় প্র্যাক্টিস করলেন না কেন, তার জবাব আমাদের জানা নেই। হতে পারে, সাহিত্যিক মহলে যতো সমাদর তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, আদালতে তা করেননি। হতে পারে, স্বাস্থ্য হঠাৎ খুব খারাপ হওয়ায় পরিবার থেকে এতোটা দূরে থাকতে ভরসা পাননি। কিন্তু কারণ যাই হোক, জীবনের একে-বারে পড়ন্ত বেলায় নতুন করে যাত্রা শুরু করার যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। অতঃপর দুর্বল দেহটাকে বহন করে কলকাতায় ফিরে গেলেন পরিবার আর উত্তমর্ণদের ভিড়ে। নগেন্দ্রনাথ সোম উল্লেখ করেছেন যে, কয়েক মাস পরে – ১৮৭২ সালের ফেব্রুআরি মাসে – তিনি আর-একবার ঢাকায় গিয়েছিলেন এবং ঢাকাকে নিয়ে সনেটটি সে সময়ে রচনা করেন।[৮১] কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই। বরং তিনি ঢাকার কাছে যে-আবেদন জানিয়েছিলেন, তা তাঁর প্রথম সফরের সময়কার হওয়াই স্বাভাবিক। কবির অন্য জীবনীকার – যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে, তিনি দ্বিতীয় বার ঢাকায় যান ১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে।[৮২]

কবি ঢাকা যাবার আগেই – পয়লা সেপ্টেম্বর (১৮৭১) – তাঁর গদ্যগ্রন্থ *হেক্টর-বধ* প্রকাশিত হয়।[৮৩] তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে বই হাতে পেয়েছিলেন কিনা, সন্দেহ হয়। কারণ,গৌরদাসকে তিনি এই বই-এর কপি পাঠিয়েছিলেন ঢাকা থেকে ফিরে আসার পরে – সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে।।[৮৪]

হেক্টরবধ তাঁর একটি ব্যতিক্রমধর্মী রচনা। গ্রীক ধ্রুপদী সাহিত্যের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিশেষ করে *ইলিয়াড* তাঁকে খুব অনুপ্রেরণা দিয়েছিলো। এই অনুপ্রেরণার স্বাক্ষর *মেঘনাদবধ কাব্য*-সহ তাঁর অনেক রচনায় অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু *ইলিয়াডে*র গদ্য-অনুবাদের প্রেরণা তিনি কোথায় পান? আগেই লক্ষ্য করেছি, আহত হয়ে ১৮৬৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি বেশ কিছু দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। তার পর ১৮৬৮ সালের অগস্ট মাসে আবার অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন। বই-এর উপহারপত্র থেকে জানা যায়, এই দুই দফা দীর্ঘ অসুস্থতার সময়ে *ইলিয়াড* পড়তে গিয়ে তাঁর মনে হয়, যে-স্বদেশবাসীরা ইংরেজি ভাষা জানেন না, তিনি যদি তাঁদের জন্যে এই অপূর্ব কাব্য অনুবাদ করতে পারেন, তা হলে তাঁরা এর স্বাদ খানিকটা পেতে পারবেন। তিনি এ মহাকাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ না-করে ভাবানুবাদ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, বহু জায়গায় মূল ঘটনা তিনি বর্জন করেছেন, আবার বহু জায়গায় সামান্য পরিবর্তন করেছেন। এই স্বাধীনতা নেবার কারণ দেখিয়ে বলেছেন যে, স্বাধীনতা না-নিলে অনুবাদ করতে অনেকটা সময় লাগতো – যা তাঁর ছিলো না। কেবল সময়ের অভাব নয়, দৈহিক দিক দিয়েও তিনি খুব সমর্থ ছিলেন না। কতোটা শারীরিক অক্ষমতা এবং ব্যস্ততার মধ্যে তিনি এ অনুবাদের কাজ করেছিলেন, তা বোঝা যায় একটি ছোট্টো ঘটনা থেকে। – এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা হারিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, তিনি তা দ্বিতীয় বার লিখে দিতে পারেননি। ('এক স্থলে কয়েক খানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে; ... সেটুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হয়, এতদিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্যাস্পদ হইতে চলিলাম। ... ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোন ক্রটি হইবে না।'[৮৫]) সর্বোপরি, তাঁর মনে একটা সংস্কার জন্মেছিলো যে, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির নেশা এবং ক্ষমতা উভয় লোপ পেয়েছে। এসব কারণে, তিনি *ইলিয়াডে*র কাব্যানুবাদ না-করে গদ্যে অনুবাদ করেছিলেন।

নিজের সাহিত্যিক ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণা যেমনই হোক না কেন, *হেক্টরবধ* বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা তখনো লুপ্ত হয়নি। আলোচ্য সময়ে লেখা তাঁর সনেট অথবা সনেট-সদৃশ কবিতাগুলো বিশ্লেষণ করলেও একই মন্তব্য করা যায়। এই কবিতাগুলো আদৌ কাব্যগুণ-বর্জিত ছিলো না এবং তিনি এগুলো লিখেওছেন দ্রুত গতিতে। তাঁর যে-কাব্যপ্রতিভা তাঁর সেবা করবে বলে ভৃত্যের মতো অপেক্ষা করছিলো তাকে তিনি নিজে অবহেলা করে কাজে লাগাননি মাত্র। বস্তুত, ন বছর আগে সাহিত্যের প্রতি চরম অবহেলা দেখিয়ে লক্ষ্মী-লাভের উদ্দেশ্যে বিলেতযাত্রা

করেছিলেন। সেখানে অসাধারণ জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে লাভ করেছিলেন — যাকে তিনি অন্তত মনে করেছিলেন — সাফল্যের চাবিকাঠি। এর পর দেশে ফিরে পর্বতপ্রমাণ উচ্চাশা নিয়ে সরস্বতীর বদলে তিনি ফিরে তাকান আদালতের দিকে। তা না-হলে বিদেশে তিনি যে-আন্তর্জাতিক মানসিকতা স্বীকরণ করেছিলেন এবং য়োরোপীয় সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির যে-প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন, তাতে এটাই ছিলো আরও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার সময়।

হেক্টরবধে তিনি যে-গদ্য লিখেছিলেন তার মধ্যেও তাঁর প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর আছে। গদ্যে লেখার ব্যাপারে কবির একটা আকর্ষণ আগে থেকেই ছিলো এবং গদ্যে লেখার সংকল্পও এক সময়ে ঘোষণা করেছিলেন।[৮] এতো দিনে *হেক্টরবধে* তিনি তাঁর সেই আশা পূরণ করেন। এগ্রন্থের অনেক জায়গাতে তিনি যে-শব্দ এবং অনুবাক্য ব্যবহার করেছেন, বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তখনো তার কোনো নজির ছিলো না, যেমন কাব্যে তাঁর বিচিত্র নাম-ধাতুর ব্যবহার ছিলো অভূতপূর্ব। বাক্যকাঠামোর ক্ষেত্রেও তিনি ইংরেজি রীতির অনুকরণে অনেক নতুনত্ব আমদানি করেছিলেন। আসলে মন-মেজাজের দিক দিয়ে তিনি ষোলো আনা কবি ছিলেন বলেই তিনি গদ্যচর্চা করেননি। নয়তো, গদ্যচর্চা করলে তিনি সেকালের প্রধান গদ্যরচয়িতাদের কারো থেকে পিছিয়ে থাকতেন বলে মনে হয় না। নাটক এবং কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি যেমন নতুন পথের দিশারি হয়েছিলেন, গদ্যের বেলাতেও সেই অবদান রাখতে পারতেন, *হেক্টরবধ* থেকে তার আভাস মেলে।

> পূর্ব্বকালে হেলাসৎ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় লোকদের পৌত্তলিক ধর্ম্মে আস্থা ও বহুবিধ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদিগের দেবকুলের ইন্দ্র জ্যুস লীড়া নাম্নী একজন নরকুলনারীর প্রতি আসক্ত হওতঃ রাজহংসের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে, লীড়া দুইটি অণ্ড প্রসব করেন। একটী অণ্ড হইতে দুইটী সন্তান জন্মে; অপরটী হইতে হেলিনী নাম্নী একটী পরম সুন্দরী কন্যার উৎপত্তি হয়। লাকীডীমন্ দেশের রাজা লীড়ার স্বামী এই তিনটী সন্তানকে দেবের ঔরসজাত জানিয়া অতিপ্রযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেমন কণ্ব ঋষির আশ্রমে আমাদের শকুন্তলা সুন্দরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হেলেনী লাকীডীমন্ রাজগৃহে দিন২ প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের শকুন্তলা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, খনিগর্ভস্থ মণির ন্যায় প্রতিপালক পিতার আশ্রমে অন্তর্হিতা ছিলেন, কিন্তু হেলেনীর রূপের যশঃসৌরভে হেলাস রাজ্য অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই ভঙ্গি বিদ্যাসাগরের কোনো কোনো রচনার কথা নিঃসন্দেহে মনে করিয়ে দেয়। অন্তর্নিহিত ছন্দ এবং প্রাঞ্জলতার কারণে এই গদ্য সেকালের শ্রেষ্ঠ গদ্যের মর্যাদা পেতে পারে। মাইকেলের স্বকীয়তার আর-একটি বিষয় হলো অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি মূল উপাদানের চরিত্র পরিবর্তন না-করেই দেশীয়করণ করেছিলেন। হোমারের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে রচনাটিকে যদ্দূর সম্ভব বাংলা ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা আদৌ সহজ ছিলো না এবং কবি নিজেও সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

> বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পর বংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে যে আমি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি এবং হইব, তাহা বলিতে পারি না।

তাঁর কৃতকার্যতা সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে, বিদ্যাসাগরের *ভ্রান্তিবিলাস* ছাড়া তখনো পর্যন্ত এ রকম অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে কেউ করেননি। কেউ দেশীয় রূপ দিতে গিয়ে মূলের বৈশিষ্ট্য আমূল বিসর্জন দিয়েছেন, কেউ বা মোটেই, মাইকেলের ভাষায়, মূলের 'গোত্রান্তর' করতে পারেননি। কেবল বিষয়বস্তু নয়, তিনি যখন ইংরেজি ভাষার অনুকরণ করেছেন, তখনো তার মধ্যে থেকে বিদেশী গন্ধ যথাসম্ভব দূর করেছেন। এক কথায় বলা যেতে পারে, তিনি বাংলা শব্দ ব্যবহার এবং বাক্যকাঠামোর চরিত্র বজায় রেখেও বিদেশী উপকরণ দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ এবং অলঙ্কৃত করেছিলেন। *হেক্টরবধ* সে কারণে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে বিশিষ্ট আসনের দাবিদার।

*

সেপ্টেম্বর মাসের (১৮৭১) শেষ দিকে ঢাকা থেকে ফিরে এসে, তিনি আবার আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। দুর্দিনের জন্যে তাঁর কোনো সঞ্চয় ছিলো না। আর স্থায়ী আয়ের শেষ সম্বলটুকুও সাড়ে তিন বছর আগে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়কে হস্তান্তর করেছিলেন। কিন্তু সঞ্চয় না-থাকলেও, তাঁর দায় কম ছিলো না। এ সময়ে বাড়ির ভাড়া ঠিকমতো দিতে পারেননি, এমন কি যথাসময়ে দিতে পারেননি চাকর-বাকর, কেরানি, সহিস আর গাড়োয়ানের বেতন। এই কর্মচারীদের বেশির ভাগকে তাই একে-একে বিদায় দিতে হয়। অনেককে বিদায় দিতে হয় বকেয়া বেতন শোধ না-দিয়েই। যে-আসবাবপত্র দিয়ে বাড়ি সাজিয়ে-ছিলেন দু বছর আগে, তার দাম তখনো পরিশোধ করতে পারেননি। বাড়িতে ফিরে এলে পাওনাদারেরা সার বেঁধে তাঁদের টাকার তাগাদা দিতে আসতেন। কোনো কোনো পাওনাদার ভাড়া করা লোক সঙ্গে নিয়ে আসতেন, যাতে তারা বাড়ির নিচ থেকে চেঁচিয়ে তাঁকে অপমান করতে পারে।

এ সময়ে কবি নিতান্ত অস্বস্তিতে সময় কাটিয়েছেন, তা অনুমান করা শক্ত নয়। কারণ তাঁর সামনে কোনো আশা ছিলো না, কোনো স্বপ্ন ছিলো না, উৎসাহ ছিলো না; ছিলো কেবল নীরন্ধ্র অন্ধকার। কথা বলতে কষ্ট হতো, মাঝেমধ্যে জ্বরে কাতর হয়ে পড়তেন। স্থূল শরীরটাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যেতে হাঁফ ধরে যেতো। তবু তাঁর থামার জো ছিলো না। তাঁকে এক সময়ে আমরা দেখেছি শত প্রতিকূলতার মুখে লড়ে যেতে। দরিদ্র এবং সমস্যাসংকুল মাদ্রাসের সংসারে বসে বারো ঘণ্টা ভাষাচর্চা করতে তিনি পিছপা হননি। ভার্সাইতে অনাহার এবং অর্ধাহারের মধ্যেও নতুন ভাষা শেখার অথবা সাহিত্যচর্চার উৎসাহ হারাননি। অনাগত ভবিষ্যতের গোলাপি স্বপ্ন দেখে দুঃসময়ের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু এতোদিনে সংগ্রাম করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ছিলো শুধু পরিবারের জন্যে দায়িত্ব পালনের তাগিদ। এই দায়িত্ব লাঘব করতে পারতেন, তাঁর এমন কেউ ছিলেন না। তাঁর নিজের কোনো আত্মীয়স্বজন তো ছিলেনই না, এমন কি, হেনরিয়েটাও বহুকাল আত্মীয়-বর্জিত। তদুপরি, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এ সময়ে ভগ্নস্বাস্থ্য। এমতাবস্থায়, ছোটো ছোটো তিনটি সন্তানের কি হবে? কে তাদের খাবার জোগাবে, কে তাদের শিক্ষা দেবে! শর্মিষ্ঠার বয়স ১২ বছর, তিনি মরে গেলে কে তার বিয়ে দেবে? কবি এসব চিন্তা করেন আর নির্ভেজাল মদ্যপান করেন। একদিন মনোমোহন ঘোষ এসে দেখলেন তিনি দিনের বেলায় ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে নির্জল হুইস্কি খাচ্ছেন। তাঁর আত্মহননের প্রয়াস দেখে মনোমোহন আঁৎকে ওঠেন। 'কি করছেন? এতো আত্মহত্যার সামিল!'[৮৭] কলকাতার প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি ডাক্তার সূর্য গুডিব চক্রবর্তী। এমন করে মদ্যপান করতে দেখে হুঁশিয়ার করে দিলেন কবিকে: 'এভাবে মদ্যপান করলে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন।'[৮৮] তিনি নিজেও সচেতন সে সম্পর্কে। সে জন্যে মনোমোহনকে বলেছিলেন, 'এ হলো আত্মহত্যার মন্থর কিন্তু নিশ্চিত একটি উপায়। তবে গলা কাটার মতো কষ্টের নয়।'[৮৯] তিনি জানেন, তাঁর সমস্যার কোনো সমাধান নেই। সুতরাং নৈরাশ্য, হতাশা এবং বিষণ্ণতার সাগরে নিমজ্জমান কবি নেশার ঘোরে সব ভুলে থাকতে চান।

১৮৭২ সালের *বেঙ্গল ডায়রেক্টরি*তে ব্যারিস্টার হিশেবে কবির নাম থাকলেও, তাঁর কোনো ঠিকানা নেই। আগের বছর ঢাকায় যাবার আগে অথবা ঢাকা থেকে ফিরে আসার কদিন পরে তিনি চেম্বার ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই বাড়িতে চেম্বার খোলেন হাই কোর্টের নবীনতম ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত (১৮৩১-১৯১৫)। কবি ঢাকা থেকে ফিরে আসার মাস দুই পরে — ৩০ নভেম্বর তারিখে তারকনাথ হাই কোর্টে যোগ দিয়েছিলেন নতুন উদ্যম নিয়ে। অপর পক্ষে, ভগ্নমনোরথ ভগ্নস্বাস্থ্য মাইকেল

ব্যারিস্টারি থেকে প্রায় রণে ভঙ্গ দেন। মাঝেমধ্যে যখন ডাক এসেছে মফস্বল থেকে, তখন পরিবারের কথা ভেবে গেছেন সওয়াল করতে, আর্জি পেশ করতে। না-গেলে খাবার জোটানোর উপায় ছিলো না। কিন্তু তার ফলে স্বাস্থ্যের ওপর আরও চাপ পড়েছে। এ সময়ে প্রতিদিন তাঁর ধার জমে উঠেছে, যেমনটা একদিন ভার্সাইতে উঠেছিলো — দোকানদারদের কাছে, বাড়িওয়ালার কাছে, বন্ধু এবং পরিচিতদের কাছে। এই সময়ে তিনি বাধ্য হয়ে লাউডন স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে দেন — যদিও সে বাড়ির ভাড়া বাকি থাকে বহু দিনের। কতো রঙিন স্বপ্ন নিয়ে এই বাড়িতে উঠেছিলেন প্রায় আড়াই বছর আগে। কতোভাবে সাজিয়েছিলেন উপভোগ করবেন বলে। কিন্তু স্বপ্নের মতো তা যেন মিলিয়ে গেলো।

'বামুনপাড়ার বাড়ি ছেড়ে উঠলেন গিয়ে তখনকার কলকাতার একটি ওঁচা পাড়ায় — ২২ নম্বর বেনিয়াপুকুর রোডে। সে বাড়ির এক পাশে ২১ নম্বরে একটি বাগান আর ২০ নম্বরে চালের গোলা। অন্য পাশে ২৩ নম্বরে একটি পুকুর আর ২৪ নম্বরে একটি কুঁড়েঘর। ১৯ নম্বরে থাকেন গুণমণি দাসী। ১৩ থেকে ১৮ নম্বর পর্যন্ত সবগুলো ছোটো ছোটো বাড়ি — পঞ্জিকার ভাষায় কুঁড়েঘর।[১০] লাউডন স্ট্রীটের পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায় কবি কোথা থেকে কোথায় গিয়ে আশ্রয় পেলেন।

তাঁর অভিজ্ঞতা চকিতে অনরে দ্য বালজাকের কথা মনে করিয়ে দেয়। লেখাপড়া নিয়ে তিনি টেবিলে সময় কাটতেন রোজ চোদ্দো থেকে ষোলো ঘণ্টা। ২৮ বছর বয়সে তিনি দেউলে হবার মুখ থেকে কোনোক্রমে রক্ষা পান। তাঁর ছিলো বিলাসিতা করার এবং জৌলুষ দেখিয়ে ব্যয় করার অদম্য বাসনা। টাকা আসবে এই ভরসায় তিনি আগে থেকে ধার করে ব্যয় করতেন। প্রভূত পরিমাণে টাকা আয় করবেন — এই ছিলো তাঁর প্রধান আকাঙ্ক্ষা। অর্থ-পূজারী বলে তাঁর অনেক নিন্দাও হয়েছিলো। কিন্তু খরুচে হাত থাকায় সব সময়ে তিনি ঋণী হয়ে থাকতেন নানাজনের কাছে। এক সময়ে তিনি পাওনাদারদের তাড়ায় প্যারিসের বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তা ছাড়া, তাঁকে যাতে আদালতের সমন জারি করতে না-পারে, তার জন্যে তিনি নানা কৌশল অবলম্বন করতেন। শেষে তিনি যখন তাঁর বহু বছরের প্রিয়তমাকে বিয়ে করতে সমর্থ হন আর প্রিয়তমা তাঁর জন্যে নিয়ে এলেন অনেক সম্পদ, তখন আপাতদৃষ্টিতে নটে গাছটি মুড়ানোর মতো সুখে জীবন যাপন করার বর্ণাঢ্য মঞ্চ নির্মিত হলো। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়স থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেছিলো। বিয়ের পর তিনি বেঁচে ছিলেন মাত্র কয়েক মাস।

বালজাকের সঙ্গে মাইকেলের জীবনের অনেক কিছুই মিলে যায়। কেবল একটি বড়ো পার্থক্য। বালজাক বহু কাল যে-রমণীকে ভালোবেসেছিলেন, মৃত্যুর ঠিক আগে হলেও, তাঁকে বিয়ে করতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া, ক্ষণিকের জন্যে হলেও, অর্থস্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পেয়েছিলেন বিয়ের পরে। দু দিক দিয়েই তাঁর জীবন মিলনান্তক। অপর পক্ষে, মাইকেল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন দারিদ্র্য, দুর্ভোগ, বিড়ম্বনা এবং চরম অযত্নের মধ্যে। তাঁর জীবনের শেষ দু বছর যেভাবে কেটেছিলো, অতি-দরিদ্র, অতি-অশিক্ষিত, অতি-অখ্যাত কেউই তাকে ঈর্ষা করবেন না। আর কুড়ি বছর ধরে ভালোবাসার এবং পনেরো বছর ধরে এক সঙ্গে বাস করার পরেও তিনি চার্চে গিয়ে হেনরিয়েটাকে বিয়েও করতে পারেননি।

কলকাতায় প্র্যাক্টিস কার্যত বন্ধ। এমন সময়ে ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে একটি মকদ্দমায় বাদী পক্ষের তরফে ডাক পেলেন নতুন শহর পুরুলিয়া থেকে। ফেব্রুআরি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি সেখানে যান। যাওয়া মোটেই সহজ ছিলো না। তখনো সেখানে রেল লাইন তৈরি হয়নি। সুরেশ মৈত্রের মতে, তিনি বরাকর থেকে কাঁচা পথে যান। বরাকর থেকে পুরুলিয়ার দূরত্ব ৪২ মাইল।[১১] এতোটা পথ পাল্কিতে যাওয়াও সুখের অভিজ্ঞতা নয়। পথে একমাত্র সুখের যে-অভিজ্ঞতা হয়েছিলো,

তা হলো পরেশনাথ পাহাড় দেখার সৌভাগ্য। পরেশনাথ খুব উঁচু পাহাড় নয় – উচ্চতা মাত্র ৪৪৮০ ফুট। পুরুলিয়া থেকে পরেশনাথের আকাশপথে দূরত্ব প্রায় ৫০ মাইল। কিন্তু পরিষ্কার আকাশ থাকলে পুরুলিয়া শহরের বাইরে থেকে এই পাহাড় চোখে পড়ার কথা। পাহাড় এবং সাগরের প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ সত্ত্বেও, কাছ থেকে পাহাড় দেখার সৌভাগ্য তাঁর যোরোপ যাবার আগে পর্যন্ত হয়নি। দেশে ফিরে এসে এই প্রথম পাহাড় দেখার ঘটনা। সুতরাং তাঁর পক্ষে খুশি হওয়া স্বাভাবিক। কেবল তাই নয়, পরে এই পাহাড় তাঁকে একটি কবিতা লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিলো। আমার ধারণা, এ কবিতাটি তিনি এ যাত্রায় লেখেননি।[১২] লিখেছিলেন কয়েক মাস পরে তিনি যখন পঞ্চকোটে ছিলেন, সেই সময়ে। কাশীপুর থেকে পরেশনাথের দূরত্ব আরও কম। পরেশনাথ পাহাড় দেখে তিনি তাকে রহস্যময় এক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ব্যোমকেশ তুমি কে হে, (এই ভাবি মনে)
মজ্জি তপে ধরেছ ও পাষাণ-মূরতি?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন্ রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী –
খচিত শিলার বর্ম্ম কুসুম-রতনে
তোমার?

ব্যারিস্টার হিশেবে খুব সফল না-হলেও, তিনি যেখানে যেতেন, কবি হিশেবে সেখানকার সাংস্কৃতিক মহলে সমাদর পেতেন। তাঁর ঢাকা সফরের সময়েও আমরা তা লক্ষ্য করেছি। পুরুলিয়ায়ও তার অন্যথা হলো না। কবি তাতে খুশিও হন। কিন্তু পুরুলিয়ায় তিনি অপ্রত্যাশিত যা পেয়েছিলেন, তা হলো খৃস্টীয় সমাজের তরফ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা।[১৩] সেখানকার খৃস্টীয় সমাজ মাইকেলের মতো অ্যাংলিকান অর্থাৎ ইংল্যান্ডীয় চার্চের অনুসারীও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেখানকার লুথারীয় চার্চের অনুসারীরা তাঁকে এই সংবর্ধনা দেন। কেবল তাই নয়, তাঁরা তাঁর জন্যে আরও একটা বিস্ময় জমা করে রেখেছিলেন। তাঁরা তাঁকে অনুরোধ জানান, সেখানকার সুপরিচিত একজন খৃস্টান নেতা, কাঙালিচরণ সিংহের পুত্র কৃষ্ণদাসের গড-ফাদার হবার জন্যে। তার ব্যাপটিজম হয় ২৫ ফেব্রুআরি (১৮৭২)।[১৪] মাইকেল কেবল যে এই প্রস্তাবে রাজি হন, তাই নয়, তিনি এই উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে ফেলেন।[১৫] ঠিক ২৯ বছর আগে – ৯ ফেব্রুআরি – তাঁর নিজের ব্যাপটিজম হয়েছিলো। সেই নস্টালজিক স্মৃতি হয়তো তাঁকে এ কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। নয়তো গড-ফাদার হবার অনুরোধ জানালেও, খৃস্টীয় সমাজ তাঁকে এ কবিতা লেখার অনুরোধ জানিয়েছিলো বলে মনে হয় না। এই কবিতায় তাঁর এক ধরনের আন্তরিকতা এবং খৃস্ট ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর ধর্মপুত্র কৃষ্ণদাসকে সম্বোধন করে বলেছেন: জর্দানের নীরে স্নান করে তুমি আজ পবিত্রতর জন্মগ্রহণ করলে। তা ছাড়া

সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে;
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত, হিমান্তকালে।

কবি মনে করেন, খৃস্টধর্ম গ্রহণ করায় কৃষ্ণদাস কী অমূল্য ধন পেয়েছে, তা সে অচিরে বুঝতে পারবে। তাঁর মতে, এর ফলে সে দৈববলে বলীয়ান হয়েছে। এ তার সৌভাগ্য। তাঁর নিজের দীক্ষা উপলক্ষে তিনি যে-হীম রচনা করেছিলেন, তাতেও কমবেশি একই রকমের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। আগেই লক্ষ্য করেছি, ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালনের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ না-

দেখালেও, খৃষ্টধর্মকে হিন্দু ধর্মের তুলনায় তিনি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করতেন এবং খৃষ্টীয় য়োরোপের প্রতিও তাঁর ছিলো আন্তরিক শ্রদ্ধা। পুরুলিয়ায় লেখা এই কবিতায়ও খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার আভাস পাওয়া যায়।

কবি এই 'শহরে' কদিন ছিলেন, সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু, সুরেশচন্দ্র মৈত্রের মতে, এখানকার জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের উপকার করেছিলো। ফেব্রুআরি মাসের শেষে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।[৯৬]

ওদিকে, পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও কবি পুরুলিয়ায় এসেছেন – এই খবর পেয়ে তাঁকে নিজের 'রাজধানী' কাশীপুরে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠান। তবে তাঁর কর্মচারী যখন পুরুলিয়ার পৌঁছেন, ততোক্ষণে কবি কলকাতায়।[৯৭] নীলমণি সিংহ তাতে উৎসাহ হারালেন না। অবিলম্বে নতুন প্রস্তাব নিয়ে দূত পাঠালেন কলকাতায়। তিনি কবিকে তাঁর 'রাজ্যে'র ম্যানেজার নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেন। কতো টাকা বেতন দেবার কথা বলেছিলেন, জানা যায় না। তবে এক হাজার টাকার চেয়ে কম। যে-মাইকেল মাত্র পাঁচ বছর আগে মাসে ছ হাজার টাকা আয় করার স্বপ্ন দেখেছেন এবং বাস্তবে অতো টাকা আয় করতে না-পারলেও কিছু কাল অন্তত মাসে হাজার দুয়েক করে আয় করেছেন, যে-মাইকেল তালুকের মালিক হলেও সামন্তদের দেখতেন কৃপার দৃষ্টিতে, যে-মাইকেল মনেপ্রাণে নাগরিক, যিনি একদা য়োরোপীয় হয়ে গেছেন বলে নিজেকে নিয়ে গর্ব করতেন – সেই মাইকেল সামান্য বেতনে একান্ত গ্রাম্য রাজা নীলমণি সিংহ দেও-এর ম্যানেজার হলেন। অবশ্য তিনি একজন সামন্ত রাজার অধীনে চাকরি করার কথা কখনো ভাবেননি, তা নয়। তিনি যখন ব্যারিস্টার হবার কথা কল্পনাও করেননি, তেমন সময়ে – ১৮৬০ সালের শুরুতে – *ইংলিশম্যান* পত্রিকায় একজন সামন্ত রাজার বিজ্ঞাপন দেখে তাঁর রাজ্যে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হবার উদ্দেশ্যে দরখাস্ত করেছিলেন।[৯৮] তখন অবশ্য তাঁর আয় ছিলো খুব কম – মাসে মাত্র ১২৫ টাকা। কাজেই বেশি বেতনের একটা পদ – তা যেমনই হোক, তার দিকে তাঁর লোভ থাকা সম্ভব। সেবারে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পাননি। কিন্তু এবারে ম্যানেজারের কাজ পেয়ে কলকাতায় পরিবার রেখে, নিজে গেলেন স্বেচ্ছা-নির্বাসনে। সেখানে আশ্রয় পেলেন 'রাজধানী' কাশীপুরে বাঁধের ধারে একটি বাংলো বাড়িতে।[৯৯] প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, তা সত্ত্বেও এক অজ পাড়াগাঁয়ে এই চাকরি নিয়ে যেতে সম্মত হলেন কি করে? তার উত্তর খুব শক্ত নয়। আমরা আগেই একাধিক বার দেখেছি যে, অজানা জায়গায় গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার একটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে একেবারে তরুণ বয়স থেকেই ছিলো। পঞ্চকোটে যাওয়ার মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর সেই চরিত্রের এবং মনোভাবের পরিচয় দেন। তা ছাড়া, চরম অর্থকষ্টের মধ্যে বাঁধা আয়ের প্রশ্নটিও নিশ্চয় বিবেচনা করেছিলেন।

তাঁর জীবনের বড়ো একটা সাধ ছিলো রাজকবি হবার। তাঁর প্রিয় কবিরা প্রায় সবাই ছিলেন রাজকবি। এটা তাঁর মনে এমন একটা মোহের মতো কাজ করেছে যে, নদিয়া- অথবা বর্ধমান-রাজের কবি হতে পারলেও তিনি খুশি হতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা-ও হতে পারেননি। এখন জীবনের একেবারে গোধূলি লগ্নে ক্ষুদ্র পঞ্চকোট রাজ্যের (মোট আয়তয় ২৭৭৯ বর্গ মাইল এবং প্রধানত জংলি এলাকা) ম্যানেজার হয়ে তিনি খুশি হয়েছিলেন কিনা, জানা যায় না। তবে তিনি এক ধরনের স্বস্তি লাভ করে থাকবেন। তাঁর মনোভাব বোঝা যায়, একটি কবিতা এবং পঞ্চকোটে তাঁর কার্যকলাপ থেকে। মাদ্রাসে পত্রিকা সম্পাদনা অথবা শিক্ষকতা এবং কলকাতার পুলিশ অফিসে কেরানির চাকরি – তিনি যখনই যে-কাজ করতেন, তা করতেন উৎসাহের সঙ্গে এবং তাতে নিজের দক্ষতা দেখাতে চেষ্টা করতেন। যে-পর্যায়ের কথা আমরা আলোচনা করছি, ততোদিনে তিনি জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষ

করে ফেলেছিলেন। তবু চাকরি নেবার পর হঠাৎ কোথা থেকে যেন নতুন উদ্যম পেলেন। সেই উদ্যম নিয়ে শুরু করলেন পঞ্চকোট সংস্কারের কাজ। সেখানে রাস্তাঘাট তৈরি করাবেন, পানীয় জলের ব্যবস্থা করাবেন, প্রজাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবেন।

ভাঙ্গা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি-কুতূহলে।

পঞ্চকোট ছোটো রাজ্য হলেও এর ইতিহাস অনেক পুরোনো — বেশ কয়েক শতাব্দীর।[১০০] পাহাড়ের গায়ে পঞ্চকোট নির্মাণের যে-কিংবদন্তী চালু আছে, তার মধ্যে পুরোনো আমলে রাজাদের প্রতিপত্তি এবং ঐশ্বর্যের আভাস পাওয়া যায়। 'ভাঙ্গা গড় গড়াইব'-র মধ্যে সেই পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৮৬০ সালে তিনি যখন সামন্ত রাজ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির জন্যে আবেদন করেছিলেন, তখন এক বছরের মধ্যে ইংরেজরা প্রশংসা করবে এমন একটি পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[১০১] সেবারে চাকরি না-পাওয়ায় তাঁর সাংগঠনিক যোগ্যতা তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। এবারে অক্ষম শরীর নিয়েও তিনি যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন।

তবে তাঁর আশা যতোই মহৎ হোক না কেন, এবারেও ভাগ্য তাঁর ভালো ছিলো না। তিনি ম্যানেজার নিযুক্ত হবার আগেই নীলমণি সিংহ দেও একটা মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরই এক পত্তনিদার শারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর বিরুদ্ধে জেলা আদালতে মামলা করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিলো: নীলমণি সিংহ তাঁর কাছ থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা জোর করে আদায় করে নিয়েছেন। আগের বছর সেপ্টেম্বর মাসে (১৮৭১) কবি যখন মামলা পরিচালনার কাজে ঢাকায় গিয়েছিলেন, মোটামুটি তেমন সময়ে এই মামলার রায় প্রকাশিত হয়। তাতে নীলমণি সিংহ হেরে গিয়েছিলেন। তাঁকে আদেশ দেওয়া হয় সুদসহ টাকা ফেরত দেবার। অতঃপর নীলমণি সিংহ এই রায়ের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে আপীল করেন।[১০২] আর এর কয়েক মাসের মধ্যে — ১৮৭২ সালের মার্চের মাঝামাঝি — মাইকেলকে ম্যানেজার করে তিনি নিজের 'রাজ্যে' নিয়ে যান। কবির নিয়োগের সঙ্গে এই মামলার সামান্য হলেও একটা যোগাযোগ ছিলো বলে মনে হয়। নীলমণি সিংহ ভেবে থাকবেন যে, কম খরচে একজন ব্যারিস্টারকে ম্যানেজার হিশেবে পেলে তিনি এই মামলা ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। তা ছাড়া, ভবিষ্যতেও যখন কোনো মামলা আসবে — একজন জমিদারের পক্ষে-বিপক্ষে মামলা-মকদ্দমা লেগেই থাকে — তখনো তিনি তাঁকে পরামর্শ দিতে পারবেন। মোট কথা, এক ঢিলে দু পাখি মারা যাবে মনে করে তিনি কবিকে তাঁর ম্যানেজার নিয়োগ করেছিলেন বলে মনে হয়। নয়তো এক গ্রাম্য জমিদারের পক্ষে হঠাৎ একজন ব্যারিস্টারকে নিজের ম্যানেজার নিয়োগ করার আপাতদৃষ্টিতে কোনো কারণ নেই।

আগেই বলেছি, প্রত্যন্ত পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কবি সামন্তরাজের ম্যানেজার হয়েছিলেন নিতান্ত প্রাণের দায়ে। বেতন সামান্য হলেও, মাসে মাসে নির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয়তা পেয়ে তিনি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। তাঁর স্বস্তির আর-একটা কারণ — পাওনাদারদের হাত থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা। যতো টাকা পাওনা থাক না কেন, তাঁর কোনো উত্তমর্ণ পঞ্চকোটে গিয়ে টাকা আদায় করতে চেষ্টা করেননি। তা ছাড়া, সেখানে থাকার সময়ে প্রচুর দেশীয় সুরা পান করলেও, তাঁর স্বাস্থ্যের খানিকটা উন্নতি হয়েছিলো। কিন্তু বিড়ম্বিত কবির কপালে এই সাধারণ সুখও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

ম্যানেজার হিশেবে পঞ্চকোটে আসার পর তাঁর একটা প্রধান দায়িত্ব ছিলো শারদাপ্রসাদের বিরুদ্ধে মামলায় তদবির করা। তিনি আর সে ব্যাপারে কোনো অবহেলাও করেননি। তিনি নিজে আইনজীবী

হিশেবে নাম করতে পারেননি। তদুপরি এ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থাও ছিলো খুব খারাপ। সুতরাং নীলমণি সিংহের পক্ষে তিনি আইনজীবী নিয়োগ করেন তখনকার সবচেয়ে নাম-করা অ্যাটর্নিদের একজন — আর টি অ্যালেনকে। ১৮৫৫ সালের ফেব্রুআরি মাস থেকে তিনি কলকাতায় ওকালতি শুরু করেন। (তাঁর পিতাও ১৮৪০-এর দশকে কলকাতায় ওকালতি করেছেন।) তাঁর চেম্বার ছিলো ৫২ নম্বর চৌরঙ্গীতে।[১০৩] মাইকেল যেখানে থাকতেন তার কাছেই। আগে থেকে তাঁদের পরিচয় ছিলো। অ্যালেনকে সাহায্য করার জন্যে দুজন দেশীয় উকিলও নিয়োগ করেছিলেন — উপেন্দ্রনাথ বসু আর ভবানীচরণ দত্তকে।[১০৪] অপর পক্ষে, শারদাপ্রসাদ তাঁর পক্ষে নিয়োগ করেছিলেন নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাসের পিতা শ্রীনাথ দাসকে।[১০৫] আসলে, আইনের চোখে নীলমণি সিংহের মামলা দুর্বল ছিলো। তাই নাম-করা অ্যাটর্নি এবং উকিল দিয়েও তিনি তাঁর আপীলে জয়ী হতে পারেননি। জেলা আদালতের রায়ই বহাল রাখে কলকাতা হাই কোর্ট।[১০৬] মাইকেলের আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই পরিস্থিতিতে নীলমণি সিংহ কাউকে দোষারোপ করে সান্ত্বনা পেতে চাইছিলেন। সেই সান্ত্বনা তিনি পেলেন অসহায় রুগ্ন কবির ওপর খড়্গাঘাত করে। কবির জীবনীকারেরা এই প্রসঙ্গে একজন নাপিতের কথা উল্লেখ করেছেন।[১০৭] রাজা নাকি এই নাপিতের বুদ্ধিতে কাজ করতেন। শোনা যায়, এই নাপিত রাজাকে কবির বিরুদ্ধে চটিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু অব্যবহিত কারণ যাই হোক, পঞ্চকোটে সম্মানের সঙ্গে চাকরি করা দূরে থাক, তাঁর নিরাপত্তাও সেখানে বিপন্ন হলো। কবি অবশ্য সেই সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন না — তাই কাউকে কিছু না-জানিয়ে রাতের অন্ধকারে পঞ্চকোট থেকে পালিয়ে কেবল মান নয়, জীবন বাঁচান। কাশীপুর থেকে তাঁকে সদর রাস্তা অবধি পৌঁছে দেন রাজারই এক জ্ঞাতি — রাজার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিলো না। তাঁর বিপদ কতোটা বাস্তবিক ছিলো তা বোঝা যায় একটি তথ্য থেকে — তিনি রাজার কাছে বেতন বাবদ ষোলো শো টাকা পেতেন। দারুণ অর্থকষ্ট সত্ত্বেও, সে টাকার মায়া কাটিয়েই কাশীপুর থেকে পালিয়ে আসেন।[১০৮] পঞ্চকোটের রাজার মামলার রায় দেওয়া হয়েছিলো দোসরা সেপ্টেম্বর (১৮৭২) তারিখে। অতএব অনুমান করা সঙ্গত যে, এর কদিন পরেই কবি কলকাতায় ফেরেন।

তাঁর কর্মচারী হলেও, মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে বিখ্যাত ব্যক্তি এবং তাঁর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করলে দুর্নাম হতে পারে — এটা নীলমণি সিংহ দেও জানতেন। সে জন্যে, কবি পালিয়ে যাবার অল্পদিন পরেই তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রাপ্য টাকা শোধ দিয়েছিলেন কিনা, তা অবশ্য জানা যায় না। তবে রাজার অনুরোধে কবির পক্ষ থেকে কৈলাসচন্দ্র বসু ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে কাশীপুরে যান।[১০৯] কবি যখন আইন-ব্যবসা করেছিলেন, তখন শেষ ক বছর তাঁর কেরানি ছিলেন কৈলাসচন্দ্র বসু। তাঁর সঙ্গে কবির সম্পর্ক ঠিক প্রভু-ভৃত্যের ছিলো না।[১১০] তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি হয়েছিলো পারস্পরিক সহানুভূতির ওপর। সেই সূত্রে তিনি কবির পক্ষ থেকে রাজার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এবং রাজা যেহেতু নিজে তাঁকে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, সে জন্যে মনে হয়, পাওনা টাকা তিনি শোধ দিয়ে থাকবেন।

কলকাতায় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো সমস্যাগুলোও কবির সঙ্গে ফিরে আসে। ফিরে আসেন পাওনাদারেরাও। বস্তুত, পঞ্চকোট থেকে রিক্তহস্তে ফিরে আসায়, তাঁর সমস্যা বরং আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে বকেয়া বাড়ি-ভাড়া নিয়ে তিনি চরম বিপদে পড়েন। এ সময়ে তাঁর অনেক ধার ছিলো — এ কথা না-বলে, বলা উচিত: তিনি ধারের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। কৈলাসচন্দ্র বসু পুরোনো মনিবের দুর্দশা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে বিদ্যাসাগরের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানান।

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে বিনীতভাবে আমি এই প্রার্থনা করি যে, যেরূপে পারেন, বিপন্ন দত্তজাকে এবারে রক্ষা করিয়া স্বীয় অপার করুণার আরও সুপরিচয় প্রদান করিবেন। ফলতঃ মহাশয়ের অনুগ্রহ ভিন্ন বর্তমানে দত্তজার আর উপায়ান্তর নাই।[১১১]

এই চিঠির সঙ্গে তিনি কবির যে-ধারের হিশেব পাঠান, তা থেকে দেখা যায়, তখন তাঁর কাছে বিভিন্ন জন যে-টাকা পেতেন, তার পরিমাণ ছিলো সেকালের মাপে প্রায় অবিশ্বাস্য – ৪২ হাজার টাকা। এই টাকার সবটাই তিনি সরাসরি ধার করেননি। তাঁর পাওনাদারদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সাবেক কর্মচারী। তা ছাড়া, অনেকের কাছ থেকে তিনি জিনিশপত্র কিনে অথবা পরিসেবা নিয়ে সেসবের দাম শোধ করতে পারেননি। এভাবেই তিনি ধীরে ধীরে ধারের স্রোতে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় কৈলাসচন্দ্র বসুর চিঠি যথেষ্ট ছিলো না, স্বয়ং কবিকে সরাসরি হাত পাততে হয় পুরোনো বন্ধু বিদ্যাসাগরের কাছে। নিতান্ত বাধ্য না-হলে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে নতুন করে দয়া ভিক্ষা করতেন না। কারণ তাঁদের সম্পর্ক তখন আগের মতো ঘনিষ্ঠ ছিলো না। তিনি অভিমান করে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছিলেন।

অপর পক্ষে, এক কালের দরদী বিদ্যাসাগরও মাইকেলের ব্যাপারে খুব তিক্ত এবং বিরক্ত হয়েছিলেন। বঙ্গ সমাজের অত্যুজ্জ্বল তারকা হলেও, বিষয়বুদ্ধি-বর্জিত কবিকে আর্থিক ব্যাপারে ভরসা করা যায় না এবং তিনি সকল সংশোধনের উর্ধ্বে – বিদ্যাসাগর এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন, তা ভালো করে জানা সত্ত্বেও, কবি সেই অপমান গায়ে না-মেখে করুণ আবেদন জানালেন তাঁর কাছে। কারণ তাঁর এ সময়ের বিপদ এবং প্রয়োজন ছিলো মান-অপমানের উর্ধ্বে।

আপনি আমার সবচেয়ে বড়ো উপকারী এবং বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে মহান। আপনি নিজেই যখন অমন খারাপ অবস্থায় আছেন, তখন আপনাকে আমার বিষয় নিয়ে বিরক্ত করে স্বার্থপরতার পরিচয় দিচ্ছি। আমার এ অপরাধ ক্ষমা করুন। কিন্তু আপনি যাঁর নাম ধারণ করছেন, তিনি ছাড়া আমাকে সাহায্য করার মতো আর কেউ নেই। আপনার নাম শুনে এখন আমার বেশির ভাগ পাওনাদার আমার সুবিধের কথা বিবেচনার করার জন্যে একমত হয়েছেন। এখন প্রচণ্ড তুফানের মধ্যে রক্ষা পাওয়ার মতো এক টুকরো ভূমি আমি সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই অবস্থায় আমি যখন চিন্তা করি যে, মাত্র দু হাজার টাকার জন্যে এসবই হারাতে হবে এবং আমাকে ডুবে মরতে হবে, তখন আমি মরমে মরে যাই। আমার পুরোনো বন্ধু এবং রক্ষাকর্তা হিশেবে আপনি কি চাইবেন যে, আমার সর্বনাশ হোক? আপনি যদি রাজীবের সঙ্গে দেখা করে আপনার প্রদীপ্ত বাকপটুতা দিয়ে আমার প্রতি তাঁর পুরোনো ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে পারেন, তা হলে তিনি আপনার কথা না-শুনে পারবেন না – যদিও জানি আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা এখন লজ্জা এবং দুঃখের কাছে নতি স্বীকার করেছে। তাঁর কাছে দু হাজার টাকার ধার কি? আমার বাড়িওয়ালা আর এক মুহূর্তও দেরি করতে রাজি নয়। তা ছাড়া, আমার ছোটোখাটো পাওনাদারেরাও আমার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। দু হাজার টাকা পেলে আমি বেঁচে যাবো। তা হলে আমি অবিলম্বে আরও ছোটো একটা বাড়িতে চলে যাবো এবং খুব কম টাকাতে সংসার চালাতে চেষ্টা করবো। আমার আগামী কাল বিকেলের মধ্যেই এই টাকাটা দরকার। তা না হলে আমার ভাগ্যে আছে পালানো অথবা তার চেয়েও খারাপ কিছু। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে, আমার এই চিঠি যেন আপনার কোমল অন্তরে একটি ভগ্নহৃদয়ের আর্তির মতো শোনায়।[১১২]

এ চিঠিতে যে-রাজীবের কথা উল্লেখ করেছেন, আগেই লক্ষ্য করেছি, তিনি কাশিমবাজার মহারানী স্বর্ণময়ীর এস্টেটের দেওয়ান। বিধবাবিবাহ বাবদে যে-ঋণে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে ১৮৬৯ সালে বিদ্যাসাগর এঁরই মাধ্যমে মহারানীর কাছে তিন বছরের জন্যে বিনা সুদে সাড়ে সাত হাজার টাকা প্রার্থনা করেন। রাজীবলোচন মহারানীর অনুমতি নিয়ে এই টাকা দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর যখন পারবেন তিনি যেন তখন টাকা শোধ দেন।[১১৩] রাজীবের দয়ালু হৃদয় এবং তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠতার কথা মাইকেল জানতেন। সেই সূত্রেই তাঁর কাছ

থেকে ঋণ জোগাড় করে দেবার অনুরোধ জানান।

চিঠির ভাষা থেকে সহজেই বোঝা যায়, কবি কী সীমাহীন বিপদে পড়ে এ চিঠি লিখেছিলেন। পাঁচ বছর আগে ধার শোধ নিয়ে যে-তিক্ততা হয়েছিলো, তিনি অথবা বিদ্যাসাগর কি তা পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলেন? বস্তুত, মরিয়া হয়ে তিনি এ চিঠি লিখেছিলেন। কে জানে ধারের ভয়ে পালিয়ে যাবার কথা লেখার সময়ে চকিতে তাঁর মৈনাকগিরি এবং দুর্যোধনের পালানোর উপমা মনে পড়েছিলো কিনা! কে জানে মনে পড়েছিলো কিনা প্রথম যৌবনের সেই দর্পিত উক্তি – রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে টাকা গুনে ব্যয় করে না! সেই দিন আর এই দিন! আজ চরম শোচনীয় অবস্থায় মাত্র দু হাজার টাকা ধারের জন্যে কী আকুল আবেদন! কিন্তু তাঁর প্রয়োজন আত্যন্তিক হওয়া সত্ত্বেও, এ চিঠি করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে কোনো করুণার উদ্রেক করতে পারেনি। বিদ্যাসাগর নিজেও এ সময়ে শারীরিক, সাংসারিক এবং আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। হতে পারে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি সাহায্য দানের উদ্যোগ নিতে পারেননি। তবে তিক্ততা যদ্দুর সম্ভব ঢেকে রেখে কবিকে তিনি ৩০ সেপ্টেম্বর (১৮৭২) তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন – তাঁকে উদ্ধার করা তাঁর সাধ্যের বাইরে।

> আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি এবং দুঃখের সঙ্গে এটা আমার মেনে নিতে হয়েছে যে, আপনার বিষয়টা একেবারে নৈরাশ্যজনক – আমি অথবা অন্য যে কেউ – তার যদি না অনেক টাকা থাকে – যতোই কঠোরভাবে চেষ্টা করিনে কেন, আপনাকে রক্ষা করা যাবে না। জোড়াতালি দিয়ে আপনার সমস্যার সমাধান করার পক্ষে বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। আমার শরীর মোটেই ভালো নেই এবং আমি আর লিখতে পারছিনে।[১১৪]

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে লেখাপড়া শিখলেও, ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইংরেজি ভালো করে শিখেছিলেন। তবে সেকালের বেশির ভাগ নব্যশিক্ষিতদের মতো তিনি বাঙালিদের কাছে ইংরেজিতে চিঠি লিখতেন না। এমন কি, সাহেব মাইকেলকেও দু-একবারের বেশি ইংরেজিতে লেখেননি। কিন্তু ওপরের চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন ইংরেজিতে। সুরেশচন্দ্র মৈত্র হয়তো ঠিকই বলেছেন – এ চিঠিতে যে-নিষ্করুণ বক্তব্য ছিলো, তা যাতে যদ্দুর কম মর্মান্তিক শোনায়, পরদেশী ভাষার ব্যবহার সেই উদ্দেশে।[১১৫] কিন্তু ইংরেজি ভাষার আপাতমধুর প্রলেপ থাকলেও, চিঠি পেয়ে কবি কম মর্মাহত হয়েছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ নেই। বরং উল্টোটাই মনে হয়। বাল্যবন্ধুরা কেউ নন, এমন কি, গৌরদাস বসাকও নন – জীবনের শেষ দিকে একজন লোকই ছিলেন যাঁর কাছে কবি সব সংকোচ এবং আত্মমর্যাদা ভুলে গিয়ে সাহায্য চাইতে পারতেন – সেই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে তিনি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর কোনো আত্মীয়স্বজন ছিলেন না – যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিলো না – বিদ্যাসাগরকে তিনি গণ্য করতেন তাঁর আত্মীয়রূপে। ভার্সাই থেকে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে যেসব চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে মনে হয়, তাঁর কাছে তিনি রীতিমতো আবদার করতে পারতেন। সেই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মর্মান্তিক কষ্ট পাওয়াই স্বাভাবিক। এর

মাইকেলের ধারের হিশেব

বড়বাজারের লালা ৮৫০০; কালীচরণ ঘোষ ৫০০০; উমেশচন্দ্র বসু ও মুনসির মিহি আনা (শেষে' নামটির বানান ঠিক নেই) ৫০০০; টালিগঞ্জের মথুর কুণ্ডু ৪০০০ (এর কাছ থেকে বিলেত যাবার আগেও ধার করেছিলেন); ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ৩৫০০ (কবির প্রকাশক); বহুবাজারের গোবিন্দচন্দ্র দে ৩০০০; দ্বারকানাথ মিত্র ২৫০০ (হাইকোর্টের বিচারপতি); মতিচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০০; খিদিরপুরের হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] (এক সময়ে বাড়ির দাম বাবদ এঁর কাছে কবি কিছু টাকা পেতেন); বেনারসের রাজা ১৫০০; [illegible]বাজারের প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ১১০০; গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী ১০০০ (এঁর মামলা করেছিলেন); চাকরের বেতন ৭০০; গমেজ সাহেব ৫০০; মানভূম ৫০০; ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশন ৫০০; মনিরুদ্দীন ৪০০; বাড়ি বাড়া ৩৯০; আমিরন আয়া ২০০; কেদার ডাক্তার ২০০; চন্দননগরের ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত ২০০; বিশ্বনাথ লাহা ১০০; দে কোং ১০০

পর অনাহারে, অর্ধাহারে এবং অযত্নে তিনি মারা গেছেন, কিন্তু আর কোনো দিন তাঁর কাছে সাহায্য চাননি। তিনি বিপজ্জালে আপদমস্তক আটকা পড়েছিলেন বটে, কিন্তু সামান্য আত্মসম্মান বোধ এবং অভিমান তখনো অবশিষ্ট ছিলো।

পঞ্চকোট থেকে ফেরার পর কবি আরও ন মাস বেঁচেছিলেন। এ সময়ে তিনি কী করতেন, পাঁচ সদস্যের সংসার কি করে চলতো, তাঁর বন্ধুরা কতোটা খোঁজ-খবর নিতেন — তার কোনো বৃত্তান্ত জানা যায় না। যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর জীবনী লিখেছিলেন কবি মারা যাবার মাত্র কুড়ি বছর পরে। তখনো কবির স্মৃতি হারিয়ে যায়নি। তখনো তাঁর বন্ধুরা সবাই জীবিত। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার এই অধ্যায়ের কোনো বিস্তারিত বিবরণ যোগীন্দ্রনাথ উত্তর কালের জন্যে রেখে যাননি। কেবল ছোটোখাটো মন্তব্য থেকে জানা যায়, তাঁর স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিলো। গলায় ঘা দেখা দিয়েছিলো। মাঝেমধ্যে রক্ত পড়তো গলা থেকে। জ্বর হতো কখনো কখনো। যক্ষ্মা অথবা গলার ক্যান্সার হয়েছিলো কিনা, জানা যায় না। যকৃতের সিরোসিস থেকেও এমন লক্ষণ দেখা দেওয়া সম্ভব। তবে যে-রক্তচাপ এবং হৃদরোগ আগেই দেখা দিয়েছিলো, এ সময়ে তার অবনতি হয়। ভালো করে নড়াচড়া করার ক্ষমতাও তাঁর লোপ পেয়েছিলো। পেটে এবং পায়ে জল জমতে থাকে। কিন্তু শরীর যতো অপটুই হোক না কেন, ছোটোখাটো মামলা-মকদ্দমা হাতে এলে, এ সময়েও অনিবার্য কারণে তা না-নিয়ে পারতেন না। ওদিকে, বেনিয়াপুকুর রোডের যে-বাড়িতে ছিলেন, মাসের পর মাস ভাড়া শোধ করতে না-পারায়, সম্ভবত তা-ও ছেড়ে দিয়ে হয়। শুরু করেছিলেন স্পেন্সেস হোটেল দিয়ে, শেষ পর্যন্ত জায়গা হলো এন্টালির বস্তিতে। শুরু করে-ছিলেন ছ হাজারের টাকার আশা নিয়ে, শেষ করলেন সম্ভবত দু-এক শো টাকার ভরসা করে। য়োরোপ থেকে ফিরে কাজ শুরু করেছিলেন অফুরন্ত জীবনীশক্তি নিয়ে, সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে — মাত্র ৪৮ বছর বয়সে সেই জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে ফেললেন। কখনো বা তাঁর মনে পড়ে তরুণ বয়সে বিশ্ববিখ্যাত নাটকে পড়েছিলেন -

> জীবন চলন্ত ছায়া — নির্বোধের উপাখ্যান এক -
> আগাগোড়া লম্ফঝম্ফ কোলাহলে ভরা -
> অর্থ নেই কোনো

এতো আশা করেছিলেন, এতো স্বপ্ন দেখেছিলেন — বোঝার আগেই সব নিমেষে উবে গেলো! ডাক্তারের বলার আবশ্যক নেই — সময় যে ফুরিয়ে এসেছে — নিজে তা অনুভব করতে পারেন। মৃত্যুকে তিনি কি ভয় পান? একেবারে অন্তিম মুহূর্তে তিনি নাকি বলেছিলেন, ভয় পান না। কিন্তু জীবনকে যিনি অতো উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুর আশঙ্কা তাঁর জন্যে নিশ্চয় উল্লাসের কারণ ছিলো না। তদুপরি, নিজের মৃত্যুর কথা ভেবে তিনি যেমনই অনুভব করুন না কেন, হেনরিয়েটার স্বাস্থ্য দেখে নিশ্চিতভাবে ভয় পান — যতোটা হেনরিয়েটার জন্যে, তার চেয়েও বেশি সন্তানদের জন্যে। পঞ্চকোট থেকে ফিরে আসার কদিন পরেই কন্যা শর্মিষ্ঠার বয়স ১৩ বছর পুরো হয়। তার আগে জুলাই মাসে মেঘনাদের বয়স হয়েছিলো এগারো বছর। আর নেপোলিয়ানের বয়স প্রায় সাড়ে পাঁচ। এদের কে দেখাশোনা করবে? শর্মিষ্ঠা পৌঁছে গেছে বয়ঃসন্ধিতে — কে তার বিয়ে দেবে? অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, নিদারুণ অনটন, রোগ-কাতর দেহ এবং সর্বোপরি সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ তাঁকে একান্তভাবে বিপন্ন করেছে। এ সময়ে তিনি সোনালি পর্বে তাঁরই লেখা কয়েকটি পঙ্ক্তি মনে করে থাকবেন:

> বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
> একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
> নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ এ দুরন্ত রিপু

তেমতি দুর্বল দেখ করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর পরে!

এই পঙ্‌ক্তিগুলোর মধ্যে কেবল একটা কথা প্রাসঙ্গিক নয় — তাঁকে কোনো রিপু ধীরে ধীরে কিন্তু অব্যর্থভাবে দুর্বল করছিলো না, বরং স্বয়ং বিধাতাই যেন তাঁকে *ঠেলে* দিচ্ছিলেন চরম সর্বনাশের মুখে।

এই সর্বব্যাপী হতাশার মধ্যে বেঙ্গল থিয়েটার কম্পেনির তরফ থেকে একটি প্রস্তাব এলো তাঁর কাছে — একটি নাটক লিখে দেবার জন্যে।[১১৬] বিনিময়ে কিছু টাকা পাবেন তিনি। সামান্য টাকা। কিন্তু তখন খুড়-কুটো যা পান, তাই আঁকড়ে ধরার মতো অবস্থা তাঁর। সুতরাং একেবারে অক্ষম শরীর নিয়ে রাজি হয়ে গেলেন নাটক লিখতে। অনেক বছর আগে কলকাতায় তাঁর সৃষ্টি-যজ্ঞের সময়েও তিনি কখনো কখনো মুখে মুখে বলে যেতেন আর তাঁর পণ্ডিত লিখে নিতেন। তবে তখন তার কারণ ছিলো ভিন্ন। এবারে লেখার জন্যে দরকারী ন্যূনতম শারীরিক শক্তিটুকুও অবশিষ্ট ছিলো না। সে জন্যে ডিকটেশন দিয়ে লেখাতে হলো *মায়াকানন*। এ নাটকের নাম বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। জীবন যে একটা মায়াকানন এবং সেখানে পূর্ব-নির্ধারিত কতোগুলো দৃশ্যে অভিনয় করাই মানুষের কাজ — এ পর্বে এসে তিনি তা ভালোভাবে অনুধাবন করেন। *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* থেকে আরম্ভ করে তাঁর নাটক এবং কাব্যে তিনি যত্রতত্র বলেছেন নিয়তির অনিবার্য এবং অমোঘ গতির কথা। *মায়াকাননে* এসে আরও একবার দৈবশক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির বলিষ্ঠ সংগ্রাম এবং পরিণতিতে তার অনিবার্য পরাজয়ের কথা বললেন। সুন্দ-উপসুন্দ, রাবণ-মেঘনাদের বিপুল বীরত্বও এই দৈবশক্তির কাছে হার মেনেছিলো। অজয় এবং রাজকুমারী ইন্দুমতী সেই অন্ধ নিয়তির কাছেই পরাজয় স্বীকার করে। যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী ছিলেন কবি নিজে, তা ধুয়ে-মুছে যায় অজয় এবং ইন্দুমতীর তাজা রক্তের ধারায়। ইন্দুমতী এবং অজয় উভয়ই পূর্ব-নির্ধারিত ভাগ্যের কাছে বিনা অপরাধে আত্মবিসর্জনে বাধ্য হয়েছিলো। যে-দেশে সেকালে বিয়ে হতো পিতামাতার ইচ্ছেয়, সে দেশে মনোনীত পাত্রকে লাভ করার জন্যে পাত্রীর অথবা পাত্রীকে লাভ করার জন্যে পাত্রের আত্মাহুতি অসাধারণ ঘটনা। তবে মনোনীত জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনী লাভ করার আদর্শ মাইকেলের কাছে ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র। এ নাটকের পাত্রপাত্রীরা তাই কোনো আপোশ মেনে নিতে পারেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, *কৃষ্ণকুমারী* রচনার এক যুগ পরে তিনি এই নাটক লেখার কাজ শুরু করেন। ততো দিনে তাঁর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণতি এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এ নাটকে তাঁর প্রতিভার কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য তার আংশিক কারণ তাঁর শারীরিক অক্ষমতা এবং মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা। যেভাবে তিনি এ নাটকের যবনিকা ফেলেছেন, তার মধ্যে কোনো রকমের সৃষ্টির সংযম লক্ষ্য করা যায় না। রাজকুমারী ইন্দুমতী এবং অজয়ের আত্মহত্যার পরেও নাটকের সমাপ্তি না-হওয়ায় মাইকেলের নাটকীয় বোধ সম্পর্কেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কিন্তু শোনা যায়, এ নাটক তিনি নিজে শেষ করেননি। এই নাটক লেখার জন্যে তাঁকে যাঁরা টাকা দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে সেই থিয়েটার কম্পেনির কর্তারা নাটকটি নিজেদের ইচ্ছে মতো শেষ করেন। যেখানে শেষ করলে দর্শকরা সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন বলে তাঁরা ভেবেছিলেন, সেখানেই তাঁরা সমাপ্তি টেনেছিলেন। এ নাটকের ভূমিকায় লেখা ছিলো: '*সংবাদ প্রভাকরে*র সহ-সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।' তিনি কেবল নাটকের সমাপ্তিতে নয়, বানান এবং অন্যান্য ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এ নাটকে চলতি ক্রিয়াপদের বানান আগেকার বানান থেকে আলাদা। এই নাটকে কেবল একটি উজ্জ্বল দিক লক্ষ্য করা যায়: সে এই নাটকের ভাষা। তাঁর আগের নাটক *কৃষ্ণকুমারী*র ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই *মায়াকাননে*

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। *মায়াকাননের* সংলাপের ভাষা মুখের ভাষার কাছাকাছি। এমন কি, রাজা-মন্ত্রীর ভাষাও আগের মতো অতোটা গুরুচণ্ডালী মেশানো নয়—এ নাটকে তা প্রায় আর-পাঁচজনের মতো সাধারণ। বস্তুত, এ নাটকে তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা নাটকগুলোর সংলাপের আড়ষ্টতা অনেকাংশে অনুপস্থিত। তার বদলে এতে বেশ খানিকটা সাবলীলতা দেখা দিয়েছে। অবশ্য এ পরিবর্তন কবি নিজে এনেছিলেন, না কি ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপের ফল, তা জানার উপায় নেই। ভুবনচন্দ্র ভাষার এই পরিবর্তন করে থাকলে অবাক হবো না। কারণ, তিনি চলতি স্টাইলে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অনেকে বলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁকে দিয়েই লিখিয়েছিলেন *হুতোম প্যাঁচার নকশা*।[১১৭] কিন্তু এ ব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রশ্নাতীত না-হলেও, ১৮৭০-এর দশকে তিনি *সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়* গ্রন্থে যে-গদ্য লেখেন, তার সঙ্গে *হুতোমের* মিল অস্বীকার করা যায় না। অন্তত, তিনি যে *হুতোম* লিখতে পারতেন, এটা মেনে নিতে হয়। সেই যাই হোক, *কৃষ্ণকুমারীর* ভাষার সঙ্গে *মায়াকাননের* ভাষার তুলনা করলে *মায়াকাননে* এসে কবির ভাষা কতোটা সামনের দিকে এগিয়েছিলো তার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়:

কৃষ্ণকুমারী

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেখি, এ সংবাদে রাজা দুর্য্যোধনের মতন আমার হর্ষবিষাদ হলো। শত্রুবলস্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যেহেতুতে ত্যাগ কল্যে, সে কথাটি মনে হল্যে আমার আর এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণ ধারণ কত্যে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে একজন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্যরক্ষা কত্যে হলো! ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?

মায়াকানন

রাজা। (সজল নয়নে) মন্ত্রি! আমার মত অভাগা লোক এ পৃথিবীতে আর নাই। তুমি জানো যে, অজয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ করে আমি পঞ্চালপতির সমীপে দূত প্রেরণ করেছি। জনরব রাজকন্যাকে নানা রূপে ও নানা গুণে ভূষিত করে। গত কল্য সায়ংকালে আমি অজয়ের নিকট এ প্রসঙ্গ কল্লে সে একেবারে রাগান্ধ হয়ে আমায় বল্লে, 'পিতা, আমার অনুমতি বিনা আপনি এ কর্ম্ম কেন কল্লেন?' অনুমতি! পিতারে কি কখনো এসব বিষয়ে পুত্রের অনুমতি নিতে হয়? ইচ্ছা করে দুরাচারের মস্তকচ্ছেদন করে ফেলি? তা তুমি কি বল?

মায়াকানন লেখার কাছাকাছি সময়ে কবি তাঁর জীর্ণ দেহ নিয়ে আরও একটি কাজ হাতে নিয়েছিলেন। সে হলো: শিশুপাঠ্য কিছু কবিতা লেখার। ভার্সাইতে থাকার সময়ে তিনি লা ফঁতেনের কবিতার অনুকরণে যে-তিনটি কবিতা রচনা করেছিলেন, তাঁর এই শিশুপাঠ্য কবিতাগুলোও সেই ধরনের। হঠাৎ তিনি শিশুপাঠ্য কবিতা লিখলেন কেন, সে কৌতূহল অস্বাভাবিক নয়। এ পর্যায়ে হঠাৎ তাঁর কবিত্ব তাঁকে বিশেষ করে প্রেরণা দিয়েছিলো, এমনটা মনে হয় না। তা হলে তিনি অন্য রকমের কবিতা লিখতেন। আমার ধারণা, *মায়াকাননের* মতো, কোনো প্রকাশক নগদ অর্থের বিনিময়ে এই কবিতা লিখে দেবার অনুরোধ করে থাকবেন। সেকালে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং দুর্গাচরণ গুপ্তের মতো অনেকে পাঠ্যপুস্তক লিখে প্রচুর টাকা করেছিলেন।[১১৮] কবির পক্ষে সেই দৃষ্টান্ত দেখে উদ্বুদ্ধ হওয়া অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু তিনি আগে এ পথে আসেননি। শিশুপাঠ্য কবিতা লিখে আর্থিকভাবে লাভবান হবার উদ্দেশে এই কবিতা রচনা করলে, তিনি তা আগেই করতেন। হতে পারে, তাঁর সাহিত্যিক অহঙ্কারের দরুন তিনি তখন এ পথে যাননি। কিন্তু অন্তিম সময়ে তিনি সেটুকুও ধরে রাখতে পারেননি।

১৮৭৩ সালের মার্চ মাস নাগাদ কবির স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেছেন — ঢাকা থেকে ফেরার পর।[১১১] হেনরিয়েটার স্বাস্থ্যও। এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন, সত্যি সত্যি মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। অপরিমিত মদ্যপান করে মৃত্যুকে তিনি তরাণ্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে, বিশেষ করে সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, তিনি ব্যাকুল হয়ে থাকবেন। এতো আদরের দুই পুত্র এককালে বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হয়ে শেষে কি অনাহারে মারা যাবে, অথবা ভিক্ষে করবে অন্যের দ্বারে? আর বয়ঃসন্ধিতে উপনীতা আদরের কন্যা শর্মিষ্ঠারই বা কি উপায় হবে? কন্যার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে হেনরিয়েটাও শিউরে ওঠেন। এই পরিস্থিতিতে কবি মরিয়া হয়ে বালিকা কন্যার বিয়ে ঠিক করেন। যে-মাইকেল বিয়ের ব্যাপারে চিরদিন বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে — মনোনীত জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনীকে বেছে নেবার নীতিতে, যে মাইকেল জীবনের একেবারে প্রান্তে উপনীত হয়েও নাটক রচনা করেছিলেন অজয় এবং ইন্দুমতীকে নিয়ে, তিনি এ পদক্ষেপ নিতে গিয়ে কতো বিচলিত বোধ করেছিলেন, তা কেবল অনুমান করা যায়। এ অসম্ভব প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন ছিলো। কিন্তু সম্মতি না-দেওয়া ছিলো আরও কঠিন। অভিভাবকহীন, সহায়-সম্বলহীন একটি কিশোরীর কি শোচনীয় পরিণতি হতে পারে, অবশ্যই তা বিবেচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। মে মাসের ৭ তারিখে মাত্র ১৩ বছর ৭ মাস ২২ দিন বয়সে একটি প্রতিশ্রুতিতে ভরা কিশোরীর বিয়ে হলো তার ঠিক দ্বিগুণ বয়সী একটি সামান্য-শিক্ষিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবকের সঙ্গে। বর এবং কনের বয়সের পার্থক্য বিবেচনা করেই বোধ হয় বিয়ের দলিলে পাত্রের বয়স লেখা হয়নি। তার বদলে লেখা হয়েছে — পরিণত বয়স্ক — of age।[১২০] ছবি আঁকতেন এই যুবক। তবে ছবি এঁকে যেহেতু সংসার চালানো যায় না, সে জন্যে তিনি হাই কোর্টে অনুবাদের কাজ করতেন। (হাই কোর্টে তাঁর কোনো চাকরি ছিলো বলে মনে হয় না।) কোর্টেই কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে থাকবে। তা ছাড়া, ইনি বাস করতেন লাউডন স্ট্রীটের কাছেই। তাড়াহুড়ো করে যে-কিশোরীর বিয়ে হলো, তার পিতা একদিন অভিভাবক-মনোনীত একটি বালিকা-পাত্রীকে বিয়ে করার হাত থেকে বাঁচার জন্যে পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ, ধর্ম এবং আবাল্যের সুখের নীড় ত্যাগ করে পথে নামতে দ্বিধা করেননি। শর্মিষ্ঠার বিয়ে মাইকেলের পরাজয় স্বীকার করে নেবার চরম দৃষ্টান্ত।


মায়া-কানন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ
ও
শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮।
সম্বৎ ১৯৩০।

মায়াকাননের নামপত্র

তিনি তখন নিতান্ত রিক্তহস্ত। কিন্তু নিজের শেষ সম্বল দিয়ে কন্যার বিয়ের আয়োজন করেছিলেন বলে মনে হয়। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রটি ছিলো ছাপানো। আর নিমন্ত্রণপত্রের শেষে ছিলো অতিথিদের জন্যে খাদ্য এবং পানীয়ের প্রতিশ্রুতি।[১২১]

শর্মিষ্ঠার বিয়ের ঠিক পর ভাঙ্গা মন আর অক্ষম দেহ নিয়ে সপরিবারে যান উত্তরপাড়ায়।[১২২] প্রায় চার বছর আগে যেখানে উঠেছিলেন, এবারেও উঠলেন সেই একই জায়গায় — লাইব্রেরির ওপর তলায়। কিন্তু সেবার আর এবারের মধ্যে কতো পার্থক্য! সেবারে চোখে ছিলো অফুরন্ত স্বপ্ন! এবারে চোখে কেবল মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তহীন হতাশার নিষ্প্রভ আলো। উত্তরপাড়ায় তাঁর আশ্রয়দাতাদের অন্যতম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর স্মৃতি-কাহিনীতে জানিয়েছেন, এই যাত্রায় মাইকেল কতোদিন ছিলেন উত্তরপাড়ায়, কী করতেন সেখানে, তাঁর পরিবারের অবস্থা কেমন ছিলো। হেনরিয়েটার পারিবারিক পরিচয় বিষয়ে তাঁর স্মৃতিচারণ করে তিনি যোগীন্দ্রনাথ বসুকে এবং তাঁর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে তিনসত্য দিয়ে বিভ্রান্ত করলেও, উত্তরপাড়ায় কবি কতোদিন ছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কবি সেখানে ছিলেন ছ সপ্তাহ।

এ সময়ে উত্তরপাড়ায় কবির জীবনযাত্রা এবং কার্যকলাপের যে-করুণ বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তাঁর সেখানে না-গিয়ে প্রথমেই যাওয়া উচিত ছিলো আলিপুরের জেনরেল হসপিটালে। কারণ এ সময়ে তিনি এবং হেনরিয়েটা উভয়ই দারুণ অসুস্থ ছিলেন। কে বেশি বলা মুশকিল। অনেক সময় তিনি আরাম কেদারায় বসে চোখ বুজে পড়ে থাকতেন।[১২৩] বস্তুত, তিনি এ সময়ে মৃত্যুর দিন গুনছিলেন। তবে সেই সঙ্গে মনে মনে হয়তো একটা কঠিন হিশেব মেলাতে চেষ্টা করতেন — কী আশা করেছিলেন আর শেষ পর্যন্ত কী অর্জন করেছিলেন! তাঁর শারীরিক অবস্থা যে খুবই খারাপ — সে খবর তাঁর বন্ধুরা পেয়েছিলেন। এ বছরের গোড়ার দিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে গৌরদাস বসাক বদলি হয়ে এসেছিলেন হাওড়ায়। তিনি এ সময়ে একাধিক বার উত্তরপাড়ায় গিয়ে মাইকেলকে দেখে আসেন। শেষ বার সেখানে তিনি যে-দৃশ্য দেখতে পান, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি তার বিবরণ দিয়েছেন:

> Mr. and Madam Michael M. Dutt present their compliments to ... [Babu Gour Das Bysack] ... and request the pleasure of his company to witness the Nuptials of their only daughter Henrietta Eliza Sermista to William Walter Evans Lloyd, at St. Paul's Cathedral on Wednesday, the 7th proximo, at 5 p.m. and thence to their residence, 22 Beniapukur Road.
>
> Cake and Wine.
>
> Calcutta
>
> 29th April, 1873.
>
> **শর্মিষ্ঠার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র**
> **উৎস: রাধারমণ মিত্র, *কলিকাতা-দর্পণ***

> মধুকে দেখতে যখন শেষ বার উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগারের কক্ষে যাই, তখন আমি যে-মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখতে পাই, তা কখনো ভুলতে পারবো না। সে সেখানে গিয়েছিলো হাওয়া বদল করতে। সে তখন বিছানায় তার রোগযন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছিলো। মুখ দিয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছিলো। আর তার স্ত্রী তখন দারুণ জ্বরে মেঝেতে পড়েছিলো। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মধু একটুখানি উঠে বসলো। কেঁদে ফেললো তারপর। তার স্ত্রীর করুণ অবস্থা তার পৌরুষকে আহত করেছিলো। তার নিজের কষ্ট এবং বেদনা সে তোয়াক্কা করেনি। সে যা বললো, তা হলো: 'afflictions in battalions.' আমি নুয়ে তার স্ত্রীর নাড়ী এবং কপালে হাত দিয়ে তাঁর উত্তাপ দেখলাম। তিনি তাঁর আঙুল দিয়ে তাঁর স্বামীকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলে নিম্নকণ্ঠে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন: 'আমাকে দেখতে হবে না, ওঁকে দেখুন, ওঁর পরিচর্যা করুন। মৃত্যুকে আমি পরোয়া করিনে।'[১২৪]

বাল্যবন্ধুর অন্তিম দশা দেখে গৌরদাস স্বভাবতই বিচলিত বোধ করেন। তিনি যে তাঁর জন্যে বেশি কিছু করতে পারতেন, তা নয়। তবু তিনি তাঁকে অবিলম্বে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন। শুনলেন, পরের দিন — ২০/২১ জুন (১৮৭৩) তারিখে — কলকাতায় ফেরার ব্যবস্থা মধু নিজেই করে রেখেছেন। পরিবার নিয়ে কবি বজরায় করে পরের দিন কলকাতা যাত্রা করলেন।[১২৫]

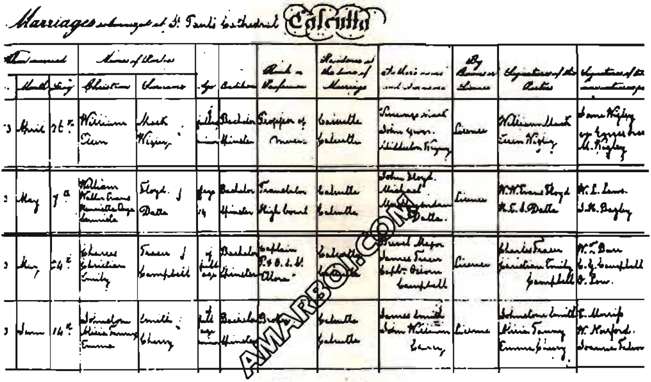
হেনরিয়েটাকে ওঠানো হলো তাঁর জামাতা উইলিয়াম ওয়াল্টার এভান্স ফ্লয়েডের বাড়িতে[১২৬] — ইংরেজ আর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাড়ায় — ১১ নম্বর লিন্ডসে স্ট্রীটে।[১২৭] আর কবির নিজের ওঠার মতো কোনো জায়গা ছিলো না। উত্তরপাড়ায় যাবার আগেই তিনি তাঁর এন্টালির বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। তিনি নিজে আশ্রয় পেলেন আলিপুরের জেনরেল হসপিটালে। দেশীয় ভদ্রলোকেরা তখনও হাসপাতালে ভর্তি হওয়াকে কালাপানি পার হওয়ার মতো শাস্ত্র-বিরুদ্ধ একটা অসাধারণ ব্যাপার বলে বিবেচনা করতেন। তাই এ হাসপাতাল ছিলো কার্যত বিদেশী আর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্যে সংরক্ষিত। মনোমোহন ঘোষ এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু তদবির করাতে এবং তাঁর নিজের সাহেবী পরিচয়ের দরুন তিনি এ হাসপাতালে শেষ কটা দিন কাটানোর অনুমতি পান।[১২৮] তা ছাড়া, এ ব্যাপারে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক সূর্য গুডিব চক্রবর্তী এবং এই হাসপাতালের চিকিৎসক এবং এক সময়ে কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডক্টর পামারের খানিকটা অবদান ছিলো বলে মনে হয়।

উত্তরপাড়ায় তিনি বিনা-চিকিৎসায় সময় কাটাচ্ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন যে, হাসপাতালে আসার পর প্রথম দিকে শুশ্রূষা এবং ওষুধপত্রের দরুন তাঁর রোগ লক্ষণের খানিকটা উপশম হয়েছিলো।[১২৯] তবে অচিরেই তাঁর স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতির দিকে যায়। যকৃৎ, প্লীহা এবং গলার অসুখে তাঁর দেহ অনেক দিন আগেই জীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু যখন হাসপাতালে ভর্তি হন তখন যকৃতের সিরোসিস থেকে দেখা দিয়েছিলো উদরী রোগ।[১৩০] হৃদ্‌রোগও ছিলো তাঁর।

একদিন এক 'সাহেব কবি' গৌড়জনের জন্যে অকৃপণভাবে মধুচক্র নির্মাণ করেছিলেন — সেই মধুর স্বাদ তাঁরা পুরোপুরি গ্রহণ করতে অক্ষম হলেও, এই মধুচক্রের কথা বাঙালিদের কাছে অজানা ছিলো না। সেই কবি মারা যাচ্ছেন শুনে আলিপুরের হাসপাতালে মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্য গুডিব চক্রবর্তী, এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেকে এসেছিলেন তাঁকে দেখার জন্যে। তাঁর চরম দুরবস্থার খবর শুনেও এতো দিন যাঁরা খোঁজখবর নিতে পারেননি, তাঁদেরও অনেকে এসেছিলেন। রক্তের আত্মীয়তা সত্ত্বেও যাঁরা একদিন তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন, এ সময়ে তাঁদের মনেও করুণা দেখা দিয়েছিলো। শেষ কদিন তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের স্মৃতিচারণ থেকে মনে হয়, মারা যাচ্ছেন — এ কথা কবি ভালো করে অনুভব করতে পেরেছিলেন।[১৩১] কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে তিনি ভালো হয়ে উঠবেন বলে স্বপ্ন দেখতেন। কল্পনা করতে ভালোবাসতেন বলে একেবারে অন্তিম দশায় পৌঁছেও যা অনিবার্য তাকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাঁর ব্যয় করার — দরকার হলে — ধার করে ব্যয় করার এবং বদান্যতা দেখানোর প্রবণতাও তিনি এ সময়ে ত্যাগ করতে পারেননি। হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করতে এসেছিলেন মনিরুদ্দীন। তাঁর এক সময়ের মুন্সি। সেই সুবাদে কবির কাছে তাঁর চার শো টাকা পাওনা ছিলো। কবি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর কাছে কোনো টাকাপয়সা আছে কিনা। শুনলেন, আছে দেড় টাকা। সেই পয়সাই তিনি চাইলেন তাঁর কাছে। তারপর তা বকশিশ হিশেবে দান করলেন তাঁর শুশ্রূষাকারিণী নার্সকে।[১৩২] কেউ কেউ বলেন, টাকা

তিনি চেয়েছিলেন মনোমোহন ঘোষের কাছে।[১৩৩] কিন্তু যাঁর কাছেই টাকা চেয়ে থাকুন না কেন, ধার করে বকশিশ দেবার এই আচরণ সঙ্গতিপূর্ণ তাঁর সারা জীবনের আচরণের সঙ্গে।

হাসপাতালে তিনি ছিলেন সাত অথবা আট দিন। এ সময়ে তিনি কিছু সেবাযত্ন পেলেও, খুব মানসিক শান্তিতে ছিলেন বলে মনে করার কারণ নেই। পরিবার সম্পর্কে তাঁর দুশ্চিন্তা এবং হেনরিয়েটার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ তাঁকে নিঃসন্দেহে খুব বিচলিত করেছিলো। এরই মধ্যে ২৬ জুন (১৮৭৩) তারিখে এক পুরোনো কর্মচারীর কাছে খবর পেলেন হেনরিয়েটা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।[১৩৪] তাঁর বয়স হয়েছিলো মাত্র ৩৭ বছর ৩ মাস ১৭ দিন। বয়ঃসন্ধিকালে মা মারা যাবার পর থেকে সুখের মুখ তিনি কমই দেখেছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে তিনি মাদ্রাস


Marriages solemnized at St. Paul's Cathedral Calcutta

শর্মিষ্ঠার বিয়ের দলিল

থেকে কলকাতায় এসেছিলেন মাইকেলের ভালোবাসার টানে। চার্চে গিয়ে সেই ভালোবাসার কোনো স্বীকৃতি পর্যন্ত তিনি আদায় করতে পারেননি। বস্তুত, জীবনকে উপভোগ করার জন্যে তিনি যদি কবিকে জীবনসঙ্গী হিশেবে বরণ করে থাকেন, তা হলে মস্তো একটা ভুল করেছিলেন। তিনি অনেক দিন থেকে মুমূর্ষু ছিলেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুসংবাদ কবির কাছে খুব অপ্রত্যাশিত ছিলো না। তবু কবি ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন: বিধাতঃ, তুমি একই সঙ্গে আমাদের দুজনকে নিলে না কেন?[১৩৫] হেনরিয়েটার ভালোবাসা এবং নীরব ত্যাগের কথা অন্য সবার চেয়ে তিনিই ভালো করে জানতেন। তাই যতো অনিবার্য হোক না কেন, হেনরিয়েটার প্রয়াণে মৃত্যুপথযাত্রী কবি মর্মাহত এবং বিষণ্ন হয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর অসহায় যন্ত্রণা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তিনি খুব উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন হেনরিয়েটার শেষকৃত্য নিয়ে। এর জন্যে যে-অর্থ লাগবে, তা কোথা থেকে আসবে? তাঁর তো কোনো সঞ্চয় নেই! কে আছে তাঁর, যে এই গুরু দায়িত্ব কাঁধে নেবে?

এরই মধ্যে মনোমোহন ঘোষ আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কবি তাঁকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন, ঠিকমতো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছে কিনা। মনোমোহন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে দিয়ে জানান, সবই যথারীতি হয়েছে। জিজ্ঞেস করেন, বিদ্যাসাগর এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এসেছিলেন কিনা। মনোমোহন তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, এঁদের খবর দেওয়া সম্ভব হয়নি।[১৩৬] মনোমোহন নিজে দশ বছর ধরে হেনরিয়েটকে চিনতেন। য়োরোপে থাকার সময়ে তাঁর কাছ থেকে অনেক সেবাযত্নও পেয়েছেন।

সে জন্যে হেনরিয়েটার শেষকৃত্যের আয়োজন করাকে তিনি একটা নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচনা করতেন। প্রবাসে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও মাইকেল-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো।[১৩৭] শেষ অবস্থায় তিনিও কবির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে কার্পণ্য করেননি। উত্তরপাড়ায় গিয়ে তিনি তাঁকে দেখে এসেছিলেন।[১৩৮] মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কবির আর-একটা প্রধান উদ্বেগের কারণ ছিলো তাঁর দুই পুত্রের ভবিষ্যৎ। একটির বয়স বারো, অন্যটির ছয়। মনোমোহন এবং উমেশচন্দ্র সে সম্পর্কেও কবিকে আন্তরিকভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন। মনোমোহন বলেছিলেন, তাঁর সন্তানরা খেতে-পরতে পারলে কবির পুত্ররাও পারবে।[১৩৯] এ প্রতিশ্রুতি মনোমোহন পরে যথাসম্ভব পালনও করেছিলেন।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিলো না। জীবনের এই একেবারে শেষ মুহূর্তে তিনি এই আস্থার অভাব আর-একবার প্রমাণ করেন। তবে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লন্ডন মিশনারি সোসাইটির রেভারেন্ড চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির পারলৌকিক মঙ্গল নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে কবির চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁরা, বিশেষ করে চন্দ্রনাথ, তাঁকে এ সময়ে বার বার নাকি পরম ত্রাতা যীশু খৃষ্টের কথা মনে করিয়ে দেন।[১৪০] পারলৌকিক মঙ্গলের ব্যাপারে তাঁদের এই উৎকণ্ঠা দিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতে তাঁরা কবির প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা করেন বলেই মনে হয়। আঠাশে জুন তারিখে সমস্ত আশা-ভরসাহীন, রোগকাতর, বিষণ্ন কবি যখন মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে আছেন, তেমন সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন খৃষ্টধর্ম অনুযায়ী তাঁর শেষ স্বীকারোক্তি আদায় করতে। তিনি কোন কোন পাপের কথা স্বীকার করে বিধাতার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, কেউ তা জানেন না। জীবনকে যিনি যদ্দুর সম্ভব উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে সেই কবি কতোটা আকুল হয়েছেন তাও আমাদের অজানা। কিন্তু কৃষ্ণমোহন এবং চন্দ্রনাথ যখন তাঁকে জানান যে, তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং তাঁকে কোথায় সমাধিস্থ করা হবে, তা নিয়ে গোলযোগ দেখা দিতে পারে, তখন কবি যে-নির্ভীক উত্তর দিয়েছিলেন, তা আমাদের জানা আছে। তিনি বলেছিলেন:

> মানুষের তৈরি চার্চের আমি ধার ধারিনে। আমি আমার স্রষ্টার কাছে ফিরে যাচ্ছি। তিনিই আমাকে তাঁর সর্বোত্তম বিশ্রাম-স্থলে লুকিয়ে রাখবেন। আপনারা যেখানে খুশি আমাকে সমাধিস্থ করতে পারেন — আপনাদের দরজার সামনে অথবা কোনো গাছ তলায়। আমার কঙ্কালগুলোর শান্তি কেউ যেন ভঙ্গ না-করে। আমার কবরের ওপর যেন গজিয়ে ওঠে সবুজ ঘাস।[১৪১]

কৃষ্ণমোহন এবং চন্দ্রনাথের আশঙ্কা অমূলক ছিলো, তা নয়। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করা কবির পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

২৯ জুন রোববার মাইকেলের অন্তিম অবস্থা ঘনিয়ে এলো। তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সন্তানরা এলেন তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে। এমন কি, জ্ঞাতিদেরও একজন এসেছিলেন তাঁকে দেখতে।[১৪২] জীবনের শেষ দু বছর তাঁর নিদারুণ দুর্দশায় সহায়তার হাত প্রসারিত না-করলেও, শেষ মুহূর্তে মৃত্যুপথযাত্রীকে দেখে অনেকেই করুণায় বিগলিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্রামহীন এবং রোগজীর্ণ দেহ কবি আর ধরে রাখতে পারছিলেন না। বেলা দুটোর সময়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন চিরদিনের জন্যে।

কৃষ্ণমোহনদের আশঙ্কা অমূলক ছিলো না। তাঁর মৃত্যুর পর সত্যি সত্যি তাঁর শেষকৃত্য নিয়ে সমস্যা দেখা দিলো। কলকাতার খৃষ্টান সমাজ তাঁর দীক্ষার ঘটনা নিয়ে ঠিক তিরিশ বছর আগে একদিন মহা হৈচৈ করলেও, মৃত্যুর পর তাঁকে মাত্র ছ ফুট জায়গা ছেড়ে দিতেও রাজি হলো না।[১৪৩] *ইংলিশম্যানের* মতো পত্রিকাগুলো তাঁর মৃত্যুর খবর পর্যন্ত ছাপলো না — যদিও সে সপ্তাহে কলকাতায় মোট কজন দেশীয় এবং খৃষ্টান মারা যান এবং আগের সপ্তাহের তুলনায় তা বেশি, না কম — সে পরিসংখ্যান নিয়েও

আলোচনা করে।[১৮৪] মিশনারিদের কাগজ – *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ায়* তাঁর মৃত্যুর খবর খুব সংক্ষেপে প্রকাশিত হলো। কিন্তু তাঁর কবিকৃতি নয়, বিশেষ করে যা এ পত্রিকার নজরে পড়লো, তা হলো – তাঁর জীবন যাপনের অভ্যাসগুলো ছিলো অনিয়মে ভরা আর তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া, আর-একটি প্রসঙ্গ এ পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছিলো – তিনি তাঁর তিনটি সন্তানের জন্যে কিছু রেখে যেতে পারেননি।[১৮৫] তাঁর প্রতি খৃষ্টান সমাজ যে-মনোভাব দেখায়, তা অসাধারণ। বস্তুত, মৃত্যুর পরে মৃতের প্রতি এ রকমের আক্রোশের ঘটনা ক্বচিৎ দেখা যায়। যাঁর সঙ্গে মাইকেলের কবিতার মিল না-থাকলেও, ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মিল লক্ষ্য করা যায় – সেই বোদলেয়ারের মৃত্যুর পরেও তাঁর প্রতি অনেকের আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছিলো। তাঁর স্বীকারোক্তি নিয়ে, তাঁর কবিকৃতি নিয়ে অনেকে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। কবি-সাহিত্যিকদের বেশির ভাগ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আসেননি।[১৮৬] কিন্তু কলকাতার খৃষ্টানদের মতো ফরাসি সমাজ মৃতদেহ সংকারে বাধা দেবার মতো এমন অসাধারণ এবং অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি।

দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে তাঁর মৃত্যু হলেও, খৃষ্টান সমাজের সৃষ্টি-ছাড়া আক্রোশের দরুন সেদিন এবং সেদিন রাতে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকলো দুর্গন্ধ-ভরা নোংরা মর্গে।[১৮৭] কৃষ্ণমোহন ছিলেন কলকাতার ধর্মযাজকদের মধ্যে একজন প্রবীণ সদস্য – যদিও তিনি এর অনেক বছর আগে থেকেই ধর্মযাজকের কাজ ছেড়ে দিয়ে বিশপস কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেছিলেন। মাইকেল মারা যাবার আগে অধ্যাপনা থেকেও তিনি অবসর নিয়েছিলেন। তিনি নিজে গিয়ে এ ব্যাপারে তদবির করলেন লর্ড বিশপ রবার্ট মিলম্যানের (১৮১৬-৭৬) কাছে।[১৮৮] মিলম্যান এর ছ বছর আগে বিশপ হয়ে কলকাতায় আসেন। দেশীয়দের সঙ্গে তাঁর বেশ ভালো সম্পর্ক ছিলো। তিনি বাংলাসহ বেশ কয়েকটি দেশীয় ভাষাও শেখেন। কিন্তু চার্চ প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে তিনি আর্চবিশপসহ অনেকের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। তা ছাড়া, তিনি তাঁর ধর্মযাজকদের কোনো বিতর্কিত বিষয়ে যোগ দানে বাধা দিতেন। সুতরাং তিনি নিজে দুই খণ্ডে মাইকেলের প্রিয় কবি ত্যাসোর জীবনী লিখলেও (১৮৫০), পরের দিন সকালেও বিতর্কিত কবির মৃতদেহ খৃষ্টানদের গোরস্থানে সমাহিত করার অনুমতি দিলেন না। ওদিকে, তাঁর স্বদেশবাসী তাঁকে গঙ্গার ঘাটে পোড়াবেন – তিনি তার পথ নিজেই রুদ্ধ করে গিয়েছিলেন। সুতরাং আষাঢ় মাসের ভেপসা গরমের মধ্যে তাঁর অসহায় মরদেহ মর্গেই পচতে থাকে। তখন সাহস নিয়ে এগিয়ে আসেন একজন ব্যাপটিস্ট ধর্মযাজক। তিনি কবির মরদেহ সমাধিস্থ করার সংকল্প প্রকাশ করেন।[১৮৯] প্রায় একই সময়ে অ্যাংলিকান চার্চের একজন সিনিয়র চ্যাপলেইন – রেভারেন্ড পিটার জন জার্বোও বিশপের অনুমতি ছাড়াই তাঁর দেহ সামাধিস্থ করার উদ্যোগ নেন।[১৯০] ডক্টর জার্বো ছিলেন ৮৪ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত সেইন্ট জেমসেস চার্চের প্রধান পাদ্রী। ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে তিনি এই চার্চে তাঁর ধর্মযাজকের জীবন শুরু করেছিলেন। লর্ড বিশপের অপ্রসন্নতা পরোয়া না-করে তাঁর মৃতদেহ সংকার করতে চেয়ে এই প্রবীণ এবং উচ্চশিক্ষিত ধর্মযাজক অসাধারণ সাহস দেখিয়েছিলেন।

৩০ জুন বিকেলে – মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টারও পরে – কবির মরদেহ নিয়ে তাঁর ভক্ত এবং বন্ধুবান্ধবসহ প্রায় হাজারখানেক লোক এগিয়ে যান লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরস্থানের দিকে। সেকালের বিবেচনায় এই সংখ্যা কম নয়। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৯১] তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে কলকাতার বাইরে থেকেও অনেক লোক এসেছিলেন বলে জানা যায়। নানা ধর্মের এবং বর্ণের লোক ছিলেন এঁদের মধ্যে।[১৯২] অবশ্য একদিন শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার নিদর্শন-স্বরূপ নিজের গ্রন্থ উৎসর্গ করে কবি যাঁদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত করেছিলেন, সেই বিখ্যাত লোকেদের কেউ এই

ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন না।[১৩৩] লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরস্থানে এর চার দিন আগে হেনরিয়েটাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিলো। কবির জন্যে কবর খোঁড়া হয় তাঁর কবরের পাশে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যখন নিশ্চিতভাবে হতে যাচ্ছে, মোটামুটি তেমন সময় লর্ড বিশপের অনুমতি এলো। কিন্তু অ্যাংলিকান চার্চের অন্য কোনো পাদ্রী অথবা নাম-করা ধর্মীয় নেতা তাঁর শেষকৃত্যে এসেছিলেন বলে জানা যায় না। কৃষ্ণমোহনও নন। অনেক পাদ্রী বরং তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন। ডক্টর জার্বোই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করেন। গোরস্থানের রেজিস্টারে তাঁর নাম লেখা হলেও, অ্যাংলিকান চার্চের বেরিয়াল রেজিস্টারে তাঁর নাম পর্যন্ত উঠলো না।[১৩৪] লেন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যে-চার্চের কাগজপত্র আছে, তাতে কবিকে অথবা হেনরিয়েটাকে সমাধিস্থ করার কোনো তথ্য নেই।) কিন্তু তাঁর ব্যাপটিজমের তথ্য এই রেজিস্টারে আছে।

কলকাতায় যে-ইংরেজ এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজ বাস করতো, তাদের মধ্যে বিবেক বিসর্জন দিয়ে রাতারাতি ধনী হবার দৃষ্টান্ত থেকে আরম্ভ করে ধর্মহীনতার বিবিধ দৃষ্টান্ত কিছু কম ছিলো না। বাংলা গদ্যের অন্যতম পথিকৃৎ হেনরি পিটস ফরস্টার অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে এক দশকের বেশি ঘর করেছিলেন। তাঁর সন্তানরা সবাই এই পরস্ত্রীর গর্ভে জন্মেছিলো। আনুষ্ঠানিক ধর্মে তাঁর সামান্যতম আস্থা ছিলো, এমন কোনো প্রমাণ নেই। তা সত্ত্বেও, ১৮১৫ সালের সেপ্টেম্বরে[১৩৫] তিনি যখন কলকাতায় মারা যান, তাঁকে সমাধিস্থ করার প্রশ্ন নিয়ে কোনো মতান্তর দেখা দেয়নি। খুনী, ধর্ষণকারী, অজাচারী, অধর্মাচারী, অবিশ্বাসী — কাউকে সমাধিস্থ করার জন্যে কোনো ধর্মযাজককে লর্ড বিশপের কাছে ধর্ণা দিতে হয়নি। এমন কি, কবির জীবনসঙ্গিনী শ্বেতাঙ্গিনী হেনরিয়েটারকে সমাধিস্থ করার সময়েও কোনো বাধা আসেনি। তা হলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো একজন বিখ্যাত ব্যক্তির ভাগ্য এমন প্রতিকূল হলো কেন? তাঁর সম্পর্কে গৌরদাস বিশ্বাস অথবা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো যে-খৃষ্টানদের স্মৃতিচারণ পাওয়া যায়, তা থেকে এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না। তাঁরা বরং প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মাইকেল শেষ পর্যন্ত কি রকম আন্তরিক যীশু-বিশ্বাস নিয়ে মারা যান। তা হলে? লর্ড বিশপ পর্যন্ত তাঁকে সমাহিত করার ব্যাপারে দ্বিধা করেন কেন?

ব্যারিস্টারি পাশ করার পর, তিনি যখন আইন-ব্যবসা শুরু করার জন্যে হাই কোর্টে আবেদন করেন, তখন তাঁকে গ্রহণ না-করার জন্যে বিচারকদের মধ্যে প্রবল মনোভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। ইংরেজ এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজে নিশ্চয় আরও শত শত লোক ছিলেন, যাঁরা এই বিচারকদের মতো তাঁর প্রতি সমান অথবা আরও বেশি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। মাইকেল মদ্যপান করে মাঝেমধ্যে বেসামাল হয়ে পড়তেন, তিনি কখনো কখনো রূঢ় আচরণ করেন — বিচারকরা তাঁদের গোপন রিপোর্টে এ কথা লিখেছিলেন। কলকাতার হাজার হাজার ইংরেজ এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্পর্কেও এই মন্তব্য কি করা যেতো না? তা হলে মাইকেল সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গদের এ রকমের বিরূপতার মূল কারণটা কি?

আমার ধারণা, তাঁর বিরুদ্ধে অন্য যেসব অভিযোগই থাক না কেন, তিনি যে-শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করেছিলেন অথবা শ্বেতাঙ্গিনীকে নিয়ে ঘর করেছিলেন — এটাকে শ্বেতাঙ্গরা বিবেচনা করতেন তাঁর অমার্জনীয় অপরাধ হিশেবে। সেকালে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে কেউ কেউ দেশীয় মহিলাদের বিয়ে করেছিলেন অথবা উপপত্নী রেখেছিলেন। সেটা যে ইংরেজরা ভালো চোখে দেখতেন, তা নয়। কিন্তু সেটা যদিও বা তাঁরা সহ্য করতে পারতেন, একজন শ্বেতাঙ্গিনীর পাণিপীড়ন করবে এক কালা আদমী — এটা তাঁরা একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এ রকমের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন তাঁর দিনলিপিতে। এতে তিনি লেখেন যে, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের এক মুসলমান বন্ধু একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তার ফলে, এই বন্ধুর মতে, প্রতিটি ইংরেজ মনে করতো যেন, তিনি

তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার সম্ভ্রমহানি করেছেন।[৮৮] মিশনারিরা, তাঁদের মতে, কৃষ্ণাঙ্গদের অন্তহীন আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে, তাঁরা অন্তত বর্ণবিদ্বেষী হবেন না। কিন্তু বিশপস কলেজে থাকার সময়েও মাইকেল যথেষ্ট বর্ণবিদ্বেষ লক্ষ্য করেছিলেন — আগেই আমরা তা লক্ষ্য করেছি। লন্ডনে থাকার সময়েও তিনি সেখানে যে তীব্র বর্ণবিদ্বেষ লক্ষ্য করেছিলেন, হয়তো তারও অন্যতম কারণ ছিলেন হেনরিয়েটা। চতুর্থ অধ্যায়ে উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে বর্ণবিদ্বেষ সম্পর্কিত যে-গবেষণার উল্লেখ করেছি, তা থেকে দেখা যায়, মিশ্রবিবাহ সম্পর্কে সে সমাজের তীব্র বিরোধিতা ছিলো। তিনি এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করে, তারপর তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য একজন শ্বেতাঙ্গিনীকে নিয়ে ঘর করছিলেন — এটাকে কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজ আদৌ অনুমোদন করতে পারেনি। মৃতদেহের প্রতি কি কারো বিদ্বেষ থাকে? না-থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবির মরদেহের প্রতি তাঁরা যে-অসাধারণ বিদ্বেষ দেখিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায়, জীবিত মাইকেলকে তাঁরা আন্তরিকভাবে কতোটা ঘৃণা করতেন। তদুপরি, ঘটনাটা এতো তীব্র আকার নেয় শেষকৃত্যের দায়িত্বে নিয়োজিত ধর্মব্যবসায়ীদের জন্যে। যে-লোকটি চিরজীবন চার্চে যাননি, বরং চার্চের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছেন, এখন সুযোগ পাওয়া গেলো তাঁকে আচ্ছা 'শিক্ষা' দেবার।

সেকালের দেশীয় সমাজে তাঁর চারদিকে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক প্রতিভাবান। জনারণ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে তাঁকে চোখে পড়ার মতো গুণাবলী তিনি প্রচুর পরিমাণে আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যকে তিনি একাই যতোটা এগিয়ে দিয়েছিলেন, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ তা করেননি। বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব হিশেবেও তিনি জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। জীবনের শেষ দুতিন বছরে তিনি ঈর্ষার অযোগ্য যে-করুণ পরিণতি লাভ করেছিলেন এবং তাঁকে সমাধিস্থ করার ব্যাপারে নিয়ে যে-কুৎসিত নোংরামি দেখা দিয়েছিলো, তা থেকে তাঁর নিঃসঙ্গতার অভ্রান্ত প্রমাণ যাওয়া যায়। আগেই বলেছি, নিজের সমাজ থেকে নিজেকে তিনি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভা এবং আকাশচুম্বী আত্মবিশ্বাস তাঁকে যে-সীমাহীন অহঙ্কার দিয়েছিলো, তাও তাঁর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। বিত্ত দিয়ে গত শতাব্দীতে অনেকেই জাতে উঠেছেন এবং সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছেন।[৮৯] যতোদিন মাইকেল সচ্ছল ছিলেন, ভোজ দিতেন, মদ্যপান করাতেন, বিনে পয়সায় মামলা করে দিতেন, ততোদিন দেশীয় সমাজে তাঁকে খাতির করার লোকের অভাব হয়নি। কিন্তু তিনি যখন নিঃস্ব রিক্ত হয়ে মৃত্যুর দিন গুনেছেন, তখন খুব কম লোকই তাঁর খবর নিয়েছেন। তিনি যদি অনেক সঞ্চিত অর্থ রেখে মারা যেতেন, তা হলে সমাধিস্থ করার ব্যাপারে সম্ভবত এতোটা বিরোধিতা দেখা দিতো না।

*

নিঃসন্দেহে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড়ো কবি। এমন কি, এক শতাব্দীর ব্যবধানে আজও কবি হিশেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা কিছু হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মৃত্যুর ঠিক আগে এবং পরে তাঁর প্রতি বাঙালি সমাজ অবিমিশ্র প্রশংসা অথবা প্রীতি প্রদর্শন করেনি। সেকালের তিনজন সাহিত্য সমালোচক — রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাইকেলের প্রতি অনুকূল এবং প্রতিকূল মনোভাব অনুযায়ী তখনকার সমাজকে দু ভাগে ভাগ করেছেন। এক দলকে বলেছেন মাইকেলের কট্টর অনুরাগী, যাঁরা কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন; অন্য দলকে বলেছেন মাইকেলের গোঁড়া বিরোধী, যাঁরা কবির নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন। তাঁদের বিবেচনায় কট্টর অনুরাগীরা বেশির ভাগ তরুণ এবং ইংরেজি-শিক্ষিত। আর গোঁড়া বিরোধীরা

সমাজের রক্ষণশীল অংশ। রামগতি, রাজনারায়ণ এবং বঙ্কিমচন্দ্র — তিনজনই দাবি করেছেন যে, তাঁরা এই দু দলের কোনোটিতে পড়েন না।[১৮] এ থেকে আমরা বুঝতে পারি — তাঁরা আসলে সমাজকে তিন ভাগে ভাগ করে নিজেদের মধ্যপন্থী বলে চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু এই স্বঘোষিত মধ্যপন্থীদের মনোভাব বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে যে, তা ছিলো যথেষ্ট প্রতিকূল। এই প্রতিকূলতা কেবল মাইকেলের 'বিজাতীয়' খৃস্টানি মনোভাবের জন্যে নয়, প্রতিকূলতার একটা বড়ো কারণ তাঁর সাহিত্যিক বিদ্রোহ। তিনি সাহিত্যের বাঁধা-ধরা পথে না-থেকে নতুন যে-পথ নির্মাণ করতে চেষ্টা করেন, অনেকেই তার সম্যক প্রশংসা করতে সমর্থ হননি। ভাষা এবং ছন্দ নিয়ে তিনি যে-পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন, তাঁরা তাকে নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু ততোধিক নিন্দা করেছেন ভারতীয় পুরাণের তিনি যে-ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তাকে।

বঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর আগে। এতে রামগতি ন্যায়রত্ন *মেঘনাদবধ কাব্যের* সমালোচনা করে লেখেন:

> ইহাতে কবি কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা যে কবির তিলোত্তমা পাঠ করিতে বিরক্ত হইয়াছিলাম, সেই কবির সেই ছন্দোগ্রথিত মেঘনাদই যে কত আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি, তা বলিত পারি না। ... বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে মনোমধ্যে দুঃখ, শোক, উৎসাহ, বিস্ময় প্রভৃতি ভাবের কিরূপ আবির্ভাব হয়, তাহা বর্ণনীয় নহে। ... ইনি কল্পনাদেবীর অক্লান্ত পক্ষের উপর আরোহণ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল — কোথাও বিরচণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই সকল গুণগ্রাম থাকায় মেঘনাদ একটি উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে।

এ পর্যন্ত প্রশংসা করে অতঃপর রামগতি মাইকেলের শব্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং ছন্দ ব্যবহারের নিন্দা করেছেন।

> ... দানিলু, চেতনিলা, অস্থিরিলা প্রভৃতি অদ্ভুতশূলস্বরূপ নূতন ক্রিয়াপদের কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই। তাহা ছাড়া, 'দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত', 'মরি কিবা', 'হায়রে যেমতি' ইত্যাদি কতকগুলি কথার এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি দেখিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। ... উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যেরূপ কোমল এবং সর্ব্বদা প্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা, চিত্তাকর্ষকতা ও মধুরতা জন্মিয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই হয় নাই। কবি যতই গর্ব্ব করুন, এবং কৃতবিদ্যদল যতই তাঁহার সমর্থন করুন, অসঙ্কুচিত মনে বলিতে হইলে আমরা অবশ্যই বলিব যে, অমিত্রচ্ছন্দ আমাদের অথবা একটি বিশেষ দল ভিন্ন দেশের কাহারও প্রিয় হয় নাই।[১৫১]

এই সমালোচনা থেকে বোঝা যায়, রামগতি কবির সাহিত্যিক বিদ্রোহ মেনে নিতে পারেননি। বিদ্যাসাগর-সহ সেকালের অনেক পণ্ডিতের পক্ষেই এটা মেনে নিতে সময় লেগেছিলো। এবং তা অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত, রামগতির মতো অনেক সমালোচক, এমন কি সাধারণ পাঠক, তাঁর সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন করতে না-পারলেও, তিনি যে এক অসামান্য কবি — অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর কোনো কোনো রচনার — বিশেষ করে *মেঘনাদবধ কাব্যের* যতোগুলো সংস্করণ হয়েছিলো — তা থেকে এটা বোঝা যায়। সমকালীন সাহিত্যরুচির তুলনায় তাঁর সাহিত্য অনেক প্রাগ্রসর হওয়ায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছিলো।

কিন্তু রাজনারায়ণ বসু কবির 'বিজাতীয়' মনোভাব সম্পর্কে যে-সমালোচনা করেছেন, তা সাহিত্যক দৃষ্টিকোণ থেকে নয় এবং সাহিত্য সমালোচনায় তা প্রাসঙ্গিকও নয়। *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক* বক্তৃতায় রাজনারায়ণ কবির সামলোচনা করে বলেছেন : 'জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প, অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেইরূপ হয় না।' এই বিজাতীয় মনোভাবের জন্যে তিনি মাইকেলকে তখনকার বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির আসন দিতেও কুণ্ঠিত বোধ করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'তিনি বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি না হউন, তিনি একজন অসাধারণ কবি।' ১৮৬০-

এর দশকের শুরুতে তিনি যে কবির প্রশংসা করেছিলেন তাও তিনি প্রত্যাহার করেন - 'যখন মাইকেল মধুসূদনের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়,... তখন তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে নব-প্রেমের মুগ্ধতা কমিয়াছে, এক্ষণে তাহার দোষসকল স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি।'[১৩]

রাজনারায়ণের মতো ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সমালোচক এবং পাঠকরা বিজাতীয় মনোভাব এবং আচার-আচরণের জন্যে কবিকে দু হাত বাড়িয়ে আপন বলে গ্রহণ করতে পারেননি। এই জন্যেই তখনকার বাংলা পত্রপত্রিকা তাঁর প্রতি সীমিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলো। এসব সমালোচক তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়নে পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে ব্যর্থ হন ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কারণ কবির স্বধর্মত্যাগ এবং 'বিজাতীয়' মনোভাবও তাঁদের মূল্যায়ন এবং দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিলো।

'সাহিত্যসম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র মাইকেল-রচনার সাহিত্যিক গুণাবলী বুঝতে পারেননি — এ কথা বলা যায় না। কবির মৃত্যুর দু বছর আগে *Calcutta Review* পত্রিকায় তিনি যে-মূল্যায়ন করেছিলেন, তাকে পুরোপুরি নিরাসক্ত মনে না-হলেও তাতে তিনি সসংকোচে মাইকেলকে বাংলা সাহিত্যে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু কবির মৃত্যুর পর *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় তিনি যে-শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ করেন, তাতে কবির প্রতি তাঁর যে-মনোভাব প্রকাশ পায় তাকে বড়ো জোর কবোষ্ণ বলা যেতে পারে — যদিও তিনি এতে এক জায়গায় জয়দেবের পর মাইকেলকে সবচেয়ে বড়ো বাঙালি কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই যে-হৃদ্যতার অভাব তার কারণ কি কেবল কবির প্রতি সাহিত্যিক ঈর্ষা? নাকি মধুসূদন মাইকেল হয়ে সাহেবী পরিচয় বরণ করেছিলেন, সেই অপরাধও এর পেছনে কাজ করেছিলো? আসলে সেকালের সমাজ একজন ব্যক্তির মূল্য নিরূপণ করতো তার সঙ্গে আত্মীয়তা এবং/অথবা ধর্মীয়, জাতিগত-, আঞ্চলিক- সম্পর্ক দিয়ে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেয়ে গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতাকে সে সমাজ বেশি মূল্য দিতো। এই সমাজ মাইকেলের গতানুগতিকতা-বিরোধী আচার-আচরণকেই বড়ো করে দেখেছিলো, তাঁর সত্যিকার কৃতির পরিমাপ করেনি। করার সাধ্যও তার পুরোপুরি ছিলো না। কিন্তু কবির সৌভাগ্য, সমকালের অপ্রশস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্য সম্মান ষোলো আনা না-পেলেও কালজয়ী প্রতিষ্ঠা থেকে তিনি বঞ্চিত হননি।

মাদ্রাস থেকে কলকাতায় ফিরে তিনি যখন কলম হাতে তুলে নেন, তখন তাঁর যে-প্রস্তুতি ছিলো, সে রকমের বিশাল আয়োজন নিয়ে কোনো বাঙালি গত শতাব্দীতে সাহিত্য রচনা করেননি। এ শতাব্দীতেও করেছেন কিনা, সন্দেহ আছে। তিনি যা অর্জন করেছিলেন, তাও সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে অসামান্য। এক শতাব্দীর ব্যবধানে এখন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাঁর সাহিত্যের দিকে তাকালে তাঁর অবদান পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্য *মেঘনাদবধ* রচনার সময়ে ছোটোখাটো মহাকাব্য লিখে হাত পাকাচ্ছেন বলে যে-মন্তব্য করেছিলেন, সেই পাকা হাতের মহাকাব্য তিনি বাংলা সাহিত্যকে দিতে পারেননি। 'সহজ বিজয়' লাভ করে সোনার হরিণের লোভে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তিনি। নয়তো বাংলা সাহিত্যকে তিনি আরও কতোটা এগিয়ে দিতে পারতেন, আমরা তা কেবল অনুমান করতে পারি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা আমরা দেখিনি। দেখেছি কেবল মানুষী দুর্বলতায় ভরা সেই সাহিত্যের রচয়িতাকে।

মধুসূদন জন্মেছিলেন এমন একটা সময়ে বঙ্গীয় সমাজে যখন চলছিলো ভাঙাগড়ার প্রবল আন্দোলন। কে কতোটা নতুন যুগের বিত্ত এবং বিদ্যা অর্জন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, তার জন্যে সেকালে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিলো। সেই যুগচিহ্ন বহন করেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশে সে যুগের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকেরই প্রবল প্রতিফলন

লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে যে-সব দোষগুণের কথা মনে পড়ে তার সবই অল্পবিস্তর তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিলো। রাজনারায়ণ দত্তও সেই সময়কার ফসল। গতানুগতিকতা তিনিও কম বিসর্জন দেননি। তিনিও চেয়েছেন, তাঁর পুত্র যেন নতুন যুগের ভোজে পুরোপুরি শরিক হতে পারেন। তার জন্যে যাবতীয় প্রাথমিক আয়োজন তিনিই করে দিয়েছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য মূল্যবোধ পিতার চেয়ে মধু অনেক ভালো করে বুঝেছিলেন এবং আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। পুত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা সমসাময়িকতা থেকে এতো আলাদা ছিলো যে, পিতামাতা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি। বিদ্যাচর্চায় এবং আচার-আচরণে তরুণ বয়স থেকে তিনি তাঁর নিজস্বতা দেখিয়েছিলেন। জীবনযাপনে, ধর্মান্তর এবং বিবাহে, বিবাহোত্তর আচরণ এবং বস্তুবাদী ভোগলিপ্সায় তখনকার সমাজ থেকে তিনি এতো স্বতন্ত্র ছিলেন যে, তাঁর চারদিকের লোকেরা তাঁকে প্রায় ভিন্ন গ্রহের মানুষ বলে বিবেচনা করতেন। আর কবি হিশেবেও তাঁর নিজের প্রত্যাশা ছিলো ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে ভিন্নতর। 'রাজকণ্ঠের মালা' নিয়ে তিনি আর তৃপ্ত থাকতে পারেননি। মালার সঙ্গে রাজকীয় ঐশ্বর্যও কামনা করেছেন।

উনিশ শতকের কলকাতা-কেন্দ্রিক উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে জাগরণের যে-জোয়ার এসেছিলো, ঐতিহাসিকরা তার নাম দিয়েছেন বঙ্গীয় রেনেসান্স — যদিও য়োরোপীয় রেনেসান্সের সঙ্গে এর অনেক কিছুতেই মিল ছিলো না। বৃহত্তর সমাজকেও এ রেনেসান্স প্রভাবিত করেছিলো সীমিত মাত্রায়। একদিক দিয়ে বিচার করলে মাইকেল ছিলেন এই রেনেসান্সের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফসল এবং মনেপ্রাণে হিউম্যানিস্ট। তিনি রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কৃত শাস্ত্র এবং সাহিত্য অনুবাদ করে সমকালীন সমাজ সংস্কার করার উদ্দেশে তাদের নতুন ব্যাখ্যা দেননি। কিন্তু তিনিও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছেন প্রগাঢ় আগ্রহ নিয়ে। সরাসরি অনুবাদ না-করলেও, পুরাণের ওপর ভিত্তি করে তিনি নির্মাণ করেছিলেন নতুন সাহিত্যের ইমারত। তাতে গতানুগতিক রীতিতে দেবতার মহিমা-কীর্তন ছিলো না। তার বদলে ছিলো দৈবশক্তির সঙ্গে অসহায় মানুষের অব্যাহত সংগ্রামের কথা। সে সংগ্রামে মানুষ পরাস্ত হয় বটে, কিন্তু কবির সহানুভূতি থাকে সম্পূর্ণ মানুষের দিকে।

দুঃসাহস এবং হঠকারিতা দেখিয়ে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন থেকে আরম্ভ করে মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট, নাটক এবং প্রহসন রচনা সবকিছুতে তাঁর এই মনোভাব প্রতিফলিত। এতে তিনি প্রচুর সাফল্যও লাভ করেছেন। ওদিকে, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি উজান পথে চলতে দ্বিধা করেননি। বরং প্রতিকূলতাকেই আহ্বান করেছেন সম্মুখ সমরে। কিন্তু খৃস্টধর্ম গ্রহণ থেকে আরম্ভ করে শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহ এবং ব্যারিস্টার হবার দুঃসাধ্য সাধনায় তিনি যখন তাঁর এই সহজাত ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহস দেখিয়েছেন তখন সাফল্যের বদলে নেমে এসেছে করুণ ট্র্যাজেডি। তিনি পাশ্চাত্যের দিকে অসাধারণ মোহের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন এবং সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন বায়রনের মতো গতানুগতিকতা-বিরোধী অসংখ্য দৃষ্টান্ত। তাঁদের আত্মঘাতী এবং জীবনকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করার পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টান্ত তাঁর কাছে সবচেয়ে অনুকরণের যোগ্য বলে মনে হয়েছিলো। সে জন্যে তিনি এই পথে পা বাড়িয়েছিলেন দ্রুত তালে। বস্তুত, তাঁর চরিত্রের অন্তর্গত নিষাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দুর্ভাগ্যের যে-সলিলে তিনি ডুবে মরেছিলেন, সে তাঁর স্বখাত সলিল। নিয়তির কাছে তাঁর শোচনীয় পরাজয় তাঁর মহাকাব্যের নায়কের পরাজয়কেই মনে করিয়ে দেয়।

আরও একটা ব্যাপারে তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের সুপরিচিত ব্যক্তিদের তুলনায় প্রাগ্রসর — তিনি ছিলেন দলছুট এবং আপোশহীন বিদ্রোহী। সবার থেকে আলাদা। সেকালের বহু শিক্ষিত ব্যক্তির

মতো তিনি আধুনিকতা এবং গতানুগতিকতার মধ্যে আপোষ ঘটাতে চেষ্টা করতেন না। প্রথাবদ্ধতা – তা রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস, মানবিক সম্পর্ক, পোশাক-পরিচ্ছদ যে বিষয়েই হোক না কেন, তিনি তা মেনে নিতে পারতেন না। এই অগ্রসর চিন্তাধারা এবং ঐতিহ্য-বিরোধী আচার-আচরণের জন্যে সমকালীন সমাজকে তিনি আপন হিশেবে গ্রহণ করতে পারেননি। অথবা সে সমাজও তাঁকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেনি। সে সমাজ তাঁকে দেখেছিলো একটা বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব হিশেবে – মহাকাশে একটা বিশাল ধূমকেতুকে যেমন করে দেখে – কিন্তু আপন বলে বিবেচনা করেনি। সে কারণে, কলকাতার অসংখ্য লোকের ভিড়েও তিনি নিতান্ত নিঃসঙ্গ এবং অসহায়। এই অসহায়তার মধ্যেই তাঁর প্রয়াণ।

৭

সংযোজন

রেখো, মা, দাসেরে মনে

আশার ছলনায় ভুলে শেষ পর্যন্ত মাইকেল কী ফল লাভ করেছিলেন, আমরা তা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সারা জীবন তাঁর প্রত্যাশা এক ছিলো না। তরুণ বয়সে তাঁর অগ্রাধিকার ছিলো কবি হয়ে যশ লাভ করার, এমন কি, নীল নয়নার প্রেম লাভ করার। অর্থস্বাচ্ছন্দ্য এবং অতি আদরের মধ্যে মানুষ হন বলে সে বয়স থেকে বস্তুগত ভোগ এবং সুখের প্রতিও তাঁর লোভ কিছু কম ছিলো না। তাঁর দুর্ভাগ্য, প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির অসঙ্গতিও দেখা দিতে আরম্ভ করে একেবারে হিন্দু কলেজের আমল থেকে। বিয়েকে কেন্দ্র করে বাবামার সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য থেকে তাঁর হতাশার সূচনা। আর কাঙ্ক্ষিত ভোগ-সুখে ঘাটতি পড়েছিলো বিশপস কলেজ ত্যাগ করার আগে থেকেই। কিন্তু সাহিত্যিক হয়ে ইংরেজি সাহিত্যের আসরে স্থান পাওয়ার স্বপ্ন তখনো ভেঙে যায়নি। সেই আঘাতটা এসেছিলো *The Captive Ladie* প্রকাশের পর। তবে তখনো হতাশা এসেছিলো সাময়িকভাবে। কারণ, কলকাতায় এসে বাংলা সাহিত্যের দরবারে রাতারাতি একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি এবং নাট্যকার বলে স্বীকৃতি লাভের পর আগেকার হতাশা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগেনি। অতঃপর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কবি নিজেকে কখনো কখনো কালিদাস, ভার্জিল, এমন কি মিল্টনের সমকক্ষ বলেও মনে করেছেন।

বস্তুত, যতোদিন যশের তুঙ্গে উঠতে পারেননি, যতোদিন তাঁর সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছিলো, ততোদিন তিনি গুরুত্বর সঙ্গে সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। কিন্তু মাত্র চার বছরের মধ্যে যখন তাঁর সামনে আর কোনো সাহিত্যিক লক্ষ্য থাকলো না, যা কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন, তার সবই সহজে অর্জন করলেন, তখন তিনি তাঁর মূল লক্ষ্য থেকে সরে গেলেন। বিশপস কলেজের একজন অধ্যাপক তরুণ মাইকেল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, মিশনারি হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে কতো প্রবল, বস্তুগত ভোগের লোভে তিনি সেটা বুঝতে পারছেন না। একই রকম বলা যায় যে, সাহিত্য রচনা করে কেবল যশ লাভ করা নয়, সাহিত্যের প্রতি তাঁর সত্যিকার প্যাশন কতো জোরালো, ধনী হবার লোভে তিনি বোধহয় তারও পরিমাপ করতে পারেননি। নয়তো ব্যারিস্টারি পড়ার কথা তিনি ভাবতেন না। এমন কি, সোনার হরিণের লোভে তিনি যখন ব্যারিস্টার হয়েছেন, তখনও আদালতের মতো অ-কাব্যিক স্থানেও তিনি বারবার আইনের বদলে তাঁর সহজাত প্রেম যে সাহিত্যের প্রতি – তা প্রমাণ করেছেন। বস্তুত, তিনি কেবল কবি নন, তিনি মনেপ্রাণে কবি। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন: যার ভাগ্য-

সরোবরে মা কমলা সোনালি আলোতে কমলিনী-রূপে বিরাজ করেন না, এ পৃথিবীতে তার জন্ম কুক্ষণে হয়েছে - এমনটা মনে করা কারণ নেই। কারণ, কল্পনারূপ খনির মধ্য থেকে রত্ন কুড়িয়ে এনে নিজের ভাষাকে যে সাজায় এবং ভাষার অঙ্গ-শোভা বৃদ্ধি করে, তার ধন কেউ কেড়ে নিতে পারে না, সে অমরত্ব লাভ করে। তিনি 'বড়ো লোকে'র মতো জীবনযাপন করতে চেয়েছেন, ঠিকই, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা ছিলো: তিনি মানুষের মাঝখানে অমর হয়ে থাকবেন। যা লিখেছেন, তা দিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন কিনা, সে চিন্তা তাই তাঁকে বারবার ভাবিত করেছে।

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে?—

মনের মধ্যে সন্দেহ উঁকি দিলেও, কবি আশা করেছেন, উত্তর-কাল তাঁকে মনে রাখবে। অন্তত, তিনি সেই প্রার্থনাই জানিয়েছেন — 'মা, দাসেরে মনে রেখো। বিলাসী জীবন যাপনের সাধনায় যদি প্রমাদ ঘটে, তবু তোমার মনের লাল পদ্মটিকে মধুহীন কোরো না।' সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তিনি প্রমাদ ঘটিয়েছেন, বিলেত যাত্রার প্রাক্কালে লেখা তাঁর এই কবিতায় তিনি নিজেই সে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে কতো বড়ো ভুল করেছিলেন এবং পরে আরও বহু ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে সে ভুলকে কতো বিশাল করে তুলেছিলেন — সেটা একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন বলে মনে হয় না। এই প্রমাদের জন্যে এবং তিনি যে এক সময়ে ভিন ধর্ম গ্রহণ করে প্রমাদ ঘটিয়েছিলেন, তার জন্যে বঙ্গসমাজও সাময়িকভাবে তাঁর প্রতি কম অবহেলা দেখায়নি। যে-অযত্নের মধ্যে তিনি মারা যান, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা কমই আছে। মারা যাবার পর, বঙ্গসমাজ তাঁর প্রতি যে- অবজ্ঞা এবং উদাসীনতা দেখায়, সে-ও বিরল। জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কোনো কোনো কবি কাঙ্ক্ষিত যশ লাভে ব্যর্থ হন সে সম্পর্কে কবি নিজেও সচেতন ছিলেন। প্রসঙ্গত হোমারের মতো মহাকবির কথাও তাঁর মনে পড়েছে। জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সুবিদিত। এ কবিতা লেখার সময়ে তাঁর নিজের ভাগ্যের কথাও তিনি ভেবে থাকবেন।

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।
উরুপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা
ওমর (অসংখ্য কালে জন্ম তাঁর) যথা
অমৃত সাগরতলে। কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে; কহিল
এ নগর ও নগরে, 'আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিল ওমর সুমতি।'

কবি হিশেবে ঈশ্বর গুপ্তকে গভীর শ্রদ্ধা করার কোনো কারণ দেখেননি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ঈশ্বর গুপ্ত যে-জগতে বাস করতেন আর তাঁর জগৎ — এ দুই ছিলো একবারে আলাদা। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর গুপ্ত মারা যাবার পরে তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্যে বাঙালিরা যে কিছুই করেননি, সে কথা বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন। দেশের প্রতি হরিশ মুখার্জির অবদানের কথা চিন্তা করে তাঁর অকাল মৃত্যুর পরে কবি তাঁর একটি ষ্ট্যাচু নির্মাণের জন্যে ওকালতি করেছিলেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা মনে রেখে কলকাতার লোকেরা যখন শ্রদ্ধা নিবেদন করার উদ্যোগ নিয়েছেন, তখনো তিনি তার জন্যে এক মাসের বেতন চাঁদা হিশেবে দিতে তৈরি ছিলেন। যিনি এভাবে অন্যের কীর্তির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে উদ্গ্রীব ছিলেন, সেই কবির দুর্ভাগ্য যে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কবরের ওপর একটি মানানসই স্মৃতিসৌধ তৈরি করার ব্যাপারে সাহিত্যামোদীরা তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ নেননি। অথচ সে সময়ে বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষিত এবং ধনী লোকদের অভাব ছিলো না। শ্রাদ্ধতে লাখ টাকা ব্যয় করা,[১] অথবা লাখ টাকা দিয়ে রক্ষিতা রাখার ঘটনা[২] উনিশ শতকেই ঘটেছিলে। তাঁর মৃত্যুর বারো-চোদ্দো বছর পরে যাঁরা তাঁর স্মৃতি রক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ বাংলা সাহিত্যোকাশের গ্রহ-তারা-নক্ষত্র ছিলেন না। তাঁদের এ উদ্যোগ নেবার কারণ কবির সঙ্গে তাঁদের এককালের বন্ধুত্ব। তাঁর বন্ধুর সংখ্যা যে একেবারে কম ছিলো, তাও নয়। তবে সব বন্ধুই তাঁর স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে এক রকমের ধারণা পোষণ করতেন না। যে বিদ্যাসাগর — কবির ভাষায় — তাঁকে 'নিজ হাতে টেনে তুলেছিলেন' বিপদের সাগর থেকে, এক জীবনীকারের মতে, সেই বিদ্যাসাগরের কাছে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্যে যখন চাঁদা চাওয়া হয়, তখন তিনি তা দেননি। তিনি নাকি দুঃখ করে বলেছিলেন, যাঁকে জীবদ্দশায় রক্ষা করতে পারেননি, তাঁর স্মৃতিসৌধ তৈরিতে কিছু দেওয়া অর্থহীন।[৩]

মাইকেল খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং স্বসমাজ ত্যাগ করে ইংরেজ সাজতে চেষ্টা করেছিলেন এবং শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে ঘর করেছিলেন — আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় — তাঁর এই 'অপরাধে'র কারণে বাঙালিরা তাঁর প্রতি সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। নয়তো, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে তিনি যে-অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন, তাতে তাঁকে নিয়ে বাঙালিরা অনেক বেশি গর্ব করতে পারতেন। তা ছাড়া, তাঁর অ-গতানুগতিক আচরণ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি তাঁরা আর-একটু বেশি দরদী এবং শ্রদ্ধাশীলও হতে পারতেন। বিশেষ করে তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে — বাঙালিরা তাঁর প্রতি সমুচিত সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, কবি হিশেবে তিনি কতো বড়ো ছিলেন, সেটা তাঁর সমকালীন সাহিত্য-রসিকদের বুঝতে অনেকটা সময় লেগেছিলো। তাঁর মৃত্যুর কয়েক দশক পরে ধীরে ধীরে ব্যক্তি মাইকেলের প্রতি বিতৃষ্ণা যখন কমে এসেছে, তখন কেউ কেউ তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেছেন। সে ক্ষেত্রেও অবশ্য তিনি যে-অন্তরের অন্তস্তলে হিন্দু ছিলেন — এটাকে বড়ো করে দেখানোর প্রয়াস একেবারে দেখা যায় না, তা নয়। অর্থাৎ সেখানেও সাহিত্যের চেয়ে তিনি 'আমাদের লোক' এই চিন্তাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।[৪]

বস্তুত, তাঁর প্রতি সেকালের বাঙালি সমাজের মনোভাব ছিলো একই সঙ্গে ভালোবাসা এবং ঘৃণার। সে জন্যে তাঁকে এক হাতে দূরে সরিয়ে রাখলেও, বাঙালি সমাজ তাঁকে ভুলেও যেতে পারেনি। বরং সময়ের দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি বাঙালিদের শ্রদ্ধা এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর অনুকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ইতিমধ্যে যুগের এবং জীবনধারার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তা ছাড়া, পুরাণের জগৎও প্রাত্যহিক জগৎ থেকে আরও দূরে সরে গেছে। তদুপরি, দেশ বিভাগের পর, হিন্দু পুরাণের সঙ্গে বাঙালি সমাজের একাংশের অপরিচয়ও গভীর হয়েছে। ভাষার ব্যাপক পরিবর্তনও হয়েছে। তা সত্ত্বেও, মধুসূদন-রচিত সাহিত্যে সময়ের ছাপ পড়েছে বলে মনে হয়

না। আজকের পাঠকের কাছে সে সাহিত্য আদৌ অপ্রাসঙ্গিক অথবা রসশূন্যও নয়। তাঁর সৃষ্টির উৎসব শেষ হবার প্রায় দেড় শো বছর পরেও এখনো তাঁর রচনা লোকেরা পড়েন। কেবল তাই নয়, কালের ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁর কবিতার কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি আমাদের ভাষায় প্রবচনের মতো গৃহীত হয়েছে। 'একি কথা শুনি আজ...?', 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে ...', 'সম্মুখ সমর', 'আশার ছলনে ভুলি', 'কপোত-কপোতী', 'দাঁড়াও পথিকবর', 'অনিদ্রায় অনাহারে', 'ভিখারী রাঘব', 'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা ...?' ইত্যাদি অনুবাক্য এ রকমের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। যাঁরা কোনো কালে তাঁর কবিতা পড়েননি, তাঁরাও অনেকে এ কথাগুলোর অর্থ জানেন এবং নিজেদের কথাবার্তায় এগুলো ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোনো বাঙালি কবির কবিতার কোনো পঙ্‌ক্তি অথবা অনুবাক্য এভাবে বাংলা ভাষায় প্রবচন হিশেবে গৃহীত হয়নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে শতাব্দীর ব্যবধানেও কবি এখনো অমর হয়ে আছেন।

ডাট থেকে ডাটন

বাঙালি সমাজে অমর হলেও, অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, তাঁর নিজের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তিনি মৃত। অথচ একটি নয়, তিনি মাদ্রাস এবং কলকাতায় দু-দুটি পরিবার রেখে গিয়েছিলেন। অবশ্য স্বীকার না-করলে অন্যায় হবে, তাঁর প্রতি উত্তরাধিকারীদের ঔদাসীন্যের জন্যে তিনি নিজেও কম দায়ী ছিলেন না। তিনি সাহিত্য রচনা করেছিলেন বাংলা ভাষায়, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের যে-তিনটি সন্তানকে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি বাংলা শেখাননি। আর মাদ্রাসের তিনটি সন্তানের বাংলা শেখার প্রশ্নই ওঠেনি। কারণ, সে সুযোগ তাঁদের ছিলো না। ফলে পিতা মস্তো বড়ো কবি ছিলেন, এটা তাঁরা অন্যের কাছেই শুনেছেন, নিজেরা কখনো প্রত্যক্ষভাবে তা অনুভব করতে পারেননি। এমন কি, তাঁর সত্যিকার পরিচয় পর্যন্ত তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে অজ্ঞাত ছিলো। প্রথম অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, তাঁর স্মৃতিসৌধের ওপর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের পৌত্ররা পিতামহীর বংশনাম পর্যন্ত ভুল লিখেছিলেন। আর, মাদ্রাসে যে-পরিবার রেখে গিয়েছিলেন, সে পরিবারের সঙ্গে তিনি যে-বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তা নজিরবিহীন না-হলেও অসাধারণ। তাঁরা যদি তাঁকে মনে না-রেখে থাকেন, তা হলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। সর্বোপরি, যে-উত্তরাধিকারীদের তিনি দারিদ্র্য ছাড়া আর-কিছুই দিয়ে যেতে সমর্থ হননি, সেই উত্তরাধিকারীদের তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হবার তেমন কোনো কারণ ছিলো না। বস্তুত, তাঁরা তাঁর বংশ-নামটি পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর বছর চল্লিশের মধ্যে তাঁদের নাম থেকে মুছে ফেলেছিলেন।

দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়ো ছিলেন হেনরিয়েটা অ্যালাইজা শর্মিষ্ঠা। আমরা শেষ অধ্যায়ে দেখেছি, মৃত্যুর মাত্র আট সপ্তাহ আগে কবি তাড়াহুড়ো করে এই কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠার বয়স এ সময়ে তেরো বছর আট মাস হতে এক সপ্তাহ বাকি ছিলো। মাইকেল তাঁকে ফ্রান্সে রেখে ভালো লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন। য়োরোপীয় করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই বাসনা, বলা বাহুল্য, সফল হতে পারেনি। তবে শর্মিষ্ঠা গান গাইতে শিখেছিলেন আর শিখেছিলেন পিয়ানো বাজাতে। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, সেই উইলিয়াম ওয়াল্টার এভান্স ফ্লয়ডের বয়স তখন সাতাশ বছর। ভদ্রলোক ছবি আঁকতেন আর জীবিকার জন্যে তরজমার কাজ করতেন হাই কোর্টে। সেখানেই মাইকেল এঁকে চিনতেন। তা ছাড়া, ইনি থাকতেন লিন্ডসে স্ট্রীটে। মাইকেলের লাউডন স্ট্রীটের বাসা থেকে লিন্ডসে স্ট্রীটের দূরত্ব বেশি নয়। বস্তুত, ফ্লয়ডের

পক্ষে শর্মিষ্ঠা এবং মাইকেলের পরিবারকে আগে থেকে চেনা অসম্ভব নয়। পাত্র হিশেবে তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। অথবা তিনি বঙ্গের সবচেয়ে বড়ো কবি এবং সুপরিচিত একজন ব্যারিস্টারের কন্যার সর্বোত্তম পাত্র ছিলেন — অনেকে তা না-ও মনে করতে পারেন।

সত্যিকার হতভাগিনী যাকে বলে শর্মিষ্ঠা তার কেতাবী দৃষ্টান্ত। তাঁর ভাগ্যে এ সুখটুকুও সহ্য হয়নি। তিনি বিধবা হন বিয়ে হবার ঠিক দু বছর চার মাস মাস বারো দিন পরে। ১৮৭৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র ২৯ বছর বয়সে উইলিয়াম ফ্রয়েড মারা যান জ্বর এবং প্লীহার অসুখে ভুগে।[৫] এর তিন মাস আগে — এগারোই জুন তারিখে ম্যালেরিয়ায় মারা যান শর্মিষ্ঠার ছোটো ভাই ফ্রেডারিক মিল্টন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিলো মাত্র ১৩ বছর দশ মাস।[৬] ফ্রেডারিক নাকি পিতার কবিত্ব লাভ করেছিলেন এবং সে বয়সেই কবিতা লিখতেন। শর্মিষ্ঠা দু বছর চার মাসের মধ্যে একে-একে তাঁর মা, বাবা, ছোটো ভাই এবং স্বামীর মৃত্যু দেখলেন। কিন্তু শোকের চেয়েও তাঁর জীবনে বড়ো একটি সমস্যা দেখা দিলো — তিনি আর-একবার অসহায় হলেন। তাঁর বয়স নিতান্ত কম। স্বামীর স্মৃতি নিয়ে সারা জীবন বেঁচে থাকার মতো পরিবেশও তাঁর ছিলো না।

তাঁর বিধবা হবার এক বছর চার মাস পরে — ১৮৭৭ সালের ১৩ জানুআরি — ১৮ বছর বয়সে তাঁর আবার বিয়ে হলো। এঁর নামও উইলিয়াম — উইলিয়াম বেনজামিন নিস। বিয়ের দলিলে শর্মিষ্ঠার কুমারী নাম লেখা হলো না। তার বদলে লেখা হলো হেনরিয়েটা ফ্রয়েড। উইলিয়াম নিস ছিলেন বিপত্নীক। পেশা ঠিকাদারি। বয়স ৫২ বছর।[৭] শর্মিষ্ঠার পিতা বেঁচে থাকলে এ সময়ে তাঁর বয়স হতো ৫৩ বছর। শর্মিষ্ঠার ভাগ্যে এর চেয়ে ভালো বর জোটেনি। শ্বশুরের বয়সী দ্বিতীয় স্বামীকে 'উইলিয়াম' নাম ধরে ডাকতে গিয়ে কতো বার তিনি প্রথম স্বামীর শোক অনুভব করেছেন, তার কোনো হিশেব আমাদের জানা নেই।

নিসের সঙ্গে বিয়ের ঠিক এক বছর এক মাস পরে — ১৮৭৮ সালের ১৩ ফেব্রুআরি তাঁর একটি ছেলে হয়। এর নাম দেওয়া হয় উইলিয়াম ব্রাইটম্যান স্যামুয়েল নিস।[৮] শর্মিষ্ঠার দ্বিতীয় সন্তান — কন্যার জন্ম পরের বছর ৯ ফেব্রুআরি। এর নাম দেওয়া হয়েছিলো মায়ের মতো হেনরিয়েটা অ্যালাইজা শর্মিষ্ঠা নিস।[৯] কন্যার অন্যতম নাম শর্মিষ্ঠা রাখার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, শর্মিষ্ঠা তখনো পিতার দেওয়া স্নেহের নামটি ভুলতে পারেননি। ঐ বছরই এই কন্যার মৃত্যু হয়। আর এই সন্তান হবার চার দিন পরে মারা যান শর্মিষ্ঠা স্বয়ং। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ১৯ বছর পাঁচ মাস।[১০] এর পর কবির দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানদের মধ্যে বেঁচে থাকেন এক মাত্র অ্যালবার্ট নেপোলিয়ন।

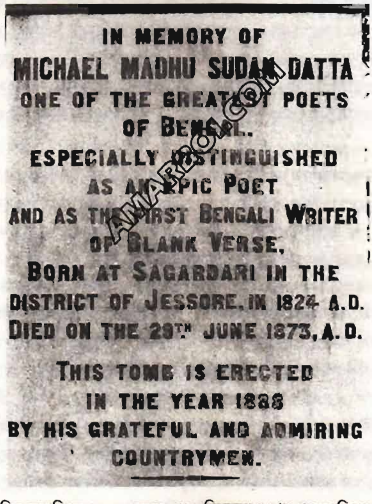
শর্মিষ্ঠা অকালে মারা গেলেও তাঁর পুত্র উইলিয়াম ব্রাইটম্যান স্যামুয়েল দীর্ঘায়ু লাভ করেন। হৃদরোগে মারা যান ১৯৪৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৬ বছর। তাঁর পিতা উইলিয়াম ব্রাইটম্যান নিস ১৯০১ সালে মারা গিয়েছিরেন ৭৬ বছর বয়সে।[১১] স্যামুয়েল মোটামুটি লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং পিতা অবসর নেবার পর পুস্তক প্রকাশক থ্যাকার, স্পিঙ্কস অ্যান্ড কম্পেনিতে পিতার কেরানিগিরির কাজ পেয়েছিলেন। পরে তিনি আবগারি এবং লবণ বিভাগে চাকরি নেন। এই উপলক্ষে তিনি ওড়িষা, নোয়াখালি, দার্জিলিং ইত্যাদি নানা জায়গায় কাজ করেন। ১৯১৮ সাল নাগাদ তিনি আবগারি বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়েছিলেন। তেইশ বছর দু মাস বয়সে তিনি বিয়ে করেছিলেন গ্রেস এলেন কেইমারকে। পরবর্তী ১৭ বছরে তাঁদের ৯টি সন্তান জন্মে। সন্তানদের মধ্যে অন্তত দুটি মারা যায় একেবারে শৈশবে। বংশ-লতিকা থেকে দেখা যাবে সন্তানদের মধ্যে তিনটি ছিলো কন্যা এবং ছটি পুত্র। দ্বিতীয় কন্যা কবি ম্যর্থা এলোডিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয় অ্যালবার্ট নেপোলিয়নের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাইকেল লরেন্স ওরফে মাইকেল ল্যান্ডসিয়ারের।

কবি মারা যাবার সময়ে মনোমোহন ঘোষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর নিজের সন্তানরা খেতে-পরতে পেলে কবির সন্তানরাও খেতে-পরতে পাবে। যদ্দুর জানা যায়, মনোমোহন এই প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন। তা ছাড়া, কবি মারা যাবার ঠিক পরে তাঁর দুই পুত্রের জন্যে যে-সাহায্য তহবিল গঠন করা হয়, দশ দিন পরের *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* পত্রিকায় দেখা যায়, ততোদিনে সেই তহবিলে বারো শো টাকা সংগৃহীত হয়। তবে মনোমোহন ঘোষ অথবা অন্য সহৃদয় ব্যক্তিদের সহায়তা সত্ত্বেও কবির দুই পুত্রের ভাগ্য যথেষ্ট প্রসন্ন হয়নি। আগেই বলেছি ফ্রেডারিক মারা যান তাঁর কৈশোরে। তারপর অ্যালবার্ট নেপোলিয়ন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৮৮৯ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মনে হয় এর পর তাঁর লেখাপড়া বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। অন্তত তিনি বিএ পাশ করেননি। শোনা যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্র — এই সুবাদে ভারত সরকারের কোনো সহৃদয় কর্মকর্তা তাঁকে আবগারি বিভাগে একটি ছোটো চাকরি দেন। চাকরির সূত্রে তিনি লাখনৌ এবং এলাহাবাদ-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। ধাপে ধাপে উন্নতির মাধ্যমে তিনি শেষ পর্যন্ত সাব-ডেপুটি অপিয়াম এজেন্ট হয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে তিনি কাশীতে কাজ করার সময়ে ক্যাথলিন রেইচেল ব্রাউনিংকে বিয়ে করেন।[১২] তাঁদের প্রথম যে-সন্তানের ব্যাপটিজমের খবর জানতে পাচ্ছি, তাঁর নাম ক্যাথলিন থেলমা অ্যাগনেস। এরপর তাঁদের অন্তত তিনটি সন্তান হয়েছিলো — মাইকেল লরেন্স (১৯০২), ডরিস নর্মা (১৯০৪) এবং নেভিল চার্লস ব্রাউনিং (১৯০৬)। মাত্র ৪২ বছর বয়সে — ১৯০৯ সালে অ্যালবার্ট মারা যান। পিতার মতো তিনিও সন্তানদের প্রায় অসহায় অবস্থায় রেখে যান। তবে তিনি আবগারি বিভাগে কাজ করতেন — এই সূত্রে কোনো সঞ্চয় রেখে গিয়েছিলেন কিনা, জানা যায় না।

কবি যখন পরলোক গমন করেন, তখন অ্যালবার্ট নেপোলিয়নের বয়স ছিলো ছ বছর। পিতার স্মৃতি তাঁর সামান্যই মনে ছিলো। কিন্তু তাঁর পিতা যে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন বয়স হবার পর তিনি সেটা অনুভব করেছিলেন। তা ছাড়া, ততোদিনে মাইকেল সম্পর্কে বাঙালিদের মনে যে-অভিমান এবং বিরাগ ছিলো, তা কমে যাওয়ায় কবি নিজেও বঙ্গ সমাজে ধীরে ধীরে একটি জীবন্ত সত্তায় পরিণত হতে আরম্ভ করেন। এই প্রক্রিয়ার শুরু কবির সমাধির ওপর স্মৃতিফলক নির্মাণের মধ্য দিয়ে। ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মাইকেলের বন্ধু এবং সাধারণ লোকদের চাঁদায় যখন তাঁর সমাধির ওপর একটি ছোটোখাটো স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়, তখন তা উন্মোচন করার সম্মান দেওয়া হয়েছিলো একুশ বছরের অ্যালবার্টকে। এ সময়ে অ্যালবার্ট লক্ষ্য করে থাকবেন, তাঁর পিতা পনেরো বছর আগে মারা গেলেও, তখনো বাঙালিদের স্মৃতিতে বেঁচেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ বসুর লেখা *জীবনচরিত* (১৮৯৩) সমাজে কবির পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করেছিলো। সে বই অ্যালবার্ট পড়েছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর পিতার জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, সে খবর জেনে থাকবেন। তিনি চাকরিও পেয়েছিলেন পিতৃপরিচয়ের জোরে। পিতার প্রতি বস্তুত তাঁর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা যথেষ্ট মাত্রায় ছিলো বলে মনে হয়। সে জন্যে, নিজের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পিতার বংশ-নাম — Datta — বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর প্রতিটি সন্তানের ব্যাপটিজমের সময়ে তাঁদের বংশ-নাম ইংরেজি রীতিতে ডাট না-লিখে লিখেছেন Datta। এমন কি, তিনি মারা যাবার পর, চার্চের রেজিস্টারে তাঁর নামও লেখা হয়েছে 'দত্ত'।[১৩]

অ্যালবার্ট তাঁর পিতাকে দেখেছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে গর্বিত হবার মতো অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর সন্তানরা অনেকেই আত্মীয়তা এবং সাংস্কৃতিক — উভয় দিক দিয়েই কবির কাছ থেকে সরে গেছেন আরও দূরে। এমন কি, কবির বংশ-নাম বহাল রাখার মতো কোনো কারণও তাঁরা

খুঁজে পাননি। প্রথমে তাঁরা ইংরেজি ধরনে Dutt লিখলেও পরবর্তী কালে বানানের একটু সংস্কার করে লেখেন Dutton। এটি হলো একটি ইংরেজি বংশ-নাম। তাঁরা যে-একজন প্রখ্যাত বাঙালি কবির পৌত্র এবং পৌত্রী — এ খবর তাঁদের কতোটা জানা ছিলো কিনা অথবা জানা থাকলে তা নিয়ে তাঁরা কতোটা গর্ব করতেন, তা আমাদের জানা নেই। বরং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাঁরা বাঙালি পরিচয়টাকে পর্যন্ত মুছে ফেলতে চেয়েছেন। মিশ্র বিবাহের দরুন ততোদিনে তাঁদের চামড়ার রঙ কেমন হয়েছিলো, সে তথ্য আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু বংশ-নাম বদল করার ঘটনা থেকে মনে হয়, নিজেদের তাঁরা ইংরেজ অথবা ফিরিঙ্গি বলেই পরিচিত করতে চেয়েছেন। প্রথম বার যখন এই নতুন ডাটন নাম লিখিত রূপে দেখতে পাই, তা হলো অ্যালবার্টের বড়ো মেয়ে ক্যাথলিনের বিয়ের সময়ে। অ্যালবার্ট মারা যাবার ন বছর পর - ১৯১৮ সালে যখন এই কন্যার বিয়ে হয় লিওপল্ড অ্যাল্যান গোরের সঙ্গে, তখন ক্যাথলিনের বংশ নাম লেখা হয় ডাটন।[১৪] (গোর ছিলেন মেকানিকাল ইনজিনিয়ার।) পরে অন্য প্রত্যেকটি সন্তান এবং সন্তানদের সন্তানদের নামের পদবীও ডাটন বলে উল্লিখিত হয়েছে। এর ফলে কবির বংশনামটি পর্যন্ত তাঁর নিজের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যায়।



কবির সমাধিতে ১৮৮৮ সালে যে-স্মৃতিফলক লাগানো হয়েছিলো।

অ্যালব্যর্ট নিজের পুত্রদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার আগেই মারা যান। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর সন্তানরা লেখাপড়া শিখে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বড়ো পুত্র মাইকেল লরেন্স ওরফে মাইকেল লন্ডসিয়ার চাকরি পেয়েছিলেন আয়কর বিভাগে। ১৯৩১ সালে তিনি যখন হেরিয়েটার পৌত্রী রুবীকে বিয়ে করেন, তখন তিনি জলপাইগুড়িতে কাজ করতেন। ১৯৩৫ সালে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ভিক্টর লরেন্স মারা যাবার সময়ে তিনি আয়কর বিভাগের হিশাব পরীক্ষক ছিলেন। কিন্তু পরের বছর (যখন তৃতীয় পুত্র পিটারের জন্মের সময়ে) তিনি আয়কর অফিসারে উন্নীত হন।

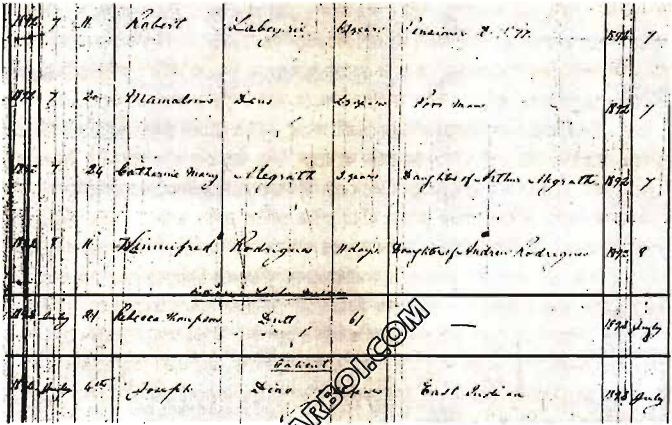
অ্যালব্যর্টের অন্য পুত্র নেভিল চার্লস লাহোরে আয়কর উকিল হিশেবে কাজ করতেন। পরে তিনি হাই কোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন।

কবির পৌত্ররা নিজেদের বংশ-নাম পরিবর্তন করলেও, অথবা এই পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সঙ্গে একাত্ম করার প্রয়াস পেলেও, পিতামহের কথা তাঁরা পুরোপুরি ভুলে যেতে পারেননি। বস্তুত, এঁরা পিতামহের স্মৃতি রক্ষার জন্যেও চেষ্টা করেছেন। কবির সমাধির ওপর বর্তমান স্মৃতিসৌধ তৈরি করার ব্যাপারে তাঁরাই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৮৮৮ স. । যখন কবির সমাধি তৈরি করা হয়, তখন হেনরিয়েটার কবরের ওপর কোনো স্মৃতিফলক লাগানো হয়নি। কবির পৌত্ররা সেই দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। বর্তমানে কবির সমাধির ওপর যে-আবক্ষ মূর্তি রয়েছে, তা-ও পৌত্ররাই নির্মাণ করান। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে তাঁর যে-চিত্রটি আছে, সেটিও তাঁদের দান। কবির সাহিত্য এঁরা বুঝতে পারেননি, তাঁর বংশ-নামও এঁরা বর্জন করেছেন, কিন্তু তবু এঁরা তাঁর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে বাঙালি সমাজের লজ্জা নিবারণ করেছেন। তবে এটা কবির সমস্ত উত্তরাধিকারীর মনোভাব নয়। তাঁর স্মৃতিরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন কবির পৌত্র নেভিল চার্লস ডাটন। ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠতা ছিলো। ডক্টর দাশগুপ্ত আমাকে বলেছেন যে, বিশেষ করে এই নেভিল ডাটনের উদ্যোগেই কবি এবং কবি-পত্নীর সমাধির ওপর স্মৃতিফলক নির্মাণের কাজ শেষ হয়। তা ছাড়া, নেভিল কবির চিঠিপত্র সম্পাদনার কাজ করার জন্যে সজনীকান্ত দাশকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ সোমের *মধু-স্মৃতির* দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। মোট কথা, নিজের পিতামহকে নিয়ে তাঁর গর্ববোধ অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাঙালি সমাজের জন্যে এটা আদৌ গর্বের বিষয় নয় যে, মাইকেলের স্মৃতির উপযোগী একটি সৌধ তৈরি করতে এগিয়ে আসতে হয়েছিলো তাঁরই আত্মীয়দের।

মাইকেলের প্রথম পক্ষের সন্তানরা তাঁদের 'ডাট' নাম বিসর্জন দিয়েছিলেন দ্বিতীয় পক্ষেরও আগে। সেটা স্বাভাবিকও। দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানদের মতো তাঁদের জীবনও মোটেই সুখের হয়নি। তবে তুলনা করলে মাদ্রাসের পরিবারই বেশি কষ্টের মধ্যে সময় কাটিয়েছিলো বলে মনে হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, কবি চারটি অসহায় শিশুকে মাদ্রাসে ফেলে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তারপর আর কোনোদিন মাদ্রাসে ফিরে যাননি। তিনি তাঁদের ভরণপোষণের জন্যে মাদ্রাসে টাকাপয়সা পাঠাতেন — এমন কোনো প্রমাণ নেই। (তবে প্রথম দিকে পাঠানো অসম্ভব নয়।) রেবেকা অরফ্যান অ্যাসাইলামের পিতৃহীন দরিদ্র সন্তান। শিক্ষাও লাভ করেছিলেন সামান্যই। আয় করার তাঁর কোনো যোগ্যতা ছিলো বলে মনে হয় না। এই পরিস্থিতিতে তিনি কি করে সন্তানদের নিয়ে বেঁচেছিলেন, তাঁদের যেমন হোক মানুষ করেছিলেন - বোঝা যায় না। কিন্তু কাজটা যে মোটেই সহজ ছিলো না, লিখিত তথ্যপ্রমাণ ছাড়াও তা বলা যায়। এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও, তিনি তাঁর সন্তানদের মায়া কাটিয়ে অন্যত্র বিয়ে করেননি। অথবা মাইকেলের দেওয়া বংশ-নামও ত্যাগ করেননি। ১৮৯২ সালের জুলাই মাসে ৬১ বছর বয়সে তিনি যখন মারা যান, তখনো তিনি মিসেস ডাট নামেই মারা যান।[১৫] আর বিনা অপরাধে পিতা তাঁদের নির্দয়ভাবে ত্যাগ করায়, প্রথম পক্ষের সন্তানদের জীবন সহজ সরল পথে চলতে পারেনি। তাঁরা লেখাপড়া শেখার তেমন কোনো সুযোগ পাননি। আর-পাঁচ জনের মতো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাই ছিলো তাঁদের জন্যে কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও, জীবিত তিনটি সন্তান দীর্ঘকাল পিতৃ-নাম ত্যাগ করেননি।

মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার থেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলাম, এই তিন সন্তানের কেউ এনট্রেন্স পাশ করেছিলেন কিনা। কিন্তু তাঁদের নাম কোথাও খুঁজে পাইনি। ধারণা করি, তাঁরা অতোটা

লেখাপড়া করতে পারেননি। ১৮৯২ সালে জর্জ জন ম্যাট্যাভিশ ডাট যখন ৩৯ বছর বয়সে বিয়ে করেন, তখন তাঁর পরিচয় লেখা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল।[১৬] অর্থাৎ ডিগ্রি-হীন উকিল। বড়ো মেয়ে ব্যর্থা অথবা ছোটো মেয়ে ফিবিও লেখাপড়া সামান্যই শিখেছিলেন।



	7	11	Robert					7
	7							7
	7	24	Catharine Mary	Megrath				7
	8	11	Winnifred	Rodrigues				8
		21	Rebecca Thompson	Dutt	61	—		
			Joseph			East Indian		

সমাধিস্থ করার সময়ে বেরিয়াল রেজেস্টারে রেবেকা টমসন ডাটের নাম

মাদ্রাসের সন্তানদের জীবন যে আর-পাঁচজনের মতো সরল অথবা স্বাভাবিক পথে চলেনি, তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাই তাঁদের বিয়ের খবর থেকে। জর্জের বিয়ে হয় ৩৯ বছর বয়সে। কন্যাদেরও যথাসময়ে বিয়ে হয়নি। নিতান্ত দরিদ্র, সাধারণ শিক্ষিত, শ্বেতাঙ্গিনীর মায়ের পিতৃ-বর্জিত কৃষ্ণাঙ্গ সন্তানদের কে বিয়ে করবে? তবে সৌভাগ্যের বিষয় তাঁরা কেউই অবিবাহিত থাকেননি। ১৮৮১ সালের ২৬ জুলাই তারিখে ব্যর্থার ৩২ বছর এগারো মাস বয়সে এবং ফিবির ৩১ বছর চার মাস বয়সে বিয়ে হয়। সেকালের কোনো মেয়ের বিয়ের জন্যে এ বয়স এতোই বেশি যে, তাঁদের বিয়ের দলিলে তাঁদের বয়স লেখা হয়নি। তার বদলে লেখা হয়েছে: of full age। তা ছাড়া, যে-পাত্র তাঁদের ভাগ্যে জুটেছিলো, তাঁরা কেউ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জামাতা হবার উপযুক্ত নন। দু জনই ছিলেন সৈন্য বিভাগের সাধারণ সৈনিক। ব্যর্থার বিয়ে হয়েছিলো ফ্র্যান্সিস জন হিগিন্স নামে এক ল্যান্স কর্পোরালের সঙ্গে। আর ফিবির স্বামী ছিলেন বিপত্নীক স্যামুয়েল ওয়ান্টার এইরিস। ফিবির চেয়ে কয়েক বছরের ছোটো। তিনি ছিলেন ফিবির মাতামহ রবার্ট টমসনের মতো সাধারণ গোলন্দাজ।[১৭] কোনো চার্চে গিয়ে এঁদের বিয়ে হয়নি। কারণ, রেবেকা সম্ভবত এঁদের চার্চে গিয়ে বিয়ে করতে দেননি। তিনি নিজের জীবনে লক্ষ্য করেছিলেন, ধর্মীয় রীতিতে বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে গেলে আইনগত কোনো প্রতিকার মেলে না। তিনি চাননি, তাঁর কন্যাদের কেউ প্রতারণা করুক; অথবা প্রতারণা করে পার পেয়ে যাক। তিনি নিজে যে-শিক্ষা পেয়েছিলেন, সেটাই তাঁর কাছে যথেষ্ট হয়েছিলো।

মাদ্রাসের পরিবার কি কবির খবর রাখতো? - জানতো যে, তিনি বড়ো কবি হিশেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন অথবা ব্যারিস্টার হয়েছেন? এই প্রশ্নের একাংশের উত্তর মেলে ব্যর্থা আর ফিবির বিয়ের দলিল থেকে। তাঁদের এই বিয়ে হয় মাইকেল মারা যাবার ন বছর পরে। সুতরাং মৃত ব্যক্তির পেশার উল্লেখ থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু এই দলিল দুটিতে দেখতে পাই মাইকেলের নামের সঙ্গে লেখা হয়েছে তাঁর পেশা: ব্যারিস্টার।[১৮] বোঝা যায়, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দারিদ্র্য এবং চামড়ার রঙ নিয়ে তাঁরা গর্ব করতে পারেননি বটে, কিন্তু খাস বিলেত থেকে-আসা তাঁদের স্বামীদের তাঁরা জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, তাঁরা গরিব হলেও, তাঁদের পিতা ছিলেন ব্যারিস্টার। স্বামীর প্রতি সীমাহীন অভিমান এবং ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও এই শব্দটি রেবেকাকেও কম গর্বিত করতো বলে মনে হয় না। যে-স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেছেন, তিনি সাধারণ লোক নন, একজন ব্যারিস্টার – বুক-ভাঙা দুঃখের মধ্যেও তাঁর কাছে এটা হয়তো একটা সান্ত্বনা ছিলো।

দারিদ্র্য সবার কাছেই কমবেশি দুঃসহ। কিন্তু কবির সন্তানদের কাছে তাঁদের দারিদ্র্য ছিলো আরও বেশি দুঃসহ। কারণ, তাঁর সত্যিকার অবস্থা যেমনই হোক না কেন, তাঁরা দূর থেকে শুনতেন তিনি ব্যারিস্টার – অর্থাৎ রীতিমতো ধনী। সুতরাং তাঁর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কেন অমন অনটনের মধ্যে থাকবেন, এটা তাঁদের বুঝতে কষ্ট হয়েছে। শোনা যায়, মাইকেল মারা যাবার পর, মাদ্রাসের পরিবারের পক্ষ থেকে কলকাতায় লোক এসে তাঁর সম্পত্তির খোঁজ-খবর নিয়েছিলো। তখনকার পত্রিকায় নাকি এ খবর ছাপা হয়েছিলো।[১৯]

বিয়ে হলেও ব্যর্থা এবং ফীবির জীবন মোটেই সুখের হয়নি। বিয়ের মাত্র ছ মাস দু দিন পরে ব্যর্থা মারা যান পিতার মতো উদরী রোগে।[২০] আর ফীবির ভাগ্য ছিলো তার চেয়েও খারাপ। তাঁর স্বামী স্যামুয়েল এইরিস মারা যান বিয়ের ঠিক সাড়ে চার মাস পরে। ততোদিনে ফীবি আশ্রয়হীন। ভাই-এর কাছেও আশ্রয় মিলেছে কিনা কে জানে? বিধবা হবার এক বছর ন মাস পরে তাঁর দ্বিতীয় বার বিয়ে হয় হেনরি কিং-এর সঙ্গে। হেনরি নামেই কিং ছিলেন। তাঁর আসল পেশা ছিলো দরজিগিরি।[২১] তাঁর সঙ্গে ফিবির বিয়ে কতো দিন টিকে ছিলো, সে তথ্য জোগাড় করতে পারিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯১৮ সালে ফিবি যখন মারা যান, তখন তাঁর কোনো বাড়িঘর অথবা আশ্রয় ছিলো না – তিনি মারা যান একটি আশ্রমে।[২২] এ থেকে সন্দেহ হয়, তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিলো কিনা।

সন্তান রেখে মারা যান জর্জ। জর্জ বিয়ে করেছিলেন প্রায় পৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে। তাঁর বিয়ে হয়েছিলো এক বিধবার সঙ্গে। নাম এলিজাবেথ ব্যাস্টিয়ন। এঁর সঙ্গে জর্জের কোনো সন্তান হয়নি। ১৯০০ সালের ১৯ জুলাই এলিজাবেথ ডাট মারা যান।[২৩] এর পরের বছরই জর্জ আবার বিয়ে করেন। এবারে তিনি বিয়ে করেন এক বিধবা নার্স – অ্যাডেলাইড এলিজাবেথ নেলসনকে।[২৪] এঁদের প্রথম সন্তান ম্যর্লিন ডরিসের জন্ম ১৯০৪ সালে।[২৫] ২০ বছর বয়সে আম্বালায় এঁর বিয়ে হয় হেনরি জন হিউমের সঙ্গে।[২৬] জর্জের পুত্র ম্যর্ভিন জর্জ কার্লটনের জন্ম ১৯০৮ সালে।[২৭] ততোদিনে জর্জ রেলওয়ের ইন্সপেক্টর। দু মাস পরেই তাঁর এই সন্তানটি মারা যায়। আর জর্জ নিজে পক্ষাঘাতে মারা যান ১৯১৫ সালে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। মৃত্যুর সময় তাঁর পেশা লেখা হয়েছিলো উকিল।[২৮]

জর্জ ১৯০১ সালে যখন দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন, তখনো তাঁর বংশ-নাম লেখা হয়েছে: ডাট। কিন্তু এর তিন বছর পরে যখন তাঁর প্রথম সন্তান জন্মে, তখন ব্যাপটিজমের সময়ে তার নাম লেখা হয়েছে: ডাটন।[২৯] দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম এবং মৃত্যু আর জর্জের মৃত্যুর সময়েও বংশ-নাম লেখা হয়েছে: ডাটন। পিতার সঙ্গে যে-ক্ষীণ যোগাযোগটুকু ছিলো, সম্ভবত দ্বিতীয় স্ত্রীর বুদ্ধিতে জর্জ সেটুকু কেটে ফেলেন। আগেই লক্ষ্য করেছি, কবির দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরাধিকারীরাও কলকাতায় বসে তাঁদের নাম ডাট থেকে

ডাটনে পরিবর্তিত করেছিলেন। মনে হয় না, মাদ্রাসের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে কলকাতার উত্তরাধিকারীদের কোনো যোগাযোগ হয়েছিলো। কিন্তু ডাটন নামগ্রহণ করে দু পক্ষই অজান্তে একে অন্যের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য এর মাধ্যমে তাঁরা মাইকেলের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন। এভাবেই মধুসূদন দত্ত তাঁর উত্তরাধিকারীদের নামে পর্যন্ত বেঁচে থাকলেন না, বেঁচে থাকলেন কেবল বাঙালি সমাজে — তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিয়ে। বঙ্গ মাতার কাছে মনে রাখার যে-মিনতি জানিয়েছিলেন, তা অগ্রাহ্য হয়নি।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটিপ্পনী

জননীর ক্রোড়-নীড়ে

পৃ. ১৩

১ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মাইকেলের চিঠি, জুন ১৮৬১, পত্রসংখ্যা ৮৩। মাইকেল মধুসূদনের অনেকগুলো চিঠির সংকলন এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ক্ষেত্র গুপ্তের সম্পাদিত এবং সাহিত্য সংসদ-প্রকাশিত সংকলনই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এ সংকলনেও বহু ভুল এবং গ্রহণ-বর্জন রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে ত্রুটির দিক — এ চিঠিগুলো তারিখ অনুযায়ী সাজানো নয়। মাইকেল অনেক সময়ে চিঠিতে কোনো তারিখ দিতেন না। এসব চিঠি কালানুক্রমিকভাবে সাজানোর উপায় এদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ। কিন্তু আমার লেখা এই জীবনী প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত মাইকেল-জীবনীর অনেক তথ্যই জানা ছিলো না। সে জন্যে আগের সংকলন-কারীরা চিঠিগুলো ঠিকমতো সাজাতে পারেননি। অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের কাছে রক্ষিত মাইকেলের মূল চিঠির যে-সংকলন ছিলো এবং এখন যা ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে আছে, তার ওপর ভিত্তি করে সম্প্রতি আমি এই চিঠিগুলোর একটি সংকলন করেছি। ২০০৩ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত এই সংকলনের নাম *The Heart of a Rebel Poet: Letters of Michael Madhusudan Dutt* (HRP)। এই সংকলনের বেশির ভাগ জুড়ে আছে প্রাসঙ্গিক তথ্য। পত্রসংখ্যা আমি সেই সংকলন থেকে দিচ্ছি।

২ বাঙালিদের মধ্যে প্রথম ব্যারিস্টার হন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ১৮৬২ সালে — মাইকেল বিলেত যাত্রা করার দু দিন পরে। তবে তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেত যাননি। তিনি লন্ডনেই বসবাস করছিলেন। তারপর এক সময়ে সিদ্ধান্ত নেন ব্যারিস্টারি পড়ার। তিনি লিঙ্কন্স ইনে ভর্তি হন ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ তারিখে। ব্যারিস্টার হবার পর প্রথমে তিনি কিছু কাল লন্ডনে প্র্যাক্টিস করেন। তারপর কলকাতা হাই কোর্টে ব্যারিস্টার হিশেবে প্র্যাক্টিস করার অনুমতি লাভ করেন ১৮৬৫ সালের ২৮ নভেম্বর।

পৃ. ১৪

৩ হিন্দু কলেজে ১৮৩০-এর দশকে ছাত্রসংখ্যা ছিলো গড়পড়তা প্রায় ৫০০। সে হিশেবে প্রথম তিরিশ বছরে বেশ কয়েক হাজার ছাত্র এ কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন।

পৃ. ১৬

৪ দত্ত *বংশমালা* নামে এই পুস্তিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এর একটি কপি আছে।

৫ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রক্ষিত গৌরদাস বসাককে লেখা রাজনারায়ণ বসুর চিঠি (২৪. ১১. ১৮৮৯)। এতে

তিনি লেখেন &The Madras secret, I believe, is that Modhu eloped with the lady with whom he lived as wife (sic) but this myself and my son knew before I corresponded with you about Modhu's life. You did not tell me anything about it." ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মধুসূদন দত্ত* (চতুর্থ সং; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬২) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৯।

৬ রাসবিহারী বসুর স্মৃতিচারণ (৯. ১. ১৮৮৮) - নগেন্দ্রনাথ সোমের *মধু-স্মৃতি* (প্রথম বিদ্যোদয় সং; কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, ১৯৮৯। প্রথম সংস্করণ চৈত্র ১৩২৭) গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ. ৫২।

৭ মাইকেলের শ্বশুর মাদ্রাস স্কুলে তাঁর সহকর্মী ছিলেন - এ রকমের জনশ্রুতি অনেক আগে থেকেই চালু ছিলো। নগেন্দ্রনাথ সোমও অনেক দিন আগে তাঁর *মধু-স্মৃতি* গ্রন্থে সঠিক অনুমান করেছিলেন যে, হেনরিয়েটার পিতা ছিলেন মাদ্রাস স্কুলে মাইকেলের সহকর্মী। (-পৃ. ৫৩।) কিন্তু এই সহকর্মী কে, তা তিনি অথবা অন্য কেউ আবিষ্কার করতে পারেননি। মাইকেলের কনিষ্ঠ পুত্র অ্যালবার্ট নেপোলিয়নের পরিচিত এক ভদ্রলোক - এইচ ডাবলিউ বি মোরেনো কবির অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্ত্রীদের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন *Bengal Past and Present* (Vol. 26, 1923) পত্রিকায়। তাতে তিনি ডিককে মাইকেলের শ্বশুর হিশেবে অনুমান করেছেন। মাদ্রাস স্কুলে দুজন ডিক ছিলেন এ. ডিক আর এল. ডিক। এ. ডিক মাইকেলের কনিষ্ঠ সহকর্মী। আর এল. ডিক মাদ্রাস স্কুল থেকে পাশ করেন ১৮৫৩ সালে। ফরাসি সহকর্মী আবিষ্কার করার চেষ্টা থেকেই মোরেনো এবং পৌত্ররা ভুল করেছিলেন বলে মনে হয়। তাঁদের কাছে ডিক নামটাকে যথেষ্ট ফরাসি-গন্ধী মনে হয়।

৮ *India Office Record*, N/2/21/424 and N/2/23/28. ইন্ডিয়া অফিস এর পর কেবল IOR নামে উল্লিখিত হবে।

৯ *The Annual Report of the Madras University, 1850* (Madras: Pharoah & Co., 1850).

১০ *The Annual Report of the Madras University, 1853* (Madras: Pharoah & Co., 1853).

পৃ ১৭

১১ Q. Bell, *Virginia Woolf* (Triad/Paladin ed; London: Triad/Paladin, 1987), pp. II, 5-6.

১২ প্রশান্তকুমার পাল এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি তথ্য দিয়েছেন। - *রবি-জীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: ভূর্জপত্র, ১৯৮৪), পৃ. ২৬৮-৭৬। কিন্তু তা সত্ত্বেও রহস্য পুরোপুরি উন্মোচিত হয়নি।

পৃ ১৮

১৩ যোগীন্দ্রনাথ বসুর *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* (প্রথম দেজ সংস্করণ; কলকাতা: দেজ পাবলিশিং,১৯৮৩), পৃ. ১২; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধুসূদন দত্ত*, পৃ. ১৩।

১৪ *সমাচার চন্দ্রিকা, সমাচার দর্পণে* উদ্ধৃত, ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩০, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড (পঞ্চম মুদ্রণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪০১),পৃ. ১৫০।

পৃ ১৯

১৫ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১১।

১৬ *সমাচার দর্পণ*, ১৬ অক্টোবর ১৮১৯, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সং; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৯) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৬।

১৭ ঐ, পৃ. ২৯৭-৯৮। কয়েক বছর পরে রামদুলাল দের নিজের শ্রাদ্ধে ব্যয় হয়েছিলো তার চেয়েও বেশি।



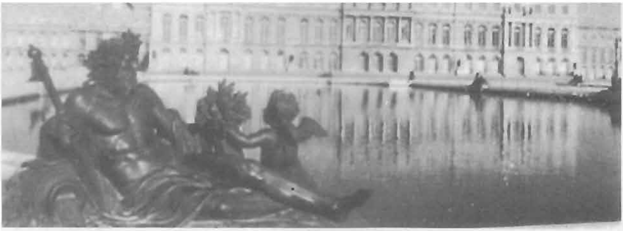
কবির সমাধি। অ্যালবার্ট নেপোলিয়নের পুত্র চার্লস নেভিল ডাটনের উদ্যোগে কবির আবক্ষ মূর্তিটি বসানো হয় ১৯৫০-এর দশকে। মাইকেল এবং হেনরিয়েটার কবরেরও সংস্কার করেন তিনি। ১৮৮৮ সালে হেনরিয়েটার কবরের ওপর কোনো ফলক বসানো হয়নি। আবক্ষ মূর্তিটি সুনীল পালের তৈরি।



ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদের ঠিক পেছনের ৫ নম্বর মোরপা সড়কের এই বাড়িতে মাইকেল নিজে ছিলেন মাসখানেক। কিন্তু তাঁর পরিবার ছিলো আড়াই বছর।



মাইকেলের সময়কার ট্যাঙ্ক স্কোয়ার।
ফ্রেডারিক ফাইবিগের আঁকা ছবি (আনুমানিক ১৮৪৫)

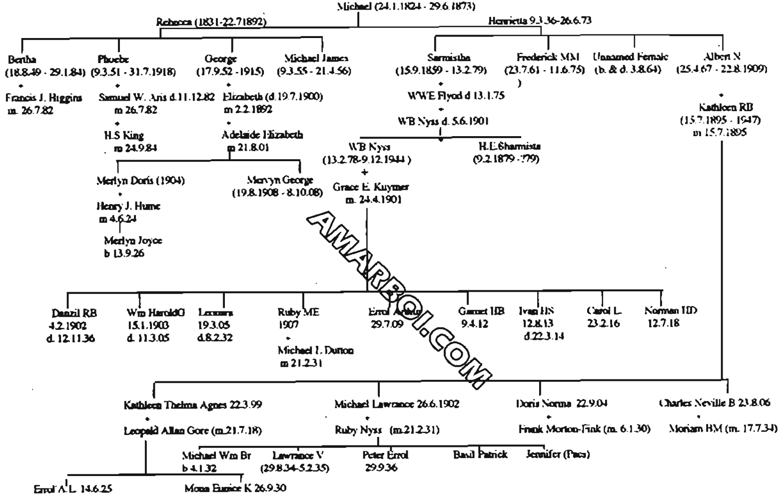


ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদ এবং ভার্সাই-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে একাধিক সনেট লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো।



হ্যাম্পটন কোর্ট: প্রধান প্রবেশ পথের দিক থেকে।

মাইকেলের বংশলতিকা



এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত এন/১ এবং এন/২ সিরিজের এক্লেসিয়াস্টিকাল পেপার্সের ওপর ভিত্তি করে। কেবল ব্যাজিল প্যাট্রিক এবং জেনিফার ডাটনের নাম সুরেশ মৈত্রের বই থেকে নেওয়া। এ তালিকা সম্পূর্ণ নয়। মাইকেলের জীবনীর জন্যে এর চেয়ে বিস্তারিত তালিকার প্রয়োজনও নেই। তাঁর প্রপৌত্রসহ বেশির ভাগ বংশধরগণ এখন অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন বলে শুনেছি।

১৮২০ সালে রামরত্ন মল্লিক ছেলের বিয়েতে সাত-আট লাখ টাকা ব্যয় করেছিলেন বলে শোনা যায়। - বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ* (তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যানস, ১৯৯৩), পৃ. ৩৯।

১৮ H. Cowell and L. A. Goodeve, eds., *The Bengal Law Reports, Vol. IV, 1869* (Calcutta: Thacker, Spink and Co, 1870) গ্রন্থে Ganendro Mohun Tagore and Upendro Mohun Tagore মামলা দ্রষ্টব্য, p. 108.

পৃ ২০

১৯ *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century*, Vol. 1, ed. Goutam Chattopadhayy (Calcutta: Progressive Publishers, 1965), p. 411. রাজনারায়ণ দত্তের প্রবন্ধটি উদ্ধৃত হয়েছে ৩৩ থেক ৫৪ পৃষ্ঠায়।। এই গ্রন্থে মাইকেলকে জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সদস্য হিশেবে দেখানো হয়েছে। ইনি আসলে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, কিন্তু কবি মধুসূদন নন। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের আগে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষও লিখেছিলেন যে, রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। — *মাইকেল-জীবনীর আদিপর্ব* (কলিকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৬২), পৃ. ৩১।

২০ *সমাচার দর্পণ*, ১২ মার্চ ১৮৩৪, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯।

২১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধুসূদন দত্ত*, পৃ. ৯।

২২ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১২; নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ১-২।

২৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধুসূদন দত্ত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৬।

পৃ ২১

২৪ দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য *The Bengal and Agra Directory and Annual Annual Register for 1848* (Calcutta: Samuel Smith & Co., 1848). এই তালিকা আছে ৩০ পৃষ্ঠা জুড়ে।

২৫ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১২।

২৬ শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (কলকাতা: নিউ এজ, চতুর্থ সং, ১৯৮৩), পৃ. ৪৩।

২৭ বিশপস কলেজের ছাত্রদের তালিকায় বয়স দেওয়া আছে, তবে মাসের কোনো উল্লেখ নেই। কলেজে অধ্যক্ষ জর্জ উডনি উইদার্স ১৮৪৬ সালের ২৬ জানুআরি তারিখের একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, কদিন আগে ১৩ জানুআরি তারিখে মধুসূদন ডাটের বয়স ২২ বছর পুরো হয়েছে। See G. U. Withers to the Bishop of Madras, 26. 1. 1846, SPG Papers, Rhodes Library, Oxford University, C Ind. I/13/118. মাইকেলের বিয়ের তারিখেও বছর সঠিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। মোট কথা মাইকেলের বয়স বছরের দিক দিয়ে সঠিক, কিন্তু তাঁর জন্মতারিখ ২৫ জানুআরি কিনা বলা শক্ত।

পৃ ২২

২৮ এ বিষয়ে আমি আমার *Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization* (Rajshahi: Sahitya Samsad, 1983) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এতে সেকালের মহিলাদের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এই মহিলাদের মধ্যে ছিলেন রাসসুন্দরী দেবী, বামাসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী প্রমুখ। এ বই-এর বাংলা অনুবাদ — *নারীপ্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০০)।

২৯ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ১৮; *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৫; সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য* (দ্বিতীয় সং; কলকাতা: পুথিপত্র, ১৯৮৫), পৃ. ১৯।

পৃ ২৩

৩০ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ২২।

৩১ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২০।

৩২ সেকালে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে কেউ দূরে চাকরি করলে ছুটির সময়ে বাড়িতে আসতেন; কিন্তু স্ত্রী এবং সন্তানদের পৈতৃক বাড়িতে রাখার নিয়মই চালু ছিলো। সুপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এ নিয়ম প্রথম ভঙ্গ করেন উত্তরপাড়ার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি উত্তর ভারতে চাকরি পেয়ে পরিবার সেখানে নিয়ে যান। দ্বিতীয় সবচেয়ে সুপরিচিত দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি আহমেদাবাদে চাকরি পেয়ে পিতার প্রায় বিনা-অনুমতিতে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে নিয়ে যান। আরও দ্রষ্টব্য আমার *Reluctant Debutante* গ্রন্থ।

৩৩ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ১৩।

৩৪ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ১৬-১৮; *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৪।

পৃ ২৪

৩৫ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ২০।

পৃ ২৫

৩৬ ইংরেজি জানলে উনিশ শতকের প্রথম পাদে একটা ভালো চাকরি পাওয়া খুবই সহজ হতো। কিন্তু তখন ইংরেজি শেখার সুযোগ যেমন সীমিত ছিলো, তেমনি তা ছিলো দারুণ ব্যয়সাপেক্ষ। এই কথা চিন্তা করেই সমাজের কেবল প্রগতিশীল ব্যক্তিরা নন, রাধাকান্ত দেবের মতো রক্ষণশীল লোকেরাও দেশীয় ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। সাংগঠনিক কাজে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন বিচারপতি এডওয়ার্ড ঈস্ট এবং দেশীয়দের বন্ধু ডেভিড হেয়ার। কিন্তু ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনি এ ব্যাপারে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেনি। আর এ উদ্যোগ যেহেতু সমাজের উপরতলার উচ্চবর্ণের উচ্চবিত্তের হিন্দুরা নিয়েছিলেন, সে জন্যে এ কলেজে লেখাপড়ার অধিকার থাকে কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের। হিন্দু কলেজ স্থাপনের পটভূমি জানার জন্যে দ্রষ্টব্য: A. F. S. Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835* (Leiden: E. J. Brill, 1965), Ch. 6.

৩৭ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের *স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক* গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালের এপ্রিল মাসে। এ বই লেখা হয় প্রধানত রামমোহন রায়ের সতীদাহ সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থে মহিলাদের সম্পর্কে সাধারণভাবে যে-মন্তব্য করা হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে এ গ্রন্থ লিখতে উদ্বুদ্ধ করেন রাধাকান্ত দেব।

পৃ ২৬

৩৮ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত* (তৃতীয় সং; কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ১৯৮৭), পৃ. ৩২।

পৃ ২৭

৩৯ এই বিখ্যাত উক্তি দীনবন্ধু মিত্রের লেখা *সধবার একাদশী* নাটকের চরিত্র রামমাণিক্যের। সেও আর পাঁচজনের মতো রাজধানী কলকাতায় গিয়েছিলো ভাগ্যান্বেষণে।

পৃ ২৮

৪০ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২৫।

৪১ Ram Comul Sen, *A Dictionary of the English and Bengali Language*, Introduction, বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* (কলকাতা: পাঠভবন, ১৯৬৮) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৮৯।

৪২ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২৫।

৪৩ মেকলি তাঁর বিখ্যাত প্রস্তাব পেশ করেন ১৮৩৫ সালের দোসরা ফেব্রুআরি। পরের মাসে যথেষ্ট বিরুদ্ধ

জনমত সত্ত্বেও সরকারী সিদ্ধান্ত হয় সরকারী কাজকর্মে ফারসির বদলে ইংরেজি ব্যবহারের। এ নিয়ে চমৎকার আলোচনা আছে পূর্বোক্ত A F S Ahmed-এর গ্রন্থে, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৪ Letter of A. W. Street to The Society for the Propagation of Gospels Papers, Rhodes House, Oxford University, Ind. অতঃপর কেবল SPG Papers বলে উল্লিখিত।

৪৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *সমাচারদর্পণে* অন্য এক মধুসূদন দত্তের নাম দেখে হিন্দু কলেজে মাইকেলের ভর্তির সময় ১৮৩৩ সাল বলে অনুমান করলেও, আসলে ১৮৩৭ সালের আগে মধুসূদন সেখানে ভর্তি হননি। এ সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২৬-২৮।

পৃ ২৯

৪৬ J. Kerr, *A Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, from 1835 to 1851, Pt. II* (London: Wm. H. Allen & Co., 1853) p. 23.

পৃ ৩০

৪৭ *Ibid.*; এ ছাড়া, সালাহউদ্দীন আহমেদ তাঁর গ্রন্থে সমকালীন সাক্ষ্যপ্রমাণসহ ইংরেজি শিক্ষিত তরুণদের ধর্মীয় আচার এবং রীতিনীতি-বিরোধী আচরণের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। - A. F. S. S. Ahmed, pp. 43-50.

৪৮ পাদটীকা ১৯ দ্রষ্টব্য।

৪৯ কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-৭৩) হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁর কাছ থেকেই কবিতা লেখার প্রেরণা পান। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ – *Shair and other Poems* – প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ সালে। ডি এল রিচার্ডসন যে-কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন, তাতে কাশীপ্রসাদের একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। এঁর অন্য একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *Memoir of Native Indian Dynasties*। তিনি এগারো বছর *Hindu Intelligencer* পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

পৃ ৩১

৫০ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) সরাসরি ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না; কিন্তু যাঁরা ডিরোজিওর দ্বারা সবচেয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৮৩২ সালের অক্টোবর মাসে তিনি অ্যালেকজান্ডার ডাফের কাছে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নেন। এর আগে থেকে তিনি একটি স্কুলে চাকরি করছিলেন, ধর্মান্তরের ফলে তাঁর চাকরি চলে যায়, কিন্তু তিনি তাতে পিছুপা হননি। ধর্মান্তরের ফলে তিনি স্ত্রীকেও হারাতে বসেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁর চরিত্রে সামাজিক সুবিধে নেবার প্রবণতা কমবেশি দেখা গেলেও, ১৮৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে নীতির ব্যাপারে তিনি আপোশহীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি পণ্ডিত হিশেবেও সুপরিচিত ছিলেন। বেশ কয়েকটি গ্রন্থে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন।

৫১ রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮) ডিরোজিওর ছাত্র এবং ইয়ং বেঙ্গল হিশেবে যাঁরা সবচেয়ে নাম-করা ছিলেন, তাঁদের একজন। সমাজসংস্কার বিষয়ে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। সত্যবাদিতা এবং হিন্দু ধর্মের বিরোধিতার জন্যে সেকালে সুপরিচিত হয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করার ফলে তিনিও কৃষ্ণমোহনের মতো তাঁর স্কুলের চাকরি খোয়ান এবং পিতৃগৃহ থেকে নির্বাসিত হন।তাঁর থেকেও তাঁর খ্যাতি ছিলো স্পষ্টবাদিতার জন্যে। তিনি *জ্ঞানান্বেষণ*-সহ একাধিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

৫২ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও (১৮১৪-১৮৭৮) ডিরোজিওর শিষ্য হিশেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনিও নিজের আদর্শের খাতিরে নানা রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেননি। সেকালেই তিনি বিধবাবিবাহ করেছিলেন এবং তার ফলস্বরূপ বঙ্গদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

৫৩ ডিরোজিওর আরও একজন শিষ্য মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮১৩-১৮৩৭) হিন্দু সমাজ এবং ধর্মের কট্টর সমালোচক ছিলেন। ১৮৩২ সালে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং মিশনারি হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বিশপস কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু এই কলেজের কাগজপত্র থেকে মনে হয় ১৮৩৭ সালে তিনি সম্ভবত সাগরে ডুবে অকালে মারা যান।

৫৪ রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮) ডিরোজিও শিষ্য এবং ইয়ং বেঙ্গলদের একজন নেতা হিশেবে পরিচিত। তিনি ডিরোজিও অ্যাকাডিমিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলদের প্রকাশিত সবগুলো পত্রিকার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুবক্তা এবং সমাজসংস্কারক রূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেকালের সব 'রাজনৈতিক' ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি অনেকগুলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন। সেকালের শিক্ষিতদের মধ্যে তাঁর চেয়ে সফল ব্যক্তি কমই ছিলেন।

পৃ ৩২

৫৫ রিচার্ডসন সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা আছে তাঁর মৃত্যুর পরে *Calcutta Review* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি দীর্ঘ নিবন্ধে - Sanial, S. C. "Captain David Lester Richardson", *Calcutta Review*, Vol. 123 (Jan. 1906), pp. 74-89.

৫৬ রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত* (ষষ্ঠ সং; কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৮৫), পৃ. ১৪-১৫।

৫৭ ঐ, পৃ. ১৪; *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। - পৃ. ১৫৭।

৫৮ W. Radice অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে ডিফিল ডিগ্রি করেন। "Tremendous Literary Rebel: the Life and Works of Michael Madhusudan Datta," a thesis submitted for the degree of D. Phil. in the Faculty of Oriental Studies, University of Oxford, 1986) নামে তাঁর এই চমৎকার অভিসন্দর্ভে কবির নতুন মূল্যায়ন আছে। পৃ. ১৫১।

৫৯ D. L. Richardon to L. Hunt, *Index of Manuscripts in the British Museum Library, Vol. VIII* (Cambridge: Chadwyck Healy, 1985), p. 337.

৬০ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, *মাইকেল জীবনের আদিপর্ব*। অবশ্য এ কথা মৌলিক নয়, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের আগে জেমস ক্যরও অনুরূপ মন্তব্য করেন – (p. 23.)।

পৃ ৩৩

৬১ See *Bengal Hurkaru*, March 2-3, 1843. *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন যে, ডিএলআর ছিলেন বিলেতের রক্ষণশীল দলের সমর্থক এবং তিনি যুবকদলের স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ দিতে পারতনে না। - পৃ. ১৪৪। আলোচ্য সভা অনুষ্ঠিত হবার পর রিচার্ডসনকে নিয়ে বিতর্ক উঠেছিলো। সে সম্পর্কে উল্লেখ করে রিচার্ডসন দক্ষিণারঞ্জনকে উদ্দেশ্য করে পত্রিকায় একটি কৈফিয়ত প্রকাশ করেন। *Bengal Hurkaru*, February 8, 1843.

পৃ ৩৪

৬২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা , *HRP.*

৬৩ MMD to Gourdas Bysack, পত্র সংখ্যা , *HRP.*

পৃ ৩৫

৬৪ Ramcomul Sen's report quoted in J. Kerr's *A Review of Public Instruction in the Bengal Presidency,* p. 33.

৬৫ MMD to Rajnarayan Basu, পত্র সংখ্যা ৬৮, *HRP.*

পৃ ৩৬

৬৬ *মধুসূদন রচনাবলী*, ইংরেজি কবিতা, সংখ্যা ৮।

৬৭ পত্রসংখ্যা, ৪১ – *HRP*.

পৃ ৩৭

৬৮ রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৭০।

৬৯ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বিদ্যাসাগর-চরিত*, *বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ*, ৩য় খণ্ড (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭২), পৃ. ৩৯৩। তাঁর বেতন যখন ৮ টাকা হয়, তখন তাঁর বাড়িতে রীতিমতো উৎসব হয়।

৭০ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ, ১৭ এপ্রিল ১৮৯৩, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৬৬।

৭১ ঐ, পৃ.৪৬৭।

৭২ ঐ, পৃ. ৪৬৯।

পৃ ৩৮

৭৩ *মধুসূদন রচনাবলী*, ইংরেজি কবিতা, সংখ্যা ১৮।

পৃ ৩৯

৭৪ বঙ্কুবিহারী দত্তের স্মৃতিচারণ, *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৩০৪। অনুরূপ উক্তি ভোলানাথ চন্দ্র এবং গৌরদাস বসাকও করেছেন - *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২০।

৭৫ রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৭০।

৭৬ *মধুসূদন রচনাবলী*, ইংরেজি কবিতা, সংখ্যা ৬২।

৭৭ রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, পৃ. ১৮।

পৃ ৪০

৭৮ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৮।

৭৯ উইলিয়াম র‍্যাডিচি একটি প্রবন্ধে মিল্টন এবং মাইকেলের চমৎকার তুলনা করেছেন। - W. Radice, Milton and Madhusudan' in *Literature East and West, Essays Presented to R. K. Das Gupta*, ed. G. R. Taneja and Vinod Sena (Delhi: Allied Publishers Ltd., 1995).

৮০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়* (চতুর্থ সংস্করণ; কলকাতা: সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৬), পৃ. ৬।

৮১ শেলির প্রথম কবিতার বই বেনামিতে প্রকাশিত হয় যখন তাঁর বয়স ১৮ বছর। - R. Holmes, *Shelley the Pursuit* (London: Penguin Books, 1987), pp. 33.

পৃ ৪১

৮২ A. F. S. Ahmed, p. 44 f.n. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *India Review* পত্রিকার বরাত দিয়ে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন, *রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়* (দ্বিতীয় সং; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৬), পৃ. ৩৬-৩৭।

৮৩ A. F. S. Ahmed, p. 49.

৮৪ তাঁর এ উক্তি প্রকাশিত হয় ৩ অক্টোবর ১৮৩১ তারিখের *Bengal Hurkaru* পত্রিকায়। উদ্ধৃত A. F. S. Ahmed, p. 49.

৮৫ গৌরদাস বসাকের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৪৫। মাইকেল নিজেও তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি গৌরদাসের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাননি। - MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২৮, *HRP*। ২৪ সংখ্যক পত্রেও অনুরূপ ইঙ্গিত আছে।

৮৬ গৌরদাস বসাকের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৪৫।
৮৭ ঐ।
৮৮ বঙ্কুবিহারী দত্তের স্মৃতিচারণ, *মধু-স্মৃতি, পৃ.* ৩০৩।
৮৯ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১, *HRP*।

পৃ ৪২

৯০ রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, পৃ. ২৬। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। - 'আত্ম-জীবন চরিত', *সাহিত্য*, ফাল্গুন, ১৩০৩, পৃ. ৭০৪।

৯১ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেবার সময়ে কুসংস্কার কাটিয়ে ওঠার এবং জাতিভেদ না-মানার প্রতীকস্বরূপ রাজনারায়ণ অন্য দুজনের সঙ্গে এক গ্লাস শেরি এবং বিস্কিট খেয়েছিলেন। - রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, পৃ. ২৮।

৯২ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, পত্রসংখ্যা ৩২, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী*, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত (কলকাতা, ১৯০৯), পৃ. ৪২।

৯৩ হরিশচন্দ্র মারা যান ৩৭ বছর বয়সে, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তিরিশের কোঠায়, কালীপ্রসন্ন ৪০ বছরে, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ৪৮ বছরে, কিশোরীচাঁদ মিত্র ৫১ বছরে এবং রামগোপাল ঘোষ ৫১ বছরে।

৯৪ *একেই কি সভ্যতায়* মাইকেল নব্যসমাজের পানাসক্তির এতো চমৎকার ক্যারিকেচার অঙ্কন করেছিলেন যে, পরবর্তী কালে এর অসংখ্য অনুকরণ প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু সবচেয়ে পরিহাসের বিষয় *সধবার একাদশী*তে দীনবন্ধু মিত্র নিমে দত্তের ভূমিকায় স্বয়ং মাইকলের সফল ক্যারিকেচার অঙ্কন করেছিলেন।

৯৫ *আত্মচরিত*, পৃ. ২৬।

৯৬ ঐ। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজি শিক্ষার বিকাশ এবং ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধের প্রভাবে শিক্ষিতদের মধ্যে বেশ্যাদের প্রতি খুব বিরূপ মনোভাব দেখা দিয়েছিলো। বিশেষ করে ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন লোকেরা বেশ্যাদের সম্পর্কে খুবই স্পর্শকাতর হয়ে পড়েন। একটি দৃষ্টান্ত থেকে এই মনোভাবের তীব্রতা বোঝা যায়। বিদ্যাসাগর এবং শিবনাথ শাস্ত্রী অভিনয় দেখতে পছন্দ করতেন। কিন্তু যখন থেকে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীরা অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন, তখন থেকে তাঁরা অভিনয় দেখা বন্ধ করেন। অথচ সেকালে বাঙালি সমাজে মহিলাদের প্রতি এঁদের থেকে বেশি সহানুভূতিশীল লোক কমই ছিলেন। — শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত* (কলকাতা সিগনেট প্রেস, ১৯৫২), পৃ. ৯০; ইন্দ্র মিত্র, *সাজঘর* (কলকাতা: ১৩৬৭), পৃ. ৪০।

৯৭ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২, *HRP*.
৯৮ গৌরদাস বসাকের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৪৬।
৯৯ ভোলানাথ চন্দ্রের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৭৭।

পৃ ৪৩

১০০ বঙ্কুবিহারী দত্তের স্মৃতিচারণ, *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৩০৩।
১০১ রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, পৃ. ২৬।
১০২ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৬৭।
১০৩ বঙ্কুবিহারী দত্তের স্মৃতিচারণ, *মধু-স্মৃতি, পৃ.* ৩০৩।

১০৪ *মধুসূদন রচনাবলী*, পৃ. ৬২২-২৪। এই রচনা প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালের *Annual Report of the Hindoo College*-এ। See Appendix, lxii এবং *General Report on Public Instruction in the Bengal Presidency, 1842-43* (Calcutta: Military Orphan Asylum Press, 1843), Appendix K, XCV-VI.

১০৫ *মধুসূদন রচনাবলী*, পৃ. ৬২৩।

পৃ ৪৪

১০৬ গৌরদাস বসাকের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৬১।

১০৭ বঙ্কুবিহারী দত্তের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৬১।

১০৮ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৬, ১৩ ও ১৫ *HRP*.

পৃ ৪৬

১০৯ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৪০।

পৃ ৪৭

১১০ R. Holmes, *Shelley the Pursuit*, pp. 23-24.

১১১ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৮, *HRP*.

পৃ ৪৮

১১২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৩, *HRP*.

১১৩ ঐ।

১১৪ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ.৮২; *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৩৫। একটি কবিতায় মাইকেল নিজেই কয়েকটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করেছেন, *মধুসূদন রচনাবলী*, ইংরেজি কবিতা সংখ্যা ১০।

১১৫ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৩৫।

১১৬ সবগুলো প্রকাশিত না-হলেও ১৮৪১ সালে লেখা এ রকমের ১৪টি কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। - *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৩৫।

পৃ ৪৯

১১৭ পত্রসংখ্যা ৭, *HRP*.। *Blackwood's Magazine*-এ ৪ অক্টোবর (১৮৪২) তারিখে কয়েকটি কবিতা পাঠানোর কদিন পরে *Bentley's Miscellany*-তে পাঠিয়েছিলেন।

পৃ ৫০

১১৮ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃ. ১৫৭।

১১৯ তাঁর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮০৩ সালে তিনি য়োরোপ থেকে ফেরার পর। এ গ্রন্থের নাম মাসির-ই-তালিফী বিলাদী ইফ্রাঞ্জি। চার্লস স্টুয়ার্ট এই গ্রন্থের যে-অনুবাদ করেন, তা প্রকাশিত হয় ১৮১২ সালে। তারপর এর ফরাসি এবং জর্মান অনুবাদও প্রকাশিত হয়। আবু তালিব (১৭৫২-১৮০৬) জন্মগ্রহণ করেন মুর্শিদাবাদে। আসফ উদদৌলা সিংহাসন আরোহণের পর তিনি ১৭৭৫ সালে অযোধ্যায় চলে যান। কিন্তু ১৭৯৯ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

পৃ ৫১

১২০ See Bankim Chandra Chatterji's letter in P. Sinha, *Nineteenth Century Bengal* (Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyaya, 1965), pp. 157-59; কালাপানি পার হওয়ার বিতর্ক যে ১৮৯০-এর দশকেরও চলছিলো এবং বিলেত-ফেরতদের সমাজে গ্রহণ করার জন্যে পত্রপত্রিকায় ওকালতি করা হয়েছে, এ সম্পর্কে আরও দ্রষ্টব্য আমার *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ৫০৭।

১২১ দেশ ফিরে আসার পর একটা লোক-দেখানো প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিলেত-ফেরতরা সমাজে গৃহীত হতেন। এবং অল্পকালের মধ্যেই বিত্ত এবং বিদ্যা দিয়ে সমাজের উপর তলায় স্থান করে নিতেন। সেকালের বিলেত-ফেরতরা কেউই চিরকাল পতিত থাকেননি।

১২২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৪, *HRP*.

১২৩ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১১, *HRP*.

পৃ ৫২

১২৪ *General Report on Public Instruction in the Bengal Presidency, 1842-1843*, p. 45.

পৃ ৫৩

১২৫ দশমীর দিন তিনি গৌরদাসকে ৯ সংখ্যক চিঠিটি লেখেন। তমলুকে পৌঁছেছিলেন তার আগের দিন।

সাধিতে মনের সাদ

পৃ ৫৪

১ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৬, *HRP*.

২ গৌরদাসের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৬১।

পৃ ৫৬

৩ W. Radice, "Tremendous Literary Rebel: the Life and Works of Michael Madhusudan Datta" (a thesis submitted for the degree of D. Phil. in the Faculty of Oriental Studies, University of Oxford, 1986), পৃ. ১৫১।

৪ T. Moore, *Letters, and Journals of Lord Byron* (London: John Murrray, 1838), p.79. এ চিঠির তারিখ ১৮ মার্চ ১৮০৯। টমাস মূরের লেখা এই জীবনীর ১৮৩৮ সালের সংস্করণই মাইকেল পড়ে থাকবেন। ছোটো হরফে ছাপা এই বই-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৩৫ এবং এতে মোট ৫৭টি অধ্যায় আছে।

পৃ ৫৭

৫ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৩; তারিখ ২৫ নভেম্বর ১৮৪২, *HRP*.

৬ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২৮, *HRP*.

৭ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৯, *HRP*.

পৃ ৫৮

৮ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৬, *HRP*.

৯ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পৃ. ১১১।

পৃ ৬০

১০ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৪৮।

১১ ভূদেব মুখোপাধ্যায় এক সময়ে অ্যালেকজান্ডার ডাফের সংস্পর্শে আসেন এবং বেশ প্রভাবিত হন। এই সূত্রে তিনি পুজো করার ব্যাপারেও পিতার কাছে আপত্তি করেন। তবে ডাফ তাঁকে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করেননি। পিতা ভূদেবকে আশ্বস্ত করেন যে, হিন্দু ধর্ম পাশ্চাত্য চিন্তাধারার তুলনায় কম আধুনিক নয়। - T. Raychaudhuri, *Europe Reconsidered* (2nd Impression; Delhi: Oxford University Press, 1989), pp.28, 46.

ডাফ নানাভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। তিনি বাংলা শিখেছিলেন। ইংরেজি শেখার

জন্যে একাধিক স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সর্বোপরি, তাঁর চমৎকার বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা ছিলো। তাঁর আগে পর্যন্ত মিশনারিরা প্রধানত নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরই খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু ডাফ প্রথম উচ্চবর্ণের এবং উচ্চবিত্তের লোকদের দীক্ষা দিতে সমর্থ হন। তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে সবচেয়ে নাম-করা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

১২ রাজনারায়ণ নিজেই তাঁর এই ইসলামপ্রীতির কথা তাঁর আত্মচরিতে বর্ণনা করেছেন। *আত্মচরিত* (তৃতীয় সং; কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক এজেন্সি, ১৯৫২), পৃ. ৪৪।

পৃ ৬১

১৩ *The Anglo-Saxon and the Hindu (Lecture I)* দ্রষ্টব্য। পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পৃ ৬২

১৪ কৃষ্ণমোহনের পত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৯২।

পৃ ৬৩

১৫ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৬।

১৬ *India Office Record* (I. O. R.), N/1/ 47/66.

১৭ I.O.R./N/1/81/347.

১৮ I.O.R./N/1/90/444.

১৯ যাত্রীদের তালিকায় দুজনের নাম ছিলো: Rev. Mr. & Miss Banerjee. কলকাতা থেকে জাহাজ ছাড়ার তারিখ ৭ ডিসে'র। Shipping News, *Athenæum*, 18 December 1855.

পৃ ৬৪

২০ *General Report on Public Instruction in Bengal Presidency for 1842-43* (Calcutta: Bengal Military Orphan Press, 1843) p. lxxiii.

২১ ঐ। অন্য বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের নাম: প্যারীচরণ সরকার - ৪০ টাকা; যোগেশচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র রুদ্র, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ৩০ টাকা; জুনিয়র স্কলারশিপ - জগদীশনাথ রায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্যামাচরণ ল। pp. vi-vii.

২২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৮, *HRP*।

পৃ ৬৫

২৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৬৭।

২৪ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, *মাইকেল-জীবনের আদিপর্ব* (কলকাতা:মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৬২), পৃ. ৮০।

২৫ এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে জেমস লঙের রচনায়। তাঁর *A Handbook of Bengal Missions* (London: J. Farquhar, 1848) গ্রন্থে বিভিন্ন মিশনের সমবেত চেষ্টায় কতোজনকে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে, তার বদলে তিনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন উচ্চবর্ণের কোন কোন হিন্দুকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

২৬ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৫৭।

পৃ ৬৬

২৭ এক নম্বর ওল্ড গার্ডেন রীচ।

২৮ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃ. ৮৩।

২৯ *Bengal Hurkaru*, 13 February 1843, *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৫।

পৃ ৬৭

৩০ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ২৭।

৩১ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২৩, *HRP*।

পৃ ৬৮

৩২ পরে, পৃ. ৩২৫-২৬।

৩৩ *Visions of the Past*, *মধুসূদন রচনাবলী*, ইংরেজি কবিতা সংখ্যা ৫১।

পৃ ৬৯

৩৪ পরে, পৃ. ১২৭।

৩৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পৃ. ১১১।

পৃ ৭০

৩৬ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২১, *HRP*।

৩৭ Ibid.

পৃ ৭১

৩৮ এই দুই অধ্যাপকই বলেছেন যে, ডাট মিশনারি হবার উদ্দেশ্য নিয়েই বিশপস কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তা ছাড়া, তিনি যে-ধর্মে গভীর আস্থা স্থাপন করেছিলেন - সে সাক্ষ্যও তাঁরা দিয়েছেন। পরে বিস্তারিত আলোচান করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য Professor A. W. Street's Letter to Rev. Fagan, and W. U. Wither's letter to the Bishop of Madras, SPG Papers, Rhodes Library, Oxford,C. Ind. I/13/134 and 118.

৩৯ ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজের নাম বদলে প্রেসিডেন্সি কলেজ করা হয় এবং তখন থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাড়া অন্য বর্ণের হিন্দুদেরও ভর্তির ব্যবস্থা রাখা হয়। এর আগে তথাকথিত জাতহীন একটি ছাত্রকে ভর্তি করার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে হিন্দু সমাজের বিতর্ক হয়। এ সময়ে হিন্দু কলেজ সরকারী অর্থে চলতো বলে হিন্দু সমাজ সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারেনি।

৪০ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২১, *HRP*।

৪১ I.O.R., Resoluion of the Education Council, 1843.

৪২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২২ ও ২৩, *HRP*।

৪৩ সালাহউদ্দীন আহমেদ, তাঁর গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। pp. 53-55.

৪৪ Unpublished Records of the Hindu College, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৬০।

৪৫ ডিরোজিওকে কলেজ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করার সময়ে ডেভিড হেয়ার-সহ কলেজের সমস্ত পরিচালক একই যুক্তি দিয়েছিলেন।

পৃ ৭২

৪৬ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২০, *HRP*।

৪৭ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২১, *HRP*।

৪৮ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩০, *HRP*।

৪৯ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২১, *HRP*।

৫০ মিস্টার স্মিথ বাস করতেন ডেকার্স লেনে। তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেবার আগে অল্পদিনের জন্যে মাইকেল ওল্ড চার্চের চ্যাপলেইন মি ডনের বাড়িতেও ছিলেন। মধু-স্মৃতি, পৃ. ২৭।

পৃ ৭৩

৫১ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২৫ ও ২৬, *HRP*।

৫২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২৯, *HRP*।
৫৩ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২২, *HRP*।

পৃ ৭৪

৫৪ পত্রসংখ্যা ৭ ও ৮, *HRP*।
৫৫ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২১, *HRP*।
৫৬ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৪০।
৫৭ পরে অধ্যাপক স্ট্রীট এবং অধ্যক্ষ উইদার্সের পত্র থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত লক্ষ্য করা যাবে। পৃ. ৮৫-৮৬।
৫৮ বিশপস কলেজের ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র অনুযায়ী মহেশচন্দ্র ঘোষের জন্ম ১৮১৩ সালে। তিনি এই কলেজে ভর্তি হন ১৮৩২ সালের ২৭ অগাস্ট তারিখে। মারা যান ১৮৩৭ সালে। তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গ্রীক টেস্টামেন্ট পাঠ করেন। SPG Papers, Rhodes Library, Oxford, C. Ind. I (6) 30.
৫৯ List of old students, SPG Papers, Rhodes Library, Oxford, C. Ind. I / 6 / 30. তাঁর ডীকন হবার তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৩। তিনি বিশপস কলেজ থেকে পাস করেন ১৮৪১ সালে।
৬০ Scales of Salaries, Street to G. H. Fagan, 10. 3. 1845, SPG Papers, C. Ind. I / 13/ 87.

পৃ ৭৫

৬১ Withers to E. Hawkins, 20 Nov. 1844, SPG Papers, C. Ind. I / 12 / 111.
৬২ A. Street to Rev. Fagan, 23 July 1847, SPG Papers, C. Ind. I / 13 / 134. Also Withers to the Bishop of Madras, 20 Jan. 1846, C. Ind. I / 12 / 118.
৬৩ A. Street to Rev. Fagan, 23 July 1847, SPG Papers, C. Ind. I / 13 / 134.
৬৪ ২০ নভেম্বর তারিখে অধ্যক্ষ উইদার্স যে-চিঠি লেখেন, তাতে তিনি তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। Withers to E. Hawkins, 20 Nov. 1844, SPG Papers, C. Ind. I / 12 / 111.

পৃ ৭৬

৬৫ G. Weildermann's letter, SPG Papers, Rhodes Library, Oxford, C. Ind. I / 13/200.
৬৬ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাত দিয়ে এ কথা তাঁর জীবনীকারেরা বললেও, এ ধরনের কোনো ঘটনার কথা বিশপস কলেজের কাগজপত্রে দেখিনি।
৬৭ Charles T. Metcaff's gift to Bishop's College, deed dated 6 Nov. 1820, SPG Papers.
৬৮ Bill of Exchange, 14 May 1823, SPG Papers. বিশপস কলেজ সম্পর্কিত বাকি সব খবরই SPG Papers থেকে সংগৃহীত।
৬৯ ১৮৩৫ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত যেসব ছাত্রদের তালিকা আছে, তাতে বিভিন্ন এলাকার ছাত্রদের নাম দেখা যায়। তবে প্রথম দিকে বাঙালি ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি ছিলো। ১৮৩৬ সালের ছাত্র তালিকা এ রকম:

তোরাব, চণ্ডীচরণ আঢ্যি (১৯), ব্রজনাথ ঘোষ (১৮), জয়গোপাল দত্ত (১৮), দ্বারকানাথ ব্যানার্জি (১৮), গোপালচন্দ্র মিত্র (১৭), মধুসূদন শীল, বেণীমাধব মজুমদার (২০)।

এই তালিকা থেকে আরও দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে ছাত্রদের সংখ্যা কখনো ২৫জনের বেশি ছিলো না, বেশির ভাগ সময়ে ২০জনের কম। ১৮৪৩-৪৪ সালে ছাত্রের সংখ্যা ছিলো গড়পড়তা ১৫। ৯ নভেম্বর ১৮৪৪ মাইকেল এই কলেজে ভর্তি হবার দু মাস আগে ছাত্র ছিলেন মাত্র ১১জন। মাইকেল এবং অন্য তিনজন ছাত্র এ সময়ে ভর্তি হওয়ায় অধ্যাপকরা বেশ খুশি হয়েছিলেন। অধ্যাপক উইদার্স সে কথা লিখে জানিয়েছেন লন্ডনে। জেমস লঙ তাঁর গ্রন্থে ১৮৪৭ সালে ছাত্রদের

তালিকা দিয়েছেন। এতে দেখা যাচ্ছে কলেজে তখন ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬-এ দাঁড়ায়। এঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন শ্রীলঙ্কা এবং মাদ্রাস থেকে। মাইকেল ছাড়া, শ্রীনাথ বসু, কালী নন্দী এবং সায়মন প্যারি নামে তিনজন বাঙালি ছাত্র ছিলেন।

৭০ ১৮৪৩ সালে বছরের ন মাস গড়পড়তা ছাত্র ছিলো ১৭জন। বাকি তিন মাস ১৩জন। ১৮৪৪ সালে ছ মাস ছাত্র ছিলো ১৩জন, তিন মাস ছিলো ১১জন, বাকি তিন মাস যথাক্রমে ১৪, ১৬ ও ১৭জন। স্ট্রীট এবং উইদার্স ছাড়া মাঝেমধ্যে তৃতীয় একজন অধ্যাপক ছিলেন। তা ছাড়া, দেশীয় ভাষা শেখানোর জন্যে চার/পাঁচজন শিক্ষক ছিলেন। অন্যান্য খরচ সম্পর্কে ধারণা করার জন্যে দ্রষ্টব্য: Monthly expenditure, SPG Papers, I / 8 / (11) 9; I / 13 / 87.

পৃ ৭৭

৭১ Street's letter dated 1 Feb. 1847, SPG Papers, C Ind. I / 13 / 126.

৭২ Ibid.

৭৩ Withers to Hawkins, 20 Nov. 1844, SPG Papers, 1 / 12 / 111.

৭৪ Street to Fagan, 23 Jul. 1847, SPG Papers, C Ind. I / 13 / 134.

পৃ ৭৮

৭৫ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ২৯, *HRP*।

৭৬ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭২, *HRP*।

পৃ ৭৯

৭৭ Ibid.

৭৮ Street's letter dated 23 Jul. 1847, SPG Papers, C Ind. I / 13 / 134.

৭৯ MMD to Gourdas Bysack, 20 Jul. 1846, পত্রসংখ্যা ৩৪, *HRP*।

৮০ প্যারীচরণ সরকার এবং প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীও শিক্ষকতায় যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে সবার আগে কলেজ ত্যাগ করেন প্যারীচরণ সরকার। মাইকেলের আর-একজন সহপাঠী এবং ভালো ছাত্র - গোবিন্দ দত্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন ১৮৪৫ সালে।

পৃ ৮১

৮১ Withers to the Bishop of Madras, 26 Jan. 1846, SPG Papers, C Ind. I / 12/ 118.

৮২ Street's letter dated 23 Jul. 1847, SPG Papers, C Ind. I / 13 / 134.

৮৩ MMD to Gourdas Bysack, 20 Jul. 1846, পত্রসংখ্যা ৩৪, *HRP*।

৮৪ Ibid.

৮৫ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৩, *HRP*।

৮৬ Street to Hawkins, 16. 8. 1845, SPG Papers, C. Ind. I / 13 / 95.

৮৭ Street to Fagan, C. Ind. I / 13 / 134 and 137.

৮৮ Street's letter dated 22 Nov. 1847, SPG Papers, C Ind. I / 13 / 137.

পৃ ৮৩

৮৯ এগবার্ট কেনেট বিয়ে করেন ১৮৫১ সালে। তাঁর স্ত্রীর নাম ফীবি রজার্স। (See IOR, N/2/30/412). মাইকেল তাঁর কন্যার নাম দেন ফীবি রেবেকো সালফেল্ট ডাট।

৯০ মাইকেল তাঁর প্রথম কন্যার নামের সঙ্গে (ব্যর্থা ব্লানশ কেনেট ডাট) জুড়ে দিয়েছিলেন চার্লস কেনেটের বংশ-নাম। IOR, N/2/28/ 557.

৯১ Street to Fagan, C. Ind. I / 13 / 134.

৯২ G. Weilderman's letter, C. Ind. I / 13 / 200.

পৃ ৮৪

১৩ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৫, *HRP*।

১৪ Street's letter dated 22 Nov. 1847, SPG Papers, C Ind. I / 13 / 137.

পৃ ৮৫

১৫ Withers to the Bishop of Madras, SPG Papers, C Ind. I / 12/ 118.

১৬ Withers to E. Hawkins, 11 Feb. 1846, SPG Papers, C Ind. I / 12/ 119.

পৃ ৮৬

১৭ Street to Fagan, C. Ind. I / 13 / 134.

পৃ ৮৭

৯৭ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধুসূদন দত্ত*, পৃ. ৬।

৯৮ *Bengal Hurkaru* এবং *Friend of India* পত্রিকার নথি থেকে এ সম্পর্কে আর-কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা, তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাতে রাজনারায়ণের পদচ্যুতি অথবা প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও অন্যান্যের কোনো খবর আবিষ্কার করতে পারিনি। এ রকমের সিদ্ধান্ত সদর দেওয়ানি আদালতের কার্যবিবরণীতে থাকার কথা, কিন্তু ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে আগের কয়েক দশকের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিক নথি থাকলেও ১৮৪০-এর দশকের নথি রক্ষিত হয়নি।

৯৯ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৬৮।

১০০ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৩। যোগীন্দ্রনাথ এমনভাবে লিখেছেন যা থেকে মনে হতে পারে যে, মাইকেল মাদ্রাসে চলে যাওয়ার পর রাজনারায়ণ জাহ্নবী দেবীর কাছে পুনর্বিবাহ করার কথা বলেন। পৃ. ১৪।

১০১ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৬৮।

পৃ ৮৮

১০২ Street to Fagan, 22 November 1847, C. Ind. I / 13/137. ঐ বছর ১৯ মে তারিখে মাইকেল গৌরদাস বসাককে যে-চিঠি লেখেন, তাতে ঝামেলায় অর্ধ-মৃত হবার কথা বলেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ এর জন্যে পিতার দ্বিতীয় বিবাহকে দায়ী মনে করেছেন। আসলে অধ্যাপক স্ট্রীট বেং অধ্যাপক উইদার্সের চিঠি থেকে বোঝা যায়, এ সময়ে পিতার টাকা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মাইকেল বিপদে পড়েছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃ. ১০২।

১০৩ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃ. ১০২।

১০৪ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৬৮।

১০৫ চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করার কথা একাধিক জীবনীকার উল্লেখ করেছেন। - *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৩২; ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃ. ১০৪।

১০৬ Street to Fagan, 22 November 1847, C. Ind. I / 13/137.

পরদেশে

পৃ ১০

১ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৬, *HRP*।

২ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৭২-৭৩। তাঁর আগে এ রকমের অনুমান করেন ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃ. ১০৪। কিন্তু তাঁরা এমনও বলেছেন যে, মাইকেল এঁদের সঙ্গে এক জাহাজে করে যান। এ অনুমানও ঠিক নয়।

পৃ ১১

৩ SPG Papers, Rhodes Library, Oxford, C. Ind. I / 13/107 and 126.

পৃ ১২

৪ *The Madras Almanac*, 1855, Shipping অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ১৮৫৫ সালে কলকাতা থেকে মাদ্রাস যাবার ভাড়া ছিলো ক্যাবিনে ১২০, কোয়ার্টার ডেকে ৯০ টাকা।

৫ Ibid.

৬ Shipping Intelligence, *Athenaeum*, 18 January 1848. লেডি সেইল ২৯ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতা ত্যাগ করে ৩০শে গাঞ্জামে পৌঁছে। পয়লা জানুয়ারি পৌঁছে কলিঙ্গপত্তম, ৯ই বিশাখাপত্তম আর ১৬ই করিঙ্গা।

পৃ ১৩

৭ *Madras Spectator* পত্রিকায় এম এম ডাটের বদলে তাঁর নাম ছাপা হয়েছে এন এন ডাট হিশেবে। কিন্তু সেখানেও অব বিশপস কলেজ, ক্যালকাটা কথাটা আছে।

৮ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৬, *HRP*।

৯ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৩৩।

১০ *A Letter to Robert Lowe, Joint Secretary of the Board of Control, From John Bruce Norton on the Condition and Requirements of the Presidency of Madras* (Madras: Pharoah & Co., 18540).

পৃ ১৪

১১ মিস্টার ডিয়ালট্রির সঙ্গে মাদ্রাসের যোগাযোগ ছিলো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মাইকেল মাদ্রাসে যাওয়ার তিন মাস পরে ডিয়ালট্রি মাদ্রাস হয়ে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। পথে কদিন ছিলেন মাদ্রাসে। কেবল তাই নয় ডিসেম্বর মাসে তিনি লন্ডনে থাকার সময়ে তাঁকে মাদ্রাসের লর্ড বিশপ পদে নিযুক্ত করা হয়। এর দু মাস পরে — ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে — তিনি মাদ্রাসে এসে এই পদে যোগদান করেন। একই মাসে তাঁর পুত্র টমাস কেমব্রিজ থেকে ডিগ্রি লাভ করে মাদ্রাসের ধর্মযাজক পদে নিযুক্ত হন। মাইকেল মাদ্রাসে যাবার ১৮দিন আগে রেভারেন্ড ডাফ এবং তাঁর স্ত্রী কলকাতা থেকে বিশাখাপত্তম হয়ে মাদ্রাসে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। ইনিও হয়তো মাইকেলকে সুপারিশ করেছিলেন। বস্তুত, নানা জনের সুপারিশই হয়তো তাঁকে মাদ্রাসে গুছিয়ে বসতে সাহায্য করেছিলো।

১২ তখনকার *The Madras Almanac*-এর প্রকাশক ছিলো মিলিটারি মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম। এতে প্রতিটি অ্যাসাইলামের বিস্তারিত ইতিহাস দেওয়া আছে।

১৩ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৮১।

পৃ ১৫

১৪ *Reports of the Madras Male and Female Orphan Asylum and Free Day School.*

1848-1855 (Madras: C. M. Pereyra, Current Press, 1848-1855).

১৫ *Ibid.*, 1850. এ বছরের রিপোর্টে আলাদা করে একজন মাস্টার এবং একজন মিস্ট্রেসের কথা উল্লেখ করা হয়। p. 3.

১৬ *Ibid.*, 1851, p. 3.

১৭ *Ibid.*, 1849.

পৃ ৯৬

১৮ *Ibid.*, 1858, p. 5. Also see "A Letter on the Annual General Meeting of Asylum", *Athenaeum*, 2 September 1848.

পৃ ৯৭

১৯ *Reports of the Madras Male and Female Orphan Asylum and Free Day School, 1848-1855* (Madras: C. M. Pereyra, Current Press, 1848-1855), 1850, p.3.

পৃ ৯৮

২০ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৬, *HRP*।

২১ ঐ।

পৃ ৯৯

২২ I.O.R./N/2/27/436.

২৩ I.O.R./N/2/ নেইলরের বিয়ের তারিখ ২৯ জুলাই ১৮৪৮ তারিখে। তখন তাঁর বয়স সাড়ে বাইশ, তাঁর স্ত্রী সুস্যাসাহর বয়স সাড়ে ষোলো।

২৪ পরের আলোচনা দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৪৬।

২৫ *Reports of the Madras Male and Female Orphan Asylum and Free Day School,* 1848. অন্য চাঁদাদাতাদের মধ্যে জর্জ নর্টন দিতেন বছরে ৩০ টাকা, এয়ার বার্টন পাওয়েল ১৫ টাকা, পাদ্রী নক্স ২০ টাকা।

২৬ I.O.R./N/2/27/436.

পৃ ১০০

২৭ I.O.R./N/2/13/196.

২৮ বিয়ের দলিলে ডুগাল্ড ম্যাকট্যাভিশের নামের আগে মৃত বলা হয়নি, বরং তাঁর কাজেরও উল্লেখ করা হয়েছে – Superintendant, Indigo Plantation, Cuddapah.

২৯ বিয়ের রেজিস্টারেই এর উল্লেখ আছে। I.O.R./N/2/10/268..

৩০ I.O.R./N/2/16/159.

৩১ I.O.R./N/2/22/87.

পৃ ১০১

৩২ Ecclesiastical Records, Public Records Office, Edinburgh.

পৃ ১০২

৩৩ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৬, *HRP*।

৩৪ পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এই কবিতাগুলো প্রথম প্রকাশ করেন নগেন্দ্রনাথ সোম।

৩৫ *Captive Ladie*-র ভূমিকায় এই ঠিকানা দেওয়া আছে। কিন্তু মাইকেলের বড়ো মেয়ে বার্থার ব্যাপটিজমের দলিলে ঠিকানা ব্ল্যাক টাউনে দেওয়া আছে।

পৃ ১০৫

৩৬ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৬ ও ৪১, *HRP*।
৩৭ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৭, *HRP*।
৩৮ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৬, *HRP*।

পৃ ১০৬

৩৯ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৭, *HRP*।
৪০ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৮, *HRP*। ওয়াকারের কাছ থেকে গৌরদাসকে নিতে লিখেছিলেন ৫০ কপি।
৪১ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৭, *HRP*।
৪২ Ibid.

পৃ ১০৭

৪৩ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪১, *HRP*।
৪৪ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৬, *HRP*।
৪৫ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪১, *HRP*।
৪৬ অ্যাবেল সিমকিন্সের দুটি পত্রিকা ছাড়া তিনটি প্রেস ছিলো। একটি প্রেস ছিলো ১০৭ নম্বর আর্মেনিয়ান রোডে, একটি ১৪২ নম্বর মাউন্ট রোডে আর-একটি ১৬৩ নম্বর সেকেন্ড লেইন বীচে।

পৃ ১০৮

৪৭ আমি এই তথ্য পরিবেশন করি ১৯৮৬ সালে - আমার দুটি প্রবন্ধে। 'মাইকেলের মাদ্রাস-জীবন", *সাহিত্য পত্রিকা*, ৩০:৩; এবং 'নতুন তথ্যের আলোকে মাইকেলের মাদ্রাস-জীবন ও বিবাহ', *জিজ্ঞাসা*, ৭:৪। এ ছাড়া *প্রতিক্ষণ* পত্রিকায়ও একটি ছোটো প্রবন্ধে এ রকমের মত প্রকাশ করি। পরে ভার্সাইতে গিয়ে হেনরিয়েটার সত্যিকার পরিচয় পাই। নিজের ভুল সংশোধন করে সত্যিকার তথ্য পরিবেশন করি *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। - 'প্রবাসে দৈবের বশে', *দেশ*, ২৫ ফেব্রুআরি ১৯৮৯।
৪৮ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৬, *HRP*।
৪৯ *Athenaeum*, 17 April 1848.

পৃ ১১০

৫০ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪০ ও ৪১, *HRP*।
৫১ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৮, *HRP*।

পৃ ১১১

৫২ MMD to Bhudeb Mukhopadhyay, পত্রসংখ্যা ৩৯, *HRP*।
৫৩ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৬১।
৫৪ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৮, *HRP*।

পৃ ১১৪

৫৫ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪০, *HRP*।
৫৬ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১১৩।

পৃ ১১৫

৫৭ স্বপন বসুর চিঠিতে মূল ইংরেজি সমালোচনা উদ্ধৃত, 'আশার ছলনে ভুলি', *দেশ*, ৮ এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ. ১৭।
৫৮ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪১, *HRP*।
৫৯ ঐ।

পৃ ১১৭

৬০ ঐ।

৬১ ঐ।

৬২ ঐ।

পৃ ১১৮

৬৩ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১১৬-১৭।

৬৪ এই বক্তৃতার অংশ বিশেষ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে (পৃ ১১৭)। পুরো বক্তৃতা পড়েছিলাম অ্যাথেনিয়াম পত্রিকায়। কিন্তু কোন তারিখের পত্রিকা সে তথ্য এখন হারিয়ে ফেলেছি।

৬৫ এ গ্রন্থের ১০৬ পৃষ্ঠায় *Captive Ladie*-র মলাটের ছবি দ্রষ্টব্য।

পৃ ১১৯

৬৬ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৩৬, *HRP*।

পৃ ১২০

৬৭ I.O.R./N/2/ 28/557. MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪২, *HRP*।

৬৮ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪২, *HRP*।

৬৯ ঐ।

৭০ *মধু-স্মৃতি* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৭।

পৃ ১২১

৭১ I.O.R./N/2/28/557.

৭২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪৩, *HRP*।

৭৩ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪১, *HRP*।

পৃ ১২২

৭৪ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪২, *HRP*।

পৃ ১২৩

৭৫ *Eurasian* পত্রিকার নথি আমি দেখিনি। এ তথ্য উদ্ধৃত করেছেন সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৮৬।

পৃ ১২৪

৭৬ MMD to Keshab Gangooly, পত্রসংখ্যা ৭০, *HRP*।

পৃ ১২৬

৭৭ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪৩, *HRP*।

৭৮ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৪৮।

পৃ ১২৭

৭৯ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৮৭।

৮০ I.O.R./N/2/29/264.

পৃ ১২৮

৮১ Quoted in *Athenaeum*, 2 May 1850.

৮২ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৯৯; *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৩১।

৮৩ Quoted in *Athenaeum*, 2 May 1850.

পৃ ১২৯

৮৪ *Athenaeum*, 9 March 1952.

পৃ ১৩০

৮৫ *Athenaeum*, 19 April 1851.

৮৬ *Athenaeum*, 3 May 1851.

৮৭ *Athenaeum*, 7 June 1851.

৮৮ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৪৩৭-৪০। এই রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালের মার্চ মাসে।

পৃ ১৩১

৮৯ ঐ, পৃ ৪৪০-৪১। প্রকাশ কাল মে ১৮৫১।

৯০ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২২৭-২৯।

৯১ *Athenaeum*, 15 January 1852.

৯২ *Athenaeum*, 17 January 1852.

পৃ ১৩২

৯৩ মধু-স্মৃতি, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৭-৪৮।

পৃ ১৩৩

৯৪ I.O.R./N/2/30/330.

৯৫ *Athenaeum*, 26 August 1851.

৯৬ *Reports of the Madras Male and Female Orphan Asylum and Free Day School, 1851.*

৯৭ *Eleventh Annual Report from the Governors of Madras University, 1852* (Madras: Pharoah & Co., 1852),

পৃ ১৩৪

৯৮ Ibid, p. 14.

৯৯ জর্জ জাইলস হোয়াইট জন্মেছিলেন লন্ডনের উপকণ্ঠে ফুলহ্যামে। তিনি ১৮২০ সালে লিয়ান্ডার জাহাজে করে মাদ্রাসে আসেন এবং এগমোরের মিলিটারি মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলামে শিক্ষকতা শুরু করেন। তাঁর আগে তাঁর পেশা কি ছিলো তা জানা যায় না। মাদ্রাস পুলিস অফিসের রিপোর্ট, ৩১ ডিসেম্বর ১৮২৭, IOR, European Inhabitants in Madras, 0/5/30, Vol. 4, pt 3.

১০০ I.O.R./N/ 2/10/286. তাঁর স্ত্রীর কুমারী নাম ছিলো অ্যালাইজা গ্রে। বিয়ের তারিখ ১২ ডিসেম্বর ১৮২৫। তিনি বিয়ে করেছিলেন লাইসেন্স নিয়ে।

১০১ *Reports of the Madras Male and Female Orphan Asylum and Free Day School, 1852.*

পৃ ১৩৬

১০২ I.O.R./N/2/31/260.

১০৩ *ক্যাপটিভ লেডি* লেখার সময় থেকেই কবি রায়পুরমে বাস করতেন। তিনি সেখানে প্রায় চার বছর বাস করেছিলেন। তাঁর ঠিকানা খুঁজে পাইনি। কিন্তু জর্জ হোয়াইট বাস করতেন রায়পুরমের ২৯ নম্বর জেইল রোডে।

১০৪ 3rd proposal moved by G. G. White and seconded by Mr Jones, *Report of the Madras Male and Female Orphan Asylum and Free Day School for Boys,*

1848 (Madras: C. M. Pereyra, Current Press, 1848).

পৃ ১৩৭

১০৫ I.O.R./N/16/169.
১০৬ I.O.R./N/2/16/385.
১০৭ I.O.R./N/2/20/4.
১০৮ I.O.R./N/2/ বিয়ের তারিখ ৭ ফেব্রুআরি ১৮৫৩। এই বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন টমাস এবং এডওয়ার্ড গ্রীন।

পৃ ১৩৮

১০৯ *Report of the Madras University, 1853.*
১১০ ঐ।

পৃ ১৩৯

১১১ *The Anglo-Saxon and the Hindu* গ্রন্থের ভূমিকা। মাইকেল ১৮৫৪ সালের জুন মাসে পরপর চার সপ্তাহে এই বক্তৃতা করেন। *অ্যাথেনিয়াম* পত্রিকায় এই বক্তৃতার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু যখন ছাপা হয়, তখন চারটি বক্তৃতাই ছাপা হয়েছিলো কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। অন্তত তার কোনো লিখিত প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি। *লেকচার ওয়ান* নামে প্রকাশিত বক্তৃতাটি এতো লম্বা যে, এর মধ্যেই চারটি বক্তৃতা সংকলিত হওয়া অসম্ভব নয়।
১১২ হেনরি কেনরিকের জন্ম তারিখ (১৮১৫) এবং বিয়ের তারিখ (১৮৪০) খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর তারিখ খুঁজে পাইনি। ১৮৫৬ সালের পরবর্তী পত্রপত্রিকায় তাঁর নামও লক্ষ্য করিনি। আবার মাদ্রাসের বেরিয়াল রেজিস্টারেও তাঁর নাম নেই। কিন্তু ১৮৫৭ সালে তাঁর স্ত্রীকে পার্সেবাকুম এলাকায় বাস করতে দেখি। আমার ধারণা, ১৮৫৫ সালে তিনি অন্য কোথাও মারা যান অথবা চলে যান। কয়েক বছর পরে উটকামুন্ডের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হিশেবে জে এইচ কেনরিকের নাম দেখতে পাই। ইনি জন হেনরি কেনরিক হওয়া সম্ভব।

পৃ ১৪৩

১১৩ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১০৮।
১১৪ I.O.R./N/2/36/217.

পৃ ১৪৪

১১৫ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৮৯-৫০।
১১৬ Shipping Intelligence, *Athenaeum*, 19 December 1855.

পৃ ১৪৫

১১৭ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪৪, *HRP*।
১১৮ *মধু-স্মৃতি*, পৃ.৫১-৫২।

পৃ ১৪৬

১১৯ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪৪, *HRP*।

পৃ ১৪৭

১২০ I.O.R./N/2/36/167.
১২১ I.O.R./N/2/36/217.
১২২ I.O.R./N/2/74/65.

পৃ ১৪৮

১২৩ কৌতূহলবশত এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি এবং সম্ভাব্য বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন অমলেন্দু দে। *Michal Madhusudan Datta* (Delhi: Sahitya Akademi,), pp. 90-91. ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এই জল্পনা-কল্পনা শুরু করেন বলে মনে হয়। পৃ. ১৪৫-৪৬।

১২৪ Shipping Intelligence, *Athenaeum*. 29 January 1856.

১২৫ *New Calcutta Directory for 1857* (Calcutta: P. M. Cravenburgh, 1857), Arrivals, Passenger List from Madras, Pt. XI.

মধুচক্র – গৌড়জনে যাহে

পৃ ১৪৯

১ ২৪ মে তারিখের *অ্যাথেনিয়াম* পত্রিকায় দেখতে পাই যে, ১৮ মে তারিখে *নাবিয়া* জাহাজে করে রেভারেন্ড ও মিসেস কেনেট কলকাতা থেকে মাদ্রাসে ফিরে এসেছেন। এই রেভারেন্ড কেনেট বিশপস কলেজে মাইকেলের সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু চার্লস এগবার্ট কেনেট। মাদ্রাসে আশ্রয় এবং চাকরি পেতে তিনি মাইকেলকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি সস্ত্রীককেন কলকাতায় গিয়েছিলেন, তা সঠিক জানা না-গেলেও রেবেকার সঙ্গে কবির বিয়ে ততোদিনে ভেঙে গিয়ে থাকলে তাঁদের পক্ষে আপোশের কথা বলাই স্বাভাবিক।

২ গৌরদাসের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৪৯।

পৃ ১৫০

৩ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪৬ (১৭ ফেব্রুআরি ১৮৫৬), *HRP*।

৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ, *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৪৬৮।

৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভূদেব মুখোপাধ্যায়*, পৃ. ১৩।

পৃ ১৫১

৬ ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রত্যেকটি ইংরেজি পত্রিকাতেই এই বেতনের অঙ্ক দেওয়া হয়েছে। এ ক' বছরে কবির বেতন মোটেই বৃদ্ধি পায়নি।

৭ ভোলানাথ চন্দ্রের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৮২।

৮ *Calcutta Directory for 1857* (Calcutta, 1857), Junior Magistrate's Office. Judicial Clerk, M. M. Dutt, Rs 125.

৯ কৈলাসবাসিনী দেবী, *আত্মকথা* (কলকাতা: হীরক রায়, ১৯৮২), পৃ. ২৭।

১০ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৫৭; *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১২৭।

১১ *Bengal Directory for 1857*, Street Finder.

পৃ ১৫২

১২ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. পৃ. ৫৬।

১৩ মাইকেলকে লেখা গৌরদাস বসাকের চিঠি, ৫ জানুআরি ১৮৫৬, *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৫১।

১৪ *সম্বাদ ভাস্কর*, ২২ নভেম্বর ১৮৫৬, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা: বীক্ষণ, ১৯৬৪) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩৫-৩৬।

পৃ ১৫৩

১৫ *আত্মচরিত*, পৃ. ৬৪-৬৫।

১৬ মন্মথনাথ ঘোষের *কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র* (কলকাতা:) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১০৮।

১৭ *সম্বাদ প্রভাকর* পত্রিকায় এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়। বিনয় ঘোষের *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৬৬। আরও দ্রষ্টব্য আমার লেখা *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ৩৯।

১৮ *আত্মচরিত*, পৃ. ৬৫।

১৯ ঐ, ৬৬।

২০ রাজনারায়ণ এই বক্তৃতা করেন ১৮৭৩ সালে। —যোগেশচন্দ্র বাগল, *রাজনারায়ণ বসু* (২য় সং; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৫), পৃ. ৬৯।

পৃ ১৫৪

২১ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৯৯; *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৩১।

২২ *Athenæum*, 28 June.

২৩ *Athenæum*, 1 July 1851.

২৪ Ibid.

পৃ ১৫৫

২৫ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৬, *HRP*।

২৬ *কুলীনকুলসর্বস্ব* নাটক অভিনীত হয় ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে। তার আগে *শকুন্তলার* অভিনয় হয় ঐ বছরের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে।— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্য-শালার ইতিহাস* (৪র্থ সং; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৮), পৃ. ৩৪, ৩৯।

পৃ ১৫৬

২৭ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪৭ ও ৪৮, *HRP*।

২৮ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪৭, *HRP*।

২৯ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ১৫৯।

৩০ *শর্মিষ্ঠা* নাটকের প্রস্তাবনা-সঙ্গীত।

৩১ গৌরদাস বসাকের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৫৬; *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৬২।

পৃ ১৫৭

৩২ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৬২।

৩৩ ঐ।

পৃ ১৫৮

৩৪ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৪৯, *HRP*।

৩৫ ঐ।

পৃ ১৫৯

৩৬ ঐ।

৩৭ MMD to Keshab Gangooly, পত্রসংখ্যা ৬২, *HRP*।

৩৮ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৬৩।

পৃ ১৬০

৩৯ আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, পিতার তরুণী এবং দ্বিতীয় বিবাহকে কেন্দ্র করে হেনরিয়েটার সঙ্গে পিতার

সম্পর্ক বিষিয়ে গিয়েছিলো। কলকাতায় আসার বছর দুয়েক পরে পিতার মৃত্যুর পরেও হেনরিয়েটা আর মাদ্রাসে যাননি। এমন কি, মাইকেলের চিঠিতেও এর কোনো সরাসরি উল্লেখ নেই।

পৃ ১৬১

৪০ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫০, *HRP*।

৪১ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫১, *HRP*।

পৃ ১৬৩

৪২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫০, *HRP*।

৪৩ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫১, *HRP*।

৪৪ Ibid.

পৃ ১৬৪

৪৫ ইংরেজিতে অনূদিত *রত্নাবলীর* ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

পৃ ১৬৫

৪৬ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫১, *HRP*।

পৃ ১৬৬

৪৭ ঈশ্বর গুপ্তের প্রশস্তিতে কবি এ কবিতা লেখেন ১৮৬৬ সালে। এ কবিতায় তিনি দুঃখ করে লিখেছেন: 'সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে, / মন্দ-বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে / নাহি কিহে জ্যোতি ভাল স্বর্ণের পরশে?' — ঈশ্বর গুপ্ত, *চতুর্দশপদী কবিতাবলি*।

৪৮ I.O.R., Recommendations by the Committtee for Sudder Examination to the Bengal Government, January 1859.

৪৯ Ibid.

৫০ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫১, *HRP*।

৫১ Ibid. অনুবাদের কাজ কবি শুরু করেছিলেন জানুয়ারি মাসে। অনুবাদের প্রথমাংশ পড়ে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১০ ফেব্রুয়ারি কবির কাছে একটি চিঠি লেখেন। *মধু-স্মৃতি* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৫।

পৃ ১৬৭

৫২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫২, *HRP*।

৫৩ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৬৫।

৫৪ *Indian Field*, 25 June 1859. এই পত্রিকার কিছু সংখ্যা ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে আছে। কিন্তু রাজনারায়ণ বসুর লেখা *তিলোত্তমার* সমালোচনা যে-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো, সেটি নেই।

৫৫ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫১, *HRP*।

৫৬ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫২, *HRP*।

পৃ ১৬৮

৫৭ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫১, *HRP*।

৫৮ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫২, *HRP*।

৫৯ মাইকেল মধুসূদনকে লেখা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের চিঠি, *মধু-স্মৃতি* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৮।

৬০ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫২, *HRP*।

পৃ ১৭০

৬১ মাইকেল মধুসূদনকে লেখা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের চিঠি, *মধু-স্মৃতি* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৮।
৬২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৫২, *HRP*।

পৃ ১৭১

৬৩ বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য আমার লেখা *সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* গ্রন্থ, পৃ. ৪০৯-১৮ ও অন্যত্র।

পৃ ১৭২

৬৪ কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলির স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৯০-৯১।
৬৫ MMD to Keshab Gangooly, পত্রসংখ্যা ৬৯, *HRP*।

পৃ ১৭৩

৬৬ কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলির স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৯০-৯১।
৬৭ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৫, *HRP*।
৬৮ MMD to Keshab Gangooly, পত্রসংখ্যা ৭০, *HRP*।
৬৯ MMD to Keshab Gangooly, পত্রসংখ্যা ৫৪, *HRP*।

পৃ ১৭৪

৭০ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে উদ্ধৃত ৪৭৩; *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ৭১।

পৃ ১৭৫

৭১ MMD to Keshab Gangooly, পত্রসংখ্যা ৫৪, *HRP*।
৭২ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৬, *HRP*।

পৃ ১৭৬

৭৩ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৫ ও ৫৬, *HRP*।
৭৪ *বিবিধার্থ সংগ্রহ*, ১৭৮১ শকাব্দ, *মধুসূদন রচনাবলী*তে উদ্ধৃত, পৃ. ঊনত্রিশ।
৭৫ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৭, *HRP*।

পৃ ১৭৭

৭৬ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্মৃতিচারণ, *মধু-স্মৃতি* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৭৩।
৭৭ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৬, *HRP*।
৭৮ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রসঙ্গে', *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা, ২৩ শ্রাবণ ১২৬৭।
৭৯ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', *বিবিধার্থ সংগ্রহ*, অগ্রহায়ণ ১৭৮২ শকাব্দ, *মধু-স্মৃতি* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৮০-৮৩। কবি নিজে এই সমালোচনা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হতে না-পারলেও, রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে এর উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'kind'। MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৬১, *HRP*।

পৃ ১৭৮

৮০ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৭ এবং ৭২, *HRP*।
৮১ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭২, *HRP*। বাল্যবন্ধু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এ মন্তব্য করার কারণ হয়তো এই যে, *এডুকেশন গেজেট* পত্রিকায় *তিলোত্তমাসম্ভবের* যে-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো, তাতে রঙ্গলাল মাইকেলের যথেষ্ট প্রশংসা করতে পারেননি।

পৃ ১৭৯

৮২ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৬, *HRP*।

৮৩ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৭, *HRP*।
৮৪ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৬১, *HRP*।
৮৫ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৭, *HRP*।
৮৬ গ্রন্থাকারে *তিলোত্তমাসম্ভব* প্রকাশের ঠিক আগে মাইকেলের কবিত্ব এবং তাঁর কাব্যের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে রাজনারায়ণ বসু ১ মে এবং ১৯ জুন (১৮৬০) তারিখে দুটি চিঠি লেখেন। - MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৫, *HRP*।
৮৭ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৬, *HRP*।

পৃ ১৮০

৮৮ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৫, *HRP*।
৮৯ IOR, N/1/97/231.

পৃ ১৮১

৯০ MMD to Bysack, পত্রসংখ্যা ৪১, *HRP*।

পৃ ১৮২

৯১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধুসূদন দত্ত*, পৃ. ২৯।
৯২ *বীরাঙ্গনা* কাব্যের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনের সাদৃশ্যের জন্যে পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য – পৃ. ২১৬-২০।

পৃ ১৮৩

৯৩ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ২০।

পৃ ১৮৪

৯৪ এই কবিতা পরবর্তী বিহারীলাল চক্রবর্তী, এমনকি, রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দিতে পারে। এ কাব্যে ছন্দ নিয়েও তিনি বেশ সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এ কবিতায় ছ মাত্রার যে-ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তা সে যুগের পক্ষে অকল্পনীয়।
৯৫ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৫, *HRP*।
৯৬ Ibid.

পৃ ১৮৫

৯৭ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৯, *HRP*।
৯৮ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৭, *HRP*।
৯৯ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৬, *HRP*।
১০০ Ibid.
১০১ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৬১, *HRP*।

পৃ ১৮৬

১০২ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৫, *HRP*।
১০৩ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৬০, *HRP*।
১০৪ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৭, *HRP*।
১০৫ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৬, *HRP*।

পৃ ১৮৭

১০৬ Ibid.
১০৭ IOR/N/2/41/42.
১০৮ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৬, *HRP*।
১০৯ ঐ।

পৃ ১৮৮

১১০ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৯, *HRP*।

১১১ আগেই উল্লেখ করেছি, মাইকেলের জন্ম-সন সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেলেও, জন্ম-তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। ১৩ই জানুয়ারি তারিখে লেখা একটি চিঠিতে বিশপস কলেজের অধ্যক্ষ লিখেছিলেন যে, সেদিন ছিলো মাইকেলের জন্মদিন। তিনি নিজে কোনো চিঠিপত্রে তাঁর জন্মদিনের উল্লেখ করেননি।

পৃ ১৮৯

১১২ MMD to Gangooly, পত্রসংখ্যা ৬২, *HRP*।

পৃ ১৯০

১১৩ Ibid.

১১৪ MMD to Gangooly, পত্রসংখ্যা ৬৩, *HRP*।

১১৫ MMD to Gangooly, পত্রসংখ্যা ৬৪, *HRP*।

১১৬ MMD to Gangooly, পত্রসংখ্যা ৬৭, *HRP*।

পৃ ১৯১

১১৭ MMD to Gangooly, পত্রসংখ্যা ৭০, *HRP*।

১১৮ Ibid.

১১৯ MMD to Gangooly, পত্রসংখ্যা ৬৯, *HRP*।

১২০ এই নাটকের কাহিনীর সঙ্গে বিশেষ করে কৃষ্ণকুমারীর আত্মহত্যার সঙ্গে ইফিজিনিয়ার কাহিনীর মিল আছে, এ কথা জেমস টড তাঁর রাজস্থান কাহিনীতেই উল্লেখ করেন। মাইকেল সেই কাহিনীকেই আরও নাটকীয়তা দান করেন। J. Tod, *The Annals and Antiquities of Rajasthan*, pp. 461-65.

১২১ MMD to Gangooly, পত্রসংখ্যা ৬৪, *HRP*।

পৃ ১৯২

১২২ MMD to Gangooly, পত্রসংখ্যা ৭০, *HRP*।

১২৩ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮২, *HRP*।

১২৪ Ibid.

১২৫ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৬৮, *HRP*।

পৃ ১৯৩

১২৬ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড (সপ্তম সং; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪), পৃ. ১১৭।

১২৭ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৫, *HRP*।

পৃ ১৯৪

১২৮ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭২, *HRP*।

১২৯ Ibid.

১৩০ Ibid.

১৩১ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৬৮, *HRP*।

১৩২ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭২, *HRP*।

পৃ ১৯৫

১৩৩ রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত* (ওরিয়েন্ট, ১৯৮৫ সংস্করণ), পৃ. ৬৮।

১৩৪ ঐ, পৃ. ৭০।
১৩৫ রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিচারণ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৭১।
১৩৬ রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃ. ৭০।
১৩৭ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৫, *HRP*।
১৩৮ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭৪, *HRP*।
১৩৯ Ibid.
১৪০ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭৭, *HRP*।
১৪১ Ibid.
১৪২ Ibid.

পৃ ১৯৬

১৪৩ Ibid.
১৪৪ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি* (কলিকাতা: শিশির পাবলিশিং, ১৯২০), পৃ. ৬৪-৬৫। মাইকেল প্রায়ই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেতেন বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে-দাবি করেছেন, তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কারণ তিনি যখনকার কথা উল্লেখ করেন (মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশের আগে), তখন তাঁর বয়স এগারো। তার চেয়েও বড়ো কথা মাইকেল নিজে তখনকার একটি চিঠিতে লিখেছেন যে, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না এবং শুনেছেন যে, তাঁর এক পুত্র কবি। আর যে-সারদাপ্রসাদের সূত্র ধরে মাইকেল জোড়াসাঁকোতে 'প্রায়ই আসিতেন' বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাবি করেছেন, তাঁর পুরো নামও মাইকেল ভালো করে জানতেন বলেও মনে হয় না। তিনি সারদাপ্রসাদের উল্লেখ করে লিখেছেন 'কী একজন গাঙ্গুলি – তোমার বন্ধু দেবেন্দ্রনাথের জামাতা।'
১৪৫
১৪৬ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৪, *HRP*।

পৃ ১৯৮

১৪৭ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭৪, *HRP*।
১৪৮ Ibid.
১৪৯ *Indian Field* পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে আছে। কিন্তু এই সমালোচনা যে-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, সেটি নেই। এটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। শেষ সপ্তাহে লেখা একটি চিঠিতে কবি এ জন্যে রাজনারায়ণকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। কিন্তু কোনো উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেননি। (MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭৭, *HRP*।)
১৫০ রাজনারায়ণ বসু, 'মেঘনাদবধ সমালোচনা', বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড (১৮৮২), দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ সম্পাদিত *মধুসূদন: সাহিত্য প্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব* (কলকাতা: পুথিপত্র, ১৯৮৬) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৫-১৬।
১৫১ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৬, *HRP*। Also see পত্রসংখ্যা ৫৭, *HRP*।

পৃ ১৯৯

১৫২ রাজনারায়ণ বসু, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা* (কলিকাতা: নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩৫ [১৮৭৮], পৃ. ৩৪-৩৫।
১৫৩ রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, পৃ. ৬৯।
১৫৪ রাজনারায়ণ বসু, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা*, পৃ. ৩৪-৩৬।
১৫৫ ঐ।
১৫৬ ঐ, পাদটীকা,।
১৫৭ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭৪, *HRP*।

পৃ ২০০

১৫৮ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৫, *HRP*।

১৫৯ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮২, *HRP*।

১৬০ Ibid.

পৃ ২০১

১৬১ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭৪, ৮১, ৮২, ৮৩ ও ৮৪, *HRP*।

১৬২ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮১, *HRP*।

১৬৩ MMD to Bysack, পত্রসংখ্যা ৭৯, *HRP*।

১৬৪ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮১, *HRP*। ৮২ সংখ্যক পত্রেও মামলায় অগ্রগতি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন।

১৬৫ বিচারে ৬ জুন তারিখে ম্যানুয়েলের জরিমানা হয়েছিলো। এই মামলার রায় দেওয়া হয় ৯ জুন (১৮৬১) তারিখে। জেমস লঙ তাঁর বিবৃতি দেন ২৭ জুন তারিখে। তাঁর বিচার ১৮ই জুলাই তারিখে আরম্ভ হয়ে ২৪শে জুলাই তারিখে শেষ হয়। দ্রষ্টব্য: *Trial of Rev. James Long for the Publication of the 'Nil Darpan'* (London: James Ridgway, 1861).

১৬৬ G. A. Oddie, *Social Protest in India* (Delhi: Manohar, 1979), p. 174.

পৃ ২০২

১৬৭ James Long to Parent Committee, 15 Aug. 1861, Birmingham University, James Long Papers, CMS, CI 1/0/185/1-154.

১৬৮ James Long to Parent Committee, 5 Mar. 1862, CI 1/0/185/1-154.

১৬৯ James Long to Parent Committee, 15 Aug. 1861 and Seton Kerr's letter to J. Long, CI 1/0/185/1-154.

১৭০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ মন্তব্য করেছেন তাঁর 'রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' প্রবন্ধে। সুপ্রিম কোর্টে মাইকেল কখনো চাকরি করেননি। সুতরাং তাঁর চাকরি চলে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তা ছাড়া, তিনি *নীলদর্পণ* অনুবাদ করে থাকলেও, তা করেছেন সরকারী আশীর্বাদ নিয়ে। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই এ মন্তব্য করেছিলেন।

১৭১ Sir Bartle Frere's letter to J. Long, 18. 7. 61, CI 1/0/185/1-154.

পৃ ২০৩

১৭২ IOR, N/1//101/38.

১৭৩ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৫, *HRP*।

১৭৪ পাইকপাড়ার রাজারা অন্তত তিনবার তাঁকে অর্থ সাহায্য করেন। প্রথমবার বেশ দরাজ হাতে টাকা দেন *রত্নাবতী* অনুবাদ করার জন্যে, দ্বিতীয়বার বাংলা এবং ইংরেজি *শর্মিষ্ঠার* জন্যে এবং তৃতীয়বার মাইকেলকে দেনামুক্ত করার জন্যে। প্রহসন ছাপানোর খরচও দেন তাঁরা। গৌরদাস বসাককে লেখা ৩ মে ১৮৫৯ তারিখের চিঠিতে এ রকম অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (পত্রসংখ্যা ৫২, *HRP*।)

পৃ ২০৪

১৭৫ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৬, *HRP*।

১৭৬ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৩, *HRP*।

১৭৭ *Indian Field*, 3 Aug., 1861.

১৭৮ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৫, *HRP*।

১৭৯ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৯, *HRP*।

১৮০ Ibid.

পৃ ২০৫

১৮১ যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত পঙক্তি হলো: কবিরে পাবে না তাঁহার জীবনচরিতে।

১৮২ Henry James quoted in L. Idel, *Writing Lives: Principia Biographica* (London: W. W. Norton & Co., 1987), p. 140.

১৮৩ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭২, *HRP*।

পৃ ২০৬

১৮৪ W. Radice, "Xenophilia and xenophobia: Michael Madhusudan Datta's Meghnad-badh Kabya" in R. Snell and I. M. P. Raeside (eds.), *Classics of Modern South Asian Literature*. Harrassowitz Velag: Wiesbaden, 1998.

পৃ ২০৮

১৮৫ C. Seely, "Homeric Similes, Occidental and Oriental: Tasso, Milton and Bengal's Micheal Madhusudan Dutt", *Comparative Literature Studies*, Vol. 25, No. 1 (1988), pp. 35-54.

পৃ ২০৯

১৮৬ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৫৫, *HRP*।

১৮৭ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮২, *HRP*।

১৮৮ Ibid.

১৮৯ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা [illegible], *HRP*।

পৃ ২১১

১৯০ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৩, *HRP*।

১৯১ Ibid.

১৯২ MMD to Gangooly, পত্রসংখ্যা ৭০, *HRP*।

১৯৩ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৩৪২। 'আত্মবিলাপ' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের (শকাব্দ ১৭৮৩) আশ্বিন সংখ্যা *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়*। এতে রচয়িতার নাম ছিলো না।

পৃ ২১২

১৯৪ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮১, *HRP*।

১৯৫ Ibid.

পৃ ২১৩

১৯৬ এই বই-এর সংযোজন এবং সংযোজনের ১৮ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

পৃ ২১৫

১৯৭ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৬, *HRP*।

১৯৮ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৭, *HRP*।

১৯৯ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮১, *HRP*।

পৃ ২১৭

২০০ L. Idel, *Writing Lives: Principia Biographica*, p. 136.

পৃ ২২০

২০১ তাঁর সমালোচকদের উত্তরে তিনি কেবল অন্ত্যমিল দিয়েই *ব্রজাঙ্গনার* কবিতা লিখলেন না, তিনি এতে

ছন্দের এতো সফল এবং গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষানিরীক্ষা করলেন যে, তাকে অমিত্রাক্ষরের চেয়ে কম কৃতিত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। – সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪। তা ছাড়া কয়েক বছর পরে *চতুর্দশপদী কবিতাবলি*তেও অত্যন্ত সফলভাবে অন্ত্যমিল ব্যবহার করেন।

২০২ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৩, *HRP*।

পৃ ২২১

২০৩ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৩, *HRP*। আরও দ্রষ্টব্য: পত্রসংখ্যা ৫৬, ৮১ ও ৮৭।

২০৪ *New Calcutta Directory. 1859-62* (Calcutta, 1859-62) আইন অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পৃ ২২২

২০৫ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মনোমোহন ঘোষ বিলেত যাত্রা করেন ১৮৬২ সালের ২৩শে মার্চ। তাঁদের যাত্রা উপলক্ষে *Hindoo Patriot* পত্রিকা মন্তব্য করে, 'We trust many more will follow their example.' - *Hindoo Patriot*, 24 March 1862.'। মনে হয় তাঁদের যাত্রার বেশ আগে থেকেই এ বিষয় নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিলো। জেমস লঙ মাদ্রাস থেকে এর আগেই লন্ডনে প্যারেন্টস কমিটিতে লেখা চিঠিতে জানিয়েছিলেন। তবে তাতে মনোমোহন ঘোষের নাম ছিলো না। J. Long to Parent Committee, 28. 2. 1862, CI 1/0/185, 1-154.

২০৬ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৭, *HRP*।

২০৭ Ibid.

পৃ ২২৩

২০৮ Vender 289, Book CH, Vol. 7, pp. 402-03 (1861). এই দলিলের পুরো পাঠের জন্যে দ্রষ্টব্য: গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'মাইকেল ও বিদ্যাসাগর', *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, পৃ. ৯৭২-৭৩।

২০৯ ঐ, পৃ. ৯৭৩-৭৪।

২১০ দলিলে বলা হয়েছে: 'আমার পিসতুত ভ্রাতা এবং বাল্যকাল অবধি আমার পিতার প্রতিপালনাধীন ছিলেন।' – ঐ পৃ. ৯৭৪।

২১১ ভার্সাই থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কবি যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে বেশ কয়েকটিতেই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই সম্পত্তির বাৎসরিক খাজনা ছিলো ১৫০০ টাকা।

২১২ তখন এ বাড়ির মালিক বাল্যবন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বাড়িতেই হরিমোহন এবং তাঁর দুই ভাই – গণেশচন্দ্র ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছেলেবেলায় কবির বন্ধুত্ব হয়েছিলো। সুতরাং বাল্য ও প্রথম যৌবনের স্মৃতি-বিজড়িত সেই বাড়িতে গিয়ে নস্টালজিক মনোভাব জেগে ওঠা স্বাভাবিক।

পৃ ২২৪

২১৩ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'মাইকেল ও বিদ্যাসাগর', *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, পৃ. ৯৬৯-৭০। এই দলিলে তিনি লিখে দিয়েছিলেন যে, এই বাড়ি থেকে হরিমোহন বেদখল হলে, তিনি তাঁকে সাড়ে ন হাজার টাকা প্রদান করবেন।

২১৪ দলিল সংখ্যা ২ ও ৩, ঐ, পৃ. ৯৬৯।

২১৫ বিদ্যাসাগকে লেখা কবির চিঠি থেকে (২ জুন ১৮৬৪), পত্রসংখ্যা ১০২, *HRP*।

২১৬ ঐ।

২১৭ বিদ্যাসাগকে লেখা কবির চিঠি থেকে (২ জুন ১৮৬৪), পত্রসংখ্যা ৯৪, *HRP*।

২১৮ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৭, *HRP*। সাগর দত্ত ও মধুসূদন মজুমদারের কাছ থেকে ধারের কথা জানা যায় বিদ্যাসাগকে লেখা কবির চিঠি থেকে (২ জুন ১৮৬৪), পত্রসংখ্যা ৯৪, *HRP*। গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'মাইকেল ও বিদ্যাসাগর', *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, পৃ. ৯৬৯-৭০। দলিলের তারিখ ২ জুন ১৮৬২।

পৃ ২২৫

২১৯ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৭, *HRP*।

২২০ কবিকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্র, *মধু-স্মৃতি* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৫৪।

২২১ ঐ।

পৃ ২২৬

২২২ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৮, *HRP*।

২২৩ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৭, *HRP*।

২২৪ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৯, *HRP*।

২২৫ ঐ।

পৃ ২২৭

২২৬ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা', দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ সম্পাদিত *মধুসূদন: সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৬-৩১।

২২৭ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৯।

২২৮ Lord Byron, 'Child Harold's Pilgrimage', Canto the First, IV, *Child Harold's Good Night.*

পৃ ২২৮

২২৯ গৌরদাস বসাক তখন বহরমপুর এবং মুরশিদাবাদে ষষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে কাজ করছিলেন। বন্ধুর বিদায়ের আগে আসতে পেরেছিলেন কিনা, তার কোনো খবর পাওয়া যায় না।

প্রবাসে দৈবের বশে

পৃ ২২৯

১ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১১২।

২ *Madras Almanac, 1863. Candia* (Capt. N. Stewart) left Madras for Galle, Aden & Suez on 14th June 1862 at night.

পৃ ২৩০

৩ ঐ।

৪ *Lloyd's List* (London), 17 July 1862.

পৃ ২৩১

৫ সম্ভবত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলেবেলা থেকে হরিচরণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিলো। তা ছাড়া, কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁর কাছে পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করেছিলেন। সপ্তাহ আগে তাঁর কাছে পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করেছিলেন।

৬ সরকারী কাগজপত্র অনুযায়ী হাইকোর্ট শুরু হয় ১৮৬২ সালের পয়লা জুলাই। কিন্তু বিচারপতিরা শপথ গ্রহণ করেন ৯ই জুলাই।

৭ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৯০, *HRP*।

পৃ ২৩২

৮ *Lloyd's List* (London), 19 July 1862.

৯ সত্যেন্দ্রনাথ এবং মনোমোহন বসু কোন ঠিকানায় থাকতেন, তা পরিষ্কার নয়। কিন্তু পরে মাইকেল মনোমোহন বসুকে যে-চিঠি লেখেন, তা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, তাঁরা একই জায়গায় ছিলেন। পত্রসংখ্যা ৯১, *HRP*।

১০ *Register of Admission to Gray's Inn, 1522-1889*, J. Forster, ed. (London: The Hansard Publishing Union, 1889), p. 479.

১১ Staff List, Gray's Inn, 1862, Gray's Inn Library.

পৃ ২৩৩

১২ *Register of Admission to Lincoln's Inn*, J. Forster (ed.) (London: Hansard Publishing Union, 1889). জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ভর্তি হন ১৮৫৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর।

১৩ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ব্যারিস্টার হন ১৮৬২ সালের ১১ই জুন। আর মনোমোহন ঘোষ ৬৬ সালের ৬ই জুন।

পৃ ২৩৪

১৪ MMD to Manomohan Ghosh, পত্রসংখ্যা ৯১, *HRP*।

পৃ ২৩৫

১৫ ঐ।

১৬ MMD to Manomohan Ghosh, পত্রসংখ্যা ৯২, *HRP*।

১৭ পত্রসংখ্যা ৯৩, *HRP*।

পৃ ২৩৬

১৮ ঐ।

পৃ ২৩৭

১৯ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১০২, *HRP*।

২০ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ৯৪, *HRP*।

পৃ ২৩৮

২১ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ৯৬, *HRP*।

২২ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১০২, *HRP*।

পৃ ২৩৯

২৩ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৮, *HRP*।

২৪ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ. ১৮০।

২৫ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১০৪, *HRP*।

পৃ ২৪০

২৬ দলিলের তারিখ ৭ই জুন, ১৮৬২। গিরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 'মাইকেল ও বিদ্যাসাগর', পৃ. ৯৬৯।

২৭ এ দলিলের পুরো পাঠের জন্যে দ্রষ্টব্য: ঐ, পৃ. ৯৭৩-৭৪।

২৮ হেনরিয়েটা বিলেত যাত্রা করার আগের দিন মহাদেব তাঁকে ১২০০ টাকা দেন। MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১০২, *HRP*।

২৯ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ৯৪, *HRP*।

পৃ ২৪২

৩০ *H. Mayhew, London Labour and the London Poor (L. Griffin, Bohn & Co., 1981).*

৩১ J. Salter, *The Asiatics in England* (London: Seely, Jackson & Halliday, 1873).

৩২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১০৪, *HRP*।

৩৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*, ৩ ও ১৩ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

৩৪ J. Long to Parent Committee, Church Missionary Society Papers, Birmingham University, CI, 1/0/185/1-154, 28. 2. 1862. অন্য এক পত্রে লিখেছেন দিগম্বর মিত্রের পুত্রের কথা।

পৃ ২৪৩

৩৫ Gray's Inn Records, Extract form the Pension Minutes, 22. 12. 1863, quoted in a letter to W. Radice by the Librarian of the Gray's Inn Library and printed in সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ. ১৯৫।

৩৬ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ১৬৪।

৩৭ এই ভ্রমণ-কাহিনীটি পড়ি ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে। এটি ১৮৫০ অথবা ১৮৬০-এর দশকে প্রকাশিত হয়।

পৃ ২৪৪

৩৮ (Versailles) Aux Archives Departmentales des Yvelines, Document on Charity, 1863-64. যারা দাতব্য তহবিল থেকে সাহায্য নিয়েছিলো, তাদের কয়েকজনের নাম এবং বয়সও এই দলিলে দেওয়া আছে। Denis Fleury (48), Emily Fleury (18), Lion Fleury (14), Cloudine Mathius (39), L. Masson (12), J. Martin (13) and Augustus Martin (47).

৩৯ MMD to M. Ghosh, পত্রসংখ্যা ১০৫, *HRP*।

পৃ ২৪৫

৪০ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১০৪, *HRP*।

পৃ ২৪৬

৪১ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ৯৪, *HRP*।

পৃ ২৪৭

৪২ Gray's Inn Records, Extract form the Pension Minutes, 22. 12. 1863, quoted in a letter to W. Radice by the Librarian of the Gray's Inn Library and printed in সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ. ১৯৫।

৪৩ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ৯৪, *HRP*।

৪৪ পুলিশ অফিসে কবির সহকর্মী। পরে ইনি আইন বিষয়ে একটি বই লিখেছিলেন।

৪৫ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ৯৯, *HRP*।

পৃ ২৪৮

৪৬ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ৯৬, *HRP*।

৪৭ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ১৬৫।

৪৮ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৪, *HRP*।

পৃ ২৫২

৪৯ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৪, *HRP*।

৫০ MMD to Bysack, পত্রসংখ্যা ১০৪, *HRP*।

৫১ Versailles Municipal Archives, Ecclesiastical Document, no. 671, dated 3. 8. 1864. এতে বলা হয়: Amelia Henrietta White, aged 27 years, wife of Michel [sic] Madhusudan Dutt, barrister, with whom she lives at 12 rue de Shantiers, gave birth to a female child todayat 6 o'clock in the morning and she was presented dead at the Alderman / Deputy Mayor... [my translation]

পৃ ২৫৩

৫২ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১০১, *HRP*।

৫৩ Ibid.

৫৪ Ibid.

৫৫ Ibid.

পৃ ২৫৪

৫৬ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৬, *HRP*।

৫৭ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১০২, *HRP*।

পৃ ২৫৫

৫৮ Ibid.

৫৯ Ibid.

৬০ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১০২, *HRP*।

পৃ ২৫৬

৬১ কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি মূল ইটালীয় ভাষায় ত্যাসো পড়ছেন বলে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন। MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৭২, *HRP*।

পৃ ২৫৭

৬২ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১০৩, *HRP*।

৬৩ Ibid. কবি যখন এ চিঠি লেখেন (৩ অক্টোবর ১৮৬৪) সত্যেন্দ্রনাথ তখনো ফিরে আসেননি। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, যখন বিদ্যাসাগর তাঁর চিঠি পাবেন, ততোদিনে সত্যেন্দ্রনাথ পৌঁছে যাবেন। সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় কবে ফিরে আসেন, সে তারিখ নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। কিন্তু তিনি অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফিরে আসেন বলে মনে করা হয়। — অমিতা ভট্টাচার্য, *সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর: জীবন ও সৃষ্টি* (কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৬), পৃ. ১৮-১৯।

পৃ ২৫৮

৬৪ MMD to Bysack, পত্রসংখ্যা ১০৪, *HRP*।

৬৫ MMD to M. Ghosh, পত্রসংখ্যা ১০৫, *HRP*।

পৃ ২৫৯

৬৬ গৌরদাস বসাককে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ২১শে মার্চ ১৮৬৫ তারিখের একটি পত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি কবির কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ সোমের *মধু-স্মৃতি* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৮১।

পৃ ২৬০

৬৭ MMD to Bysack, পত্রসংখ্যা ১১২, *HRP*।

পৃ ২৬১

৬৮ Ibid.

পৃ ২৬৪

৬৯ C. Pichois, *Baudlaire* (London: Hamish Hamilton, 1989), pp. 232-35.

পৃ ২৬৬

৭০ Baudlaire''s letter to Mme Aupick, 27 March 1852, quoted in *Ibid.*, p. 199.
৭১ একজন জীবনীকারের মতে, তিনি টেনিসন এবং ভিক্টর উগোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। - মধু-স্মৃতি, পৃ. ১৯৩। এটা একেবারেই ভিত্তিহীন।

পৃ ২৬৯

৭২ MMD to Bysack, পত্রসংখ্যা ১১২, *HRP*।
৭৩ মধু-স্মৃতি, পৃ. ১৮৪, *HRP*।

পৃ ২৭০

৭৪ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ. ১৮০।

পৃ ২৭২

৭৫ মূল সনেটটি ইটালি থেকে উদ্ধার করেন ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত।

পৃ ২৭৩

৭৬ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১০৯, *HRP*।
৭৭ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১০৯, *HRP*।

পৃ ২৭৪

৭৮ Ibid.
৭৯ MMD to M. Ghosh, পত্রসংখ্যা ১০৫, *HRP*।

পৃ ২৭৫

৮০ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১০৯, *HRP*।
৮১ Ibid.
৮২ Ibid.

পৃ ২৭৬

৮৩ MMD to Bysack, পত্রসংখ্যা ১১২, *HRP*।
৮৪ Ibid.

পৃ ২৭৮

৮৫ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১১, *HRP*।
৮৬ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৩, *HRP*।
৮৭ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৪, *HRP*।
৮৮ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১০, *HRP*।

পৃ ২৭৯

৮৯ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৩, *HRP*।

৯০ Ibid.

৯১ যে-রোম্যান ক্যাথলিক বিশপের কথা মাইকেল উল্লেখ করেছেন, তার নাম ড. টমাস অলিফ।

৯২ মাইকেল কমিটির সদস্যদের দুর্গন্ধওয়ালা বদমাশ বলে বর্ণনা করলেও, লর্ড ডি গ্রে ছিলেন জর্জ ফ্রেডারিক স্যামুয়েল রবিনসন, ফার্স্ট মার্কুইস এবং সেকেন্ড আর্ল অব রিপন। কবি মারা যাওয়ার সাত বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষে আসেন ভাইসরয় হিশেবে। যখনকার কথা মাইকেল লেখেন, তখন রিপন ছিলেন পার্লামেন্টের সদস্য এবং ভাইকাউন্ট গোডেরিচ উপাধিতে ভূষিত। ১৮৫৯ সালে তিনি ইংল্যান্ডের এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পিতার উপাধি আর্ল অব রিপন পদবী উত্তরাধিকার হিশেবে লাভ করেন।

৯৩ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৬, *HRP*।

পৃ ২৮০

৯৪ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ১৯৬। এ হিশেব মাইকেল নিজেই ১৮৬৬ সালের ১৭ই জানুয়ারির চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হিশেবেই ভুল ছিলো।

৯৫ বিদ্যাসাগরকে লেখা অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চিঠি (৮. ৪. ১৮৬৭), গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ. ৯৬৯।

৯৬ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১০৩, *HRP*।

পৃ ২৮১

৯৭ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৯, *HRP*। রানী স্বর্ণময়ীর এই সরকারের নাম রাজীবলোচন রায়। কয়েক বছর পরে কবি আবার এঁর সহায়তা লাভের জন্যে বিদ্যাসাগরের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

৯৮ কবি একাধিক চিঠিতে ঈশ্বরচন্দ্র বসুর কথা উল্লেখ করেন। এর মধ্যে ৯ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে লেখা চিঠিতে লিখেছেন যে, বই-এর রয়্যাল্টি বাবদ ১৮৬৬ সালের প্রথমার্ধে পাওয়া গিয়েছিলো এক হাজার টাকা।

পৃ ২৮২

৯৯ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৩, ১২৫, ১২৬, *HRP*।

পৃ ২৮৪

১০০ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৮, *HRP*।

১০১ General Register Office (Catherine House, London), Document No. 339, dated 29. 6. 1866, Pancras, Middlesex. এটি ক্ষেত্রমোহন দত্তের বিয়ের দলিল।

১০২ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৮, *HRP*।

১০৩ Ibid.

পৃ ২৮৫

১০৪ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৯, *HRP*।

১০৫ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৮, *HRP*। ১২৪ এবং ১২৮ সংখ্যক চিঠিতেও ক্ষেত্রমোহন সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য আছে।

১০৬ General Register Office (Catherine House), Document No. 339, dated 29. 6. 1866, Pancras, Middlesex.

১০৭ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৪, *HRP*।

১০৮ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৭, *HRP*। অন্তত তিনটি চিঠির বয়ান থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষেত্রমোহন সম্পর্কে কবির মনে অনেক অভিযোগ ছিলো। গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠিতে (১১২ সংখ্যক) ক্ষেত্রমোহনের নাম নেই, কিন্তু যে-ব্যক্তির উল্লেখ আছে, তাঁর পক্ষে ক্ষেত্রমোহন হওয়া

অসম্ভব নয়।

১০৯ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৮, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬ এবং ১২৮, *HRP*।

১১০ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৮, *HRP*।

পৃ ২৮৬

১১১ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২১, *HRP*।

১১২ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৫, *HRP*।

পৃ ২৮৭

১১৩ Ibid.

১১৪ Ibid.

১১৫ Ibid.

পৃ ২৮৮

১১৬ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৬, *HRP*।

১১৭ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৭, *HRP*।

১১৮ *Census Report, 1861.*

পৃ ২৮৯

১১৯ *London Postal Directory, 1861.*

১২০ *London Postal Directory, 1879 & Census Report, 1881.* রবীন্দ্রনাথ থাকতেন ডক্টর জন স্কটের বাড়িতে, ১০ নম্বর ট্যাভিস্টক স্কোয়ারে। এ নিয়ে আমার প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও তিন নারী'তে বিস্তারিত তথ্য আছে। *দেশ*, ১৭ নভেম্বর, ২০০২।

পৃ ২৯০

১২১ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৭, *HRP*।

১২২ Ibid.

১২৩ Ibid.

পৃ ২৯১

১২৪ MMD to Bysack, পত্রসংখ্যা ১০৪, *HRP*।

১২৫ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৫, *HRP*।

১২৬ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৭, *HRP*।

১২৭ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৫, *HRP*।

পৃ ২৯২

১২৮ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৫, *HRP*।

১২৯ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৮, *HRP*।

পৃ ২৯৪

১৩০ Ibid.

১৩১ Ibid.

কি যন্ত্র লভিনু হায়

পৃ ২৯৫

১ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১৩৭, *HRP*।

২ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১৩০, *HRP*।

পৃ ২৯৬

৩ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৮, *HRP*।

৪ *New Calcutta Directory for 1862,* 'Street Finder'.

৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* (৪র্থ সং; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৫), পৃ. ৭৪।

পৃ ২৯৭

৬ বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর* (দ্বিতীয় ওরিয়েন্ট সং; কলকাতা: ১৯৯১, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫), পৃ. ২৬৭।

পৃ ২৯৮

৭ *Bengal Directory for 1867,* 'Law'.

৮ MMD to Sir Barnes Peacock, Cheif Justice, 30-1-1867, পত্রসংখ্যা ১২৯; *HRP*।

৯ হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিশেবে যোগ দেওয়ার অনুমতি চেয়ে তিনি যে-আবেদন করেছিলেন, তাতে প্রথমেই জুড়ে দিয়েছিলেন দিগম্বর মিত্রের শংসাপত্র। বিদ্যাসাগরকে মার্চ মাসে যে-চিঠি লিখেছিলেন (পত্রসংখ্যা ১৩০, *HRP*) তাতে দিগম্বর মিত্র সম্পর্কে কোনো তিক্ততা নেই।

পৃ ২৯৯

১০ মাইকেলের আবেদন করা থেকে আরম্ভ করা থেকে আইন ব্যবসা করার অনুমতি পাওয়া পর্যন্ত বিচারপতিদের মধ্যে যেসব আদানপ্রদান হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ আছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত একটি নথিতে। "Documents in connection with application of Michael Madhusudan Dutt", R319, Victoria Memorial, Calcutta.

১১ Justice J. B. Phear to Peacock, ঐ।

১২ Justice Norman to Peacock, ঐ।

১৩ ঐ।

১৪ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১৩০, *HRP*।

পৃ ৩০০

১৫ Ibid.

১৬ "Documents in connection with application of Michael Madhusudan Dutt", R3197, Victoria Memorial, Calcutta. Also see MMD's letters nos. 131 and 132 in *HRP*.

পৃ ৩০১

১৭ MMD to M. Ghosh, পত্রসংখ্যা ৯৩, *HRP*।

পৃ ৩০২

১৮ *Bengal Directory for 1868,* 'Law'

পৃ ৩০৩

১৯ মদ দিয়ে বন্ধুদের আপ্যায়নের ব্যাপারে তাঁর বিলাসিতার কথা তাঁর জীবনীকারেরা সবাই কমবেশি উল্লেখ করেছেন। কেউ গেলেই নাকি তিনি ভৃত্যকে "Give him a peg" বলে আদেশ দিতেন।

২০ যেমন, পত্রসংখ্যা ১৩৪। নিজেই বিদ্যাসাগরের কাছে লিখেছেন যে, গলার এবং অন্য অসুখের কারণে শয্যাগত। তা ছাড়া ১৮৭১ সালে *হেক্টর*-বধের ভূমিকায় লিখেছেন যে, প্রায় চার বছর আগে অসুস্থতার কারণে যখন কোনো কাজ করনতে পারেননি, তখন এই গ্রন্থ রচনা করেন।

পৃ ৩০৪

২১ Onoocul Mukherji to Vidyasagar, 8. 4. 1867. গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, ৯৬৯।

২২ *সম্বাদ প্রভাকর* পত্রিকায় বিয়ের সময়ে বলা হয় যে, টাকার লোভে এবং রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হওয়ার আশায় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবাকে বিয়ে করতে রাজি হন। —বিনয় ঘোষের *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৬৬। কিন্তু এই তথ্য ঠিক নয়। শ্রীশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পান বিয়ের এক বছর আগে। তদুপরি, মনে রাখা যেতে পারে যে, তিনি বিয়ে করেছিলেন মায়ের হুমকি সত্ত্বেও। তাঁর মা ভয় দেখিয়েছিলেন যে, শ্রীশচন্দ্র বিয়ে করলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। আমার লেখা *সমাজ সংস্কার ও বাংলা নাটক* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৯-৪০।

পৃ ৩০৫

২৩ বর্ধমান থেকে মাইকেলকে বিদ্যাসাগর এই চিঠি লেখেন আনুমানিক ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে।

২৪ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১৩৩, *HRP*।

২৫ Ibid, পত্রসংখ্যা ১৩৪, *HRP*।

২৬ পত্রসংখ্যা ১৩৩, *HRP*।

পৃ ৩০৬

২৭ দলিল নম্বর ১২, গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ. ৯৭০-৭১।

২৮ গৌরদাস বসাকের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৬৩।

২৯ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১৩৪, *HRP*।

পৃ ৩০৭

৩০ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১৩৭, *HRP*।

৩১ Versailles Municipal Archives, Ecclesiastical Document, no. , dated 25. 4. 1867.

৩২ পত্রসংখ্যা ১৩৭, *HRP*।

৩৩ ঐ।

পৃ ৩০৮

৩৪ মাইকেলকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি, তারিখ ৩ মার্চ ১৮৬৮।

৩৫ বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, পৃ. ২৯১।

পৃ ৩০৯

৩৬ বিদ্যাসাগর প্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি করেন আট হাজার টাকায়। - বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, পৃ. ২৯১।

৩৭ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১৩৮, *HRP*।

পৃ ৩১০

৩৮ এ মামলার বাদী ছিলেন গোপীকৃষ্ণ গোসাঁই, বিবাদী গঙ্গাপ্রসাদ গোসাঁই। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য:

Bengal Law Reports, Vol. IV, 18679-70, ed. by H. Cowell and L. A. Goodeve (Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1870).

৩৯ জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে ছাত্র ছিলেন, তখন পড়ুয়া ছাত্র হিশেবে জ্ঞানেন্দ্রমোহন মধুসূদনের তুলনায় ভালো ফলাফল করতেন। ১৮৪২ সালের অক্টোবর মাসে মধু যে-শেষ পরীক্ষায় অংশ নেন, তাতে ইংরেজিতে ৫০এর মধ্যে মধু পেয়েছিলেন ৩০ নম্বর, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র পেয়েছিলেন ৪৯। মধু পেয়েছিলেন ৮ টাকার জুনিয়র স্কলারশিপ, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র ৩০ টাকার সিনিয়র স্কলারশিপ। - *General Report on Public Instruction in the Bengal Presidency for 1842-43* (Calcutta: G. H. Huttman, B. M. Orphan Press, 1843), p. vi.

৪০ এ মামলার বিবাদী ছিলেন উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর দৌহিত্র/দৌহিত্রাদের প্রত্যেকের জন্যে যথাক্রমে ৫০ হাজার এবং ২৫ হাজার টাকা রেখে যান। পিতৃব্য হরিমোহন ঠাকুরের পুত্রদের দেন ৬০ হাজার টাকা। ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন, সুবোধমোহন এবং ললিতমোহন ঠাকুর এবং তাঁদের জীবিত এবং ভাবী সন্তানদের জন্যেও অর্থ বরাদ্দ করেন। তাঁর কর্মচারীদেরও অর্থ দান করে যান। Ganedro Mohun Tagore Vs Upendo Mohun Tagore, in *The Bengal Law Reports*, Vol. IV, 1869-70, ed. by H. Cowell and L. A. Goodeve, pp. 103-28. Also see *The Bengal Law Reports*, Vol. IX, 1872 (Calcutta: Thacker, Spink & Co, 1872), pp. 377-416.

৪১ কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিকে ১০ হাজার, কলকাতা নেটিভ হসপিটালকে ১০ হাজার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক পদের জন্যে ১০ হাজার টাকা রেখে যান।

৪২ এই আইনজীবীদের নাম: M. Wylie, A. G. Macpherson, C. W. Hatch and J. C. Michael.

পৃ ৩১১

৪৩ *The Bengal Law Reports*, Vol. IV, 1869-70, pp. 107-08.

৪৪ Ibid., pp. 127.

৪৫ Ibid., pp. 112-28.

৪৬ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৪৬, *HRP*।

৪৭ *Englishman*, 23 March 1869.

৪৮ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২১৫। যোগীন্দ্রনাথের মতে, এক থেকে দেড় হাজার টাকা, *মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৩১২।

৪৯ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২০৩।

পৃ ৩১২

৫০ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৪৮, *HRP*।

৫১ গৌরদাস বসাক ১০ অগস্ট ১৮৬৯ তারিখে খুলনা থেকে কবিকে যে-চিঠি লেখেন, তা তেকে এই মনোভাব বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এতে তিনি লেখেন: I suppose your business leaves you little time for poetry; nothing will gladden me more than to hear your roaring success at the Bar like that of Dwarky, Sumboo or Ramapersaud. You have a greater genius and ought to take the shine out of them. - *মধু-স্মৃতি* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৩৫।

৫২ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৪৬, *HRP*।

৫৩ MMD to Vidyasagr, পত্রসংখ্যা ১৩৯, *HRP*।

৫৪ *Thacker's Bengal Directory, 1868* (Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1868), "Law Section."

পৃ ৩১৩

৫৫ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২১৩।

৫৬ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২১৩। *Hindoo Patriot* পত্রিকায় তাঁর ব্যারিস্টারি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়: nursed on the lap of poetry, he was not the man to suck the moisture of life from the dry bones of law. – *মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪১২।

৫৭ Street to Fagan, 23. 7. 1847, SPG Papers, C. Ind. 1/13/134.

পৃ ৩১৪

৫৮ *মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪১৭।

৫৯ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২১৫।

৬০ হেনরিয়েটা ভীয়েপে যে-হোটেলে ছিলেন, সেখানকার একটি বিল রক্ষা পেয়েছে এবং এই অসাধারণ বিলটির বয়ান নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর মধুস্মৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। (পৃ. ২০০) তা থেকে হেনরিয়েটা কিভাবে ছুটি কাটাতেন - সে সম্পর্কে আগ্রহব্যঞ্জক তথ্য পাওয়া যায়।

৬১ ঐ।

পৃ ৩১৫

৬২ উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি এ সময়ে তাঁকে ৮ পাউন্ড দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

৬৩ অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তিকে লেখা হেনরিয়েটার পত্র, তারিখ ১৩. ৩. ১৮৬৯, *মধুস্মৃতি* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৩৪।

৬৪ হেনরিয়েটার পত্র, তারিখ ৩০. ৩. ১৮৬৯, *মধুস্মৃতি* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৩৫।

পৃ ৩১৬

৬৫ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১১৮, *HRP*।

৬৬ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২০৬।

৬৭ *ঐ*, পৃ. ২৩৬; *মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২০১।

পৃ ৩১৭

৬৮ *Thacker's Directory for Bengal, 1870,* "Street Finder."

৬৯ *Thacker's Bengal Directory, 1868,* "Law Section."

৭০ *Thacker's Directory for Bengal, 1870*-এ তাঁর বাসস্থান এবং চেম্বারের ঠিকানা একই দেওয়া হয়েছে।

৭১ *Thacker's Directory for Bengal, 1870,* "Law."

৭২ উত্তরপাড়া থেকে চন্দননগরে যাবার কথা কবি নিজেই গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৪৮।

পৃ ৩১৮

৭৩ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২২৮।

৭৪ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৪৮, *HRP*।

পৃ ৩১৯

৭৫ *Englishman, 13 June 1871.*

৭৬ ঐ।

৭৭ *Thacker's Directory for Bengal, 1872,* "Law."

৭৮ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৪৭, *HRP*।

পৃ ৩২০

৭৯ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৪৯, *HRP*।

৮০ এই সংবর্ধনার খবর *হিন্দু হিতৈষিণী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। তারপর এই খবরের ওপর ভিত্তি করে ২২ সেপ্টেম্বরের *এডুকেশন গেজেট* পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মধুসূদন* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৯০।

পৃ ৩২১

৮১ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৫৭-৫৮।

৮২ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪২১।

৮৩ বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে প্রদত্ত তারিখ, Oct.-Dec., 1871. মুদ্রণ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে এক হাজার।

৮৪ MMD to Gourdas Bysack, পত্রসংখ্যা ১৪৯, *HRP*।

৮৫ *হেক্টর-বধের* উপহারপত্র।

পৃ ৩২২

৮৬ MMD to Rajnarayan Basu, পত্রসংখ্যা ৮৩, *HRP*।

পৃ ৩২৩

৮৭ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪১৯; *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৫২।

৮৮ এ সময়ে সূর্য গুডীব চক্রবর্তী মেডিকাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

৮৯ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৫২।

পৃ ৩২৪

৯০ *Bengal Directory for 1872*, "Street Finder."

৯১ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২১০।

পৃ ৩২৫

৯২ প্রথমবার কবি পুরুলিয়া পর্যন্ত যান। তাঁর সেই সংক্ষিপ্ত অবস্থানের সময়ে তিনি শহরের বাইরে গিয়ে পরেশনাথ পাহাড় দেখে কবিতা লিখেছিলেন — মনে করা শক্ত। কিন্তু তিনি যখন কয়েক মাস পঞ্চকোটে থাকেন, তখন এ কবিতা লেখা সম্ভব। তিনি এ সময়ে পরেশনাথ নিয়ে একটি এবং পঞ্চকোট গিরি নিয়ে দুটি কবিতা লিখেছিলেন। আগেই বলেছি, তিনি পাহাড় ভালোবাসলেও কখনো পাহাড় দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। সে জন্যে পরেশনাথ এবং পঞ্চকোট গিরিই তাঁর কল্পনাকে উস্কে দিয়েছিলো।

৯৩ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২১০-১১।

৯৪ *ঐ*, ২১১। এ বইতে সংশ্লিষ্ট ব্যাপটিজমের দলিলটিও ছাপা হয়েছে।

৯৫ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়ে *জ্যোতিরিঙ্গণ* পত্রিকায় (নভেম্বর ১৮৭২) — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধুসূদন*, পৃ. ৯৩।

পৃ ৩২৬

৯৬ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২১০।

৯৭ ঐ, ২১২-১৩।

৯৮ MMD to Raja Narendra Narayan Bhup, পত্রসংখ্যা ৫৩, *HRP*।

৯৯ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২১৫-১৬।

পৃ ৩২৭

১০০ পঞ্চকোটের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা এবং কিংবদন্তী মেশানো ইতিহাস দেওয়া আছে তখনকার *District Gazetteer*-এ। H. Coupland, *Bengal District Gazetteer*, Vol. XXVIII (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1911), pp. 53-54, 178-82, 187.

১০১ MMD to Raja Narendra Narayan Bhup, পত্রসংখ্যা ৫৩, *HRP*।
১০২ *The Bengal Law Reports*, Vol. 22, p. 532.

পৃ ৩২৮

১০৩ *Thacker's Bengal Directory, 1872*, "Law Section."
১০৪ এঁরা উভয়ে ছিলেন হাই কোর্টের প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ আইনজীবী।
১০৫ শ্রীনাথ দাস ছিলেন নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস, শিক্ষবিদ দেবেন্দ্রনাথ দাস এবং অভিধানকার জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের পিতা। হাইকোর্টের নাম করা আইনজীবী। তাঁর যোগদানের তারিখ ১৮. ৪. ১৮৫৬।
১০৬ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২১৫।
১০৭ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৭৫।
১০৮ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৫০; *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২১৬।
১০৯ বিদ্যাসাগরকে লেখা কৈলাসচন্দ্র বসুর চিঠি, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭২, বিহারীলাল সরকারের *বিদ্যাসাগর*গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৩৫-৩৬। এতে তিনি লেখেন: অদ্য রাত্রিতেই আমাকে পুরুলিয়ায় যাত্রা করিতে হইল।
১১০ ঐ, ২৩৬।

পৃ ৩২৯

১১১ ঐ।
১১২ MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১৫৩, *HRP*।
১১৩ মহারানী স্বর্ণময়ীকে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্র, বিনয় ঘোষের *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৬৫। বিদ্যাসাগর এ চিঠি লেখেন মাহারানীর কাছ থেকে যে-ধার নিয়েছিলেন. তা শোধ দেবার সময়ে।

পৃ ৩৩০

১১৪ মাইকেলকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২১৭।
১১৫ ঐ।

পৃ ৩৩২

১১৬ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ, ৪২২।

পৃ ৩৩৩

১১৭ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড (১৪০১), পৃ. ৪৫০-৫১।
১১৮ বিদ্যাসাগরের প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের অনেকগুলো সংস্করণ হয়েছিলো। ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত কয়েকটি বই-এর সংস্করণের হিশেব এ রকম: ১৮৭৪ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে একত্রে লেখা *শিশুশিক্ষার* ৬৫তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১০০০০ কপি); বিদ্যাসাগরের নিজের লেখা *বোধোদয়ের* ৪৬তম সংস্করণ (১০০০০ কপি); *বর্ণপরিচয়ের* ৪৩তম সংস্করণ (২০০০০ কপি); *ভাষাবোধ ব্যাকরণের* ৫৩তম সংস্করণ। জেমস লঙ লিখেছেন যে, ১৮৬৮ সালেও বিদ্যাসাগর প্রতি মাসে রয়্যাল্টি বাবদ প্রায় এক হাজার টাকা পেতেন। - লঙের এই হিশেব কতোটা সঠিক, তা জানা নেই। তিনি সম্ভবত অন্যদের কাছ থেকে শুনে এই মন্তব্য করে থাকবেন। তবে এটাকে মোটেই অসম্ভব মনে হয় না। ১৮৬৬ সালের প্রথমার্ধে মাইকেল রয়্যাল্টি বাবদ এক কাজার টাকা পেয়েছিলেন বলে বিদ্যাসাগরের কাছে লিখেছিলেন। মাত্র গুটি কতক কবিতা এবং নাটক থেকে তাঁর এ আয় হলে অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তক থেকে মাসে এক হাজার টাকা আয় হওয়া অসম্ভব নয়। মদনমোহন বিদ্যালঙ্কারের লেখা পাঠ্যপুস্তরের সংখ্যা বিদ্যাসাগরের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু তিনিও পাঠ্যপুস্তক থেকে কম আয় করতেন না। দুর্গাচরণ গুপ্তের নিজের ছাপাখানা ছিলো। তিনি অভিধান-সহ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ

করেছিলেন। তাঁরও প্রতিটি বই-এর অনেকগুলো সংস্করণ হয়েছিলো - গোলাম মুরশিদ, *নারীপ্রগতির এক শো বছর* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৬১-৬২।

পৃ ৩৩৪

১১৯ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪২১।

১২০ I. O. R., N/1/144/69.

পৃ ৩৩৫

১২১ শর্মিষ্ঠার নিমন্ত্রণপত্র থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২২ যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন যে, এ সময়ে কবি উত্তরপাড়ায় গিয়ে দুতিন মাস ছিলেন। *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪২৫। আর নগেন্দ্রনাথ সোমের মতে, মাইকেল এপ্রিল মাসে উত্তরপাড়ায় গিয়ে সেখানে দেড় মাস করেন। - *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৫৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, কবি সেখানে যান এপ্রিল মাসে। - *মধুসূদন দত্ত*, পৃ. ৯৭। আসলে এই জীবনীকারেরা কেউই সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। কবি দুই পুত্র এবং হেনরিয়েটাকে নিয়ে উত্তরপাড়ায় যান ৭ মে তারিখে শর্মিষ্ঠাকে বিয়ে দেবার দু-এক দিন পরে।

১২৩ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৬১-৬২।

পৃ ৩৩৬

১২৪ গৌরদাস বসাকের স্মৃতিচারণ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪৬৪।

১২৫ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২২১। নগেন্দ্রনাথ সোম (পৃ. ২৬৪) এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃ. ৯৭) ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, উত্তরপাড়া থেকে ফিরে কবি তিন সপ্তাহ নিজের বাড়িতে ছিলেন। এ তথ্য ঠিক নয়।

১২৬ *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২২১।

১২৭ উইলিয়াম ফ্লয়েডের ঠিকানা দেওয়া আছে *Thacker's Directory for Bengal, 1873*-তে।

১২৮ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৬৫।

১২৯ ঐ, পৃ. ২৬৬।

১৩০ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪১৯।

১৩১ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৬৫-৬৬। বিশেষ করে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ এবং প্রাণনাথ বিশ্বাস এবং মনোমোহন ঘোষের স্মৃতিচারণের কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে।

১৩২ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৬৬।

পৃ ৩৩৭

১৩৩ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪২৮।

১৩৪ ঐ, পৃ. ৪২৭।

১৩৫ ঐ।

১৩৬ ঐ।

পৃ ৩৩৮

১৩৭ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবি এবং তাঁর পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয় য়োরোপে থাকার সময়ে। কবির যখন বারে ডাক পড়ে, তখন ক্ষেত্রমোহন দত্ত বেঞ্চারদের কাছে কবির বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তুলে তাঁর ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু উমেশচন্দ্র তাঁকে ভয় দেখানোয় ক্ষেত্রমোহন শেষ পর্যন্ত সে সাহস করেননি। (MMD to Vidyasagar, পত্রসংখ্যা ১২৭, *HRP*)। হেনরিয়েটা যখন ফ্রান্সে বাস করছিলেন এবং কবির কাছ থেকে অনিয়মিত টাকাপয়সা পাওয়ায় অভাবে সময় কাটাচ্ছিলেন, তখনো উমেশচন্দ্র তাঁকে ৮ পাউন্ড দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। হাসপাতালে ভর্তির

ব্যাপারেও তাঁকে সাহায্য করেন। সবশেষে সাহায্য করেন কবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়।

১৩৮ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৬২।

১৩৯ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪২৮; *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৬৯।

১৪০ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৬৯, ২৭৩।

১৪১ প্রাণনাথ বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ, *মধু-স্মৃতি গ্রন্থে* উদ্ধৃত, পৃ. ২৭৪-৭৫।

১৪২ *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, পৃ. ৪২৯।

১৪৩ হিন্দু কলেজের এক তরুণ ছাত্র - মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান হয়েছেন - এ খবর *Bengal Hurkaru* থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলি পত্রিকায়। সরকারী কর্মকর্তা, মিশনারি, এমন কি, ফোর্ট ইউলিয়ামের কর্মকর্তারা পর্যন্ত সহযোগিতা করেছিলেন। তা থেকে ইংরেজ সমাজের উৎসাহ বোঝা যায়। কিন্তু সেই ছাত্র যখন বাংলা ভাষার তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার এবং একজন ব্যারিষ্টার হবার পর মারা যান, তখন ইংরেজ পরিচালিত পত্রপত্রিকায় সে খবর বলতে গেলে প্রকাশিত হয়নি।

পৃ ৩৩৯

১৪৪ *Englishman*, 30 June - 6 July 1873.

১৪৫ *Friend of India*, 3 July 1873: "His habits were irregular and he squandered his patrimony." তবে এতে উল্লেখিত হয়েছিলো যে, তিনি দেশের বিখ্যাত লোক ছিলেন। বাঙালিদের পরিচালিত ইংরেজ *মিরর* পত্রিকায় তাঁকে দেশের সবচেয়ে উজ্জ্বল বুদ্ধিজীবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো।

১৪৬ *Baudlaire*, p. 366-68.

১৪৭ নগেন্দ্রনাথ সোম অবশ্য লিখেছেন মর্গে কবির মৃতদেহ 'পুষ্পাচ্ছন্ন' অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার চেয়েও বেশি সময় ছিলো। - *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৭৬।

১৪৮ প্রাণনাথ বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ, *মধু-স্মৃতি গ্রন্থে* উদ্ধৃত, পৃ. ২৭৫।

১৪৯ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৭৪।

১৫০ *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৭৭।

১৫১ ঐ, পৃ. ২৭৬।

১৫২ জে বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ, *মধু-স্মৃতি*, পৃ. ২৭৭।

পৃ ৩৪০

১৫৩ হেনরিয়েটা মারা যাবার পর কবি যখন মনোমোহন ঘোষকে জিজ্ঞেস করেন বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং দিগম্বর মিত্র এসেছিলেন কিনা, তখন মনোমোহন বসু বলেছিলেন যে, তাঁদের খবর দেওয়ার সময় হয়নি। এ থেকে মনে হয়, এঁরা তখন কলকাতায় ছিলেন। কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলি, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরও তখন জীবিত ছিলেন।

১৫৪ কলকাতার Eccleciastical Papers-এ হেনরিয়েটা অথবা কবির মৃত্যুর কোনো তথ্য নেই। কিন্তু তাঁদের দুটি সন্তান এবং কবির দীক্ষা গ্রহণের তথ্য আছে।

১৫৫ বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: গোলাম মুরশিদ, *কালান্তরে বাংলা গদ্য* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃ. ১০১-০৬।

পৃ ৩৪১

১৫৬ Tapan Raychaudhuri-র *Europe Reconsidered* (Delhi: Oxford University Press, 1989) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৫৩।

১৫৭ এর সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতা রাধাকান্ত দেব। নিম্নবর্ণের হওয়া সত্ত্বেও, তিনি বিত্তএবং বিদ্যা দিয়ে কলকাতার হিন্দু সমাজের সর্বোচ্চ নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। বিত্ত ও বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা লাভের প্রক্রিয়া বাঙালি সমাজে বস্তুত ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা

গিয়েছিলো। এ সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিয়েছি আমার *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* গ্রন্থে (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ১৫১-৫৩।

পৃ ৩৪২

১৫৮ রামগতি ন্যায়রত্ন এ সম্পর্কে লিখেছেন: বাঙ্গালাবিনোদীদিগের এক্ষণে দুইটি বিশেষ দল হইয়াছে – একদল লোক মেঘনাদের অতি-প্রশংসাকারী, – ইংরেজীতে কৃতিবিদ্যগণ এই দলে অধিক। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে এরূপ আছেন যে, তাঁহারা মাইকেলের লেখা 'ম' বলিলেই ঘুসী উঁচাইয়া আসেন, 'ন্দ' পর্য্যন্ত বলিবার অপেক্ষা রাখেন না। আর একদল না বুঝিয়াও অনেক নিন্দা করেন। আমরা এই দুই দলের নাম 'গোঁড়া' ও 'নিন্দক' রাখিলাম – আমরা স্বয়ং কপাটি খেলার ঘোলষাঁড়ের ন্যায় উভয় দলেই থাকিব।' 'মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা', দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ সম্পাদিত *মধুসূদন: সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৯।

রাজনারায়ণ বসু এ সম্পর্কে বলেছেন: 'মাইকেল মধুসূদনের যেমন গোঁড়াও অনেক, তেমনি শত্রুও অনেক।' 'এই বক্তৃতা করিবার পর আমি অবগত হইলাম যে, উপরে আমি যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য মাইকেল মধুসূদনের পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় পক্ষীয় লোকেরা আমার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেবল এই মাত্র প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক বলিয়াছি।' – *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা* (কলিকাতা: নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র, ১৮৭৮), পৃ. ৩৫, ৩৬-৩৭।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও *Calcutta Review* পত্রিকায় (৫২ খণ্ড, ১০৪ সংখ্যা, ১৮৭১) Bengali Literature প্রবন্ধে নিজেকে মধ্যপন্থী বিবেচনা করেছেন।

১৫৯ রামগতি ন্যায়রত্ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২০।

পৃ ৩৪৩

১৬০ রাজনারায়ণ বসু, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা*, পৃ. ৩৬।

সংযোজন

পৃ ৩৪৮

১ গোপীমোহন দেবের শ্রাদ্ধে (১৮১৮ সালে) তিন লাখ টাকা ব্যয় হয়েছিলো বলে *সমাচারদর্পণে* লেখা হয়েছিলো। ১৮২৫ সালে রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে ব্যয় হয়েছিলো তার চেয়েও বেশি। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (৪র্থ মুদ্রণ; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭১), পৃ. ২৬১, ২৬৩।

২ ঐ, পৃ. ১২১।

৩ ইন্দ্রমিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর* (তৃতীয় মুদ্রণ; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১), পৃ. ৩৮৭।

৪ যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর জীবনীতে বারবার আক্ষেপ করেছেন, মাইকেল খৃষ্টান হয়ে কতো বড়ো অন্যায় এবং অপরাধ করেছিলেন। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর কবি শ্রীমধুসূদনে (কলকাতা:, ১৯) মধুসূদন যে আসলে শ্রী মধুসূদন, মাইকেল মধুসূদন একটা ভ্রান্তি তার ইঙ্গিত করেছেন।

পৃ ৩৫০

৫ IOR, N/1/153/248.

৬ IOR, N/1/152/529.

৭ IOR, N/1/159/266.

৮ IOR, N/1/165/.
৯ IOR, N/1/170/54d.
১০ IOR, N/1/167/209.
১১ IOR, N/1/305/113.

পৃ ৩৫১

১২ IOR, N/1/248/241.
১৩ IOR, N/1/359/220.

পৃ ৩৫২

১৪ IOR, N/1/431/217.

পৃ ৩৫৩

১৫ IOR, N/2/74/65.

পৃ ৩৫৪

১৬ IOR, N/11/8/814.
১৭ IOR, N/11/1007.

পৃ ৩৫৫

১৮ IOR, N/11/1005-1007.
১৯ আহমদ শরীফের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য। আমি নিজে কোনো পত্রিকায় পড়িনি। কিন্তু মাদ্রাসের সন্তানরা যেহেতু পিতার খবর রাখতেন, সুতরাং ব্যারিস্টার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর অগাধ সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার আশা নিয়ে কলকাতায় খোঁজখবর নেওয়া সম্ভব।
২০IOR, N/2/65/26.
২১ IOR, N/11/6/1165.
২২ IOR, N/2/124/208.
২২ IOR, N/11/6/1167.
২৩ IOR, N/2/88/96.
২৩ IOR, N/2/124/205.
২৪ IOR, N/11/10/146.
২৫ IOR, N/2/104/248.
২৬ IOR, N/1/477/60.
২৭ IOR, N/2/104/248.
২৮ IOR, N/2/115/220.
২৯ IOR, N/2/104/248.

নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা

১. অপ্রকাশিত দলিলপত্র

Birmingham University
James Long Papers, CMS, CI 1/01/185/1-154.

Edinburgh
Public Records Office, Ecclesiastical Records, 1856-70.

Gray's Inn
Gray's Inn Records, Extract from the Pension Minutes, 22. 12. 1863.
Staff List, Gray's Inn, 1862, Gray's Inn Library

India Office Records
Ecclesiastical Records
    Calcutta Dios. N/1 Series, 1843, 1859-63, 1873-1930.
    Madras, N/2 Series, 1825-56, 1880-1912.
    Madras, N/11 Series (Civil Marriage Register).
Law Report, V/22/532, Vol. 1.
Police Report on Europeans not in the Employ of E. I. Co. Living in Madras, dated 31 Dec. 1827, I. O. R. O/5/30, Vol. 4, Pt. 3.
Proceedings Civil and Judicial, 1847-48.
Recommendations by the Committee for Sudder Examination to the Bengal Government, January 1859.
Resolutions of Education Council of Bengal, 1843.

London
Catherine House, Ecclesiastical Records, Pancras, Middlesex, 1866, General Register Office

Rhodes House, Oxford University
Society for the Propagation of Gospels, Bishop's College Papers, C. Ind. I / 1, 6, 11, 12 and 13 Series.

Versailles
Ecclesiastical Records, Versailles Municipal Archives, 1864 & 1867.
Aux Archives Departmentales des Yvelines, Documents on Charity, 1863-65.

২ পত্রপত্রিকা

Athenæum, 1848-1856.

Bengal Hurkaru, 1843, 1847-48.

Englishman, 1861, 1867, 1870, 1873.

Friend of India, 1847, 1873.

Indian Field, 1858-62 (Only the available issues at the British Museum Library).

Lloyd's List (London Museum), 1862, 1863.

Madras Spectator, 1855.

Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century, Vol. 1, ed. Goutam Chattopadhayy. Calcutta: Progressive Publishers, 1965.

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড। চতুর্থ মুদ্রণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭১।

------ *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড। পঞ্চম মুদ্রণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪০১।

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত *সাময়িকপত্রে বাংলার সামজচিত্র*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: বীক্ষণ, ১৯৬৪।

------ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: গ্রন্থভবন, ১৯৬৬।

৩ সরকারী, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাময়িক প্রকাশনা

Bengal

The Bengal and Agra Directory and Annual Annual Register for 1848, Calcutta: Samuel Smith & Co., 1848.

Bengal Library Quarterly Catalogue, 1869, 1872 and 1873.

The New Calcutta Directory for the Town of Calcutta etc., for 1857-1861. Calcutta: A. G. Roussac, 1857-1862.

Thacker's Post Office Directory for Bengal etc. for 1863-64. Calcutta: Thacker, Spink and Co., 1863-64.

Thacker's Directory for Bengal, 1865-1871. Calcutta: Thacker, Spink and Co., 1865-1871.

The Bengal Directory for 1872-1873. Calcutta: Thacker, Spink and Co., 1872-1873.

Education

General Report on Public Instruction in the Bengal Presidency, 1842-43, Calcutta: Military Orphan Asylum Press, 1843.

Annual Report of the Hindu College et., 1843, Calcutta: Military Orphan Asylum Press, 1843.

Annual Report of the Hindu College et., 1846-47, Calcutta: Military Orphan Asylum Press, 1848.

Kerr, J. *A Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, from 1835 to 1851, Pt. I. Calcutta: Baptist Mission Press, 1852.*

------ *A Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, from 1835 to 1851, Pt. II.* London: Wm. H. Allen & Co., 1853.

Long, J. *A Handbook of Bengal Missions,* London: J. Farquhar, 1848.

Bengal Library Catalogue (The Quarterly List of Publications), Oct.-Dec., 1871; Jan.-Mar., 1874.

Coupland, H. *Bengal District Gazetteer, Vol. XXVIII,* Calcutta: Bengal Secretariat Book Depoet, 1911

Cowell, H. and Goodeve, L. A. eds., *Bengal Law Report, 1869-70,* Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1870.

The Bengal Law Reports, Vol. IX, 1872. Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1873.

London

Census Report, 1861

Index of Manuscripts in the British Museum Library, Vol. VIII. Cambridge: Chadwyck Healy, 1985

London Postal Directory, 1861, 1866-67.

Gray's Inn

Register of Admissions to Gray's Inn 1521-1889, ed. by J. Forster. London: The Hansard Publishing Union, 1889.

The Story of Gray's Inn. London: Chiswick Press, 1950.

Lincoln's Inn

Register of Admission to Lincln's Inn, J. Forster (ed.).

Madras

A Letter to Robert Lowe, Joint Secretary of the Board of Control, From John Bruce Norton on the Condition and Requirements of the Presidency of Madras Madras: Pharoah & Co., 18540

Madras Almanac, 1845-59, Madras: Male Orphan Asylum Press, 1863

Madras Asylum School and University

The Opening of the Madras Univesity, 1841. Madras: Vepery Mission Press, 1841.

Annual Report of the Madras University, 1843-50, Madras: Pharoah & Co., 1843-50

Madras University Calendar, 1866-71, Madras: Male and Female Orphan Asylum, 1866-71.

Reports of the Madras Male and Female Orphan Asylum and Free Day School or Boys, 1848-1852, Madras: C. M. Pereyra, Current Press, 1848-1852.

Report of the Madras University, 1851-52. Madras: Christain Knowledge Press, 1852.

The Madras Tercentenary Commemoration Volume, H. Milford ed. Madras: Oxford University Press, 1939.

The Annual Report of the Madras University, 1853, Madras: Pharoah & Co., 1853

The Eleventh Annual Report from the Governors of the Madras University, 1851-52. Madras: Pharoah & Co., 1852.

Versailles

New Guide, 1858.

৪ মাইকেল রচনাবলী

মেঘনাদবধ কাব্য, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ এবং *The Anglo-Saxon and the Hindu*-এর প্রথম সংস্করণ ব্যবহার করতে পারিনি। রচনা উদ্ধৃত করার জন্যে ব্যবহার করেছি ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত *মধুসূদন রচনাবলী*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯০ সংস্করণ।

The Captive Ladie (An Indian Tale) in two cantos by M. M. S. Dutt. Madras: The Advertiser Press, 1849.

মাইকেলের পত্রাবলী

মাইকেলের চিঠিপত্রের কোনো প্রামাণ্য সংস্করণ নেই। যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে মাইকেলের বেশির ভাগ চিঠি ব্যবহার করেন। তবে চিঠিতে উল্লিখিত অনেক ব্যক্তিই তখনো জীবিত থাকায় তিনি চিঠিগুলোর পূর্ণ পাঠ ব্যবহার করেননি। এমন কি, অনেক জায়গায় তিনি মূল পাঠ সামান্য পরিবর্তনও করেছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর *মধু-স্মৃতি*তে যোগীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত সব চিঠিই ব্যবহার করেন। কিন্তু কিছু বাড়তি চিঠিও খুঁজে পান। ক্ষেত্র গুপ্তের *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী* (কলকাতা: গ্রন্থনিলয়, ১৯৬৩) গ্রন্থে মাইকেলের সবচেয়ে বেশি চিঠি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু এতে যোগীন্দ্রনাথ যে গ্রহণ-বর্জন করেছিলেন, তা ছাড়াও অনেক ছাপার ভুল আছে। সুশীল রায় সম্পাদিত ও অনূদিত পত্রাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে (কলকাতা: এম. সি, সরকার)। তবে আমি এ বই ব্যবহার করিনি। ঢাকার বাংলা একাডেমিও চিঠিপত্রের একটি সংকলন প্রকাশ করেছে। এ বইতে ভুলের পরিমাণ আরও বেশি। বিদ্যাসাগরকে লেখা মূল চিঠিপত্র ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের অনুগ্রহে। এই সংকলনে একাধিক অপ্রকাশিত চিঠি আছে আর আছে বেশ কয়েকটি চিঠির পূর্ণ পাঠ। চিঠিপত্রের যদ্দুর সম্ভব শুদ্ধ পাঠ দিয়েছি আমার সম্পাদিত *The Heart of a Rebel Poet: Letters of Michael Madhusudan Dutt*, ed. by G. Murshid (Delhi: Oxford University Press, 2004) গ্রন্থে। *আশার ছলনে ভুলি*তে যে-পত্রসংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে, তা আমার সম্পাদিত এই বই থেকে।

৫ মাইকেল সম্পর্কিত রচনা

Unpublished D. Phil dissertstion

William Radice (উইলিয়াম র‍্যাডিচি) "Tremendous Literary Rebel: the Life and Works of Michael Madhusudan Datta" (a thesis submitted for the degree of D. Phil. in the Faculty of Oriental Studies, University of Oxford, 1986.

গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "মাইকেল ও বিদ্যাসাগর", *ভারতবর্ষ* (১৮/৬), জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ সম্পাদিত *মধুসূদন: সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব।* কলিকাতা: পুথিপত্র, ১৯৮৬।

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, *মাইকেল-জীবনীর আদিপর্ব,* কলিকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৬২।

নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধু-স্মৃতি,* কলকাতা: প্রথম বিদ্যোদয় সংস্করণ, ১৯৮৯ । প্রথম সংস্করণ ১৯২১।

প্রমথনাথ বিশী, *মাইকেল মধুসূদন (জীবনভাষ্য),* কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪১।

বিধান দত্ত সম্পাদিত *মধুসূদন স্মৃতি।* কলিকাতা: সাহিত্যম, ১৯৮৯।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধুসূদন দত্ত,* চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৫।

মোহিতলাল মজুমদার, *কবি শ্রীমধুসূদন,* হাওড়া: বঙ্গভারতী, ১৯৪৭।

যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল *মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,* প্রথম দেজ সংস্করণ; কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯৮৩। প্রথম সংস্করণ ১৮৯৩।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত,"মাইকেল ও বিদ্যাসাগর", *ঐতিহ্য ও পরম্পরা: উনিশ শতকের বাংলা।* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯৯।

------ "মাইকেল ও নীলদর্পণ", ঐ।

------ "গ্রেজ ইনে মাইকেল", ঐ।

------ "মেঘনাদবধ কাব্যের প্রসঙ্গে", ঐ।

------ "মাইকেল মধুসূদনের সনেট", ঐ।

------ "মাইকেলের একখানি বিস্মৃত গ্রন্থ", ঐ।

শশাঙ্কমোহন সেন, *মধুসূদন (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা),* কলিকাতা, ১৯২১।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য,* দ্বিতীয় সং; কলকাতা: পুথিপত্র, ১৯৮৫।

A. Bose, *Michael Madhusudan Dutt.* Delhi: Sahitya Akademi, 1981.

"Life of Michael Madhusudan Dutt in Bengali", *Calcutta Review*, Vol. 98, Jan. 1894.

Moreno, H. H. B. "M. S. S. Dutt and his Anglo-Indian Wives", Bengal Past and Present, Vol. 26 (pp. 191-94).

Radice, W. 'Milton and Madhusudan' in *Literature East and West, Essays Presented to R. K. DasGupta*, ed. G. R. Taneja and Vinod Sena. Delhi: Allied Publishers Ltd., 1995.

------ "The significance of Michael Madhusudan Dutt and his epic", *India International Centre Quarterly*, Vol. 30, No. 1 (Summer 2003).

------ "Xenophilia and xenophobia: Michael Madhusudan Datta's Meghnadbadh Kabya" in R. Snell and I. M. P. Raeside (eds.), *Classics of Modern South Asian Literature.* Harrassowitz Velag: Wiesbaden, 1998.

Seely, C., "মাইকেলের হাতে রামাদি চরিত্র", *Jadavpur Journal of Comparative Literature*, Vol. 29, 1990-91.

------ "Homeric Similes, Occidental and Oriental: Tasso, Milton, and Bengal's Michael Madhusudan Dutt", *Comparative Literature Studies*, Vol. 25, No. 1 (1988).

------ "Raja's New Clothes: Redressing Ravana in Meghanadavadh Kavya" in *Many Ramayanas*, ed. P Richman. Berkeley: University of California, 1991-

------ "Rama in the Nether World: Indian Sources of Inspiration", *Journal of the Americal Oriental Society*, Vol. 102, No. 3 (1982).

------ "Introduction", *The Slaying of Meghanada: A Ramayana from Colonial Bengal*, C. Seeley tr. Oxford University Press, USA, 2004.

৬ জীবনী, আত্মজীবনী ইত্যাদি

ইন্দ্রমিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*। তৃতীয় মুদ্রণ; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বিদ্যাসাগর-চরিত, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ*, ৩য় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭২।

কৈলাসবাসিনী দেবী, *আত্মকথা* । কলকাতা: হীরক রায়, ১৯৮২

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, "আত্ম-জীবন চরিত", *সাহিত্য*, ফাল্গুন, ১৩০৩।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত। কলকাতা: আদি ব্রাহ্ম সমাজ, ১৯০৯।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*, তৃতীয় সং; কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ১৯৮৭।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি*। কলকাতা: শিশির পাবলিশিং, ১৯২০।

বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ।* কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৩ সালের পুনর্মুদ্রণ।

বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর।* দ্বিতীয় ওরিয়েন্ট সংস্করণ; কলকাতা: ১৯৯১, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।* পঞ্চম সংস্করণ; কলকাতা: সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৫।

------ *ভূদেব মুখোপাধ্যায়*। তৃতীয় সংস্করণ; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৭।

------ *কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়*। দ্বিতীয় সং: কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৬।

------ *রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।* চতুর্থ সংস্করণ; কলকাতা: সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৬।

------ *রামনারায়ণ তর্করত্ন*। পঞ্চম সংস্করণ; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৯।

------ *সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর*। দ্বিতীয় সংস্করণ; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬০।

মন্মথনাথ ঘোষের *কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র*। কলকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১৩৩৩।

যোগেশচন্দ্র বাগল, *রাজনারায়ণ বসু*। দ্বিতীয় সংস্করণ; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৫।

------ *রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়*। দ্বিতীয় সংস্করণ; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৬।

রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত।* ষষ্ঠ সং; কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৮৫।

শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*। কলকাতা সিগনেট প্রেস, ১৯৫২।

------, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। কলকাতা: নিউ এজ, চতুর্থ সং, ১৯৮৩।

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ভূর্জপত্র, ১৯৮২।

------ *রবি-জীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: ভূর্জপত্র, ১৯৮৪।

Bell, Q. *Virginia Woolf*. Triad/Paladin ed; London: Triad/Paladin, 1987.

Edwards, T. *Henry Derozio* with an Introduction by R. K. DasGupta. Calcutta: Riddhi-India, 1980. (First published in 1884).

Holmes, R. *Shelley the Pursuit*. London: Penguin Books, 1987.

Levinson, M. *Keats's Life of Allegory*. London: B. Blackwell, 1988.

MacCarthy, F. *Byron: Life and Legend*. London: J. Murray, 2002.

Moore, T. *Life. Letters and Journals of Lord Byron*. London: John Murray, Albemarle St, 1838.

Pichois, C. *Baudlaire*. London: Hamish Hamilton, 1989

Sanial, S. C. "Captain David Lester Richardson", *Calcutta Review*, Vol. 123 (Jan. 1906).

৭ সহায়ক গ্রন্থ

গোলাম মুরশিদ, *সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।

-------- *নারীপ্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*। দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০০।

-------- *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা: অবসর, ২০০৬।

বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*। কলকাতা: পাঠভবন, ১৯৬৮।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*। চতুর্থ সং; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬৮।

রাজনারায়ণ বসু, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা*। কলিকাতা: নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩৫ (১৮৭৮)।

রাধারমণ মিত্র, *কলিকাতা-দর্পণ*। কলকাতা: সুবর্ণ রেখা, ১৯৮৮।

রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলকাতা: সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯১। প্রথম প্রকাশ ১৮৭২।

সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড। সপ্তম সং; কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

Ahmed, A. F. S. *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*. Leiden: E. J. Brill, 1965.

(Chatterji, Bankim Chandra) "Bengali Literature", *Calcutta Review*, Vol. 52, No. 104.

DasGupta, R. K. " Dante in Bengali Literature", *in East-West Literary Relations*. Calcutta: Papyrus, 1995.

------ "Shakepeare in Bengali Literature", *Ibid.*

------ "Indian Response to *Paradise Lost*', *Ibid.*

------ "Indian Response to Western Literature", *Ibid.*

Kopf, D. *British Orientalism and the Bengal Renaissance*. Berkeley: University of California Press, 1968.

------ *Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind*. Princeton: Princton University Press, 1979.

Mayhew H. *London Labour and the London Poor. L. Griffin, Bohn & Co., 1861.*

Murshid, G. *Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization.* Rajshahi University: Sahitya Samsad, 1983.

Odie, G. A. *Social Protest in India.* Delhi: Manohar, 1979.

Salter, J. *The Asiatics in England.* London: Seely, Jackson & Halliday, 1873.

Sinha, P. *Nineteenth Century Bengal.* Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyaya, 1965.

Raychaudhuri, T. *Europe Reconsidered.* 2nd Impression; Delhi: Oxford University Press, 1989.

Richardson, D. L. *Selections from the British Poets from the Times of Chaucer to the Present Day with Biographical and Critical Notes*. Calcutta: Baptist Mission Press, 1840.

Tod, J. *Annals and Antiquities of Rajasthan, or the Central and Western Rajpoot States of India*, 2 Vols. London: Smith, Elder & Co., 1829-32.

Trial of the Rev. James Long for the Publication of the 'Nil Durpan', London: James Ridgway, 1861.

নির্বাচিত নির্ঘণ্ট